তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

— কুড়ি টাকা—

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র পর থেকে তারাশঙ্কর যে সব উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন সেগুলির মধ্যে ক্রমশঃ দ্রুত মূল্যবোধ-পরিবর্তনের এই জগতে ধর্ম-বিশ্বাস ও যুক্তি-বিচারের দ্বন্দ্ব প্রবলতর হয়েছে এবং প্রধান চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে জীবনজিজ্ঞাসার সূত্রে আত্ম-জিজ্ঞাসা বেড়ে গেছে। যে অর্থে যে-কোন উপন্যাসই ঔপন্যাসিকের আত্মজীবনী সেই অর্থেই তারাশঙ্কর তাঁর এই সব উপন্যাসে বিভিন্ন আদর্শ, বিশ্বাস, সংস্কার ও আবেগের সংঘর্ষ এনে নিজের সত্যানুভূতিকে যাচাই করার চেষ্টা বার বার করেছেন। কালান্তর, বিচারক, সপ্তপদী, রাধা (ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা হলেও), উত্তরায়ণ, মহাশ্বেতা, যোগভ্রষ্ট সর্বত্রই দেখা যাবে, মানুষের আদর্শ বা বিশ্বাস (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ধর্মবিশ্বাস) বিচিত্র বিরুদ্ধ ও প্রতিস্পর্ধী পরিবেশে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। এক হিসেবে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র শেষ জমিদার সুরেশ্বরের মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে এবং সেদিক থেকে এই বৃহত্তম উপন্যাসটিও তারাশঙ্করের গভীর আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে জীবন-জিজ্ঞাসার দলিল। আর এই সংশয়-দ্বন্দ্ব ও সংকটের সূত্রেই উপন্যাস-শিল্পের নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কথক তারাশঙ্কর মহৎ ঔপন্যাসিক।

'সপ্তপদী'র (১৯৫৭)-নায়ক কৃষ্ণেন্দু প্রেমিকা রিনা ব্রাউনের জন্যে ক্রিশ্চান হয়েছিলেন। তবু প্রেমিকা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তার ফলে কৃষ্ণেন্দু পাদার কৃষ্ণস্বামী হয়েছেন। কুম্ভকোণম আশ্রমে কুষ্ঠদের সেবা করে নিজের ধর্মবিশ্বাসে শান্তি পেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে রিনা নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভেসে গেছে। যুদ্ধের সময়ে ফিরিঙ্গি সমাজের ব্যাভিচারের স্রোতে সে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। আমেরিকান অফিসারের জীবনের সাধামিটিয়ে-নেওয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় আত্মসমর্পণ করে মাতাল হয়ে প্রায় স্মৃতিভ্রংশতায় সে ভুগছে তারাশঙ্কর এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ দেখিয়েছেন রিনার আত্মপরিচয় প্রকাশে। রিনা পিতা-মাতার জারজ সন্তান। মা আসলে ছিদেন। তিন জেনারেশনের ব্যাভিচারের রক্ত তার ছিল। সেই মা আয়ার মতো তাকে দেখাশোনা করতো বাবার নির্দেশে। রিনা যখন বুঝলো সে ক্রিশ্চান নয়, ছোটবেলায় বাইবেল আর ক্রশ তাকে খেলার জন্যে দেওয়া হয়েছে, তখন থেকেই তার আত্মধিক্কার ও অধঃপতনের সূচনা। কৃষ্ণেন্দু যখন ক্রিশ্চান হয়েও রিনার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তখনই রিনার প্রতি তীব্র ঘৃণায় বাবা তার সামনেই তার জন্মের ইতিহাস প্রকাশ করে দিয়েছিল। রিনার তখনকার সেই হঠাৎ শূন্যতাকে ঔপন্যাসিকের ভাষাতেই বলা যেতে পারে: 'ঈশ্বর ধর্ম কোনো কিছুর উপর আমার কোনো অধিকার নেই। ঈশ্বর মূক, কোনো ভাষা নেই তাঁর, তিনি প্রতিবাদ করেন নি, ধর্মের মধ্যে তালা রীতির কোডে মেলেনি বলে খোলেনি। আমি সামনে দেখেছি নরকের সিংহ দ্বার খোলা—তার মধ্যে ঢুকেছি।'

এই জন্মগত অসামাজিক পরিচয়ের হঠাৎ প্রকাশ রিনাকে ব্যাভিচারের উচ্ছৃঙ্খল আবেগে

মুক্তি দিয়েছে। এই আবেগের পেছনে সামাজিক কোন চাপ থাকলে আরও যুক্তিসঙ্গত হতো। এই আবেগের মুক্তির পেছনে তারাশঙ্করের হেরিডিটি-তত্ত্ব-চেতনা (বংশধারার পাপের স্মৃতি) কাজ করছে—যে চেতনা তারাশঙ্করের অনেক উপন্যাসের নাটকীয়তার বীজ। 'কীর্তিহাটের কড়চা'র শেষ জমিদার সুরেশ্বরও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে নিজের বংশের জৈব প্রবৃত্তির বীভৎস প্রকাশকে রোধ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও বংশগত পাপের ইতিহাস-চেতনা তাঁকে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুত করেছিল। পূর্বপুরুষের বংশগত পাপের রক্ত যাকে কেন্দ্র করে নেচে উঠেছিল তারই মিশ্র রক্তের উত্তরাধিকারিণী কুইনীকে দেখে শেষ পর্যন্ত মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন প্রায় অজ্ঞেয়বাদী সুরেশ্বর। এ ক্ষেত্রেও রিনা ব্রাউনের মধ্যেই হেরিডিটি-চেতনা সমস্ত রকম সংযম, যুক্তি ও প্রতিজ্ঞাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

ঈশ্বরবিশ্বাস ভেঙে গেলে যে রিনা ব্রাউনকে যে শয়তান পেয়ে বসেছিল, এমনই পরিহাস, এককালে সেই তথাকথিত 'ক্রিশ্চান' ও ঈশ্বরবিশ্বাসী রিনা ব্রাউনের জন্যেই কৃষ্ণেন্দুর নিজের ধর্মীয় ঈশ্বরবিশ্বাস তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। অথচ নিজের এই ঈশ্বরকে বিসর্জন দিয়ে যখন সে রিনাকে দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করবার জন্যে রিনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন রিনা তাকে বলেছিল, 'একটি নারীর জন্য তুমি ঈশ্বরকে ছাড়তে পার।······আমার চেয়ে সুন্দরী নারী অনেক আছে। তাহলে তাদের কাউকে যখন দেখবে, সংস্পর্শে আসবে, সেদিন আমাকেও তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেবে তুচ্ছ বস্তুর মতো।' তারাশঙ্কর হয়তো রিনার মুখে এই কথা বসিয়ে রিনাকে ঈশ্বরবিশ্বাসী রূপে দেখাতে চেয়েছেন তার ভাগ্যের পরিহাসকে ঘনীভূত করবার জন্যে। কারণ, ধর্মের ভিত যখন তার টলে গেল তখন সে 'ভয়ংকর' কৃষ্ণেন্দুর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেই রিক্ততায় হাহাকারে ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণেন্দু আর রিনার এই বিপরীতমুখীনতাই উপন্যাসের কাহিনীটিকে সমৃদ্ধ ও সপ্রাণ করেছে। এবং কাহিনীর শেষের দিকে দেখি, রিনা ব্রাউনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে কৃষ্ণেন্দুর সেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুর আত্মত্যাগের বাণী ছায়ার মতো রিনাকে অনুসরণ করেছিল। 'কুয়ো ভাডিস' উপন্যাসের সেই বিখ্যাত বাণী : to Rome to be crucified again'!' তারাশঙ্করকে এক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছিল নিশ্চয়। পাপী রিনা অনুতপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সেন্ট কৃষ্ণস্বামীর কাছে যেতে সাহস পায় নি। তাই সে ক্লেটনকে নির্ভর করেছিল এবং ভাগ্য ভালো, ক্লেটন অনুতপ্ত রিনাকে সুস্থ জীবনে তুলে এনেছিল। তার পরই তো সেন্টের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব। দেখা হলো। সেন্ট কৃষ্ণস্বামী তখন দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, কিন্তু নির্লিপ্ত। রিনাও তখন সুখী বিবাহিত জীবনে ফিরে এসেছে। কিন্তু কৃষ্ণস্বামী ভগবানকে খুঁজেছে একলা, কারণ একলাই ও পথে যেতে হয়, সেজন্যে তার কোনো আক্ষেপও নেই।

রিনা ব্রাউন ও কৃষ্ণেন্দু দুটি চরিত্র পৃথক রেখায় পরিণতির দিকে এগিয়েছে। রিনার জীবনে বিশ্বাসভঙ্গ, পদস্খলন ও অনুতাপ হয়েছে, এবং সংসারে ফেরার শুভবুদ্ধির জাগরণ হয়েছে। আর কৃষ্ণেন্দুর জীবনে ব্যর্থতা ও বিশ্বাসের নিঃসঙ্গ নীরব সন্ধানের পর বিশ্বাসের অসীম নির্ভরে উত্তরণ ঘটেছে। উপন্যাসটির মধ্যে জটিল রেখাচিত্রের সৃষ্টি করেছে। দুটি মানুষের প্রাথমিক সাক্ষাৎ, আকর্ষণ ও বিচ্ছিন্নতা দুভাবে তাদের উত্তরণের পথে নিয়ে গেছে। তারাশঙ্কর কাহিনীটি

ক্রনোলজিক্যাল বিস্তার না ঘটিয়ে কাহিনীর মধ্যপথে সুরু করে মাঝে মাঝেই ফ্লাশব্যাকে বলেছেন, এবং দুজনেরই সংকট মুহূর্তে তাদের নিজেদের মুখের জবানীতেই কাহিনী শুনিয়েছেন। ফলে কাহিনীটি যেমন ঘনবদ্ধ হয়েছে তেমনি চরিত্রের সংকটের আন্তরিকতা কাহিনীটিকে অন্তরঙ্গ করে তুলেছে। কেবল মনে হয়েছে, রিনার ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত আকস্মিক-ভাবে টলে যাওয়ার পর যে পাপ ও নরকযন্ত্রণা ভোগ করে সে ক্লেটনকে নির্ভর করেছে তা খুবই নাটকীয় হলেও মানবিক। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর যে ঈশ্বরকে দেখলে, মানুষের সেবায় যেভাবে সে নিজেকে বিলিয়ে দিলে, গভীর রাতের শান্ত সমুদ্রের মতো হয়ে গেল তার মন এবং যে মন রিনার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতেও সমান অক্ষুব্ধ রইল তাতে তাকে যতটা শ্রদ্ধার যোগ্য মনে হয় ততটা মানবিক বলে মনে হয় না। উপন্যাসের শেষে দেখি, ক্লেটন আর রিনাকে সে যখন বিদায় দিনে দীর্ঘ হাতখানি তুলে, তখন মনে হলো, শূন্যলোকে অদৃশ্য ঈশ্বরের পা দুটি শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যাখ্যানের পর নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে যে বিশ্বাসকে সে এতখানি শান্ত স্তব্ধ করে আয়ত্ত করেছিল সে সংগ্রামকে আমরা উপন্যাসে দেখিনি। অথচ কৃষ্ণেন্দুকে লেখক অনেকবারই নিজের মুখোমুখি করিয়েছেন।

কেবলই মনে হয়েছে, একটি নির্বিকল্প প্রশস্ত সমাধির সামনে একটি মেয়ে যেন অঝোরে কেঁদে তার পাপ-তাপ খানিকটা হাল্কা করে চলে গেছে। হয়তো এই প্রসন্ন উদাসীনতাই তারাশঙ্করের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জিত সত্য বলে মনে হয়েছে। এবং এইদিক থেকেই হয়তো রিনার ব্যাভিচারের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের ছবি থেকে কৃষ্ণস্বামীর মানব-সেবার পরিবেশ বাঁকুড়ার সরল বন্য মুক্ত প্রকৃতি-অঞ্চল সয়ে-আসা বিশেষ উত্তরণের অর্থেই সংকেতময়।

উত্তরায়ণ (১৯৫৮) উপন্যাসের ঘটনা ও সপ্তপদীর ঘটনারই সমসাময়িক। কেবল আরেকটু এগিয়ে এসে ছেচল্লিশের বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ছুঁয়েছে। আরতিকে অপমানকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচবার সূত্রে প্রবীর 'হিরো' হয়ে আরতির সান্নিধ্যে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রবীরের পৌরুষ প্রকাশে কিছুটা হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি আছে। তারপর সে সান্নিধ্য ক্রমশ ভালোবাসার অনুভব-শিহরণে পৌঁছেছে। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে হঠাৎ ছেদ পড়েছে। যুদ্ধের সময়ে ইস্টার্ন ফ্রন্টে চলে গেছে প্রবীর। ইতিমধ্যে ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আরতির জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। আশ্রয় নিতে হলো উদাসীন, স্বার্থপর মামাদের বাড়িতে। এই বিহ্বলতার মুহূর্তে আরতি যখন অন্যান্য বিপন্নদের সঙ্গে গাড়িতে নিরাপদ জায়গায় যাচ্ছে তখনই হঠাৎ ড্রাইভার রতনের ছদ্মবেশধারী প্রবীরের সঙ্গে তার দেখা। তারাশঙ্কর এইরকম অনেককালের খুব পরিচিত মানুষকে অন্যরূপে হঠাৎ ফিরিয়ে আনার নাটকীয়তাকে ভালো-বাসেন, সপ্তপদীর কৃষ্ণস্বামীও এইরকম আকস্মিক ভাবে এককালের 'ক্রিশ্চান' রিনা ব্রাউনকে ব্যভিচারী হিদেন মাতাল রূপে দেখতে পেয়েছিল। যাইহোক, এই পর্যন্ত কাহিনী আরতির দাঙ্গাবিপর্যস্ত জীবনে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে কাটা কাটা ভাবে বলা হয়েছে। বিপর্যস্ত আরতি নোয়াখালিতে গান্ধীর সংস্পর্শে এসে শান্তি পেয়েছে। এই বিশ্বাসের পথে আরতিকে যিনি এনেছিলেন সেই ব্যক্তিটি হাঙ্গামায় নিহত হলেন। সেই সূত্রে শ্মশানে এসে প্রবীরের

সঙ্গে আবার তার দেখা। বন্ধুর ছদ্মবেশ নিয়ে প্রবীরের বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে থেকে অন্ধ শাশুড়ীর সৎকার করতে এসেছে। এই বিচিত্র রূপান্তরিত জীবনযাত্রার কাহিনী প্রবীর চিঠিতে আরতিকে জানিয়েছে। যে ড্রাইভার রতনকে সে বর্মার জঙ্গলে মৃত্যুযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে গুলি করে মেরেছে তারই মা ও স্ত্রীর সঙ্গে একাধারে পুত্র ও স্বামীর ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে হয়েছে। স্ত্রী বুঝেছে সে অভিনয়। অন্ধ মার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। এই রকম অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে প্রবীরের আত্মসমর্পণ অত্যন্ত অস্বাভাবিক রোম্যান্‌স্‌-সুলভ মনে হয়। মিলিটারি অফিসার এবং এককালে কলেজ জীবনের নারী-উদ্ধারকারী হিরো যে রকম অসহায়ভাবে পুত্রহীনার পুত্র হয়েছে, স্বামীহীনার স্বামী হয়েছে, রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ি থামিয়ে মোটর মেকানিকের কাজ করেছে, এবং অন্যদিকে পণ্ডিত বাড়ির মেয়ে যেভাবে স্বামীর বন্ধুকে পেয়ে তাকে শালগ্রামশিলার ছায়া করে 'দাম্পত্যকল্প' সম্বন্ধ তৈরি ক'রে নির্ভীক সতীত্বের অকলঙ্ক ভূমিকা নিয়েছে তার তাত্ত্বিক সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও বলা চলে, স্বামী-স্ত্রীর এই অভিনয়-তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে দুজনেই যেভাবে মানবিক দুর্বলতাকে জয় করেছে তার আভাস মাত্র উপন্যাসে আছে। অথচ সেই সংগ্রামই জীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে পারতো। উপন্যাসের মূল সত্য হতে পারতো। যাই হোক, অন্ধ মার মৃত্যুর পর এই দাম্পত্যচুক্তি শেষ হয়েছে, দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এর পরে মেয়েটির আত্মহত্যা যেমন নাটকীয় তেমনি আবেগময়। যেন শুধু শাশুড়ীকে ভোলাবার জন্যেই ওই দাম্পত্য তত্ত্বের প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে মিলিটারি অফিসার প্রবীর বন্ধু-হত্যার পাপে দগ্ধ হয়ে ওই মেয়েটির প্রেরণাতেই স্বাধীন ভারতের ন্যায়ের অবতার মহাত্মাজীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে গেছে। মেয়েটির সাহস অবিশ্বাস্য প্রবীরকে এক দিব্যতায় 'উত্তরায়ণ' করিয়ে দিয়ে গেছে। তবু বলবো, কখনো প্রথম পুরুষে, কখনো চরিত্রের মুখে চিঠির আকারে বলা এই কাহিনীতে তারাশঙ্কর চরিত্রের যে ভাবে উত্তরণ ঘটিয়েছেন তাতে রোম্যান্‌সের আকস্মিকতার খানিকটা যে পূরণ হয়েছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরতি যে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে মানব সেবার পরম আদর্শকে নিয়েছে, রতনের স্ত্রী পুরুষোত্তমের কল্পনায় যে কষ্ট সহ্য করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে এবং প্রবীর যে নির্ভীক সতীত্বকে দেখে স্বীকারোক্তির পথ নিয়েছে সেই অভিজ্ঞতাগুলি সর্বত্র ঔপন্যাসিক বিশ্বাসযোগ্যতা না পেলেও প্রত্যেকেই 'নৈতিক সমৃদ্ধিতে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছে। এই চরিত্রশক্তি তারাশঙ্করের দুর্বলতম রচনাকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এই নৈতিক সমৃদ্ধিতে আত্মস্থ সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দু বা কৃষ্ণস্বামীর কাছে সেইজন্যেই তো রিনার স্বামী বলে গিয়েছিল, 'আবার আসব। বার বার।'

এই নৈতিক সমৃদ্ধিরই অপর নাম প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাকে লক্ষ্য রেখেই এক জমিদার বংশের প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাস বর্ণনায় তারাশঙ্কর নিজেকে প্রসারিত করেছেন মহাকাব্যিক বিস্তারে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র (শেষখণ্ডের প্রকাশকাল ১৩৮৫) মধ্যে। এই উপন্যাসে একটি বংশ-ধারাকে অবলম্বন করে তিনি একটি যুগকে ধরেছেন বিশাল হাতে। এর পটভূমি দেড়শো বছরের ঘটনাবহুল পরিবর্তনশীল কাল। এই গতিশীল প্রেক্ষাপটে দেখি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের খাস গোমস্তা কুড়ারাম ভট্টাচার্য শেষ জীবনে জমিদারী কিনে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রায়বংশের প্রতিষ্ঠা করেছেন। দশ বছরের ছেলে সোমেশ্বর রায়ের নামে সে জমিদারী কেনা হয়। সোমেশ্বর থেকেই 'ভট্টাচার্য' উপাধি উঠে গিয়ে 'রায়' হলো। সোমেশ্বর পরে বিস্তৃত জমিদারী কিনেছিলেন। সোমেশ্বরের পর বীরেশ্বর। তারপর রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের তিন ছেলে। বড় ছেলে দেবেশ্বর রায়। তাঁর দুই ছেলে। যজ্ঞেশ্বর ও যোগেশ্বর। যোগেশ্বরের একমাত্র সন্তান সুরেশ্বর আর্টিস্ট। তিনিই কীর্তিহাটের শেষ জমিদার। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে তাঁরই আমলে জমিদারী প্রথা উঠে গেল। সুরেশ্বর আর্টিস্ট হিসেবে কীর্তিহাটের সোমেশ্বর থেকে-শুরু তাঁর সমকাল পর্যন্ত নানা ছবি এঁকেছেন। কীর্তিহাটের রেখাচিত্র শিল্পী তিনি। সেই রেখাচিত্র ধরেই তিনি স্মৃতিচারণ করে চলেছেন সাতপুরুষের। কথক সুরেশ্বর, শ্রোতা তাঁরই এককালের প্রেমিকা সুলতা। রায়বংশের রেখাচিত্র শিল্পী আঠারো বছর বাদে সুলতাকে পেয়ে রায়বংশের 'কথা'শিল্পী হয়ে উঠেছেন। এক বিচিত্র স্বাধিকার-প্রমত্ত জমিদারবংশের কীর্তিকাহিনী বলে জমিদারী উচ্ছেদের মুহূর্তে তিনি জবানবন্দী করে নিজের বংশগত আভিজাত্য, প্রমত্ততা ও পাপের দেনা শোধ করেছেন শ্রোতার কাছে। উপন্যাসের প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের খানিকটা সুলতার স্মৃতিচারণেই যেন বলা হয়েছে। সেখানে সুরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিচয়ের ইতিহাস এসেছে। সেই সঙ্গে সুরেশ্বরের পূর্বপুরুষের কিছু কিছু নাটকীয় অংশও এসে পড়েছে যা সুরেশ্বরের সঙ্গে পরিচয় সূত্রেই পাওয়া। তারপর শিল্পী, পানাসক্ত, কল্পনাবিলাসী, রায়-বাড়ির পূর্বপুরুষদের বিচিত্র ভালোমন্দের উত্তরাধিকারী, পূর্বপুরুষদের রোমাঞ্চকর নাটকীয় ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রাহক সুরেশ্বর বিচিত্র এক মোহগ্রস্ত মানুষের মতো স্বীকারোক্তি শুরু করেছেন। স্বীকারোক্তি শুধু নিজের নয়, পূর্বপুরুষের সব রকম ভালো-মন্দের। সুরেশ্বর একদিক থেকে খুবই আধুনিক মানুষ। কারণ, শুধু একালের মানুষ বলে নয়। কারণ, সে একই সঙ্গে জমিদারী রক্তের ডাক যেমন অনুভব করে, তেমনি এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের অবসান ও সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাও সে কামনা করে। এই বিপরীত মুখী দুটি টানের তীব্র জ্বালায় সে ভোগে। পূর্বপুরুষের অর্জিত পাপ যেমন তাকে নেশা ধরায়, কামনা ও ভোগবিলাসের দিকে টানে, তেমনি এই শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনের আত্মসংযম ও আত্মত্যাগও তাকে উদ্বুদ্ধ করে। এই দ্বন্দ্বে সুরেশ্বর শেষপর্যন্ত কুইনীকে বিয়ে ক'রে জমিদারী আভিজাত্য ভেঙে বেরিয়ে আসে। রায়বংশ আর গোয়ানদের রক্ত মিশে যায়। পুত্র 'মানবেশ্বর' অর্থাৎ 'মানবতা' বা 'মানব' কি সেই অর্থেই সার্থকনামা নয়? এই ভাবে একজন আত্মসচেতন সংবেদনশীল মানুষের দৃষ্টিতে জমিদারী আভিজাত্যের বিচ্ছিন্নতা ও ধর্মীয় আচরণের সংকীর্ণতার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। যে বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতাকে সুরেশ্বর নিজে ভেঙে বেরিয়ে এলেন উদার মানবিকতার ভূমিতে, তার কারণটা কিন্তু ঠিক সুরেশ্বরের উদার মানবিক বোধ নয়, কুইনীর প্রতি তার রক্তগত টান। এ আকর্ষণ তিনি বংশগত ভাবেই পেয়েছেন, পূর্বপুরুষের অবৈধ ভালোবাসার সূত্রেই এই কুইনীর মধ্যে সুরেশ্বর জমিদারী রক্তের টান অনুভব করেছেন। সুলতাকে তিনি আত্মবিশ্লেষণের

সূত্রে বলেছেন, 'কুইনীর প্রতি এই আকর্ষণ যে কেন এত প্রমত্ত, তা আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি। ঠিক পুরো বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু বলতে পারি, তার রূপের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমার পুরুষবিত্তকে প্রমত্ত করে। আর একটা কথা।...বার বার মনে হত, ও আমাদের, ও আমাদের,—আমাদের সম্পর্ক আছে ওর সঙ্গে। মনে পড়ত অঞ্জনাকে, রত্নেশ্বর রায়কে। মনে পড়ত দেবেশ্বর রায় এবং ভায়লেটকে। অর্থাৎ একই সঙ্গে রূপমোহ ও জমিদারী রক্তের সম্পর্ক সুরেশ্বরকে কুইনীর কাছে টেনে নিয়ে গেছে, হিন্দু-ক্রিশ্চানের বেড়া ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং, নিছক মানবিক মহত্ত্বে সুরেশ্বর যে জমিদারী আভিজাত্য ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন তা নয়। বরং, কুইনীর সঙ্গে জমিদারীগত আত্মীয়তা-বোধই সুরেশ্বরের জৈবিক কামনার সঙ্গে মিশে ছিল। হয়তো প্রাথমিক আকর্ষণ হিসেবে জৈবিক ও বংশগত শ্রেণী-চেতনা কাজ করেছে ঠিকই, কিন্তু পরে এই কামনার সঙ্গে মিশেছে প্রেমে অবিচ্ছেদ্য অনুভব। সুরেশ্বরের আত্মত্যাগ, রায়বংশের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ও স্বাধীন বিবাহিত জীবনযাপনের চেষ্টা, সম্পত্তিকে জনসমাজে ও জনকল্যাণে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা, স্ত্রীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের কষ্ট, স্ত্রীর স্বাধীন জীবিকাগ্রহণ, সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে স্ত্রীর কাছে রেখে মানুষ করার চেষ্টা—সব কিছুর ভেতর দিয়ে সুরেশ্বরের জীবনে সেই মহৎ প্রেমই ফুটে উঠেছে—মানবিকতাই যে প্রেমের অন্য নাম। এই তপস্যালব্ধ মানবিকতার বলেই অসুস্থ সুরেশ্বর ক্রিশ্চান স্ত্রী কুইনীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে তাকে মানব সাধনার সহধর্মিনী করতে পারলেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নির্বিকল্প সেই মানুষটি 'পরিচিত জনতার সরণী'তে নেমে এলেন, বিশাল জমিদারী বিশালতর জনারণ্যে ছড়িয়ে গেল। মানুষের কালের যে নতুন যবনিকা উঠবে তারই অব্যর্থ প্রতিনিধি সুরেশ্বরের সন্তান মানবেশ্বর।

সোমেশ্বর রায়ের জমিদারী প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু জমিদার মহাজন, নায়েব, গোমস্তা এবং হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান নানা ভূমিনির্ভর সাধারণ মানুষের পরিচয় আছে এই ক্রনিকল্ বর্ণনায়। গ্রাম যেমন এসেছে, তেমনি শহরও এসেছে। শহরের আভিজাত্য ও বিলাসিতা, গ্রামের জমিদারদের শহর-বাস ও ইংরেজি শিক্ষার আলো পাওয়ার ইতিহাস, তাদের রুচি, আভিজাত্য, উচ্ছৃঙ্খলা ও বীভৎস কদাচার, বাইজী ও পতিতালয়ের নতুন আকর্ষণ, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাই-জেশানের সঙ্গে অবক্ষয়িত জমিদারদের যোগাযোগ, জমিদারদের মধ্যবিত্ত জীবনে অধঃপতন, স্বাধীন জীবিকা, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী ঐক্যের পরীক্ষা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং জমিদারী উচ্ছেদ ও সমাজবাদের সূচনা—এই সম্পূর্ণ দেশ কালের পটভূমিকাকে তারাশঙ্কর এত প্রসারিত করে ইতিপূর্বে আর ধরেন নি। চৈতালিঘূর্ণি, মন্বন্তর, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, নাগিনীকন্যার কাহিনী, কিংবা পদচিহ্ন বা শতাব্দীর মৃত্যু ইত্যাদি উপন্যাস এবং রায়বাড়ী, জলসাঘর, অগ্রদানী, তিনশূন্য, সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার ইত্যাদি গল্প থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষের স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা এবং লোভ-লালসা জৈবিক বৃত্তির গল্প ও অলৌকিক বিশ্বাসের নানা কাহিনীর মধ্যে তারাশঙ্কর তাঁর শিল্প-চেতনাকে যেভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন তার সম্পূর্ণ যোগফল বোধহয় এই উপন্যাস। কারণ, এই উপন্যাসের জমিদারবাবুরা তো বটেই, হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান

প্রজারা, অন্দর মহলের বিচিত্র মেয়েরা—অন্নপূর্ণা যাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, কলকাতার বিচিত্র মানুষ এবং দেড়শো বছরের কলকাতার নতুন সমাজবিন্যাস এমন কি কীর্তিহাটের কাহিনীর শ্রোতা সুলতা পর্যন্ত অনেক ব্যক্তিত্বকে আংশিকভাবে এবং কখনো কখনো একই চারিত্রিক স্বভাবে, অন্যান্য গল্প উপন্যাসে আমরা দেখেছি। বোধহয় বিলেতের পরিবেশটা নতুন। ওখানকার কীর্তিহাট শাখার হারা রায় ও চন্দ্রিকা মালহোত্রার মতো চরিত্র তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাস গল্পে বিশেষ আছে বলে মনে হয় না—ও দুটি চরিত্র এক্ষেত্রে নতুন ডাইমেনশন এনেছে। আর নতুন ডাইমেনশন এনেছে এই দেড়শো বছরের কিছু বাস্তব ঐতিহাসিক খ্যাতনামা মানুষের সক্রিয় ভূমিকা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আগেও অনেক উপন্যাসে পেয়েছি। কিন্তু কর্ণওয়ালিস থেকে শুরু করে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র নাথ, অক্ষয় কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, তিরিশের দশকের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আড্ডার বিখ্যাত মনস্বীরা, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের গান্ধী প্রমুখ সবকজন উল্লেখযোগ্য নায়ক, আগস্ট আন্দোলন এবং বিশেষ করে মেদিনীপুরের কীর্তিহাটকে কেন্দ্র করে তার প্রতিক্রিয়া, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক নেতারা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র ও মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ পর্যন্ত অনায়াসে এই বিশাল উপন্যাস-ভূমিতে বিচরণ করে গেছেন। জমিদার অবক্ষয়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতাকেও তাঁরা সম্পূর্ণ করে গেছেন। জমিদারীর ক্ষতিপূরণের টাকা নতুন সমাজবাদী সুরেশ্বর মৃত্যুর আগে বিনোবা ভাবেকে দিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। সেইসূত্রে ঐতিহাসিক বাস্তব এই চরিত্রটির সঙ্গে সুরেশ্বরের স্ত্রী কুইনী দেখাও করেছে। তারাশঙ্কর বরাবরই কালের সঙ্গে পা ফেলে চলেন; কাল-কালান্তরের যোগসূত্র দেখান, কিন্তু এই উপন্যাসে অনেক বেশি দৃঢ়ভাবে তিনি পা ফেলার চেষ্টা করেছেন। আগেকার সব গল্প-উপন্যাসগুলিকে যদি বলি এক একটি স্বতন্ত্র 'লিটারারি এপিক' তাহলে কীর্তিহাটের কড়চাকে বলবো এপিক তবে গ্রোথ্।' অবশ্য এক মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্যিক জীবনের নানাপর্বে নানা অভিজ্ঞতার ফসলকে যেমন তারাশঙ্করে ছোট বড় মাঝারি গল্প উপন্যাসের গুচ্ছে বেধেছিলেন তেমনি এখানে সব অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। কংসাবতীর জল ইংলিশ চ্যানেল ছুঁয়ে ফের ফিরে এসেছে কীর্তিহাটে। ইতিমধ্যে সুরেশ্বরের 'নীলরক্তে' গেরুয়া রঙ ধরেছে। সাতপুরুষের খোলস ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করেছেন তিনি। একেবারেই হাড়ে-মজ্জায় নতুন মানুষ হওয়া যায় না। সেইজন্যেই সুলতার মনে হয়েছিল, সুরেশ্বরের মৃত্যুতে জমিদারের শেষ আরিস্টোক্র্যাট মানুষটি বিদায় নিলেন। অর্থাৎ নতুন মানুষ না হোক, এক মানবসন্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছেন সুরেশ্বর। স্ত্রীকে মৃত্যুর আগে বলেছেন, 'সোসালিজম্ কম্যুনিজম্ বুঝি না কুইনী। সব ভূমি গোপাল কি' বললে বুঝতে পারি। মন প্রসন্ন হয়।' তার অর্থই হলো, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমবণ্টনের কাজের চেয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ বেশি হয় ভেবেই ভূদানের প্রতি সুরেশ্বর ঝুঁকে-ছিলেন। কিন্তু এওতো ঠিক যে, ব্যক্তি-উদ্যোগে সোস্যালিজমের সূচনা হতে পারে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োগবিধিটি ছাড়া এ চেষ্টা স্থায়ী কোনো কর্মযজ্ঞের সূচনা করে না। ব্যক্তি-উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। যাই হোক, ধরে নেওয়া যেতে পারে, দ্রুত কোনো কার্যকারিতার

জন্যেই বিনোবাজীকে শেষ আশ্রয় করেছেন সুরেশ্বর। কারণ বিনোবাই তখন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সব চেয়ে উদ্যোগী 'সমাজবাদী।'

আসলে এই আভিজাতিক আবরণ-ভঙ্গের সাধনায় সুরেশ্বরকে বড় কঠিন আত্মসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই আত্ম-সংগ্রামের পর্বে তিনি খুব বেশি নিজেকে সমাজের মধ্যে ছড়াতে পারেন নি। তারাশঙ্কর সে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন আদিপর্বেই: 'হয়তো গভীর অন্তস্তলে আরও কিছু আছে। নিজের বংশের ধারাকে সমর্থনও বটে আবার তার প্রতি বিদ্বেষও বটে।' এবং সারা উপন্যাসেই সুলতাকে রায়বংশের জবাববন্দী দিতে দিতে স্ববিরোধিতার এই বিচিত্র সংগ্রামের কথা তিনি বলেছেন। আর, এই সংগ্রাম থেকেই তিনি আত্মশুদ্ধি ঘটিয়েছেন—সেই নির্লিপ্ততার 'নৈতিক সমৃদ্ধি'তেই পৌঁছেছেন—যে সমৃদ্ধি তারাশঙ্করের এই অবিন্যস্ত, পুনরাবৃত্ত, নাটকীয়তাময়, দীর্ঘস্মৃতিসূত্রজালবদ্ধ, শিথিল ও উচ্ছ্বসিত আদি-মহাকাব্যিক বিশাল কাহিনীর গ্রথিত ফলশ্রুতি।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কীর্তিহাটের কড়চা

অন্নপূর্ণা-মা সেদিন অর্চনার বিয়ে পাকা করবার সময় সুরেশ্বরকে শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—শোন, কালকে যা কথা হয়েছে, তাই ঠিক রইল, কন্যাভরণ আমি নেব না। শুধু শাঁখাশাড়ী দিবি। পাত্রকে পাত্রাভরণ দিতে হবে ও যা চাইবে। ছোঁড়ার মোটরগাড়ীতে ঝোঁক, ডাক্তার হয়েছে। একটা মোটরগাড়ী দিস্। আর ঘড়িফড়ি যা দিতে হয় আসর সাজিয়ে দিবি। যোগেশ্বরই একমাত্র টাকা রেখেছিল, জমিয়েছিল, সুদে বাড়িয়েছিল; তার অর্ধেক সে উড়িয়ে দিয়ে গেছে। ধনীদের টাকা রাজা জমিদারের টাকা যাতে যায় তাতেই উড়িয়েছে। তবু ভাল সে অৰ্দ্ধেক রেখে গেছে। নগেন বলছিল—নাতবউ তোর মায়ের বুদ্ধিতে তা বিষয়-সম্পত্তিতে লগ্নী ক'রে বেড়েছে অনেক। তোর বোন নেই। তুই দিবি। তার সঙ্গে আর একটি শর্ত চাপাব।

সুরেশ্বর বলেছিল—বলুন।

—ওই বাড়ী, যা দাদা দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছে অঞ্জনাদি'র মেয়ে ভায়লাকে, যাকে দেবেশ্বর কৃশ্চান হয়ে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছিল, তার বাড়ী যদি কেড়ে নেয় রায়বংশের কেউ তাতে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই সুরেশ্বর।

সুরেশ্বর বলেছিল—ব্যাপারটা যতদূর বুঝছি, তাতে হ্যারিস বলে একটা লোক, সে হল কুইনীর মায়ের সৎমামা—

—তুই বলছিস ভায়লার বেটা পিড্রুজ যে ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল, সেই মেয়েটার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর সন্তান?

—হ্যাঁ। সে কিছুদিন আগে কীর্তিহাটে গিয়েছিল। তার দাবী তার মা, মানে কুইনীর মায়ের-মা মরবার সময় কুইনীর মাকে বলেছিল, হ্যারিসকে থাকবার জন্যে একখানা ঘর দিস। লোকটা জঙ্গলে বাস করত, বড়লোকদের শিকারের শখ হলে তাদের বনে নিয়ে গিয়ে শিকারের ব্যবস্থা করে দিত। তার-পর একটা খুনখারাপী করে লোকটার জেল হয় বারো বছর। জেল থেকে ফিরে লোকটা কলকাতায় এসে দেখে কুইনীর মা মরে গেছে, কুইনীকে হিলডা নিয়ে এসেছে কীর্তিহাটে। সে কীর্তিহাটে এসেছিল কুইনীকে নিয়ে কলকাতার বাড়ীতে বাস করবে, কুইনীকে মানুষ করে তুলবে লেখাপড়া শেখাবে। কিন্তু হিলডা লোকটাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—ওর মতলবটাই অত্যন্ত বদ মতলব। মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে—।

হ্যারিসকে নিয়ে যা ঘটেছিল তা সে সবই বললে অন্নপূর্ণা-মাকে। এবং দুই আর দুই চারের মত হ্যারিস ও প্রণবেশ্বরের যোগাযোগ ফলটাই অনুমান ক'রে বললে।—হ্যারিসই খুঁজে বের করেছে প্রণবেশ্বরদা'কে। হয়তো বা কীর্তিহাট থেকেই সে ঠিকানা-ফিকানা যোগাড় করে এনেছিল। এসে এই কাণ্ড বাধিয়েছে। তা আপনি বলছেন—আমি বাড়ীটা যদি দরকার হয় তবে না-হয় দাম দিয়েই আবার কুইনীর নামে দলিল করিয়ে দেব। নিশ্চয় করব আমি।

রথীন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনেই গেল। একটি কথাও বললে না। সে চারিদিক ঘুরে আমার আঁকা ছবিগুলো দেখছিল।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—বিয়ে তা হলে ফাল্গুনেই হবে। তুই আয়োজন কর। কিরে রথীন? বল আর একবার বল!

—আবারও বলতে হবে?

—হবে।

—তা হলে বলছি, আগে একবার তিন সত্যি করেছি আবারও করছি। করব, করব, করব।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ভাল, তুই একবার ওই মেয়েটিকে ডাক।

—কাকে? কুইনীকে?

—হ্যাঁ।

—এখানে ডাকব?

—বারান্দাতে দাঁড়াতে বল।

কুইনী এসে বারান্দাতে দাঁড়াল, অন্নপূর্ণা-মা তাকে বললেন—তোমার বাপ তো মুখুজ্জে বামুন ছিল?

কুইনী হাসলে, বললে—হ্যাঁ মুখার্জি ছিলেন কিন্তু আমরা কৃশ্চান। আমার বাবার বাবা তাঁর বাবা প্রপিতামহ কৃশ্চান হয়েছিলেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তা হলেও তুমি ভায়লেটের বংশ। আমি এই বাবুকে বলে গেলাম, কোন ভয় নেই তোমার, ও বাড়ী তোমরা নিশ্চয় ফিরে পাবে। ভায়লেটকে আমি চিনতাম।

কুইনী চুপ ক'রে রইল।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—আমি কে জান?

কুইনী বললে—জানি, হিলডাদিদিয়া বললে—আপনি কীর্তিহাটের সব থেকে বড় জমিদার রায়বাহাদুরের বোন।

—হ্যাঁ। তোমার মায়ের বাবার মা ভায়লা—ভায়লেটকে আমি তোমার মত দেখেছি। বুঝেছ? তাকে খুব ভালবাসতাম আমি।

কুইনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা বিনীত আভিজাত্য আছে সুলতা। সে আঘাত সহ্য করে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু হারে না। কারণ যুদ্ধ তো হয় না তার সঙ্গে। সে নিরস্ত্র। তবে হ্যাঁ, অনেক কুম্ভকর্ণ আছে যারা সশস্ত্রনিরস্ত্র বাছে না, চর্বণ করে হাড়গোড় পর্যন্ত শেষ করে দেয়।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—আমি সুরেশ্বরকে বলে দিলাম। তুমি পড়াশোনা কর। রায়বাড়ীর বড় তরফ তোমার পড়ার সমস্ত খরচ যোগাবে। ভায়লেটের ছেলে মিশনারী ইস্কুলে পড়ত? তার খরচ বড় রায় তরফ। দিয়েছে। পিড্রুজ মারা গেলে তোমার মায়ের পড়ার খরচ তাও দিয়েছে। কনভেণ্টে পড়ত বোধ হয়।

কুইনী সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালে এবার। সম্ভবতঃ এত কথা তিনি জানলেন কি ক'রে সেই প্রশ্নটাই তাকে বিস্মিত ক'রে তুলেছিল।

অন্নপূর্ণা-মা রথীনকে সঙ্গে নিয়েই চলে গেলেন।

বিকেলবেলা খবর পেলাম বিশে ফাল্গুন বিয়ের দিন স্থির করছেন অন্নপূর্ণা-মা।

বিশে ফাল্গুনই বিয়ে হয়ে গেল সুলতা। শর্ত আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম সুলতা। শুধু অর্চনার বিবাহের বরপণ বা খরচ সম্পর্কেই নয়, অন্নপূর্ণা-মা কুইনী সম্পর্কে যে শর্ত আমার উপর চাপিয়েছিলেন তাও আমি পালন করেছিলাম।

তার মধ্যে কিছু কথা আছে, কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, সে কথা না বললে রায়বাড়ীর জবানবন্দী অসম্পূর্ণ থাকবে। এবং অর্চনাকে নিয়ে যা প্রশ্ন করলে তাও ঠিক পরিষ্কার হবে না।

* * *

বিয়ে ঠিক হয়েছে বিশে ফাল্গুন। আমি জানবাজারের বাড়ীতে। জগদীশ্বরকাকার গোটা সংসারকে এখানে নিয়ে এসেছি। হিলডা কুইনী ফিরে গেছে কীর্তিহাটে। আমি মেদিনীপুরের মিশনারীদের ইস্কুলে এবং হোস্টেলে কুইনীকে দেবার জন্যে চিঠি লিখেছি। আর বাড়ীখানার জন্য প্রণবেশ্বরদাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। অনুমান আমার সত্য, হ্যারিস এসে প্রণবেশ্বরদাদাকে দিয়ে বন্ধ ঘরখানা খুলিয়ে ঢুকে বসেছে। প্রণবেশ্বরদা হাজার হলেও রায়বাড়ীর ছেলে। বিষয় ব্যাপার বোঝে, হ্যারিসের কথায় কাগজপত্র খুঁজেপেতে পেয়েছে কর্পোরেশনের ট্যাক্সের রসিদ। অবশ্য বেশ ক'বছর আগের রসিদ। তখন তাদের অবস্থা ভালই ছিল। বোধ করি বিশ বছর আগের। তারপর খুঁজে খুঁজে পেয়েছে যে বাড়ীর দানপত্র হওয়া যে-কালে হয়েছে সেই কাল থেকেই কর্পোরেশনের ট্যাক্স বরাবরই দিয়ে আসছে রায়বাড়ীর বড়তরফ।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর এ দায়টা চাপিয়ে রেখে গিয়েছিলেন বড় ছেলে দেবেশ্বরের ঘাড়ে। তাই বরাবর দেওয়া হয়ে আসছে। বিশ বছর আগে যখন বড়তরফের বড়তরফ প্রণবেশ্বর-দাদারা কর্পোরেশনের সব ট্যাক্সই বাকী ফেলতে শুরু করলেন তখন থেকে আমাদের বা আমার তরফ থেকেই জয়েন্ট প্রপার্টির ট্যাক্স দিয়ে আসা হচ্ছিল। এ বিশ বছরের ট্যাক্স আমরাই দিয়ে এসেছি। হ্যারিসের কাছে হদিসটা পেয়ে প্রণবেশ্বরদা নিজে থেকে গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে কর্পোরেশন ট্যাক্স দিয়ে এসেছে এবং একলা তার বাপের অর্থাৎ জ্যাঠামশাই যজ্ঞেশ্বর রায়ের নামে রসিদ কাটিয়ে এনেছে। তার ফল এই। এলিয়ট রোডের বাড়ীখানি লাভ! লাভ না-হোক ক্লেম বটে। ষোল আনা না-হোক আট আনা বটে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরও একটা জিনিসে তার ভরসা ছিল, সেটা আমার মূর্খতা। সেটেলমেন্টে নগদ হাজার কয়েক টাকা দিয়ে গোয়ানপাড়া চাকরান থেকে পুরো নাখরাজ করে দিয়েছি; কীর্তিহাটে গোচরভূমি আর বসতবাড়ী কুড়ারাম ভটচাজের পাঁচালী দেখিয়ে বিনা খাজনায় ভোগ করতে দিয়েছি, এবং টাকা এখনও আমার লাখ কয়েক ছিল সুতরাং হিলডা এবং কুইনী কেঁদে পড়লে হয়তো আরও কিছু খরচ করতে আমি রাজী না হয়ে পারব না।

প্রণবেশ্বরের হিসাবে ভুল ছিল না। কিন্তু ওদের অদৃষ্ট খারাপ, তার প্যাঁচেই সত্যি অঙ্কও ভুল হয়ে যায়। পাওনার অঙ্কের বাঁদিকে কখন যে একটা ফুটকি বসিয়ে দিয়ে পূর্ণকে ভগ্নাংশ করে দেয় তা গণৎকার বলতে পারে, আমি পারি না। অন্ততঃ তখন তেমনি কপালের পালাই চলছিল।

প্রণবেশ্বরদাদাকে ধরতে চেষ্টা করেও পারছিনে। জগদীশ্বরকাকাকে আনতে চেষ্টা করছি, তাও পারছি না। জগদীশ্বরকাকা স্ত্রীর সঙ্গে অর্চনা এবং অন্য ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজে আসেননি।

কারণ তখন ইলেকশন ক্যাম্পেন চলছে পুরোদমে, এবং ইলেকশন ঠিক সামনে।

মেদিনীপুর। বাংলার পীঠস্থান মেদিনীপুর। সকলেই জানে মেদিনীপুর থেকে কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেট এবং একটি মিস্ট ক্যাণ্ডিডেট ছাড়া কেউ আসবে না। কংগ্রেসের ভিতরে তখন দুটো ভাগ তা তুমি আমার থেকে ভাল জান সুলতা। কিন্তু প্রণবেশ্বরদাদা সেখানে গেছেন, জগদীশ্বরকাকা সেখানে থেকে গেছেন এই ভোটপর্ব থেকে কিছু উপার্জনের প্রত্যাশায়।

আমি সকালবেলায় উঠে বারান্দায় রেলিংয়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি খবরের কাগজের জন্যে। কোথায় কোন বক্তৃতা হল, কে কি বললে, তা জানবার জন্যে মন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

বিয়ের উদ্যোগের আয়োজন চলছে। খুড়ীমা ম্লান মুখে এসে যখন বলেন—হ্যাঁ বাবা, এটার কি করবে? তখন আর লজ্জার আমার বাকী থাকে না।

আমি বলি—যা বলবেন তাই হবে।

কিন্তু তিনি মাটির দিকে মুখ নামিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন—তাতে যে অনেক খরচ হবে বাবা!

—আমি আপনাদেরই ছেলে! বললে এমন আশ্চর্য হাসেন, যাতে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেতে হয়।

সেদিন সেই সকালেই মনোহরপুরের খুড়ীমা বলতে এসেছিলেন—প্রণামীর কাপড়ের কথা। দুদিন আগে ওবাড়ী থেকে অন্নপূর্ণা-মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে এর জন্যে। সকলকে ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে খিল বন্ধ করে অন্নপূর্ণা-মা আমাকে বলেছিলেন—শোন সুরো, আজ আমি যা বলছি তা রায়বাড়ীর মেয়ে হয়ে বলছি রে! ভবানীপুরের মুখুজ্জেবাড়ীর বউ না আজ আমি। এরা বড় ছোট রে! সেইজন্যে আমার পেটের ছেলে থেকে—আমার রক্ত দিয়ে এদের তৈরী করে ভেবেছিলাম, যে এরা পাল্টাবে। তা পাল্টায় না রে। দেখ —ক'দিন থেকেই নগেন সুরেন বীরেন এদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে, বউরাও গিয়ে যোগ দিচ্ছে। সে সব কথা কানে আসছে আমার। ছোটলোকের মত কথা রে। কাল নাকি কথা হয়েছে, শুধু কথা কেন, ফর্দও হয়ে গেছে একটা। প্রণামীর কাপড়ের ফর্দ! বুঝলি! চাকরবাকর ঝি ঠাকুর সহিস কোচম্যান এ তো সব আছেই, এগুলো বকশিশ। কিন্তু প্রণামীর দাবী নাকি রথীনের মা বলেছে—আমাদের মানে আমার, মেজবউয়ের, ছোট বউয়ের বাপ-মাদের না দিলে মাথা হেঁট হবে। ওটা তোমরা নিজেরা কিনেই দাও।

সুরেশ্বর, কথাটা আমার বড় গায়ে লেগেছে রে। দেখ, ছেলেদের বলতে পারিনি কিন্তু তোকে বলতে আমার লজ্জা নেই। কেন জানিস? ওরা হল পরগোত্র, ওদের গোত্রে আমি এসে পড়েছিলাম, লাঞ্ছনার অন্ত হয়নি। আমার বাপের টাকায় আর পিসেমশায়ের টাকায় এই বংশ আমি আমার বংশ মনে করেছিলাম। কিন্তু তারাই আজ আমার বাপের বংশের

খেউড় করছে, তা আমার বুকের শেলের মত বিঁধছে। শোন, ফর্দ আমি কাল করে পাঠিয়ে দেব। কাকে কি কাপড় দিতে হবে—গরদ, শান্তিপুরে, কাঁচি, মিলের পেটাই, খদ্দর সব লিখে দেব। বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস তুই দিবি। সর্বোৎকৃষ্ট। শোন, টাকা আমি দেব, কিন্তু কাকপক্ষীতে জানবে না। তুই আর আমি।

আমি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটু হয়তো উঁচু গলাতেই বলেছিলাম—না বড়মা, খরচ যা লাগে—।

তিনি মুখটা আমার চেপে ধরেছিলেন। জানিস্‌নে সুরো, দেওয়ালের কান আছে। যা বাড়ী যা।

বাড়ী ফিরে সেই মত ফর্দই আমি করিয়েছিলাম। কথাটা কেমন করে যে জগদীশকাকার স্ত্রীর কানে উঠেছিল তা বলতে পারব না, তিনি সকালবেলাতেই অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—একটা কথা বলতে এলাম বাবা।

—কি বলুন খুড়ীমা!

—ওঁরা নাকি যা প্রণামীর কাপড়ের ফর্দ দিয়েছেন তার দাম নাকি আড়াই হাজারের কম হবে না?

সুরেশ্বর বললে—তখনও ১৯৩৭ সাল সুলতা। চালের দর চার টাকার মত, কাপড় কাঁচি ধুতির জোড়া বোধ হয় বারো-চৌদ্দ টাকার বেশী নয়। মানে একখানা ছ'-সাত টাকা। তাতে আড়াই হাজারে কত কাপড় তা বুঝতে পারছ। অবশ্য গরদ কম ছিল না। সব মুর্শিদাবাদী গরদের শাড়ী। তিনি লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়েছেন তাতেই।

সুলতা, আমি হেসে বলতে যাচ্ছিলাম—খুড়ীমা, আমার সহোদরা থাকলে তো তার বিয়ের খরচ করতে হত, ভাবুন তাই করছি। জানেন তো, টাকা আমার অনেক জমিয়ে দিয়ে গেছেন আমার মা। এই কালই দেখছিলাম—। কথাটা আর শেষ হল না সুলতা, বড়মা অন্নপূর্ণা দেবীর গাড়ী এসে এ বাড়ী ঢুকল।

আমি ছুটেই নেমে গেলাম। এত সকালে অন্নপূর্ণা-মা কেন এলেন আবার! কি হল? একজন পঁচাত্তর বছর বয়স্কা মহিলা দেহে না-হয় শক্ত আছেন, মনে তো আছেনই, তবুও বয়সের বছরের পরিমাণ তো কম নয়। অনেকের ওটা বেড়েই যায় কিন্তু কমে না বোধহয় কারুরই। গাড়ীটা থামতেই আমি দরজার নিচের অংশটা খুলে দিয়ে পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—বড়মা!

দেখলাম, বড়মার সামনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছেন দয়াল-ঠাকুরদা।

বড়মা বললেন—তোর কাছেই এসেছি, কাজ আছে!

অন্নপূর্ণা-মা স্থূলকায় ছিলেন না, আবার গুটিয়ে খাটো হয়েও যান-নি, মুখখানা তাঁর বার্ধক্যের রেখার জালে জালে দুর্বোধ্য নয়, দেখলাম রাঙা মুখখানা থমথম করছে। কণ্ঠস্বর ভারী, তার মধ্যে এতটুকু স্নেহ-আশ্বাসের আভাস নেই।

আমি তাড়াতাড়ি দরজার নিচের কাটা দরজাটা খুলে দিলাম। বড়মা হাতখানা বাড়িয়ে

বললেন—ধর আমাকে।

আমার হাত ধরে নেমে বললেন—চল, উপরে তোর মায়ের ঘরে চল। পিছন পিছন দয়াল-ঠাকুরদা নামলেন, অন্নপূর্ণা-মা বললেন—এস দয়াল, তুমি সঙ্গেই এস।

উপরের ঘরে গিয়ে মেঝের উপর কার্পেট আমিই পেতে দিলাম। বড়মা বললেন—দরজা বন্ধ করে দে। জানালাও। যা বলব তা যেন কেউ শুনতে না পায়। বাইরে বলে দে যেন কেউ না আসে। জগদীশ্বরের বউ, অর্চনা এরাও কেউ না।

বলব কি সুলতা, বুকখানা আমার কেঁপে উঠল। ভয় হল এই অলঙ্ঘনীয়া মহিলাটিকে। আবার কি বলবেন ?

দয়াল-ঠাকুরদা কেবল বললেন—কেন পিসীমা, এসব বাজে—

—তুই থাম দয়াল! অন্নপূর্ণা-ঠাকুমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুই মদ খাস সুরেশ্বর ?

মনে মনে চমকে গেলাম। কিন্তু বাইরে চমকালাম না। বললাম—খাই বড়মা।

—খাস! আচ্ছা আর একটা কথা বল তো—সেখানে তুই কুইনীকে নিয়ে—। চুপ ক'রে গিয়ে বললেন—তার জন্যেই কি তুই কুইনীর দিদি হিলডাকে গোয়ানপাড়ার একরকম মালিক করে দিয়েছিস! নাখরাজ করে দিয়েছিস গোয়ানপাড়া ?

—না। এর একটাও সত্য নয়। সত্য কেবল ওরা যখন নাখরাজ দাবী করলে—

—সে আমি দয়ালের কাছে শুনেছি। যদুরাম রায়ের নাখরাজের ছাড়পত্র দেখিয়েছিল দয়াল সেই দিন। তুই তাই দেখে গোয়ানপাড়া নাখরাজ ক'রে দিয়েছিলি।

—হ্যাঁ বড়মা। কথাটা ঠিক তাই বটে।

—টাকাও তার জন্যে অনেকগুলো খরচ করেছিস। তারপর তিক্ত হেসে বললেন—ছোট মেজবউমা, মানে শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের বউকে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখিয়ে কলঙ্কভাগিনী করেছিস!

—তোমাকে কে বললে বড়মা?

দয়াল-ঠাকুরদা কাতর কণ্ঠে বললেন—ওঁকে কীর্তিহাট থেকে চিঠি লিখেছে ভাই। সে একখানা মস্ত বেনামী চিঠি।

বড়মা তাঁর গঙ্গাস্নানের ঝোলা থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখ। চিঠিখানা পেয়েছি পরশু, পেয়েই আমি লোক পাঠিয়ে দয়ালকে আনলাম। দয়াল কখনও মিথ্যে বলবে না আমার কাছে। রায়বাড়ীর সবটাই ফাট ধরছে, বংশে পচ ধরেছ তা আমি জানি। বেশী পুরনো হলেই তা হয়। রামের অযোধ্যা নেই, বংশ থাকলে তাদের কি দশা হত ভগবান জানেন। পুরাণে আছে যদুবংশ শেষ হয়েছিল মদ খেয়ে নিজেরা মারামারি ক'রে। বাদশাদের বংশ শুনেছি টাঙা চালায়। তাদের মধ্যেও কত পাপ কত পচন কে জানে? আশ্চর্য কিছু নয়। তোর বাপই তো তার চরম ক'রে গেছে। তোকে দেখে ভরসা হয়েছিল। তারপর ওই মেয়েটার ছবি দেখে মনে হয়েছিল সত্যি সত্যিই আমার মা বুঝি ফিরে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যি ফিরেছে রায়বংশে। এ চিঠিতে সব জঘন্য

কথা আছে সুরেশ্বর। জঘন্য কথা। তাই দয়ালকে আনতে পাঠিয়েছিলাম। তার কাছে জানব শুনব। তা সব শুনলাম জানলাম। তুই পড়ে দেখিস। দেখিস্ নয় দেখ। আর বল তো—চিঠিখানার হাতের লেখা তুই চিনিস কিনা? চিঠিখানা যে রায়বাড়ীর কোন কুলাঙ্গারের লেখা তাতে সন্দেহ নেই। অর্চনার বিয়েটা ভেঙে দিতে চায়। আর রাগ আছে তোর ওপর, খুব রাগ, সেটাও এই সব কলঙ্ক রটনা করে মেটাতে চায়। তুই যে নিজে থেকে এত টাকা খরচ করে অর্চনার বিয়ে দিতে চাস তার উপরেও একটা কুৎসিত মতলব চাপিয়েছে।

সুলতা, চিঠিখানা হাতে করে আমি প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন একটা কাঁপুনি বেয়ে চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর আক্রোশ, ক্রোধ, প্রতিহিংসাস্পৃহা যা বল তাই। চিঠিখানা খুলতে আমার সাহস হচ্ছিল না। হোক মিথ্যা, হোক অসত্য, কিন্তু কুৎসিত ভয়ঙ্কর কদর্য কিছু কে দেখতে চায় বল!

দয়াল-ঠাকুরদা বললেন—না—না পিসীমা, কেন ওই মিথ্যেকথাভরা মতলববাজি চিঠিখানা পড়তে ওকে বলছ তুমি? না—না। চিঠিখানা তুমি নিয়ে নাও। বুঝলে? পুড়িয়ে দাও। ছাই ক'রে দাও। পিসীমা।

অন্নপূর্ণা-মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সেই ভাল। দে, চিঠিখানা আমাকে ফিরে দে। শুধু লেখাটা দেখে বল—দেখি এ লেখা তুই চিনিস কিনা?

আমি বললাম—না বড়মা, চিঠিখানা আমি পড়ব। পড়তে চাই।

*   *   *

সেটেলমেন্টের নোটিশ পেয়ে কীর্তিহাটে এসে আমি মহিষের মত পঙ্কপল্বলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুধু নাকের ফুটো দুটি চাগিয়ে প্রমত্ত হয়ে পড়ে আছি, পত্রের বক্তব্য তাই হলেও আসল লক্ষ্য অর্চনার বিয়ে।

"আপনাদের মত বংশ—যাঁহারা বাংলাদেশে এবং কলকাতায় দেশপ্রেমিক, গান্ধীবাদী, মরালিস্ট হিসাবে বিখ্যাত, তাঁহারা যদি এই কন্যার মত কন্যাকে গৃহে বধূ করিয়া লইয়া যান তবে সম্ভবতঃ দশ মাস যাইতে না যাইতেই সন্তান কোলে করিয়া বসিবেন জানিবেন।

এই যে বড়তরফের সুরেশ্বর, যে প্রকৃতপক্ষে রায়বাড়ীর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক, এই সুরেশ্বর কি স্বার্থে দশ বারো পনেরো হাজার টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছে? এতই উদার সে? এতই মহৎ?

এই ধনীপুত্রটির পিতৃপরিচয় বঙ্গদেশে বিখ্যাত, সুবিদিত। তাঁহার পুত্র এখানে আসিয়া অর্থের উত্তাপে সর্বগ্রাসী অগ্নির মত জ্বলিতেছে এবং যাহা পাইতেছে তাহাই গ্রাস করিতেছে। তাহার সম্পর্ক বিচার নাই। সে সর্বভুকের মত মেজতরফের যুবতী ছোটগিন্নীকে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখাইয়া কেলেঙ্কারি ছড়াইয়াছে। তাহাকে মাসে মাসে সে নিয়মিত টাকা দিত। এই জেলের সময়েও বহু টাকা সে তাহার জন্য খরচ করিয়াছে। এবং তাহার দ্বারাই সে রায়বংশের কুমারী কন্যাগুলিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছে। অর্চনার উপরেই তাহার বেশী টান ছিল।

তাহার উপর এখানে আসিলেই বুঝিতে পারিবেন, জানিতে পারিবেন, গোয়ানপাড়ার গোয়ানদের লইয়াও সেই কাণ্ড করিয়া চলিয়াছে সে। দিবারাত্রি মদ্যপান করে এবং ছবি আঁকার ছল করিয়া এখানে সেখানে বসিয়া থাকে। গোয়ানপাড়ার হিলডা বুড়ীর এক সম্পর্কীয় নাতনী আছে, তাহার নাম কুইনী। সেই কুইনীর উপরেও তাহার খুব নজর। খবর লইলে জানিতে পারিবেন, সে তাহাকে মেদিনীপুর মিশনারী ইস্কুলে এবং বোর্ডিংয়ে রাখিয়া শিক্ষিতা মেমসাহেব তৈরী করিয়া লইতেছে।

অর্চনার দায় এখন কাঁধ হইতে না নামাইলে উপায় নাই। কেলেঙ্কারি হইয়া যাইবে। তাহারই জন্ত তাহাকে আপনাদের পবিত্র বংশের স্কন্ধে চাপাইয়া কুইনীকে লইয়া ভবিষ্যতে স্ফূর্তির তালে আছে।

কুইনীর জন্তও খরচ সে অনেক করিতেছে। খবর লইলেই জানিতে পারিবেন। এলিয়ট রোডের একখানা বাড়ী লইয়া সে প্রায় হাজার সাত-আষ্টেক টাকা তাহার জাঠতুতো ভাই প্রণবেশ্বরকে দিতে রাজী হইয়াছে।

এ সম্পর্কে আরও একটি সংবাদ জানাই, সেদিন ইলেকশনে ভোটের জন্ত কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ···রাজা বাহাদুরের তরফের লোক আসিয়াছিল, তাহাদের তরফের বক্তারা প্রকাশ্যে বলিয়া গেল যে সুরেশ্বরবাবু নিজে আধা ক্রশ্চান—ধর্মহীন ব্যক্তি, তাঁহার কথায় তোমরা ভুলিয়ো না। তিনি গোয়ানপাড়ার কুইনী নামক ক্রশ্চান মেয়েকে মিশনারী ইস্কুলে রাখিয়া পালিতেছেন।"

* * *

ইলেকশনের সময় আমি যেতে পারিনি কিন্তু আমার তরফের লোকেরা, কর্মচারীরা কংগ্রেসের হয়েই কাজ করছিল। কীর্তিহাটের লোকেদের বলবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। সে গোটা দেশেরই প্রায় এক অবস্থা। তবু আমি বলেছিলাম। খান দুই চিঠিও লিখেছিলাম। একটা ছোট নিবেদনপত্র ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে ছিল "বুকের পাঁজর জালিয়ে যারা অন্ধকারে আলো জেলে পথ চলছে, তাদের পিছনে চল। অন্ত পথ নেই।"

কালো ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা শক্ত হাতে ধরা একটা মশালের আলো; তার তলায় ওই দুটো লাইন লিখে এখান থেকে ছাপিয়ে আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার উত্তরে নাকি এই কথা রাজারা বলেছেন।

তা বলুন। জানি কংগ্রেস—মানে মানুষেরা জিতবে। মানুষ মানে জীবন্ত মানুষ, নতুন মানুষ, পুরনো নয়, পচা নয়। জানি আমি নিজে পচা-বাড়ীর ছেলে। আমি—যোগেশ্বর রায়, সেকালের ইংলিশম্যান স্টেটস্‌ম্যান—ইংরেজ সরকারের মুখপত্রের লেখকের ছেলে আমি। আমি 'বিদায় সত্যাগ্রহ' লিখে বাপের ধারা বজায় রেখেছি। এবং ইংরেজ আছে বলে আজও আছি। আমাকেও যেতে হবে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজিমের সঙ্গে। বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজিম যাবে। ইউরোপে সে জার্মানীর হিটলারের দুই হাতে দুই গালে চড় খেয়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথায় বন্দীশালার ক্ষেপে-যাওয়া জন্তুকে মান যাও, মান যাও বলে মানাতে চাচ্ছে। কিন্তু যেতে তাকে হবেই। তার সঙ্গেই আমি যাব। তবু আমি ওই ছোট পোস্টার এঁকে ছেপে পাঠিয়ে

দিয়েছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ আমিই এঁকেছিলাম।

কিন্তু তাতে নাম আমার ছিল না। তবে পুলিস ঠিক বের করেছিল।

আর জানত শুধু প্রণবেশ্বরদা। যেদিন জানবাজারের বাড়ীতে বসে এই ছবিটা আঁকি, সেইদিনই প্রণবেশ্বরদা এসেছিল এই এলিয়ট রোডের বাড়ী সম্পর্কে কথা বলতে। পাশে বসেছিল। আমাকে বলে গিয়েছিল—কুইনীকে ওব্‌লাইজ করতে চাও তো টাকা কিছু ছাড়। পেটে ক্ষিধে মুখে লজ্জা করা কাজের কথা নয়।

আমি চিঠিখানা থেকে চোখ তুলে তাকালাম। যেন চোখের উপর ভাসছিল প্রণবেশ্বর-দাদার ছবি। দেখছিলাম তাকে।

বললাম—বড়মা, এ-চিঠি লিখেছে প্রণবেশ্বরদা।

—হ্যাঁ।

দয়াল-ঠাকুরদা বললেন—না ভাই, এ-হাতের লেখা আমি চিনি। এ-হাতের লেখা সুখেশ্বরের ছেলে কল্যাণেশ্বরের।

—তা হোক ঠাকুরদা, আমার এই পোস্টারের কথা অন্য কেউ জানে না—জানে শুধু প্রণবেশ্বরদা। সে দেখেছিল ছবিখানা আঁকতে।

বড়মা চুপ করে বসেছিলেন—ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন—তুই যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানা জানিস? কাশীতে কোথায় থাকে সে?

আমি বললাম—কাশীতে তো থাকেন না জ্যাঠামশায়। ঠিকানা কাশীর আছে বটে। তবে থাকেন এখানে।

—এখানে—মানে? কলকাতায়?

—না, কলকাতায় ঠিক নয়, থাকেন বরানগরে।

—বরানগরে?

—হ্যাঁ। সেদিন প্রণবেশ্বরদাদা বলে গেলেন। অনেকগুলো বডিওয়ারেণ্ট ঝুলছে, তাই কাশীর ঠিকানাটা রেখে এখানে বরানগরে আছেন। তবে মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে।

—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারিস?

—ঠিকানা আমাকে বলে গেছেন প্রণবেশ্বরদা। কারণ, টাকা জেঠামশাই নিজে হাতে নেন। এলিয়ট রোডের বাড়ীর ওই মিউনিসিপ্যাল বিলের ভুলের দরুণ যা পাবেন, তা নিজে হাতেই নেবেন। ছেলেদের দেবেন না।

সুরেশ্বর বললে—জ্যাঠামশাই যজ্ঞেশ্বর রায়কে বাল্যকালে দেখেছিলাম। তারপর দীর্ঘকাল বোধহয় বিশ-বাইশ বছর পর দেখলাম অন্নপূর্ণা মায়ের তাগিদে। বিচিত্র যজ্ঞেশ্বর রায়। মহিমান্বিত রায়বংশের কফিনে পোরা মমি। বরানগরে গঙ্গার ধারে একখানা বড় ফাটলধরা বাড়ীতে থাকতেন তখন। বাড়ীখানা সত্যিই কফিনের মত, আর জ্যেঠামশাই রায়বংশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মমি। ইনসলভেণ্ট, প্যারালিটিক, দিলদরিয়া লোক, জেদী, উদার, বদমেজাজী, অতিভদ্র, পরস্বাপহারী, দাতা—একসঙ্গে সব। ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা মানুষটা খাট জুড়ে পড়ে ছিলেন।

ভাঙা ফাটল ধরা বাড়ী ; সামনের প্রথম এবং প্রধান দরজার দু পাল্লার কব্‌জায় মরচে ধরেছে, ইস্ক্রুপ খুলে গেছে, বন্ধ আছে ভিতর থেকে—কিন্তু দুটো প্লেট আঁটা আছে দু পাল্লায় ; একটাতে লেখা আছে জ্যেঠাইমার নাম, অন্যটায় লেখা আছে—'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ'।

বাড়ীখানা জ্যেঠাইমার সম্পত্তি। তাঁর বাপের বাড়ীর দিক থেকে পেয়েছিলেন। বন্ধ থাকে জ্যেঠামশায়ের পাওনাদারদের ভয়ে। যেমন তেমন পাওনাদার নয়—দু-দশ বা দুশো পাঁচশো পাওনা নয়, ও হলো দু হাজার পাঁচ হাজার থেকে লাখ দু লাখ পর্যন্ত সুবিস্তৃত এবং পাওনাদারেরাও তেমনি—এ ব্যাঙ্ক ও. ব্যাঙ্ক ; এ কোম্পানী ও কোম্পানী ; যাদের আসল পরিচয় হ'ল খ্যাতিমান মাড়বার রাজস্থানের শেঠেরা ; আজ এই ১৯৫৩ সালে যাঁরা বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীর মালিকানি কিনেছেন—তাঁরা। জ্যাঠামশায় তাঁর জীবনে রায়বাড়ীর সমস্ত ইতিহাসটাকেই পুনরাবৃত্তি করেছেন। গড়েছেন ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন আবার ভেঙেছেন। শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন।

রত্নেশ্বর রায়ের জীবন মাত্র বাহান্ন বছরের জীবন। বাহান্ন বছরে রায়বাড়ীকে নতুন ছাঁচে ঢেলে গড়ে গিয়েছিলেন ; বীরেশ্বর রায়ের আমলে যে সম্পত্তির আয় ছিল কুড়ি হাজার টাকা, তাকে বাড়িয়ে তিনি তুলেছিলেন চল্লিশ হাজার এবং পনের বছর পরে তাকে পঁয়তাল্লিশ হাজারে তুলবার পাকা রাস্তার প্ল্যান তৈরী ক'রে জমি পর্যন্ত প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন।

তুমি রাজনৈতিক কর্মী সুলতা ; তুমি নিশ্চয় জান ভারতেশ্বরী এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে এ আইন প্রচলিত ছিল। পনের বছর অন্তর বৃদ্ধি পাবার হকদার ছিল জমিদারেরা। তার কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। ফসলের দাম বাড়লেই জমিদার তার অংশ বাবদ খাজনা বাড়াতেন। সারাটা জীবনভোর তিনি এ কর্তব্যকর্ম ভোলেননি। এবং কোন সময়েই আপসে করেননি. আদালতে গিয়ে নালিশ করে লড়ে পাওনা আদায় করেছেন অথবা প্রজার সঙ্গে আদালত সাক্ষী রেখে সোলেনামা করেছেন। এ ছাড়া পতিত পুকুর কাটিয়েছেন। নদীর ধারের গ্রামে বন্যা নিবারণের জন্য বাঁধ তৈরী করিয়েছেন। সুতরাং জমির উন্নতি করেছেন বলেও খাজনা বৃদ্ধিতে তাঁর একটা দাবী ছিল। তিনটে এন্ট্রান্স স্কুল, দুটো চ্যারিটেবিল ডিসপেনসারী করেছিলেন, মেয়েদের প্রাইমারী স্কুল তাও করে গেছেন দুটো। মাইনর ইস্কুল করেছেন আরও কয়েকটা। নিঃসন্দেহে কীর্তিমান পুরুষ। কীর্তিহাট থেকে তমলুক পর্যন্ত কাঁচা পথটা পাকা করেছিলেন ; বহু দরিদ্রকে দান করেছেন ; বহু বুদ্ধিমান ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে বৃত্তি দিতেন। এই জানবাজারের বাড়ীতে ওই ওপাশের একতলা ঘরগুলোতে তারা থাকত ; তাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা ছিল, তারা খেয়ে কলেজ যেত।

পত্নীব্রত পুরুষ শ্রীমতী স্বর্ণলতা—যার নাম সরস্বতী বউ—তার মুখের দিক ছাড়া নাকি তিনি অন্য স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকাতেন না।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অপবাদ রটনা সম্পর্কে মানুষের একটা দুর্নাম আছে। কিন্তু রায়বাহাদুরের ডায়রী পড়ে আমি বলতে পারি, শুধু অপবাদই নয় ; প্রশংসাবাদ

সম্পর্কেও মানুষ ঠিক তাই।

মানুষের মনই হ'ল ডিফেকটিভ থারমোমিটারের মত। অপবাদ প্রশংসাবাদের উত্তাপ আসলে যাই হোক, ও একশো হলে একশো দুইয়ে গিয়ে পৌঁছবে। তবে এটা মানতে রাজী আছি যে, অপবাদ আসলে একশো হলে সেটা হয় একশো পাঁচ, আর প্রশংসাবাদ সেখানে আসলে একশো হলে একশো দুই-তিন-এর বেশী ঠেলে না। মানুষ প্রশংসাও করে নিন্দাও করে, তবে নিন্দা একটু বেশী করে।

রায়বাহাদুরের ডায়রীতে অঞ্জনার কথা যা আছে তা তোমাকে পড়ে শুনিয়েছি। এ ছাড়াও কখনও কখনও রায়বাহাদুরের ডায়রীতে গল্পের মত বিচিত্র ঘটনার কথা আছে। অনেকগুলোই মনে আছে—তার দু-একটা বললেই বুঝতে পারবে। হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় দুটি সুন্দরী পার্শী মেয়েকে দেখে লিখেছেন—

"অদ্য কীর্তিহাট ফিরিতেছি। গত কয়েকদিন হইতেই রূপ চাক্ষুষ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল। সেদিন দত্তবাড়ীর ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া দুইজন অপরূপ সুন্দরী বাঈজীকে দেখিয়া অবধি ভাবিতেছিলাম, ইহাদিগকে কীর্তিহাটে রাজ-রাজেশ্বরের কোন পর্ব উপলক্ষ্যে বায়না করিয়া লইয়া যাইব। তাহা হইলে চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইয়া তাহাদের দেখিবার সুযোগ পাইব। দত্তবাড়ীর বিবাহের নাচ-গানের আসরে রত্নেশ্বর রায় বসিয়া বসিয়া অবশ্যই এই বাঈজীদের রূপ দেখিতে পারেন না। তাহাতে শত্রুজনে অপযশ ঘোষণার প্রশ্রয় পাইবে। এবং মনের মধ্যে যে প্রবৃত্তির বিষবৃক্ষ আছে, তাহার তলদেশে জল-সিঞ্চন করা হইবে। কিন্তু কীর্তিহাটে সম্মুখে রাজরাজেশ্বর জিউ প্রভুকে রাখিয়া তাহাদের দেখিলে রূপের তৃষ্ণা মিটিবে কিন্তু তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারিবে না। এবং কেহ কোন নিন্দার কথাও বলিতে পারিবে না। আমার জীবনের প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু অদ্য হাওড়া স্টেশনে এই পার্শী মহিলা দুটিকে দেখিয়া আমার ভ্রম ভঙ্গ হইল। কি অপরূপ রূপসী এই মেয়ে দুইটি। ইহাদিগকে যুগল তিলোত্তমা বলা চলে। ইহাদের কাছে সেই বাঈজী দুইটি অনেক মলিন। আকাশের চন্দ্রমা এবং পঙ্কপল্লবে তাহার প্রতিবিম্ব এই দুইয়ে যত তফাৎ তত তফাৎ। চক্ষু জুড়াইয়া গেল। হৃদয় ভরিয়া গেল। ঈশ্বরের রূপসৃষ্টির আর শেষ নেই তাহা অনায়াসে এক মুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম তিনি বুঝাইয়া দিতেছেন যে, রূপ খুঁজিয়ো না, তাহা হইলে আর সারা জীবনে বিশ্রাম পাইবে না, রূপের পর রূপ আসিয়া তোমাকে হাতছানি দিয়া মরীচিকা যেমন করিয়া তৃষ্ণার্ত হরিণ ছুটাইয়া লইয়া চলে মরুভূমির উত্তাপের মধ্যে, তেমনি করিয়া ছুটাইয়া চালিবে এবং একদা মৃত্যু মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে সংহার করিবে। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অপার করুণাও উপলব্ধি করিলাম, তিনি আমায় প্রার্থনা যেন স্বকর্ণে শুনিয়া আজ এইভাবে ট্রেনের কামরায় এই রূপসী মেয়ে দুইটিকে দেখাইয়া দিলেন।"

এমন ঘটনা রায়বাহাদুরের জীবনে অজস্র ঘটেছে। তিনি অকপটে ঘটনাগুলি লিখে গেছেন।

কীর্তিহাটের বাড়ীতে যুবতী শ্রীমতী মেয়ে-ঝি রাখা তিনি বন্ধ করে একটা নিয়ম

করেছিলেন।

করেছিলেন অঞ্জনার ঘটনার পর থেকে। রায়বাহাদুরের স্ত্রী সরস্বতী বউ স্বামীগরবিনী এবং আদরিণী ছিলেন, সে গরব সে আদর পরিমাণে এত বেশী যে, তিনি এগুলো গ্রাহ্যই করতেন না। তার কাছে যে ঝি থাকবে সে কুদর্শনা হবে এ তিনি পছন্দ করতে পারতেন না। ঝগড়া করতেন স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি। রত্নেশ্বর রায় তাকে তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। সরস্বতী বউ আবার আনতেন রূপসী যুবতী ঝি এবং তাকে স্বামীর চোখের সামনে যেতে দিতেন না। এবং হেসে স্বামীকে বলতেন—কি বাতিক মা? শেষে আমায় না ঝাঁড়াও! ভিতরের তত্ত্বটা তিনি বুঝতেন না।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বড় নাতি আমার জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় ঠিক তেমনি মানুষ। পিতামহের মতই পত্নীব্রত ছিলেন। তফাৎ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় কীর্তিতে কীর্তিমান, আর নাতি যজ্ঞেশ্বর রায় ভ্রষ্টকীর্তি। রায়বাহাদুর সম্পত্তিকে বাড়িয়ে গেছেন, বাপের আমলের আয়কে চারগুণ করেছেন—আর নাতি যজ্ঞেশ্বর রায় দশের বাঁদিকের একটাকেই মুছে দিয়েছেন। অবশেষে স্ত্রীর পিতৃদত্ত বরানগরের এই পুরনো বাড়ীটায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন।

অন্নপূর্ণা দেবী বড় জেদী মানুষ ছিলেন। বেটাছেলে হলে সম্ভবতঃ সম্পত্তির জন্য মামলা করুন বা না করুন দাদা রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে খুনোখুনির মত একটা কিছু ক'রে বসতেন। মেয়ে বলেই তা করেননি—তার বদলে ত্যাগ ক'রে সব ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন কাশী, পিসেমশাই এবং পালকপিতা বিমলাকান্তের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইয়ের কাছে আসেননি। রত্নেশ্বর রায়ও আশ্চর্য মানুষ, বীরেশ্বর রায়ের নামে যে সব কলকাতার সম্পত্তি ছিল তাও বোনকে দিতে চান নি। জানবাজারের এই বাড়ীখানা, এখানাও সেই সম্পত্তির মধ্যে খানিকটা স্থলতা। এগুলো অন্তত অন্নপূর্ণা দেবী ওই শ্যামাকান্তের কলঙ্ক এবং বিমলাদেবীর সন্তান চুরির কেলেঙ্কারিকে সামলে চাল হিসেবে ব্যবহার ক'রে মামলা চালাতে পারতেন, কিন্তু তাও তিনি করেননি।

জমিদারী ব্যবস্থার ইংরেজ যখন সামন্ততন্ত্রকে পল্টন সিপাহী হাতিয়ার ইত্যাদির হাঙ্গামা থেকে মুক্ত ক'রে হাল্কা-পল্কা এবং পরগণাগুলোকে প্লটে তৌজিতে ভাগ ক'রে ছোট ক'রে দিলে তখন এর প্রভাবে দুটো ফল ফলেছিল; অনেক মধ্যবিত্ত উপরে উঠে জমিদার বনে গিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় রক্তারক্তি যুদ্ধের নেশা মিটিয়েছে, জাল-জালিয়াতি করে পাপের শেষ রাখেনি, আবার অনেক ক্ষেত্রে মনকে উঁচুও করেছিল।

রত্নেশ্বর তাঁর জীবনে ছোটতে বড়োতে, দেওয়ানীতে ফৌজদারীতে, মানি স্যুটে, রেণ্ট স্যুটে, টাইটেল স্যুটে, সাধারণ ক্রিমিন্যাল কেস এবং সেসনস কেসে মুন্সেফী আদালত এবং ডেপুটি এস-ডি-ও থেকে জজকোর্ট পর্যন্ত আপীল নিয়ে যে মামলামকদ্দমা করেছেন তার সংখ্যা কত হবে জান? আমি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পর্যন্ত গুনে আর করিনি। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী জীবনে কি বাপের সম্পত্তি কি স্বামীর সম্পত্তির ভাগের জন্য একটিও মামলা করেন নি।

অন্নপূর্ণাদেবী যদি বীরেশ্বরের পুত্রসন্তান হতেন তবে তিনি যে কি হতেন তা বলতে পারব না। তবে কন্যা হয়েও যে বংশধারাটি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা সত্যই অসাধারণ। এবং তাঁর নিজের কথা যা বলেছি তোমাকে, তা একবিন্দু বাড়িয়ে বলিনি।

এই অন্নপূর্ণা দেবী এসে দাঁড়ালেন বরানগরে রত্নেশ্বর রায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র যজ্ঞেশ্বর রায়ের স্ত্রীর পিতৃদত্ত বাড়ীর দরজায়। যজ্ঞেশ্বর রায় তখন সর্বস্বান্ত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ইনসলভেন্সী নিয়েছেন, কিন্তু তবু পাওনাদারের ভয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। সব ঐশ্বর্যবিলাসই গেছে কিন্তু একজন গুর্খা দারোয়ান তখন পর্যন্ত আছে। সে দরজা আটকালো।

আটকালো বটে, কিন্তু খুব সম্ভ্রমভরেই বললে—বাবুজীর বেমার আছে মাইজী, যানে কো মানা হ্যায়।

অন্নপূর্ণাদেবীর চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাকে কেউই বোধহয় লঙ্ঘন করতে পারতো না। আমার রূপের প্রশংসা তোমার কাছে করে লাভ নেই। তবে আমাকে দেখে খেলো লোক কেউ ভাববে না নিশ্চয়। দারোয়ান আমার পথ আটকাতে পারতো অন্ত ভঙ্গিতে। কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীর মহিমাকে লঙ্ঘন করা যেতো না।

অন্নপূর্ণাদেবী তাকে ধমকালেন না। তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন না। বললেন—তোর তো কথাবার্তার তরিবৎ খুব ভালো রে বাবা!

লোকটা খানিকটা অবাক হয়ে গেল; হয়তো বা অন্নপূর্ণা-মা কি বললেন তা ঠিক ধরতে পারলে না, তবে তার আভাসেই সে ধন্য হয়ে গেল। এমন এক মাঈজী তার কথাবার্তার তারিফ করছেন।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেখ, আমি তোর বাবুর পিতাজীর ফুফু আছি। বাবুজীর দিদিয়া। উনকে দেখনে কো লিয়ে আয়ি হ্যায়, আওর দু-চার বাত ভি হ্যায়। লেকিন উসমে ঝামেলা কুছ নেহি হ্যায়; সমঝা? ডিগ্রীকে বাত ভি নেহি, কুচ মাঙনে কি বাত ভি নেহি। সমঝা? ছোড় দরওয়াজা, মুঝে যানে দো। নেহি তো উপর যাকে বাবুজী সাব কি কহনা কি অন্নপূর্ণা মাঈজী আয়ি হ্যায় ভওয়ানীপুর সে। হাঁ?

বলতে বলতেই সিঁড়ির মাথায় দেখা দিলেন জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা খুব বড় ব্যবসাদার বাড়ীর মেয়ে।

এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—ঠাকুমা! আপনি!

—হ্যাঁ আমি। যজ্ঞেশ্বরের কাছে এসেছি।

আমিও ছুট ক'রে গিয়ে প্রণাম করলাম জ্যাঠাইমাকে। জ্যাঠাইমা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—সুরেশ্বর!

—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, আমি।

—দাড়িটাড়ি রেখে এ কি চেহারা করেছিস রে!

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ওসব আমি সব ব্যবস্থা করব। ওকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছি ও দাড়ি কামাবে।

জীবনে সবেতেই একটা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ ভূমিকা থাকে সুলতা, সেদিনের গৌরচন্দ্রিকার

সব কথাই বাদ দেব, কেননা তাতে অনেক সময় নেবে।

সেদিন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন খাঁটি এ্যারিস্টোক্র্যাট রায়বংশের মহিলা, বয়স পঁচাত্তর বছর, তিনি দাঁড়ালেন রায়বংশের আর একজন খাঁটি জমিদার ব্যবসাদার তনয়ের সম্মুখে।

ভূমিকা যা তা জ্যাঠাইমার সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশায়কে খবর দিয়ে তাঁকে একরকম প্রস্তুত ক'রে দিয়ে তবে অন্নপূর্ণা-মাকে জ্যাঠামশায়ের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত যজ্ঞেশ্বর রায়ের ডান দিকটা পঙ্গু হয়ে গেছে, হাতখানা থেকে পা পর্যন্ত স্নায়ুগুলো সব অবশ হয়েছে, কিন্তু ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত ঠিকই আছে, কথাবার্তাও বলতে পারেন, তবে একটু যেন জড়ানো জড়ানো; বসেছিলেন সে-আমলের প্রকাণ্ড বড় একখানা খাটে। খাটের গদিটা পাশে পাশে ছিঁড়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। উপরে তোশকখানা ছেঁড়া নয় তবে পিটানো, এমন শক্ত যে জমানো তুলোর একখানা তোশক বলা যায়। তার উপর চাদরখানা পুরো তোশকটা ঢাকেনি বলেই দেখা যাচ্ছিল। খাটো চাদরখানা ময়লা চিট, বিবর্ণ। ঠাকুমাকে দেখে হেসেই জ্যাঠামশাই বললেন—এস ঠাকুমা!

থমকে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন পক্ষাঘাতটা কি রকমের, ডান পা-খানা ঢাকা ছিল, ডান হাতখানাও ছিল, সুতরাং ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা দেখে অন্নপূর্ণা-মা বোধহয় পক্ষাঘাতের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বললেন—প্যারালিসিস্ তোর কোনখানে রে হরি?

হরি হল যজ্ঞেশ্বরের ডাকনাম। রত্নেশ্বর রায় যজ্ঞেশ্বর নাম রেখে বলেছিলেন—যজ্ঞেশ্বর—হরি!

যজ্ঞেশ্বর হেসে বললেন—হরি চিরকাল ছলনাময় নয় ঠাকুমা? তা ভাবতে পার, পাওনাদার ফাঁকি দিতে প্যারালিটিক্ সেজে বসে আছি। শুনেছি তোমার দাদা, আমার ঠাকুরদা সাহেবদের ভোজের আসর থেকে পেট কামড়াচ্ছে ব'লে ঘরের ভিতরে শুতে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে গিয়েছিল রাধানগরের দেসরকারদের বাড়ীতে ডাকাত ফেলে লোকটাকে ঠ্যাঙাতে আর তার ঘর পোড়াতে। আমি তো তোমাদেরই নাতি। আমি যজ্ঞেশ্বর হরি, ছলনা অবশ্যই করতে পারি। কিন্তু তা নয়। এই দেখ!

ব'লে গায়ে ঢাকা দেওয়া চাদরখানার ভেতর থেকে ডান হাতখানা বহু কষ্টে বের করলেন। হাতখানা কনুইয়ের কাছ থেকে বেঁকে রয়েছে এবং গাছের মরা ডালের মত শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে আসছে। আঙুলগুলোই আগে শুকিয়ে গেছে; যখন বের করছিলেন তখন থরথর ক'রে কাঁপছিল।

বললেন—এই এইটুকু এখন বের করতে পারছি, আগে একেবারেই পারতাম না। কোমর থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত ডান পাখানা অসাড়। নড়ে না। তোমার নাতবউ ঢেকেঢুকে দিয়ে তুলে বসিয়ে দিয়ে যায়, আবার শোবার সময় শুইয়ে দেয়। তোমাদের যজ্ঞেশ্বর হরি ছলনাময় বটে কিন্তু এ অসুখে নয়। তা তুমি হঠাৎ এলে ঠাকুমা—ব্যাপার কি বল তো! সত্যিই তুমি এলিয়ট রোডের বাড়ীখানার জন্যে এসেছ?

অন্নপূর্ণা-মা কথা বলতে পারলেন না, চুপ ক'রে বসে রইলেন মাটির দিকে তাকিয়ে।

জ্যাঠামশাই একটু অপেক্ষা ক'রে বললেন—সুরেশ্বর বাড়ীখানা কিনতে চেয়েছে শুনে খুব আশ্চর্য হইনি। রায়বংশের ছেলে, তার উপর অবস্থা ওর স্বচ্ছল। গোটা রায়বংশটা দেউলে হয়ে গেল, আশ্চর্য টেঁকে রইল যোগেশ্বরের ছেলে। শুনেছি বাপের মত খেয়ালী। বাপ খেয়ালী হলেও অন্যরকমের মানুষ ছিল, জমিদারের ছেলে, বড় ব্যবসাও ছিল আমাদের, কিন্তু যোগেশ্বর লেখাপড়া শিখে খবরের কাগজে চাকরি নিলে। বাবা তাই পছন্দ করলেন। তখন ঠাকুমা, ঠিক বুঝতে পারি নি। বাবা তো আমাকে খুব ভাল চোখে দেখতেন না। তাই ভাগের সময় গোটা ব্যবসাটা আমাকে দিয়ে বাড়ী আর নগদ টাকা যোগেশ্বরকে যখন দিলেন তখন আশ্চর্য হলাম। তবে কি জান ঠাকুমা, সবই ভাগ্য। আমি ভাগ্যকে মানতাম—আজও মানি। তার জন্যে কবচ মাদুলী গ্রহরত্ন অনেক ধারণ করেছি বোঝাদরুণে। আমার ভাগ্যে কোষ্ঠীতে এই ছিল। তাই হল। কি করব? তা তুমি এ নিয়ে এলে কেন বল তো? সুরেশ্বর কিনতে চায় বুঝি, প্রণবেশ্বরের কাছে শুনেছি আমি, কুইনী বলে যে মেয়েটা এখন বাড়ীর মালিক ছিল—। একটু হেসে চুপ ক'রে গেলেন জ্যাঠামশায়, কিন্তু ইঙ্গিতটা বুঝতে কারুর বাকী রইল না।

এতক্ষণে অন্নপূর্ণা-মা মুখ খুললেন, বললেন—দাদা তোকে খুব ভালবাসতেন। বলতেন—ওরে আমি মরে গেলে লোকে ভাবত আমি আবার ফিরে এসেছি। তুই একেবারে আমার মত। তাই ঠিক। তেমনি কুটিল তেমনি জটিল—সবই তেমনি।

—হ্যাঁ, তা বলতেন। তাঁকে আমার ভালও লাগত। খুব ভাল লাগত। তা খানিকটা বটেও। তাঁর পথেই চলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিচিত্র ভাগ্যের কথা, তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জিতে গেলেন, রায়বাড়ীকে ছোট থেকে বড় ক'রে গেলেন, আর আমি হেরে গেলাম। আমার কোষ্ঠীতে শনির ফল, শনি আমাকে রাজা করেছিল, সে আবার সব কেড়ে নিলে।

—আজেবাজে কথা না বলে আমার কথার জবাব দে তো!

—কি বল?

—এলিয়ট রোডের বাড়ীটার উপর তুই ছোঁ দিলি কেন?

—বাড়ীটা দেখলাম আমাদের—সেই জন্যে। বাড়ীখানা কেনার দলিল পর্যন্ত রয়েছে। দেখ না। বলে নতুন বের করা একখানা কবলার কপি বের ক'রে দিলেন। মাথার বালিশের তলাতেই সেটা ছিল। তার সঙ্গে কতকগুলো কর্পোরেশনের ট্যাক্সের রসিদ। আজও ট্যাক্স দিচ্ছি।

—যজ্ঞেশ্বর!

—ঠাকুমা!

—তোর ওই সব কথা-বার্তা তুই ছাড়। সোজা কথা বল। কুইনী বলে মেয়েটির পরিচয় তুই জানিস নে? ন্যাকা সাজিস নে, তোর ঠাকুরদা আমার দাদা, রায়বংশের পুণ্যবান পুরুষকে ঠিক আমি এই কথাই বলেছিলাম। দাদা, তুমি ন্যাকা সেজো না। ভায়লেট

অঞ্জনাদির মেয়ে এ তুমি জানতে না? দাদা ঠিক তোর মতই ন্যাকা সেজেছিল। আমি তিনবার ছি-ছি-ছি বলেছিলাম, তাতে দাদা মাথা হেঁট করেছিল, তুই করছিস নে, তুই আরও পাষণ্ড রে যজ্ঞেশ্বর।

কথাগুলি আমি বুঝতে পারছিলাম সুলতা, আমি অবাক হইনি। লজ্জায় প্রথমটা পিছন ফিরেছিলাম, তারপর ঠিক এই কথার পরই অন্নপূর্ণা-মাকে বলেছিলাম—আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াই মা-মণি! আপনাদের কথা শেষ হোক।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—না, তুই বস্ সুরেশ্বর। তুইও শোন্। অর্চনার বিয়েতে তোর কাছে কুইনীর বাড়ী ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তটা পণের মধ্যে কেন ধরেছি তুইও শোন। কুইনীকে একখানা বাড়ী আমি আমার টাকায় কিনে দিতে পারি। তাতে আমার দেবুর আত্মা শান্তি পাবে; কিন্তু তাতে দাদার দানপত্র নাকচ হবে, দাদা রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর স্বর্গ থেকে সিংহাসন সমেত উল্টে পড়বে রে—পড়বে নরকে। তুই চুপ করে আছিস কেন যজ্ঞেশ্বর? রায়বাহাদুর এ বাড়ী দেবুর পাপের জন্ম দেয়নি, দিয়েছিল ভায়লেট মেয়েটা অঞ্জনাদির মেয়ে ব'লে। ওকে কিছু দেবার অজুহাত খুঁজছিল দাদা; দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়েই ছিল। দেবুর এই ভুলটা হ'তেই সে বাড়ীটা লেখাপড়া করে দিল ভায়লেটকে। এই জানবাজারের বাড়ীতে যেদিন দেবু গুলি খেয়ে মরতে চেয়েছিল বাপের ভয়ে, সেদিন দাদা কলকাতা এসেছিল শুধু আমার সঙ্গে মিটমাট করতে। তখন আমি কোলে এক বছরের ছেলেকে নিয়ে আমার স্বামীকে অনেক কষ্টে রাজী করে জোড়াসাঁকোর জ্যাঠাইমার বাড়ী গিয়ে উঠেছিলাম। তারপর স্বামীকে বললাম—তুমি ফিরে যাও, আমি আর ফিরে যাব না তোমাদের বাড়ী। আমি কাশীতে পিসেমশাইকে চিঠি লিখেছি, তিনি এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি সেখানেই থাকব, তোমাদের অন্নে আর আমার প্রয়োজন নেই। আমার ছেলে বড় হয়ে তার সম্পত্তির জন্য যা করবার করবে। তার অভিভাবক হিসেবে তোমাদের কিছু করতে হবে না। কাশী থেকে মামা মানে পিসেমশাই এলেন, কীর্তিহাট থেকে দাদা এল। এসে জানবাজারের বাড়ীর ফটকে দেখলেন ভায়লাকে। বন্ধ ফটকের সামনে রাস্তার উপর মাথা ঠুকে কাঁদছে—রায়বাবু, মেরি রায়বাবু! মেরি রায়বাবু! দাদার গাড়ী এসে দাঁড়াল। দাদা এখানকার দপ্তরে খবর দিয়েছিল, কিন্তু খবরটা এসে পৌঁছোয়নি। ডাকের গোলমাল হয়েছিল। দাদা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে একেবারে ঠিক সেই সময়টাতেই এসে হাজির হল। দাদা ভায়লাকে চিনত। ভাল ক'রে চিনত। অঞ্জনার মুখের মত মুখ ছিল বলে চিনত।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় সাধু চরিত্রের লোক। লোকে বলে সাক্ষাৎ শিব। শিবের গায়ের বর্ণ দিনের আলোর থেকেও সাদা। তেমনি স্বচ্ছ এবং শুভ্র নাকি শিবের চরিত্র। কালীর ছোঁয়াচ লাগলেও জানা যায়, বোঝা যায়। যতই গোপন করুক দাদা, অঞ্জনাকে ভালবাসার কথাটা গোপন থাকেনি। আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য ভালবাসা। আশ্চর্য ধর্ম-পরায়ণতা।

অঞ্জনাকে ভালবেসে শুধু তার স্বামীর কাছ থেকেই ছিনিয়ে নিলে। কাছে কাছে চোখে চোখে রাখলে, কিন্তু সরস্বতী বউয়ের সামনে। তাকে পাহারা রেখে হেসে কথা বলে, রাগ করে, সে রাগ করলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে একরকম মান ভাঙিয়ে নিজের সাধ মেটালে, কিন্তু অঞ্জনার সাধ তাতে মিটল না। সে একদিন হলদীর বাপ পিড্রুজের দাদা, যে রবিনসনকে খুন করেছিল, তার সঙ্গে পালাল। পালাল—কীট সাহেবকে চিঠি লিখে জানিয়ে কৃশ্চান হয়ে গোয়া পালালো। বছর কয়েক পর অনেক কষ্টে গোয়া থেকে ফিরে এল কলকাতায়; কোলে তার ভায়লেট। দেহে সাতখানা রোগ ধরেছে, যা কিছু গহনাগাঁটি ছিল সব গিয়েছে; রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে ভোগ ক'রে স্পর্শ করেননি, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ সাজিয়ে গহনা দিয়েছিলেন, পালাবার সময় অঞ্জনা সে সব ফেলে যায়নি। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। পিড্রুজ তার সে সব বেচে খেয়েছে, তারপর কার সঙ্গে ঝগড়ায় ছুরি মারামারি করে ছুরি খেয়ে মরেছে। অঞ্জনা সেকালের বামুনের ঘরের মেয়ে, এগিয়েছিল অনেকদূর, হুগলী জেলার একখানা অজ পাড়াগাঁ থেকে কীর্তিহাট হয়ে কলকাতা, সেখান থেকে পশ্চিম মুখে একেবারে গোয়া পর্যন্ত। তার ওদিকে সমুদ্রে ভাসতে আর সাহস হয়নি, অন্য কাউকে বিয়ে করবার মত দেহেও কিছু ছিল না, আর মনেও ঠিক হয়নি বা মনের মত মানুষ পায়নি। ফিরে এসেছিল কলকাতা। রিপন স্ট্রীট থেকে পার্ক স্ট্রীট এলাকায় গোয়ানীজদের একটা আড্ডা ছিল, সেই আড্ডায় এসে উঠে সাহায্যের জন্যে চিঠি লিখেছিল—একখানা দাদাকে একখানা আমাকে। বলতে গেলে আমার মারফৎ পিসেমশাইকে।

বুঝতে পেরেছ সুলতা, অন্নপূর্ণা-মায়ের পিসেমশাই কে? বিমলাকান্ত। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—আমার বয়স তখন বছর-ন'য়েক হবে। অঞ্জনাদি যখন চলে যায়, তখন আমার বয়স ছিল ছ' বছর। এর তিন বছর পর অঞ্জনা ফিরে চিঠি লিখেছিল আমাকে কাশীতে। চিঠি সাহায্যের জন্য। চিঠিখানা আমার হারায়নি। চিঠিখানা আছে। পিসেমশাইয়ের স্বভাব ছিল বড় গোছালো—বড় পরিচ্ছন্ন মানুষ, চিঠিখানি তিনি রেখে দিয়েছিলেন।

তখন আমার ন'বছর বয়স। চিঠিখানা এল, খামের চিঠি; পিসেমশাই চিঠিখানা খুলে পড়ে আমাকে দিলেন। চিঠিখানা আমার মনে আছে—"মহামহিম মহিমান্বিতা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট অধিনীর নিবেদন এই যে, এককালে আমি সম্পর্কে আপনার দূরসম্পর্কের দিদি হইতাম, তৎকালে আমার নাম ছিল অঞ্জনা এবং কীর্তিহাটের রায়বাটীতে রায়হুজুর ও রায়গিন্নীর নিকট পরম সমাদরের মধ্যেই বাস করিতাম। এবং কাজকর্ম করিতাম। কিন্তু যাহার ভাগ্য মন্দ হয়, তাহার মতিও সু হইতে কু হয়; কুমতি-দুর্মতি মন্দভাগ্য-মন্দভাগিনীদের ঘাড়ে ভর করিয়া থাকে। আমারও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। সেই দুর্মতিবশত আমি একদা গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কৃশ্চানধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। ফলে আজ আমার দুঃখ-দুর্দশার অবধি নাই। আমি কৃশ্চান হইয়া রায়হুজুরের কলিকাতাস্থ মোকামের বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া ও গাড়ী প্রভৃতি দেখিবার জন্য যে পর্টুগীজ, যাহাকে সকলে গোয়ান বলিয়া জানিত ও ভাবিত, তাহাকে বিবাহ করিয়া গোয়া পালাইয়াছিলাম। কিন্তু মদীয় মন্দভাগ্যবশত সে ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং আমি নিরতিশয় দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিপতিত হইয়াছি। দেহেও অনেক

রোগ ঢুকিয়াছে। খুব বেশীদিন সম্ভবত বাঁচিব না। কিন্তু আপাতত চতুর্দিক অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতেছি। আমার কোলে একটি বৎসরখানেকের কন্যা। তাহাকেও বাঁচাইবার মত সামর্থ্য নাই। সেইজন্ত আপনার নিকট কিছু অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া অত্র পত্রযোগে দরখাস্ত জানাইতেছি। আমার সহস্র অপরাধ, কৃশ্চান হইয়াছি, পরপুরুষের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি—ইহা কখনওই মার্জনার যোগ্য নয়। তবুও উদরের জ্বালায় এবং আমার কন্যাকে বাঁচাইবার জন্ত লজ্জার মাথা খাইয়া পত্র লিখিলাম। আপনাদের অনেক আছে। আপনার জ্যেষ্ঠ রায়হুজুরকেও পত্রযোগে দরখাস্ত জানাইয়াছি। তিনি দিবেন না জানি, তিনি কঠোর ধার্মিক লোক, তবুও করুণা করিবার সময় তো পাপ বিচার কেহ করে না, পাপীকেই তো করুণা করিতে হয়। ভগবানও পাপীকে দয়া করিয়া থাকেন। সেই হিসাবে তিনি দয়া করিলে করিতে পারেন। আপনি করিবেন বলিয়া ভরসা করিতেছি। এবং দয়া করিয়া রায়হুজুরকেও যদি কিছু লেখেন—আমাকে ক্ষমা করিতে, দয়া করিতে, তবে অধিনীর প্রতি অনেক কৃপা করা হইবেক।"

চিঠিখানা আজও আমার কাছে আছে।

অন্নপূর্ণা-মা একটু থামলেন; বয়স হয়েছিল—এতক্ষণ কথা বলে একটু হাঁপাচ্ছিলেন। থামলেও জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর রায়ের মুখ যেন পাথরের মুখ। একটি রেখারও তাতে বদল হয়নি।

এই ফাঁকে তিনি বললেন—এসব কথা তুমি যখন বলছ, তখন সত্যি বলেই মানছি ঠাকুমা, কিন্তু আমাকে তুমি বলছ কি?—যা বলছ তাই বল! বাড়ীটা ছেড়ে দিতে বলছ তো!

—হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, তোকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তুই এত ছোট কাজ করলি কেন?

—ছোট কাজ কি করে হল ঠাকুমা। আইনসঙ্গত না হয়, মামলা করলেই তো বাড়ীটা পাবে।

—দাদা বাড়ীটা দান করে দলিল একখানা করে দিয়েছিল, কিন্তু বাড়ীটার করপোরেশন ট্যাক্স দিয়েছে বরাবর তোদের কলকাতার এস্টেট। পাছে ট্যাক্সের জন্ত গোলমালে পড়ে, দিতে না পারে, বিব্রত হয়, তারই জন্ত এইরকম করেছিল। তাছাড়া পাছে ওরা কেউ বিক্রী করে দেয়, দেনার দায়ে বাড়ীটাকে জড়িয়ে ফেলে, তাই এই জট পাকিয়েছিল। তুই তার সুযোগ নিয়েছিস।

—বল না, অন্যায় করেছি? কিছু বে-আইনী কিছু করেছি? বল?

—তা করিসনি। কিন্তু তুই তোর বাপকে, তোর ঠাকুরদাদাকে নরকে ডোবাচ্ছিস।

—না, ঠাকুরদার যে-দায়টা বলছ, সেটা তুমি চাপাচ্ছ দাদার উপর। মায়ের পেটের ভাই নয়, তোমার বাপ পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিল ঠাকুরদাদাকে, তার জন্যে আমার ঠাকুরদার উপর তোমার রাগ এ তো সবাই জানে গো। তবে হ্যাঁ, আমার বাপের কথা যা বললে, তা অবিশ্যি পাপপুণ্যি স্বর্গ-নরক এসব মানলে মানতে হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হয়, পাপ করলেই তার সাজা আছে। সে-সাজার মাফ নেই ঠাকুমা। ভায়লা বলে গোয়ান ফিরিঙ্গী
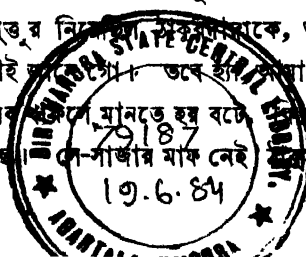
মেয়েটার সঙ্গ—সে বাড়ী দান করেও হয় না।

—চুপ কর, চুপ কর। ওরে যজ্ঞেশ্বর তুই চুপ কর।—

আর্তনাদ করে উঠলেন অন্নপূর্ণা-মা।

কিন্তু জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় চুপ করলেন না। তোমার ভাইপো তোমার ছোট ভাইয়ের মত ছিল। তার নিন্দে তোমার সহ্য হচ্ছে না—না? কিন্তু কি করব বল? এ যে তাঁর প্রাপ্য গো। মিথ্যে তুমি অঞ্জনা-ফঞ্জনার ফ্যাচাং তুলে ঠাকুরদার মত দেবচরিত্র ব্যক্তির অপমান করছ।

অন্নপূর্ণা-মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—অবিকল সেই রত্নেশ্বর রায়। অবিকল। ঠিক এমনি করেই নিজের বাপের উপর রাগ করে কথা বলত, তাঁরই ওপর সব দোষ চাপাত। অবিকল! লাখখানেক কি তারও বেশী মামলা দাদা করেছে। তার সব কাগজপত্র যদি থাকে, তবে অন্তত বিশ-পঞ্চাশটা মামলায় হয় মামলা দায়েরের আর্জিতে, নয় মামলার জবাবে বলা আছে—বীরেশ্বর রায় মদ্যপান করিয়া বেহুঁশ থাকিতেন, এবং মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল বলিয়া এমন স্বীকৃতি তিনি দিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তাঁহার পক্ষাঘাত ঘটিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার কোন স্বীকৃতি বা সহির মূল্য গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যজ্ঞেশ্বর রায় হেসে বললেন—ওসব কথা ছাড়ান দাও না ঠাকুমা। তুমি কুইনীর বাড়ীখানা কুইনীকে ফিরিয়ে দিতে চাও। তা বেশ তো, পুরনো কাসুন্দী না ঘেঁটে বাড়ীখানার দামের অর্ধেক টাকা আমাকে দিয়ে একটা না-দাবী লিখিয়ে নাও। চুকে যাক। টাকাটা তুমিও দিচ্ছ না, দেবে সুরেশ্বর। জগদীশ্বরের মেয়েটা ওর গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধেছে। ওর যখন ওগরাতেই হবে তাকে, তখন টাকাটা ওই দেবে।

একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে সুলতা। আমার নিজের গলায় এতখানি ভয়ঙ্কর চড়া সুর বা গর্জন বের হতে পারে, এর আগে তা আমি জানতাম না। গান গাইবার সুকণ্ঠ রায়বংশে আছে। শ্যামাকান্তের দান এই সুকণ্ঠ আর সংগীত-ব্যাকরণে জ্ঞান—এ নিয়েই অনেকে আমরা জন্মেছি, কিন্তু এমন গর্জন এক মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়ের সেই দৈত্যাকৃতি পশুচরিত্র ছেলেটা ছাড়া কারও গলায় বের হতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল—কিছুদিন আগে অন্নপূর্ণা-মায়ের নামে লেখা একখানা বেনামী চিঠির কথা। যে চিঠিতে অজ্ঞাত পত্রলেখক অর্চনার প্রতি আমার স্নেহ-মমতার কুৎসিত ব্যাখ্যা করে অপবাদ দিয়ে সংবাদ দিয়েছিল তাঁকে। বিয়েটা যাতে না হয়, তারই চেষ্টা ছিল তাতে। চকিত কথাটা মনে হতেই আমার ধারণা জন্মেছিল, সে-চিঠি হয় লিখেছিল বা লিখিয়েছিল—।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠেছিলাম পশুর মত—চু-প করুন আপনি!

সে চিৎকারে চমকে উঠেছিলেন যজ্ঞেশ্বর রায়। চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন, নির্বাক হয়ে। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই আত্মসম্বরণ করে নিয়ে বলেছিলেন—কেন? এমন করে চিৎকার করে উঠলে কেন? একটা জন্তুর মত? এঁ্যা?

আমি বলেছিলাম—সে চিঠি তাহলে আপনি লিখিয়েছিলেন?

একটু চুপ করে থেকে যজ্ঞেশ্বর রায় বলেছিলেন—হ্যাঁ। আমিই শিখিয়েছিলাম একরকম। হ্যাঁ, একরকম আমিই বইকি! প্রণবেশ্বর কীর্তিহাট থেকে এসে বললে—সমস্ত কথা, অতুল-মেজখুড়ীমার বোমা-পিস্তল নিয়ে জেলের কথা। অর্চনার সঙ্গে তোমার মাখামাখির কথা। সব শুনলাম। শুনলাম এবং সন্দেহ হল। এ তো হামেশাই হয়। বড় বড় বাড়ীতে, যে-সব বাড়ীতে বড় সংসার, পোষ্য অনেক হয়, সে সব বাড়ীর মালিকেরা ভোগ করে থাকেন পোষ্যদের বধূ-কন্যাদের। তা করেন। যারা দুবেলা দুমুঠো ভাত পায়, মাথা গুঁজবার একখানা ঘর পায়, বড় বাড়ীর লোক বলে পরিচয় দিতে পায়, তাদের পুরুষ অভিভাবক থাকে না বা থাকলেও বোবা হয়ে থাকে। বাইরে এখানে-ওখানে গালাগাল দেয়। যেখানে কোন লোক থাকে না। এর মধ্যে মালিকপক্ষের ছেলে বা কর্তার নজরে মেয়েরা কেউ পড়লে আর কি রক্ষে থাকে? এই তো আমার শ্বশুরবাড়ীতেই, আগে রেওয়াজ ছিল, মেয়ে-দের কুলীনের ঘরে বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই ঘরে রাখা, কিছু সম্পত্তি দেওয়া। তারপর হত এই তারা যখন একপাল করে ছেলে-মেয়ে বিইয়ে বসত, তখন—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—থাক। আর বেদ-বেদান্ত আওড়াতে হবে না তোকে যজ্ঞেশ্বর। তুই স্বীকার করলি এই যথেষ্ট।

—কেন, কথাটা মিথ্যে বললাম নাকি? তোমার দাদা রায়বাহাদুরের যে অপবাদ তুমি দিচ্ছ, সেটাই বা কি গো? কলকাতায় ওটা আকছার বড়লোক বাড়ীর কীর্তি। বড় বড় বাড়ীর কেচ্ছা আছে, বড় বাড়ীতে গরীব আত্মীয়ের বউ-বেটী নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরত, এক একখানা গয়না নিয়ে। কর্তা একলা ঘরে বসে বউ দেখতেন আর গয়না দিতেন। তোমার ভাইপো ভায়লাকে নিয়ে এতবড় যে কীর্তি করলে সেটা? সেটাই বা কি? তোমার ভাইপোর মেমসাহেবের ওপর একটা ঝোঁক ছিল। যোগেশ্বরকে লেখাপড়া শেখাবার নামে একজন মেমসাহেব গবর্নেস রেখেছিল, আমার মায়ের চোখ থেকে জলের ধারা-বওয়া আমি ভুলিনি, আমি তাকে চাবুক মেরে তাড়িয়েছিলাম।

বাধা দিয়ে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তুই দিব্যদৃষ্টি মহাপুরুষ রে। তোর সঙ্গে কথা কইতে আসা আমার ভুল হয়েছিল। তোর ঠাকুরদার থেকে তুই সরেস। নির্বাণ তোর এই জন্মেই হবে। শুধু টাকা আর সম্পত্তির মায়াটা থাকবে, আর ওইটেই হবে তোর সিদ্ধির বাণী। ওসব কথা থাক। এখন ওই বাড়ীর জন্যে কি নিবি তাই বল। কেস তো আমি কোর্টে ওঠাতে পারব না, নইলে দেখতাম তুই কতবড় পাষণ্ড! কত তোর টাকার জোর, আর কত তোর জেদ! আমার কপাল! বুঝলি, আমার কপাল! কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে যজ্ঞেশ্বর রায় বলেছিলেন—তা দিয়ো হাজার পাঁচেক।

এবার আমি আর অন্নপূর্ণা-মাকে কথা বলতে দিই নি। বলেছিলাম—টাকাটার বদলে চেক যদি আজই দিয়ে যাই?

—তা দিতে পার। আমি না-দাবী লিখে দেব বলে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, টাকাটার জন্তে রসিদ দিচ্ছি। তবে বেয়ারার চেক দিতে হবে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—চেক দিয়ে দে সুরেশ্বর। কিন্তু তোর বউয়ের হাতে দেব, তোকে

দেব না। আর একটা প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেব।

—প্রতিশ্রুতি! হাসলেন যজ্ঞেশ্বর রায়।

—হ্যাঁ। মিথ্যে বেনামী পত্র লিখে তুই অর্চনার বিয়েতে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিস। এমন কাজ এর পর আর করবি নে।

চুপ করে রইলেন যজ্ঞেশ্বর রায়, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। ফিরে যখন তাকালেন তখন আমি পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম সুলতা। দেখলাম, যজ্ঞেশ্বর রায়ের চোখ ছলছল করছে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—এবার শান্ত কণ্ঠে বললেন—কি বলে এমন কথাটা লিখলি তুই? তোর মনে এতটুকু লাগল না? একবার মনে হল না যে, মেয়েটা তোর বাপের…

—বাবার কথা তুলো না ঠাকুমা। না।

—বেশ তোর কাকা, তিনি তো তোর সঙ্গে কোন অসদ্ভাব করেন নি। শিবেশ্বর? তাছাড়া ঠাকুরদা তোর কাছে দেবতা, এ মেয়ে তো তাঁরই এক নাতি জগদীশ্বরের মেয়ে!

যজ্ঞেশ্বর রায় বললেন—ঠাকুমা, ওটা আমার কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে। সে আজ থেকে নয়, সেই ছেলেবেলা থেকে। বাল্যবয়স থেকে। তোমাকে বলি। ঠাকুরদা একটা ঝিকে হঠাৎ দেখলেন, তার আগে দেখেন নি। যুবতী ঝি, বছর সতেরো-আঠারো বয়স, তাকে রেখেছেন ঠাকুমা। ওই ঝিটার মা, ঠাকুমার খাস-ঝি ছিল। নাম ছিল কামিনী। কামিনীর মেয়ে যামিনী এ বাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল, বারো বছর হতে না হতে তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা। মেয়েটার কপাল; বিধবা হয়ে ফিরে এল ভরাযৌবন নিয়ে। কামিনী খুব করে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরলে, মা, বাড়ীর এককোণে ওকে একটু ঠাঁই দাও। ঠাকুমা ঠাকুরদার মত জানতেন, তিনি তাকে বাড়ীতে রাখলেন, খুব গোপনে। ঠাকুরদার চোখের সামনে যেতে বারণ ছিল। তা সে যেতো না। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিপদ ঘটল; মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হল। মেয়েটার মা জানতে পেরে কেঁদে এসে পড়ল ঠাকুমার কাছে। উপায় কর মা। ছোটবাবু—মানে ছোটকাকা রামেশ্বর…। কথাটা শেষ পর্যন্ত রায় বাহাদুরের কানে উঠল। ঠাকুরদার খেয়াল ছিল না যে, আমি পাশের ঘরেই আছি, আমার বয়স তখন বারো পার হয়ে তেরোয় পড়েছে। ঠাকুরদা তিরস্কার করেছিলেন ঠাকুমাকে। বলেছিলেন—সরস্বতী-বউ, যে ঘরে লক্ষ্মী থাকে, তার ঘরে অলক্ষ্মী চারিদিক থেকে কাঁদতে কাঁদতে এসে আশ্রয় চায়। আশ্রয় দিতে নেই। অন্ততঃ ভোগী যারা, জমিদার যারা, তাদের তো নেই-ই। দিলে কি হয় জান? ওই অলক্ষ্মী রূপসী রূপ ধরে যৌবনের ডালা তুলে ধরে ওই বংশের মালিক, তার বংশধরদের সামনে। ভোগ করলেই অলক্ষ্মীর মনস্কামনা পূর্ণ। ধর্ম পালাল, ধর্মের সঙ্গে ভাগ্য যায়, ভাগ্যের সঙ্গে যশ যায়, যশের সঙ্গে সম্মান যায়। সম্মানের সঙ্গে অধিকার যায়, ক্রমে সব যায়, লক্ষ্মী ছেড়ে পালাল, অলক্ষ্মী তখন দারিদ্র্য দুর্ভাগ্য নিয়ে বংশকে ছারখার করে দেয়। তার উপর তুমি জান না, জান না সরস্বতী-বউ, এ বংশের উপর পূর্বপুরুষের অর্জিত একটা অভিসম্পাত আছে। নিদারুণ অভিসম্পাত। নারীঘটিত পাপ বংশে ঘটবেই, এবং তাতেই সব নষ্ট হবে। আমি এমন কঠোর সংযম করি, পূজা করি, অর্চনা করি, শুধু

এই পাপ থেকে রায়বংশকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তোমরাই তা হতে দিলে না। দেবে না। হল তো। রামেশ্বরকে ডোবালে তো পাপে। ডোবালে তুমি। দয়া করতে গিয়ে পাপের উপকরণ তুমি রামেশ্বরের মুখের সামনে ধরে দিলে। সে নতুন জোয়ান, তার দোষ কি? সে সামনে হরিণী পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে! দেখেও জ্ঞান হল না তোমার? এর আগে দেবেশ্বরকে নিয়ে এত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, ভায়লা মেয়েটাকে নিয়ে কি করলে সে, তার জন্যে কি করলাম আমি—তা তো জান! ঠাকুরদাস খুন হয়ে গেল। আমি নিজে বিশ্বাস করি নে সরস্বতী-বউ। মেয়েদের সতীত্বে আর পুরুষের সৎ শুদ্ধ থাকায় বিশ্বাস করি নে। থাকতে গেলে আমার মত যারা চব্বিশ ঘণ্টা জেগে থাকে, তারাই পারে। ঘি আর আগুনে এক জায়গায় থাকলেই জ্বলবে। দাউ-দাউ করে জ্বলবে, ঘি শেষ হলে আগুন ছাই চাপা পড়বে।

তারপর ঠাকুমা, কি বলব, আমার অদৃষ্ট, ঠাকুরদা তীর্থে গেলেন, বাবা কীর্তিহাটে এসে থাকলেন, আমরা এলাম, কলকাতায় যোগেশ্বরের জন্যে যে গবর্নেস রাখা হয়েছিল সে এল, বিবিমহলে থাকল, বাবার সঙ্গে একসঙ্গে বেড়াতো, একসঙ্গে চা খেতো। গল্প করত। মা কাঁদত। আমি বুঝতে শিখেছি। আমি শুনেছিলাম মায়ের কাছে, ভায়লেটকে নিয়ে প্রথম বয়সে বাবার কীতির কথা। ঠাকুরদার ভয়ে ওকথা কীর্তিহাটে মুখে আনতো না কেউ। গোয়ানরা গান করত—

বড়া বড়া মোকাম কি বড়া কারখানা
উধর মৎ যানা মৎ যানা
শুননা মানা, দেখনা মানা, বাত কহনা মানা
বড়া কারখানা—

পিড্রুর ফাঁসি হয়েছিল, তারই গান বেঁধেছিল ওরা। তবে মা জানতেন, মায়ের কাছে শুনে জেনেছিলেম, নইলে ভায়লেটকে নিয়ে যখন বাবা এসব কাণ্ড করেন, তখন বাবার বিয়েই হয় নি! তাছাড়া মেজকাকার কাছে শুনেছি, ছোটকাকার কাছে শুনেছি। ঠাকুরদা বার বার বলতেন আমাকে, তোমার বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না দাদু। সর্বনাশ হয়ে যাবে। রায়বংশের ওপর দেবরোষ আছে। নারী হতে সর্বনাশ। মনে একটা ভয় হয়েছিল। তত সন্দেহ বেড়েছিল। তারপর যে বাড়ীতে আমার বিয়ে হল, সে বাড়ীতে তখনও আমার বুড়ো দাদাশ্বশুর বেঁচে।

বয়স তখন সত্তোরের কাছে, স্ত্রী মারা গিয়ে খালাস পেয়েছেন; দীর্ঘকাল তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। পঙ্গু স্ত্রী থাকতেই তাঁর সেবা করত তাঁর পোষ্যা আপন ভাগ্নীর বিধবা মেয়ে। সে সেবা সত্যি-সত্যিই রক্ষিতার সেবা ঠাকুমা। আজ তুমি কথাটা বড় ঘা দিয়ে বললে বলে তোমার কাছে বলছি। এই বুড়োকে কারুর কিছু বলার উপায় ছিল না, তার কারণ এই বুড়োই কয়লাকুঠীতে সামান্য চাকরি করতে গিয়ে সেকালে পাঁচ-ছ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি করেছিল। সমস্ত সম্পত্তির দাম কষতে গেলে কোটির কাছে যাবে। শুধু ঐ মেয়েটিই নয়, ও বাড়ীতে যত পোষ্য দেখেছি, তাদের যাদের রূপ-যৌবন ছিল, সকলকেই ওই দণ্ড দিতে

হয়েছে। দণ্ড দিতে হয়েছে বলছি কেন, তারা গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি বাপ-ভাইয়ের চাকরির জন্তে ওই মাশুল দিয়েছে।

একটু থামলেন যজ্ঞেশ্বর রায়।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—কথাটা তুই বেশী বাড়িয়ে বলছিস যজ্ঞেশ্বর, নইলে কথাটা সত্যি। আমার শ্বশুরবাড়ীতেও ওই হাল ছিল। তারপর পরমহংস দেব প্রকট হলেন, লোকে তাঁকে জানল, চিনল, তাঁর পিছনে স্বামীজী এলেন, তখন দেশের হাল ফিরল।

জ্যাঠামশাই বললেন—না ঠাকুমা, কথাটা ঠিক হল না। পরমহংস দেব এলেন, তাঁর কৃপায় গিরিশ ঘোষ মশায়ের থিয়েটারের মধ্যে থেকেও মতি পাল্টেছিল, কিন্তু জমিদার বড়-লোকের বাড়ীর কারও কোন গতি হয় নি। যা ছিল তাই থেকেছে, তাই রয়েছে। আমাদের বংশে দেবরোষের কথা শুনি, কিন্তু সেটা কি তা জানি নে। জানতে কোন রকমেই পারি নি। শুনি ধর্মসাধনে পাপ, আর সম্পদে পাপ। ঠাকুমা, বহু কর্ম আমি করেছি, দীক্ষা আমি নিয়েছিলাম, সে সব গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়েছি, কিছুই আমি মানি নে। তবে এটা জানি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দ হাজার বছরে একজন। বাকী সন্ন্যাসী সাধুগুলো চোর, ভণ্ড, লম্পট। আর ধনীর ছেলেগুলো সব শয়তান, চরিত্রহীন। তারা আবার যখন গরীব হয়, লক্ষ্মী ছাড়ে, তখন শুধু পুরুষের নয়, বাড়ীর বউ-বেটীরও পতন ঘটে। ও পাপ কেউ ঘোচাতে পারে না ঠাকমা। এ দেশে ধর্ম নিয়ে যত মাতামাতি হয়েছে, এত কোথাও হয় নি। মেয়েরা, সে স্বামীকে ভালোবাসুক না-বাসুক, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেছে। ঈশ্বরকে নিয়ে এত খেলা কেউ কোথাও খেলে নি। বিধবা বিবাহ আইন করেও এদেশে চালানো যায় নি। এত পাপ, এত ভয়ঙ্কর পাপ কোন দেশে—ধর্মের উল্টোপিঠে তার আড়ালের আশ্রয়ে ঘটে নি। আবার একথাও সত্য যে, এত ভালবাসাও কোন দেশে, কোন নারী কোন পুরুষকে বাসে নি। কোন পুরুষ কোন নারীকে বাসে নি। সম্পদেও আমরা পাপ করেছি। এ আমার কথা নয় ঠাকুমা, এ আমার ঠাকুরদাদা তোমার দাদার কথা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কথা, আমাকে নিজে মুখে বলতেন এসব কথা। শুনেছি তাঁর নিজের পিতামহ—মানে বিমলাকান্তের বাপ কি এক ভীষণ সাধনা করেছিলেন। তারই পাপ নাকি আমরা ভোগ করছি। রায়বংশে ধর্মের পাপ ধনসম্পদের পাপ একসঙ্গে জমা হয়েছে। আমার মনে অহরহ সন্দেহ হয় ঠাকুমা, এ বংশে ছেলে-মেয়ে কেউ সৎ থাকতে পারে না, সতী থাকতে পারে না। চিরজীবন এই সন্দেহ আমার মনে। তাই আমি প্রণবেশ্বরের কাছে যখন শুনলাম সুরেশ্বরের সঙ্গে জগদীশ্বরের মেয়ের এত মাখামাখি, তখন একটা সন্দেহের সুতো টেনে বের করেছিলাম। তারপর যখন শুনলাম, সুরেশ্বর তার বিয়ের জন্তে এত টাকা খরচ করছে, তখন আমার আর সেটা সন্দেহের সুতো রইল না। মোটা দড়ি হয়ে উঠল। আগেকার আমি, মানে অর্থবান যজ্ঞেশ্বর রায় হলে আমি এ সন্দেহ চিঠি লিখে তোমাকে জানাতাম না। কিন্তু গরীব হয়ে ছোট হয়ে গেছি। মনটা ছোট হয়ে গেছে। কিছু মনে করো না ঠাকমা। অভিসম্পাত দাও, তা দাও। হাজার বার দাও। কিন্তু আমার উপর রাগ করে মন খারাপ করে যেয়ো না।

সুলতা! সুরেশ্বর বললে—এই যজ্ঞেশ্বর রায় আমার জ্যাঠামশাই, যে সন্দেহের দড়ি পাকিয়ে তুলেছিলেন সেদিন, সেই সুতোই কাল হয়েছিল। প্রণবেশ্বর এই সন্দেহের কথা জানিয়েছিল রথীনকে। অর্চনার সঙ্গে রথীনের বিয়ের পর প্রণবেশ্বরের সঙ্গে মাখামাখি একটু বেশী হয়েছিল রথীনের। কেন জান?

অন্নপূর্ণা-মা যে-বাড়ী, যে-বংশ দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলেন, কোন পাপ প্রবেশ করতে দেবেন না বলে বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই বংশে পাপই বল আর যাই বল, সুলতা, ব্যভিচারকে কি বলবে, মদ্যপানকে কি বলবে বল? বল? If it is not a sin—তাই মেনে নেব আমি। Sin বলে কিছু নেই। মদ্যপানকেও মেনে নেব। খেলে কোন দোষই নেই। কিসের দোষ? Neither a sin nor a crime. ওটা উনবিংশ শতাব্দীর পিউরিট্যান মুভমেন্টের একটা idea, তাই হল। কিন্তু ব্যভিচার? প্রথমে রথীন ডাক্তার অর্চনাকে বিয়ে করতে অরাজী হয়েছিল বলেছি। কেন শোন, একটি Anglo nurse-কে নিয়ে সে তখনই জড়িয়ে পড়েছিল। সেই মেয়েটির সঙ্গে প্রণবেশ্বরেরও আলাপ ছিল। আলাপটা ঠিক নার্সটির সঙ্গে নয়, তার দিদির সঙ্গে। সেই সূত্রে তারা চিনত পরস্পরকে, কিন্তু আত্মীয় হিসেবে পরিচয় ছিল না। প্রণবেশ্বরদাদা রথীনকে জানত মেডিকেল স্টুডেণ্ট হিসেবে প্রথম, তারপর ডাক্তার হিসেবে। আর রথীন প্রণবেশ্বরকে চিনেছিল প্রথম পেশেণ্ট হিসেবে। নার্স তাকে এবং নিজের দিদিকে স্যালভারসান ইঞ্জেকসন দেওয়াবার জন্য নিয়ে এসেছিল রথীনের কাছে। রথীন তখন সিক্সথ ইয়ারের ছাত্র। তারপর নার্সটির বাড়ীতে দুই ভায়রা-ভাইয়ের মত তাদের দেখা হয়েছে। এবং মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের কাছে পেশেণ্ট হিসেবে এসেছে।

পরিচয় হল বিয়ের পর।

তারপর সুলতা—যজ্ঞেশ্বর রায় যে কাজ করেছিলেন, বিবাহের আগে বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে, সেই কাজ প্রণবেশ্বর করলে বিবাহের পরে। জ্যাঠামশাই অপবাদ দিয়েছিলেন অর্চনার নামে। প্রণবেশ্বর এবার অর্চনাকে চিঠি দিয়েছিল রথীনের নামে। তার আর সেই নার্সের একসঙ্গে বসে তোলানো ছবিসমেত প্রমাণসমেত পত্র।

উদ্দেশ্য কি জান সুলতা? উদ্দেশ্য অর্চনার সুখের ঘরে আগুন লাগানো। আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তার ফল এমন হল যে—চুপ করলে সুরেশ্বর।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুরেশ্বর। সুলতাও কোন কথা খুঁজে পেলে না।

অনেকক্ষণ পর সুরেশ্বর বললে—অথচ বিয়ের পর রথীন মোটামুটি নিজেকে শুধরে নিয়েছিল। তা না হলে হয়ত ভাবতাম যে, প্রণবেশ্বরদাদার নারীদেহলোভী মন নার্সটির বড় বোনের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে বা তার প্রতি অরুচি ধরিয়ে নার্সটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

থাক ও কথা এখন, সুলতা। মোটামুটি বলে রাখলাম, এর পর যথাসময়ে যথাক্রমে অর্চনার এ দুর্ভাগ্যের কথা বলব। এখন ও কথা থাক।

এখন যা বলছিলাম তাই বলি।

সেদিন জ্যাঠাইমাকে সাক্ষী রেখে জ্যাঠামশায়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখে

দিয়ে কুইনীর ওই বাড়ীটা খালাস করে এনেছিলাম। এবং ক'দিন পর তার কাছে না-দাবা দলিল করিয়ে নিয়ে আমিও না-দাবী রেজেস্ট্রী করে দলিল দুখানা দিয়ে এসেছিলাম অন্নপূর্ণা-মা'র হাতে। ওটা কুইনীকে আমি দিই নি। দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা-মা।

তিনি কীর্তিহাটে যান নি। কুইনীকে আনিয়েছিলেন কলকাতা। ঘটনাটা ঘটেছিল বিয়ের আগেই। কুইনীকে দলিল দুখানা হাতে দিয়ে বাড়ীতে দখল দিয়েই তাকে বলেছিলেন, এই নে তোর বাড়ীর দলিল।

কুইনী বড় শান্ত, না ঠিক বলা হল না, সুলতা, বড় নীরব মেয়ে। কথা বেশী বলে না। নীরবেই সে হাত পেতে দলিল দুখানা নিয়ে বলেছিল, আপনাকে নমস্কার করতে লজ্জা করছে, প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে, করব ?

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—করবি বইকি, আমি খুশী হব রে। ক্রশ্চান হলেও বাঙালী। প্রণাম করা তো শুধু হিঁদুর নিয়ম নয়। এ নিয়ম এই দেশের নিয়ম। যেমন এই শাড়ী পরেছিস। শাড়ী তো সাহেবদের দেশে পরে না।

—পা ছোঁব ?

একটু ভেবে নিয়ে অন্নপূর্ণা-মা পা দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ছোঁ!

তাঁর পা-দুখানা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই অন্নপূর্ণা-মা তাঁর হাতখানা কুইনীর মাথার ওপর রেখে আশীর্বাদ করলেন। কি আশীর্বাদ করলেন তিনিই জানেন, তবে দু ফোঁটা জল তাঁর চোখ থেকে টপটপ করে পড়ল।

আমি খুব বিস্মিত হই নি সুলতা। আমি এর কারণ জানতাম। ভেবেছিলাম, কুইনী কিছু বিস্মিত হবে, কিন্তু তাও সে হয় নি।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—দেখ্, আর একটা কথা তোকে বলব।

—বলুন।

—আমি সুরেশ্বরকে বলেছি, তোর পড়াশোনার খরচ সব ও দেবে। তুই পড়। ওই গোয়ানপাড়ায় হলদীদের সঙ্গে থেকে ওদের মত হয়ে যাস নে।

কুইনী মৃদুস্বরে বললে—সে-কথা বাবু দিদিমাকে বলেছেন মা।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—জানি। কিন্তু তুই তো তার উত্তর দিস নি। তুই তো গোয়ান নোস কুইনী। তোর বাবা মুখুজ্জে ছিল। বামুন থেকে ক্রশ্চান হয়েছিল। তোর মা—সে পিড্রুজের মেয়ে নয় কুইনী। পিড্রুজের মা ভায়লা পিড্রুজের মেয়ে, বাপ ছিল পিড্রুজ কিন্তু তার মা ছিল বামুনের মেয়ে। ভায়লার ছেলে তোর মায়ের বাপকে লোকে পিড্রুজ বলেই জানে বটে কিন্তু তা নয় কুইনী, সে-ও হল বামুনের ছেলে। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—মা-বাপ একসঙ্গে মরে গিয়ে হিলডার কাছে গিয়ে পড়েছিস, কিন্তু ওদের মধ্যে থেকে ওরকম হলে তো চলবে না। তোর মায়ের বাপের বংশ খুব বড় বংশ—। চুপ করে গেলেন অন্নপূর্ণা-মা। মুখ ফিরিয়ে নিলেন কুইনীর দিক থেকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কুইনী—কোন উত্তর দিলে না বা দিতে পারলে না। শুধু ঠোঁটদুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কুইনী চলে গেলে অন্নপূর্ণা-মা মুখ ফেরালেন আমার দিকে, দেখলাম তাঁর চোখ থেকে দুটি জলের ধারা গড়াচ্ছে।

অন্নপূর্ণা-মাকে আমি যত দেখছিলাম, ততই যেন অভিভূত হচ্ছিলাম। বিশেষ করে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন থেকে। তাই বা কেন সুলতা, সেই যেদিন উনি রথীনকে সঙ্গে করে এনে বিয়েতে রথীনের সম্মতি দেওয়ালেন এবং নিচে দেখলেন কুইনীকে আর হিলডাকে, সেইদিন থেকেই। আমি দেখেই যাচ্ছিলাম আর এইটুকু বুঝছিলাম যে, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে যা আছে, রায় কোম্পানীর সঙ্গে ভায়লেট পিড্রুজের পত্রালাপের মধ্যে যা আছে, দেবেশ্বর রায়ের একখানা চিঠির মধ্যে যা আছে, তার চেয়েও আরও কিছু বেশি জানেন অন্নপূর্ণা-মা।

অনুমান আমার মিথ্যে নয় সুলতা। তিনি তা জানতেন।

যেদিনের কথা বলছিলাম, যেদিন কুইনীকে ওইসব কথা বলছিলেন, সেদিন ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে, অর্চনার বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে ফাল্গুনের শেষে, মার্চের ৮ তারিখে ; ওই দলিল ফেরত দেবার জন্যেই অন্নপূর্ণা-মা ওদের আটকে রেখেছিলেন কলকাতায়। পড়ে গিয়ে হিলডার হাঁটুটা শুধু পাকেই নি, একটা স্থায়ী স্প্রেন হয়ে প্রায় খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। তারও চিকিৎসা হচ্ছিল। সেদিন কুইনী কোন কথা বলতে পারলে না, চলে গেল—অন্নপূর্ণা-মা মুখ ফেরালেন, দেখলাম তাঁর চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়েছে। আঁচল দিয়ে মুছে তিনি বললেন—সুরেশ্বর, এ-ভারটাও তুলে নিস রে। মেয়েটাকে পড়িয়ে-শুনিয়ে মানুষ করে দে। এতে তোর সত্যিকারের ধর্ম করা হবে রে। সে-সব কথা তোকে মুখে বলতে পারব না। কথা তো অল্প নয় রে, কথা অনেক। দেখ, কথা এত রে, কথা যদি ইট-কাঠ বা পাথর হত, কিম্বা সব কথা যদি কাগজে লিখে থাকে-থাকে সাজানো হত, তবে গোটা এই হলঘরখানাই ভরে যেত। বুঝলি! বলতে গেলে জীবনে আর কুলোবে না। আমি তোকে একখানা চিঠি দেব—চিঠিখানা দেবুর লেখা। দেবু তোর ঠাকুরদা, দেবেশ্বর রায় সম্পর্কে আমার ভাইপো, আমার সহোদরের ছেলে সে, তুই জানিস। তোর জ্যাঠাও জানে না। বয়সে প্রায় একবয়সী ছিলাম, আমি থাকতাম কাশীতে, সে থাকত কীর্তিহাটে, দুজনে দুজনকে চিঠি লিখতাম। সেকালের ছোট পোস্টকার্ড, তিন-চারটে লাইন লিখতে ফুরিয়ে যেত। তাও আমার কাছে দু-একখানা আছে। সে আমার ছোট ভাইয়ের অধিক ছিল রে। ভাইপো থেকে ভাই, ছোট ভাই বেশী আপন। আমরা বন্ধু ছিলাম। খুব ছোটবেলা কালীপুজোর পরদিন ভাইফোঁটা, আমি পিসেমশাই আর পিসীমার সঙ্গে কাশী থেকে পুজোর সময় শ্যামনগর এসে কীর্তিহাট আসতাম। সে আমার হাতের ফোঁটা নেবার জন্যে কাঁদত। একসঙ্গে খেলা করতাম। দশ বছর বয়স তখন। আমার বিয়ের জন্যে পাত্রের খোঁজ হচ্ছে, দেবু আমাকে বলেছিল—পিসী, তোমার বিয়ের পরই তো আমার বিয়ে হবে। তা তুমি বলে দিয়ো, আমি মেম বিয়ে করব। তার মনের কথা প্রথম বিশ বছর সে আমাকে বরাবর জানিয়েছে ; তারপর সে বদলেছিল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘা খেয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছিল পাথরের মত। তার

একখানা চিঠি আমি তোকে দেব—তুই পড়ে দেখিস। আমার মৃত্যুর আগে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলব ঠিক করেছিলাম, তাই করতামও। কিন্তু তোকে পেয়ে মনে হচ্ছে, তুই আমার যেন সেই দেবু। তোকে এই চিঠিখানা দেব, তুই পড়ে দেখিস। তার মধ্যে তার একটা ইচ্ছের কথা আছে। ওরে, সে আমাকে লিখেছিল টাকার জন্যেই। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বর রায় আমার কাছে হাজার টাকা ধার চেয়েছিল। এই কুইনীর মায়ের বাপের মা অঞ্জনাদির পেটের মেয়ে ভায়লেটের জন্যে চেয়েছিল। আমি দিই নি।

ইচ্ছে করেই দিই নি। নইলে আমার টাকা ছিল। একটু চুপ করলেন অন্নপূর্ণা-মা। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—টাকা দিলে আর দেবেশ্বরকে কীর্তিহাটের বংশের মধ্যে পেতাম না রে। ও ভায়লেটকে নিয়ে কৃশ্চান হয়ে যেতো। টাকাটা চেয়েছিল—। থাক, যে-চিঠিখানা দেব তোকে, তারই মধ্যেই তুই সব দেখতে পাবি।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—অথচ এর ভিত্‌টা গেড়ে দিয়েছিল আমার দাদা। রায়বাহাদুর গোঁড়া ধার্মিক রত্নেশ্বর রায়।

* * *

সুরেশ্বর বলতে বলতে থামলে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—বারোটা বাজতে চলেছে। জিরো আওয়ার। কীর্তিহাটের কড়চাও শেষ হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় আর তাঁর বড়ছেলে দেবেশ্বর রায়ের কথা বললেই শেষ। তারপর আমি আর তার শেষপুরুষ, ছবিতে যে-কড়চা এঁকেছি, তার মধ্যে আমি ছবি নই। আমি জীবন্ত। বিংশ শতাব্দীর মানুষ।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায়ের কাহিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই শেষ। পৃথিবীতে ইংরেজ জাতের দীপ্তমধ্যাহ্ন। বৈশাখের মধ্যাহ্ন। ইংরেজ তখন বৈশাখের সূর্যের মত প্রখর প্রদীপ্ত। তার সেই প্রচণ্ড তেজের উত্তাপে বাংলাদেশে জমিদারেরা সুবর্ণরেখার বালুচরের মত সূর্যের চেয়েও অসহনীয় কিন্তু তবু লোকে তাদের সহ্য করে, দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে, তাদেরই বলে 'মা-বাপ'। বালির মধ্যে সোনার দানা বা কণা সত্যই পাওয়া যেত, খুব বেশি না হলেও, নেহাৎ কম নয়। অনেক। অনেক।

ইস্কুল, হাসপাতাল, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী যা বাংলাদেশে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল, তার বারো আনা দিয়েছে এই জমিদারেরা।

সুলতা এতক্ষণে কথা বললে, বললে—আমি তোমাকে সমর্থন করছি সুরেশ্বর। তার সংখ্যাও মোটামুটি আমার জানা আছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইংরেজ সরকার মোটামুটি জেলাওয়ারি একটা জেলা স্কুল, আর একটা সদর হাসপাতাল দিয়েছে। হয়তো বা দুটো-একটা জেলায় দুটো থাকতে পারে কিন্তু দুটোর বেশি নয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হবার পূর্বে এই হিসেবে আটাশটা জেলায় গোটা-তিরিশেক ইস্কুল গভর্নমেণ্ট দিয়েছে, হাসপাতালও তাই। কিন্তু পার্টিশনের সময় প্রায় চোদ্দশ' ইস্কুল আমাদের দেশে ছিল। এর কিছু ছিল মিশনারীদের। কিছু গ্রামের লোকের চাঁদায়। শতকরা আশীটাই জমিদারদের

দেওয়া। তার সঙ্গে অনেক কথা আসে, সেসব থাক, আমি ওসব শুনতে আসি নি, আমি তোমার রায়বাড়ীর বা কীর্তিহাটের কড়চা দেখতে এসেছি, শুনতে এসেছি। বলে রাখি, এর মধ্যে আমার সঙ্গে তোমার পুরনো হৃদ্যতার জের অবশ্যই আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন হৃদয়ের আকর্ষণের জের নেই। তুমি কড়চার কথা বল।

ঢং-ঢং-ঢং শব্দে ঘড়িটা বাজতে শুরু করল।

সুলতা বললে—তোমার অন্নপূর্ণা-মা যে চিঠিখানা তোমাকে দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটা থেকে শুরু কর। চিঠিখানা তোমার কাছে আছে?

—আছে। যা তোমাকে বলেছি, যা আমি ছবিতে এঁকেছি, তা যে সব কাগজ থেকে পেয়েছি, সে সব কাগজ আমার কাছে বড় মূল্যবান দলিল সুলতা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইসব দলিলের দেনা আমাকে শোধ করতে হবে। লোকে আমাকে পাগল বলে। এই তো কালও রায়বাড়ীর অন্য জ্ঞাতিরা আমাকে গালাগাল দিয়ে গেলেন এর জন্যে। তা দিন। আমার সংকল্প আমি পালন করব।

সামনের টেবিলে জমা-করা কাগজপত্রের মধ্য থেকে একটা ছোট চন্দনকাঠের বাক্স থেকে সুরেশ্বর একখানা খাম বের করলে। সেই ছোট পোস্টকার্ড ছোট খামের আমলের—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি আঁকা খাম। তার মধ্যে থেকে লাইন-টানা চিঠির কাগজে লেখা চিঠি। চিঠির কাগজখানা গিরিমাটির রঙ ধরেছে এবং কোণগুলো ভেঙে গেছে। ভাঁজে ভাঁজে কাট ধরেছে।

* * *

চিঠিখানার তারিখ ১৮৭৮ সাল, বাংলা ১২৮৫ সাল। কলকাতার জানবাজারের বাড়ী থেকেই চিঠি লিখেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং, পিসী, মদীয় এই পত্র পাইয়া তুমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হইবে। সম্ভবত মদীয় নাম দেখিয়া আমার উপর তোমার ঘৃণারও উদ্রেক হইতে পারে। কিন্তু নিবেদন করিব এই যে, পত্রখানি তুমি পাঠ করিয়া দেখিয়ো। এ-সংসারে তুমি আমাকে আপন দিদির মত যে-প্রকার স্নেহ কর, তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। এমতপ্রকার স্নেহ আমাকে আমার পিতা করেন না, মাতাও করেন না। আমি আজ তাঁহাদের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছি। আমাকে একরূপ ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

মদীয় বিবরণ তুমি জান। তুমি শুনিয়াছ। অবশ্য পূর্বে তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া করিলে হয়তো এমতপ্রকার অবস্থা বিপর্যয়ে পতিত হইতে হইত না। তবে তুমি ভায়লা বলিয়া যে-অনাথা মেয়েটি পিড্রুজের বাড়ীতে থাকিত, তাহাকে তুমি দেখিয়াছ। তাহাকে তুমি চেন। মেয়েটা আমা অপেক্ষা বৎসর-দুয়ের ছোট। মেমসাহেবদের মত গায়ের রঙ। সে যে অঞ্জনাপিসীর কন্যা, তাহা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম।

ইহা কি প্রকারে আমি অবগত হইলাম, তাহা বলিয়াছিলাম কিনা জানি না। তাহাই তোমাকে বলিব। না হইলে তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিবে না।

আমার বয়স তখন বৎসর-সাতেক, তোমার তখন বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। জানবাজারের বাড়ীতে তৎকালে ছিলাম। মা তখন প্রসবের জন্ম কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি দেখিতাম এই ভায়লাকে কোলে করিয়া কলিকাতাবাসী একজন গোয়ান সেরেস্তায় আসিয়া দাঁড়ায় এবং সপ্তাহে কয়েকটি করিয়া টাকা লইয়া যায়।

বাবামশায় আসিলে তিনি লোকটাকে লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কথা বলেন। আমার খুব কৌতূহল হইত। কারণ ছেলেবেলা হইতেই মেমসাহেব আমার খুব ভাল লাগে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল—তাহার করিলাম। সে ভাঙা-ভাঙা বাংলায় দুই-চারিটা কথা বলিত। ইংরাজী সে জানিত না। আমি তখন ইংরাজী শিখিয়াছি, মাস্টার আমাকে তখন মুখে-মুখে ওয়ার্ড-বুক মুখস্থ করাইয়াছে। আমি মধ্যে মধ্যে ইংরাজী বলিলে সে দুই হাত নাড়িয়া দিত, বুঝাইয়া দিত জানি না। বলিত, পর্টুগীজ পর্টুগীজ।

একদিবস আমার পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, ওই মেয়েটি অঞ্জনাপিসীর কন্যা। গভীর রাত্রিকাল তখন। আমি মায়ের নিকট ছোট একখানি খাটে শুইয়াছিলাম, মায়ের খাটে মা শয়ন করিয়াছিলেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, হঠাৎ মায়ের উচ্চকণ্ঠে আমি জাগিয়া উঠিলাম।

প্রথমেই শুনিলাম—ওই যে ফিরিঙ্গী মেয়েটা কোলে লইয়া গোয়ান ছোঁড়াটা আসে, বল, বল, বল সে-মেয়েটা কে? কার মেয়ে? তুমি উহাকে প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করিয়া দাও কিনা? বল?

বাবামহাশয় যেন একটা চাপা গর্জন করিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিও না। যাহা বলিবে আস্তে আস্তে বল। একটা কেলেঙ্কারী করিয়া লাভ হইবে না। দেবেশ্বর জাগিয়া উঠিবে।

বলিয়া তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন—দেবেশ্বর। দেবু। বাপি। আমি আগেই ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। আমি কোন সাড়া দিলাম না, অন্তরে নিদারুণ ভয় সঞ্চারিত হইল। আমি চুপচাপ পড়িয়া রহিলাম। যেন গাঢ় ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

তারপর পিসী যাহা সেদিন শুনিয়াছিলাম, তাহার অর্থ সম্যক অনুধাবন করিতে পারি নাই। কিন্তু কথাগুলি ভুলি নাই। জ্ঞান হইবার বোধশক্তি জন্মিবার পর তাহার অর্থ বুঝিলাম। বুঝিলাম—মা সেদিন ওই ভায়লাকে অঞ্জনার কন্যা বলিয়া জানিলেন। অঞ্জনার প্রতি পিতৃদেবের একটা গোপন লালসা বা অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি তাহা তাঁহার অন্তরে অন্তরে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং অঞ্জনাকে তাহার দরিদ্র বাউণ্ডুলে স্বামীর নিকট হইতে একরূপ ছিনাইয়া লইয়া নিজেদের কাছে কাছে রাখিয়াছিলেন। এতটা সহ্য করিতে পারে নাই অঞ্জনা। সে আলফান্সো পিড্রুজের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিল। এখন আলফান্সো খুন হইয়াছে। গোয়াতে অঞ্জনাদিদি থাকিতে পারে নাই। এবং শরীরেও রোগ ধরিয়াছিল; সেই কারণে বহু কষ্টেই ওই ভায়লা মেয়েটাকে লইয়া কোনমতে কলিকাতায় আসিয়া ফিরিঙ্গিপাড়ায় যেখানে গোয়ানীজরা থাকে, সেইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এবং এখানে আসিয়া বাবামহাশয়কে পত্র লিখিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। বাবামহাশয়

সপ্তাহে দশ টাকা হিসাবে বরাদ্দ করিয়াছেন, একসঙ্গে সমস্ত টাকা দেন না, তাহার কারণ একসঙ্গে সমস্ত টাকাটা হাতে পাইলে সবটাই খরচ করিয়া ফেলিবে।

বাবামহাশয় নিষ্ঠুরভাবে বলিলেন— হাঁ বাসিতাম। অঞ্জনাকে ভালবাসিতাম বলিয়াই তাহাকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলাম। তোমার নাম করিয়া তোমার নিকটই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার সহিত কোনপ্রকার গাঢ় সম্পর্ক হইতে দিই নাই, তাহা আমার নিষ্ঠুর চরিত্রবল। আমি অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। অত্যন্ত নিষ্ঠুর আমি। আমি আত্মহত্যা করিতে পারি। আমার আঙুল একটি একটি করিয়া ছেদন করিতে পারি। তাহার জন্যই করি নাই। নতুবা অঞ্জনাকে একখানা বাড়ীতে রক্ষিতা হিসাবে রাখিলে কে আমাকে বাধা দিতে পারিত! তোমার এস-ডি-ও সাহেবপিতারও ক্ষমতা ছিল না।

মা কিছু বলতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবামহাশয় বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, চুপ কর, চুপ কর। বৃথা আস্ফালন করিয়া কোন লাভ হইবে না। রত্নেশ্বর আইনকে লঙ্ঘন করিয়া চলে না। তোমার বাবা আইনের বাহিরে যাইতে পারেন না। তাহা ব্যতীত বাবার উপরে বাবার মত এস-ডি-ও'র উপর ম্যাজিস্ট্রেট, তাহার উপর কমিশনার, তাহার উপর লেফ্‌টন্যান্ট-গভর্নর আছেন ; এদিকে জজকোর্ট আছে, হাইকোর্ট আছে। ইহাদের দিয়াই আমি সহস্র সহস্র দুর্ধর্ষ প্রজাকে পদানত করিয়াছি। বৃদ্ধি লইয়াছি। তাহাদের পায়ের গোলাম করিয়া রাখিয়াছি। তোমার বাবার কাছেই শুনিয়াছি যে, সরকারী মহলে আমার যত সুনাম, তত দুর্নাম। তবুও তাঁহারা আমার প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন না। তেমনি ভাবেই অঞ্জনাকে—। থাক, কথাগুলো উচ্চারণ করিতেও ঘৃণাবোধ হইতেছে। নারীজাতি অতি ঈর্ষাপরায়ণ, অঞ্জনা মরণাপন্ন, তাহার ওই শিশু-কন্যাটি লইয়া নিরাশ্রয়, আমি তাহাকে সামান্য সাহায্য করি, তাহাও তোমার সহ্য হইতেছে না।

পিসী, কথাগুলো আমি কোনদিন ভুলিতে পারি নাই। ইহার পর একদিন সেই গোয়ানটার সঙ্গে চুপি চুপি অঞ্জনাপিসীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। অঞ্জনাপিসীকে চিনিতে খুব কষ্ট হয় নাই, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছিলাম। অঞ্জনাপিসী খুব আদর করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল—আঃ! কি কপাল, আর কি বিধান। দেবুর সঙ্গে ভায়লার বিবাহ হইবার উপায় নাই। হইলে কি ভালই না হইত।

পিসী, কথাগুলা সে-সময় বোধহয় তোমাকে বলিয়াছিলাম। যেবার অঞ্জনাপিসীর মৃত্যুর পর বাবামহাশয়ের ব্যবস্থায় ভায়লেট গোয়ানপাড়ায় পিড্রুজদের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল, পিড্রুজের সৎভগ্নী পরিচয়ে এবং তুমি তাহাকে প্রথম দেখিলে সেবার বোধহয় তোমাকে কথাগুলি বলিয়াছিলাম। তোমার হয়তো মনে নাই।

কিন্তু আমার ইহাই সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। আমি ভায়লেটকে ভালবাসিয়াছি। সে-ও আমার প্রতি আশ্চর্যরূপে অনুরক্ত। তাহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না, সে-ও আমাকে ছাড়িয়া বাঁচিবে না। ধর্মমতে বিবাহ না হইলেও, আমরা স্বামী-স্ত্রীই হইয়া গিয়াছি। এবং আশঙ্কা করিতেছি, কিছুদিনের মধ্যে এ-ঘটনা আর লোকচক্ষে অপ্রকাশ থাকিবে না।

তুমি তো বাবামহাশয়কে জান। এ-কথা তিনি জানিতে পারিলে হয় ভায়লেট মরিবে,

নয় আমাকে চরম অপমানে অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিবেন। তাহা আমি চাহি না। আমি ভায়লেটকে লইয়া চলিয়া গিয়া ক্রশ্চান হইয়া বিবাহ করিব। এবং দরিদ্র ভাবেই জীবন-যাপন আরম্ভ করিব। তবে আমার ভরসা আছে এই যে, যদি আমি কিছু টাকা একসঙ্গে সংগ্রহ করিতে পারি, তবে আমি তাহা হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উন্নতি করিতে পারিব। মাইকেল মধুসূদন মহাকবি হইয়াছিলেন। আমি হইব না কে বলিতে পারে?

তোমার হাতে টাকা আছে। তুমি তো টাকা পাইয়াছ। আমাকে কয়েক হাজার টাকা ধার দিতে পার পিসী! আমি শোধ দিব, নিশ্চয় শোধ দিব। আমাকে বিশ্বাস কর—আমাকে বিশ্বাস কর। আমাকে বাঁচাইতে পার তুমি, বাঁচাইবে? মায়ের গয়না আমি চুরি করিতে পারি—টাকাও চুরি করিতে পারি। কিন্তু তাহা আমি করিব না। তোমার ভাইপো চোর নয়।

সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভাবলে। পুরানো চিঠিখানার শেষের পাতাটার নীচের দিকটা উপরে ছিল বলে ময়লা একটু বেশী হয়েছিল। চিঠিখানার ওই অংশ থেকে চোখ তুলে বললে—এই অংশটা আমার খুব ভাল লাগে। দেবেশ্বর রায়কে এই অংশ থেকে স্পষ্ট চেনা যায় জানা যায়। কথাগুলো খুব দামী—সেই বয়সে দেবেশ্বর রায় কি করে যে লিখেছিলেন, তা বলতে পারব না। কথাগুলো শোন, শুনলেই বুঝতে পারবে।"

"পিসী আমার ভয় হইতেছে যে, তুমি আমাকে বুঝিবে না, বুঝিতে চাহিবে না। তুমি বাবামহাশয়ের সহোদরা হইলেই ভাল হইত। আশ্চর্য বোধ হয় এই যে, বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় দাদামহাশয়ের সন্তান পোষ্যপুত্র সূত্রে বীরেশ্বর রায়ের পুত্র হইয়া অবিকল তাঁহার স্বভাব কিরূপে পাইলেন? তুমি বাবামহাশয়ের অপেক্ষাও জেদী। এই বয়সে একটি সন্তান লইয়া জেদের বশে স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ হইতে নির্বাসন লইয়া কাশীতে বিমলাকান্ত দাদামহাশয়ের কাছে পালক-পিতার কাছে গিয়া সংসার পাতিয়াছ। পিতৃবংশের সহিত মামলা করিবে না—ইহা তোমার জেদ। জেদ করিয়া তুমি স্বামীকে ছাড়িয়াছ। তাহা ছাড়া সারা দেশের মেয়েরাই এমন যে, জাতের জন্য স্বামী তাহারা অনায়াসে ছাড়িতে পারে। স্বামী ক্রশ্চান কি মুসলমান হইল—স্ত্রী জাতের জন্য স্বামীকে ছাড়িল। পুরুষেও পারে। তাহাই করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের প্রথম পক্ষের স্ত্রী পদ্মাবতীর কি অপরাধ বল? জোরপূর্বক তাহাদের বাপ-মায়ের সহিত তাহাকেও মুসলমান হইতে হইল। তাহার জন্য নবকুমার পরিত্যাগ কেন করিবে। কিন্তু ইহাই এ-দেশে হয়। পিসী, ইহাই আমি পারি না। পারিব না। আমার কাছে জাতিধর্ম অপেক্ষাও প্রেম বড়। যাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহাকে ছাড়িতে পারিব না। তাহারই জন্য তোমার নিকট আমি সকাতরে আবেদন করিতেছি। পিসী, এই সাহায্যটুকু তুমি আমাকে কর। তোমার ভাইপো দেবু তোমাদের শিবঠাকুরের মত। সে প্রেমের জন্য প্রিয়তমার জন্য অঙ্গে ছাই মাখিয়া শ্মশানের পোড়াবাঁশ ও চ্যাটাইয়ে ঘর বাঁধিয়া, ভিক্ষা করিয়া থাকিতেও রাজী আছে। কিন্তু এত কষ্ট সহিবে না। অভ্যাস নাই। অভ্যাস করিতে গেলে অকালমৃত্যু ঘটিবে। পিসী, তাহা কি সহ্য করিতে পারিবে? তুমি আমাকে টাকা ধার দাও। আমি তাহা মূলধন করিয়া ব্যবসা করিব, ঘর বাঁধিব।

* * *

শেষের দিকটায় কাব্য একটু বেশী হয়েছে এবং রোমাণ্টিক হয়ে পড়েছেন। তা হোন, সেটা আমি ধরি নি, কারণ তখন দেবেশ্বরের বয়স সবে ষোল পার হয়ে সতেরোতে পড়েছে। গ্রামেই হাই ইংলিশ স্কুল ছিল, কিন্তু রায়বাহাদুর ছেলেকে জানবাজারের বাড়ীতে রেখে পড়াতেন। পড়তেন হিন্দু স্কুলে। তাঁর কাছে থাকত গোপাল পাল, ঠাকুরদাস পালের এ-পক্ষের বড় ছেলে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের বিয়ের ঠিক আগেই বা ঠিক পরেই তাঁরও বিয়ে হয়েছিল রঙলাল ঘোষের পিসীর সঙ্গে। সে-কথা আগেই বলেছি।

১৯৩৭ সাল থেকে আবার পিছিয়ে চল সুলতা। সময়টা ১৮৭৬ সাল। রত্নেশ্বর রায় শ্যামনগরে হাই-ইংলিশ স্কুল স্থাপন করলেন। ১৮৭৬ সালে রত্নেশ্বর রায় হাই-ইংলিশ স্কুল। বিমলাকান্ত তখনও বেঁচে ; তিনি বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—না রত্নেশ্বর, আমি আজও বর্তমান রয়েছি। আমার নামে নয়। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কেন ? তাতে কি হল ? এই তো কীর্তিহাটের স্কুলের এম-ই স্কুল বাবা থাকতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, নাম দেওয়া হয়েছিল বীরেশ্বর রায় এম-ই স্কুল। তারপর স্কুল এণ্ট্রান্স স্ট্যাণ্ডার্ড হল, তখন তার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে বীরেশ্বর রায় এম-ই এ্যাণ্ড রত্নেশ্বর রায় এচই-ই স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে। তাতে অন্যায় হয়েছে বলতে চান ? তাছাড়া কর্মের জন্য নিন্দাই বলুন আর প্রশংসাই বলুন, এ-প্রাপ্য হল তার যে সেই কর্ম করে। সে সমাজে বলুন, রাজদ্বারে বলুন, অথবা বিধাতার বিচারালয়েই বলুন। সালটা ওই ১৮৭৮।৭৯ সাল।

এসব কথাই চিঠি মারফৎ চলছিল সুলতা।

বিমলাকান্ত লিখেছিলেন—"তাহা হইলে এ স্কুল তোমার নামেই স্থাপিত হওয়া উচিত, আমার নামে নয়। অথবা শুধু গ্রামের নামেই নামকরণ হওয়া উচিত। শ্যামনগর হাই-ইংলিশ ইস্কুল। কারণ শ্যামনগরের জমিদারী স্বত্ব আমাদের বংশের বা আমার হইলেও ইহার আসল মালিক কীর্তিহাটের রায়বংশ। তাঁহাদের অর্থেই এ লাট আমার নামে ক্রয় করা হইয়াছিল। তৎপর তাহা পত্তনী লইয়াছেন কীর্তিহাটের রায় অর্থাৎ তুমি। এই লাটের বৃদ্ধি লইয়াই একদা দে-সরকারদের সহিত তোমার বিরোধ বাধিয়াছিল। তাহা হইতেই বহু ঘটনা ঘটিয়াছে। রবিনসন সাহেব আসিয়া কুঠী করিতে গিয়া মরিয়াছে। দে-সরকারেরা গিয়াছে। এখন জমিদারী আমার কিন্তু পত্তনীদার হিসাবে খাস দখল তোমার। তুমি এই লাটের মোট আদায় ৫৬০০ টাকার মধ্যে সরকারকে দেয় রাজস্ব ৪০০০ টাকা বাদে ১৬০০ টাকা আমাকে ঠাকুরের সেবায়েত হিসাবে লভ্য প্রদান করিয়া থাক। লাভ তোমাদের এস্টেটের কিছুই নাই আছে লোকসান। আদায় খরচা লোকসান লাগে। লাভ বলিতে শ্যামনগর রাধানগর এবং ঠাকুরপাড়া এবং পাইকপাড়া কয়েকটির খাস দখল বা অধিপতিত্ব। তুমি এই গ্রামের বৃদ্ধির জন্য একদা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলে—এবার শ্যামনগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়া সমুদয় মৌজায় ডৌল জমার উপর সিকি বৃদ্ধি দাবী করিয়াছ। অর্থাৎ ৫৬০০ টাকার সিকি ১৪০০ টাকা বৃদ্ধি হইবে। ইহার সহিত কিছু খাসদখলী জমি ইত্যাদিও দেওয়া হইবে। ইহা সবই রায় এস্টেটের দান। সুতরাং

ইহাতে কোনপ্রকার কীর্তি স্থাপনের গৌরব বা পুণ্যের দাবী শ্যামনগরের ভট্টাচার্য বংশের নাই। সুতরাং ইহা তোমার নামেই স্থাপন কর। আরও একটা শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করাইয়া দিই। "সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম।" তোমার গৌরবেই আমার গৌরব। পিতৃ-পুরুষের গৌরব।

প্রসঙ্গক্রমে লিখি যে ঠাকুরদাস আমাকে এ সম্পর্কে পত্র লিখিয়াছিল। শ্যামনগরে বৃদ্ধির প্রস্তাবে সে খুবই ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এবং তৎসঙ্গে আর ভদ্রজনেরাও আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, আমি যেন ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া এই বৃদ্ধি নিবারণ করি। কিন্তু আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া পত্রাদি লিখিয়াছি। এবং এই উচ্চ ইংরাজী বিত্যালয় স্থাপিত হইলে গ্রামের যে কি প্রকার উপকার হইবেক তাহাও বুঝাইয়াছি। তাহারা আমার পত্রের আর উত্তর দেন নাই কিন্তু জানিলাম কথাটা ঠিক তাহারা মানিতে চাহেন নাই। তোমাকে এই বৃদ্ধির জন্ম অনেক অর্থাদি ব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রায় দুইশত জোতের উপর বৃদ্ধির নালিশ চলিয়াছে হাই-কোর্ট পর্যন্ত। তাহাতে কৃতকার্য হইয়া তুমি মায়-খরচা ডিগ্রী পাইয়াছ। তাহাতে অবশ্যই আমি খুশী হইয়াছি। এ সম্পর্কে ঠাকুরদাস কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সে আমাকে এই লইয়া একখানা পত্র লিখিয়াছে। পত্রখানায় যে ক্ষোভ আছে তাহা নিশ্চয়ই আমি সমর্থন করিতেছি না। তুমি যেমন তাহার জোতের উপর বৃদ্ধি লইয়াছ তেমনি তাহাকে নিষ্কর দিয়াছ এবং যথেষ্ট করিয়াছ। কিন্তু তাহার একটা কথায় আমার খটকা লাগিয়াছে। আমি সন্দেহ করিতেছি যে, সে কোনরূপে আমার সহিত তোমার এবং ভবানী ভগ্নীর সহিত আমার সম্পর্কের কথা জানে বা জানিতে পারিয়াছে।"

রত্নেশ্বর রায় এ পত্রের কোন উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে ইস্কুলের নাম রেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায় হাই-ইংলিশ স্কুল। এবং ঠাকুরদাস পালের নাম আর কোন কিছুতে উল্লেখ পাই নি।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে চিঠিটার কথা উল্লেখ আছে। "আজ কাশী হইতে পত্র পাইলাম। পিসামহাশয় পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্র পড়িয়া ঠাকুরদাসকে বাজাইয়া দেখিব বলিয়া তাহাকে আনিতে লোক পাঠাইলাম। পিসামহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য হইলে তো ঠাকুরদাসকে—।"

আর কিছু লেখেন নি তিনি। তারপর লিখেছেন—"কথাটা সত্য মনে হইতেছে। ইদানীং ঠাকুরদাস আমাকে নির্জনে পাইলে শ্যামনগরের বৃদ্ধি লইয়া পূর্বের সম্পর্ক ধরিয়া নির্বোধ আমাকে দাদাঠাকুর সম্বোধন করে এবং আমার সহিত বাকযুদ্ধ করিতে সাহসী হয়। আমি সহ্য করি কিন্তু মাত্রা ছাড়াইবার উপক্রম করিলেই কিছু কঠোর কণ্ঠে 'ঠাকুরদাস' বলিয়া ডাকিলেই বা সজোরে গলাঝাড়া শব্দ করিলেই চুপ করিয়া যায়। আমি আঙুল দেখাইয়া বলি—যা বাহিরে যা। সাধারণ লোকের মগজে গোবর থাকে, তোর মগজে মহিষের বিষ্ঠা পোরা আছে। তর্ক করিস না, বাহিরে যা!

সে বাহিরে যায় কিন্তু বারান্দায় বা এমন কোন স্থানে বসিয়া যেন আপন মনেই বলে— "ঘি দিয়া ভাজ নিমের পাত—নিম না ছাড়েন আপন জাত!" অথচ তাহার উদ্দেশ্য কথাটা

আমাকে শোনানো।

যে সব মূর্খেরা ইস্কুলের উপকারিতা বুঝে না, শুধু খাজনা বৃদ্ধিটাকে অপমান বোধ করে, তাহাদের উন্নতিবিধান করিতে ভগবানেরও সাধ্য নাই। ইহারা ইংরাজকে দেখিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িবে। এ দেশী ইংরাজী জানা ব্যক্তিকে ইংরাজের সমকক্ষ ভাবিবে—অথচ নিজেরা কিছুতেই ইংরাজী শিখিবে না। বলিবে—কি বলিতেছেন মহাশয়, আমরা যদি ইংরাজীই শিখিব তবে চাষবাস করিবে কাহারা? আপনাদের ভৃত্যগিরি করিবে কাহারা? কিন্তু আশ্চর্য, প্রজা হিসাবে ইহাদের আর একটা চেহারা আছে। ঠাকুরদাস পালের ঘরে যখন জমিদারের দেওয়া আগুনে স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিয়াছিল, সে ছবি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।"

* * *

এরই মধ্যে ঘটনাটা ঘটল। চতুর্দশী ভায়লেটের প্রেমে পড়লেন দেবেশ্বর। কিন্তু দেবেশ্বরকে আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠাকুরদাসের দ্বিতীয়পক্ষের বড় ছেলে গোপাল।

রত্নেশ্বর রায় পত্র লিখে ঠাকুরদাসকে আসবার কথা জানালেন। কিন্তু সে এল না। রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"অন্য কেহ হইলে ঠাকুরদাস পাল বলিয়া কেহ আর শ্যামনগরে ইহার পর থাকিত না।

ইতিমধ্যেই পিক্রুজ আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে যে, গোপাল অঞ্জনার কন্যা ভায়লেটকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিতেছে। কতদিন হইতে ব্যাপারটা ঘটিয়াছে তাহা সঠিক বলিতে পারিল না, তবে কিছুদিন হইতে অর্থাৎ এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেবেশ্বরের সঙ্গে সে এখানে আসিয়া এইরূপ কাণ্ড শুরু করিয়াছে। সুতরাং পিক্রুজকে দিয়া অনায়াসে এই ঘটনা লইয়া ঠাকুরদাসের সঙ্গে ঝগড়া বাধিতে পারে। ঠাকুরদাসের সঙ্গে পিক্রুজদের একটা বিবাদ ইতিমধ্যেই জন্মিয়াছে। শ্যামনগরের বৃদ্ধি কোর্ট মারফৎ মামলার রায়ের বলে হইলেও আমাদের কাছারীতে পিক্রুজ এবং তাহার অনুচরেরাই মোতায়েন আছে। কিন্তু না, তাহা করিব না। তাহাতে অধর্ম হইবে। অধর্ম আমি করিব না। পূর্বের সে-সকল দিবস বিগত হইয়াছে, যে-কালে প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া চলিত। ইচ্ছামত গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করা চলিত, তাহাদের ঘরের বধূকন্যা জোরপূর্বক হরণ করা মাত্র একটা হুকুমের অপেক্ষা রাখিত। আজ নূতন কাল নূতন আলোক নূতন উত্তাপ অনুভব করিতেছি। দক্ষিণেশ্বর গিয়া আশ্চর্য মানুষ দেখিয়া আসিলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পূর্বে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের নিকট দীক্ষা লইয়াছি নহিলে এই মহাসাধকের নিকট দীক্ষা লইয়া ধন্য হইতাম। বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যেন একটা নূতন জোয়ার আসিতেছে। তাহা ছাড়া ভায়লেট অঞ্জনার কন্যা।

যাহা হউক দেবেশ্বরকে ডাকিয়া গোপাল সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিলাম। দেবেশ্বর নতমুখে দাঁড়াইয়া শুনিল এবং ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে সাবধান করিয়া দিবে। দেবেশ্বর আমার কুল-উজ্জ্বলকারী পুত্র। যেমন রূপে কন্দর্প কি কুমার কার্তিকের, তেমনি গুণে মেধায় অসাধারণ। বাল্যকালে আমার নিজের মেধা ও স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়া মনে করিতে সংকোচ নাই যে সে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল লজ্জাকর কথাগুলি সে শুনিল—মাথা

হেঁট করিয়াই শুনিল—ক্ষণে ক্ষণে সে লাল হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু আমার মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিল না। কোন প্রশ্ন করিল না। হাঁ, ইহাই তো আভিজাত্য। ইহাই তো শীলতা। কিন্তু আমি ভাবিতেছি হতভাগ্য গোপালের কথা।"

ভায়লেটকে রত্নেশ্বর রায় নেপথ্যে থেকে অঞ্জনার কন্যা হিসেবে মানুষ করছিলেন। শেষ জীবনটায় তিনি তাকে অর্থসাহায্য করেই কর্তব্য শেষ করেন নি, তার মৃত্যুকালে গোপনে তার বাড়ীতে গিয়ে ভায়লেটের ভার নিয়ে এসেছিলেন। ভার নিয়ে তাঁর সমস্যা দাঁড়িয়েছিল কি ভাবে ভায়লেটকে মানুষ করবেন? সেই গোয়ানীজ আধাপর্তুগীজটার মত? কিংবা অঞ্জনার মেয়ের মত? আলফানসো পিক্রুজের দেহের যা গড়ন গায়ের যা রঙ তাতে তাকে বারো আনা পর্তুগীজ বলা চলত। এবং তার যা চরিত্র তার যা পেশা তাতেও তাকে হারমাদদের খাঁটি বংশধর বলা যেত। কিন্তু অঞ্জনা বামুনের মেয়ে; সেকালে রত্নেশ্বর রায়ের মত জমিদারপুত্রের মুখে দু'চারটে সরস কথা শুনে আর তার নিজের প্রতি কয়েকটা তারিফ বাক্য শুনে বামনের চাঁদ ধরার সাধ জেগেছিল—নিজে গলে জল হয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রত্নেশ্বরের যে স্পর্শে সে গলতে পারত সে স্পর্শ পায় নি বলেই ক্ষোভের বশে চলে গিয়েছিল ওই দুঃসাহসী আলফানসো পিক্রুজের সঙ্গে। হয়তো সে সেদিন আরও ঘৃণ্য কাউকেও বরণ করতে পারত। কিন্তু তার মোহ বেশীদিন টেঁকে নি। এবং ভাগ্যক্রমে আলফানসোও তার হারমাদি ট্রাডিশনকে উজ্জ্বলতর করে খুন হয়ে তাকে রেহাই দিয়েছিল। অঞ্জনা আবার ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ফেরা আর সম্ভবপর ছিল না এবং উপায়ও ছিল না। একদিকে সমাজ ছিল কঠোর। আর অন্যদিকে তার নিজেরও ধরেছিল মৃত্যু-রোগ। মৃত্যু আসন্ন বুঝে সে রত্নেশ্বর রায়কে শেষ দেখা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। এবং তা সে পেয়েও ছিল। রত্নেশ্বর রায় ওই পিছন দিকের মেথরদের দরজা দিয়েই ময়লা কাপড়জামা প'রে নিঃশব্দে চোরের মত বেরিয়ে গিয়েছিলেন এই জানবাজারের বাড়ী থেকে। এবং গিয়ে উঠেছিলেন দেশী কৃশ্চানপাড়ায় ওই এলিয়ট রোডের আশেপাশে কোন একটা খোলার বাড়ীতে।

বিস্তৃত বিবরণ লেখেন নি রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে। সে লিখবার মত লোক তিনি ছিলেন না। কঠিন কাঠের মত লোক। কাঠ হলেও বলব রত্নেশ্বর রায় ছিলেন সেকালে চন্দন কাঠ। কিন্তু রক্তচন্দন। অত্যন্ত শক্ত। অনেক ঘষলে তবে রক্তরাঙা কাঠের রস বের হয়।

যাক। অঞ্জনার কাছে বাগ্‌দান করে এসেছিলেন—ভায়লেটকে তিনি এই কলকাতার বাড়ীতে যেন ফেলে না রাখেন। কোন মিশনে না দেন। যাতে ও একেবারে ফিরিঙ্গী কৃশ্চান না হয়ে যায়। অঞ্জনা বলেছিল—দেশে তো অনেক দেশী কৃশ্চান আছে—মুখুজ্জে বাঁড়ুজ্জে চাটুজ্জে—বামুন কৃশ্চান, কায়স্থ কৃশ্চান, বদ্যি কৃশ্চান আছে তো। তেমনি দেখে একটা বিয়ে দিলে আমি স্বস্তি পাব।

কথা দিয়ে এসেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু কাজটি করা খুব সহজ ছিল না সুলতা। তবু তিনি করেছিলেন যথাসাধ্য। হিলডার বাবা পিক্রুজের সঙ্গে আলফানসোর সম্পর্ক ছিল খুড়ো-ভাইপো। খুব নিকট সম্পর্ক, কিন্তু ওদের সমাজে তো সম্পর্কের মূল্য খুব বেশী নয়। তবে সেখানে রত্নেশ্বর রায়ের দাক্ষিণ্যে মূল্যটা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত বাস্তব; টাকা আনা

পাই। এবং কীর্তিহাটের গোয়ানপাড়ায় বাড়ী ঘর পর্যন্ত। এবং এই পিক্রুজই ভায়লাকে তার সৎবোন পরিচয় দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গোয়ানপাড়ায়। সেখানে কয়েকটা বছর কাটতে কাটতে ভায়লা যখন বারো-তেরো বছরের হয়ে উঠল, তখন রত্নেশ্বর রায় অকস্মাৎ একদিন মেয়েটাকে দেখলেন। দেখলেন কিশোরী ভায়লার চোখে একটু বিচিত্র দৃষ্টি ফুটছে। এবং গালে যেন একটা লালচে আভা দেখা দিয়েছে। গোয়ানপাড়ায় অন্য রঙ্গিণী মেয়েগুলোর সঙ্গে রঙ্গ ক'রেই ওই কাঁসাইয়ের দহে নেমে জল তোলপাড় ক'রে স্নান করছিল। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বিবি মহলের ছাদে। তামাটে রঙের মেয়েগুলোর মধ্যে উজ্জ্বলতমা কালো কুঞ্চিতকেশিণী ভায়লেটকে চিনতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে। এবার অঞ্জনার কাছে শেষ প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে, দেশী ক্রশ্চানের ঘর দেখে।

তাদের সমাজ স্বতন্ত্র, জীবনের ভঙ্গি স্বতন্ত্র। তারা ধর্মে ক্রশ্চান কিন্তু তারা ফিরিঙ্গী নয়। তারা ভারতীয় ক্রশ্চান। সেকালে বামুন ক্রশ্চান কায়স্থ ক্রশ্চানের সঙ্গে করণ কারণ করত না। করলেও তা খুব বেশী নয়—বিরল ছিল। ব্রাহ্মদের মধ্যেও তাই।

তবু অর্থের জোর এবং জেদী শক্তিশালী মানুষেরা সব পারে। তার সঙ্গে যদি বুদ্ধি এবং কৌশলের মাথা থাকে তবে লক্ষ্মী সরস্বতী শক্তি একসঙ্গে অঘটন ঘটাতে পারে সুলতা।

রত্নেশ্বর রায়ের তিনই ছিল।

শুধু রত্নেশ্বর রায় কেন গোটা বাংলাদেশে জমিদারদের দিকে তাকিয়ে দেখ, এই কালটা তাদের উজ্জ্বলতম জীবনাধ্যায়। মুঘল আমলের একেবারে মধ্যযুগীয় হালচাল বদলে গিয়ে নতুন হালচাল শুরু হয়েছে। যে হালচালের জন্য ইংরেজ সরকার একটু সচকিত হয়েছেন। সাত-আট বছরের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস জন্ম নেবে এইসব বিত্তসম্পত্তিশালী এবং ইংরিজী লেখাপড়া জানা লোকেদের নেতৃত্বে। বিবেকানন্দের পদধ্বনি নেপথ্যে তখন বাজছে। সুতরাং ইংরেজের চকিত না হয়ে উপায় ছিল না। তারা রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে যা করছে—করছে, তার সঙ্গে মিশন ইস্কুলগুলোও কাজ করে যাচ্ছে। শুধু ঈশ্বরের পুত্র জেসাস ক্রাইস্টের অনুগামী ভক্ত তৈরী করছে না, ক্রশ্চান ইংরেজ রাজ্যের খুঁটি তৈরী করবার কল্পনা করছে। রত্নেশ্বর রায় মেদিনীপুরের মেয়েদের মিশন ইস্কুলে ভায়লেটকে ভর্তি করবেন ভাবলেন। কিন্তু সেখানে ব্রাত্যদের, বিশেষ করে সাঁওতালদের ভিড় দেখে ওখান থেকে ফিরে এসে ভাবছিলেন কি করবেন?

সেদিনের তাঁর ডায়রীতে আছে—"পিক্রুজকে লইয়া ক্রশ্চান মিশন দেখিতে মেদিনীপুর শহরে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে দেখিলাম—যাহাদের ক্রশ্চান করিয়া পাদরী সাহেবরা লেখাপড়া শিখাইতেছে তাহাদের অধিকাংশই সাঁওতাল অথবা এদেশে যাহাদের আমরা চুয়ার বলিয়া থাকি তাহারাই। এখানে ভায়লেটকে দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাহাতে মহা অপরাধ হইবে। সুতরাং বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম ইহাদের যে একটি খড়ো গির্জা উহারা খাড়া করিয়াছে, সেইটিকে মেরামতাদি করাইয়া একজন আমাদের দেশী ক্রশ্চান পাদরীকে বেতন দিয়া লইয়া আসিব। সে পাদরীর কাজ করিবে এবং একটি পাঠশালাও

করিয়া দিব। সেখানে ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু পড়িবে। তাহার দ্বারাই ভায়লেটকে বিশেষ করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিব। এই পাদরী সাহেবকে দিয়া ভায়লেটকে adopted daughter করাইয়া জাতে উঠাইব।"

সব ব্যবস্থাই অত্যন্ত দ্রুত করে ফেলেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এবং প্রাথমিক ইস্কুলটির জন্যই তাঁর এতগুলি ইস্কুল—গোটা আষ্টেক মাইনর স্কুলে আংশিক সাহায্য, কীর্তিহাটে শ্যামনগরে দুটো এইচ ই ইস্কুল, কীর্তিহাটে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী করা সার্থক হ'ল। এই প্রাইমারী স্কুলটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেই বৎসরই তিনি হয়েছিলেন রায়বাহাদুর। সেটা ১৮৭৭ সাল। এবং সেই উপলক্ষেই রত্নেশ্বর রায়ের যুবরাজ দেবেশ্বর দেখলেন ভায়লেটকে।

দেবেশ্বরের বয়স তখন পনের বছর। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটে এসেছিলেন বাপের নির্দেশে। সঙ্গে এসেছিল গোপাল।

গোপাল ছিল দেবেশ্বরের সাথী অনুচর—মুখে বলতেন দাদা।

ঠাকুরদাস পাল তার দাদাঠাকুরকে ত্যাগ করেছিল। কমলাকান্ত রত্নেশ্বর হলেন, ঠাকুরদাস তাঁকে ছাড়ল। কিন্তু গোপাল দেবেশ্বরের সঙ্গে থাকল—তাতে আপত্তি করে নি। নিজেও দেবেশ্বরকে প্রাণের তুল্য ভালবাসত।

অনুষ্ঠানটা হয়েছিল সরস্বতী পুজোর সময়। সভায় গাঁদাফুলের মালা পরিয়েছিল ভায়লেট। ডায়াসে বসেছিলেন সস্ত্রীক ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট। নিচে দুপাশে দুখানা চেয়ারে সিমেট্রি রেখে বসেছিলেন পিতাপুত্র; একদিকে রত্নেশ্বর রায় অন্যদিকে দেবেশ্বর রায়। এবং তাঁদের সঙ্গে আরও অভ্যাগত সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। তাদের সঙ্গে ছিলেন নবনিযুক্ত বৃদ্ধ বাঙালী পাদরী সাহেব।

গাঁদাফুলের মালা বোঝাই ঝুড়ি নিয়ে পিরুজ যাচ্ছিল ভায়লেটের সঙ্গে, ভায়লেট তার নির্দেশমত মালা পরিয়ে দিচ্ছিল অতিথিদের গলায়। সবশেষে পালা এল দেবেশ্বরের—শেষ মালাটি ভায়লেট পরিয়ে দিলে দেবেশ্বরকে। সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ্বর হলেন শরাহত।

* * *

দেবেশ্বর রায় জীবনে ডায়রী রাখেন নি। জীবনে সেদিনের যে বিবরণটুকুর কথা বললাম সেটুকু দেবেশ্বর রায়ের কোন কিছু থেকে পাই নি। পেয়েছি তাঁর পিতা স্বনামধন্য কীর্তিহাট-সিংহ রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে। ভায়লেট যখন দেবেশ্বরের গলায় মালা পরায় তখন ভায়লেট নিজেই আড়াল ক'রে দেবেশ্বরকে ঢেকে রেখেছিল। এবং নিজে ভায়লেটও পিছন ফিরে ছিল রত্নেশ্বর রায়ের দিকে, নইলে নিশ্চয় তিনি দুজনের মুখ দেখে ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারতেন। হয়তো সেইদিনই ভায়লেট দেবেশ্বর রায়ের নাগালের অনেক বাইরে চলে যেতো।

চোখেও দেখেন নি কিছু, কানেও দেবেশ্বর সম্পর্কে কোন নিন্দার কথা শোনেন নি। তিনি যে কঠোর নিষ্ঠায় নিজেকে সংযমের শাসনে শাসিত রেখেছিলেন তা অঞ্জনার বিবরণেই স্পষ্ট, এ ছাড়াও মধ্যে মধ্যে তাঁর ডায়রীতে যে সব অকারণ আত্মনির্যাতনের বিবরণ পাওয়া

যায় তা পড়ে বিস্মিত হতে হয় এবং সে বিস্ময় একটা ভয়ে পরিণত হয় সুলতা, যখন জানতে পারি যে কোন নারীর প্রতি আকর্ষণকে নিঃশেষে মুছে ফেলবার জন্য নিজের অন্তরের কোমলতম অংশের একটুকরো পর্দা ঝামা দিয়ে অথবা উখা দিয়ে ঘষে তুলে দিতেন। তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এবং তার থেকে তিনি সম্পত্তি অর্জনের ব্যাপারে যে কত সুবিধা পেয়েছেন, তার হিসেবও রায়বাড়ীর জবানবন্দীর একটা বড় হিসেব। কিন্তু সে কথা থাক। দেবেশ্বর রায়ের কথা বলি।

দেবেশ্বর রায় ভায়লার দেওয়া মালা কণ্ঠে ধারণ করে শরাহত কুরঙ্গের মত লুটিয়ে পড়লেন। সভা থেকে ফিরে এসে শরীর ভাল নেই বলে শুলেন। ডাক্তার এসে দেখে গেল। বলে গেল সর্দি হয়েছে। বিশেষ কিছু না।

কিন্তু দেবেশ্বর রায়ের গোপালদা বুঝেছিল—তার রাজাভাইয়ের কি হয়েছে। গোপাল দেবেশ্বর থেকে মাস কয়েকের বড় কিন্তু এ সব বিষয়ে দেবেশ্বর থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। লেখাপড়ার পালাও সে তখন শেষ করেছে। প্রথমটা কীর্তিহাট এইচ ই স্কুলে দেবেশ্বর এবং সে দুজনেই পড়ত, অবশ্য দেবেশ্বর পড়ত উঁচু ক্লাসে; সে পড়ত নিচে। তারপর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতেই ছেলেকে কলকাতার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে রত্নেশ্বর রায় দেবেশ্বরকে কলকাতায় পাঠিয়ে গার্জেন টিউটারের তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। গোপাল কীর্তিহাটে ফেল ক'রে ক'রে চলে গেল শ্যামনগর। মধ্যে মধ্যে পালিয়ে এসে উঠত কলকাতায় জানবাজারের বাড়ীতে তার রাজাভাইয়ের প্রেমের টানে। কলকাতা দেখে বেড়াত। এ বিষয়ে ঠাকুরদাস খুব অসুখী ছিল না বা ছেলের উপর অসন্তুষ্ট ছিল না। তার যত কিছু ক্ষোভ অভিমান সব রত্নেশ্বর রায়ের উপর। দেবেশ্বর তার কাছে ছিল সোনার পুতুলের মত পরম প্রিয়। গোপালের চেয়েও সে বেশী ভালবাসত দেবেশ্বরকে।

দেবেশ্বর ছুটিতে কীর্তিহাট এলে সে এখানে একবার আসত। দেবেশ্বরকে দেখে সমাদর করে বাড়ী ফিরে যেত। রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেখা ইচ্ছে করেই করত না। হয়ে গেলে খুব খাতির করে প্রণাম করে চলে যেত। দাদাঠাকুর আর বলত না সে। হুজুরও তার জিভে আসত না। সে বলত—প্রভু।

বলত—প্রভুর শরীর-মেজাজ ভাল আছে? এবং নগদ একটি টাকা সেলামী দিয়ে প্রণাম করত। রত্নেশ্বর রায় গম্ভীরভাবেই জবাব দিতেন। তিনি অবশ্য 'তুই' বলেই কথা বলতেন এবং কাছারীতে রোকা দিতেন—ঠাকুরদাস পালের বিদায়-খরচ। সেটায় প্রতিবারই কাপড়-চাদরের ব্যবস্থা থাকত। ঠাকুরদাস অমান্য করে ফিরিয়ে দিত না, নিত, কিন্তু সে কাপড়-চাদর নিয়ে সে কীর্তিহাটের সীমানা পার হত না; কাউকে না কাউকে বিলিয়ে দিয়ে যেত।

গোপালকে বলত—আমার সোনাবাবার কাছে আছিস, আমি খুশি আছি। এখানে তো কিছু হল না। তা সোনাবাবার কাছে কলকাতায় থেকে চোখোল-মুখোল হ; কিছু-মিছু কর। বুঝলি। এখানকার চাষবাস আছে, সে কুলকম্ম তো এখনও একা আমাকেই কুলোয় না, তার মধ্যে তুই আর মাথা গলিয়ে করবি কি! ওখানে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি, বুঝলি।

* * *

বিরোধ বা মান-অভিমান সত্ত্বেও দুই পিতা যেমন পুত্রদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন, পুত্রেরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবেসেছিল এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। গোপাল তখন তরিবৎ করে দেবুভাইকে সিদ্ধির সরবৎ থেকে আরম্ভ করে বছর-খানেক-দেড়েকের মধ্যেই হুইস্কীর গেলাস সোডা মিশিয়ে যথাসময়ে যোগাতে শুরু করেছে। তখন একটা হুইস্কী ছিল O. H. M. S. অন হিজ ম্যাজেস্টিক সার্ভিস। তার বোতল কিনে এনে গোপাল নিজের বাক্সে পুরে রাখত। সকালবেলা থেকে গার্জেন টিউটরের কাছে দেবেশ্বর একরকম ছিলেন, স্কুলে ছিলেন আর একরকম; গার্জেন টিউটারের কাছে যা, তার সঙ্গে একটুখানি আমীরী চাল যোগ হত। রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সের ছবি আছে দেখেছ কিনা জানি না; জরির টুপী, আচকান, পায়জামা-পরা ছবি; সেটা তখন উঠি-উঠি করছে; তার জায়গায় কোঁচানো কাপড়, সিল্কের পাঞ্জাবি চলিত হচ্ছে। সেই পোশাক পরে দেবেশ্বর রায় কম্পাসের বগিগাড়ী অর্থাৎ একঘোড়া-টানা বগিগাড়ীতে স্কুলে যেতেন। বিকেল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আবার গার্জেন টিউটারের অধীনে দেবেশ্বর রায় শান্ত, বুদ্ধিমান, ধীর; স্কুলে ক্লাসের প্রথম দুজনের মধ্যে একজন। টিউটার ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করেন। দশটার পর দেবেশ্বরের ছুটি হয়। দেবেশ্বর কোন একটা রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে বার্ণিশ করা চটি টানতে টানতে উপরে এসে ঘরে বসে ডাকেন—গোপালদা রে।

—কি রাজাভাই!

—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে গোপালদা।

—আমি ঢেলে রেখে বসে আছি সেই কখন থেকে। নাও, খাও। বলে সোডা মেশানো হুইস্কীর গ্লাস তাঁর হাতে তুলে দেয়। তৃষ্ণার্তের মত সেটা শেষ করে দেবেশ্বর বলেন—আর একটু দে না গোপালদা।

—আরও খাবে? জানাজানি হলে তোমারও বিপদ আমারও বিপদ।

—তা ঠিক। কিন্তু আর একটুখানি। একটু। এই এতটুকু।

এই গোপালদা এবং এই তার রাজাভাই দেবেশ্বর রায়। ছিপছিপে পাতলা, লম্বায় তখনই প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি, সোনার বর্ণ রঙ, তার উপর নীলাভ শিরাগুলো যেন এই সৌন্দর্যের একটা বিচিত্র ইতিবৃত্ত লিখে রেখেছে—হাতের তালু, পায়ের তলা গাঢ় গোলাপী। সে নাকি দেখলেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। ঠাকুরদাস পাল ছেলেবেলায় তাঁকে দুই হাতে তুলে ধরে দোলাতো আর বলত—"ও আমার নদের ছবি, যে দেখবি সে পাগল হবি।"

সুলতা, আমার মেজদাদু আমাকে প্রথম দেখে বলেছিলেন, তাই তো ভাই, আমায় যে তুমি ধাঁধা ধরালে হে। আমার দাদা তোমার পিতামহ রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন, বাংলাদেশে এমন রূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছাড়া দেখি নি। দাদা আমার তাদের কাছেও ম্লান ছিলেন না।

সেই তরুণ কিশোর দেবেশ্বর রায় ভায়লাকে দেখে শরাহত হল। ভায়লার বয়স তখন তের পার হয়ে চৌদ্দয় পড়েছে। চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালা!

সভা থেকে ফিরে এসে সে শরীর খারাপ বলে শুয়ে পড়ল।

ডাক্তার দেখে বলে গেল—সীজন চেঞ্জের সময় সর্দি লেগেছে। ও কিছু না।

দেবেশ্বর চুপ করে শুয়েছিলেন, তাঁর বাসনা তখন উদ্দাম হয়ে ছুটেছে। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মত। ভায়লা—ভায়লা—ভায়লা। তার গালের গোলাপী রঙ, কালো চোখ, কোঁকড়ানো কালো চুল কিছুতেই সে ভুলতে পারছিল না।

এক সময় গোপাল এসে ঘরে ঢুকল। দেবেশ্বরের শিয়রের কাছে বসেছিলেন তাঁর মা। গোপাল তাঁকে বললে—আপনি জ্যাঠাইমা এখন যান, আমি বরং রাজাভাইয়ের কাছে বসি।

সরস্বতীঠাকরুণ প্রায় সন্ধ্যে থেকেই বসে আছেন। তিনি বললেন—তাই বস রে তুই। একটু বরং গল্পটল্প কর। তাতে হয়ত ভাল থাকবে। দেবু, আমি যাই, ওঁর খাওয়া-টাওয়াগুলো একবার দেখি।

দেবেশ্বরও তাই যেন খুঁজছিলেন। এ-কথা তিনি বলবেন কাকে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে এক গোপালদা ছাড়া তো কাউকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন—তাই যাও।

সরস্বতী বউরাণী চলে যেতেই গোপাল দরজায় পাল্লাদুটো ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে কাছে এসে খাটের বিছানার উপর কনুইদুটো রেখে ঝুঁকে পড়ে বললে—সায়েবদের জন্যে আনা এক বোতল স্যাম্পেন বাগিয়েছি রাজাভাই। কিন্তু কি হল বল তো?

বলতে লজ্জা পেয়েছিলেন দেবেশ্বর। গোপাল ঘাড় নেড়ে প্রশ্ন করেছিল—ওই ভায়লা?

দুই হাতে গোপালের গলা জড়িয়ে ধরে দেবেশ্বর বলেছিলে—ওকে নইলে আমি বাঁচব না গোপালদা। আমি মরে যাব।

গোপালদার পক্ষে কাজটা দুরূহ হয় নি। সেকালটায় অবশ্য ধনীর পক্ষে মুগ্ধা দরিদ্র-কন্যাকে আয়ত্ত করা কোন বড় অপমানের মধ্যেই গণ্য ছিল না, তবে বর্ণভেদে অর্থাৎ জাতের উঁচু-নীচু ভেদে একটু-আধটু তফাৎ হত। নিশ্চয়ই হত। কিন্তু এছাড়াও আর একটা চিরন্তন ধারা আছে প্রেমের পথে—সেটা হল সনাতন ধারা; যে-ধারায় রাজকন্যার জন্যে রাখাল-ছেলে পাগল হয়, আবার রাজপুত্রকে দেখে ভিক্ষুকের কন্যা লালায়িত হয়ে ওঠে। রাখাল-ছেলে রাজার মেয়েকে বড় পায় না সুলতা, তবে রাজার ছেলে কৌতুকবশে ভিক্ষুক-কন্যাকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। আবার প্রেমেও পড়ে। সে রাজকন্যেও পড়ে, ভিখিরীর মেয়েও পড়ে।

ভায়লাও প্রেমে পড়েছিল এবং সে-প্রেমও দর্শনমাত্র প্রেম। সুতরাং কাজটা দুরূহ হয় নি গোপালের পক্ষে। তবে গোপালই এটাকে সম্ভবপর করে তুলেছিল, নইলে সে-সাহস বা সে-বুদ্ধি দেবেশ্বর রায়ের ছিল না। তখনও ততখানি শক্ত হয়ে উঠতে পারেননি।

সেটা সহজ এবং সরল করে দিয়েছিল গোপালদা।

সুলতা, পল্লীগ্রাম সরল বটে। অচতুরও বটে। শহরের মত জটিল নয় এ-কথা নিশ্চয়, কিন্তু জীবনের বৃন্দাবনে জটিলা-কুটিলা-বৃন্দা সেখানেও আছে। আজও আছে। সেকালে আরও অনেক বেশী ছিল। যে-আমলের কথা বলছি, সে-আমলে ধনী জমিদারদের এবং

উচ্চবর্ণের এসব ক্ষেত্রে অন্যায় করবার একটা বে-আইনী আইন থানার দারোগাদের ঘুষ নেওয়ার মত জানাশোনা ভাবেই চলত ছিল। এতে মনে কেউ কিছু করত না। হয়তো ঘৃণা একটু করত, ঠাট্টা একটু-আধটু করত, বেশী হলে একটা সামাজিক আন্দোলন হত, তাতে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ব্রাহ্মণকে দিলেই মাপ হয়ে যেত। এবং গ্রামের যারা দুষ্ট দুর্দান্ত প্রকৃতির তাদের হয়তো কিঞ্চিৎ দিতে হত। এটা অবশ্য উচ্চবর্ণের সাধারণজনের পক্ষে। কিন্তু জমিদার বা ধনশক্তির অধিশ্বরের মান্য আলাদা। তাঁর লোকের সঙ্গে বা তাঁর বাড়ীর মুখে কোন রমণী যদি গভীর রাত্রে পথ ধরত, তবে এই দুষ্টেরা সুসম্ভ্রমে সরে যেত।

কীর্তিহাটে এটি কিন্তু ছিল না, রত্নেশ্বর রায়ের কঠিন শাসনে। তাঁর হুকুম ছিল চৌকিদার এবং নিজের বাড়ীর বরকন্দাজদের উপর এবং সাধারণ লোকের উপরও বটে যে, যদি এমন ঘটনার কোন সন্ধান কেউ পায় বা সন্দেহ করে, তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে জানায়। গ্রামের কয়েকটা ব্রাত্য স্বৈরিণী যুবতী যারা এই ধরনের পেশা এবং নেশায় একটু বেশী প্রমত্তা হয়েছে, তাদের তিনি অর্থব্যয় করে নবদ্বীপ পাঠিয়ে দিয়ে গ্রামকে পাপমুক্ত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরই গ্রামে, তাঁরই কিশোর কন্দর্পের মত দেবেশ্বর রায়ের সঙ্গে ভায়লেটের মিলনের ব্যবস্থা অনায়াসে করে ফেললে গোপাল। এতটুকু বেগ পেতে হল না। বিচিত্রভাবে সে সমস্ত সমস্যার সরল সহজ ব্যবধান করে দিলে।

খানিকটা ঘুরেফিরে এসে বললে—রাজাদাদা, বেশ একখানা ভাল করে প্রেমপত্র লিখে দাও। তা নইলে সে ভয় খাচ্ছে। আমি বলে পাঠিয়েছিলাম, মেয়েটা শুনে কেঁদেছে। কিন্তু তারপরই বলেছে, উঁহু, উ যদি মিছে করে বলে, বাবুর নাম করে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে—। বুঝেছ? তুমি রাজাদাদা, একখানা চিঠি লেখ। বেশ ভাল করে চিঠি লেখ। আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি। ভায়লা, তোমাকে নইলে আমার দুনিয়া অন্ধকার, আমার বুক হু-হু করছে। এইসব আর কি! তুমি তো লেখাপড়া জান ভাল, আমার মত তো নও। বাগিয়ে লেখ। বুঝেছ! তার আগে দাঁড়াও বোতলটা খুলি, খানিকটা স্যাম্পেন খেয়ে নাও। বুঝেছ। ব্রেন একবারে খুলে যাবে।

সুলতা তার মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে-দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং খানিকটা রুক্ষও বটে। সুদীর্ঘ রায়বংশের জবানবন্দী সে শুনছে দু'দিন ধরে, নির্বিকার ভাবেই শুনে আসছে। কখনও একটু হেসেছে, কখনও দৃষ্টিটা উদাস হয়েছে; কখনও মুখের রেখায় ক্রোধ ফুটে উঠেছে—কপালে কুঞ্চনরেখা জেগেছে এই পর্যন্ত। এই প্রথম তার দৃষ্টি বক্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তার থেকে খানিকটা ক্রোধের উত্তাপও অনুভব করা যায়।

সুরেশ্বর সেদিকে লক্ষ্য করে নি। সে বলেই চলেছিল সামনের দেওয়ালের ছবি-গুলোর দিকে চোখ রেখে। যে-ছবিখানার দিকে সে তাকিয়েছিল, সেখানা বন্দুক হাতে দেবেশ্বর রায়ের ছবি। কিন্তু চারদিকে প্যানেল করে অনেকগুলো ছোট ছোট ছবি আঁকা আছে। একটাতে একটা কুঞ্জের মত মনোরম পরিবেশের মধ্যে ভায়লেট এবং দেবেশ্বর পরস্পরে হাত ধরে মুগ্ধ ও মুগ্ধার মত তাকিয়ে আছেন। তারপর সুসজ্জিত ঘরে সোফার উপর দেবেশ্বরের কোলে মাথা রেখে ভায়লেট শুয়ে। আছে এবং মুগ্ধার মত তার দিকে

তাকিয়ে আছে। একটাতে দেবেশ্বর একমনে চিঠি লিখছেন। কিন্তু প্রত্যেক ছবিতেই গোপাল পাল উঁকি মারছে।

সুলতা সুরেশ্বরকে বাধা দিয়ে বলে উঠল—তুমি থাম সুরেশ্বর।

তার কণ্ঠস্বর শুনে এবার চমকে উঠল সুরেশ্বর, চকিত এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে সে সুলতার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্নের সুরেই বললে—কি হল সুলতা?

গম্ভীরভাবেই সুলতা বললে—তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, গোপাল ঘোষ আমার ঠাকুরদার কাকা, তাঁর সম্পর্কে যেভাবে উক্তি করছ, তাতে আমি ঠিক স্বস্তিবোধ করছি না। সেকাল হলে সহ্য হয়তো করতে হত, কিন্তু কাল অনেকটা বদলেছে। কি বলছ এসব তুমি?

কিছুক্ষণ সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—তোমার কথা শুনে ভারী ভাল লাগল, সুলতা। কথাটা আমার মনে ছিল—ভুলে আমি যাই নি। এবং তাঁর সম্পর্কে বানিয়েও কিছু বলি নি আমি। এ সমস্ত বৃত্তান্ত আমি চিঠিপত্রের মধ্য থেকে সংগ্রহ করেছি।

—চিঠিপত্র? এসব বৃত্তান্ত কে কাকে চিঠিতে লিখেছেন বা লিখতে পারেন সুরেশ্বর?

—তিনি দেবেশ্বর রায়, সুলতা।

—কাকে লিখেছিলেন তিনি এসব কথা?

—তাঁর পিতৃদেব, যিনি সাধারণের কাছে সিংহ ছিলেন, তাঁকেই লিখেছিলেন।

—তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন তিনি এইসব কথা?

—হ্যাঁ, সব কথা। তবে অবশ্যই লেখার ভঙ্গিটা একটু স্বতন্ত্র ছিল।

—এ আর কতটা স্বতন্ত্র হতে পারে, সুরেশ্বর?

—অনেক অনেক! সত্যকে যখন নির্ভয়ে কেউ প্রকাশ করে, তখন সেই সত্যই তাকে প্রকাশের ভাষা যুগিয়ে দেয়। এসব চিঠিপত্রের কতক ছিল অন্নপূর্ণা-মার কাছে যা তাঁকে লেখা, এবং কিছু ছিল বিমলাকান্তের কাছে, যা রত্নেশ্বর রায় পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে এবং কতক পেয়েছি এই অতিসঞ্চয়ী আশ্চর্যশৃঙ্খলা এবং সত্যবাদী রত্নেশ্বর রায়ের দপ্তর থেকে। তুমি পড়ে দেখতে পার। তবে যে-ক্ষেত্রে কথাটা তোমার গায়ে বা মনে আঘাত দিয়েছে, সে-ক্ষেত্রে বলার ভঙ্গীর দোষ আমারই হয়েছে। দেবেশ্বর রায় যা লিখেছিলেন, সেইখানটাই তোমাকে আগে শোনাই। তিনি লিখেছেন—"সেই সভাস্থলে ভায়লেট যখন আমার গলদেশে মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার গালদুটিতে রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় আনত হইল, আমার বক্ষাভ্যন্তরে যেন মৃদঙ্গধ্বনির মত ধ্বনি উঠিতেছিল, আমি কম্পিত হইতেছিলাম, সেও কম্পিত হইতেছিল। এবং তখন হইতেই মনে হইল এই ভায়লেটই আমার জন্মজন্মান্তরের স্ত্রী বা প্রিয়তমা; তাহাকে নহিলে আমি বাঁচিব না। তাই বাড়ী আসিয়া উদ্বিগ্ন-উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে অসুস্থের মত শয়ন করিয়া রহিলাম। কোন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। রায়বংশের উত্তরাধিকারিত্ব নহে, গোটা সংসারের আর কোন জন আমার কেহ নহে। শুধু ওই ভায়লেট। তাহার জন্য আমি সবই ত্যাগ করিতে পারি। ডাক্তার আমার শিয়রে গোপালদাকে বসাইয়া আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে গেলেন। গোপালদা এক বোতল স্যাম্পেন চুরি করিয়া সরাইয়াছিল সাহেবদের জন্য আনীত সামগ্রী হইতে; সে আমাকে

তাহাই খাওয়াইল। অন্য আর কোন কথাই গোপন করিব না, আমি বৎসরখানেক অবধি মদ্যপান করিতেছি। গোপালদা কখনওই কোন অন্যায় আমাকে শিক্ষা দেয় নাই। আমি প্রলুব্ধ হইয়া যে অন্যায় করিতে চাহিয়াছি, তাহাতে সে আমাকে আনন্দিত এবং খুশি করিতে প্রাণপণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে।

ভায়লেটের ক্ষেত্রেও তাই হইল, আমি স্যাম্পেন পান করিয়া সকল সংকোচ এবং সকল লজ্জা-সরম অতিক্রম করিয়া বলিলাম—গোপালদা, আমি ওই ভায়লেটকে ভালবাসিয়াছি। উহার জন্য আমার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে; আমার জীবন মিথ্যা মনে হইতেছে। উহাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না। আমি আত্মহত্যা করিব।

গোপালদা আমার জন্য সব করিতে পারে, প্রাণটাও দিতে পারে বলিয়া জানিতাম। সে তৎক্ষণাৎ বলিল—তাহার জন্য চিন্তা তুমি করিও না, আমি ইহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতেছি।

পরদিন সকাল হইতে সে বাহির হইল। এবং বেলা দ্বিপ্রহর সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"রাজাদাদা, তোমার পছন্দ আছে, তোমার চক্ষু আছে, তুমি সত্য সত্যই দেবেশ্বর। সে-কন্যাটি অপর গোয়ান-কন্যার মত নহে। এবং সে সত্য সত্যই তোমাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে। আমি একজন দূতীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। অর্থের কথায় অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়াছে। সে অর্থ চায় না। সে নিজেকে বিক্রয় করিবে না। একমাত্র ভালবাসার জন্য নিজেকে সমর্পণ করিবে। কিন্তু সন্দেহ করিতেছে যে, তোমার নাম করিয়া দূতী তাহাকে লইয়া গিয়া অন্য কাহাকেও সমর্পণ করিবে। অথবা তুমি তাহাকে উপভোগের কারণে লইয়া গিয়া কয়েকদিনের পর উচ্ছিষ্টের মত পরিত্যাগ করিবে। তাহা ছাড়া তুমি রাজা, তুমি ব্রাহ্মণ, সে কৃশ্চান গোয়ান, সে দরিদ্র ইত্যাদি। অতএব তুমি তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দাও। খুব ভাল করিয়া লেখ। লেখ, তুমি তাহাকে ভালবাস। তুমি তাহাকে জীবনে পরিত্যাগ করিবে না। দেখ জমিদার, ধনীর ছেলেদের কত রক্ষিতা ইত্যাদি থাকে; তোমার ঠাকুরদাদার সোফিয়া বাঈয়ের গল্প তো এখানকার সকল লোকে করে। তাহার কথা শুনিয়া ভায়লেটকে আমি আরও ভালবাসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের কথা মনে পড়িল। পত্র লিখিতে বসিয়া কয়েকখানা পত্রই ছিঁড়িলাম। মনোমত হইল না। গোপালদা সেই দ্বিপ্রহরেই আমাকে খানিকটা স্যাম্পেন খাওয়াইয়া বলিল—ঘরে বসিয়া লেখ। আমি বাহিরে পাহারা দিতেছি। কেহ আসিলে ঘরে ঢুকিতে দিব না। এই কর্তা বা গিন্নী-মা আসিলে তোমাকে শব্দ করিয়া ইসারা দিব, তুমি তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুইয়া পড়িবে, যেন ঘুমাইয়া গিয়াছ। আমি বলিব দেবু-ভাইয়ের মস্তক ধরিয়াছে।"

সুলতার মুখ প্রসন্ন হয়নি। সে অপ্রসন্ন মুখেই সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। সুরেশ্বর বললে—দেখ সুলতা, দেবেশ্বর এবং গোপাল ঘোষের সম্পর্কটা ছিল তাদের নিজস্ব সম্পর্ক এবং তাদের যে কাল সেই অনুযায়ী। আমরা তাদের উত্তরাধিকারী, আমাদের সম্পর্ক আমাদের মত। এখানে আমি জমিদারের ছেলে, একজন ইংরেজ সমর্থনকারী ইংরিজী কাগজের এডিটোরিয়েল স্টাফের অন্তর্ভুক্ত পাকা জার্নালিস্টের ছেলে—একসময় আমি বিদায় সত্যাগ্রহ বলে স্টেটসম্যানের চিঠির কলমে চিঠি লিখেছিলাম; আমার থেকে আজ তোমার মান বেশী, তুমি এম-এ

পাশ, কলেজের প্রফেসর, পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বর, তোমাদের পার্টি যদি আগামী ইলেকশনে জেতে, তবে তুমি হয়তো একজন মিনিস্টারও হবে। তখন তুমি যা-হয় করো। কিন্তু এখন আমার জবানবন্দীর এইখানের এইটুকুতে মুখভার করো না। গোপাল পাল, ঘোষ আমি বলছি নে স্থলতা, ইচ্ছে করেই না ; যা করেছিলেন আমার ঠাকুরদাদার জন্যে, তা অন্য কেউ করেনি বা করে না। সেই জাতের কড়াকড়ির কালে নিজের জাত আর এই দুর্ধর্ষ গোয়ানদের হাতে তার জীবন, সব তিনি বিপন্ন করেছিলেন দেবেশ্বর রায়ের জন্য। সে দেবেশ্বরও গোপন করেননি, আমিও করছিনে। অন্যায় কিছু বললে গায়ে তোমার লাগতে অবশ্যই পারে কিন্তু অন্যায় বাড়াবাড়ি করে লাভ কি? শচীন সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা নাটকে এক জায়গায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা ওয়াটসকে বলছেন—তোমার যা চরিত্র, তাতে তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার ওপর চড়িয়ে গোটা শহর ঘুরিয়ে বের করে দেওয়া উচিত দেশ থেকে। দেখ, নবাবীকালের অভিনয় হচ্ছে বলে এটা ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজও সহ্য করেছে। স্বাধীনতার পর অবশ্যই আমরা সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান—ভারতও জেগেছে, কিন্তু জেগেছে বলে এমন অসহিষ্ণু হয়ো না। আমি তোমাকে বলছি, হলপ করেই বলছি, যা বলব তাতে দেবেশ্বর রায় থেকে গোপাল পাল এবং তাঁর বাপ ঠাকুরদাস পালই বড় হয়ে গেছেন রায়বাবুদের চেয়ে। শুধু চুপ করে শোন।

* * *

দেবেশ্বর রায় পত্র লিখে দিয়েছিলেন গোপালদার হাতে। এবং পরের দিন দিনের বেলা বলেছিলেন—চল আমার সঙ্গে। বন্দুক নাও। শিকার করতে যাচ্ছ। বুঝেছ? ভায়লা আসবে ওই সিদ্ধেশ্বরীতলার জঙ্গলে। ওখানে তো গোয়ানটোয়ানরা কেউ আসে না। কারণ আছে। ওখানে একটা ভাঙা পড়ো বাড়ীর মত আছে, কে একজন তান্ত্রিক থাকত একজন যোগিনী নিয়ে। সেই বাড়ীটা আমি পরিষ্কারঝরিষ্কার করিয়ে রেখেছি ভায়লাকে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কবচ বলে একটা কবচ পাঠিয়ে দিয়েছি, বলেছি, এই কবচ পরলে কোন ভয় নাই। সে নিয়েছে কবচ, ঠিক আসবে।

সুরেশ্বর হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর ঘাড় নেড়ে হয় আক্ষেপ বা ব্যঙ্গ করে বললে—এ সেই শ্যামাকান্তের ভাঙা ঘর। যে ঘরে 'মনোহরা' যোগিনী বলে ব্রাত্য মেয়েটাকে নিয়ে সে বামাচারী সাধনা বা সাধনার নামে কদাচার ব্যভিচার যা বল তাই করেছিল। এ ঘরে লোকজন ঢুকত না। প্রথম ছিল একটা ছিটেবেড়ার ঘর, তারপর শ্যামাকান্তের পর সোমেশ্বর রায় কিছুদিন ওই মনোহরা মেয়েটাকে নিয়ে ওখানে যেতেন। তখন কাদা দিয়ে পাকা ইট গেঁথে একখানা ঘর তৈরী করিয়েছিলেন। এবং সাধনার শিমুল গাছটির তলাটাও সুন্দর ক'রে দিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় ঘরখানাকে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করেও পারেন নি। সোমেশ্বর রায়ের যে দলিল তাতে এই ঘর এবং সিদ্ধেশ্বরীতলা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিল। ভবানীর পরিচয় এবং শ্যামাকান্তের জীবনের বিচিত্র কথা জানার পর বীরেশ্বর রায় ওই শিমুলতলা এবং ওই ঘরখানাকে মেরামত করিয়ে শ্যামাকান্তের মৃত্যু দিনে পুজার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেও তিনি দলিলভুক্ত করে তার জন্য আথিক সংস্থান

ক'রে দিয়ে গেছেন। সে সংস্থান আজও বজায় আছে। কিন্তু কোন অনুষ্ঠান আজ আর হয় না। তার জন্য রায়বংশের কেউই চিন্তিত নয়। সিদ্ধেশ্বরীতলার সিদ্ধাসনের কোন গৌরব কোন পবিত্রতাই ছিল না। আমি সেখানে একটা কিছু করে এসেছি। সে যথাসময়ে বলব, সুলতা। এখন সেদিনের কথা শোন। সেই দিন সেই ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখিয়েছিলেন গোপাল পাল। সেই ঘরে তাঁর প্রাণের প্রিয় দেবুভাইয়ের প্রথম বাসরশয্যা হবে।

রত্নেশ্বর রায় সিদ্ধেশ্বরীতলার একটি সংস্কার করেছিলেন। তিনি একটা গণ্ডী এঁকে দিয়েছিলেন চারিদিকে, মধ্যে মধ্যে এক একটা পিল্‌পে গেঁথে দিয়ে বলে দিয়েছিলেন এর ভেতরে যেন কোন গোয়ান বা কোন ব্রাত্য প্রবেশ না ক'রে। এর বাইরে একটা জায়গা ছিল সেটা রত্নেশ্বর রায়ই তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে গোয়ানরা বা ব্রাত্যরা ইচ্ছে হলে পুজো বা মানত মানসিকের অর্ঘ্য দিতে পারে।

এই গণ্ডীর মধ্যে ভায়লেটকে আসতে রাজী করা সহজ কথা ছিল না। তার ব্যবস্থা সুকৌশলেই বল আর আপন বিশ্বাসমতই বল—করেছিলেন দেবেশ্বরের গোপালদা। প্রথম পাঠিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর কবচ। তাই গলায় ঝুলিয়ে প্রেমমুগ্ধা কিশোরী ভায়লেট—সে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই গণ্ডীর প্রান্তে। দেবেশ্বর অপরাহ্নের আগে থেকেই বন্দুক হাতে করে ওই সিদ্ধেশ্বরীতলার জঙ্গলের প্রান্তে প্রান্তে শিকারের ছল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিছেন। তারপর এক সময় ক্লান্তি অপনোদনের ছলে জুতো খুলে সিদ্ধেশ্বরীতলার গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে বসে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে জীবনের প্রথম প্রিয়া বা নারী যাই বল তার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। সূর্য তখন পাটে বসেছে, লগ্ন বলতে গোধূলি লগ্ন, সেই লগ্নে কম্পিত পদক্ষেপে অভিসারিকা ভায়লেট এসে দাঁড়িয়েছিল ওই সীমার প্রান্তভাগে।

দেবেশ্বরও কম্পিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরেছিলেন। দেবেশ্বর রায়ের গোপালদা দিয়েছিলেন নববিধান। দু'গাছা ফুলের মালা—ওই গাঁদাফুলেরই মালা গেঁথে এনেছিলেন এবং বলেছিলেন— নাও মালাবদল ক'রে বিয়ে ক'রে নাও। আর এই সিদ্ধেশ্বরী মায়ের সিঁদুর ওর সিঁথিতে ছুঁইয়ে দাও। আর ভায়লেটকে বলেছিলেন—তুমি মনে মনে বল—বিয়ে ক'রে আমি হিন্দু হলাম—বল!

বিচিত্র ভাগ্যের বিধান নয়, সুলতা? অন্ততঃ আমার কাছে তাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শ্যামাকান্তের কর্মফলের চক্রান্ত এই সিদ্ধগণের পাশে ওই বিকৃত আচারে ধর্মের নাম ক'রে ব্যভিচারের জন্য সোমেশ্বর রায়ের তৈরী করা ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদারসন্তান এবং কৃশ্চান মেয়ে ভায়লা ওইভাবে ধর্মের নাম ক'রেই সমাজ লোকাচার ধর্ম সব কিছুকে লঙ্ঘন করে প্রথম মিলিত হয়েছিল!

—না-না-না। বাধা এখন দিয়ো না। তুমি যা বলবে তা আমি জানি এবং তা আমি মানি। তোমার থেকেও হয়তো আরও বেশী উদার আমি, সুলতা। তোমরা রাজনৈতিক কর্মী, সংসারে লোকেদের সামনে নিজেকে তোমাদের শুদ্ধ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন চরিত্রবান মানুষ বলে প্রমাণিত করতে হয়। আমি মানি লোকাচার সমাজ ধর্ম এসব থেকেও হৃদয়ের

অকৃত্রিম আকর্ষণ মিলনের আকৃতি অনেক বড়। অনেক বড়। রামী চণ্ডীদাসের মত ভাঙতে পারলে তা স্বর্গীয় হয়। ভাঙেও অনেকে। ভেঙে হয়তো সমাজে থেকে নির্বাসিত হয়ে লোকের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে ধর্মের ধ্বজাধারীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে পথের পাশে প'ড়ে মরে। অনেক সময় পুরুষ অত্যাচার সইতে না পেরে একদিন নারীটিকে পথে ফেলে দিয়ে দাঁতে কুটো ক'রে ফিরে আসে ঘরে। সমাজ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে ফিরিয়ে নেয় কিন্তু মেয়েটাকে চলে যেতে হয় হারিয়ে, কোথায় কেউ খোঁজ রাখে না। হয়তো দেহটাকে সম্বল ক'রে পথে নেমে যতদিন দেহটা থাকে ততদিন কোন রকমে খায় দায়, মদ খেয়ে পাগলের মত হাসে দেহব্যবসায়িনীর জীবনযাপন ক'রে। তারপর একদিন মরে এবং সেদিন তারই মত জনকয়েক ভাগ্যহতা হতভাগিনী হরিধ্বনি দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যায় শ্মশানে, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আসে। মুসলমান বা কৃশ্চান হলে কবরে যায়। তবে মুসলমান এবং কৃশ্চান ধর্মের এখানে নারীর পক্ষে একটা উদারতা আছে, যে উদারতাকে আমি শ্রদ্ধা করি প্রশংসা করি, তার কাছে মাথা নোয়াই। মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যই নীতি তৈরী করেছে ধর্ম, আত্মাকে ধ্বংস করবার জন্য, মানুষকে হত্যা করবার জন্য নীতি তৈরী হয় নি। এমন নীতি দুর্নীতি, চণ্ডনীতি জীবনে ধ্বংসনীতি।

*　　　*　　　*

—এক গ্লাস জল!

—তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ সুরেশ্বর। বলে সুলতা ডাকলে—রঘু—রঘু! তোমার বাবুর জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে এস।

সুরেশ্বর তার মাথার লম্বা চুলগুলো পিছন দিকে ঠেলে আঙুল চালাতে চালাতে বললে—তা হয়েছি সুলতা। তুমি আঘাত দিয়েছ আমাকে। হয়তো তুমি বলবে—আঘাত তুমিই আমাকে আগে দিয়েছ, তা হলে বলব—না-না-না। তা দিই নি। নিজে ইচ্ছে করে তুমি নিজের মনে নিজে আঘাত করে আমার নামে অপবাদ দিচ্ছ।

জল নিয়ে এসে যে দাঁড়াল সে রঘু নয়, সে অর্চনা।

—অর্চনা! তুই এখনও জেগে রয়েছিস?

—রয়েছি। পাশের ঘরেই ছিলাম। ওই কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীটা পড়ছিলাম। আর তোমাদের কথাও শুনছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবছিলাম, শত দুঃখকষ্ট নানান অভাব নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও ভাঙা বাড়ীতে বাস করত রায়েরা, বাঙলাদেশের জমিদারেরা—তারা কি সবাই তোমার মত এমনি করে পাগল হয়ে গেল? না ফাঁসির আসামীর মত রাত্রি জেগে সেলের মধ্যে বসে আছে!

গ্লাসের জলটা নিঃশেষে পান ক'রে সুরেশ্বর বললে—কে কি করছে তা জানিনে, তবে এইটুকু বলতে পারি যে অধিকাংশ জমিদারই তো আজ দেউলে এবং আজ তারা সবাই প্রায় এ অচলায়তন ভেঙে বেরুতে চায়। অনেক আগেই অনেকজনে এ থেকে বেরিয়ে এসে জীবন-সমুদ্রে নতুন স্টীমলঞ্চ ভাসিয়ে জমিদারী বজরাটাকে গাধাবোটের মত পিছনে বেঁধে দিয়েছেন। আজ যদি শান্তির ব্যাঘাত ঘটে থাকে তবে এঁদেরই ঘরে। নইলে পাড়াগাঁয়ের ছোটখাটো

অসংখ্য জমিদার নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাচ্ছে। তারা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে মুক্ত আলো হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাঁচবে। কিন্তু সে সব কথা থাক। যা বলছিলাম তাই বলি। তুই কি এখানে বসবি অর্চি, না—

—বসলে আপত্তি কি অসুবিধে হবে না তোমাদের ?

—আমার হবে না। আমার যখন হবে না তখন সুলতারও হবে না। কারণ বাধবার কথা সংকোচ হবার কথা যে বলে যে কনফেসার তার। যে শোনে তার নয়।

তারপর সে সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—সুলতা ?

হেসে সুলতা বললে—আমি অনেকক্ষণ আগেই অর্চনাকে বলেছিলাম—আপনিও এসে বসুন না! প্রথম রান্না করতে গেলেন। তারপর—

চুপ ক'রে গেল সুলতা ; মনে পড়ে গেল খেতে বসে কথাপ্রসঙ্গে যে অপ্রিয় কথা উঠে খাওয়ার আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছিল সেই কথাটা।

আবার শুরু করলে সুরেশ্বর, বললে—রায়বংশের অপরাধ আমি খুঁজে খুঁজে জমা করে পাহাড় করেছি। তার মধ্যে জমিদার হিসেবে নালিশ মকদ্দমা সত্য মিথ্যা অনেক ক'রেছি। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর অঙ্ক কষে প্রজাকে ঘায়েল করতেন। জোতদার যখন বড় হয়ে উঠেছে সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তখন তাকে ডেকে সমাদর ক'রেছেন, প্রয়োজনমত আরও বড় এবং সম্পন্নতর হবার জন্য ঋণ দিয়েছেন। খাজনা বাকী ফেলেছেন এবং পরে সব জমে যখন পাহাড় হয়েছে তখন নালিশ ক'রে তার বুকে পাহাড় চাপিয়ে তাকে শেষ করে দিয়েছেন। আবার উল্টোও হয়েছে, যারা ঋণ নেয় নি তাদের কোথায় কার কাছে ঋণ আছে খোঁজ ক'রে হ্যাণ্ডনোট তমসুদ কিনে নালিশ করেছেন। জিতেছেন সর্বত্র তা নয় ; বহু ক্ষেত্রেই হেরেছেন। কিন্তু হেরেও তো তিনি হারতেন না, মুনসেফ কোর্টে হেরে সবজজ কোর্ট জজ কোর্ট সেখান থেকে হাইকোর্টে আপীল করতে করতে এগিয়ে চলেছেন, পিছনে পিছনে প্রজাকে হাঁটতে হয় বাধ্য হয়ে। ক্লান্ত পদক্ষেপে নিঃস্ব এবং রিক্ত অবস্থায় হয়তো হাইকোর্ট থেকেও জয়ধ্বজা বয়ে বাড়ী আসতে আসতে ভেঙে পড়ে গেছে। এমন অনেক অনেক আছে। এদের দেনা শোধ করা আজ আর রায়বংশের কারুর পক্ষে সম্ভবপর নয়। সর্বস্বান্ত হয়েও নয়।

কিন্তু রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর থেকে দেবেশ্বর রায় পর্যন্ত সারাজীবন অবনত মস্তকে ঠাকুরদাস পাল আর গোপালদাস পালের ঋণ ভালবাসা স্বীকার ক'রে গেছেন। আমি তাও জানি এবং তোমার সঙ্গে গোপালদাস ঘোষের সম্পর্কও জানি, সে মনে রেখেই আমার মন্তব্য করে রেখেছি। আজ যদি গোপালদাস ঘোষ এসে আবির্ভূত হন এখানে তবে তোমার কথার প্রতিবাদ করেই বলবেন—তুই জানিস নে সুলতা, দেবু রাজাভাই আমার কি ছিল আর আমি তার কি ছিলাম, সে আমার জন্যে কি ক'রেছে তা তুই জানিস নে। আর দেবু রাজাভাই যে কি মানুষ ছিল তাও তুই জানিস নে। তুই চুপ কর।

সুলতা হেসে বললে—বেশ, তাই মেনে নিলাম। বল তোমার কথা।

—হ্যাঁ দেবেশ্বর রায়, ষোল বছরের দেবেশ্বর রায় বিচিত্রভাবে এই শ্যামাকান্তের সিদ্ধাসনে

সিদ্ধেশ্বরীতলায় যেখানে তিনি তাঁর জীবনের অভিশপ্ত নারীসাধনা আরম্ভ করেছিলেন, সেই-খানেই পাতলেন জীবনের প্রথম বাসর। মিলিত হলেন প্রথম এক কৃশ্চান কুমারীর সঙ্গে। কৃশ্চান কুমারী অঞ্জনার কন্যা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর অঞ্জনার প্রতি তাঁর গোপন প্রেমের ঋণশোধের অভিপ্রায়ে ক'দিন আগে চার্চের সংস্কার করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন তাকে শিক্ষিত করে তুলবেন বলে! একটি কুমার এবং কুমারীর সে বাসরসন্ধ্যার কথা উহ্য থাক। তা কল্পনা করবারও আমার অধিকার নেই। দেবেশ্বর রায় যে পত্রে এসব কথা নির্ভয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর বাঘের মত বাপকে খুলে লিখেছেন তাতে শুধু ওই কথাটুকুই আছে।

"সেদিন সন্ধ্যায় গোপালদার ব্যবস্থায় আমরা উভয়ে ওই গৃহের মধ্যে মিলিত হইলাম। এবং ইহার পর অসুখের অজুহাতে যে কয়েকদিনই ওখানে থাকিয়াছি—নিত্যই নিয়মিতভাবে মিলিত হইতাম। গোপালদাদার ব্যবস্থা মত সময়টা পরিবর্তিত হইত, কোনদিন সন্ধ্যায়, কোন দ্বিপ্রহরে—কোনদিন বা গভীর রাত্রে সেখানে যাইতাম। ভায়লেটও আসিত। আমরা সর্বপ্রকারে পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া গভীর ভালবাসায় আবদ্ধ হইলাম।"

* * *

ষোল বছরের এক ধনীপুত্র এবং এক চতুর্দশী কৃশ্চান কন্যা। অর্ধশ্বেতাঙ্গিনী দরিদ্র অসহায় অনাথ। অবস্থাবৈগুণ্যে বাংলাদেশের পল্লীতে প্রায় দেশীয় কৃশ্চানদের সঙ্গে বাস করে। কথাটা গোপন ছিল না—থাকবার কথা নয়। কিন্তু দেবেশ্বরের গোপালদা দেবেশ্বরকে এমন ভাবে নিজের আড়ালে ঢেকে রেখেছিলেন যে, যে কানাঘুষোই উঠেছিল ক'দিনে সেটার মধ্যে দেবেশ্বরকে কেউ ধরাছোঁয়ার মধ্যে পায় নি, পেয়েছিল গোপালকেই। কিন্তু গোপালদাসকেও রত্নেশ্বর রায় কম ভালবাসতেন না। তাঁর কাছে সে কম প্রশ্রয় পেতো না।

দেবেশ্বরের সে সঙ্গী ছিল, যা দেবেশ্বর খেয়েছে সেও তাই খেয়েছে, পরার কথাটা ঠিক বলতে পারব না, তবে গোপালদাস সে আমলে যে কাপড়জামা পরেছে তা অন্তত ঠাকুরদাস পালের যোগাবার সাধ্য ছিল না। ঠাকুরদাস রত্নেশ্বর রায়ের ছেলেবেলার আদরে 'ঠাকুরা' তাঁর প্রাণরক্ষাকর্তার ছেলে সে ; তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে তাঁর বিবাহের সঙ্গে, তাকে তিনি ভালবাসতেন কিন্তু তাঁর সৎকর্মে বিরুদ্ধাচরণের জন্য তিনি তার উপর বিরূপ হয়েছিলেন। ঠাকুরদাসের 'ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত—নিম না ছাড়েন আপন জাত' এই কটু-কথা তাঁর কানে গিয়েছে, তিনি সহ্য করেছেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে আসে নি তাও তিনি কিছু বলেন নি। মনের ক্ষোভ মনেই চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু তার জন্য গোপালের উপর বিরূপ কোন দিন হন নি তিনি। তার পরিচয় রায়বংশের জমাখরচের খাতার মধ্যে আছে। চিঠিপত্রের মধ্যেও আছে।

বিরূপ হলেন এইবার। পিক্রু এসে জানালে গোপালদাস তাদের পাড়ায় ঘোরাফেরা করে, তার ভাবভঙ্গি দেখে লোকে তার সঙ্গে ভায়লেটের নাম জড়িয়ে পাঁচ কথা বলছে। ভায়লেট পিক্রুজের নিজের কেউ নয়, তবু সে তার সম্পর্কিত কাকা আলফানসোর মেয়ে, তার উপর খোদ রায়হুজুর তার ভার নিয়েছেন তার জন্য এত করছেন। পাদরী সাহেব এনে ইস্কুল বসিয়ে দিলেন, তার পিছনে গোপাল লেগেছে এ নালিশ সে জানিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা নিয়ে ভাবছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু খুব বেশী কিছু একটা করেন নি, শুধু কলকাতার নায়েবকে লিখে দিয়েছিলেন—"গোপালের উপর কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাহার স্বভাবচরিত্র মন্দ হইতেছে কিনা এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। এবং তাহাকে বলিবেন—এখানে তাহার নামে কিছু মন্দ কথা লোকে আমার নিকট বলিয়াছে। আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই। তবে তাহার সাবধান হওয়া উচিত বলিয়াই আমি তাহাকে নির্দেশ দিতেছি।"

এদিকে নবীন দুটি প্রাণ পরস্পরের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এত ব্যাকুল যে অদর্শন আর সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু ভায়লেটের করবার কিছু ছিল না। কি করবে সে? সে কাঁদত।

*　　　　*　　　　*

কলকাতায় দেবেশ্বর রায় কীর্তিহাটের রাজাবাবুর যুবরাজ। বাইরে শান্ত প্রসন্ন কিন্তু জীবনে ক্ষুরের মত ধার, শাণিত তরবারির মত আস্ফালন এবং শক্তি, তিনি সহ্য করবেন কেন?

তিনি একদিন গোপালদাসকে ডেকে বললেন—গোপালদা, তুই হয় ভায়লেটকে এনে দে, নয় বিষ এনে দে। গোপালদা, আমি খেয়ে মরব। আমি ভায়লেটকে ছাড়া থাকতে পারছি না। পারব না।

গোপালদা সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—তার জন্যে কি হয়েছে, দেবু আমার রাজাভাই। এনে আমি তাকে এখুনি দিতে পারি। কাল বল কাল যাব, তিন দিন—তিনদিনের মধ্যে ভায়লা-বউরাণীকে এনে দেব। সে নিশ্চয় আসবে। বলামাত্র আসবে আমি জানি। কিন্তু এখানে এনে রাখবে কোথায় বল? একটা বন্দোবস্ত কর আগে। এ-বাড়ীতে তো রাখা যাবে না, রাজাভাই। এখুনি খবর যাবে দপ্তর থেকে—এখানকার এই আমলা বেটারা বড় বজ্জাত। আমাকে সেদিন খাজাঞ্চী বললে—আমি দশটা টাকা চাইতে গিয়েছিলাম, তোমার রোকা নিয়ে, বললে—দেবুবাবুকে বলগে কিসের জন্য টাকা চাই লিখে দিতে হবে। আর তুমি এমন করে দেবুবাবুর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা গায়ে গা লাগিয়ে ঘুরো না। কর্তা চিঠি দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

ষোল বছরের জমিদার-পুত্র—বুদ্ধিতে, সাহসে অসাধারণ ছিলেন দেবেশ্বর। পরবর্তীকালে তার প্রমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপে রেখে গেছেন এবং যে সময়ের কথা বলছি, তার ক'মাস পরেই পিতাপুত্রে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, যে-পত্রের মধ্যে এই সমস্ত কথা তিনি খুলে লিখেছেন নির্ভয়ে, তাই তার প্রমাণ। তবুও প্রথমটা গোপালদার প্রশ্নটা দমিয়ে দিয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে।

ভায়লেটকে তাঁর ভায়লাকে এনে রাখবেন কোথায়? রাখতে হলে বাড়ী চাই, সুন্দর বাড়ী, খাট চাই, পালঙ্ক চাই, আয়না চাই, আসবাব চাই; ভায়লার জন্য পোশাক চাই, পরিচ্ছদ চাই, তার কাছে কাজ করবার জন্য লোক চাই, জন চাই; তাকে সাজাবার জন্য অলঙ্কার চাই—অনেক কিছু চাই।

সামনে তখন তাঁর পরীক্ষা। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। সেই দারুণ চাঞ্চল্যের মধ্যেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরীক্ষার পরই এই চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁর বাল্যসঙ্গিনী পিসী অন্নপূর্ণা দেবীকে। তখন তিনি কাশীতে।

অন্নপূর্ণা দেবী সে-চিঠি পেয়ে ভাইপোকে চিঠির উত্তর দেন নি; একটি লাল-টুকটুকে কনে খুঁজতে শুরু করেছিলেন কাশী অঞ্চলেই। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা অঞ্চলে তখন বাঙালীরা দলে দলে বাস করেছেন এবং ওসব অঞ্চলে ওঁরাই হয়েছেন প্রধান এবং সরকারী অনুগ্রহে প্রবল। ডাক্তার বাঙালী, উকিল বাঙালী, ডেপুটি বাঙালী, সাব-ডেপুটি বাঙালী। বাঙালীরা তখন আই-সি-এস হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর সুরেন বাঁড়ুজ্জে, রমেশ দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত পাশ করে এসেছেন। বাঙালী তখন ভারতবর্ষে দিগ্বিজয় করছে ইংরিজী বিদ্যে আর ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের অনেকজন প্রদেশান্তরে নতুন বটগাছের মত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। কাশীতেই কি বাঙালী তখন কম? কাশী আর বৃন্দাবন —এ-দুটি তীর্থই তো বাঙালীর তীর্থ। কাশীর 'বাংগালী' টোলাকে ভয় এবং খাতির কাশী-ধামের পাণ্ডারাও না করে পারত না। বৃন্দাবনে বাঙালীর খাতির আরও বেশী।

বিশেষ করে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরকে যে খাতির ইংরেজ সরকার দেখিয়েছিল, তা দেখে সারা ভারতবর্ষ চমকে গেছল। রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভ সাহেবের দেওয়ান। তাঁর পোষ্যপুত্রের ছেলে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর—তিনি ইংরেজের অনুগত ছিলেন কিন্তু তাদের অযথা আনুগত্য দেখান নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং কীর্তির জন্যে ইংরেজ সরকার তাঁকে কে-সি-আই-ই খেতাব দিয়েছিল। তখন তিনি বৃন্দাবনবাসী। গৃহত্যাগ করে চলে এসেছেন বৃন্দাবন। খেতাব নিতে তিনি গেলেন না কলকাতা লাটহেবের দরবারে। লিখলেন—আমি হিন্দু, আমি বানপ্রস্থ নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছি, এখান থেকে আর আমার কলকাতা ফেরার উপায় নেই। তাতে আমাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।

শেষ পর্যন্ত আগ্রায় স্পেশাল দরবার করে লাটসাহেব তাঁকে খেতাব দিয়েছিলেন। আগ্রা নাকি বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথম বন—'অগ্রবন'। সেখানে পর্যন্ত এসেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর।

* * *

—কোথেকে কোথায় যাচ্ছ, সুরেশ্বর। বাঙালীর সেকালের মহিমা আমার জানা আছে। তুমি তোমার দেবেশ্বর রায়ের কথা বল।

হেসে সুরেশ্বর বললে—জানা আছে তা জেনেও আমার সন্দেহ হয় সুলতা, জানাটা বেশ মনে মনে তলিয়ে বিচার করে জানা তো! আজকে যারাই স্বাধীন দেশে পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে আছে, তারা সবাই তোমরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা সে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা সেধে আসছে, কোন অনুগ্রহ নেয় নি বা নাও নি। বাড়ীতে কেউ লাঠিতে তেল মাখিয়ে, কেউ গাদা-বন্দুক নিয়ে ইংরেজ তাড়াবার কল্পনা করেছ। আমরা যারা জমিদার-রাজা বা ধনীদের বংশধর, সব অপরাধ আমাদের।

অর্চনা হেসে বললে—সুরোদা, হঠাৎ তুমি যেন মেজাজের ব্যালান্স হারিয়েছ। বুঝেছি

তুমি কেন সেটা হারিয়েছ।

চুপ করে গেল সুরেশ্বর। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সামনে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সুলতা সবিস্ময়ে দেখলে, সুরেশ্বরের বড় বড় চোখদুটি কানায় কানায় জলে ভরে উঠেছে। সুরেশ্বর চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছে না, ভয় হচ্ছে, চোখের পাতার চাপে জল গড়িয়ে ঝরে পড়বে।

—সুরেশ্বর!

—আমি বলছি সুলতাদি। আমি বলি। রায়বাড়ীর এই জবানবন্দীর সবটাই আমি জানি। সুরোদা আর কাউকে বলে নি কিন্তু আমাকে না-বলে পারে নি। আমি জানি।—

অর্চনা বললে—কথাগুলো যা তোমাদের হচ্ছিল, তা ওঘরে বসে আমি শুনছিলাম, আর কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীর নকলখানা পড়ছিলাম। আমি ভাবছিলাম। ঠিক এই রকমই ভেবেছিলাম সুলতাদি। অবশ্য তুমি রাগ করবে এটা বুঝতে পারি নি। কারণ এখনও ঠিক যেন মনে ধারণাই করতে পারি না, তুমি কোন রকমে কীর্তিহাটের রায়েদের ভাল-মন্দ তারা যা করেছে তার সঙ্গে জড়ানো আছ। থাকার তো কথা নয়। রায়বাড়ীর কর্তাদের হাত যাদের উপর পড়েছে, তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভেঙে গেছে। তবে কিছু কিছু লোক আছে, যারা সত্যিই খুব বড় হয়েছে। তারা অবশ্য রায়বংশের কাউকে এখন আমলে আনে না।

সুরোদার ঠিক এমন ধরনের কিছু হবে, মানে চঞ্চল হবে, কি ছেলেমানুষের মত কেঁদে-টেঁদে ফেলবে, আমি তা ভেবেছিলাম। এইভাবে যখন ও চঞ্চল হয় তখন খানিকটা পাগলের মত হয়ে যায়। বড়ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায়কে ও বড্ড ভালবাসে। তার ঋণ যেটা তার মধ্যে রায়বংশের পুরনো শ্যামাকান্তের ঋণকে আবিষ্কার করেছে। বলে, দেবেশ্বর রায় সে ঋণটা শোধ করতেন, করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা করতে তাঁকে দেন নি; দেন নি আমার দাদাশ্বশুরের মা, দেবেশ্বর রায়ের পিসীমা, সুরোদার অন্নপূর্ণামা, আমি তাঁকে বলতাম—বড়মা।

আমার বিয়ে হবার পর ওই নামেই তাঁকে ডাকতাম। আমার বিয়ে হল, এই জানবাজারের বাড়ী থেকেই বিয়ে হয়েছিল। বড়-জ্যাঠামশাই মানে যজ্ঞেশ্বর রায় আসেন নি, ছেলেরাও কেউ আসে নি, কিন্তু দুপুরবেলার দিকে ট্যাক্সি করে জ্যাঠাইমা এসেছিলেন। সঙ্গে একজন ঝি। একটা আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন। এখান থেকে হরিশ মুখুজ্জে রোডের বাড়ীতে বড়মার সঙ্গেও দেখা করে প্রণাম করে [illegible]লেন। বিয়ের মাস দুয়েক পরই বড়মা, আমার অন্নপূর্ণামা অসুখে পড়লেন। যেন এই বিয়েটার অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন। বলতেনও, আমাকে বলতেন—দেখ, তুই গতজন্মে আমাকে জন্ম দিয়েই পালিয়েছিলি। দেখ, সংসারে প্রসব করে সন্তানের সেবা আর ঈশ্বরের সেবা দুই সমান। সে যে না করে তার জীবনে ঋণ থাকে, জন্মান্তরে শোধ করতে হয়। সেই শোধ করতে এসেছিস। নে, বেশ করে সেবা কর; তেল গরম করে এনে পায়ে মালিশ কর, পিঠে মালিশ কর। আমি আর ঝিয়ের কাজ নেব না।

দু মাস পর হঠাৎ জ্বর হল। ঘুসঘুসে জ্বর। আমার স্বামীই দেখছিলেন। বললেন—

কিছু না। হেসে বড়মা বললেন—কিছু না নয় রে, তোর বউয়ের সঙ্গে আমার আর-জন্মের মার সঙ্গে হিসেব-নিকেশের পালা পড়ল। খতেনের খাতা খুলে বসেছে হিসেব-নিকেশওয়ালা। সুদে আসলে এতদিনে সেবা আমার কত পাওনা হয়েছে।

আমার স্বামী এসবে বিশ্বাস করতেন না, সুলতাদি। তিনি নতুন কালের নতুন মানুষ, মানে যেকালে আমার বিয়ে হল ১৯৩৭ সালে, সেকাল থেকেও অনেক পরের কালের মানুষ। এরা চালাক, এরা চতুর, এরা মুখে বলে এরা যুক্তিবাদী কিন্তু আসলে এরা অবিশ্বাসবাদী, মানে জীবনে কোন বিশ্বাস নেই। যা আজকাল, মানে মহাযুদ্ধের পরে, স্বাধীন ভারতবর্ষে সব মানুষের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ। তিনি লুকিয়ে মদ খেতেন, তিনি···। চুপ করে গেল অর্চনা। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে সামলে নিয়ে সে বললে—এই এমন একটা বাড়ী যা বাইরে থেকে একেবারে আদর্শবাদের মন্দিরের মত মনে হত, সেই বাড়ীর কোণে কোণে এই কালের, এই ধারার তখন শুরু হয়ে গেছে।

যাক গে, যা বলছিলাম বলি। রায়বাড়ীর জবানবন্দী কীর্তিহাটের কড়চা যা সুরোদা ছবিতে এঁকেছে, তার মধ্যে দেবেশ্বর-ঠাকুরদার প্রথম জীবনের সব কথাই জমা ছিল, এই বড়মা, সুরোদার অন্নপূর্ণামা'র কাছে। তিনি নিজে নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দিন পনেরো পর চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন সুরোদাকে। আমাকে দিয়েই লেখালেন, এবার আমি যাইব। আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমার মায়ের আসন পাতিয়া দিয়াছি; এবার আমার ডাক আসিয়াছে। আমি যাইব। তোমাকে কিছু বলিবার আছে, তোমাদের বংশের কিছু কাগজপত্র আমার নিকট আছে। তাহা তোমাকে দিতে চাই এবং তোমাকে কিছু বলিতেও চাই। সুরোদা চিঠি পেয়ে এল। বড়মা তার আগে তাঁর সেই পুরনো মেহগনী কাঠের হাতবাক্সের মধ্য থেকে বাণ্ডিল বাঁধা চিঠির তাড়া খুলে বসে বেছে বেছে খান বারো-চৌদ্দ বের করলেন। বললেন—চিঠিতেই সব আছে; এতেই সব পাবি। কিন্তু ঠিক ধরতে পারবি নে। যেসব কথা সামনা-সামনি দেবুর সঙ্গে কি দাদার সঙ্গে হয়েছে, তা তো চিঠির মধ্যে নেই। তার থেকে আমি বলি, তুই শোন। সে অনেক কথা রে!

* * *

সেদিনের কথা আমার চোখের উপর ভাসছে সুতলাদি। কলকাতা পৌঁছেই সুরোদা এসে হাজির হন আমাদের বাড়ীতে। বড়মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলে—বড়মা!

বড়মা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—এসেছিস! আয়। দেখ, ওই কথাগুলি বললেন। তারপর বললেন—আমার ডাক এসেছে। আমি এবার যাব। তাই কথাগুলো তোকে বলে যাচ্ছি, আর এই চিঠিগুলো সেই কথার দলিল, তোকে দিয়ে যাচ্ছি। তোকে মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি রে তোর দেনার কথা, তোর দায়ের কথা, তোর ইচ্ছের কথা।

সুরোদা বুঝতে পারলে না। অবাক হয়ে মুখপানে তাকিয়ে রইল, বড়মায়ের মুখের দিকে।

বড়মা বললেন—কি, কিছু মাথায় ঢুকছে না তোর ?

সুরোদা হেসে বললে—না বড়মা, ঠিক ঢুকছে না। একটু গোলমাল ঠেকছে।

বড়মা বললেন—কই আমাকে রাঙাপিসী বলে ডাক তো! ওরে তুই যখন ছেলেবেলা বাপের সঙ্গে আসতিস, তখন আমার দেখলেই মনে হত, তুই আমার সেই দেবু। আমার গোরা ভাইপো! তাই তোকে ঠিক দেবুর ছেলেবেলার পোশাকের মত পোশাক তৈরী করিয়ে দিয়েছিলাম, তোর বাপকে বলেছিলাম—এই পোশাক পরিয়ে ওকে নিয়ে আসিস আমার কাছে। জ্বর হওয়া অবধি স্বপ্ন দেখছি, তুই এসে বলছিস—রাঙাপিসী, তোমার কাছে আমি যে সব দেনা করেছিলাম, তার হিসেবগুলো আছে, আমাকে বলে দাও। আমিই তোমার দেবু, রাঙাপিসী, গোরা ভাইপো। এই নামটি, গোরা নাম তাকে আমিই দিয়েছিলাম। গোরা মানে, সাহেব গোরা নয়, নবদ্বীপের গোরাচাঁদ।

জানালার ধার থেকে ফিরে এসে বসল সুরেশ্বর। বললে—তুই কথা বাড়িয়ে ফেলছিস অর্চনা। দে আমাকেই বলতে দে।

সুলতা, গোড়াতেই বলেছি এবং এখন অর্চনাও বলেছে, অন্নপূর্ণা মা আমার চেহারার সঙ্গে আমার ঠাকুরদার মিল দেখতে পেতেন। শুধু অন্নপূর্ণা মা কেন, মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়ও বলেছিলেন একথা। রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন আমার দাদা দেবেশ্বর রায়, তুমি তার মত, হয়ত তার থেকেও উজ্জ্বল। মিল যে আছে, সে তাঁর ছবির সঙ্গে মেলালে তুমিও বের করতে পারবে। তার উপর ঘটনাচক্রে জানবাজারের বাড়ীতে হঠাৎ কুইনী এবং হিলডাকে দেখে তাঁর পুরনো কথাগুলো, যেগুলো তিনি ভুলে যেতে বসেছিলেন, সেগুলো নতুন করে মনে পড়েছিল। শুধু মনে পড়া নয়, একটা ধাক্কা যা তিনি সেকালে খেয়েছিলেন, তা আবার নতুন করে তাঁর মনে পড়েছিল।

ঘটনাগুলো বলে যাই, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন তিনি কুইনীকে দেখে চঞ্চল হয়েছিলেন, কেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, কুইনীর বাড়ীখানা তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে তোকে। কেন তিনি বলেছিলেন—কুইনীকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনের পথে দাঁড় করিয়ে দিতেই হবে তোকে। এবং কুইনীকেই বা তিনি কেন বলেছিলেন, সুরেশ্বরবাবু তোর পড়ার ব্যবস্থা করবেন। সেই মত পড়াশুনো করবি তুই। বুঝলি ?

অবলীলাক্রমে বলেছিলেন। যেমন করে আপনার নাতি-নাতনী বা তাদের ছেলেমেয়েকে বলা যায় তেমনি করে বলেছিলেন। এমনটা তুমি কখনও অনুভব করেছ কিনা জানি নে, তবে আমি অনুভব করেছি। এই কুইনীর সম্পর্কেই অনুভব করেছি। কিছুক্ষণ আগেই বলেছি, কুইনীকে নিয়ে ওর সৎমামা হ্যারিসের সঙ্গে ঝগড়ার যেদিন বিচার করতে গিয়েছিলাম, তার কদিন পর বিবিমহলে অর্চনার সঙ্গে কুইনী এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং বাড়ীর দলিলটার সঙ্গে দেবেশ্বর রায়ের কখানা চিঠি সে আমাকে দেখতে দিয়েছিল। সে সব চিঠির মধ্যে আসল যা সত্য এবং জীবনের সঙ্গে জীবনের যে আসল সম্পর্ক তার একটা হিসেব ছিল। চিঠিগুলো পড়ে যখন মুখ তুললাম তখন কুইনী নেই। ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছিল, সে গোধূলির আলোয় শুকনো কাঁসাইয়ের বালুচর পার হয়ে কুইনী তখন শিলুটের ছবির মত চলে যাচ্ছিল।

সে ছবিটাও আমি এঁকেছি সুলতা। ছবিখানা আমার পরম প্রিয়। এই জবানবন্দীর মধ্যে সেখানার থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু নেই। ছবির বিচারে সেইখানাই আমার শ্রেষ্ঠ ছবি। আমার বিচারেই নয়, বিলেতের বিচারেও বটে। কিনতে চেয়েছিল অনেকে, কিন্তু তা আমি দিই নি। ছবিখানা কুইনীই আমার কাছে চেয়ে নিয়েছিল।

এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা কেড়ে নেওয়ার খবর পেয়ে যে কথা অন্নপূর্ণামা সেই জ্যাঠামশায়ের বাড়ী যাবার আগে আমাকে বলেছিলেন, তা শুনেছ। সে চিঠিখানাও রয়েছে এখানে। পৃথিবীতে পুরুষ আর নারী নিয়ে চিরকাল, সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে। বিচিত্র ঘটনা এই যে, যে-কোন পুরুষ যে-কোন নারীকে পেয়ে খুশী নয়, সুখী নয়। সেকালে রাজা-রাজড়াদের ঘরে ধরে আনা এবং বিয়ে করা নারী তো কম থাকতো না ; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারদের সংখ্যা বাদই দাও, ওটা পৌরাণিক। এই তো সেদিনের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদের নবাব সরফরাজ খাঁ'র নাকি সতেরোশো বেগম ছিল। তবু সরফরাজ রাবেয়া বেগমকে বেশী ভালবাসতেন। ভালবাসা একটা বিচিত্র মনের অবস্থা, ও একবার জন্মালে আর মরে না, অনন্ত মূলের মত মানুষের সমস্ত অন্তর জুড়ে মূল বিস্তার করে দেয়। কখনও কখনও অনাবৃষ্টির সময় মনে হয় বুঝি এবার শুকিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি পড়লেই সারা অন্তর জুড়ে তার সবুজ অঙ্কুরের ডগা বেরিয়ে আচ্ছন্ন করে দেয়। এই ভায়লা বা ভায়লেট মেয়েটাকে সেই ভালবাসায় ভালবেসেছিলেন দেবেশ্বর রায়। তাই রাঙাপিসী যিনি তাঁর খেলার সঙ্গী ছিলেন, বড় বোনের মত ছিলেন, প্রিয় সখীর মত ছিলেন, তাঁর কাছে লিখেছিলেন—পিসী, তুমি আমাকে হাজার কয়েক টাকা ধার দাও। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে রাখছি, টাকা আমি শোধ দেব-দেব-দেব।

তখন ঘটনাটা অনেক দূর এগিয়েছে সুলতা। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া তাঁর হয়ে গেছে। এলিয়ট রোডে একটা বাড়ী খাড়া করেছেন। এই বাড়ীটা গোপালদার সঙ্গে পরামর্শ করে করেছেন। জানবাজার থেকে রিপন স্ট্রীট বেশী দূর নয়, তার ওদিকেই এলিয়ট রোড। ফিরিঙ্গী পাড়া। পাড়াটায় যারা বাস করে, তারা খেটে-খুটে খায়, আবার ইংরেজ যখন কলকাতা পত্তন করেছিল, তখন জাহাজে করে পুরুষদের সঙ্গে অনেকে মেয়ে যারা এখানে হোটেল, বারে এবং নানা বৃত্তি করে জীবিকা উপার্জন করত, তাদের অনেকে থাকত, তাছাড়া ক্লাইভের আমল থেকে যেসব নবাব ইংরেজরা হারেম রাখত, তাদের বংশের ছেলেমেয়েরাও অনেকে এদিকপানে ছটকে এসেছিল। লালবাজার, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, ওয়েলেসলী হয়ে বেনিয়াপোখরা পর্যন্ত যে সমাজটা, সে সমাজের মধ্যে, এক পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দৌলত আর সাংসে কিছু এদেশী মানুষ, এদেশী সমাজ কোনমতে টিঁকে ছিল। আজও আছে। এখন বিক্রম অবশ্য আমাদের বেশী। সেকুলার স্টেটের সুনাম ক্ষুণ্ণ না করেই বেশী হয়ে উঠেছে।

যাক গে।

এই এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা ভাড়া নয়, লিজ নিয়ে ভায়লেটকে এনে রেখেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এবং পরমানন্দে মধুযামিনী যাপন শুরু করলেন। দিন-রাত্রি, কীর্তিহাট,

বাপ-মা, বংশ-পরিচয় সব ভুলে এই ষোল বছরের কন্দর্পটি জীবনে বসন্তোৎসব জুড়ে দিলেন। পরীক্ষা হয়ে গেলেও কীর্তিহাট ফিরলেন না।

বার বার পত্র লিখলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু নানান অজুহাতে তিনি যাওয়া ঠেকিয়ে রাখলেন। রত্নেশ্বর রায় তাঁকে বিশ্বাস করলেন।

তখনকার সমাজ এবং বাঙালীর জীবন মনে করলে এটা খুব অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে না সুলতা।

বাঙলাদেশ তখন জাগছে। সব দিক থেকে, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চার দিক থেকে যেন বারোটা সূর্য উঠছে।

শাস্ত্রমতে বলে, সূর্য হচ্ছেন বারোটি। বারোটি সূর্য বাঙলাদেশে তখন চারিদিকে প্রভাতের আলো ফুটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার শিক্ষা পাল্টেছে, ধর্মের চেহারা পাল্টেছে, নতুন ধর্ম জেগেছে, মুসলমান আমলে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি এবং চারিদিকে তোলা আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিল বাঙালীরা নিজেরাই ভেঙে ফেলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী তখন ছাপা হয়ে বের হয়েছে। তাতে নবাবনন্দিনী আয়েষা কুমার জগৎসিংহের প্রেমে পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কুমার জগৎসিংহের জাত বাঁচাতে বিয়েটা দিতে পারেন নি, কিন্তু সত্যি বলতে, তিলোত্তমা থেকে নবাবনন্দিনী আয়েষাকে অনেক মহীয়সী এবং সম্ভবত রূপসী মনোহারিণী করে সৃষ্টি করেছেন।

কৃশ্চানধর্মের গতি রোধ হয়ে গেছে ; বউবাজারে মা ফিরিঙ্গী কালী পথরোধ করেছেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে এক প্রায় নিরক্ষর ব্রাহ্মণ এসেছেন, তাঁর আশ্চর্য মহিমা। আশ্চর্য সারল্য। আশ্চর্য প্রেম। অপার ভালবাসা।

ব্রাহ্মধর্মের পর পর থাক হ'তে হ'তে আদি থেকে নববিধান, এবং নববিধান থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে চেহারা নিয়েছে।

মিউটিনির পরই নীল বিদ্রোহ হয়ে গেছে। সে বিদ্রোহে বাঙালী হারে নি, জিতেছে। হরিশ মুখার্জির জেল হয়েছে। ফাদার লঙেরও জেল হয়েছে, যশোরের মাগুরা গাঁয়ের ঘোষেরা মাগুরায় বসে ছোট সাপ্তাহিক বের করেছিল, সে কাগজ নিয়ে তারা বাগবাজারে এসে বসেছে। বাঙলা কাগজকে এক রাত্রে ইংরিজী কাগজে পরিণত করে লাটসাহেবের উদ্যত রোষের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ সতেরো-আঠারো বছরের ; দ্বিজু রায়, রামানন্দ চাটুজ্জে, আচার্য প্রফুল্ল রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র তখন বাঙলাদেশে অপরিচয়ের মধ্যে বেড়ে উঠছেন। দক্ষিণেশ্বরের যে ব্রাহ্মণের আশ্চর্য তপস্যা-চরিত্র সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে, তার মহিমা এবং তপস্যার যিনি ধারক-বাহক—দত্তবাড়ীর নরেন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, তিনিও তখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বছর কয়েক পরেই তিনি তাঁর গুরু, যাঁকে তিনি My Master বলেছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। এ সময়টা সেই সময়।

বাঙালী সে সময় শুধু ধন-সম্পদ খোঁজে না, বিষয়-বিষয় করে গলি-ঘুঁচিতে ঘোরে-ফেরে না, সে আরও অনেক কিছু খুঁজছে। অনেক প্রশ্নও তার মনে জেগেছে। একদিকে সে

ওল্টাচ্ছে এদেশের পুরনো ইতিহাস, শাস্ত্র, পুঁথি, বেদান্ত, উপনিষদ, অন্যদিকে সে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আস্বাদ নিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস, কবিতা পড়েছে। শুধু রেনল্ডের 'মিস্ট্রি অব দি কোর্ট অব লণ্ডন' নয়, আরও অনেক পড়েছে, স্কট ডিকেন্স পড়েছে। জীবনে তার নতুন আলোকপাত হয়েছে। দেবেশ্বর রায় বেশ একটু ইংরিজী-ঘেঁষা লোক ছিলেন। তিনি এই অর্ধ-শ্বেতাঙ্গিনী ভায়লেটের কিশোর জীবনের ভালবাসায় আকণ্ঠ ডুব দিয়ে তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে ভাবছিলেন, কিছু টাকা মূলধন পেলে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে মাইকেলের মত একজন কেউ হবেন।

সেই সময়টায় তিনি মাইকেলের মত দাড়ি-গোঁফ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং খাঁটি সাহেবী পোশাক পরে ভায়লেটকে পাশে বসিয়ে ফিটনে চড়ে বেড়াতেও যেতেন।

সুলতা, অন্নপূর্ণামা সেই রোগশয্যায় আমাকে ডেকে বললেন—দেখ, দেবু তার মৃত্যুর আগে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল—রাঙাপিসী, তুমি আমাকে টাকাটা দাও নি, সে হয়তো আমার ভাল-মন্দ বিচার করতে গেলে ভালই করেছ। কারণ ভায়লেট এমনই অশিক্ষিত ছিল এবং এমনই ওয়াইল্ড ছিল যে, আমি তাকে সহ্য করতে পারতাম না। তাতে এর থেকেও অনেক বেশী যন্ত্রণা আমাকে সইতে হত।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—তখন দেবু মদ প্রায় সব সময়ই খেত। মনের যাতনায় খেত। তবে হ্যাঁ, বুঝতে কেউ পারত না। দেবুর কথাটা শুনে আমার খুব অনুশোচনা হয়েছিল রে। আমি তাকে বলেছিলাম—দেবু, টাকাটা দিতে আমি পারতাম, কিন্তু তোকে যে চিরকালের জন্যে হারাতাম, দেবু।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—না পিসী, তুমি হারাতে না আমাকে। আমি তোমার সেই দেবুই থাকতাম। তবে হ্যাঁ, বাবা-মা'র সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। সমাজের সঙ্গে হ'ত। তা হ'ত। কিন্তু তা কি আটকানোই গেল রাঙাপিসী? বল, তুমিই বল! গেল! বাবার সঙ্গে প্রতি-পদে ঝগড়া হল। প্রতি পদে। যে মানুষটাকে সারা দেশে বললে, এমন ধার্মিক, সুবিচারক হয় না, তাকে আমি নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ছাড়া কিছু দেখলাম না। একটা অত্যন্ত হিংস্র মানুষ। উঃ রাঙাপিসী, বাবার এই মনে চেপে রাখা প্রতিহিংসা, আর সময় এবং সুযোগ বুঝে আইনের পথে শোধ তোলা এ যে কি ভয়ানক তুমি কল্পনা করতে পারবে না। জান রাঙাপিসী, বাবার পছন্দ করা মেয়ে বলে কাশীর বউকে আমি কোনদিন পছন্দ করতে পারলাম না। এমন ধর্মবাইগ্রস্ত স্বামীতে, দেবতায়, ধর্মে তার অচলা ভক্তি, কোনদিন সে আমার উপর জোর খাটালে না, কোনদিন সে আমার একটা অবিচারের প্রতিবাদ করলে না, না পারলাম তার উপর রাগ করতে, না পারলাম তার উপর ঘেন্না করতে, না পারলাম তাকে ভালবাসতে; পিসী ভালবাসতে গেলে সে ভালবাসা নিলে না, ফেলেও দিলে না, একটু হেসে পাশে সরিয়ে রেখে দিলে। নেড়েচেড়েও দেখলে না।

ফ্রানিস সে কেঁদে ফেলেছিল সেদিন। অন্নপূর্ণামা বললেন—আমি সেদিনও তাকে বলতে পারলাম না যে, ওরে দেবু, ও ক'নে দাদা পছন্দ করে নি রে, পছন্দ করেছিলাম আমি। আমার বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে; তোর চিঠি পেয়ে আমি তোকে উত্তর দিলাম না,

দাদাকেও বিশেষ কিছু জানালাম না, লিখলাম—আমার সঙ্গে মিটমাটের কথা যা চাহিতেছ, তাহার জন্য কলিকাতা যাইতে লিখিয়াছ; কিন্তু তুমি কাশী এস না কেন? তুমি জমিদার, স্বাধীন মানুষ; আমি মেয়েছেলে, পিসেমশায় ছুটি না পাইলে যাইব কেমন করিয়া এবং মিটমাট দুই পক্ষের মধ্যে বসিয়া করিয়াই বা দিবেন কে!

এরই মধ্যে দেখলাম এই মেয়েকে। দশাশ্বমেধ ঘাটে তার দিদিমার সঙ্গে স্নান করতে এসেছে। ফুটফুটে মেয়েটি। কিন্তু সেই বয়সে কি ধর্মনিষ্ঠা আর কি ভক্তি! পরিচয় নিয়ে জানলুম, দিদিমা নদে জেলার জমিদারবাড়ীর গিন্নী, জমিদারি থেকেও ব্যবসায়ে ওদের নামডাক খুব বেশী, অবিশ্যি দেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে মেয়েটি গিন্নীর মেয়ের মেয়ে, মা মারা যাওয়ার পর থেকে দিদিমার কাছে মানুষ হচ্ছে। আমি পরিচয় দিয়ে পিসেমশাইকে নিয়ে কথাবার্তাটা খানিকটা পেড়ে রাখলাম। দাদাকে লিখলাম, "তুমি শিগ্‌গির আসিবে। তুমি এলে মিট-মাটের কথা সব হইবে।"

দাদা আসতে পারলে না। কমিশনার লাট অনেক কথা লিখলে। রায়বাহাদুর খেতাব দেবেন সরকার, তার তদ্বিরের জন্য এখন দেশ ছেড়ে আসা অসম্ভব। অগত্যা আমি কলকাতা গেলাম। দেখলাম স্টেশনে জানবাজারের গাড়ী এসেছে। কিন্তু একজন গোমস্তা ছাড়া কেউ আসে নি। আমার রাগ হল। আমি জানবাজার গেলাম না, গিয়ে উঠলাম জোড়া-সাঁকোর জেঠামশাইয়ের বাড়ী।

সেখানে গিয়ে খবর শুনলাম, দেবেশ্বর বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

অবাক হয়ে গেলাম। দেবু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বন্দুকের গুলিতে?

উত্তর শুনলাম—হ্যাঁ।

পিসেমশাই বললেন—তাহলে এখানে নয়। ফিরে গিয়ে গাড়ীতে ওঠ মা। চল্ ওখানে চল্। এই জন্যে কেউ স্টেশনে আসে নি।

জানবাজারের বাড়ীতে গিয়ে অন্নপূর্ণা দেবী এবং বিমলাকান্ত পৌঁছে দেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায় বড় সাহেবডাক্তারকে বিদায় করছেন। সাহেব তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে তাঁর ব্রুহাম গাড়ীতে চড়ছেন। বলছেন—রয়বাবু, It is only luck—only luck—that has saved your boy. Offer your thanks and gratitude to God and God alone. I have not done anything.

অন্নপূর্ণামা বলেছিলেন আমাকে, আমি কাশীতে পিসেমশায়ের কাছে ইংরিজী শিখে-ছিলাম, কিন্তু সাহেবের কথা একবিন্দু বুঝি নি। পা আমার সিঁড়িতে আটকে গেল, আমি উপরে যেতে পারলাম না।

সাহেবকে বিদায় করে দাদা ফিরে এল ঘরের মধ্যে, পিসেমশায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরের মধ্যে, তিনি বললেন—তাহ'লে ভয়ের কিছু নেই!

গম্ভীরভাবে কীর্তিহাটের রায়রাজা আমার দাদা বললে—না। তবে যা হবার হয়ে গেলেই তো ভাল হত। ভগবান আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতেন, রায়বংশকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করতেন। গুলিটা চালাতে চেয়েছিল বুকে। বন্দুকটার বাঁট মেঝেতে রেখে

নলটা বুকে লাগিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার টিপেছে, এখন বন্দুক তো ফায়ারিংয়ের সময় খানিকটা ঝাঁকি দেয়, back push করে, তাইতেই পিছলে গিয়ে গুলীটা বগলের ভিতরে মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে। ছররা হলেও ক্ষতি হ'ত, দু-চারটে এদিক-ওদিক ঢুকতে পারত। এ একেবারে বুলেট। সুতরাং জীবনহানি হয় নি, কেলেঙ্কারিই সার হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। নড়বার শক্তি তখনও আমার হয় নি। পিসেমশাই বললেন—কি বলছ তুমি রত্নেশ্বর ?

—ঠিক বলছি। আমি বাল্যকাল থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত আপনার কাছে মানুষ হয়েছি। আপনি কি আমাকে এমনিই মমতাহীন পাষণ্ড করে গড়ে তুলেছিলেন যে, নিজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, প্রথম সন্তান সম্পর্কে এমনি কথা বলব ? মরাই ওর উচিত ছিল, চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, রায়বংশের দুর্ভাগ্য, সব থেকে বেশী দুর্ভাগ্য আমার যে,—

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল দাদা। বলেছিল—চলুন ওপরে চলুন। এখানে লোকজনে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ীর গোপন কথা, কি কেলেঙ্কারির কথা সে এক রকম ওরা জেনেছে, তার প্রতিবিধান তো করতে হবে। কিন্তু আমাদের কথাগুলো ওদের শুনতে দিয়ে লাভ কি ?

*   *   *

অন্নপূর্ণামা থাক-থাক করে চিঠিগুলো সাজিয়ে হাতে ধরে বসে কথাগুলি বলছিলেন আমাকে। ঘরের মধ্যে ছিল শুধু অর্চনা, আর কেউ ছিল না। আমি অনেকটাই জানতাম, কিন্তু এমন বিশদভাবে জানতাম না। বাইরেটা দেখে যতটা জানা যায় ততটাই। মর্মকথা নয়।

দাদা জানবাজারের বাড়ীতে সেবার এসে উঠেছিল খবর-টবর না দিয়ে। খবর যা ছিল, তাতে দাদার আসবার কথা একদিন পরে, কিন্তু মেদিনীপুর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিঠি দিয়ে একদিন আগে আসতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, চুঁচড়োতে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। সাহেবের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট যাবে, সেটা দেখাবেন। কমিশনার নিজেই ডেকেছেন।

রত্নেশ্বর রায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গেই সকালে রওনা হয়ে হাওড়া পৌছে ওখান থেকেই গিয়েছিলেন চুঁচড়ো। বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের আসন চুঁচড়োতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে খুশী মনেই ফিরছিলেন। মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন একটা জলছিল। কিন্তু সেটাকেও তিনি লণ্ঠনের ফানুস পরিয়ে আগুন থেকে সুন্দর একটি লণ্ঠন করে তোলা যায় কিনা ভাবছিলেন। সেটা ভায়লেট এবং গোপালকে নিয়ে। ভায়লেট একদা অদৃশ্য হয়েছে কীর্তিহাট থেকে। গোপালই এনেছিল কীর্তিহাট থেকে। এবং দিনকয়েক থেকে একদিন ওই গোয়ানপাড়ারই এক আধবুড়ী গোয়ানবুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে ভায়লেটকে এনে তুলেছে এই এলিয়ট রোডের বাড়ীতে। বাড়ীখানা তখন সদ্য নতুন তৈরী হয়েছে। ঝকঝকে বাড়ী। বাড়ীটা করেছিল একজন খাঁটি সায়েব, যার মতলব ছিল—আর হোমে সে ফিরবে না। সেও এক প্রেমের ব্যাপার। এখানে প্রেমে পড়েছিল, তাই ফিরে যাবে না মতলব করেছিল। সেখানে

পুরানো বিয়ে করা বউ ছেলেমেয়ে ছিল, একে নিয়ে হোমে গেলে জেল খাটতে হবে। কিন্তু তার ভাগ্য, বাড়ী-টাড়ী হল কিন্তু যে-মেয়েটার প্রেমে পড়েছিল, সে মরে গেল হঠাৎ। সায়েব বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়ে বিলেত চলে গেল। বাড়ীটা কিনেছিল কলকাতার বাড়ীভাড়া ব্যবসায়ী যারা তাদের একজন। কিন্তু ভাড়া সহজে হচ্ছিল না। বাড়ীটার নাম রটে গিয়েছিল অপয়া—আনলাকী। গোপাল ঘোষ খবর পেয়ে দেবেশ্বর রায়কে খবরটা দিয়েছিল; তরুণ দেবেশ্বর বলেছিলেন—রাবিশ! অপয়া! আনলাকী! ওসব আমি মানি নে গোপালদা! চল, বাড়ীখানা দেখে আসি। পছন্দ হলে ওই বাড়ীই নেব। নতুন বাড়ী, সায়েবী-রুচিতে করা বাড়ী।

তরুণ দেবেশ্বরের দেখবামাত্র ভাল লেগেছিল এবং সেই পথেই বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা বলে পাকা করে, ওখান থেকেই গিয়েছিলেন হ্যামিল্টনের বাড়ী। হাতে আংটি ছিল। একটা খুব দামী হীরের আংটি, সেটা পৈতের সময় পেয়েছিলেন; আর একটা আংটি—সেটা বীরেশ্বর রায়ের একটা দামী দুর্লভ নীলার আংটি। সেটা তাঁর আঙুলে শেষদিন পর্যন্ত ছিল। লোকে বারণ করত, এটা পরবেন না। কিন্তু তিনি তা ছাড়েন নি। আংটিটার গল্প ছেলে-বয়স থেকে শুনেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এ নীলা সহ্য হলে রাজা হয় মানুষ। এই আংটিটা একদিন বাপের সম্মুখেই খোলা জহরতের বাক্স থেকে হাত-সাফাই করে তুলে নিয়েছিলেন। সেটা পরতেন তিনি। এবং ভায়লেটকে পেয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল আংটিটা তাঁর সহ্য হয়েছে। হ্যামিল্টনের বাড়ীতে গিয়ে বড় হীরের আংটিটা এবং হীরের বোতাম বিক্রী করেছিলেন, আর এই নীলাটা বন্ধক রেখে টাকা কম পান নি—পেয়েছিলেন দশ হাজারের বেশী।

সেই টাকায় বাড়ী লিজ নিয়ে ফারনিচার কিনে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভায়লেটকে কীর্তিহাট থেকে এনে মধুচন্দ্রিকা যাপন করছেন।

দেবেশ্বর রায় বাপ রত্নেশ্বর রায়কে ভয় করেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে বাপের কঠোর সমালোচক। বাপের কাঠিন্য এবং কঠোরতা তাকে তাঁর অজ্ঞাতসারে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাছাড়া তিনি বেপরোয়া। তিনি গ্রাহ্য কাউকে করেন না। বাপকে পত্রে লেখেন —তখনকার দিনের এ-মিটিং ও-মিটিংয়ের কথা। এবং তার সঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের মতের কথাও জানাতেন। যা পড়ে রত্নেশ্বর মৃদু হাসতেন। তাঁর মনে পড়ত তাঁর বাল্যকালের কথা। তিনি যখন নিজেকে কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর দৌহিত্র বলে জানতেন, তখন তিনি নিত্য অভিশম্পাত দিতেন এই বংশটিকে। সোচ্চারে দিতে পারতেন না ভবানী দেবীর জন্য। ভবানী দেবীকেও তিনি তখন নিজের গর্ভধারিণী বলে জানতেন না।

তারপর?

তারপর বিচিত্র ঘটনাচক্রে সব উল্টে-পাল্টে গেল। বীরেশ্বরের পুত্র হিসাবে তিনি আজ কীর্তিহাটের ষোল আনা সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের মত অনুযায়ী বীরেশ্বর রায়ের আমলের ধারাপদ্ধতি সবই পাল্টেছেন। জোরজুলুম, জবরদস্তি, দৈহিক নির্যাতন ক'রে, গ্রাম জ্বালিয়ে, লাঠিবাজী ক'রে প্রজাশাসন তিনি তুলে দিয়েছেন। আজ সবই চলে দেশের প্রচলিত আইনের কাঁটায়-কাঁটায়। কারুর সাধ্য নেই যে তাঁকে প্রজাপীড়ক বলে, তবু তিনি

নিজে জানেন, অনুভব করেন আজ কীর্তিহাটের কাছারীকে, কীর্তিহাট এস্টেটের প্রজারা কত বেশী ভয় করে। এ তো সেই তিনিই করেছেন। এবং তার সঙ্গে দেশের আমল—হাল-চাল আইন সাহায্য করেছে।

১৮৫৭ সাল থেকে ভাইকাউন্ট আর্ল ক্যানিং, লর্ড এলগিন, লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন একের পর এক লাট হয়ে এসে গোটা দেশে কেমন করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করলে তা দেখেছেন তিনি। শিখেছেন অনেক কিছু। লর্ড লিটন চলে যাবেন, আসবেন লর্ড রিপন। লর্ড লিটনই তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব মঞ্জুর করেছেন।

ছোট লাটবাহাদুর নিজে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন—"তুমি যে তোমার জমিদারীর মধ্যে নেটিব কৃশ্চানদের জন্য চার্চ করেছ এবং সেখানে স্কুল ক'রে দিয়েছ তাদের জন্য, এর জন্য তোমাকে আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ-ধরনের উদারতা সত্যই প্রশংসনীয়।"

দেবেশ্বর আজ চিঠিপত্রে যাই লিখুক কলকাতার মিটিং এবং হুজুগ আর ফ্যাশনের নেশার তার বিন্দুমাত্র লেশ থাকবে না, যখন সে রায়বাড়ীর জমিদারীর আসনের স্বাদ পাবে। তার আয়ের স্বাদ, সম্মানের—তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মূলের সন্ধান পাবে। হ্যাঁ, তবে নতুন জীবনে এগুলো ভাল। অন্তত সমাজে, বাইরে পাঁচজনের সামনে ভাল লাগে।

তিনি জানতেন না, দেবেশ্বর নিজের জীবনে কতখানি শিকড় চালিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার মাটির উপর। বুঝতেন না তার মতামতের মূল্য কতখানি! এবং মনে তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, দেবেশ্বর ষোল বছর বয়সে চৌদ্দ বছরের ভায়লেটের প্রেমে পড়েছে এবং গোপালদার সাহায্যে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে বাড়ী ভাড়া করে রেখেছে।

রত্নেশ্বর রায়ের অনুমান ছিল এবং কীর্তিহাট অঞ্চলে প্রবল গুজব ছিল যে, গোপালই ভায়লেটকে নিয়ে পালিয়েছে কলকাতায়। রত্নেশ্বর চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায়, নায়েবকে —"গোপাল সম্পর্কে এখানে অনেক গুজব রটিয়াছে। সে কলিকাতায় কি করিতেছে বা তাহার সমুদয় বিবরণ আমাকে পত্রপাঠ জানাইবা।" দেবেশ্বরকে লিখেছিলেন—

He is a scoundrel.—The Goans of our Goanpara say that Gopal has eloped with Violet Podros the girl—who you may remember—garlanded us in the meeting and who—happens to be the daughter of one of our women employees in the house—Anjana. You were a mere boy at that time, —she was your nurse—very favourite of yours—you may remember her. She embraced christianity and married a Goanese Christian. Violet is her daughter. You just warn him—and tell him—that he shall have to be a Christian and marry this girl.

* * *

চুঁচড়ো থেকে ফিরে বাড়ী পৌছেই রত্নেশ্বর নিচের ওই হলঘরে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রত্যাশা করেছিলেন, দেবেশ্বর সহাস্যমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রণাম করবার জন্য দাঁড়িয়ে

থাকবে বা কাঠের সিঁড়ির উপর, ম্যাটিংয়ে চটির দ্রুত শব্দ তুলে, ছুটে নেমে আসবে।

গম্ভীর রাশভারী মানুষ রত্নেশ্বর রায়। রায়বংশের কাঠামো, তার উপর জীবনের প্রথম দিকটা কাশ্মীর জলে-হাওয়ায়, ঘিয়ে-ময়দায় ল্যাংড়া আম, কাশ্মীর পেয়ারা এবং বাদাম-পেস্তা খেয়ে আর কুস্তি করে, সাঁতার কেটে মজবুত হয়ে গড়ে উঠেছে, চোখের চাউনিতে ছিল একটা তীক্ষ্ণ এবং অবজ্ঞার দৃষ্টি, অল্পেই কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিত। তার সামনে সহজে কেউ মুখ তুলে কথা বলতে পারত না। কিন্তু দেবেশ্বর প্রসন্ন হাসিমুখে তরুণকণ্ঠে উৎসাহের সুরে "বাবা" বলে ডাকলে রত্নেশ্বর আর একরকম হয়ে যেতেন। প্রণাম করতে করতে দুই হাতে তুলে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে বলতে উপরে উঠে যেতেন এক প্রবীণ ও এক নবীন বন্ধুর মত।

সেদিন তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। দেবেশ্বরের চটির শব্দ উপরে বাজল না, এগিয়ে এল না। তিনি ডাকলেন—দেবু! দেবেশ্বর!

সাড়া মিলল না। এবার তাঁর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কীর্তিহাটের এস্টেটের জমিদার রত্নেশ্বর রায়, যে-রত্নেশ্বর রায় ম্যাজিস্ট্রেটকে অ্যালিবি সাক্ষী রেখে দশ ক্রোশ দূরের রাধানগরের দে-সরকারের ঘর জ্বালিয়ে এসেছেন, দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়ে দে-সরকারের হাত ভেঙে দিয়েছেন, যে-রত্নেশ্বর রায়ের অভিষেকের উৎসবের সময় গোপাল সিংয়ের মত দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত খুনে দাঙ্গাবাজকে একদিনে নাগপাশে বেঁধে এনে দাসখত লিখিয়েছেন, সেই জমিদার!

শুধু একটা ধমক। কাউকে উদ্দেশ করে নয়। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কোথায় দেবেশ্বর?

নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে গিয়েছিল গোটা বাড়ীটা। একটা সুচ পড়লে শোনা যেত।

—কোথায় সে? তারপর দেবেশ্বরের খাস চাকরকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—এই শুয়ার কি বাচ্চা! শুনতে পাচ্ছিস নে?

সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বলেছিলেন—কোথায় সে? এই হারামজাদা!

এরপর কথাটা প্রকাশ হতে কতক্ষণ লাগে? প্রকাশ হয়ে পড়েছিল—"বড়বাবু সন্ধ্যে হলেই চলে যান, যেখানে গোপাল থাকে সেখানে। ফেরেন সকালবেলা।"

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু মুখ থেকে একটি কথাও বের হয় নি। হয়তো মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে নিয়ে থাকবেন, গোপাল যেখানে থাকে, সেখানে? তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল ভায়লেটকে। তাহলে?

কত প্রশ্ন, কত ক্ষোভ, কত ক্রোধ এর সঙ্গে জেগেছিল তার প্রকাশ বাইরে কেউ কিছু দেখে নি। দেখতে পায় নি। এবং রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেও তার এতটুকু প্রকাশ নেই। তবে গোপন করেন নি ঘটনাটাকে।

রত্নেশ্বরের ১৮৭৮ সালের ডায়রীখানা নিয়ে সুরেশ্বর পড়লে—"বাড়ী পৌঁছিয়া দেবেশ্বরকে দেখিলাম না। সকলকে প্রশ্ন করিলাম। কেহ উত্তর দিল না। নতমুখে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল। আমার সন্দেহ হইল। এবার ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই শুনিলাম,

এলিয়ট রোডে একখানি বাড়ী ভাড়া বা লিজ লইয়া সেখানেই দেবেশ্বর রাত্রিযাপন করে। গোপালও সেখানে থাকে। সুতরাং ভায়লেট। সে-ও সেখানে থাকে। বাড়ী ভাড়া করিবার সাধ্য গোপালের নাই। সুতরাং এ-কর্মের সকল দায় দেবেশ্বরের। তৎক্ষণাৎ আমি গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলাম—ওসমান! গাড়ী লে আও জলদি! ওসমান! এবং বিক্ষুব্ধ অন্তর লইয়া সম্মুখের বারান্দায় পদচারণা করিতে লাগিলাম। গাড়ী আসিতেই তাহাতে আরোহণ করিয়া বলিলাম—ওসমান! ওসমান সেলাম করিয়া কহিল—জী হুজুর।—

—কিসকা নিমক তুম খাতে হো? হামারা?

—জরুর! হামারা বাপ আপনা বাপকে নিমক খায়া, হাম আপকে নিমক খাতা।

—হাঁ। নিমকহারাম যো হোতা হ্যায়—উসকা পর খুদা নারাজ হোতা হ্যায়, জিন্দীগি বরবাদ যাতা হ্যায়। কেয়া, বাত ঠিক হ্যায় কি, নহি?—

—হাঁ হুজুর, ঠিক হ্যায়!

—বাস, চলো, মুঝে, মেরা লড়কা তুমলোগোঁকা বড়াবাবু, সামকো যাঁহা যাতা হ্যায়, হুঁয়া লে চলো। আউর কোই আদমী উনকা হুঁয়া খবর না দে।—চলো!

এলিয়ট রোডের বাড়ীখানা অধিকাংশ ফিরিঙ্গীপাড়ার বাড়ীর মত একলাই ছিল, কিন্তু দোতলায় একখানা প্রশস্ত ঘর দেবেশ্বর নিজে করে নিয়েছিলেন। হাজার হলেও জমিদারের ছেলে, নিতান্ত একতলায় খুব একটা সুলভ-প্রাপ্যতার মধ্যে থাকতে তাঁর মন চাইত না। নিচে একখানা ঘরে থাকত গোপালদা। একখানা ঘরে থাকত ভায়লেটের সঙ্গে এসেছিল যে গোয়ানীজ মেয়েটি সে; আর বাকিগুলোর কোনটা ছিল বিলিতী কায়দায় ড্রইংরুম, কোনটায় করছিলেন লাইব্রেরী, সেখানে মাস্টার এসে ভায়লেটকে পড়াতো, লেডী করে তুলত।

রত্নেশ্বরের গাড়ী গিয়ে বাড়ীটার সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি ফটকটা খুলে থমকে দাঁড়ালেন। অতর্কিতে ঢুকলেন না।

ডাকলেন—বেশ উচ্চকণ্ঠেই ডাকলেন—দেবেশ্বর!

উপরে হাসির শব্দ উঠছিল, বন্ধ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ বাড়ীখানা যেন ভয়ার্ত হয়ে গেছে। আবার রত্নেশ্বর ডাকলেন—দেবেশ্বর! এবং এবার গিয়ে সামনের দরজায় ধাক্কা দিলেন।

—দরজা খোল দেবেশ্বর!

উত্তর একটা এল। কিন্তু কথায় নয়। বন্দুকের শব্দে। একটা বন্দুকের শব্দ উঠল দোতলায়।

রত্নেশ্বর চমকে উঠলেন। ডাকলেন—ওসমান! ভাঙো, দরজা ভাঙো।

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ওসমানকেই বললেন—ওসমান, কোথায় দেবেশ্বর?

উপর থেকে তখন কাতর আর্ত চীৎকারে বুক ফাটিয়ে ভায়লেট ডাকছে—রাজাবাবু—আমার রাজাবাবু—

উপরের ঘরে এসে দরজার মুখে দাঁড়ালেন রত্নেশ্বর রায়। দেখলেন—দেবেশ্বর চিৎ হয়ে

পড়ে আছে, রক্তের মধ্যে যেন ভাসছে। তার বুকের উপর পড়ে চীৎকার করে কাঁদছে ভায়লেট—রাজাবাবু— My darling—রাজাবাবু—My prince—রাজাবাবু।—

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেবেশ্বর জানত, বাপ আসবেন দিনে। কিন্তু গাড়ী হাওড়া থেকে দিনেরবেলা ফিরে এসেছিল। বাপ আসেননি, চুঁচড়ো গেছেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে—এই খবর পেয়েই দেবেশ্বর দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছিল এলিয়ট রোডের বাড়ী; সারাদিনরাত আজ ভায়লেটকে নিয়ে আনন্দ করবে। ভোর ভোর বাড়ী ফিরে এসে ভাল ছেলে সাজবে।

ভাল ছেলে সাজবার ইচ্ছে তার ছিল না। মিথ্যে কথায় তার শুধু অরুচিই ছিল না, ঘেন্না করত সে মিথ্যে কথা বলতে। সে কতবার বলেছে—মিথ্যে কথা বললে নিজের কাছে নিজের মান যায় রাঙাপিসী। যুধিষ্ঠির নাকি ধর্ম্মপুত্র, তার মা কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মরাজের ঔরসে তার জন্ম, সে সত্য গোপন ছিল না, তাই তাতে পাপ ছিল না; নিজে যুধিষ্ঠির সত্যবাদী ছিলেন বলে তাঁর রথ চলত বাতাসের উপর দিয়ে, মাটি থেকে কিছুটা ওপরে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গুরু দ্রোণকে বধ করবার জন্য তাঁকে দিয়ে বলাতে হল অশ্বত্থামা মরেছে। মরেছিল অশ্বত্থামা হাতী। কৃষ্ণ বললে—'হাতী' কথাটা বলে দরকার কি? বল অশ্বত্থামা মরেছে, তাতেই দ্রোণ শোকার্ত্ত হবে। দুর্বল হবে। যুধিষ্ঠির বললেন—অশ্বত্থামা হত ইতি গজ। ইতি গজ বাক্যদুটি আস্তে বলেছিলেন বলে গোটা কথাটাই মিথ্যের সামিল হল। রথখানা তাঁর চিরদিনের জন্য মাটিতে নামল। কিন্তু বাবাকে এমন ভয় করে যে, সব গোলমাল হয়ে যায়। বাবার সকল কাজ আমার ভাল লাগে না। মনে হয়, বাবার মত নিষ্ঠুর অহঙ্কারী স্বার্থপর মানুষ আর নেই।

ওই ভয় করে এবং গোলমাল হয়ে যায় বলেই সে ভায়লেটকে বিয়ে করে কৃশ্চান হবে এবং ব্যবসা করে বড় হবে সংকল্প করে আমাকে চিঠি লিখেছিল টাকার জন্য। নিজের আংটি-বোতাম, হীরে-নীলা বেচে যে-টাকা পেয়েছিল, সে-টাকাটায় বাড়ী কিনে আর সারিয়ে খরচ করে ফেলে আপসোস হয়েছিল। এত খরচ না করলেই হত। কিন্তু যে দেবেশ্বর কীর্তিহাটের রায়দের উন্নতির চরম সময়ে জন্মেছে এবং রাজা-রাজড়ার ছেলেদের মত মানুষ হয়েছে, সে প্রথম প্রেম করে যে-ঘর বাঁধবে, তাতে টাকা খরচ না করে পারে! পারেনি। খরচ করেছিল। এবং খরচ করে তখন ব্যস্ত হয়েছিল টাকার জন্য, টাকা নিয়ে সে ব্যবসা করবে। ব্যবসা সে জানত না কিন্তু সাহস তার ছিল।

যাক ওসব কথা, সে আমল বোঝা কঠিন তোদের পক্ষে। তখন ছড়া ছিল—হট্টমালার দেশের ছড়া। হীরে পোড়ানো মাজনে দাঁত ঘষত, মুক্তো-পোড়ানো চুনে পান খেতো; দুধে তারা আঁচাতো। হীরের মাজনটা অতিরঞ্জন কিন্তু বাকিগুলো সব সত্যি। রায়বাড়ীতে জামাই হোক আর বউ হোক—প্রথম খেতো সোনার থালায়। আর আঁচাবার সময় গাড়ুতে যে জল দেওয়া হত, তাতে অর্দ্ধেকটা দুধ মেশানো থাকত। এই অর্চনার বিয়েতে রথীনকে আঁচাতে জল দেওয়া হয়েছিল, তাতেও দু-ঝিনুক দুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রায়বাড়ীর সে-সম্পদ কল্পনা করতে পারবিনে রে। আমার বিয়ে হয়েছিল দশ পার হয়ে এগার বছরে। তখন কীর্তিহাটের লক্ষ্মীর ঘরে বড় বড় লোহার সিন্দুক মেঝেতে গাঁথা ছিল। সেগুলো ভর্তি ছিল টাকা-

সোনাদানায়। তাছাড়া কলকাতার ব্যাঙ্কে ছিল। কোম্পানীর কাগজে ছিল। বউবাজারের বড়ালদের একচেটে ছিল কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচার ব্যবসা; রায়বাড়ীর জন্তে বছর বছর কোম্পানীর কাগজ আলাদা করে রেখে দিত তারা। তারা জানতই যে, এ-কাগজ তারা কিনবে।

সেই বংশের বড় ছেলে, কলকাতার সেকালের সমাজে বড় হচ্ছে, মেলামেশা করছে। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে একটা সে-কালের আগুন ছিল রে। ভায়লেটের সঙ্গে প্রেম করে সে দুঃখিত হয়নি, লজ্জিত হয়নি, হয়তো সেদিন এমন হঠাৎ রাত্রিকালে তার বাঘের মত বাবা যদি না হাজির হতেন, তবে সে হয়তো ভেবেচিন্তে একটা বোঝা-পড়া করতে চেষ্টা করত। কিন্তু সে প্রত্যাশা করেনি যে, তার বাবা রত্নেশ্বর রায় এসে এমনভাবে নিজে হাজির হবেন। বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠেছিল, ভায়লেট হাসছিল খিলখিল করে, সে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বলেছিল—চু-প!

ভায়লেট তার দিকে তাকিয়েছিল সভয় বিস্ময়ে। কি হল?

ঠিক সেই মুহূর্তে গোপালদা ছুটে এসে বলেছিল—রাজাভাই, সর্বনাশ হয়েছে। কর্তাবাবু!

আবার ডাক ভেসে এসেছিল—দেবেশ্বর!

এবার গোপাল দুড়দুড় করে নেমে পালাবার সময় বলেছিল—পালিয়ে এস খিড়কীর দরজা দিয়ে।

—ওই মেথর ঢোকে যেদিক দিয়ে?

—নইলে আর পথ নেই।

—তুই যা। তুই পালা। ওই পথ দিয়ে আমি পালাতে পারব না।

—তাহলে? কি করবে?

—আমার যা হয় হবে। তোকে ভাবতে হবে না।

—ভায়লা—?

ভায়লেট উত্তর দেয়নি, দেবেশ্বরকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। দেবেশ্বর বলেছিলেন—আমি বাঁচলে ও বাঁচবে। আমি যদি মরি, তবে যা হয় হবে। ওদিকে তখন নীচে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়ছে। ভেঙে ফেলবে দরজা।

দেবেশ্বরেরও চারিদিক বন্ধ, রত্নেশ্বরের হুকুম শুনতে পাচ্ছেন তিনি—ভেঙে ফেল। তোড় দো। ওদিকের দরজা আটক কর। কোনদিকে পরিত্রাণের কোন পথ নবীন দেবেশ্বরের চোখে পড়েনি, শুধু পড়েছিল বন্দুকটা। একনলা ব্রিজ লোডিং গান্ একটা—দেবেশ্বর নিজের জন্ম লাইসেন্স করিয়ে কিনেছিলেন; সেই বন্দুকটাও ওই বাড়ীতেই তিনি রেখেছিলেন। কোন বিপদের ভয় করে রেখেছিলেন—এটা ঠিক নয়, তবে দেবেশ্বর রায় যে-বাড়ীতে তাঁর প্রথম প্রিয়াকে নিয়ে বাস করবেন, সে-বাড়ীর দরজায় সঙীনধারী পাহারাদার থাকবে না এটা তাঁর ঠিক ভাল লাগেনি। তিনি সংগীনওলা বন্দুক এবং তার সঙ্গে পাহারাদারের লাইসেন্সের চেষ্টা করছিলেন গোপনে। সেটা না-হওয়া পর্যন্ত নিজের অতিপ্রিয় এই একনলা বন্দুকটিকে ভায়লেটের শোবার ঘরের কোণে খাড়া করে রেখেছিলেন।

গোপাল ঘোষ চলে যেতেই দেবেশ্বর একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখে দেখতে পেয়েছিলেন এই বন্দুকটাকে। তিনি ছুটে গিয়ে বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাতে টোটা পুরে শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর চিঠিতে আছে—"আত্মহত্যা করিবার জন্য সেদিন বন্দুক আমি তুলি নাই। অপমানের হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই বন্দুকে টোটা পুরিয়া আমি নিচে নামিয়া যাইতেছিলাম। ইচ্ছা ছিল—যে বেতনভোগী ভৃত্যদিগের পাশবিক বলের উপর নির্ভর করিয়া আপনি আমার বাড়ীতে আমাকে অপমান করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত আমি বুঝাপড়া করিব। আমার দারোয়ান নাই, আপনার আছে, আমি একনলা বন্দুক হাতেই তাহাদিগকে ঠেকাইয়া বলিব—চলিয়া যাও। কিন্তু ভায়লা ভয় খাইল। সে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—আমার রাজাবাবু, না-না-না, এমন তুমি করিও না। না। তাহাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে কি করিব? তুই বল—কি করিব? সে উত্তর দিতে পারে নাই। আমার একটা কথা মনে হইল, বলিলাম—তবে আয় আমরা দুইজনেই মরি। আমি তোকে গুলি করিয়া মারিয়া নিজে আত্মহত্যা করিব কিন্তু সে তাহাতে আরও ভয় পাইয়াছিল। তখন আমার আর আপসোসের সীমা ছিল না। এ কাহাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করিয়াছি? এখন মনের মধ্যে আগুন আরও প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠিল। বলিলাম—বেশ, তবে তুই থাক। আমিই মরিব। ইহার পর আর বাবার সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব না। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা থুত্নীর নিচে লাগাইয়া বাঁট্টা মাটিতে রাখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু দেখিলাম বন্দুকটা আমার থুত্নী অপেক্ষা ছোট; ওদিকে দরজাটা ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমি বন্দুকের নলটাকে বুকে লাগাইয়া পা দিয়া ঘোড়াটা টিপিয়া দিলাম। তাহার পর আর জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আজ আবার বাঁচিয়া উঠিয়া মনে হইতেছে—গলায় লাগাইলাম না কেন! তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিয়া আপনি জন্মদাতা পিতা আপনার সহিত পত্রে এই ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে হইত না। আপনি আমাকে একরূপ বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ভায়লেটের কি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আপনি কি করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানাইবার জন্য আপনার নিকট মিনতি করিতেছি। গোপালদাদা কোথায়? তাহার কি করিলেন? আপনি এইসব সংবাদ আমাকে জ্ঞাত করুন। অন্যথায় আমি আর মরিবার চেষ্টা করিব না। এবার আমি বিদ্রোহ করিব। এই বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়া কৃশ্চান মিশনারীদের শরণাপন্ন হইব। সেখান হইতে রক্ষা করিতে আপনি আমাকে পারিবেন না।"

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা-মা বললেন—চিঠিখানা পুরো এক মাস এক সপ্তাহ পর, যেদিন ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলে সাহেব ডাক্তার—সেইদিন সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিঠিখানা লিখছিল, আমি ঘরে ঢুকলাম। বললাম—এ কি! সকালে ব্যাণ্ডেজ কেটেছে বিকেলে চিঠি লিখছিস। কাকে চিঠি লিখছিস দেবু?

আমরা কাশী থেকে এসেছিলাম সেই ঘটনা যেদিন ঘটে, সেইদিন, রাত্রে খবর পেয়ে জোড়াসাঁকোর জেঠামশাইয়ের বাড়ী থেকে জানবাজারের বাড়ীতে এসেছিলাম। সাহেব ডাক্তার দেখে বললে বটে—জখম এমন কিছু নয় রায়বাবু, শুধু বগলের নীচে খানিকটা মাংস

কেটে বেরিয়ে গেছে, সারতে বেশীদিন লাগবে না। তবুও যত্ন আর সাবধানতায় অন্ত ছিল না। কীর্তিহাট থেকে সরস্বতীবউ এসেছিল ; সেবার জন্তে তখন মেম-নার্স পাওয়া যেত, মেম-নার্স এসেছিল। একজন দেশী ডাক্তার চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ীতে থাকত। আমি কাশী চলে যেতে পারিনি। দেবুর ওই অবস্থায় যার জন্তে এসেছিলাম, একটা বিষয়ের মিটমাটের জন্তে তাও হয়নি, আর দেবুর জন্তে যে-মেয়েটির বিয়ের কথা পাকা করতে চেয়েছিলাম তাও হয়নি। আর আমি কাছে থাকলেই দেবু স্বস্তিতে থাকত, শাস্তিতে থাকত। উঠে গেলেই চাকর-ঝি যাকে সামনে পেত বলত, রাঙাপিসীকে ডেকে দে।

আমার বদলে বউদি—সরস্বতী-বউ গেলে চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকত। কথা বলত না।

বউদি বিরক্ত হতেন। বেরিয়ে এসে আমাকে বলতেন—তুই যা অন্নপূর্ণা, আমাকে দেখে মুখ গোঁজ ক'রে চোখ বুঁজল।

আমি গিয়ে বসে ডাকতাম—দেবু! দেবু রে!

বোঁজা চোখ অমনি খুলে যেত, বলত—কোথা গিয়েছিলে ?

—কেন ? কি হল ? শুয়ে ঘুমো না।

—তোমার পায়ে পড়ি রাঙাপিসী, তুমি খবর এনে দাও ভায়লেটের কি হল ? সে কোথায় ? আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না। He can do anything and everything.

—কি বলছিস ?

—ঠিক বলছি। তোমার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে কি করছে দেখছ না ? ন্যায়তঃ ধর্মতঃ সম্পত্তি তোমার। বীরেশ্বর রায়ের ঔরসে ভবানী দেবীর গর্ভে তুমি জন্মেছ ; উনি সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র, তাকে বীরেশ্বর রায় সন্তান হবে না বলে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন এবং সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছিলেন বলে সে-সম্পত্তি তিনি তোমাকে দেবেন না। আমি গল্প শুনেছি—প্রথম যৌবনে ওঁর বিয়েরও আগে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিস সাহেবকে কীর্তিহাটের বাড়ীতে ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন পাতবার জন্তে এনে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় নকল অসুখের ভান ক'রে দশ ক্রোশ দূরে রাধানগরে দে-সরকারদের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন। গোপাল সিং নাম এক ছত্রি প্রজাকে এনে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করেছিলেন—

অন্নপূর্ণামা বললেন—কথাগুলো আমার কানেও কটু ঠেকছিল রে। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, না, তুই জানিসনে ঠিক। সে-সব আমার বাবার আমলের কথা, বীরেশ্বর রায়ের আমলের।

—তাও জানি। তাতেও আমার বাবা অংশীদার। তারপরের কথা তুমি জান না রাঙাপিসী। বিয়ে হয়েছে এগার বছর বয়সে, প্রথম কেটেছে তোমার কাশীতে বিমলাকান্ত ঠাকুর্দার কাছে ; আমি এখানে কীর্তিহাটে কলকাতায় আছি, দিনরাত্রি শুনছি, দেশের ধন্যপুরুষ রত্নেশ্বর রায়ের সুনামের কথা, খ্যাতির কথা আর চোখে দেখছি তাঁর আসল চেহারা। আমার দাদামশায় Retired Subdivisional Officer—সিগার মুখে দিয়ে আসেন, তিনি

উপদেশ দিয়ে যান, কি ভাবে কি করা উচিত। কিসে সুনাম হবে। I know them, I know them. আমি বলতে পারব না—এ case-এ তিনি কি পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু দিয়েছেন—তা নিশ্চিত। একটা অনাথা কৃশ্চান মেয়ে যার তিনকুলে কেউ নেই, তাকে কিছু করা কি অসম্ভব?

দেবুর কথাটা আমার খুব বাড়াবাড়ি মনে হত না সুরেশ্বর। সে-আমলে কি এমন কঠিন কাজ। রবিনসন সাহেবের মত একজন ইউরোপীয়ানের বাচ্চাকে খুন করাতে যারা পারে, তার জন্যে যারা আসর সাজিয়ে নেয়; থানার দারোগাদের টাকা ঢেলে দিয়ে মুখ বন্ধ করতে পারে, তাদের কাছে এটা কি একটা শক্ত কাজ?

আলফান্সো মরেছে, অঞ্জনা মরেছে, তার বেটী, সে রত্নেশ্বর রায়ের ছেলের মন ভুলিয়েছে, জাত-ধর্ম তার যৌবনে রূপের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে—সেখানে মেয়েটাকে—

আমি শিউরে উঠতাম। খোঁজ করবার চেষ্টা করলাম অনেক—অনেককে দিয়ে, কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড সুরেশ্বর, জানবাজারের চাকর-বাকর, মানুষজনের পেটের মধ্যে এই কথাগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, তারা স্মরণ করতে পারে না; ভায়লেট বলে কাউকে জানে না—নাম কখনও শোনেনি, এমনি তাদের চাউনি, এমনি তাদের মুখের ভাব।

যেন ঠোঁটদুটো সেলাই করে দিয়েছে।

সেদিন চিঠিখানা লিখছিল, লেখা প্রায় শেষ করে এনেছিল, সে চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—প'ড়ে দেখ!

প'ড়ে শিউরে উঠে বললাম—এই চিঠি তুই দাদাকে দিবি?

—না দিয়ে কি করব পিসী? আমার জন্যে যদি বাবা ভায়লেটকে কি গোপালদাকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে হয়—।

থেমে গেল দেবেশ্বর। তারপর সামলে নিয়ে বললে—আবার আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। এবার আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। এবার আর ভুল হবে না।

ঠিক এই সময়ে সুরেশ্বর, হঠাৎ পাশের ঘরে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করার শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম, দেবেশ্বরের মুখখানা যেন শ্বেতপাথরের তৈরী মুখের মত হয়ে গেল।

দাদার গলা। দাদা যে পাশের ঘরে কখন ঢুকেছিলেন, আমরা কেউ দেখিনি, আর বুঝতেও পারিনি।

* * *

সুরেশ্বর বলল—একটু পরিষ্কার করে বলি সুলতা, দোতলার মাঝখানে যে ঘরখানায় বাবার আমলে ড্রয়িংরুম ছিল, যে-ঘরখানায় আমার ছবির প্রথম এগজিবিশন হয়েছিল, যে ঘরখানায় বীরেশ্বর রায় থাকতেন তাঁর অসুখের সময়, সেই ঘরে রাখা হয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে আর তার পাশের যে-ঘরটা ওদিকে অন্দরের সঙ্গে যুক্ত, যে ঘরে আমার মা মারা গিছলেন, যে ঘরে ভবানী দেবী বসে পুজো করতেন, যে-ঘরে বসে রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়কে লেখা ভবানী দেবীর পত্র এবং তার পালক পিতার পত্র পড়ে আত্মপরিচয় জেনেছিলেন, জেনেছিলেন—জেনেছিলেন, তিনি বিমলাকান্তের এবং বিমলা দেবীর সন্তান নন—তিনি বীরেশ্বর রায়

এবং ভবানী দেবীর পুত্র, এ-ঘর সেই ঘর। ভবানী দেবীর পুজোর ঘরই জানবাজারের বাড়ীর লক্ষ্মীর ঘর। ঘরখানার নামই ছিল লক্ষ্মীর ঘর। ওঘরে দেওয়ালে এখনও লোহার সিন্দুক পোঁতা আছে। সে আমলে এই ঘরেই আরও কয়েকটা লোহার সিন্দুক ছিল, তাতে এখানকার লগ্নী-ব্যবসার কাগজপত্র, কোম্পানীর কাগজ থাকে থাকে সাজানো থাকত। রত্নেশ্বর রায় নতুন কোম্পানীর কাগজ কিনে সিন্দুকে তুলে রাখতে এসেছিলেন।

একশো বছর নয়, তবে পঁচাত্তর বছর আগে, এসব কাজ অর্থাৎ সিন্দুক খোলা, টাকা, সোনাদানা, মোহর, জহরত নাড়াচাড়া করার সময় লোকে অনেকটা সন্তর্পণেই করত। ব্যাঙ্ক তখন হয়েছে, তবুও মোহর কিনে কলসীবন্দী করে জমা করা আর কোম্পানীর কাগজ কিনে রাখার চলই ছিল বেশি।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা এখানকার নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাসী দারোয়ানকে দরজায় রেখে অন্দরের দিকের দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছিলেন। এবং কোম্পানীর কাগজ সিন্দুকে রেখে, সিন্দুক বন্ধ করার সময় এঘরে দেবু যে সব কথা আমাকে বলছিল, তা সব শুনেছিলেন। শুধু কিছুক্ষণ শুনেই নায়েবকে বলেছিলেন —তুমি নিচে যাও।

নায়েব নিচে নেমে গেলে তিনি দাঁড়িয়ে দেবুর কথা শুনতে শুনতে আর সহ্য করতে পারেননি, শব্দ করে গলা ঝেড়ে একটা সাড়া দেওয়া অভ্যেস তাঁর ছিল, ঠিক সেই শব্দ করে সাড়া দিয়ে দারোয়ান বচ্চন সিংকে ডেকে বলেছিলেন—"বচ্চন, এই দরওয়াজাটা খোল তো!

ভারী দরজা, মোটা লোহার খিল, তার সঙ্গে হুক, খোলা সহজ নয়। বচ্চন সিং ছিল পালোয়ান, সে অল্পক্ষণেই খুলে ফেলে দরজাটা খুলে দিয়ে পাল্লাদুটা ঠেলে দিলে, আর দাদা বেরিয়ে এসে এ-ঘরে ঢুকলেন।

সুরেশ্বর, সে মূর্তি এখনও মনে পড়ছে আমার। পরনে গরদের ধুতি, গায়ে গরদের চাদর। হাতে লোহার সিন্দুকের চাবির থোলো, পা খালি। লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকেছিলেন বলে এই বেশ আর খালি পা। চোখ মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারা যায় না, শুধু রায়বংশের সোনার মত যে গায়ের রঙ, তাতে যেন খানিকটা সিন্দুর লেগেছে বলে মনে হল।

এসেই প্রথমে নার্সকে বললেন—তুমি একটু বাইরে যাবে?

নার্স বাইরে যেতেই দাদা বললেন—যে-সব কথা তুমি বলেছিলে তোমার রাঙাপিসিকে, তা অন্তত এই নার্সটার সামনে বলা উচিত হয়নি। পিতৃনিন্দা সত্য হলেও করতে নেই। তবুও যদিই কর, তবে বাইরের লোকেদের সামনে করাটা ঠিক নয়।

আর লুকিয়ে কারুর কথা শোনা উচিতও নয়, সে অভ্যাসও আমার নেই, কিন্তু আজ অকস্মাৎ হয়ে গেল, শুনে ফেললাম; সাড়া দিতে ভুলে গেলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবার মত ঠিক অবস্থা ছিল না আমার।

থাক্ সে কথা। এ আমার ভাগ্য। আমি রায়বংশের ধারাকে নির্মল করবার জন্যে, অভিশাপের ধারা থেকে বাঁচাবার জন্যে যে চেষ্টা করেছি সে মিথ্যে হয়ে গেছে। সে সব কথা থাক। এখন যা জানবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছ তাই বলি। এ বাড়ীর কোন লোককে

আমি বিশেষ কিছু জানতে দিইনি। ভায়লেটকে তুমি ভালবেসেছ, তাকে তুমি আমার চোখে ধুলো দিয়ে কীর্তিহাট থেকে নিয়ে এসে এখানে রেখেছিলে, সেখানে গুজব রটেছিল গোপালের নামে। আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। গোপাল যদি ঠাকুরদাসের ছেলে না হত, তবে তার ঘাড়ে মাথা থাকত না। ভায়লেট আলফান্সোর কন্যাই শুধু নয়, সে অঞ্জনার মেয়ে। অঞ্জনার কাছে তার মৃত্যুশয্যায় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা চুপ করে গেলেন। দাঁতে দাঁত টিপে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দুটি ধারায়। কিছুক্ষণ পর অজগরের মত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—শোনো, ভায়লেটকে আমি খুন করাইনি, গোপালকে আমি কোন শাস্তি দিইনি। তবু রায়বংশের জাত আর মানটাকে আমাকে বাঁচাতে হবে, তাই অপবাদ গোপালের নামে রয়েছে—রয়েছে। তাকে আমি লোক পাঠিয়ে এইটুকু শুধু বলেছি যে, সে যেন কীর্তিহাট কি শ্যামনগর আর না যায়। তাকে বলেছি, আমি তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব, সে এখানে ব্যবসা করুক, বিয়ে করুক। আরও টাকার প্রয়োজন হয় তাকে আমি দেব। সে ঠাকুর-দাসের ছেলে, সে তোমার অপরাধ রায়বংশের কলঙ্ক মাথায় নিয়েছে। তার অঙ্গ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তবে তোমার সঙ্গে আর তার সম্পর্ক থাকবে না।

আর ভায়লেট। ভায়লেট অন্তর্বত্নী—।

বুঝতে পারলে না? অন্তর্বত্নীর অর্থ? অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান হবে তার। তাকে এক মিশনের নিরাপদ আশ্রয়ে আমি রেখেছি। তার যাবতীয় খরচ আমি বহন করব। তোমার বাপকে তুমি বিশ্বাস কর। অন্ততঃ এই কথাটা বিশ্বাস কর। তবে—।

একটু থেকে গম্ভীর গলা আরও গম্ভীর করে তুলে বললেন—তবে তোমার বিবাহ দেব আমি দু-এক মাসের মধ্যেই। বিবাহ তোমাকে করতেই হবে। তার জন্য তুমি প্রস্তুত থেকো।

বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। খিল—হুক বন্ধ হল একে একে।

অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—সুরেশ্বর, তোকে বলব কি, আমরা—মানে আমি আর দেবু দু'জনেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। ওই ক'টা কথা রে, তার যে কি ভার আর ওই যে আস্তে গলায় বলা, তার শব্দ যেন আমাদের শুধু বোবা না, কালা সুদ্ধ করে দিলে।

দরজাটা বন্ধ হতে হতে আবার খুলল, আবার। দাদা বললেন—ভায়লেটকে আমি নিরাপদে রেখেছি, তার সন্তান হলে তার ভারও আমি নিয়ে যাব। তোমায় পাপ—আমি ক্ষমা কোন-মতেই করতাম না; করলাম তার কারণ এ-পাপ তোমার নয়, এ-পাপ রায়বংশে জন্মেছ বলে তার ভাগী হতে বাধ্য হয়েছ; রায়বাড়ীর আশেপাশে সে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে, দরজায় ধাক্কা দিয়ে বেড়িয়েছে। দরজা খোলো—দরজা খোলো। কিন্তু আমি সারাজীবন জেগে থেকে ঢুকতে দিইনি। তুমি জানতে না—অসতর্ক মুহূর্তে সে তোমাকে আশ্রয় চেয়েছে, তুমি ধনীর ছেলে মানীর ছেলে ভূস্বামীর ছেলে, তাকে আশ্রয় দিয়েছ। দিয়ে ফেলেছ। জানতে না। শ্যামাকান্তের অপরাধ—যোগভ্রষ্টতার শাস্তি, সোমেশ্বর রায়ের—বীরেশ্বর রায়ের ধারা আমি রুখতে গিয়েও পারলাম না। অঞ্জনার রূপ ধরে বাড়ী এসে ঢুকেছিল বুঝতে পারিনি।

বলেই চুপ করে গেলেন। দরদর করে চোখ থেকে জল গড়াল। একফোঁটা দু'ফোঁটা নয় রে—ধারা বয়ে গেল। এরই মধ্যে কখন যে সরস্বতী-বউ এসে ঘরে ঢুকেছিলেন, আমরা কেউ জানতে পারিনি; তিনি দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দা আগলে; পাছে সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ এসব কথা শুনে ফেলে।

হঠাৎ দরজাটা বন্ধ করে তিনি যখন ঘরে এসে ঢুকলেন, তখন আমাদের খেয়াল হল। তিনি এসে স্বামীর হাত ধরে বললেন—করছ কি? এসব হচ্ছে কি বল তো? যা হয়েছে তা হয়েছে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে ছেলেটা বেঁচেছে। বাবা এসেছিলেন, তিনি ফিরে চলে গেলেন, বলে গেলেন—ওবেলা আসবেন। এর মধ্যে আসতে চাইলেন না। বললেন—জমিদারবাড়ীতে রাজাদের বাড়ীতে যে সব কাণ্ড ঘটে, তার তুলনায় এটা আর কি এমন একটা ব্যাপার।—শুধু তোমার জন্যে বললেন—এতখানি কড়াকড়ি ভাল নয়; ও একটু কড়া বেশী। ছেলেটা এত ভয় পেয়েছিল যে সুইসাইড করতে গেছল। চল—মুখ-হাত ধুয়ে সরবৎ খাবে চল।

দাদা যেন এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সরস্বতী-বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন—ওই লক্ষ্মীর ঘরের ভিতর দিয়েই। দরজা বন্ধ করলেন। এদিক থেকে দারোয়ান এসে ঠেলে দেখলে।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

আমি দাদার কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিলাম। চোখ মুছে দেবুর মুখের দিকে তাকালাম।—অবাক হয়ে গেলাম সুরেশ্বর। দেখলাম—দেবেশ্বর গুম হয়ে যেন বসে আছে। দাদার মত এমন একজন কড়া মানুষ, যার মুখের দিকে প্রজারা তাকাতে পারত না। তার চোখের জল তাকে যেন এতটুকু ভেজাতে পারেনি। কালা-বোবা সে আমারই মত হয়েছিল কিন্তু সে আমার মত গলেনি।

আমি তাকে ডাকলাম—দেবু!

সে নড়লে না, যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল, যেদিকে তাকিয়েছিল সেইদিকেই তেমনিভাবে তাকিয়ে রইল—শুধু বললে—বল রাঙাপিসী!

তার সেদিনের সেই লেখা চিঠিখানা টেনে নিলাম, সে আপত্তি করলে না; বললাম—এটা ছিঁড়ে দে। ক্ষমা চেয়ে একখানা চিঠি লেখ।

—না।

—না? অবাক হয়ে গেলাম আমি।

—না।

—এরকম চিঠি তুই লিখতে পারবিনে।

—তা লিখব না। যা উত্তর চাচ্ছিলাম—তা পেয়ে গেছি। ভায়লেটকে উনি যখন ভাল জায়গায় রেখেছেন, বলেছেন—আর গোপালদার সম্বন্ধে যা করব বলেছেন, তাতে আমি অবিশ্বাস করব না। তা উনি করবেন। অন্ততঃ লোক দেখিয়েও করবেন। কিন্তু ক্ষমা আমি চাইব না।

আমি চুপ করে রইলাম। দেবু বললে—শুনেছ? এই অবস্থার মধ্যেও বাবা আমার কনে ঠিক করেছে? একটি দশ বছরের খুকী।

—তুই কি বিশ-তিরিশ বছরের বুড়ো? তোর কনে দশ বছরের ছাড়া ক' বছরের হবে? ও-মেয়েকে আমি জানি।

—জান? মেয়েটি ভাল তো? মানে, সইতে পারবে তো আমার মত মানুষকে?

—কেন রে? তুই এমন মন্দ মানুষ কি মস্ত মানুষ এ-কথা তোকে বললে কে?

—নিজেই বলছি। আমাকে বিয়ে যে করবে, সে হয় আমার ভালবাসার জ্বলে মরবে রাঙাপিসী, আমার ভালবাসার উত্তাপ আগুনের মত। নইলে আমার অবহেলায় ফেলে দেওয়া অপছন্দের পোশাকের মত এককোণে পড়ে থাকবে। ধুলোয় পোকা-মাকড়ে ভরে যাবে।

সুরেশ্বর, আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—দেবু, এরকম কথাবার্তা তোর হল কি করে রে? কি করে শিখলি?

—তা জানিনে পিসী, তবে শিখেছি। আপনি কথাবার্তা আসে। ভেতর থেকে যেন কে যুগিয়ে দেয়। সে-কথা থাক। যা বলছি শোন, তুমি বিয়ের সম্বন্ধ করেছ বিয়ে আমি করব। ভালও তাকে বাসতে চেষ্টা করব। ভায়লেটের উপর আমার আকর্ষণ আর নেই। সেদিন ওকে বলেছিলাম—তুই দাঁড়া, তোকে গুলী করি, তারপর নিজে গুলী খেয়ে আত্মহত্যা করব। দুজনে একসঙ্গে মরব দুঃখ থাকবে না। তা দেখলাম—কি ভয়! একসঙ্গে মরতে যে ভয় করে, তার ভালবাসার আবার দাম কি? কানাকড়িও না। হিঁদুর মেয়ে তবু বাধ্য হয়ে বিধবা হয়ে স্বামীর বদলে ঈশ্বর ভজে বাঁচে। কোন মানুষকে আর বিয়ে করে না। এ তো ক্রীশ্চান, আমি বেঁচেছি ভাই, মরলে তো আর কাউকে বিয়ে করে দিব্যি গাধাবোটের মত অন্য স্টীমারের টানে ভেসে চলত। নাঃ—ওকে আর আমার চাইনে—ওকে আমি আর কোনদিন ফিরে দেখব না। হিন্দু মেয়েই ভাল। কিন্তু বাবাকে তুমি বল আমার ভিক্ষেমায়ের সম্পত্তি দেবোত্তর, আমাকে লিখে দিতে। আমি আলাদা হয়ে যাব। বাবার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে হলে আবার আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা-মা এখানেই নিজে মুখে কথা বলা শেষ করেছিলেন। তার কারণ বন্ধ দরজায় টোকা পড়েছিল. টোকা নয়, মৃদু ধাক্কা; আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এসেছিল—আমি রথীন!

অর্চনা মুখ নত করেছিল লজ্জায়; আমি একটু হেসেছিলাম; অন্নপূর্ণা-মা বলেছিলেন—যা, দোর খুলে দে। বাপ রে বাপ—মাণিক এসেছে, ওঠ ওঠ! অর্চনা গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই একরাশ ওষুধের গন্ধ ছড়িয়ে রথীন ঢুকল। হাতে একখানা খাম। হেসে বললে—ক'টা বাজছে ঠিক আছে মা-মণি? নিজের পিতৃবংশের গল্প বলতে গিয়ে বারোটা বাজিয়ে ফেললে যে। আর তো দেখি ক' মিনিট বাকি। ডাক্তার হিসেবে বলতে পারি, রাত বারোটার পর যে একটা বাজে, সেটা সচরাচর কেউ শুনতে পায় না। জন্মান্তর স্মৃতি কারুর থাকে না। তোমার বয়স পঁচাত্তর পার হয়েছে। তবু তুমিই হলে এ-বংশের সব। তোমার উপর কথা বলবার ক্ষমতা তোমার নাতিদের নেই। পুত্রবধূর নেই। অর্চনাকে মা বল, সে-

হিসেবে বাবাত্ব দাবী করে বলছি, ঘুমিয়ে পড়, আর না।—

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—হেসেই বললেন—ওরে, আমার বাবা হওয়া সোজা কথা নয় রে! আমার বাবা ছিলেন সত্যি করে রাজা। বুঝলি—তাঁর জীবনে কলঙ্ক অনেক, মদ খেতেন, তারপর বাঈজী ছিল কিন্তু সে-সব আমার মাকে না-পেয়ে। বুঝলি। অর্চনা-যাকে সেইভাবে আদর করলে বাবা বলব, নইলে না। উঃ—কি এত ওষুদের ঝাঁঝালো গন্ধ রে গায়ে।

—ইথার, স্পিরিট, লাইজল গন্ধওলা ওষুদের কি আর শেষ আছে। এক্ষুনি তো হাত ধুচ্ছিলাম স্পিরিট-লাইজল দিয়ে। ওটা আমার বাতিক। তুমি কিন্তু এখন শোও। এখন—সুরেশ্বরদা, তোমার নামে টেলিগ্রাম এসেছে, জানবাজারের বাড়ী থেকে নিয়ে তোমার রঘুয়া এসেছে। তাই জন্যে আমাকে আসতে হল। নাহলে—

—টেলিগ্রাম?—

—হ্যাঁ, মেদিনীপুর থেকে। আমি খুলেছি—। কে একজন সুধাকর টেলিগ্রাম করেছেন—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেন is considering the case of your mejdidi—come sharp.—

* * *

অন্নপূর্ণা-মার সঙ্গে সেই শেষ দেখা আমার। উনি আমার হাতে রেশমী কাপড়ে বাঁধা পুরানো চিঠির বাণ্ডিল একটা দিলেন, বললেন—নিয়ে রাখ, এর মধ্যে সব কথা পাবি। আমার দেবুর কথা। শুনেছি যখন সে মারা যায়, তখন বিকারের ঘোরে কেবলি আমাকে ডেকেছিল রাঙাপিসী রাঙাপিসী, বাবা ভায়লেটকে নর্দমার জলে ডুবিয়ে মেরে দিলেন। ছি-ছি রাঙা-পিসী। তুমি ভুলতে পার? রাঙাপিসী! এর অর্থ অনেক। সে অনেক কথা। তা ওই কাগজের ব্যণ্ডিলের মধ্যে ছিল। দেবেশ্বর রায়ের রাঙাপিসী অন্নপূর্ণা দেবী সযত্নে সব বাণ্ডিল বেঁধে রেখেছিলেন। হয়তো আমার জন্যই রেখেছিলেন। কারণ, সেই রাত্রে ওই বাণ্ডিল হাতে হরিশ মুখার্জি রোড থেকে জানবাজার ফিরে এসে পরের দিন সকালেই আমি মেদিনীপুর রওনা হয়ে গেলাম মেজদির জন্যে। ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেন এসে মেদিনীপুরে ঝড়ো হাওয়ার মোড় ফিরিয়েছেন। ওখানকার অবস্থা সহজ করে এনেছেন মেলামেশার মধ্য দিয়ে, কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে।

মেদিনীপুরে 'বিদ্যাসাগর হল' তৈরী হচ্ছে। জেলার বড় বড় জমিদার, রাজা উপাধিকারী জমিদার মেদিনীপুরে অনেক, নাড়াজোল ঝাড়গ্রাম, কীর্তিহাটের পাশে গর্গ বাহাদুরেরা, রামগড়ের রাজা—সে একটা লম্বা ফর্দ হয়। তাছাড়া রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, জমিদারও আছে। পল্টনী মেজাজের শাসনতন্ত্রের মধ্যে টাকা আদায় সোজা ব্যাপার। টাকা অনেক উঠেছে।

ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের দুর্দিন এসেছে, তার এম্পায়ারের শ্রেষ্ঠ ভূখণ্ডে; বিরাট মহীরুহের শিকড়ে টান ধরেছে, কট কট করে কাটছে; সঙ্গে সঙ্গে মহীরুহটির প্রশাখা এই জমিদারী-গুলোই আগে শুকিয়ে আসছে; তবু যা আছে, দু-চার-দশটা কাঁচা পাতা, ডালের মধ্যে রস, তাই তখন আদায় করে বা সম্বল করে বাঁচতে চাচ্ছে। মানুষকে ভোলাতে হবে। মানুষ

আর সহজে ভুলবে না। তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতির উপর সৌধ গড়ে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা। জমিদারেরা সঞ্চিত টাকা থেকে দিচ্ছেন। ধার করেও দিচ্ছেন। না-দিয়ে উপায় কি? যারা দেশের মানুষ, যারা ইংরেজের সঙ্গে লড়ছে, তারাই জমিদারের প্রজা। জমিদারীর বিপক্ষে ফতোয়া বেরিয়ে গেছে। কীর্তিহাটের জমিদারীতে আমি যথ হয়ে আছি। টাকা আমিও দিয়েছি।

সমারোহ করে কাজকর্ম হচ্ছে। ওখানকার উকিলদের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী, তাঁরা একটু একটু করে কাছে এগিয়ে এসেছেন। ওদিকে মার খেয়ে ক্লান্ত মেদিনীপুরের যৌবনশক্তি গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে ১৯৪২ সালের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে, তিনি আসবেন বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলের ওপনিংয়ের জন্যে। কলকাতায় সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

এরই মধ্যে মেদিনীপুর এসে সুধাকর বাবু উকিলের মারফৎ পিটিশন দিয়ে মিস্টার সেনের সঙ্গে ইণ্টারভ্যু চাইলাম। পেলাম ইণ্টারভ্যু, মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন—ও কেসটার জন্যে অলরেডি আমি রেকমেণ্ড করে লিখেছি। আশা করছি দিন-দশেকের মধ্যেই একটা উত্তর পাব। মনে হয়, ওঁকে ছেড়েই দেওয়া হবে।

মিস্টার সেনের কাছে আশ্বাস পেয়ে কীর্তিহাট ফিরলাম। আমার জীবনের সব গ্রন্থি সব জট যেন খুলে গেল বলে মনে হল। অর্চনার বিয়ে হয়ে গেছে। তবে—। তবে ফেরবার দিন অর্থাৎ টেলিগ্রাম নিয়ে রথীন যখন অন্নপূর্ণা-মার ঘরে ঢুকল, তখন তার গায়ে ওষুধের তীব্র গন্ধে আমার মনটা কেমন খারাপ হয়েছিল সুলতা।

আমি যে মদ খাই। অনেকদিন খাচ্ছি। খেয়ালী মানুষ, কখনও ছেড়ে দি, খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করি, আবার কখনও প্রতিজ্ঞা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ধরি। আমার বাধাবন্ধ নেই। গুরুজন নেই, লজ্জা-সংকোচও নেই। কিন্তু যাদের বাধাবন্ধ আছে, তাদের জানি। তাদের দেখেছি, তাদের চিনি।

১৯৩৭ সাল পার হয়ে ৩৮ সালের কাল চলছে, আমাদের জীবন পাল্টাচ্ছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি সব দিক থেকে। ১৯৩০ সালের 'মাস' মুভমেণ্টের পর যে এবার কোন মুভমেণ্ট আসছে তা কেউ জানে না, তবে সেটা যে ১৯৩০ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না এটা নিশ্চিত। তবে সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ব্যাকগ্রাউণ্ডে কুইট ইণ্ডিয়া, আজাদ হিন্দ, তার সঙ্গে পিপলস ওয়ারের কল্পনা কেউ ভাবতে পারে না। বড়জোর ভাবে, আর একটা রিফর্ম। শুধু মুসলিম লীগকে রাজী করতে পারলেই হয়। নতুন কালের মানুষেরা স্পষ্ট বলছে—পুরনো কিছু চলবে না। তার সঙ্গে রথীনের মদ খাওয়ার সামঞ্জস্য আছে। তবু মনে দুঃখ পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম অন্নপূর্ণা-মার জন্যে। তিনি বেঁচে থাকতেই এই হল। তা হোক, উনি আর ক'দিন।—এই বলে সান্ত্বনা নিতে গিয়েও নিতে পারিনি। দুঃখ হয়েছিল অর্চনার জন্যে। মেয়েটা বড় ভাল মেয়ে। অন্নপূর্ণা-মার মেজদির কথা রায়বাড়ীর প্রবাদে আমার বিশ্বাস নেই। ভবানী দেবী অর্চনা হয়ে ফিরে আসেননি। সায়েন্স অব হেরিডিটি আছে। চেহারায় এমন মিল বিচিত্রভাবে একবংশে দেখা যায়। চরিত্রেও মিল হয়। অর্চনার সঙ্গে

ভবানী দেবীর চেহারা চরিত্রের ঠিক সেই মিল। মেয়েটা অন্যায় কিছু সহ্য করতে পারবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এদের প্রতিবাদ থাকে—অর্চনারও আছে। রথীনের মদ খাওয়া কি ও সহ্য করতে পারবে? ভেবেছিলাম—ওকে ডেকে বলে দেব, সহ্য করে নিস অর্চনা। ও ডাক্তার মানুষ। একালের ডাক্তার। ১৯৩৮ সালের। দেখ, এককালে বীরেশ্বর রায়ের আমলে প্রবাদ ছিল রায়বাড়ীর ইটগুলো মদে ভিজিয়ে তৈরী করে পোড়ানো হয়েছিল। কীর্তিহাটের মাটি মদ খায়। সে গোটা বাংলা দেশেই। তারপর আবার মোড় ফিরেছিল। তারপর ফের আবার মোড় ফিরেছে রে। তোরা মাথার ঘোমটা টেনে নামিয়ে শুধু স্বাধীন জেনানা হতেই চাচ্ছিসনে, স্বাধীনতা আনবার জন্যে বোমা পিস্তল নিয়েও কারবার শুরু করেছিস। আমি বড়লোকের বাড়ীর পার্টির খবর জানি, মেয়েরা এখন হেল্থড্রিংকও করছেন। সুতরাং ও নিয়ে মাথা ঘামাসনে ভাই। লোকটাকে যদি ভালবেসে ফেরাতে পারিস তো ফেরা। নইলে মেনে নে। মনে হয়েছিল মানাতে পারবে অর্চনা।

এরপর জট মেজদিদি। তার জটও খুলে দিচ্ছেন বিধাতা। অথবা ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে আপনি খুলছে। মেজদিকে কীর্তিহাটের দেবসেবার ভার দিয়ে আমি ছুটি নেব।

ছুটি মানে কীর্তিহাট থেকে ছুটি, রায়বংশের গ্রন্থি খুলে ছুটি। চলে যাব, ঘুরে বেড়াব পৃথিবীময়, টাকা আছে আমার। ঘুরে বেড়াব। দুনিয়াময়। এবং একদিন কোথাও কোনও বিদেশে বা স্বদেশে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকব, একদিন চোখ বুঁজব। এবং এইসব কাহিনী লিখে যে সব ছবিগুলো তখন পর্যন্ত এঁকেছিলাম, সেগুলো তোমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে এ্যাটর্ণী সলিসিটারকে দিয়ে যাব। আমার ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায় তাঁর ছোট ছেলে অর্থাৎ আমার বাবাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়তে চেয়েছিলেন। আমার বাবা অর্ধেকটা হয়েছিলেন তাঁর মনের মত, অর্ধেকটা হয়েছিলেন তাঁর মত। তাঁকেও আমার ঠাকুরদা বলে গিয়েছিলেন।

Don't marry,—my boy—একটি স্ত্রীলোক ছাড়া দুনিয়ার সব স্ত্রীলোককে যদি মা ভাবতে পার, বলতে পার, তবেই বিয়ে করো; and try to love her—try to find out that Eternal She—in her. she is in every woman, just awaken her.

যদি চেষ্টা কর তবে নিশ্চয় একদিন ভালবাসা আসবে। পাবে—দেবে। তা যদি না পার, তবে বিয়ে করো না। একা হয়ে থাক। তোমার নিজের মা; fortunately আমার কন্যা নেই, তোমার বোন নেই, সুতরাং তোমার মা ছাড়া সব নারীর কাছেই তুমি সেই চিরন্তন পুরুষ-Eternal He হতে পারবে। কোন অনুতাপ হবে না, কোন পাপ হবে না। শুধু নারীকে জয় করার মত শক্তি তোমার চাই। আর অনুতাপকে মনের ঘরে ঢুকতে দিতে না পারার শক্তি অর্জন করতে হবে তোমাকে।

বাবা আমার সাতাশ বছর পর্যন্ত সে কথা মেনে এসে, সাতাশ বছর বয়সে আমার মাকে বিয়ে করলেন। তারপর ঠাকুরদা যা বললেন তাই হল; অন্য একজন উয়োম্যান মিশ্র রক্তের

লাবণ্যবতী চন্দ্রিকা এল এবং বাবাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বাবাও চিঠি লিখেছেন মাকে। যখন বম্বে থেকে চন্দ্রিকাকে নিয়ে তিনি ইয়োরোপ চলে যান তখন। লিখেছিলেন, "সুরেশ্বর যেন বিবাহ না করে। আমাদের বংশে অভিশাপ আছে। আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন। কারণ ঠিক জানি না, বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি, রায়বংশের ছেলে, তাদের রক্তে মন্ত এবং নারী সম্পর্কে একটা উদ্দাম ধারা আছে। এ হয়তো সকল পুরুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব, কিন্তু যাদের এই ধারাটা সম্পত্তি, অর্থ, সম্মানের একটা উঁচু ঢিবি বা পাহাড় বা পর্বত থেকে ঝরে, তখন সেটা জলপ্রপাতের মত সশব্দে ঝরে। একটু হাঁক-ডাক করে' ভ্রাভাডো করে' এগুলো করে এবং এই সব মায়াময়ী, মোহময়ী যারা তারা এটা পছন্দ করে। সুরোর বেলা এর সম্ভাবনা খুব বেশী। তুমি তার বিয়ে দিয়ো না। সে বিয়ে করতে চাইলে, তাকে বলো বা আমার এই চিঠি দেখিও। তার প্রতি আমার উপদেশ—Don't marry. End our line with you.

কথাটা আমার মনে গেঁথে ছিল। বিয়ে করব নাই স্থির করেছিলাম। হঠাৎ মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে তুমি এলে। তোমার সঙ্গে পরিচয় বিচিত্রভাবে, ব্রজেশ্বরদার সেই শেফালিকে নিয়ে কেমন চট করে একটা কথায় জট পাকিয়ে গেল। তুমি বললে—ওর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করলেই পারতেন! যাই হোক, ওরা—ওরাও তো মানুষ। মেয়েছেলে। কথাটা সারাদিন মনে ঘুরল, সন্ধ্যেবেলা ট্যাক্সি করে গিয়ে শেফালির বাড়ী গেলাম, তার দুঃখ মোচন করে ফিরে এলাম সগৌরবে। তারপর একদিন গিয়ে দোরে দোরে যারা দেহের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পেটের অন্নের জন্যে, তাদের টাকা দিয়ে ফিরে এসে তারই গৌরবে তোমার কাছে বিকিয়ে গেলাম। তারপর কীর্তিহাটে এসে পড়লাম, রায়বংশের বিষয় আর কৃতকর্মের ইতিহাসের ঘূর্ণিতে। ডুবেই গেলাম। তোমার হাত ছেড়ে দিলাম। নিজে ডুবতেই লাগলাম। টেনে তোমাকে ধরলে হয়ত তুমিই আমার গলা টিপে ধরবে বলে ভয় হল।

সেদিন ১৯৩৮ সালে, সেদিন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বি আর সেনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে মনে হল, যেন ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠলাম। এবার ছুটি পাব। ভাবলাম কি জান, ভাবলাম অর্চনার বিয়ে হয়ে গেছে, মেজদি আমার খালাস পাচ্ছেন, এবার আমি খালাস, জমিদারীর দেবোত্তর যেমন আছে, তেমনি থাকবে, সে ওই মেজতরফই আপন গরজে রক্ষা করবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে পত্তনী স্বত্ব কিনে-কিনে যে সম্পত্তির মালিক হয়েছি, তা সব বেচে দিয়ে চলে যাব; আর ফিরব না। অন্ততঃ কীর্তিহাটে আর না। কলকাতার জানবাজারের বাড়ী. কলকাতার অন্য সম্পত্তি, তাও সব বিক্রিটিক্রি করে চলে যাব ইয়োরোপ, অথবা আমেরিকা, অথবা প্যাসিফিকের কোন দ্বীপে। সেখানে চাষবাস করব, ছবি আঁকব। আর Enjoy করব life।

আজও আমার মনের মধ্যে সেদিনের সেই স্মৃতি জলজল করছে। মনে হচ্ছে যেন হয়ত বা এইমাত্র ঘটে গেছে। মনে পড়লে সেদিনের সেই ইমোশনের স্পর্শও যেন পাই। বলতে পারি, তোমাকে সেদিন আমার এই কল্পনা 'টু এনজয় লাইফ' 'এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া'—এর

মূলে ছিলে হয়ত তুমি। হয়ত বলছি এই কারণে যে, আমি হলপ করে বলতে পারব না যে সে তুমি। সে একজন নারী! যে নারীর বন্ধনে চাষী বাঁধা আছে, মজুর বাঁধা আছে, গৃহস্থ বাঁধা আছে, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, প্রজা, জমিদার, মহাজন, রাজা-মহারাজা, সম্রাট সবাই বাঁধা আছে; তেমনি একজন নারী। যে বিপ্লবীরা তখন আগুন নিয়ে খেলা করে, ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেয়, তাদের কথা ঠিক জানিনে, বলতে পারব না; মনের গভীরের গভীরে কেউ আছেন কিনা যাকে তারা দেশের পর্যায়ে পূজোর ফুলের মত ঢেলে দিয়ে নির্মাল্য করে দেয়। যাদের বাঁধন কেটে বেরিয়ে গেলে তবে গৌতম পরমবুদ্ধ হন, নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন, তেমনি একজন কেউ ছিল। তাঁর মুখ শিলুটের ছবির মত দেখছিলাম। পিছনে ঝলমল করছে আলো; আর সে আমার ঘরে দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকছে। আমি তাকে ঠিক শিল্যুটের ছবির মত দেখছি।

আমি বসে গভীর চিন্তায় যেন ডুবে ছিলাম। ভাবছিলাম এই সব কথাই। ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকল একটি নয়, দুটি মেয়ে। শিলুটের মত।

শিলুটের মত হতে একজনকে চিনতাম, একজন কুইনী; তাকে একদিন বিবিমহলের ছাদের উপর থেকে এমনি শিলুটের মত দেখেছিলাম। কিন্তু অনেকটা দূরে ছিল বলে ছোট দেখিয়েছিল এর থেকে। আর একজনকে চিনলাম না; অপরিচিতা গাউন পরা একটি মেয়ে। তাদের সঙ্গে হিলডা।

অন্নপূর্ণা-মার কথা নিশ্চয় মনে আছে, তিনি তাঁর সোনাভাইপোর প্রথম প্রণয়ের ফলের বংশোদ্ভূতা এই মেয়েটিকে শুধু আমাকে দিয়ে বাড়ীই ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননি, তাকে পড়িয়ে কোন দেশী ক্রুশ্চানের সঙ্গে বিয়ে দেবার অঙ্গীকার আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন। আমি তাকে মেদিনীপুর ক্রুশ্চান মিশনে ভর্তি করতে গিয়ে ভর্তি করিনি। কারণ সেখানে অধিকাংশই ছিল সাঁওতাল আর চুয়াড়দের মেয়ে। তাদের লেখাপড়া কতদূর কি হয় তা বলতে পারব না, তবে আবহাওয়াটা আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। শুধু আমারই বা কেন, বুড়ী হিলডা এসেছিল সঙ্গে, তারও হয়নি। সে বুড়ী হয়েছে, মুখে তার মাকড়শার জালের মত বার্ধক্যের হিজিবিজি রেখা পড়েছে, কিন্তু তার চোখ এবং রঙের মধ্যে একটা পিঙ্গলাভা আছে, ঘষা তামার মত রঙ, যার গৌরব ওরা এখনও করে। সেটা বরং কুইনীর মধ্যেই নেই, থাকলেও ঈষৎ যৎসামান্য, চোখের তারায় শ্বেত রক্তের একটা ছাপ আছে। হিলডা বলেছিল—না বাবুসাহেব, ই জাগায় নেহি। ইতো সব কালাআদমীর মিশন আছে। না-না-না। আমাদের হারমাদী খুন, হারমাদী ইজ্জৎ, না-না। ইখানে কুইনীকে দিব না।

তার জন্যই তাকে শেষ পর্যন্ত দিয়েছিলাম খড়্গপুরে। ওখানে ক্রুশ্চান আছে অনেক; এ্যাংলো আছে; রেলওয়ে ইস্কুল আছে, মেয়েদের বোর্ডিং আছে। সেখানেই কুইনীর পড়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। হিলডা খুসী হয়েছিল, কুইনীও খুশী হয়েছিল।

সেদিন কুইনী ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বলেছিল—নমস্কার স্যার!

মনটা যেন আমার চমকে উঠল। শুধু মন কেন, মন দেহ সব। আচমকা কেউ কিছু বললে যেমন চমকে ওঠে মানুষ ঠিক তেমনি। ঠিক তেমনিই, তবু যেন তার সঙ্গে আরও

কিছু ছিল। হ্যাঁ, আরও কিছু। পরে নিজেকে বিশ্লেষণ করেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি তার সত্যস্বরূপ। সে পরে বলছি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেয়েটিকে যেন বড় আপনার মনে হল, আমার একান্ত করে নিজস্ব সম্পত্তির মত, হ্যাঁ, সুলতা তাই ঠিক, তাই মনে হল। বুকের ভিতরে রক্ত যেন চলকে উঠল। যে চলকানো কখনো তোমার সঙ্গে ইডেন গার্ডেনস-এ বেড়াতে গিয়েও হয়নি।

কণ্ঠস্বরে তার আভাস ফুটে উঠল, মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতেও তার প্রতিভাস ফুটেছিল। বলে উঠলাম—কুইনী!

মেয়েটা থমকে গেল। অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে দৃষ্টি নামিয়ে আমাকে বললে—একটা কাজে এসেছি আপনার কাছে। কোর্টে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, এখুনি ডি-এম-এর সঙ্গে দেখা করে বাসায় এসেছেন। দিদি বললে—

হিলডা সেলাম করে বললে—হ্যাঁ হুজুর, আমি বললাম। উরা শুনতে চায় না। ওদের খুন তেজী আছে, গরম আছে। দরখাস দিতে যাচ্ছিল হুজুর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। হামাদের উখানে হামরা হুজুর কংগিরিসকে ভোট দিলাম না। কংগিরিস ইংরাজ কৃশ্চান লোকের দুষমনি করে। হামি লোক কিরিশ্চান, হামি লোক কংগিরিসকে ভোট দিলাম না।

কুইনী তাকে বাধা দিয়ে বললে—তুমি থাম দিদিয়া। আমি বলছি। মিসেস হাডসন আসুন, আমরা সব বুঝিয়ে বলব। তুমি খুব বেশী বক। থাম একটু।

আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম সুলতা। এই কয়েক মাসের মধ্যেই কুইনী কত পাল্টে গেছে! তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

কংগ্রেসকে ভোট না-দেওয়ার জন্য গোটা কীর্তিহাট গোয়ানদের উপর বিরূপ হয়েছে। তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন জগদীশ্বরকাকা, অর্চনার বাবা আর বিমলেশ্বর-অতুলেশ্বরের ঠিক উপরের বড়ভাই। পরশু যাকে আমি হাত মুচড়ে ধরেছিলাম ইতরামির জন্য সে-ই। তার সঙ্গে রঞ্জলাল ঘোষ আছেন। বৃদ্ধ রঞ্জলাল ঘোষ নাকি বলেছেন—ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লড়াই হবে, সে বড় লড়াই। সে লড়াই করবেন গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, বীরেন শাসমল। এখানে গোয়ানদের সঙ্গে লড়ব আমরা।

হিলডা নিজে এসেছিল রঞ্জলালের কাছে। আপনে ঘোষ, এমুন বাত কাহে বললেন?

বুক চাপড়ে রঞ্জলাল বলেছেন—হামারা খুনী। তারপর বলেছেন—এইবার শোধ হবে আমার পিসের খুনের! পিক্রুজের ফাঁসিতে শোধ হয় নাই!

সেই সব খবর খড়্গপুরের কৃশ্চানেরা আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা পেয়েছে, খড়্গপুর কৃশ্চান গার্লস হোস্টেলবাসিনী কুইনীর কাছে এবং গোয়ানপাড়া গিয়ে হিলডাকে এবং কুইনীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেদিনীপুর ডি-এম-এর কাছে দরখাস্ত করতে। একদিকে ১৯৩০-এর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স সল্ট মুভমেণ্ট, আর পেডি বার্জ ডগলাস মার্ডার করা মেদিনীপুরের প্রচণ্ড ভয়, অন্যদিকে মিলিটারী বুটের থেঁতলানি আর পিউনিটিভ ট্যাক্সের ভারে জর্জরিত মেদিনীপুরে গোয়ানপাড়া থেকে খড়্গপুর অবধি এ্যাংলোদের এবং বিদেশী উপাধিধারী কালো ক্রীশ্চানদের

অবস্থা ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে হেঁটে চলার মত মর্মান্তিক। ভয়ে রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে আস্ফালন করে তাড়ির নেশায় প্রমত্তের মত।

১৯৩০ সাল থেকে বাংলা দেশের সে যুদ্ধের কথা ঐতিহাসিক। সে তো বলার প্রয়োজন নেই, তবু আমার জবানবন্দীর সেদিনের এই ঘটনাটির জন্য উল্লেখের প্রয়োজন আছে, মেদিনীপুরের কথা আগে বলেছি, তার সঙ্গে একটা কথা বলা হয় নি, ১৯৩৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসেছেন নেতৃত্বের আসনে। সদ্য তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন, আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা ডি ভ্যালেরার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। এদিকে নতুন ইলেকশনে গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজের শক্তি, অহঙ্কার, রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধিকে চমকে দিয়ে তার সমস্ত প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে কংগ্রেস সব Province-এ ministry form করেছে। পারে নি সিন্ধু আর বাংলায়। মুসলীম লীগের নায়ক জিন্নাসাহেব স্থির করেছিলেন চিরকালের জন্যে চলে যাবেন ইংলণ্ডে। কিন্তু দুটি প্রদেশে দুটি পা রাখবার জায়গা পেয়ে তিনি জিনিসপত্র লগেজের বাঁধনের গিঁট খুলে ফেলেছেন।

মনে একটা ধাক্কা খেলাম। তাকিয়ে ছিলাম কুইনীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, কুইনী আমার আপনজন নয়?

কুইনী অস্বস্তিবোধ করছিল বোধ হয়। আমার দৃষ্টিতে নিশ্চয় অস্বস্তিকর কিছু ছিল। নিজের দৃষ্টি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, সামনে আমার আয়না ছিল না, আমি আমার দৃষ্টির প্রতিক্রিয়া দেখছিলাম কুইনীর চোখে। কুইনী বললে—দেখুন, নেহাত দিদিমা বললে, সুরেশ্বরবাবু যখন এখানে রয়েছে, তখন আগে তাঁর কাছে যাব। তাঁকে না বলে কিছু করব না, কাউকে কিছু করতে দেব না। নিমকহারামি হবে। তাই ডি-এম-এর কাছে যাবার আগে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কি এর প্রতিবিধান করতে পারবেন?

আমি কিছু বলবার আগেই মিসেস হাডসন বললে—Won't you ask us to sit down Babu?

অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম, বসতে বললাম; রঘুয়াকে বললাম—ভাল মিষ্টি আনতে। চা করতে।

অতিথিদের আপ্যায়ন করে বিদায় করলাম। বললাম—আমি তোমাদের ডি-এম-এর কাছে যেতেও বলব না, বারণও করব না। জমিদার হিসেবে আজ আর আমার খাজনা আদায় করে সরকারের প্রাপ্য সরকারী মালখানায় জমা দিয়ে বাকীটা নিজের জন্যে জমানো বা নিজে ভোগ করা ছাড়া আমার করণীয় কিছুই নেই। বড়জোর দু-দশ টাকা চাঁদা দিতে পারি। দেওয়া উচিত বলে মনে করি। তার বেশী কিছু নয়। তবু কীর্তিহাটে গিয়ে একথা বলব আমি। বলব এই পর্যন্ত। যেমন ঠিক তোমাদের বলছি। তার বেশী কিছু নয়।

—বাস। বাস। ওই সে হোয়ে যাবে কুইনী। বস করো। ছোটবাবু রাজাবাবু যখুন বলিয়েছেন, তখন জরুর সব মিটমাট হো যায়ে গা। দরখাস্ত-অরখাস্ত দেনে কা কুছ জরুরৎ নেহি। চল বাবা, ঘর চল।

মিসেস হাডসন কুইনীকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। পরামর্শ করলে। তারপর ফিরে এসে বললে—বেশ তাই হল। আপনি চেষ্টা করে দেখুন। আমরা অপেক্ষা করব তার জন্ত।

ওরা চলে গেল। শুধু হিলডা যাবার সময় বলে গেল—বাবুসাহেব!

—বল হিলডা!

—হামার পর, কুইনীর পর আপনে গোস্সা করো না। আপনের পর হামিলোগের কোই নালিশ নেহি, কুছ না!

—না-না হিলডা। তা আমি ভাবিনি।

কাতরভাবে হিলডা বললে—বহুৎ জুলুম করছে বাবু, বহুৎ জুলুম!

—আমি বারণ করব। ওদের অনুরোধ করব। তোমরা ভেবো না।

* * *

সন্ধ্যাবেলা থেকে সেদিন আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে ওই রাত্রিটি আমার একটি স্মরণীয় রাত্রি। অবিস্মরণীয়। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

বুঝতে পারলাম ওই কুইনী মেয়েটা আমার সমস্ত দেহ-মনকে এক আশ্চর্য মোহে মোহাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

প্রথম মনে হল, এ আমার রক্তের ধারা। রায়বংশের জীবনের অভ্যাস রক্তস্রোতের মধ্যে একটা রোগের বীজাণুর মত মিশে রয়েছে। সংসারে আজও এমন কোন ছাঁকনি তৈরী হয় নি, যা দিয়ে একে ছেঁকে শোধন করা যায়।

রঘুয়াকে ডেকে বললাম—বাজারে যা, এক বোতল হুইস্কী কিনে আন।

রঘুয়া বললে—আছে।

—আছে? অন্নপূর্ণা-মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শপথ করেছিলাম, মদও আর খাব না। সে আজ ছ-সাত মাস হয়ে গেল! তবু রঘুয়া বলছে, আছে!

রঘুয়া আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললে—আগেও তো তিন-চার দফে ছোড়া, আওর ফের এক রোজ হুকুম হল কি রঘুয়া লে আয় হুইস্কী! তো দো-তিন বোতল তখুন বাক্সমে ছিলো, রেখে দিলাম। আনব?

—আন।

—ইখানে? এই রাস্তার সামনা ঘরমে? উপর চলো। হামি থোড়া কুছ খানাকে সঙ্গে সব তৈয়ার করে দি!

বললাম—দে।

রঘু চলে গেল। আমিও উপরের ঘরে পায়চারি করছিলাম, আর ভাবছিলাম, ভাবছিলাম ওই কুইনীর কথা। ওই কিশোরীটির মুখে-চোখে, সকল তনু ঘিরে থাকা একটা আশ্চর্য মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। রায়বংশের স্রোতের মুখে ওই তনুখানিকে যেন একখানি কুমারী তরণীর মত নিজের ভাগ্যের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম, কই সুলতাকে নিয়ে তো এমন কল্পনা করনি? কুইনীকে

নিয়ে কেন ?

চট করে মন উত্তর দিয়েছিল, সুলতা তোমার দ্বারা উপকৃতা নয় ; তোমার অধিকারের মধ্যে সে বাস করে না। তোমার দানের অর্থে সে অন্নে শিক্ষায় দেহ-মনকে পুষ্ট করছে না।

বোধ করি ওর একটা দাবী আছে। আগের কালে এ দাবী ছিল সোচ্চারে ঘোষিত। জীবনে এবং জগতে সব ভ্যালুর মধ্যে সম্পদের ভ্যালু হল প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ; ওর স্ট্যাণ্ডার্ড—গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে মাপ করা। তার সঙ্গে শক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, মালিকানিশক্তি এক হলে তো রক্ষে থাকে না। আমেদশা আবদালীর ইতিহাসটা পড়া ছিল আমার ভাল করে। অন্তত মনে ছিল। শাহ আবদালার নাকটা বসে গিয়েছিল, সেখানে চিরস্থায়ী একটা ক্ষত ছিল ; ক্ষতটা কুষ্ঠরোগের। সেই আবদালী ষাট বছর বয়সে যখন দিল্লীর রঙমহলে ঢুকল, তখন দিল্লীর বাদশাহ বংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ষোল-সতেরো কি আঠারো বছরের হজরত বেগমের দেহ-মন দাবী করে বললে—চাই, হজরৎ বেগমের দেহের মনের আমি হকদার।

আমার মনের কামনাও তারই হয়তো অবশেষ। নদীটা শুকিয়ে এসেছে, ১৭৫৭ সাল আর ১৯৩৮ সাল, ১৮১ বছরের মধ্যে। নদীটার উপরে স্রোত নেই, কিন্তু বালির তলে তলে আজও বইছে, আজও বইছে। রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে করতলগত করে পাথরের দেবতার মত দৃষ্টিভোগে সন্তুষ্ট ছিলেন ; তার ছেলে দেবেশ্বর রায় ভায়লেটকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন, কৈশোর চাপল্যে। আমি তার পৌত্র, সুরেশ্বর। কুইনীও ওই অঞ্জনার বংশের। আমি তাকে চোরাবালির মত গ্রাস করতে চাচ্ছি।

ঘুরতে ঘুরতে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিছু চাই। কিছু চাই। মনে পড়ল, অন্নপূর্ণা-মার দেওয়া কাগজের বাণ্ডিলটার কথা। স্যুটকেস খুলে, তাই নিয়ে বসলাম। রঘু বোতল এনে নামিয়ে রাখলে টেবিলের উপর।

সুরেশ্বর বললে—১৯৩৮ সালের সেদিন মার্চের ৩০শে। তারিখটা আমার মনে আছে সুলতা। কীর্তিহাটের রায়বংশের রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায়ের পিতাপুত্রের বিস্ময়কর দ্বন্দ্বের কাহিনীর সবটুকু জেনে শেষ করেছিলাম। কড়চা বল জবানবন্দী বল তার উপাদান সংগ্রহ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সারারাত্রি জেগে অন্নপূর্ণা-মা'র দেওয়া কাগজপত্রগুলি পড়ে শেষ করেছিলাম ভোরবেলা পর্যন্ত।

বাপের সঙ্গে দেবেশ্বর রায়ের এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল শৈশবে। পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই শুরু হয়েছিল। শুরু ক'রে দিয়ে গিয়েছিল অঞ্জনা। অল্প কিছুটা বয়স হতেই দেবেশ্বরের আশ্রয় মায়ের কোল থেকে গিয়ে নির্দিষ্ট হয়েছিল অঞ্জনার কোলে। চার বছর বয়স থেকে ; তখন সরস্বতী বউয়ের গর্ভে এসেছে আর একজন।

সেই সময় অঞ্জনার কাছে শুয়ে সে কাঁদত। অঞ্জনাও মধ্যে মধ্যে কাঁদত। দেবেশ্বর কাঁদতেন মায়ের কোলের জন্য। অঞ্জনা কাঁদত ব্যর্থ জীবনের জন্য। দুজনেই দায়ী করেছিল রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বরের চরিত্রগৌরবের মধ্যে যাই থাক, সে হীরে মতি পান্না নীলা যাই হোক, তার স্পর্শ, তার দীপ্তি, সবই ছিল বড় রূঢ় উত্তপ্ত। তাঁর কণ্ঠস্বরে সঙ্গীত ছিল। কিন্তু সঙ্গীত সভয়ে বিদায় নিয়েছিল।

এগুলো অস্পষ্ট। প্রথম স্পষ্ট হয়েছে যেদিন অঞ্জনা প্রথম বন্ধ ঘরের মধ্যে রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে সমানে জবাব করেছে। তখন সরস্বতী বউ আঁতুড়ঘরে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেছে, প্রসূতি অসুস্থ, চিকিৎসা চলছে। তারই অবসরের মধ্যে রত্নেশ্বর রায় সন্ধান পেয়েছেন অঞ্জনা এবং আলফান্সোর সঙ্গে একটা কিছুর পালা চলেছে। এবং সে পালাটা আছে রত্নেশ্বরের ডায়েরীর মধ্যে সে তুমি শুনেছ। ঘণ্টা দুয়েক আগে ডায়রী থেকে পড়ে শুনিয়েছি। দেবেশ্বর সেটা শুনেছিলেন।

জীবনের প্রায় শেষকালে, তখনও তিনি যুবক, বাংলাদেশের বিদগ্ধ মানুষের সমাজের একজন উজ্জ্বল মানুষ, বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি—তখন তিনি রাঙাপিসীকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে আছে এ-সংবাদটা। রত্নেশ্বর রায়ের পাশের ঘরটাই ছিল দেবেশ্বরের ঘর, এই ঘরেই অঞ্জনা দেবেশ্বরকে নিয়ে থাকতেন। সরস্বতী বউ আঁতুড়ঘরে। বাড়ীর এক প্রান্তে।

অঞ্জনার সঙ্গে কথা বলবার সময় সাবধান হতে ভোলেন নি রত্নেশ্বর। সেদিকে দৃষ্টিহীন বা ভ্রূক্ষেপহীন তিনি ছিলেন না। বাড়ীটার বারান্দার দু মাথায় পাহারা রেখেই কথা বলছিলেন অঞ্জনার সঙ্গে। হুকুম ছিল কেউ যেন না আসে। কিন্তু তারা চার বছরের দেবেশ্বরকে কেউ এর মধ্যে ফেলে নি। ফেলতে পারে নি। হয়তো মনেই হয় নি। দেবেশ্বর ছিলেন মায়ের আঁতুড়ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে, সেখান থেকে এসেছিলেন অঞ্জনার খোঁজে। তাঁকে কেউ আটকায় নি। কিন্তু কিছুটা এসে নিজেই যেন আটকে গিছলেন, বাবার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অঞ্জনা পিসীর কণ্ঠস্বরের পাল্লায় ভয় পেয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন অঞ্জনা পিসীর জন্যে। বাবা অঞ্জনা পিসীকে বকছে। অঞ্জনা পিসী সমান উত্তর করছে। এমন কখনও ভাবতে পারেন না তখন দেবেশ্বর।

ঘরের দরজার কোণে দাঁড়িয়ে তিনি যত কেঁদেছিলেন তার সবটাই অঞ্জনা পিসীর জন্যে। আর রাগ হয়েছিল বাবার উপরে।

"এই রাগ তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইয়া এক পর্বত সৃষ্টি হইতেছিল রাঙাপিসী। বাল্যকালে তিনি কদাচ আমাকে সমাদর করিয়াছেন। শুধু শিক্ষাই দিয়াছেন। কীর্তিহাটের প্রতিটি ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাহাদের সে কি ভয়!

রাঙাপিসী, নিত্য প্রভাত হইতে নানা স্থানের প্রজারা আসিত; তাহারা অগ্রে আসিয়া কাছারিতে সেলামী জমা দিয়া সেরেস্তায় আগমনের কারণ জানাইত, তাহার পর মা কালীর নাটমন্দিরে গিয়া মা কালীকে প্রণাম করিত। রাজরাজেশ্বরকে প্রণাম করিত। তখনও রাধাসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তুমি জান রাঙাপিসী, এই যুগল বিগ্রহ আমার ভিক্ষা-মা ও ভিক্ষা-বাবার। সে কথা পরে বলিব। আগের কথা আগে লিখি।

রাঙাপিসী, কীর্তিহাটের চাউল এবং ধান্যেরও জমাখরচের খাতা আছে; নিত্য প্রায় এক মণ চাউল খরচ হইত দেবোত্তরে। প্রায় একশত জনের খাদ্য! প্রজা কোনদিন পঞ্চাশ, কোনদিন ষাঠ, কোনদিন সত্তর-আশী আসিয়াছে। সকলেই সেলামী দিয়াছে। তাহারা অন্নের মূল্য দিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়াছে। তাদের সকলেরই প্রার্থনা এক—হুজুর মা-বাপ;

হুজুর রক্ষা করুন। ডিক্রীর টাকা দিতে হইলে আমাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে।

আমার পিতার মুখ যেন প্রস্তরে গঠিত মুখ। তাঁহার এক কথা। "আইন অনুসারে যাহা প্রাপ্য তাহার অতিরিক্ত এক কপর্দক আমার দাবী নহে। ডিক্রীর টাকা ছাড়িতে হইলে একদিন আমাকেও সর্বস্বান্ত হইতে হইবে। সম্পত্তি প্রথমতঃ দেবোত্তর, মালিক দেবতা, দ্বিতীয়তঃ এ সম্পত্তি রায়বংশের আগামী পুরুষদের, ইহাকে আমি কোনক্রমেই ক্ষয় করিতে পারি না। ন্যায্য প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবার অধিকার আমার নাই। কথা কয়টি শেষ হইতে-না-হইতে দারোয়ান তাহাকে বলিত—'উঠো বাহার চলো। উঠো—উঠো!'

দ্বিতীয় জনের ডাক হইত। সেই একই কথা।

পিসী, প্রথম প্রথম মনে একটা ভয় হইত, একটা গভীর শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় জাগ্রত হইয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহার উপর তাঁহার কঠিন চরিত্র। রাঙাপিসী, অঞ্জনা পিসীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়াছিলাম কিন্তু তাহার অর্থ বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম অঞ্জনা পিসী বাবাকে কঠিন কথা বলিল। বাবার শাসন সে গ্রাহ্য করিল না। ইহার পর হঠাৎ সে চলিয়া গেল, লোকে তাহার নিন্দা করিল; "কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে" কথাটা শুনিলাম কিন্তু ঠিক বুঝিলাম না, তবে কাজটা অত্যন্ত ঘৃণ্য তাহা বুঝিলাম। বাবার ক্রোধ দেখিলাম। একটা গোয়ান ছোকরা, সে ইহাতে লিপ্ত ছিল। আলফান্সোর সহকারী হিসাবে, ঘোড়া দেখাশোনা করিত, সে কোথায় হারাইয়া গেল। শুনিলাম তাহাকে কাটিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বাবামহাশয়ের হুকুমে। কারণ সে আলফান্সোকে সাহায্য করিয়াছিল। আমার ভয় আরও বাড়িল। মনে হইল, বাবা এত নিষ্ঠুর কেন? তাহার পরই নিজের ভয় হইল। বাবার মত পুণ্যাত্মা ধার্মিক লোক, তাঁহার যে নিষ্ঠুর না হইয়া উপায় নাই। কি করিবেন? পাপীকে দণ্ড তিনি না দিলে কে দিবে! শিহরিয়া উঠিলাম।

কিন্তু একদিন আর মানিতে পারিলাম না। একদিন দেখিলাম, নাটমন্দিরে কালীমায়ের সম্মুখে একজন অর্ধ-উন্মাদিনী যুবতী বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই, কেশরাশি এলাইয়া পড়িয়াছে, বক্ষের বস্ত্রও খসিয়া গিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, সে বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। বলিতেছে—এই বিচার? এই বিচার? মানি না, এ-বিচার মানি না, মানব না।

কীর্তিহাটের কাছারিবাড়ী ও ওদিকে নাটমন্দিরের চারিদিকে গোমস্তা, নায়েব, আমলা, পাইক, চাপরাসী, পূজক-পুরোহিত, পরিচারক প্রভৃতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে স্তম্ভিতের মত। এই উন্মাদিনীর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, জিহ্বার আগলবাঁধ নাই, সে কীর্তিহাটের রত্নেশ্বর রায়কে তিরস্কার—তাই বা কেন, গালিগালাজ করিয়া চলিয়াছে। আমিও অবাক হইয়া বাড়ীর ভিতরের দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম।

এমন সময় বাবামহাশয়ের গলার সাড়া পাওয়া গেল। তিনি তাঁহার খাস কাছারি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—সকলে আপন-আপন কাজে চলিয়া যাও। কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না।

সে-কণ্ঠস্বর, সে-হুকুমজারীর ভঙ্গি উপেক্ষা করিতে কাহারও সাধ্য ছিল না। সকলেই

চলিয়া গেল। বাহিরে ফটকের সামনে কতকগুলা লোক, তাহারা বাহিরের লোক, দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, তাহারও সভয়ে প্রস্থান করল। আমিও ভয় পাইয়া পলাইয়া গেলাম। কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল, কান্না পাইতেছিল—আশঙ্কা হইতেছিল যে, এইবার বোধ হয় বাবা ওই হতভাগিনীকে তলোয়ার দিয়া কাটিয়া ফেলিবেন। ওই স্ত্রীলোকটি দরিদ্র বটে কিন্তু নীচজাতীয়া নয়, তাহার আকৃতি ও রূপের মধ্যেই তা পরিস্ফুট ছিল। এবং তাহার আকৃতি ও রূপের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা আমার মত সাত-আট বৎসরের বালকের মনকেও দয়ার্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাই পলাইয়া গিয়াও পলাইতে পারিলাম না। ফিরিয়া গেলাম ছাদের উপর, সেখানে আলসের আড়ালে লুকাইয়া ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলাম ও শুনিতে লাগিলাম। এতক্ষণে দৃষ্টিতে পড়িল যে মেয়েটির সামনে নাটমন্দিরে এক প্রৌঢ় মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া নতদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে। লোকটার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। কপালে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। স্ত্রীলোকটি বাবামহাশয়কে দেখিয়া পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল—বাবু মহাশয় দয়া করুন, বাবুমহাশয় কৃপা করুন। বিবেচনা করিয়া বিচার করুন বাবুমহাশয়।

রাঙাপিসী, আজও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ওই উন্মাদিনী মেয়েটির উচ্চ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, তাহার বক্ষের আকুতি-মিনতি আমার বাবামহাশয়ের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। বাবামহাশয়ও তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন কেহ বন্ধ করিয়া দিল—হাত দুটা দিয়া সে বুক চাপড়াইতেছিল, সে হাত দুইটা যেন অবশ হইয়া শুধু যুক্তকর হইয়া রহিল।

বাবামহাশয় বলিলেন—তোদের স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে-নালিশ, তাহা কি মিথ্যা? এই কালীমাতার সম্মুখে তাঁহার নির্মাল্য হাতে লইয়া বলিতে পারিস?

মেয়েটি নীরব হইয়া গেল।

পুরুষটির মাথা আরও নত হইল। বাবামশায় বলিলেন—বল্, সত্য কিনা বল!

পুরুষটি এবার বাবার পায়ে পড়িয়া বলিল—সত্য। কিন্তু হুজুর, আপনি সব শুনিয়া বিচার করিয়া—

বাবামহাশয় সিংহগর্জনে বলিলেন—বাহির হইয়া যা। তুই পাপিষ্ঠ, আর ওটা পাপিষ্ঠা; যা যা, এখুনি বাহির হইয়া যা। আমার মন্দির অপবিত্র হইয়াছে। যাহা বিচার হইয়াছে, তাহা সত্য বিচার হইয়াছে। যা—বাহির হইয়া যা। যা এবং তিন দিনের মধ্যে গ্রাম ছাড়িয়া তোদের চলিয়া যাইতে হইবে।

তাহারা চলিয়া গেল। সে-সময়টা বৈশাখ মাস, বেলা তখন দ্বিপ্রহর, মেয়েটি ও পুরুষটি নতমস্তকে নীরবে বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় মেয়েটি একটি থামের ছায়ায় শায়িত ঘুমন্ত একটি শিশুকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল।

এ-বিচারের কারণ শুনিয়া বাবা সম্পর্কে আমার ভয় আরও বাড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল—বাবামহাশয় বিচারক—বিধাতার মূর্তিমন্ত অবতার।

কারণ কি জান?

এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি একজন বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যাহারা কন্যা বিক্রয় করে। বিবাহের

সময় কন্যার পিতাকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। এই প্রৌঢ়টি জল-অচল হিন্দুদের মধ্যে পূজা-অর্চনা ও পৌরোহিত্য করিত। পৈতৃক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিল তিল করিয়া পয়সা জমাইয়া অবস্থা বেশ স্বচ্ছল করিয়া তুলিয়া একদা বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার সাধ করিয়াছিল। এবং একটি আট বৎসরের পিতৃহীনা কন্যাকে প্রায় চারিশত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়া ঘরদুয়ার সাজাইয়া পাতিয়াছিল। সময়টা তখন দুর্ভিক্ষের সময়—মেদিনীপুরে ১৮৬৪ সালে সাইক্লোন ঝড়ের পর দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সময় এই লোকটি সমস্ত শ্বশুরবাড়ীর লোকদের বাঁচাইয়াছিল। কন্যাটির মাতা ও ভ্রাতাদের পর্যন্ত স্বগৃহে আনিয়া রাখিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ প্রৌঢ় এইভাবেই প্রায় খেলাঘরের বরকনে খেলা শুরু করিয়া যখন কন্যাটি যৌবনে উপনীত হইল, তখন একদা হতভাগ্য পথের মধ্যে পড়িয়া গিয়া কোমরে আঘাত পাইয়া একেবারে কোমরভাঙা কুব্জ হইয়া গেল, সেই সঙ্গে তাহার পুরুষ-জীবনের সকল শক্তি তিরোহিত হইল।

সুরেশ্বর বললে, সে এক করুণ ইতিহাস—তারই সঙ্গে খানিকটা সামাজিক রুচিতে কুৎসিতও বটে। একালে যদিবা এ-সত্যকে সহ্য করা যায়, সেকালে কোনমতেই তা সহ্য করা যেতো না। এর মধ্যে মানুষের মনের চিরন্তন কামনার যে লজ্জাহীন, ভয়হীন, সঙ্কোচহীন প্রকাশ, তার তুলনা রাবণের চিতার সঙ্গে। সে নাকি কোনকালে নেভে না, চিরকাল জ্বলছে—চিরকাল জ্বলবে।

ওই মেয়েটির মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। তার সঙ্গে ওই হতভাগ্যের বিচিত্র হতাশা—তার রক্ত-জল-করে-অর্জন-করা সম্পদ-সম্পত্তি সে কাকে দিয়ে যাবে। কে তার উপাধি বহন করবে। সেকালে তার সঙ্গে আরও কামনা ছিল—কে তাকে জলপিণ্ড দেবে।

এরপর যে ব্যাপার ঘটল, তা যেমন শ্রুতিকটু, সমাজবিরুদ্ধ, তেমনি এই মায়া-মমতার সংসারে সম্পদ-সম্পত্তির দুনিয়ায় চিরন্তন। মহাভারতের কাল থেকে ঘটে আসছে। ব্যাসদেব যে-সাহসের সঙ্গে সেই সত্তাকে প্রকাশ করেছেন, তারই নজির তুলে দেবেশ্বর রায় তাঁর রাঙাপিসীকে অনায়াসে ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন—

"রাঙাপিসী, বিষয়ের সংসারে মমতার পৃথিবীতে এ বোধ হয় চিরকাল ঘটিতেছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে আছে পঞ্চপাণ্ডবের জন্মকাহিনী। এই হতভাগ্য দম্পতির সেই মতি হইল। এই যুবতীটি স্বামীকে সত্যই ভালবাসিত। স্বামীর সঙ্গে নাকি রাত্রে বসিয়া ক্রন্দন করিত—এসব তাহাদের কে খাইবে? অবশেষে উভয়ে পরামর্শ করিয়া ওই পথই ধরিল। পুরুষটির এক নীচজাতীয়া পালিকা মা ছিল, তাহার মায়ের মৃত্যুর পর সে-ই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল; সেই মায়ের গর্ভের এক ছোট ভাই, সে ছিল তাহাদের বাড়ীর কেনা গোলামের মত। ছেলে-বেলায় ছিল রাখাল, তাহার পর হইয়াছিল মাহিন্দার, তাহার পর সে তাহাদের জমি চাষ করিত এবং চাকর বলিতে চাকর, ভারবহনকারী পশু বলিতে তাহাই, আবার বন্ধু বলিতে একান্ত আপন বন্ধু ভাই, তা-ও ছিল সে। সব কথাই তাহার সহিত হইত। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া একদা তাহাকেই সমস্ত দুঃখ ব্যক্ত করিল। এই অস্পৃশ্য নীচজাতীয় পুরুষটি

বয়সে এই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিল এবং আকারে অবয়বে কালো কষ্টি-পাথরে গড়া ভীমাকৃতির তুল্য সুন্দর ছিল। এই মেয়েটির ও তাহার স্বামীর বংশরক্ষা করিবার নিমিত্ত এমনি কৃষ্ণবর্ণ এক পুত্র যথাসময়ে তাহারা পাইয়াছিল। তাহারই বিচার হইয়াছিল। নালিশ আনিয়াছিল—মেয়েটির ভাইয়েরা, পুরুষটির জ্ঞাতিরা। কারণ তাহারা দুইপক্ষই প্রত্যাশা করিয়াছিল—ওই নিঃসন্তান দম্পতির সম্পত্তি তাহারাই পাইবে। জ্ঞাতিদের প্রাপ্য আইনানুসারে। শ্যালকেরা আশা করিয়াছিল, দানপত্র লিখাইয়া লইবে বা তাহাদের সন্তান পোষ্যপুত্র লওয়াইবে।

প্রমাণ ছিল অকাট্য। ওই শিশুটির কৃষ্ণবর্ণ। তাহার উপর ওই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটির স্বীকারোক্তি। কাছারিতে তাহাকে থামে বাঁধিয়া তাহার পিঠ বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া স্বীকার করানো হইয়াছিল। এবং বিচারে হুকুম হইয়াছিল—এই দম্পতিকে ওই সন্তান লইয়া সামান্য অস্থাবর লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, ওই সম্পত্তি ওই গ্রামের গ্রাম্য দেবতাদের দেবোত্তররূপে গণ্য হইবে।

রাঙাপিসী, সেদিন বাল্যকালে বাবামহাশয়কে যেমন বিচারক-বিধাতার অবতার মনে হইয়াছিল, এই রায়কেও ঠিক তদ্রূপ বিধাতার রায় বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ইহার পর নয় বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হইল। আমার মুখ দেখিলেন হুগলী জেলার কায়স্থ জমিদার মিত্র-গোবিন্দপুরের জমিদার শিবদাস মিত্রের তৃতীয় পক্ষের বন্ধ্যাস্ত্রী। কৃষ্ণভামিনী দাসী। এখানেও একটা সমস্যা ছিল। সমস্যা—কৃষ্ণভামিনী দাসীকে অপবাদ দিয়া সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিতেছিল শিবদাস মিত্রের ভাগিনেয়। কারণ ভাবী উত্তরাধিকারী সেই। অথচ শিবদাস মিত্র তাঁহার স্বোপার্জিত সম্পত্তি তাহার তৃতীয় পক্ষের যুবতী নিঃসন্তান স্ত্রীকে নির্ব্যূঢ়স্বত্বে উইল করিয়া দিয়াছেন। বারো মাসে বারো হাজার টাকা আয়ের জমিদারী। এবং নগদ অর্থ। কৃষ্ণভামিনী দাসী বাছিয়া বাছিয়া শরণ লইলেন ধার্মিক সাধুপ্রকৃতির খ্যাতিমান ও প্রতাপবান জমিদার রত্নেশ্বর রায়ের। রাঙাপিসী, তোমার জমিদারী শ্যামনগরের পত্তনীদার কীর্তিহাটের রায়বংশ। শ্যামনগর-রাধানগর লইয়া যে বিরাট পর্ব, তাহা তোমার অগোচর নয়। শ্যামনগর হুগলী জেলার অন্তর্গত। চুঁচুড়ায় রায়েদের বাড়ী ছিল একখানা, সেখানে সেরেস্তা ছিল এবং সেখানে রত্নেশ্বর রায় মধ্যে মধ্যে যাইয়া বিশ্রাম করিতেন। গঙ্গার ধারে বাড়ী, তাঁহার প্রিয়স্থান ছিল। এখানেই একদা এই কৃষ্ণভামিনী দাসীর সঙ্গে আমার মাতাঠাকুরাণীর পরিচয় হয়; কৃষ্ণভামিনী দাসী একদিন পাল্কী করিয়া আসিয়া আমার মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়া গেলেন, আট বছরের আমাকে সমাদর করিয়া কোলে লইয়া একটি মোহর দিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আমার কিশোর গোপাল। এবং নিজ বাটীতে রাধাসুন্দরজীউ ঠাকুরের আরতি দেখিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর ক্রমে সে-আলাপ গাঢ় হইল। এবং সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমার পিতার কাছে আসিয়া প্রণতা হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি অনাথা। আপনার নাম-খ্যাতি এ-অঞ্চলে কে না জানে! এ-অবলা-অনাথাকে আপনি রক্ষা করুন।

রাঙাপিসী, কথাগুলি আমার কানে এখনও যেন বাজিতেছে। মাতাঠাকুরাণী, তাঁহার পাশে আমি ভিক্ষা-মায়ের কোলের কাছে, তিনি আমাকে কোলের কাছে লইয়াই দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন।

বাবামহাশয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—আমি সমস্তই অবগত আছি। দেবেশ্বরের গর্ভধারিণীর নিকটও আপনার কথা শুনিয়াছি। অসহায়কে রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যধর্ম। ইহা যে না করে সে ধর্মে পতিত হয়। আমা হইতে যতদূর হইবে অবশ্যই তাহা করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

কৃষ্ণভামিনী দাসী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে অনেক অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পাইল। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিলেন। এবং আমাকে সন্তানরূপে পাইবার বাসনায় আমার উপনয়নের সময় মুখ দেখিলেন। মুখ দেখিবার কালে তিনি আমাকে মূল্যবান হীরার আংটি এবং হীরা-বসানো বোতাম, রূপার বাসন এবং একশত একটি মোহর দিয়াছিলেন।

ভিক্ষা-মা এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না, রাধাসুন্দর ঠাকুরের সম্পত্তি দেবোত্তর ছিল, তাহার সেবায়েৎ-স্বত্ব বলিলেন আমাকে দিবেন। তখন রত্নেশ্বর রায়ের প্রতাপে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়—তাঁহার নাগপাশের মত কৌশল-জালে এবং অর্ধচন্দ্রবাণের মত ক্ষুরধার বুদ্ধিতে অঘটন ঘটে। সুতরাং কৃষ্ণভামিনী দাসীর স্বামীর জ্ঞাতিবর্গ পিছু হটিল। রত্নেশ্বর রায়ের প্রভাবে এবং কৌশলে সামান্য কিছু সম্পত্তি লইয়া তাহারা সম্পত্তির উপর কৃষ্ণভামিনী দাসীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকার করিয়া দলিল করিয়া দিল। এদিকে আমার ভিক্ষা-মা বাবামহাশয়ের সম্পর্কে বেয়ান হইলেন। তাঁহার সামনে ঘোমটা কমাইয়া কপালে চুলের রেখার প্রান্ত পর্যন্ত তুলিলেন। হাস্য-পরিহাস হইতে লাগিল।

বৎসর-তিনেক পর, তখন আমার বয়স বারো বৎসর, সবে জানবাজারের বাড়ীতে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করিতেছি। দেশে তখন বর্ধমান ফিবারের প্রকোপ হইয়াছে। কয়েকটা অজন্মায় দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, লোক মরিয়াছে। বর্ধমান ফিবার দেশময় ছড়াইয়াছে। রত্নেশ্বর রায় কীর্তিহাটে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরাতন যেটা ছিল, সেটা একটা সামান্য ব্যাপার। এ-চিকিৎসালয় সত্যই বড় চিকিৎসালয়। তাঁহার নাম তখন দেশে কীর্তিমান লোকেদের প্রথম সারিতে স্থান পাইয়াছে, হঠাৎ কলিকাতায় বসিয়া শুনিলাম আমার ভিক্ষামাতা কৃষ্ণভামিনী দাসী বৃন্দাবনবাসিনী হইয়াছেন। দেশে আর ফিরিবেন না। এবং তিনি তাঁহার স্বামীর উইলসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি রাধাসুন্দরের নামে দেবোত্তর করিয়া, গুজব শুনিলাম, ভিক্ষাপুত্র আমাকেই তাঁহার সেবায়েৎ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণভামিনী-মা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার কথা তুমি জান, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, তোমাকেও তিনি তোমার বিবাহের সময় মূল্যবান অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরখানেকের মধ্যে আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার এতদিনের পৃথিবী সব যেন পাল্টাইয়া গেল। আমি যাহাকে এতদিন দেবতা ভাবিয়াছিলাম, তাহার ছদ্মবেশটা খসিয়া গেল। আমি দেখিলাম, তিনি যাহাই হউন, দেবতা বা দানব, মানব বা অসুর—তিনি হউন

পবিত্র চরিত্রবান, তিনি ত্রিসন্ধ্যা করুন, তিনি জপ করুন, তিনি প্রকাশ্যে দান করুন, তিনি হউন কীর্তিমান, তিনি দয়াহীন, মায়াহীন, ক্ষমাহীন, তিনি দেবস্থলের খড়্গের মত পবিত্র, কিন্তু তাঁহার কর্ম—দেবতার হাড়িকাষ্ঠে আবদ্ধ হতভাগ্য মেষ-মহিষ এবং ছাগগুলিকে ছেদন করা। হয়তো এককালে খড়্গ লইয়া শত্রুর সঙ্গে, বিধর্মী বা অধর্মাচারীর সঙ্গে যুদ্ধ করা হইত, কিন্তু এখন তাহা কেহ করে না; সে তাহার রক্তপিপাসার নিবৃত্তি করে, অসহায় পশুগুলিকে ছেদন করিয়া। রাঙাপিসী, আমার ভিক্ষা-মা কৃষ্ণভামিনী স্বেচ্ছায় বৃন্দাবন বাস করেন নাই। রত্নেশ্বর রায় তাহাকে সম্পত্তি দেবোত্তর করাইয়া, সে দেবোত্তরের ট্রাস্টি নিজে হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। কেন জান? কৃষ্ণভামিনী দাসী ছিলেন বন্ধ্যা এবং বয়সে পঁচিশ-ত্রিশ, তিনি বেয়াই সম্পর্ক ধরিয়া রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতে গিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সে-প্রেম এমনি গাঢ় এবং তাহার ফলে তাঁহার পক্ষে দেহ-কামনা এমনই অসম্বরণীয় হইয়াছিল যে, একদিন সমস্তই সকাতরে নিবেদন করিয়া রত্নেশ্বর রায়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রখানিকেই তিনি কৃষ্ণভামিনী দাসীর মৃত্যুবাণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে এইভাবে সর্বস্ব দেবোত্তর করাইয়া নিজে সেবায়েত ট্রাস্টি হইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

রাঙাপিসী, কৃষ্ণভামিনী দাসী কিন্তু নির্বাসিতা হইয়াও নির্বাসিতা হয়েন নাই। তিনি বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিয়া কলিকাতাতেই কৃষ্ণাবাই নামে বাইজীর পেশা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি নাই, মা বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিলাম। তিনি কাঁদিয়াছিলেন। সমস্ত শুনিয়া আমার সেদিন প্রথম আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল।

আর একজন এসব কথা আমাকে বলিয়াছিল। সে-ব্যক্তি শ্যামনগরের ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই!

* * *

সুরেশ্বর থামলে। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে টান দিয়ে পত্রখানা পত্রের বাণ্ডিলে রেখে দিয়ে বললে—থাক, পত্র থাক। কি হবে তোমার কাছে এত প্রমাণপ্রয়োগ দিয়ে?—প্রয়োজন নেই। মুখেই বলি। রায়বংশের প্রাচীনকালের কথার আর অল্পই বাকি। সামান্য।

তবে একটা কথা বলব। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে এর একটি ঘটনাও গোপন করা নেই। এবং আশ্চর্যের কথা সুলতা, তিনি এইসব ঘটনা লিখতে গিয়ে অসত্য, অসততা এবং মিথ্যা ও পাপকে, আগুনের অন্ধকারকে দহন করার মত দহন করেছেন। দৃঢ়বিশ্বাস এবং সূক্ষ্মতম বিচারবোধের পরিচয় সেখানে ছত্রে-ছত্রে। এবং নিজের উপরেও শাস্তিবিধান করেছেন।

কৃষ্ণভামিনীর পত্র পেয়ে তিনি তিন দিন উপবাস করেছিলেন। এবং নিজের রূপ ও কান্তির জন্য বার বার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, "হাঁ, আমার এই কান্তি ও রূপও ইহার জন্য দায়ী। কি করিয়া অস্বীকার করিব? কিন্তু এই বাক্য শ্রবণে পাপ, চিন্তনে পাপ! পত্রযোগে সেই পাপ আমাকে অর্শিল। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত উপবাসাদি করাই স্থির করিলাম।"

তাছাড়া এই রাধাসুন্দরকে কীর্তিহাটে নিয়ে গিয়ে স্থাপন ক'রে, তার বাৎসরিক এক হাজার টাকা আয় এমন পাকা করে কীর্তি ও কর্মে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তা থেকে বছরে দশ টাকাও রায়বংশের কোন স্বার্থে লাগেনি। না, স্থূলতা লাগে, কিছু লাগে; লাগে রাধাসুন্দরের অন্নপ্রসাদ। সে-প্রসাদ আগে রায়বংশে গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। আজ আর সে-নিষেধ কেউ মানে না। আর ওই পঙ্গু ব্রাহ্মণটি এবং সেই ব্রাত্য ঔরসজাত সন্তানটিকে বুকে করে বৈশাখের রৌদ্রে যেদিন ওই যুবতীটি আগুনের মত তেতে-ওঠা মেদিনীপুরের লালমাটির পথের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল, সেদিন ডায়রীতে লিখেছেন—"আজ পঙ্ক এবং চন্দন, এই-দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তাহা পারিতেছি না। নাসারন্ধ্র বলিতেছে পঙ্ক-গন্ধ সহ্য করিতে পারি না, পারি না, পারি না। শ্বাসরোধ করিতেছে। অন্তর বলিতেছে—শ্বাসরোধে মৃত্যু অনিবার্য বিধান। যাহা বিধান, তাহাই বিধাতার নির্দেশ। অঙ্গে পঙ্ক মাখিলে চর্মরোগ হইবে। চর্মরোগও ব্যাধি। কি করিব, কুষ্ঠরোগীকে মমতা করিয়া কোন্ বিধানে আশ্রয় দিব? বুঝিতেছি এই মমতাগুলি মোহ, এই দুঃখগুলি অলীক, মিথ্যা। কি করিব? তাহাকে নির্বাসন দিতে আমি বাধ্য।

তবে এই বারো হাজার টাকা আয় সেকালে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আর চিকিৎসার জন্য। সে-দান কলকাতার মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজও তা বজায় আছে। আজও তা থেকে কিছু উপকার হয়।

তবে একথাও ঠিক নয় যে, এ থেকে নিজের বংশের জন্য তিনি কিছু করেন নি। ধর্ম এবং আইন বিচারমত পাপ বাঁচিয়ে এ সম্পত্তি নিজের নামে পত্তনী এবং দরপত্তনী নিয়ে দশ হাজার টাকার জমিদারীকে বাইশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন। পথ সেই চিরাচরিত পথ।

খাজনা বৃদ্ধি আর পতিত আবাদ।

শেষ বৃদ্ধি হয়েছে রত্নেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর—শিবেশ্বর রায়ের হাতে তখন জমিদারী গেছে। দেবেশ্বর রায়ও সদ্য মারা গেছেন তখন। তারপর পতিত আবাদ থেকে বৃদ্ধির দিকটা অব্যাহত থাকলেও ফসলের মূল্যবৃদ্ধিহেতু বৃদ্ধি—যা ইংরেজের আইন অনুসারে পনের বছর পর পর জমিদারেরা পেতে পারে, তা আর পায় নি রায়েরা।

* * *

সুরেশ্বর পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে টিপে নিভিয়ে দিয়ে বললে, সেসব তথ্য ফ্যাক্টস ফিগারস তুমি ভাল করেই জান আমার চেয়ে। স্বীকার করবে নিশ্চয়। গোটা বাংলাদেশ জুড়েই ওখানে এক হাল। ওকথা থাক, এখন রায়বাড়ীর কথা বলি। পৃথিবীর মানুষের কাছে তোমার মারফৎ আমার জবানবন্দী শেষ করি।

বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ দেবেশ্বরের যেদিন ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়েছিল, সেদিন চিঠি লিখতে বসেছিলেন বাপকে। তখন দেবেশ্বর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছেন, ষোল বছর বয়স পার হয়েছেন, তখন তাঁর মন একটা চেহারা নিয়েছে—যে-চেহারাটা বলতে গেলে

রত্নেশ্বর রায় তাঁর অজ্ঞাতসারে নিজেই গড়ে দিয়েছেন। তবে তাকে শেষ গড়ন দিয়ে গেছে কৃষ্ণাবাই—অর্থাৎ বৃন্দাবন থেকে নিরুদ্দিষ্টা কৃষ্ণভামিনী দাসী আর শ্যামনগরের ঠাকুরদাস পাল, দেবেশ্বরের গোপাল দাদার বাবা, রত্নেশ্বরের বাল্যকালের দোসর, পার্শ্বচর, শ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী, যা তোমার পছন্দ সুলতা সেই বিশেষণই তুমি গ্রহণ কর। তখন তিনি রত্নেশ্বরকে বলেন—"নিম। নিম। নিম। ঘি দিয়ে ভাজো নিমের পাত—নিম না ছাড়ে আপন জাত।" জেঠামণি, হয়তো তুমিও তোমার বাবার মত হবে। কিন্তু শোন শোন—এই সদ্গোপ জেঠা তোমার তোমাদের জন্যে প্রাণ দিতে পারে গো! তা পারে। কিন্তু দুঃখু কি জানো, তোমরা বড় হলেই ফণা তুলে ফোঁস ক'রে ওঠো, উঠে বল—তোরা ঢোঁড়া—তোরা দাঁড়াশ—তোরা সরে যা। তখন সে ফোঁসানি সামলায় কে?

কৃষ্ণাবাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল দেবেশ্বরের, কলকাতার এক বিখ্যাত জমিদার বাড়ীর বিয়ের আসরে। রত্নেশ্বরের চিঠির নির্দেশ মত সামাজিকতা রক্ষা করবার জন্য তাঁকে যেতে হত রায়বাড়ীর তরফ থেকে লৌকিকতা বা উপহার নিয়ে। তখন লৌকিকতারই যুগ ছিল। বড় বড় বাড়ীর রেওয়াজ ছিল তাঁদের থেকে বড় বাড়ীর নিমন্ত্রণে মোহর বা গহনা দেওয়া। হীন অবস্থার বাড়ীর নিমন্ত্রণে নগদ টাকা, দশ বিশ পঞ্চাশ কদাচিৎ একশো টাকা। সেটা নগদ টাকা। বধূর সামনে রাখা পরাতে রেখে দিয়ে, আশীর্বাদ বা প্রণাম করে চলে আসতেন। পাশে যৌতুক বা লৌকিকতা গুনে নিয়ে খাতায় লিখে রাখবার কর্মচারী বসে থাকত। ওদিকে একদিকে খাওয়া-দাওয়ার আসর, অন্যদিকে একটা আসরে চলত সঙ্গীত-নৃত্যের আসর। সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরা সামনে বসতেন, ফরমায়েস করতেন; পিছনের লোকেরা আসত যেত; আসত যেত; ক্রমান্বয়েই বদল হত আসনের লোক। এই আসরে তরুণ কন্দর্পের মত দেবেশ্বরের হাত ধরে গৃহকর্তা নিজে সামনের আসনে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—বস গান শোন; খেয়ে তবে যেতে পাবে।

আশপাশের সামনের সারির শ্রোতাদের বলেছিলেন—কীর্তিহাটের রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে। গান ওদের রক্তে।

কথাটা সে-কালে কলকাতার ধনী ও গুণীসমাজে সকলেই জানত। জানত এ বংশের সকলেই জন্ম থেকে গানে বোধ নিয়ে জন্মায়, কণ্ঠস্বরও সকলের সুস্বর। এদের বংশে কেউ একজন নাকি গান গেয়ে শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

১৮৭৮।৭৯ সাল। বাংলাদেশে রামপ্রসাদী গান তখন কীর্তনের সঙ্গে প্রায় সমান মর্যাদা পেয়েছে। তান্ত্রিক সাধুদের যুগ সেটা। বীরাচারী বামাচারীদের উপর যত ঘৃণা ইংরাজী শিক্ষিতদের, সাধারণের কাছে তত সমাদর ভক্তিমার্গী শক্তিসাধকদের। রামকৃষ্ণদেব তখন পূর্ণ প্রকাশ করেছেন নিজেকে দক্ষিণেশ্বরে। ইংরিজী শিক্ষিত নরেন দত্ত, থিয়েটারের প্রবর্তক, শেক্সপীয়রভক্ত জি সি তাঁর পায়ে গড়াবেন, তার আয়োজন চলছে।

গৃহস্বামীর কথায় সকলেই ফিরে তাকিয়েছিল এই সুন্দর তরুণটির দিকে। দেবেশ্বর তখন লম্বা ছিপছিপে অসাধারণ সুন্দর কিশোর। লজ্জিত হয়ে তিনি সকলকে নমস্কার ক'রে চেয়ারে বসে, আসরের নায়িকার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

—এ কে? এ কে? এ কে?

হঠাৎ গায়িকা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সেই আসরের উপরই আছাড় খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

দুদিন পর একজন লোক এসে একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল দেবেশ্বর রায়কে। লিখেছিলেন—তাঁর ভিক্ষামাতার প্রেতিনী। তার প্রথম পত্রেই ছিল—বাবামণি আত্মহত্যা করিলে মানুষ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমিও প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিঃসন্তান কায়স্থ কন্যা, তোমার মুখ কেবলমাত্র মা হইবার সাধ মিটাইবার জন্য দেখি নাই, মৃত্যুর পর তোমার হাতের একটু জল পাইব এবং "রৌরব নরক হইতে মুক্তি পাইব বলিয়াও আশা করিয়াছিলাম।"

তারপর ওই বিবরণ। বিস্তৃতভাবে তিনি লিখেছিলেন, কোন কথা গোপন করেন নি। লিখেছিলেন—"দোষ আমার আমি তাঁহার রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার চরণে আপনাকে বিকাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি ফিরাইয়া দিলেই পলাইয়া আসিতাম এবং দূর হইতে তাঁহাকে ভালবাসিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতাম। কিন্তু তিনি আমাকে পদাঘাতে দূর করিলেন। দেশের ও দশের সম্মুখে অপমানিত করিলেন। তাহা আমার সহ্য হয় নাই। আমি বৃন্দাবন হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম আগ্রা। আমার রূপ ছিল এবং গানের গলা ছিল, তাহার সহিত সঞ্চিত কিছু গোপন অর্থ ছিল, আগ্রায় আসিয়া গান শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, তোমার পিতার সহিত এইভাবে একদিন সাক্ষাৎ করিব আশা করিয়া। কিন্তু আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার গোপাল, তুমি আমার মুক্তিদাতা ব্রহ্মচারী, এই পাপিনীর বেশে দেখা হইল তোমার সঙ্গে।"

রাঙাপিসী, এই পত্র পাইয়া আমি তিন দিন ক্রন্দন করিয়াছিলাম। গোপালদাদাকে পাঠাইয়া তাঁহার সন্ধান লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম; দেখা করিয়াছিলাম হাওড়া স্টেশনে, তিনি এই বঙ্গদেশ হইতেই পলাইয়া যাইতেছেন। মা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। তিনি জোর করিয়া আমার পায়ের ধূলা লইয়াছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে টাকাও দিতে চাহিয়াছিলেন। একটা ভারী হাতবাক্স লইয়া বলিয়াছিলেন—এইটি তুমি লও।

কিন্তু রায়বংশের দেবেশ্বর তাহা লয় নাই। পিসী, সেদিন যদি বাক্সটা লইতাম, তবে ভায়লেটকে লইয়া সংসার পাতিয়া ব্যবসা করিবার জন্য টাকা ঋণ চাহিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে হইত না। এবং ঠিক এইরূপ পরিণতিটা সম্ভবতঃ হইত না রাঙাপিসী, এই অল্পকালের জীবনে, এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে দেখিলাম অনেক, বুঝিলাম অনেক। স্বর্গ-নরকের হদিস পাই নাই, ভগবানকে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি নাই। অবিশ্বাস, তাই বা করিতে পারিলাম কই? ধর্ম—যে ধর্ম তোমরা মানিয়া চল তাহাকে মানিতে পারি নাই। তাহাকে মানিতে পারি নাই বাবামহাশয়ের কার্যকলাপের জন্য। মানুষটা পাথর, মানুষটা পাথর! রাঙাপিসী, এই পাথরে আমি মাথা ঠুকিয়া লড়াই করিয়াছি, রক্তাক্ত করিয়াছি মাথাটা। শুধু শেষ কালটায়—রাঙাপিসী—বুঝিতে পারিলাম না। দশদিন শ্রাদ্ধের সময় আসিতে পার নাই। অথবা ইচ্ছা করিয়াই আইস নাই। ছয় মাসে রায়বাহাদুরের উপযুক্ত শ্রাদ্ধ করিব। তুমি আইস।

কলিকাতায় থাকিয়াও তোমার সহিত দেখা করি না, তোমার বাড়ী যাই না, তাহার কারণ, অন্তে না-চিনুক আমি তোমাকে চিনি। আমি তোমাকে জানি। তুমি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের যোগ্যা ভগ্নী। তুমি আমাকে মদ্যপ বলিয়া ঘৃণা করিবে। আমি দেবতা মানি না, ধর্ম মানি না বলিয়া ঘৃণা করিবে। আরও অনেক কারণে ঘৃণা করিবে।

*　　*　　*

চিঠিখানার তারিখ ১৮৯৭ সাল। ১৮৯৬ সালে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় মারা গিয়েছিলেন। এগিয়ে এসে পড়েছি। ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল আঠারো বছর। এই আঠারো বছর রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় এবং দেবেশ্বর রায়ে নিষ্ঠুর সংগ্রাম চলেছে। এ সংগ্রাম একদিনের জন্য থামে নি। রত্নেশ্বর রায় পুত্রকে চালাতে চেয়েছিলেন নিজের মতে, নিজের পথে।

সেদিন, মানে, যেদিন রত্নেশ্বর রায় বড় ছেলের অভিযোগের কথা শুনে, লক্ষ্মীর ঘর থেকে চোখের জলের সঙ্গে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন, অঞ্জনার মেয়েকে আমি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম সংসারজীবনে, সমাজজীবনে। চেয়েছিলেন রেভারেণ্ড কালীমোহন ব্যানার্জি, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনবেন। এদের মধ্যে ক্রীশ্চিয়ানিটি ভারতবর্ষের স্পর্শ পেয়েছিল, ক্রীশ্চিয়ানিটির সঙ্গে ভারতবর্ষের সাধনার ধারাটি যুক্ত হয়েছিল।

বাংলাদেশের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রয়েছে। আর যারা মেমসাহেব বিয়ে করে বা যে মেয়েরা সাহেব বিয়ে ক'রে ওই এলিয়ট রোড, কি খিদিরপুরে পাড়া ফেঁদেছে, যারা নাম পাল্টেছে, বুলি পাল্টেছে, তারাও রয়েছে সুলতা। তাদের দৃষ্টান্ত সে-কালে আরও কটুভাবে প্রকট ছিল, তারা নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করত। তাই যে সম্পর্ক অঞ্জনা ছিঁড়ে চলে গিয়েছিল, সেই সম্পর্ক আবার নতুন করে গড়তে চেয়েছিলেন ভায়লেটকে দেশী ক্রীশ্চানসমাজে বিয়ে দিয়ে।

গোপালকে টাকাও দিয়েছিলেন। পাঁচ হাজার টাকাই দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন দেবশ্বরের হাত দিয়েই। তারপর করেছিলেন দেবেশ্বরের বিবাহের আয়োজন।

রাঙাপিসীর পছন্দ-করা ওই দশ পার হয়ে এগারোয় পা-দেওয়া পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটির সঙ্গেই তার বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মেয়েটির নাম উমা। মাথায় ছোটখাটো, তবে রূপসী বটে। তার সঙ্গে একটু—

থেমে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—কি বলব সুলতা? মানে ঠিক বিশেষণটি যেন খুঁজে পাচ্ছি না। প্রগল্‌ভা কথাটা ঠিক হবে না।

অর্চনা হেসে বললে—বড়ঠাকুমা, ছেলেবেলা দিদিমার আদরে অকালে একটু বেশী পেকেছিলেন।

—না, অকালপক্ক কথাটাও খাটবে না। না। বরং প্রিকোসাস বলতে পারা যায়।

—না সুরোদা, প্রিকোসাস শব্দটাও ভাল না, ঠিকও নয়। তার থেকে বরং অকাল-ভারিক্কি বা অকাল গিন্নীবান্নী ভাল। নিজের দিদিমার কাছ থেকে ওটাই শিখে এসেছিলেন। স্বামীর প্রেয়সী হওয়ার চেয়ে বাড়ীর গৃহিণী ছিলেন তিনি বেশী। বেলফুলের মালা গেঁথে

রাধাসুন্দরের এবং রাধারাণীর জন্ম নিত্য পাঠাতেন। কিন্তু কোনদিন সন্ধ্যায় বেলকুঁড়ি মালী তুলে দিয়ে যেত, তা নিয়ে মালা গেঁথে নিজের খোঁপায় পরেন নি বা স্বামীকে পরাবার জন্মে আঁচলে লুকিয়ে নিয়ে যান নি।

—ঠিক বলেছিস অর্চি। এ কথাটা এমন ভাবে বলতে আমি কখনও পারতাম না রে! রাঙাপিসীকে যে চিঠি তিনি লিখেছিলেন ওই পিতৃশ্রাদ্ধের সময়, তাতে শ্রীউমার সম্বন্ধে লিখেছেন —"রাঙাপিসী, বয়স তখন ষোল পার হইয়া সতেরোতে পড়িয়াছি, একটি এগারো বছরে পা-দেওয়া কনেই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তখন প্রেম করিয়াছি ভায়লেটের সঙ্গে। সাদা-চামড়ার ক্রীশ্চান মেয়ে, গোয়া হইতে কলিকাতার ফিরিঙ্গীপাড়া হইয়া কীর্তিহাটের গোয়ানপাড়া ফেরত ভায়লেটের সঙ্গে প্রেম করিয়াছি যে উল্লাসের মধ্যে, যে নেশার মধ্যে, তাহা বিবাহিতা এই পত্নীর মধ্যে ছিল না। থাকিবার কথা নয়। তাহার উপর উমার ছিল প্রাচীনকালের মন। সে মনের কাছে আনন্দের চেয়ে পুণ্য ও ধর্মের মূল্য বেশী। ওই বয়সেই সে ব্রতের জন্ম স্বচ্ছন্দে উপবাস করিতে পারিত। সারাটা দিনই প্রায় সে কীর্তিহাটের ঠাকুরদের অর্চনার আয়োজনে ব্যস্ত থাকিত, কিন্তু আমার সঙ্গে দুদণ্ড বসিয়া গল্প করিবার অথবা একটি বসন্তকালে পূর্ণিমারাত্রে মুখের দিকে চাহিয়া বসিবার অবকাশ বা আগ্রহ তাহার হয় নাই।

বলিলে বলিত, 'কেমন কথা তোমার? এ সবই তো তোমার জন্যই করি, না 'হরের মায়ের' জন্য করি। 'হরের-মা' কথাটা সে আজও ব্যবহার করে।

তাহার উপর রাঙাপিসী, বিবাহের পর কীর্তিহাটে ছিলাম এবং এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। সর্বত্রই, একলা আমার উপর নহে, আমাদের উভয়েয় উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য কীর্তিহাটের সংসারটাই কলিকাতায় আসিল।

শিবেশ্বর রামেশ্বরকে লইয়া মাতাঠাকুরাণী আসিলেন। বাবামহাশয় পনের দিন থাকিতেন কীর্তিহাটে, পনের দিন থাকিতেন কলিকাতায়।

একদা একখানা দলিল তৈয়ারী করিয়া আমাকে বলিলেন—সহি কর।

দেখিলাম, এলিয়ট রোডের যে বাড়ীখানা আমি লিজ লইয়াছিলাম, সেখানার মালিকানি স্বত্ব কিনিয়া তিনি ওই বাটী ভায়লেটকে দান করিতেছেন। এবং জানিলাম—ভায়লেটের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে।

জবানবন্দী আমার শেষ হয়ে আসছে—সুরেশ্বর বললে।

ভায়লেটকে অনেক খেসারত দিয়ে, রত্নেশ্বর রায় দেবেশ্বরের সম্মুখ থেকে সরিয়েছিলেন বটে কিন্তু ভায়লেট তার মামে দেবেশ্বরের অন্তিম মুহূর্তে বিকারগ্রস্ত চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় বিকারের ঝোঁকে বলেছিলেন, গোপালদা বের ক'রে দে, কেন আনলি ভায়লাকে—বের ক'রে দে! জোর করে বের ক'রে দে, আ, হাসছে দেখ! ইউ গেট আউট আই সে! শাট্ দ্য ডোর। ইউ শাট্ দ্য ডোর!

আমার ব্যাখ্যা কি জান? শ্যামাকান্তের প্রতি সেই মহাশক্তির রোষ। সেই রোষ ভায়লা

হয়ে এসেছিল তাঁর সামনে।

হঠাৎ চুপ করে গেল সুরেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

সুলতা বললে—হঠাৎ এমন করে, এই যুগে, উনিশশো সালের পঞ্চাশ বছরের পর যখন এ্যাটমিক এজে মানুষ পা দিচ্ছে, তখন এইভাবে ব্যাখ্যা করছ কেন? তুমি তো রিঅ্যাকশানারি ছিলে না, হঠাৎ এসব কি? না—এ সব তোমার আর্টের তুলির ছোপ?

অর্চনা মৃদু স্বরে বললে—মধ্যে মধ্যে এই রকম বলে ও—বংশের ঋণ শোধ করতে তুমি বাধ্য।

সুরেশ্বর বললে—নিশ্চয়ই তা বলতে পার তুমি। কিন্তু না। হয়তো বলার ঢঙটা আমার ঠিক হল না। হেরিডিটির থিয়োরি দিয়ে বললে বাহবা দিতে। তা ছাড়া আর একটা কারণ আছে, সেটা হল এই যে, দেবেশ্বর রায় নিজে এই কথাগুলো একরকম লিখে গেছেন মৃত্যুর দিনই। সে লেখা তোমাকে দেখাব আমি।

নইলে জীবনের শেষ বছরটা তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে যাপন করেছিলেন, জীবনে শান্তি খুঁজেছিলেন। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন কেন, ভালবেসেছিলেন তাঁর উপেক্ষিতা স্ত্রীকে।

স্ত্রী তাঁর সে ভালবাসা নিতে চান নি। বিশ্বাস করেন নি। হয়তো নেবারও শক্তি তাঁর ছিল না, তখন তিনি নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন দেবতার পায়ে।

দেবেশ্বর তাতে দমেন নি। বলেছিলেন—আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, আমাদের ডাইভোর্স নেই; আমার তোমার উপর অখণ্ড অধিকার। দেবতা হোক, দৈত্য হোক, যে হবে সে হোক, তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করে হয় মরব, নয় তোমায় ছিনিয়ে আনব।

এবং তা তিনি এনেছিলেন; পেরেছিলেন তিনি স্ত্রীকে তাঁর অভিমুখিনী করতে। ছেচল্লিশ বছর বয়সে মারা গিছলেন; তাঁর বয়স তখন ছেচল্লিশ, তাঁর স্ত্রীর বয়স চল্লিশ; বড়ছেলে—আমার জ্যাঠামশাইয়ের বয়স তখন সাতাশ, আমার বাবার বয়স পঁচিশ। তখন দেবেশ্বর রায় অহরহ চাইতেন স্ত্রীকে, বলতেন—জীবনে এত শান্তি আছে তা জানতাম না।

আমার ঠাকুমা উমা দেবী বসে হাসতেন।

হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে দেবেশ্বর চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, স্ত্রী শঙ্কিত হয়ে উঠে প্রশ্ন করত—কি হল? এ্যাঁ।

দেবেশ্বর বলতেন—এই জীবনেই সব শেষ? তোমাকে আর পাব না? এত ভালবাসা এত প্রেম সব শেষ এই কটা দিনেই?

স্ত্রী বলতেন—শেষ কেন হবে? শেষের মধ্যে অশেষ যিনি, ওই মা—ওঁকে ডাক, ওঁর দয়া হলে, শেষের পরেও আছে।

দেবেশ্বর বলতেন—না। ম্লান বিষণ্ণ হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন—meaningless, life is meaningless উমা!

চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়াতো। তাঁর স্ত্রী হাঁপিয়ে উঠতেন, তিনি নিজে এর উত্তর

জানতেন নিজের বিশ্বাসবোধে, কিন্তু তা বিশ্বাস করাবার ক্ষমতা তো তাঁর ছিল না। তাও দেবেশ্বর রায়কে।

তিনি নাস্তিক ছিলেন চিরজীবন। তিনি মৃত্যুর দিন এই কথাগুলো লিখে গিছলেন। "শ্যামাকান্ত মহাশক্তির যে রোষবহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বহ্নির ক্ষুধার তৃপ্তি আজও হয় নাই। বাবামহাশয় ইহার দহন হইতে বাঁচিয়াছিলেন নিজের পুণ্যে। তবু তাঁহার বুকে নাগিনীর ছোবলের মত ছোবল সে দিয়াছিল কিন্তু দংশন করিতে পারে নাই। আমাকে সে ছাড়িল না, আমি মরিলাম।"

আরও অনেক কথা। যথাসময়ে বলব। এখন হারানো ক্রমটা খুঁজে নিয়ে বলি।

বিয়ের পর সরস্বতী বউরাণী, তিন ছেলে এবং বউকে নিয়ে এসে পাকা হয়ে বসেছিলেন জানবাজারের বাড়ীতে।

দেবেশ্বর ফার্স্ট ডিভিশনে এন্ট্রান্স পাস ক'রে প্রেসিডেন্সীতে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন ; শিবেশ্বর রামেশ্বর এঁরা তখন একজন চৌদ্দ বছরের, একজন এগার বছরের। কালের বয়স বাড়ে কিনা জানিনে। তবে আমাদের বাড়ে বলে হিসেব একটা রাখি। ১৮৮০ সাল পার হয়েছে। বাংলাদেশের জীবনসমুদ্রে পূর্ণিমার জোয়ার জেগেছে। ইংলিশ চ্যানেলের, মেডিটেরিয়ানের উত্তর কূল ঘেঁষা জোয়ারের সাদা ফেনা মাথায় করে যে ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ে আমাদের ঘরদোরের সব কিছু ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, আমাদের জীবন-সমুদ্রের ঢেউ সে ঢেউগুলোকে রুখে দিয়েছে। নতুন ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিবাদী ধর্ম আর জীবনের প্রসার তখন তাতে আশ্চর্য জোর দিয়েছে। দু'চারজন মুসলমানও নাকি ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তখন। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে কলরোল উঠছে। এরই মধ্যে নতুন বিয়ে করে দেবেশ্বর রায় প্রথম দুটো বছর শুধু পড়া আর নতুন বউকে নিয়ে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। বউকে জীবন ভ'রে পাওয়া সহজ হয় নি, পান নি ; কলকাতার জানবাজারে বাড়ী হলেও এখানেও কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর চালচলনের এতটুকু এদিক ওদিক হয় নি। বউ সেই নিয়মানুসারে উঠত ভোরবেলা, অন্ধকার থাকতে। এবং নিজের ঝিকে ডেকে নিয়ে (ডাকতে অবশ্য হত না—ঝি উঠে বসেই থাকত) প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নান পর্যন্ত সেরে নিয়ে শাশুড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতেন, শাশুড়ী বধূকে ভাবীকালের রায়গৃহিণীর ছাঁচে ঢেলে তৈরী করতেন। রান্নাবান্না কি হবে—থেকে শুরু ক'রে, ঝি-চাকরের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সব কিছুর উপর দৃষ্টি রাখাই গৃহিণীত্ব। সেই দৃষ্টিই তিনি দিতেন। শ্বশুর এলে তাঁর সেবা এবং তাঁর উপদেশ শোনা ছিল অন্যতম কর্তব্য। এবং তার সঙ্গে আর একটা কর্তব্য ছিল, সেটি গভীর রাত্রিতে শেষবার ঘরে যাবার পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে দেখা না-করা।

প্রথম স্ত্রী যতদিন নিতান্ত বালিকা ছিলেন, ততদিন দেবেশ্বর এটা মেনেছিলেন, তিনি বই নিয়ে পড়ে থাকতেন। বই, বই, বই ; পড়া পড়া পড়া! তাঁকেও তখন ছাঁচে ঢালাই চলছে। অথবা নিজেই তিনি নিজেকে গড়ছেন। রায়বংশের আভিজাত্যের ইতিহাসে দেবেশ্বর শ্রেষ্ঠ অভিজাত। চলন ছিল ধীর, কিন্তু দীর্ঘদেহ দেবেশ্বরের পদক্ষেপ ছিল দীর্ঘ। বেশে-ভূষায় শুভ্রতার মহিমা ছিল অক্ষুণ্ণ, অমলিন। কণ্ঠ ছিল গম্ভীর কিন্তু স্বর ছিল মৃদু। পাতলা গোঁফ তখন

বেরুচ্ছে, তা তিনি মোম দিয়ে মেজে সূচালো করতে চাচ্ছেন। গায়ে আতরের গন্ধ থাকত অহরহ। দৃষ্টি ছিল তির্যক, কথা বলতেন বেঁকিয়ে, ঠোঁট দুটিও একটু বেঁকত। নমস্কার করতেন সর্বাগ্রে। ঘৃণা করে তাকালে, যার দিকে তাকাতেন সে যেন মনে মনে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই দেবেশ্বর রায়—তখন তিনি ১৮।১৯ বছরের নবযুবক, তিনি এই বালিকা স্ত্রীর জন্য জেগে বসে থাকতেন। বই হাতে। বালিকাবধূ আসত পায়ের তোড়া বাজিয়ে, ঝুম ঝুম শব্দ তুলে। হাতে থাকত পান, নিজের হাতে সাজা। এও তাঁকে শিখিয়েছিলেন তাঁর দিদিমা এবং তাঁর শাশুড়ী। দেবেশ্বর পান দু-খিলি খেয়ে বলতেন—"মালা গাঁথতে পার না? বেলফুলের এত কুঁড়ি!"

বালিকাবধূ শিউরে উঠে বলতেন—বাবা গো, ফুলে পূজো হয়, মা পূজো করেন—

—মা তো এত ফুল নিয়ে পূজো করেন না। ফুল তো গাছেই বাসী হয়।

—তা হোক। কি মনে করবেন বল তো!

এই বলতে বলতেই বালিকাবধূ ঢুলতে আরম্ভ করতেন। এবং আর কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বামীর বুকে বা কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেতেন।

এইভাবে দু বছর কাটল। বালিকাবধূ কিশোরী হল। "ত্রয়োদশ বসন্তের মালা।" দেবেশ্বর এফ-এ পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাস করলেন! দেবেশ্বর প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। এবং বধূর কোলে এল প্রথম সন্তান।

এরই মধ্যে হঠাৎ এল সংঘাত। হঠাৎ সরস্বতী বউরাণী মারা গেলেন। সেই শ্রাদ্ধে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাটের এল ঠাকুরদাস পাল। ঠাকুরদাসের সঙ্গে আর একবার ছিন্ন প্রীতির বন্ধন জোড়া লেগেছিল, দেবেশ্বর রায়ের বিয়ের সময়। সুখী হয়েছিলেন রত্নেশ্বর। সব ভার দিয়েছিলেন ঠাকুরদাসকে। গোপালও এসেছিল বিয়েতে। কিন্তু সে কীর্তিহাট যায় নি। যায় নি গোয়ানদের জন্য। এবার এল এই শ্রাদ্ধে। তখন সে সেই পাঁচ হাজার টাকা মূলধনে ব্যবসা শুরু ক'রে বিশ-ত্রিশ হাজারের মালিক হয়েছে। হঠাৎ শ্রাদ্ধের পরেই ঠাকুরদাস খুন হয়ে গেল। বচসা করতে করতে পিক্রু গোয়ান তার পেটটা ফেড়ে দিলে।

সুরেশ্বর বললে—তার গূঢ় কারণটা রায়বাহাদুরের ডায়রীতে পাই নি সুলতা। পেয়েছি দেবেশ্বর রায় যে চিঠি লিখেছিলেন রাঙা পিসীকে, তার মধ্যে।

"ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই খুন হইলেন; সে খুনের হেতু কে, আমি অথবা গোপালদা তাহা আজও বুঝিতে পারি নাই। তবে খুন পিক্রু করিলেও তাহা করাইল কে, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে নাই।"

গোপাল ঘোষ একটা অন্যায় করেছিলেন। দেবেশ্বরও তার ভাগী ছিলেন। গোপাল ঘোষ তখন বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার মালিকই হন নি, তিনি তখন ব্রাহ্ম হয়েছেন। একটি মেয়েকে ভালবেসে তাকে বিয়ে করবার জন্য ব্রাহ্ম হয়েছেন। সে কথাটা তিনি বলেন নি। এবং দেবেশ্বর সেটা জানতেন, তিনিও সেটা বলেন নি। কথাটা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল।

রত্নেশ্বর রায় প্রাচীনপন্থী, তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। সে ক্ষোভ তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ। তিনি প্রথম দেবেশ্বরকেই বলেছিলেন—তুমি জান যখন, তখন আমাকে বল নি কেন?

দেবেশ্বর বলেছিলেন—কেন বাবা, গোপালদা এখানে তো ব্রাহ্ম হয়েছে বলে মাথাও উঁচু করে নি। ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও খায় নি, খেতেও চায় নি; যেখানে থাকতে দিয়েছেন থেকেছে। কারুর অসম্মানও করে নি।

রায়বাহাদুর বলেছিলেন—সে সদ্‌গোপ হয়ে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেছে। এ-অধর্ম। এর সাজা দেব আমি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তার আগে আমাকে সাজা দিতে হবে। কারণ এতে আমি মত দিয়েছিলাম। কাউকে জানাতে বারণ করেছিলাম। এবং এ শ্রাদ্ধেও তাকে আমি আসতে বলেছি বলেই সাহস করে সে এসেছে। বলেই তিনি চলে গিয়েছিলেন, অন্দরে নিজের ঘরে।

দেবেশ্বর লিখেছেন—"বাবা মহাশয়ের আসল ক্রোধটা গোপালদাদার উপর, সে ব্রাহ্ম হইবে কেন? ব্রাহ্মধর্মের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সে তুমি অবগত আছ। আমার উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন—তোমার স্পর্ধা, তুমি এমন কথা বলিতেছ। শাস্ত্রের তুমি কি জান? আমি বলিলাম—কিছুই জানিতে চাহি না। তবে গোপালদাদা কোন অন্যায় করিয়াছে, যে শাস্ত্রে বলিবে, আমি মানিতে পারিব না। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। ইহার পরই পিক্রু আসিয়া তাঁহার কাছে গোপালদাদার বিরুদ্ধে নালিশ করিল। ভায়লেটকে সে গোয়ানপাড়া হইতে তিন বৎসর পূর্বে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে।"

ঠাকুরদাস ছুটে এসেছিল। তার আগে রটে গেছে যে, পিক্রু নালিশ করেছে, গোপালের নামে। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তুই বসে দেখ ঠাকুরদাস। আমার বিচারে বাধা দিস নে। আমি অন্যায় বিচার করব না।

ঠাকুরদাস চিনতেন তার দাদাঠাকুরটিকে, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তার মানে? গোপাল আমাকে বলেছে, তুমি দেবুবাবুর উপর ক্ষেপেছ। দেখ, তুমি গোপালকে সাজা দাও-দাও, আমি তাকে সাজা দেব, ত্যাজ্যপুত্র্র করব।

—আমিও দেবেশ্বরকে তাই করব। সম্পত্তি সব দেব বউমাকে। তারও জাত গিয়েছে।

—দাদাঠাকুর! এ সব তুমি কর না।

—না করে আমি পারি না। ধর্মের অপমান হয়েছে, পিক্রু নালিশ করেছে।

—ধম্ম-অধম্ম বুঝি না। দেবুবাবা গুলি খেয়ে মরতে চেয়েছিল। প্রাশ্চিত্তির তার হয়ে গিয়েছে। গোপালকে তুমি তখন পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছ। কেন দিয়েছিলে! আর পিক্রু? ওকে তুমি শুধোও দিকি, ওর বোনের বিচার কে করবে? সে তো তোমার দেওয়া বাড়ীতে তোমার টাকায় ধেই-ধেই করে নাচছে! বেশ্যে—

পিক্রু চিৎকার করে উঠেছিল—ঝুটা বাত। মু সামাল করনা—

—যাঃ বেটা গোয়ান। চেঁচাসনে মেলা।

ধমক দিয়েছিলেন এবার রত্নেশ্বর—ঠা—কু-র-দাস!

—দাদাঠাকুর কার বিচার করবে? বল তো? তোমার বাবা, তার বাবা, তোমার মায়ের বাবা।

—দারোয়ান! দরওয়াজা সব বন্ধ কর, দারোয়ান। ঠাকুরদাস, কি বলছিস! আস্তে

বল। আস্তে।

গলা নামিয়েই বলেছিল ঠাকুরদাস—কিন্তু নিচু গলা হলেও খুব শক্ত গলায় বলেছিল—দেবুবাবাকে নিয়ে যদি কিছু কর—আমি জানি, তুমি পার, সব পার, যে শ্যামনগরকে বাঁচাতে তুমি মরতে গিয়েছিলে, সেই শ্যামনগরের মানুষের টুঁটিতে পা দিয়ে তুমি টাকা বার ক'রে সেই টাকায় ইস্কুল করে দিলে। তুমি সব পার। কিন্তু এ কাজ করলে আমি গাঁয়ে-গাঁয়ে বলে বেড়াব ঢাক বাজিয়ে,—শুধাও তোমাদের জমিদার রত্নেশ্বর রায়কে—, তার মায়ের বাবার নাম কি? জমিদারের আসল মা কে? আসল বাবা কে? তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢেকেছ? উল্টে দেব শাকের ঢাকা। বলব, শুধাও ভায়লা কার বিটি? ওর বাবা যে হোক, মাটা কে?

মনে মনে চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু তার প্রকাশ বাইরে কিছু হয় নি। শুধু বলেছিলেন—চেঁচাস নে ঠাকুরদাস, চেঁচাস নে। যা বলবি আস্তে বল।

ঠাকুরদাস ভেবেছিল, সে জিতেছে। সে আরও স্ফীত হয়ে বলেছিল—আমি সব জানি, তোমাদের ভাই-বুনের ঝগড়ার সময়, যেদিন অন্নপূর্ণাদিদিকে সব কথা বলে চিঠিপত্তর পড়ে শোনাও, সেদিন আমি সব শুনেছি। ওসব কথা তুমি ছাড়ান দাও। দেবুবাবা বড়লোকের ছেলে, তার ওপর এই তোমাদের বংশাবলীর ধারা। একটা শাপ-শাপান্ত আছে। এক পুরুষে তা ক্ষয় না দাদাঠাকুর। অনেক পুরুষ লাগে। আর এ তো একটা ওই জাতের ছুঁড়ি। নিজেদের ভেতরেই দশজনার সঙ্গে রসের খেল্ খেলে, শেষে একজনাকে বিয়ে করে। আজ বিয়ে করে, কালকে ছাড়ে, আবার আর একজনাকে ধরে।

পিরু লাফ দিয়ে উঠেছিল আবার—হুজুর!

হুজুর তখন পিরুর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

হুজুর বলেছিলেন—আমার ছেলের বিচার আমি করতে পারি পিরু, কিন্তু ঠাকুরদাসের ছেলের বিচার আমি করতে পারব না।

—ঠাকুরদাস কি বলছে, তার বিচার কর।

—তাও পারব না।

—তবে আমি নিজ জোর সে শোধ নিয়ে লেবে।—

—সে কথা ওকে বল। বোঝাপড়া কর।—

বাস। সঙ্গে সঙ্গে পিরু ঠাকুরদাসের টুঁটি চেপে ধরেছিল। ঠাকুরদার চমকে উঠে গলা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে বলেছিল—আয় শালা—আয়, বাইরে আয়। তুই গোয়ান, আমি গোপ। আয়!

তারপর, ওই কংসাবতীর ঘাটে—।

* * *

সুরেশ্বর চুপ করলে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়ালে একখানা ছবির সামনে।

দেবেশ্বর রায় আর উমা দেবী—তাঁর স্ত্রীর ছবি। ছবিখানায় দুজনের মধ্যে যেন একটা

পাতলা কালো যবনিকার আড়াল পড়ে আছে। সুলতার মনে হল, যেন একটা মূর্তি। নারী-মূর্তি।

সুরেশ্বর ছবিখানা দেখতে দেখতে বললে, দেবেশ্বর রায় সেই দিনই রাত্রে গোপালকে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলে এসেছিলেন কীর্তিহাট থেকে। কীর্তিহাট থেকে কলকাতায়। শুধু স্ত্রীকে বলেছিলেন—চল আমার সঙ্গে।

স্ত্রী বলেছিলেন—আমি রায়বাড়ীর বউ, শ্বশুরের অনুমতি না নিয়ে যেতে পারব না।

ব্যাস, সেই অবধি এই আড়াল রয়ে গেল। ধর্ম, দেবতা, রায়বংশের লালসা যা বলবে বলতে পার।

একটা গম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে।

সে ছবিখানার সামনে থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল আর একখানা ছবির সামনে। এ ছবিখানা তার নামকরা ছবি। Indian Madona। একটি কালো মেয়ের কোলে একটি ছেলে। তার পিছনে যে রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড তাতে একটা ক্রুশের ছায়া পড়েছে।

সুলতা বললে—ও ছবিটা তো—?

অর্চনা বললে—হ্যাঁ, কুইনীর ছবি।

ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং শব্দে তিনটে বাজল। সুরেশ্বর ছবিখানার ধার থেকে সরে এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে জানালা খুলে দিলে। পূর্ব-আকাশে শুকতারাকে দেখা যাচ্ছে।

সুরেশ্বর বললে—রাত্রির তৃতীয় প্রহর পার হল। চতুর্থ প্রহরের সঙ্গে সঙ্গেই আমার জবানবন্দী শেষ হবে। কাল থেকে সাধারণ মানুষ সুরেশ্বর রায়। কীর্তিহাটের জমিদার বংশের সন্তান নয়। কাঠগড়ার ভেতর থেকে বেকসুর খালাসের রায় নিয়ে বেরিয়ে আসব।

জ্বলন্ত সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিলে সে। তারপর বললে—অর্চনা আছিস ভালই হয়েছে। অসঙ্কোচে এক গ্লাস হুইস্কী খেতে পারি। তুই না থাকলে আমার সঙ্কোচ হত। সুলতা, নতুন কালের মেয়ে, রাজনৈতিক চেতনাও প্রখর, কিন্তু তবু Indian moral code খানা ওর কাছে পুরনো হয় নি। ও আমাকে বলেছে খেতে, কিন্তু তা আমি পারি নি। ভাবছিলাম, আর খাবই না। কোন দিনই না। কেননা জমিদারী যখন উঠে গেল, তখন রায়বংশের শেষ অভিজাত পুরুষ হিসেবে মদটা আমার ছেড়েই দেওয়া উচিত। তাতে যদি এবার বেণীর সঙ্গে মাথাটাও যায় তো যাক। এর আগে বহুবার ছেড়েছি, আবার ধরেছি। এবার আর না। সুতরাং শেষ গ্লাসটা খেয়ে নিই। রায়বংশের সাতপুরুষের মধ্যে কুড়ারাম রায় থেকে বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় পর্যন্ত সবটাই বলেছি। এদিকে আমার খানিকটা এবং আমার বাবার সবটাই সকলের জানা। দেবেশ্বর রায়ের কথা বলছি। মদের গ্লাস হাতে না করে দেবেশ্বর রায়ের কথা বলা যায় না।

সুলতা হেসে বললে—কেন অকারণে তাঁর দোহাই পাড়ছ সুরেশ্বর? তুমি তো নিজে আর্টিস্ট। আর্টের দোহাই দিয়ে নিশ্চয় খেতে পার। লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অধ্যাপক, ছাত্র এমন কি করেন এখাসী কনস্ট্যলেটে অনেক খদ্দরধারীকেও এ পদার্থ পান করতে দেখা যায়। মন্ত্রীটন্ত্রী যাঁরা, তাঁরা এদেশে যাই করুন, বিদেশে গিয়ে কি করেন বা বাড়ীতে কি করেন, তা

হলপ করে কেউই বলতে পারবে না। স্বাধীনতা আসার পরও যদি মদ খাওয়ার স্বাধীনতা না থাকে তবে সে স্বাধীনতার মূল্য কি বল?

একটু দূরে দেরাজের মাথার উপর রঘু বোতল-গ্লাস-সোডা সব রেখে গিয়েছিল। সুরেশ্বর উঠে গিয়ে খানিকটা হুইস্কী গ্লাসে ঢেলে সোডা মিশিয়ে একটু চুমুক দিয়ে বললে—কুড়ারাম রায় ভটচাজ নবাবী আমলে কারণ করতেন মায়ের নাম নিয়ে; সোমেশ্বর রায় মদও খেতেন, কারণও করতেন, বীরেশ্বর রায় ইংরেজদের এদেশী নবাবীধরনে মদ্যপান করতে শুরু করে শেষে উন্মাদের মত খেয়েছেন। ওদিকে শ্যামাকান্ত ভ্রষ্ট তান্ত্রিক—ছিলেন রত্নেশ্বরের মাতৃবংশে। তাঁর বাপও ছিলেন তান্ত্রিক। মদ্যপান তিনিও করতেন। এতে প্রথম ছেদ টেনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। শ্যামাকান্তের পুত্রের দিকে বংশধারা বিমলাকান্তে শেষ। পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু রায়বংশে রত্নেশ্বরের পর আবার দেবেশ্বর এসে শুরু করলেন মদ্যপান। এবং রায়বংশে তিনিই প্রথম রায় এ্যারিস্ট্রোক্র্যাট, যিনি খাঁটি মডার্ন ধরনে, মানে ইংরিজী ধরনে, ইংরেজের মত, খাঁটি বিলিতী মদ খেতে ধরেছিলেন।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বললে—এবং নির্ভীকভাবে খেতে ধরলেন।

কলকাতায় ফিরে এসেই মদ ধরলেন, ফের প্রকাশ্যভাবে।

ওদিকে রত্নেশ্বর রায় পরের দিন সকালে ছেলের খবর শুনলেন। ছেলে চলে গিয়েছে রাত্রে গোপালকে নিয়ে। খবরটা বললেন পুত্রবধূ। নতমুখে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন। নিজে থেকে নয়, ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্বশুর।

রত্নেশ্বর রায় বললেন—তুমি চলে যাও শিবেশ্বর রামেশ্বরকে নিয়ে।

বধূ নতমুখে বললে—আপনাকে ফেলে যাব কেমন করে? মা নেই!

রত্নেশ্বরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল। বলেছিলেন—তাহলে এখানেই থাক। সম্পত্তি আমি সব তোমার নামে দিয়ে যাব।

বধূ বললে—না।

—বেশ। যে নেবার তাকেই দেব আমি। আমার পৌত্রকে দেব।

অর্থাৎ দেবেশ্বরের প্রথম সন্তান। রত্নেশ্বর ছেলেকে চিঠি লিখলেন, তার কোন উত্তর পেলেন না। পেলেন নোটিশ ধরনের একখানা চিঠি।

"আমার ভিক্ষামায়ের সম্পত্তি আমাকে দিতে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন রত্নেশ্বর রায়। জানালেন, "দলিলের নকল পাঠাইলাম, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, না পার, আইনজ্ঞ সলিসিটার এটর্নীর বাড়ী গিয়া পরামর্শ লইবে যে, ঐ সম্পত্তি কৃষ্ণভামিনী দাসী রাধাসুন্দরের নামে দেবোত্তর করিয়া ওই দেবোত্তরের ট্রাস্টি করিয়া গিয়াছে সরস্বতী বধূরাণীকে; এবং এই দেবোত্তর সম্পত্তির পত্তনীদার হইতেছেন বিমলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং দরপত্তনীদার হইতেছেন ব্যক্তিগতভাবে রত্নেশ্বর রায়। এ সম্পত্তি কৃষ্ণভামিনী তোমাকে দেন নাই বা দিতে চাহেন নাই।"

এখানেই শেষ করেন নি, সঙ্গে পুত্রবধূ এবং শিবেশ্বর রামেশ্বরকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন দেবেশ্বরকে শান্ত এবং ক্ষান্ত করবার জন্য। সঙ্গে নিজে এসেছিলেন। ছেলে হেসেছিল।

রত্নেশ্বর পৌঁচেছিলেন অপরাহ্ণ বেলায়, তখন সবে কলেজ থেকে ফিরছেন দেবেশ্বর। দেবেশ্বর কিছু বলেন নি, হেসেছিলেন।

বাপ সে হাসির অর্থ বোঝেন নি সেদিন। খেতে বসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছ?

ছেলে উত্তর দেন নি।

বাপ বলেছিলেন—হঠাৎ সম্পত্তির এমন কি প্রয়োজন হল? আমার থেকে পৃথক হতে চাও? স্বাধীনতা?

ছেলে এবারও উত্তর দেন নি। নিরুত্তর পুত্রকে পরাজিত ভেবে পিতা বিজয়ী বীরের মত কীর্তিহাট ফিরেছিলেন। ভার দিয়ে গিয়েছিলেন পুত্রবধূকে।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—তোমাকে বোধ হয় বলি নি সুলতা এবং তুমিও জান না যে, ঠাকুমা আমার আজও জীবিত। উন্মাদ বলে ডাক্তারেরা। সমস্ত দিবা-রাত্রি শুধু জপই করে যান। কারুর সঙ্গে কথা না, বার্তা না, ডাকলে সাড়া দেন না, আপন মনেই আছেন ঠাকুর নিয়ে। কাউকে যেন চিনতেও পারেন না। চিঠি গেলে পড়েন না, ফেলে দেন। নিজের নাম, পরিচয় সব ভুলে গেছেন। প্রথম কিছুদিন বহরমপুরে রাখা হয়েছিল, তখন এ্যাসাইলাম ছিল ওখানে। তখন আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। শুধু জপ করতেন আর চীৎকার করতেন—মুক্তি দাও মুক্তি দাও মুক্তি দাও। তারপর ভায়লেণ্ট হয়ে গেলেন। কপাল ঠুকতেন দেওয়ালে। তখন তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বৃন্দাবনে বাড়ী কিনে রাখা হয়। সেখানেই আছেন। বলেন—তপস্যা করছি। স্বামীর মুক্তির জন্য তপস্যা করছি। নিজের সন্তানদের মুখ দেখেন না। গেলে ক্ষেপে যেতেন শুনেছি। নিজের মনে বেশ থাকেন। তপস্যা করছেন।

আমার ইচ্ছে আছে, আমি এই সব ঋণ শোধ করে একবার যাব। তাঁর সঙ্গে দেখা করব। সম্ভবতঃ আমাকে পরিচয় দিতে হবে না, দেখলেই চিনতে পারবেন। তাঁকে বলব—দাদুর সব দেনা শোধ করেছি আমি। মেজদি এখন সেই বাড়ীতেই থাকেন, অন্যদিকে। এই অর্চনা গিয়েছিল। আমার বাবার মৃত্যু তিনি জানেন না, মায়ের মৃত্যু জানেন না, হয়তো বিয়ের কথাও জানেন না। তবুও আমাকে চিনবেন তিনি। দেবেশ্বর রায়কে তিনি নিশ্চয় ভুলে যান নি।

অর্চনা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সুরেশ্বর বললে—ইম্পসিবল্।—

একটু পর আবার আরম্ভ করলে—সুলতা, পিতাপুত্রের সে এক আশ্চর্য যুদ্ধ! চিঠিগুলো পড়লে অবাক হয়ে যাবে! কারণ যুদ্ধ হয়েছে শুধু চিঠিতে। যা চিঠিতে হয় নি—এমনি হয়েছে, তা আছে অন্নপূর্ণা-মাকে লেখা চিঠিতে। দেবেশ্বর রায়ের জবানীতে বলা।

* * *

বাপ ছেলেকে শাসিয়ে চলে গেলেন বিজয়গৌরবে। ভাবলেন, ছেলে নিশ্চয় বুঝেছে। কিন্তু দেবেশ্বর ভয়ে বুঝবার মত ছেলে ছিলেন না। রত্নেশ্বর রায় নিজের যৌবনকালটা ভুলে

যান নি, তবে তিনি কথায় কথায় বলতেন—আমার সঙ্গে তোমাদের তুলনা ক'র না। আমি গরীবের ছেলে হিসেবে মানুষ হয়েছিলাম। দেবেশ্বরের প্রেমের কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিতেন ইঙ্গিতে, বলতেন—জীবনের প্রথম থেকে ধর্মাচরণের আর ব্রহ্মচর্যের তেজ ছিল আমাদের। যা তোমাদের নেই। তোমরা সাহেব হতে চলেছ।

দেবেশ্বর এর উত্তর দিলেন কাজে।

পড়া ছেড়ে দিলেন। চাকরির খোঁজে বের হলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। নিজের জীবন, নিজের ভবিষ্যৎ, তার সঙ্গে হয়তো জগৎটাকেই নিজের ছাঁচে ফেলে গড়ে নেবেন বলে কল্পনা করেছিলেন।

সুন্দর সুপুরুষ দেবেশ্বরের রূপের কথা বলেছি। তার সঙ্গে ছিল বাকপটুতা, শীলতায় ভদ্রতায় সম্ভ্রমে, ফলে আনত তরুণ গাছের মত—আবার প্রয়োজন হলে, বক্রতায় বাঁকা তলোয়ারের মত—ধারে ক্ষুরের মত। চলে গেলেন মেদিনীপুর, জমিদারী কোম্পানীর আপিসে। কীর্তিহাটের পরিচয়টা সেখানে সুবিদিত ছিল। চাকরি সহজেই মিলেছিল এবং ভাল চাকরিই মিলেছিল। মাইনেও ভালই দিয়েছিল। জেনারেল ম্যানেজার খুব খুশী হয়েছিল তাঁর কথায়। কীর্তিহাটের রায়বাহাদুরের ছেলে চাকরি চায় শুনে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—তুমি চাকরি করবে? কেন?

—আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজে গড়তে চাই; বাপের পয়সায় বড়লোক হয়ে সুখ আছে, গৌরব নেই। একটা লাকের কথা, একটা হল নিজের শক্তির কথা।

খুব খুশী হয়ে সাহেব তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এ কথা তো ইণ্ডিয়ানদের মুখে শুনি না! তারা তো লাক্‌কেই সব বলে মানে।

—আমি মানিনে। তা ছাড়া—।

—কি? বল!

—টিরানী (tyranny) আমি পছন্দ করি না, টাইর‍্যাণ্ট হতে আমি চাইনে।

—মানে?

—জমিদারী মানেই tyranny—আমার বাবাকে আমি দেখেছি। যদিও তিনি আইনের পথ ছাড়া হাঁটেন না তবুও তা আইনসম্মত হলেও অত্যন্ত নির্মম নিষ্ঠুর।

—আমাদেরও তো জমিদারীর কাজ।

—আমি আপনার কাছে এসেছি জমিদারীর কাজের জন্য নয়। আপনি কোন Industrial firm-এ আমাকে ঢুকিয়ে দিন। সেখানে আমার পথ আমি করে নেব।

তাই হয়েছিল। সাহেব তাঁকে নিজে সঙ্গে করে বড় সাহেবী ফার্মে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কয়লার খনি, অভ্রের খনির মস্তবড় কারবার। সেখানে জমি-জায়গার স্বত্ব পরীক্ষার কাজ দিয়েছিল তারা। প্রথমেই মাইনে দিয়েছিল একশো পঁচিশ টাকা।

চাকরি নিয়ে, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বাড়ী ভাড়া করে স্ত্রীকে বলেছিলেন—চল, এ বাড়ী থেকে চলে যাব আমি। নতুন বাড়ী ভাড়া করেছি।

স্ত্রী জানতেন না যে স্বামী পড়া ছেড়ে চাকরি করছেন। কারণ দশটাতেই বেরিয়ে যেতেন ফিরতেন চারটেতে। ভাইরাও জানতে পারে নি।

অবাক হয়ে গেলেন স্ত্রী। বললেন—সে কি?

—হ্যাঁ। আমি চাকরি করছি। বাড়ী ভাড়া করেছি। এ বাড়ীতে আমি থাকব না। আমার সঙ্গে যাও তো চল। নয়তো আমি একলাই যাব। পরের কথা পরে হবে।

স্ত্রী বুঝলেন। তখনকার কালে মেয়েরা একালের মেয়েদের থেকে অনেক অল্পবয়সেই অনেক বেশী বুঝত। তিনি কথাটার মানে বুঝেও বললেন—তুমি বাপের ছেলে। আমি বেটার বউ। আমার অপরাধ তিল হলে তাল হয়। তা ছাড়া রায়বাড়ীর বউ আমি, আমি চঞ্চল হলে আমার অধর্ম হবে। আমি যেতে পারব না শ্বশুরের হুকুম ছাড়া।

দেবেশ্বর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবার। বললেন—যদি আমি বিয়ে করি আবার?

—সে তো এমনিই করতে পার। কে বাধা দেবে তোমাকে? সতীন নিয়েই ঘর করব।

—যদি ক্রীশ্চান হয়ে যাই?

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এবার ওই ছোট্ট বধূটি বলেছিল—না, তা আমি পারব না।

—সে আমি জানি। বলে চলে গিয়েছিলেন দেবেশ্বর। এবং ওই বাড়ীতে বাস শুরু ক'রে মদ্যপান আরম্ভ করেছিলেন মনের ক্ষোভে। দিনে চাকরি করতেন, বিকেলে বাড়ী ফিরে পোশাক বদলে বেরিয়ে যেতেন; বন্ধুবান্ধব মজলিশ গানবাজনার আসর সেরে বাড়ী ফিরতেন অনেক রাত্রে। চাকর অপেক্ষা ক'রে থাকত। কলকাতার মজলিশে তাঁর তখন বিদগ্ধজন বলে খ্যাতি রটেছিল।

হঠাৎ চিঠি এল। চিঠি নিয়ে এল, জানবাজারের বাড়ী থেকে ছোট ভাই রামেশ্বর। রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—"তুমি চাকরি লইয়াছ জানিয়া স্তম্ভিত হইলাম। পড়া ছাড়িয়াছ। স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছ। কারণ কি অবিলম্বে জানাইবে। এবং পত্রপাঠ জানবাজারের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবে। পত্র আমাকে শিবেশ্বর লিখিয়াছে, বধূমাতা লেখেন নাই। পত্রসহ গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম। এই গাড়ীতেই ফিরিয়া আসিবে।"

দেবেশ্বর গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন। শুধু একখানা পত্র রামেশ্বরকে দিলেন, বললেন—বাবাকে যে পত্র লিখবি, তার সঙ্গে এটা পাঠিয়ে দিস। পত্রখানা সংক্ষিপ্ত,—"আমার চাকরি লওয়ার আপনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন কেন বুঝিলাম না। সংসারে যাহার যতই থাক, কাজ করা, উপার্জন করা অগৌরবের নয়। এবং সংসারে যেখানে পৈতৃক অন্নে জীবনধারণ করিলে পদে পদে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে নিজের উপার্জিত অন্নে ভাগ্য গঠন করিলে শুধু স্বাধীনতাই অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, পিতার গৌরবও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করি।"

এক সপ্তাহ পর আবার গাড়ী এসে দাঁড়াল। এবার গাড়ী থেকে নামলেন বধূ। পিছনে ছেলে কোলে নিয়ে ঝি। তার সঙ্গে রামেশ্বর। এবং গাড়ীর ছাদে বোঝাই বাক্স-পেঁটরা। এবং গৃহে গৃহিণীর মতই ঢুকে বললেন—বাবা আমাকে এখানে আসতে বলেছেন।

—এস। কিন্তু আমি যদি ক্রীশ্চান হয়ে থাকি ?

—সে তুমি হ'তে পার না।

হাসলেন দেবেশ্বর। শুধু বললেন—এ বাড়ীতে বাবুর্চি রান্না করে।

—সে আমি শুনেছি। জানি। ঠাকুর এক্ষুনি আসছে। বাবুর্চি থাকবে না। আর আমি এখানে থাকব বলে আসি নি, ধরনা দিয়ে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—অ! শুধু এইটুকু বলে দেবেশ্বর স্নানের জন্যে উঠলেন—আপিস যেতে হবে। এবং বাবুর্চির হাতে খেয়ে চলে গেলেন। বিকেলে ফিরে দেখলেন বাবুর্চি নেই। তার বদলে মেদিনীপুরের খাস কীর্তিহাটী চাটুজ্জেপুত্র জলখাবার তৈরী করেছে—লুচি-হালুয়া-ফল-মিষ্টি। কিন্তু তার তরিবৎ অনেক। দেবেশ্বর সন্ধ্যায় স্নান ক'রে প্রসাধন করে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন বারোটায়। মদ্যপান করেছেন কিন্তু চঞ্চল নন, স্থির, শুধু একটু বেশী গম্ভীর। দেখলেন খাবারের থালা নিয়ে স্ত্রী প্রতীক্ষা করে রয়েছে। পরদিন রাত্রি দুটো। সেদিনও ওই বধূটি খাবারের থালা নিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলছে। পরদিন এলেন দশটায়। এবং এই দশটাই নিয়ম হয়ে গেল। কিন্তু জানবাজার ফিরলেন না।

স্ত্রী রোজ বলেন—আজ ওবাড়ী চল।

—না।

রোজ এই এক কথা, ওই এক উত্তর। অবশেষে একদিন, প্রায় মাসখানেক পর, রাত্রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। বাড়ীতে পুত্রবধূ বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে ঘুম পাড়াচ্ছেন আর বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়ছেন। শ্বশুরকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বললেন—বাবা!

—হ্যাঁ মা। কিন্তু দেবেশ্বর কোথায় ?

নতমুখে পুত্রবধূ বললেন—তিনি তো বেরিয়েছেন আপিস থেকে ফিরে—।

—ফিরবে কখন ?

চুপ করে রইলেন পুত্রবধূ। রায়বাহাদুর বললেন—হুঁ। তার পর বললেন—রামেশ্বর কোথায় ? শিবেশ্বর ? ওবাড়ীতে শুনলাম শিবেশ্বর এখানে এসেছে।

—ওরা থিয়েটার দেখতে গেছে।

—থিয়েটার ?

চুপ ক'রে রইলেন পুত্রবধূ। রায়বাহাদুর বললেন—এই ঘরে আমার একটা বিছানা করে দাও। রাত্রে আমি এখানেই থাকব। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—ওঃ অভিশাপ বটে।

এ আসনে তিনি বসেছিলেন রাত্রি দুটো পর্যন্ত। রাত্রি দুটোর সময় সেদিন দেবেশ্বর ফিরেছিলেন। পদক্ষেপ ঈষৎ স্খলিত; কণ্ঠস্বর একটু জড়িত। বললেন—তুমি দরজা খুলছ কেন, চাকর কোথায় গেল।

—চুপ কর। বাবা!

—কে ?

—বাবা। কীর্তিহাট থেকে এসেছেন।

একবার চমকে উঠলেন দেবেশ্বর। তারপর এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন। নাকের ডগায় কপালে গালে লালচে আভা ফেটে পড়ছে। চোখের দৃষ্টি স্বল্প ক্লান্ত, অথবা নেশায় নিমীলিত, পরনে বাহান্ন ইঞ্চি বহরের ফরাসডাঙার কোঁচানো কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে সেকালের হাল-ফ্যাশনের কিছু বদল হওয়া মুসলমানী আমিরী পাঞ্জাবি, কাঁধে পাটকরা দুধের মত রঙের রেশমী চাদর। গুন গুন ক'রে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢুকেছিলেন, ফিরছেন বিশিষ্ট একজন ধনীর বাগানবাড়ীর বাঈজীর গানের আসর থেকে। স্ত্রীর কথা শুনে থমকে গিয়ে কপাল কুঁচকে চোখ বুজলেন। মনে হল মনে মনে বলছেন—ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তাঁর!

স্ত্রী আবার সামনের ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বাবা বসে আছেন।

একবার তাকিয়েও দেখলেন না দেবেশ্বর, শুধু বললেন—অ! তারপর তিনি সতর্ক পদক্ষেপে পা বাড়ালেন দোতলার সিঁড়ির দিকে।

স্ত্রী পিছন থেকে একটু উচ্চকণ্ঠেই ব্যাকুলভাবে বললেন—ওগো, বাবা বসে আছেন, দেখা কর!

এবার দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে ফিরে তাকালেন স্ত্রীর দিকে, বললেন—ভাল। দেখা করব। বলে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির রেলিং ধ'রে উপরে উঠে গেলেন। এবং সামনেই মার্বেল টপ টেবিলের উপর হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। নিয়ম—চাকর এসে চেয়ার এগিয়ে দেবে, তিনি বসবেন, তারপর চাকর জামা জুতো চাদর একে একে খুলে নেবে। চটি এগিয়ে দেবে। ঘাড় হেঁট করে ভাবছেন, কপালে কুঞ্চন-রেখা দেখা দিয়েছে—এ কি! বাবা এমনভাবে আসবেন কেন ?

হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনে চমকে উঠলেন।—দেবেশ্বর! রত্নেশ্বর নিজেই উঠে এসেছেন, উত্তেজনার মধ্যে চটি জোড়াটা পায়ে না দিয়েই উঠে এসেছেন; দেবেশ্বর আবার চমকে উঠলেন একবার। এটা তিনি আশঙ্কা করেন নি। ঘাড় তুলে দেখে নিলেন একবার, বাপ কত দূরে, তারপর ঘাড় নামালেন। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রণাম করবার চেষ্টাও করলেন না।

—আমি জেগে বসে আছি, আর তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে এলে ?

দেবেশ্বর নীরব। তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন।

—আমাকে তুমি এমন ক'রে উপেক্ষা করতে সাহস কর ? এতবড় স্পর্ধা! তবু দেবেশ্বর নীরব। এক চুল নড়লেন না। বরং এর আগে একটু-আধটু টলছিলেন, সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

—দেবেশ্বর!

নীরব দেবেশ্বর। রত্নেশ্বর বললেন—কথার উত্তর দাও!

—কাল সকালে উত্তর দেব। আজ আমি সুস্থ নই। বলে জুতো-জামা না ছেড়েই সামনেই শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

—দেবেশ্বর, দরজা খোল, দেবেশ্বর!

দেবেশ্বর উত্তর দিলেন, কিন্তু সরাসরি বাপকে নয়, ডেকে স্ত্রীকে বললেন—মানিক-বউ, বাবার শোবার ব্যবস্থা করে দাও; আমার শরীরটা খারাপ করছে। তুমি একটু শিগ্‌গির এস। আমার সেই গুলী লাগা জায়গাটায় যেন কেমন ব্যথা জাগাচ্ছে। একটু মালিশ দিতে হবে। চাকরটাকে বল। তুমি বাবার ঘুমের ব্যবস্থা কর।

পরদিন বেলা আটটার সময় উঠলেন দেবেশ্বর, দেখলেন রায়বাহাদুর—কীর্তিহাটের একচ্ছত্র অধিপতি রত্নেশ্বর রায়—তাঁর প্রতীক্ষায় গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে আছেন। স্নান পুজো হয়ে গেছে। পুত্রবধূ ফল কেটে রূপোর রেকাবীতে সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার সঙ্গে কিছু মেওয়া ফল। বাইরে—জানবাজারের জুড়ি, কোচম্যান সহিস; চাকর দারোয়ান। কিন্তু সবাই স্তব্ধ। যেন একটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

দেবেশ্বরের শুন্য চাকর ছিল উপরে। তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেয়েই নিচে নেমে এলেন, এসে বাপকে প্রণাম করে সামনে দাঁড়ালেন। মাথা হেঁট করেই দাঁড়ালেন।

রত্নেশ্বর রায় বললেন—চা খেয়েছ?

ঘাড় নাড়লেন দেবেশ্বর—না।

রত্নেশ্বর বললেন—বউমা চা আন।

পুত্রবধূ চলে গেলেন চা আনতে। রত্নেশ্বর তিরস্কার শুরু করলেন। প্রথমে মৃদুস্বরে, তারপর সে স্বর চড়ল। দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। যে মুহূর্তে পুত্রবধূ দরজায় ঢুকলেন, অমনি চুপ করে গেলেন। বধূ চা-খাবার এনে নামিয়ে দিলেন। রায়বাহাদুর বললেন—খাও।

ছেলে নড়ল না। বাপ বললেন—নইলে আমার খাওয়া হয় না। খাবার পড়ে রয়েছে, দেখছ না?

দেবেশ্বর এবার চা ও খাবারে হাত দিলেন। বাপও ইষ্টকে নিবেদন ক'রে ফলের টুকরো মুখে দিয়ে ওবাড়ীর সরকারকে ডেকে বললেন—দারোয়ান চাকরদের বল, এ বাড়ীর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিক। সন্ধ্যেবেলা তক ওবাড়ী যাবে। কাল সকালে কীর্তিহাটে। বড়বাবু, বউমা, খোকার সব জিনিস যাবে কীর্তিহাটে।

এবার দেবেশ্বর বললেন—আমার আপত্তি আছে।

—কারুর আপত্তি আমি মানি না। পুত্র চমকাল না কিন্তু অতর্কিতে এমন ধমকে বধূটি চমকে উঠল।

দেবেশ্বর হাসলেন। বধূটির লজ্জার আর সীমা রইল না। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের। শ্বশুর হেসে বললেন—এই ক্রোধ রিপুটা আর আমার গেল না। ভূমির অধিকারীত্বের সঙ্গে সম্বন্ধটা নিগূঢ়। ছেলের হাসিকে গ্রাহ্য করলেন না। অর্থও ভুল করলেন, ভাবলেন বিনীত আত্মসমর্পণ। স্ফীতও হলেন। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল। সন্ধ্যায় এসে উঠলেন জানবাজারের বাড়ীতে। সেখানে শিবেশ্বর এবং রামেশ্বর অপরাধীর মত ঘরে লুকিয়েছিল। তাদের কয়েকটা কটু কথা বলে রেহাই দিলেন। খুশী হয়েছেন বড়ছেলেকে

আরম্ভ করেছেন।

কিন্তু কীর্তিহাটে এসে দেখলেন, ভুল তাঁরই। প্রচণ্ড ভুল করেছেন। তিনি অন্ধ।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে যা আছে তাই বলি। আমি তাঁর চেয়ে ভাল ক'রে বলতে পারব না। লিখেছেন—"আমি ভুল করিয়াছি। আমিই অন্ধ, আমিই অন্ধ। দেবেশ্বরের যে লৌহকঠিন অবাধ্যতা এবং জেদকে ভাঙিয়াছি মনে করিয়াছিলাম সেটা ধৃতরাষ্ট্রের ভাঙা লৌহভীমের মত, একটা কৃত্রিম এবং অলীক বস্তু ছাড়া কিছু নয়।"

তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন দেবেশ্বর স্বরূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। তিনি কীর্তিহাটে এসে, পরদিন থেকেই অন্ন এবং আহার ত্যাগ করলেন। শুধু জল। এবং মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে একখানা মোটা বই নিয়ে বসে রইলেন ইজিচেয়ারে।

কাছারীতে বসে একটা লাটের প্রজাদের সঙ্গে মিটমাটের কথা হচ্ছিল। লাটভুবনপুরের মধ্যে মৌজা খান-দশেক ; দশখানা গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে মামলা চলছিল দু বছর। বৃদ্ধির জন্যে মামলা করেছিলেন রায়বাহাদুর। প্রজারা বৃদ্ধি দিতে রাজী ছিল কিন্তু সে টাকায় এক আনা থেকে শুরু করে দু' আনা পর্যন্ত উঠেছিল, তারপর খুঁট পেতে বসেছিল—লড়াই হয় হোক। এর বেশী দেবে না।

রায়বাহাদুরের দাবী ছিল—টাকায় চার আনা এবং প্রত্যেক জোতজমা জরীপ করে দেখে যার জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, তার উপর খাজনা ধার্য।

নতুন কেনা লাট। বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক। রায়বাহাদুর হুকুম দিয়ে গোমস্তা পাইক উঠিয়ে এনে, কাগজ ফেলে দিয়েছিলেন মামলা সেরেস্তায়। সেখান থেকে গাদাবন্দী আর্জি গিয়ে পড়েছিল মুন্সেফী আদালতে। এ-লাটখানা ২৪ পরগণার অন্তর্গত, আলিপুর, সদর সাব-ডিভিশনের এলাকা। দু' বছর লড়ে প্রজারা গড়িয়ে পড়েছে—হুজুর, একটা মিটমাট করে নিন। টাকায় সিকি বৃদ্ধি দিতে গেলে আমরা মরে যাব। এতেই আমরা দু'বছর মামলা করে ঘায়েল হয়ে পড়েছি। দশখানা গ্রামের মাতব্বর সে প্রায় পঞ্চজন হিসেবে হলে পঞ্চাশ হয় সুলতা, কিন্তু পঞ্চের চেয়ে বেশি এসেছিল, দশ হিসেবে একশো নয়, বিরাশী জন। দেবোত্তরের ভাণ্ডারের খাতায় খরচ লেখা আছে, চালের খরচ। "অদ্য লাটভুবনপুরের বিরাশীজন ও অন্যান্য স্থানের ত্রিশজন প্রজা আইসে তাহাদের জন্য মায়ের ভোগ বরাদ্দ ব্যতীত বাড়তি চাউল বরাদ্দ—এক মণ আঠারো সের।"

খাস কাছারী—যে কাছারী-ঘরে অতুলেশ্বর কার্টিজ আর বোমার সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছিল, সেইটে তখন নতুন তৈরি হয়েছে—সেই ঘরে, ওই কুইন ভিক্টোরিয়ার অয়েল পেন্টিংয়ের নীচে তিনি বসেছিলেন, ফুরসী নলে টান দিচ্ছিলেন এবং মনে মনে প্রজাদের কতটা মাপ করা যায়, সেই কথা ভাবছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর খাস চাকর এসে পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডেকেছিল—হুজুর!—

চিন্তার মধ্য থেকেই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—উঁ—। ছোট্ট উঁ।

—এই রোকাখানা। বলে সে একখানা কাগজ তাঁর সামনে এসে ধরেছিল।—কি এটা? বলে রোকাখানা তুলে ধরে পড়েই গভীরতর চিন্তায় ভুরু-কপাল কুঁচকে, ঘাড়টা

একটু ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন পলকহীন দৃষ্টিতে।

রোকাখানায় লেখা, পুত্রবধূ লিখেছেন—"আপনার ছেলে সকালবেলা হইতে কাহারও ডাকে সাড়া দিতেছেন না, জল ছাড়া কোন কিছু খাইতেছেন না, সকাল হইতে চা পর্যন্ত খান নাই। শুধু দু গ্লাস জল খাইয়াছেন। আমি কি করিব? কাহাকে বলিব? যাহা হয় আপনি করুন।"

কপালের কুঞ্চনরেখার সারির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবং দৈর্ঘ্যেও প্রসারিত হচ্ছিল দুই প্রান্তে। নাকের উপরেই ভ্রূর মধ্যে তিনটে রেখা জেগে উঠে ত্রিশূলের মত মনে হচ্ছিল। সব আলোচনা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কে কথা বলবে এ-সময়? হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আসছি আমি। মণ্ডলদের সব তামাক দিতে বল।

রত্নেশ্বর এসে দেখলেন দেবেশ্বর ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন। বাপের পায়ের চটির শব্দ শুনে মুঁখ তুলে দেখে উঠে নীরবে দাঁড়ালেন।

রত্নেশ্বর বললেন—তুমি কি আমাকে অপমান করতে বদ্ধপরিকর?

দেবেশ্বর ইজিচেয়ারের পাশে একটা তেপায়া ছিল, সেটার উপর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে লিখে উত্তর দিলেন—"না। তবে আমারও একটা সম্মান আছে। সে সম্মান বজায় রাখিতে আমি মরিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। আমিও রায়বংশের সন্তান, উত্তরাধিকারী। আমি রায়বাড়ির প্রজা নহি। এবং আপনার প্রতি ভয়, আতঙ্ক সবকিছু—সেদিন গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াও বাঁচিয়া উঠিবার পর চলিয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত আমার বয়স যোড়শ বর্ষ অনেক দিন অতিক্রম করিয়াছে, আমি পুত্রের পিতা হইয়াছি।"

রত্নেশ্বর স্থিরভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ছেলেকে বলেছিলেন—বস।

দেবেশ্বর ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তুমি আমার পুত্র নও? তুমি ভুল করলে আমি তোমাকে শাসন করব না?

লিখেই উত্তর দিয়েছিলেন দেবেশ্বর—"পুত্রেরও স্বাধীনতা আছে। সেও মানুষ। আমার ধারণা আমার ভাল-মন্দ বুঝিবার বয়স হইয়াছে এবং সেমত বিদ্যাবুদ্ধিও আয়ত্ত করিয়াছি। আমার জীবনের ভাল-মন্দ যেমন আপনি বিচার করেন, তেমনি আপনার চরিত্রের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া নিজেকে গঠন করিয়াছি। যে-কঠোরভাবে আপনি আত্মনির্যাতন করিয়াছেন, তাহার জন্যই আজ আপনি এমত প্রকার কঠিন ও কঠোর চরিত্র, রূঢ় প্রকৃতি। তাহার সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধি জড়িত করিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহাকে আপনি ধর্ম বলেন—আমি অধর্ম মনে করি।"

দেবেশ্বরের হাত চেপে ধরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—স্বার্থবুদ্ধির অপবাদ দিচ্ছ তুমি দেবেশ্বর?

সসম্ভ্রমে হাতখানি টেনে এবার মুখে বলেছিলেন—হাতখানা ছাড়ুন, মুখে এর উত্তর দিতে পারব না আমি। লিখে দিচ্ছি।

ছেলের হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। দেবেশ্বর লিখেছিলেন—তার দুটি দৃষ্টান্ত

আমার অন্তরে মর্মান্তিক ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম আমার ভিক্ষা-মাকে যে-কারণে দেশত্যাগিনী করিয়া নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন, সে-কারণ এমন কোন অপরাধ নয়।

মাঝখানেই রত্নেশ্বর বলে উঠেছিলেন—না-না। তুমি জান না। তুমি জান না। সে আমার সর্বনাশ করত। সে আমাদের বংশের অভিসম্পাত, ছলনা করে প্রবেশ করেছিল। সর্বনাশ হয়ে যেত।

দেবেশ্বর লিখলেন, কিন্তু তাহার সম্পত্তি লইলেন কেন?

—তার স্বামীর তাই অভিপ্রায় ছিল। সম্পত্তি দেবোত্তর করা। এবং একজন ভ্রষ্টাচরিত্রার দেবোত্তরের সেবায়েত হবার অধিকার নাই।

—আমি স্বীকার করি না, দেবতার সেবা করিবার অধিকার নাই। পাপী-তাপী-পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা সকলেরই অধিকার আছে।

দৃঢ়স্বরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না-না। বেশ্যা নিজে দেবতা স্থাপন করে পুজো করতে পারে সে তার। কিন্তু সৎ শুদ্ধ গৃহস্থের স্থাপিত বিগ্রহের সেবায়েত ভ্রষ্টা হলে তার সে অধিকার থাকে না। থাকতে পারে না। যেমন জাতিচ্যুত বা জাত্যন্তরগ্রহণে পৈত্রিক সম্পত্তিতে এমন কি পিতামাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম, সেই রক্ষা দেবেশ্বর, হতভাগিনী মরে বেঁচেছে। নাহলে সে আমাকে বলেছিল, সে তোমার মা, তোমাকে সে কথা বলতে পারব না। তবু ইঙ্গিতে বলি, বলেছিল—সে মুসলমান বা ক্রীশ্চান হয়ে যাবে। ঠাকুর গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবে।

দেবেশ্বর লিখে জানিয়েছিলেন, কৃষ্ণভামিনী মরেন নি। বৃন্দাবন থেকে মৃত্যু রটনা করে পালিয়ে এসে বাইজীবৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

তিক্ত হেসে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তাও জান তুমি? সেও আমিও জানি, কিন্তু কথাটা বলতে পারি নি তোমাকে।

এবার দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার লিখেছিলেন, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ রামছবি চক্রবর্তীকে স্ত্রী-পুত্রসহ নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন। তাহা নিষ্ঠুরতা নয়?

—মৃত্যু? মৃত্যু নিষ্ঠুরতা নয়? কিন্তু তা নিয়ম। সমাজের মধ্যেও নিয়ম আছে। তার কিছু কিছু নিষ্ঠুর হয়ে থাকে।

এবার যেন পরাজিত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন দেবেশ্বর। লিখেছিলেন—"আপনি ভ্রান্ত সংস্কারবলে আপনার মাতামহের ভ্রান্তির বা মস্তিষ্কবিকৃতির কলঙ্ককে বংশগত অভিশম্পাত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এবং নিজেকে যন্ত্রণা দিতেছেন, আমাদিগকেও যন্ত্রণা দিতেছেন।"

সভয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—থাম থাম। তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তুমি জান?

—জানি। মুখেই বলেছিলেন দেবেশ্বর।

—কে বললে।

এবার আবার কাগজ টেনে লিখে দিয়েছিলেন দেবেশ্বর, যার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করিবার জন্য আপনি পিরুকে দিয়া খুন করাইলেন। ঠাকুরদাস জ্যাঠামশাই। গুলি লাগিয়া

যখন শয্যাশায়ী ছিলাম, তখন জ্যাঠামশাই কলিকাতা আসিয়াছিলেন; গোপনে তিনিই আমাকে সব বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ইহাতে তোমার দোষ নাই, দেবু বাবা। তোমার বাবার পিতামহ-মাতামহ দুই দিক হইতে অভিশম্পাত আছে। আমাকে তিনি সাবধান করিবার জন্যই বলিয়াছিলেন। "রায়বংশের নিন্দা করেন নাই।"

—তবে? তবে তুমি কেন আমাকে এই কঠোরতার জন্য দোষারোপ করছ। আমি নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করেছি। অঞ্জনা-কৃষ্ণভামিনী দুটো নারীকে বলতে গেলে, পঙ্কসমুদ্রে ফেলে দিয়েছি, তারা ডুবে গেছে। কেন? রায়বংশকে বাঁচাতে। তুমি মূর্খের মত, পশুর মত প্রলুব্ধ হয়ে সেই অভিশাপের হাতছানিতে ছুটছ।

চুপ করে বসেছিল দেবেশ্বর, উত্তর বোধহয় খুঁজে পান নি। বা যে উত্তর তিনি পরে দিয়েছিলেন, সেটা তখন-তখনই বাপের সম্মুখে লিখে দিতে পারেন নি। দিলে সেটা মুখের উপর জবাব করা হত।

ওদিকে কাছারী থেকে লোক এসেছিল। সময়টা ভর্তি কাছারীর সময়। সকালবেলায় প্রথম প্রহর পার হয়ে দ্বিতীয় প্রহরে ঢুকছে দিন। কীর্তিহাটে যারা আসবার জন্য সকালে বা রাত্রি থাকতে যাত্রা করেছে, তারা এসে পৌঁছে গেছে। ওদিকে ডাক এসেছে। মামলা সেরেস্তায় তো দশখানা তৌজির মাতব্বর বসে আছে। এর মধ্যে হরকরা খবর এনেছে, তমলুকের এস-ডি-ও সাহেবের চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। রত্নেশ্বর রায় ছেলেকে নীরব দেখে বললেন—ভেবে দেখ। কিন্তু গোটা বাড়ীতে, গোটা গ্রামে একটা সোরগোল তুলে জাহির কর না যে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের পুত্র অবাধ্য। সে তাঁকে অপমান করেছে। রায়বাহাদুর তাই নীরবে হজম করছেন। রত্নেশ্বর রায় বাঘ নয়, শেয়াল হয়ে গেছে ছেলের কাছে।

তমলুকের এস-ডি-ও অর্শে ভুগছিলেন, তার জন্য ওল খেতে বলেছে কবিরাজ এবং স্থানীয় প্রধানেরা, তাই তিনি কীর্তিহাটের রায়বাহাদুরের কাছে পাঠিয়েছেন, কিছু ভাল ওল পাঠিয়ে দিন। এবং তার বাড়ীতে জামাই-মেয়ে এসেছে, তাদের জন্যে একটা বড় মাছ এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন, খুব ভাল মিহি-পাতির মাদুরের কথা।

সেই ব্যবস্থা আগে করলেন। চিঠির উপর হুকুম লিখে পাঠিয়েছিলেন ম্যানেজারের কাছে। ওবেলার মধ্যে লোক যেন জিনিসপত্র নিয়ে তমলুকে পৌঁছয়। এই সব জিনিসের সঙ্গে আরও কিছু জিনিস, বাগানের অকালের আম, মর্তমান কলা, কিছু ভাল ঘি সের পাঁচেক যেন পাঠানো হয়।

তারপর কয়েকটা নালিশ এসেছে প্রজাদের। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার নালিশ। বিচার মহলের গোমস্তা করেছে, কিন্তু তা ঠিক মনঃপূত হয় নি, আপীল করেছে খোদ হুজুরের কাছে। সে সব দরখাস্তের উপর তারিখ দিয়ে গোমস্তাকে এবং প্রতিপক্ষকে হাজির হবার জন্য হুকুমনামা পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তারপর ডাকঘরের ডাক দেখতে বসলেন; সাপ্তাহিক কাগজ এসেছে বাংলা-ইংরেজী; বঙ্গবাসী, হিতবাদী, অমৃতবাজার, ইংলিশম্যান—সে সব ঠেলে রেখে সর্বাগ্রে খুললেন একখানা

সরকারী খাম, আসছে কলকাতা থেকে। তিনি নতুন ভাইসরয়কে সেলাম জানাবার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিলেন, তার জবাব।

জবাব এসেছে, দরখাস্ত হিজ একসেলেন্সি পেয়েছেন, পরে সুবিধামত সময় ও সুযোগ অবশ্যই দেওয়া হবে। রায়বাহাদুরের নাম ভাইসরয় দপ্তরে অপরিচিত নয়।

শ্বশুর চিঠি দিয়েছেন, তাও উৎসাহজনক। তিনি কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে তদ্বির করছেন। নূতন লাটসাহেব মার্কুইস অব রিপন। লিখেছেন—হঠাৎ খানিকটা অসুবিধা ঘটিয়া গেল, নতুবা নূতন লাট লর্ড রিপন উদার ব্যক্তি। তিনি নিশ্চয় সুবিধা দিতেন। সম্প্রতি আফগানিস্তান লইয়া রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজের যে কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে ইংরেজই জয়ী হইয়াছিল, হঠাৎ সেখানে আবার বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তুমি নিশ্চয়ই কাগজে দেখিয়াছ যে, কাবুলের বৃটিশ এজেন্টকে একদল বিদ্রোহী আফগান সৈন্য হত্যা করিয়াছে। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য লর্ড রবার্টস কাবুল অভিযান করিয়াছেন এবং কাবুল দখল করিয়াছেন। বর্তমানে কাবুলের আমীর শেখ আলিকে অপসারণ করিয়া তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমনকে আমীরের পদে অভিষিক্ত করা হইতেছে। এখন এখানে দারুণ ব্যস্ততা। সুতরাং অন্যরূপ ভাবিবে না। এসব মিটিলেই তোমার ইন্টারভ্যুর সুযোগ মিলিবে। এবং আমি যতটা আঁচ পাইয়াছি, তাহাতে তোমাকে আরও বড় সম্মানে সম্মানিত করিবার কল্পনা আছে। তখনকার ১৮৬৪ সালের Cyclone-এর পর তুমি যে সদাব্রত খুলিয়া লোককে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়াছ, সেবা করিয়াছ, তাহার সরকারী রিপোর্ট দেখিলাম, তোমার ফাইলের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছে।

"On the whole the death by sickness are estimated to have been equal to those caused by storm and flood making a total of atleast 65,000; exclusive of the tracts not reported upon of all individuals specially amongst the zaminders who live like princes and lords by exacting money from these poor people. Roy Bahadur Ratneswar Roy is the first and foremost man to be named who did more than his best to serve these poor people. He gave them shelter and food, also served with medical help from his charitable dispensary.

সুলতা, চিঠিপত্র সবই তখন ইংরিজীতে। দেবেশ্বরও ইংরিজী ছাড়া লিখতেন না।

যুগটাই ইংরেজের। কিন্তু সে কথা থাক। সেদিন ওই পত্রখানার কল্যাণে লাট ভুবনপুরের প্রজাদের মঙ্গল হয়েছিল। তাদের বৃদ্ধির বোঝার কিছু উপশম হয়েছিল। টাকায় এক আনা বৃদ্ধি মাফ হয়ে তিন আনা হয়েছিল।

প্রজারা সানন্দে মেনে নিয়েছিল। কারণ এ কথা সকল লোকে জানে যে, আইনে যা প্রাপ্য হয় তা রায়বাহাদুর মাফ দেন না। এক্ষেত্রে চার আনা বৃদ্ধি তিনি নিশ্চয় পেতেন। কারণ ধান-চালের দর ১৮৭০ সালের পর থেকে এই আশী সাল পর্যন্ত টাকায় দু-তিন আনা বেড়ে গেছে। এবং রায়বাহাদুর যে বিরাট বাঁধ দিয়েছেন বন্যা রোধের জন্য, তাতে ফসলের

উৎপাদন নিশ্চয় বাড়বে।

রায়বাহাদুর হুকুম দিয়েই উঠে গিয়েছিলেন নিজের আপিসঘরে। এ ঘরটা সেই ঘর সুলতা, যেটা থেকে সিন্দুক খুলে পুলিসের দল লাফ মেরে পালিয়ে এসেছিল কাঁকড়া বিছের ভয়ে এবং যে সিন্দুক থেকে পেয়েছিলাম পত্রের দপ্তর, এটা সেই ছোট ঘরখানা। এবং সেই চেয়ার, সেই টেবিল।

সেখানে বসে তিনি চিঠির জবাব লিখতে বসেছিলেন শ্বশুরকে। হঠাৎ কি মনে হয়েছিল, তাঁর খাস চাকরকে ডেকে বলেছিলেন—যা চিঠিখানা বড়বাবুকে দেখিয়ে নিয়ে আয়। বলবি, কর্তাবাবু পড়ে দেখতে বললেন। ইচ্ছে কি ছিল অনুমান করতে পারি, সম্ভবত উদ্ধত পুত্রকে তাঁর কীর্তিকলাপের এ দিকটা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। চাকর ফিরে এল দেবেশ্বরের চিঠি নিয়ে।

দেবেশ্বর তখন প্রায় উন্মাদ। মদ খেয়েছেন। বিলিতী মদ তাঁর বাক্সে লুকানো ছিল, বের করে খেয়েছেন এবং যে কথা বাপের সামনে লিখে দিতে পারেননি, সেই কথা লিখে ওই চাকর মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—এইটে দিস বাবাকে। যখন একলা থাকবেন তখন। দস্তুরমত খামে বন্ধ করে পাঠিয়েছেন। সবিস্ময়ে চিঠিখানা খুলে রত্নেশ্বর রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আবার।

ছেলে লিখেছে—"আপনি ভাবিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি এসব কথা অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি। আজও আবার ভাবিলাম। আপনার মতামতের সহিত আমার মতামত কোন প্রকারেই মিলিতেছে না। ইহার জন্য অর্থাৎ আমি স্বাধীন মত পোষণ করি বলিয়া আমি আপনার অবাধ্য নহি। ইহার সহিত বাধ্যতা-অবাধ্যতার কোন সম্পর্ক নাই। আপনি যাহা বিশ্বাস করেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আমি অবাধ্য নহি, আমি আমার স্বাধীন মতে চলিব। আপনি মদ্যপান করেন না, আমি মদ্যপান করি, তাহাতে দোষ দেখি না। এদেশে-ওদেশে বড় বড় লোকে মদ্যপান করিয়াছেন, করেন। আপনি করেন না; তাহাও ভাল। আপনি জীবনে মদ্যপান করেন নাই, তজ্জনিত যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা তাহাও বোধহয় আমার অন্তরে রহিয়াছে। আপনি বাল্যজীবনে আমাকে কঠোর সংযম শিক্ষা দিতে সম্ভবতঃ অত্যন্ত দুঃখ দিয়াছেন। শাসন করিয়াছেন। তাহাই আমাকে আপনার পথ ও মতকে আমার নিকট নিষ্ঠুর এবং দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। আমার লালসাকে উগ্র হইতে উগ্রতর করিয়াছে। আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, অনেক পড়াশুনা করিয়াছি, ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের দর্শন পড়িয়াছি। আপনি এক ভ্রান্ত অভিশম্পাতভীতি দ্বারা ভীত হইয়া নিজের জীবনকে পীড়িত করিয়াছেন, আমাদিগকে পীড়িত করিতেছেন। ইহা মিথ্যা, ইহা ভ্রান্তি, অলীক। পৃথিবীতে যাহারাই ভূমির স্বামীত্ব ভোগ করে, তাহারাই সেই ভূমির শ্রেষ্ঠ ফসল ও ফল ভোগ করে, তাহারাই সেই ভূমিশ্রেষ্ঠ রূপবতী নারীর অধিকার পাইয়া থাকে। রাজাদের, নবাব বাদশাহদের অন্দর ও হারেমভরা নারীকুল তাহার প্রমাণ। পৃথিবীর কোন সমাজ তাহা দমন করিতে পারে না। আমাদের দেশে আজ ইংরাজ এক বিবাহ করে এবং তাহারা শক্তিবলে এ অনাচার দমন করে বলিয়া কিছুটা দমিত হইয়াছে

মাত্র। কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভূম্যধিকারীর এই অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই বা হইবে না। আর ওই শাস্ত্রবাক্য "পৃথিবীতে একটি পুরুষের সহিত একটি নারী ব্যতীত অপর সকলের সম্পর্ক মাতৃ-সম্পর্ক বা কন্যা-সম্পর্ক"—ইহা ভুল। ইহা নিতান্তই কাপুরুষের কথা। সংস্কারাচ্ছন্নের কথা। সমাজের দিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনি দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন মাতৃসাধকদের। ইঁহাদের সম্পর্কে কটু কথা বলিতে চাহি না, এই দেশের প্রতি সম্মান রাখিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহারা শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং যতই দীর্ঘজীবন হউক তাঁহাদের শিশুত্ব কখনও ঘোচে না, শিশু হইয়াই তাঁহারা মরেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত স্তন্যলালসা মেটে না। তাঁহারা সব নারীকেই মা ভাবিয়া থাকেন ভাবিতে পারেন আমি তাহা পারি না, তাহা পারিব না। ইহা হাস্যকর। ইহাকে সত্যই যদি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করেন বা করিতে পারিতেন তবে নিজে বিবাহ না করিলেই পারিতেন। যদি করিলেন, তবে রায়বংশের শিশুদের শেষ সূতিকাগৃহে করিলেই মিটিয়া যাইত।

ওই ভাব আমার জন্য নহে। আমি পুরুষ। আমি জীবনে চলার পথে একক চলিতে পারিব না। বা একজনের সঙ্গে খুঁটে খুঁট বাঁধিয়া চলিতে পারিব না। আপনাদের শাস্ত্র পুরাতন, অচল। এ যুগের মানুষ তাহা মানিতে পারিবে না।

শৃঙ্খল দিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে চান রাখিতে পারেন, আমি শক্তি থাকিলে তাহা ছিন্ন করিব এবং সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, দেবেশ্বর যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। কীর্তিহাটের সেবার তাঁর সিংহের মত বাপের সঙ্গে লড়াই করে তাঁর দাবী আদায় করে নিয়ে তবে ছেড়েছিলেন। কিন্তু মুখে কথা হয় নি। সব হয়েছে চিঠিতে। তার মধ্যে কোনটা এক লাইনের চিঠি। শুধু লেখা—

Respected Sir—My answer to your letter—is no.

শেষ চিঠিখানাতে কয়েকটা লাইন আছে তা মারাত্মক। লাইন-কটা আমার মনে গাঁথা আছে। "আপনার উপলব্ধি আপনার নিজস্ব। তাহা আমার নিকট দুর্বোধ্য। তাহা বুঝিতে পারি না। একান্তভাবে অর্থহীন যদি শাস্ত্রবাক্য হয়, তবে সে শাস্ত্র ভীরুর শাস্ত্র। সে শাস্ত্র কুসংস্কারাচ্ছন্নের শাস্ত্র। পৃথিবীতে একমাত্র গর্ভধারিণী জননী এবং নিজের ঔরসজাত কন্যা ও সহোদরা এই তিনটি নারী ব্যতীত অপর সকল নারীর সহিত আমার বিচারে পুরুষের একটি মাত্র সম্পর্ক, নারী তাহার কাছে নারী ছাড়া আর কিছু নহে। আপনি অনেক সাধকদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; দক্ষিণেশ্বর গিয়া রামকৃষ্ণ নামক একজন সাধককে দেখিয়া আসিবার জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। ইহা আমাদের দেশের এই সকল সাধকদের নিকট এবং সাধারণ মনুষ্যগণের নিকট হয়তো পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি ইহাকে তৃতীয় নয়ন দ্বারা মহাসত্য বলিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি সম্মান রাখিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহারা শিশু হইয়াই জন্মান ও চিরজীবন শিশুত্ব ঘুচে না, এবং একলা সূতিকাগৃহে শিশুমৃত্যুর মতই মৃত্যুবরণ করেন। আজীবনের মধ্যে ইঁহাদের স্তন্যলালসা আর মেটে না। কিন্তু আমি তাহা ভাবি না। আমার ধারণা এবং এই প্রকৃতির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, আপনার

মাতামহের প্রতি দেবতার অভিশাপকে। তাহাও আমি মানি না। কারণ জন্মান্তর স্বর্গ নরক ইত্যাদি সবই আমার নিকট অলীক কল্পনা।"

* * *

সুরেশ্বর বললে—এর পর হার মেনেছিলেন রত্নেশ্বর। দেবেশ্বরকে কলকাতা ফিরে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাপ-বেটায় একটা আপোস হয়েছিল। রত্নেশ্বর দেবেশ্বরের ভিক্ষে-মা কৃষ্ণভামিনীর সম্পত্তির দুইয়ের তিন অংশের দাম হিসেবে পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা আর কলকাতার বাড়ী লিখে দিয়ে বলেছিলেন—আমি বিবেচনা করে দেখলাম, ওই সম্পত্তিটা ষোল আনা তোমারই প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে যখন আর হবার উপায় নেই এবং তিন ভাগের দু ভাগ তোমার ভাইরা পাবে…তখন তার দাম হিসেবে এটা তোমাকে দিচ্ছি। আমার ইচ্ছায় তুমি সাহেব কোম্পানীর চাকরি ছেড়েছ ; এই টাকায় তুমি এখনই ব্যবসা আরম্ভ কর।

আরও কথা হয়েছিল, দেবেশ্বর কথা দিয়েছিলেন—মদ্যপান তিনি সংযতভাবেই করবেন। অসংযতভাবে মদ্যপান স্বাস্থ্যহানি, পাপ না হোক অপরাধ। এবং—

বেদনার্ত হাসি হেসে সুরেশ্বর বললে—এবং নারীর কথাও হয়েছিল। রত্নেশ্বর তাতেও সঙ্কোচবোধ করেন নি। ইঙ্গিতে অনুরোধ করেছিলেন অবশ্য। বলেছিলেন—হ্যাঁ, ভূমি এবং সম্পদের যারা অধিকারী তার, সংসারে নারীর ক্ষেত্রে ভোগী। কুলপতি,সমাজপতিরা বহু-বিবাহ করে থাকেন। রাজারা বহুবিবাহের পরও রক্ষিতা রাখেন। আমাদের আশেপাশে তো দেখছি, রাজ-রাজড়াদের। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন রত্নেশ্বর রায়।

তারপর বলেছিলেন—তবু নিজের ইজ্জত, বংশের মর্যাদা, এসব বজায় রেখেই সব করা উচিত। মদ্যপান করতে হয় ঘরে বসে কর। বাইরে পথে বেরিয়ে মত্ততা কেন প্রকাশ করবে? শুধু তো মর্যাদা ইজ্জত নয়, নিজের নিরাপত্তা আছে, আরও অনেক কিছু আছে।

দেবেশ্বর রায় কোন উত্তর দেয় নি, স্তব্ধ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন—আমি এর উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেব।

রত্নেশ্বরই প্রথম প্রস্তাব লিখে পাঠিয়েছিলেন। বাড়ী ভাড়া করে রক্ষিতা রাখার কথা ছিল। বীরেশ্বর রায়ের শেষজীবনে যেমন সোফি বাঈ ছিল। রত্নেশ্বর লিখেছিলেন—"ভায়লেটের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ বা থাকে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিলে কোনদিন-না-কোনদিন এই গোয়ানপাড়ার গোয়ানরা রায়বাড়ীর দুর্নামের ধ্বজা হইয়া থাকিবে এবং ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে।"

দেবেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন—ভায়লেটের প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষণ নেই। সে মোহ তাঁর কেটে গেছে। "এবং এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আপনার সহিত করিবার মত মনের কাঠিন্য আমার আর নাই। আমি আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছি। আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি এমন কোন কর্ম করিব না, যাহাতে আপনাকে লজ্জিত হইতে হইবে।"

এর পর চিঠি এসেছিল, আবার তোমাকে উত্ত্যক্ত করিতেছি। আমার বধূমাতার অবস্থা কি হইবে?

উত্তর গিয়েছিল, "আমি ইতর নহি, তাহার কোন অসম্মান হইবে না।"

এর উত্তরেও প্রশ্ন এসেছিল, "সম্মান তোমার নিকট হইতে তাহার কাম্য নয়। এবং সে যতক্ষণ নিজে অসম্মানের মত কর্ম না করে, ততক্ষণ কাহার সাধ্য তাহাকে অসম্মান করে। আমি অবহেলা, অবজ্ঞার কথা বলিয়াছি। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য তাহার সম্পর্কেই প্রশ্ন করিয়াছি।"

দেবেশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন, "বহুজন সমক্ষে শাস্ত্রীয় মন্ত্রপাঠ করিয়া শপথ করিয়া যাহা রক্ষা করিতে পারি নাই, দিব বলিয়া দিতে পারি নাই, আবার আপনার নিকট শপথ করিয়া তাহা দিব বলিয়া কি লাভ হইবে? তবে চেষ্টা আমি করিব। এবং আমি চেষ্টা করিয়া দিতে তাঁহাকে পারিব না, যদি তিনি তাঁহার পাওনা, আমি যেমন আপনার নিকট আদায় করিয়া লইলাম, তেমনি করিয়া আদায় করিয়া লইতে না পারেন।"

এর পর আর প্রশ্ন রত্নেশ্বর করেন নি। শুধু নিজের ডায়রীতে লিখেছিলেন—"ভাগ্য বড়, না পৌরুষ বড়, এ প্রশ্নের সেই একই উত্তর রইল চিরকাল। "ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।" রায়বংশের ভাগ্য! এই তার কর্মফলের দ্বারা নির্দিষ্ট প্রাপ্য। একটা তীরকে যেমন যে মুখে নিক্ষেপ কর, সে তার গতিতে সেই মুখেই ছোটে, তেমনি করিয়াই ছুটিয়াছে। আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল।

* * *

বিচিত্র চরিত্র দেবেশ্বর রায়; সুলতা, আজ তাঁকে বিচিত্র চরিত্র মনে হয় বটে, কিন্তু সেকালে তিনি ছিলেন 'আলট্রা মডার্ন'। অবিশ্বাসী, নাস্তিক—ইতিবাদের একটি সংজ্ঞাকে তিনি মনুষ্যত্ব বলে মানতেন এই পর্যন্ত। তর্কে-যুক্তিতে ক্ষুরধার, কল্পনাতে তিনি অসম্ভব অবাস্তবকে জীবনে গড়ে তুলতে চান। কলকাতায় এসে খনির জায়গা কিনে খনির মালিক হয়ে বসলেন। জমিদারী তিনি পছন্দ করেন না। বলেন—মনুষ্যত্ববিরোধী। তিনি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ভারতবর্ষের অন্যতম নির্মাণকর্তা হয়ে ধনকুবের হবেন, এই তাঁর বাসনা। এসব মানুষের মন মাটিতে বিচরণ করে না, আকাশে পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়; না, তার চেয়ে বলব, মাটির বুকের জলীয় বাষ্পের মত আকাশে মেঘ হয়ে ভেসে বেড়ায়, নিচে মাটিতে নামতে হলে হয় জলধারায় নামে,নয় বিদ্যুতের মত পৃথিবীর বুক চিরে নামে। জলধারায় নামার মধ্যেও ঝড় সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও মানুষের সর্বনাশ করে দিয়ে যায় কখনও দেখা দিয়েও মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, পৃথিবীর ফসল শুকিয়ে মরে; তবে অধিকাংশ সময়ই পৃথিবীতে ফসল বাঁচিয়ে সুফলা করে দিয়ে যায়। দেবেশ্বর ছিলেন, শুধু দেবেশ্বর কেন, সম্পদশালী সম্পত্তিশালী ঘরের ছেলেরা মানুষের এই মেঘের মত। হয় অতিবৃষ্টি, নয় অনাবৃষ্টিতে চিরকাল ধরে মানুষকে ক্লেশ দিচ্ছে। আবার ফসলের জলও দিচ্ছে। কিন্তু পুষ্কর মেঘের সঙ্গে তুলনা হয়, এমন বংশ বাংলাদেশে আমার চোখে একটি। সেটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশ।

জাতবংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং, ওই একটি বংশকেই বলা যায়। দেবেশ্বরকে কিম্বা রায়বাড়ীকে আমি পুষ্কর বংশ বলি না, বলব না। তবে দেবেশ্বর অভিজাত ছিলেন। 'সম্বর্ত' মেঘ বলতে পার।

খনির ব্যবসায়ে অসামান্ত সাফল্য এবং কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। রাণীগঞ্জ-গিরিডি ফিল্ড তখন সায়েব কোম্পানীর হাতে, দেবেশ্বর রায় বরাকর থেকে পশ্চিম এলাকার কয়লার জমি সংগ্রহ করে ওদিককার একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

এই দেখ, সুলতা! সুরেশ্বর একখানা ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে—এই ছবিখানা দেখ!

শাল গায়ে কোঁচানো কাপড়-পরা দেবেশ্বর রায়। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন তখন। ওই পোশাকেই আপিস করেন। ইংরেজ ম্যানেজার রেখেছেন। কাপড় পরে ইংরেজ চাকরকে হুকুম করেন। বিলিতী মদ খান। মেমসাহেব অনুগৃহীতা রেখেছেন।

ওদিকে প্যানেলে দেখ—প্রথমেই দেখ রামকৃষ্ণদেবের তিরোধান, ওই দেখ তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ। ওখানে লেখা আছে—উনি বলছেন "মনে রাখিও জন্ম হইতেই তুমি মহামায়ার কাছে উৎসর্গীকৃত।" ওই দেখ—বঙ্কিমচন্দ্র. হাতে আনন্দমঠ, ওখানে লেখা বন্দেমাতরম গান—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং—শস্যশ্যামলাং মাতরম। তারপর দেখ রবীন্দ্রনাথ। ওখানে লিখেছি—"ওরে তুই ওঠ আজি। আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ-জনে।" ওই দেখ, তারপর কংগ্রেসের অধিবেশন।

দেবেশ্বর রায়ের মুখ দেখ, একসঙ্গে সমস্ত কিছুর প্রতি বঙ্কিম এবং ব্যঙ্গ হাস্যভরা দৃষ্টি। সব-কিছুকে অবজ্ঞা করেছেন। শুধু নিজেকে ভেবেছেন সত্য, বাকি সব মিথ্যা। বাপের সঙ্গে, ভাইদের সঙ্গে এমন কি নিজের বড় ছেলের সঙ্গেও মেলে নি তাঁর। এরই মধ্যে তিনি একলা চলেছেন—তিনি। বুকের ভিতর তাঁর রাক্ষসী ক্ষুধা।

এ-ক্ষুধা রায়বংশের তিন ছেলের মধ্যেই ছিল কিন্তু দেবেশ্বর রায়ের ক্ষুধার সঙ্গে কারুর ক্ষুধার তুলনা হয় না। নিত্যনূতনের ক্ষুধা। এবং এ-ক্ষুধার রুচি ছিল তাঁর ভায়লেটের স্বজাতীয়াদের মধ্যে। মিশ্র রক্ত। মিশ্র সৌন্দর্য।

তিনি স্বীকার করতেন—এ তাঁর ভায়লেটের ক্ষুধা। কিন্তু বিচিত্র কথা—জীবনে সেই গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর আর কোনদিন ভায়লেটকে স্মরণ করেন নি। মুখ দেখেন নি। কতদিন ভায়লেট এসে উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরে গেছে কিন্তু তিনি সেদিকে দৃষ্টি ফেরান নি। তার কারণ বলতেন—ওকে তো জীবনটাই দিতে চেয়েছিলাম। ওকে সঙ্গে নিয়ে মরতেই চেয়েছিলাম। ও পারলে না। আমি বাঁচতে চাই নি, এ্যাকসিডেন্টালি বেঁচেছি, ওর মুখ আর দেখে? তবে হ্যাঁ, নিত্যনূতন ফিরিঙ্গী মেয়েদের মধ্যে ওর ক্ষুধাই মেটাতে চাই তা মেটে না। আশ্চর্য লাগে। তবে এটা সেই অভিশাপ-টভিশাপও নয়, আমিও শ্যামাকান্ত নই। পুনর্জন্ম আমি মানি না। এ্যাণ্ড দিস ইজ দি ইটারন্যাল হাঙ্গার অফ ম্যান ফর উয়োম্যান। ম্যান ইজ পলিগেমাস বাই নেচার। বহু ভোগ বা সব ভোগ করব এই তার চিরন্তন বাসনা। আমার মধ্যে এটা খুব প্রবল। তার কারণ আমি জমিদারের ছেলে আমার শরীরে ফিউড্যাল রক্ত এবং হাতে প্রচুর অর্থ আছে এবং আমি একজন জেদী, শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও দুঃসাহসী ব্যক্তি। এবং আমি মিথ্যাবাদী নই, সেইহেতু ইস্কাপনকে আমি ইস্কাপনই বলি। ধর্মের ধাঁধা—নীতি এবং ন্যায়শাস্ত্রের আনরিয়াল রোমান্টিক বুলিটুলি আমি পছন্দ করি না।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে কিন্তু লিখে গেছেন—এ-পাপ দেবেশ্বরের ইচ্ছাকৃত নহে। ইহা তাহার প্রাক্তন। হয়তো সে-ই পূর্বজন্মে ভ্রষ্টযোগী ছিলেন। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইতে আসিয়াছেন, ভোগ করিতে আসিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছেন। তাহা না হইলে ভায়লেটের প্রতি যত আকর্ষণ তত ঘৃণা কেন হইবে? ভায়লেট যে অঞ্জনার কন্যা, সে কথা অপরে না জানিলেও, আমি তো এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হইতে পারি না।"

এরই মধ্যে নিঃশব্দে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে যেতেন আমার পিতামহী উমারাণী দেবী। সহশক্তির জীবন্ত মূর্তির মত।

রত্নেশ্বর রায় তাঁর এই পুত্রটিকে স্বেচ্ছামত বিচরণের অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, দেবেশ্বর তা কেড়ে আদায় করে নিয়েছিলেন বাপের কাছ থেকে, রত্নেশ্বর তা তাঁকে দিয়েও ছিলেন। ভাবতেন হস্তক্ষেপ করবেন না তিনি। কিন্তু এই পুত্রবধূটির কথা স্মরণ করে হস্তক্ষেপ না করে পারেন নি। এবং এই নিয়ে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছেলের সঙ্গে লড়াই করেছেন।

শুধু পুত্রবধূর জন্য বললে অন্যায় হবে। রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন দেবেশ্বর রায়। তার পরিচয় আছে পিতাপুত্রের পত্রগুলির মধ্যে। আর কিছু আছে রত্নেশর রায়ের ডায়রীর মধ্যে। এগুলি সবই পেয়েছি আমি। পত্রগুলির মধ্যে বৈষয়িক কর্ম নিয়ে বাদানুবাদ, ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসা এবং কুশল আদানপ্রদানই বেশী, কিন্তু যে একটি সরল আন্তরিকতা নিরাবরণ সত্য ফুটে উঠেছে, সেটি কি করে সম্ভবপর হল, তা ঠিক ধারণা করতে পারিনে আমি।

রত্নেশ্বর রায়ের শরীর ভাঙল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই। বাপ ছেলেকে লিখলেন—

"এইবার তুমি আসিয়া বিষয়ের ভার গ্রহণ কর। এই দেহে এই ভার বহন করিতে হইলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে হইবে আমাকে। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

দেবেশ্বর লিখলেন—"আপনার হাতের হাল গ্রহণ করার মত যোগ্যতা আমার নাই। তদুপরি আমি জমিদারী কর্মটিকেই ঠিক পছন্দ করি না। গরীবের উপর পীড়নই তো জমিদারী চালানো নয়—এই সকল গ্রাম্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে অহরহ সাহচর্য করিয়া অনেক নীচে নামিতে হয়।"

আজ একখানা পত্রে লিখেছেন—"আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার ব্যক্তি জীবনের আদর্শ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বাস্থ্য আপনার যাহা দেখিলাম, তাহাতে আপনি আমা অপেক্ষা সমর্থ আছেন। আমার অমিতাচার আছে, আপনার তাহা নাই। আপনি এইসব গ্রাম্য ব্যক্তিদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের নিকট খাজনা লইয়া তাহাদের শাসন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, তাহার সঙ্গে এই সকল মনুষ্যদের জন্য একটি কল্যাণকর কর্মকল্পনা লইয়া কর্ম করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াও ইহাদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাহা আমি পারিব না।"

বাপ এর উত্তরে লিখলেন—"আমার মনে হইতেছে যে, তুমি তোমার আসল মত আমার নিকট গোপন করিতেছ। আমি শয্যাশায়ী না হইলেও, আমার এই ক্লান্ত অবস্থায় আমাকে

সাহায্য করা কি তোমার কর্তব্য নয়?"

উত্তরে দেবেশ্বর লিখেছিলেন—"সংসারে কর্তব্যের আর শেষ নাই। সব মান্য করিয়া চলিতে পারে এমত মানুষ আর কয়জন আছে। আমার তো কর্তব্যচ্যুতির শেষ নাই। আমি মদ্যপানে আসক্ত, আরও নানাবিধ দোষ আছে। তাহা ব্যতীত পিতাকে মান্য করিয়া চলা যেখানে কর্তব্য, সেখানে আপনার ও আমার মধ্যে মতান্তর বৃদ্ধি পায়—তাহাকে কি কোনমতে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে? আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, ভয়ও করি। তাহা আন্তরিক। কিন্তু আপনার মতের সহিত আমার মতের পার্থক্যের কথা আপনি জানেন। আপনাকে সাহায্য করিতে গিয়া আপনাকে কষ্ট করা বা আপনার সহিত বিরোধ করিতে আমি চাহি না। তাহা ছাড়াও কথা আছে। শিবেশ্বর আজ উপযুক্ত হইয়াছে, জমিদারী পরিচালনার ব্যাপারে তাহার নেশা আছে, আসক্তি আছে। সে আপনার অধীনে কার্য করিতেছে। তদুপরি সে আপনার পন্থাকেই অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। ধর্মবিশ্বাসী, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে, আমার বিবেচনায় কীর্তিহাটের দেবোত্তর এবং দেবকীর্তি পরিচালনার সেই যোগ্য ব্যক্তি। তাহাকে ঠেলিয়া আমাকে ভার দিলে সে ক্ষুব্ধ হইবে, তাহার ফল ভাল হইবে না। রামেশ্বর বি-এ পাস করিয়া ল লেকচার কমপ্লিট করিয়া এমনি রহিয়াছে এখানে। তাহাকে আপনি মামলা সেরেস্তা এবং আপনার পারসোনাল এস্টেটের ভার দিতে পারেন। আমি এখানে নানান কর্মে জড়িত। সভা-সমিতি এবং কয়েকটা এ্যাসোসিয়েশন গঠন করিয়াছি। এবং বহু যত্নে ও পরিশ্রমে যে খনি-ব্যবসায় আমি গঠন করিয়াছি, বাহির দিক হইতে তাহার সমারোহ এবং প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট মনে হইলেও, সেটা ঠিক নহে। তাহার ভিতরে অনেক জট বাঁধিয়াছে। কয়েকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এমত অবস্থায় এসব ছাড়িয়া আমার যাওয়ার অর্থ তাহার ধ্বংসসাধন করা।

"পরিশেষে একটা সংবাদ আপনাকে আমার জানানো উচিত। এখানে সেক্রেটারিয়েটে আমার পরিচিত বন্ধুজন আছেন। কয়েকজন ইংরাজও আছেন। আমারও যাতায়াত আছে। আমি খবর পাইয়াছি যে, আপনাকে রাজা টাইটেল দিবার কথা মধ্যে মধ্যে উঠিয়া থাকে। এখন ঘন ঘন উঠিতেছে। আর একটা বড় দান হইলেই ওটা নিশ্চিত হইবে বলিয়া মনে করি।"

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় এবার হার মেনে চিঠি লিখেছিলেন সুলতা। এমনভাবে বীরেশ্বর রায়ও হার মানেন নি তাঁর কাছে। তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখে গেছেন—"আমার পিতা আমার কাছে হার মানেন নাই. আমার মাতৃদেবীর নিকট হার মানিয়াছিলেন। আমিই পুত্রের নিকট পরাজয় মানিলাম। আমার সকল দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

দেবেশ্বর রায়ের চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন—"তোমার পত্র পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। এরূপ পত্রোত্তর আমি প্রত্যাশা করি নাই। তবে ইহাই হয়তো আমার প্রাপ্য, কারণ আমি সমস্ত জীবন ধরিয়া সকলকেই বলপূর্বক নত করিয়াছি, কাহারও নিকট নত হই নাই। এমন কি নিজের পিতৃদেবের নিকটও না। তুমি রাজা খেতাবের খবর দিয়াছ, সে সংবাদ আমার নিকট অগোচরে নাই; কিন্তু রাজা খেতাবের সাধ আমার নাই। জীবনে

যত দান করিয়াছি, স্মরণ করিয়া দেখিতেছি পুণ্যের জন্য কোন দান করি নাই, খ্যাতির জন্য সরকারী খেতাবের জন্য করিয়াছি। স্কুল ডাক্তারখানা প্রভৃতি কীর্তিও তাহারই জন্য। দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, দেবতার নামে দেবোত্তর এস্টেট গড়িবার জন্য; নিজের সংসারের মঙ্গল সাধন করিবেন তিনি সেই জন্য। যে অর্থব্যয় করিয়াছি দানখাতে কীর্তিখাতে তাহা নিজের তহবিল হইতে দিই নাই, প্রজাদের পীড়ন করিয়া আদায় করিয়া দিয়াছি। নিজে কিছু দিই নাই। আজ আমি শঙ্কিত। কেমন একটা শঙ্কা আমাকে যেন মাঝে মাঝে বিহ্বল করিয়া তোলে। তুমি নিজে ব্যবসায় করিয়াছ, উপার্জন করিতেছ, কিন্তু তোমার মধ্যে দেখিতেছি রায়বংশের অভিশাপ যাহা তুমি বিশ্বাস কর না তাহা যেন ফণা তুলিয়া আমাকেই দংশন করিতে চাহিতেছে। তুমি ধর্ম মান না, ঈশ্বর মান না, বলিতে গেলে এদেশের কিছুই মান্য কর না, এমন কি রাজশক্তিকেও না। আমি শুনিয়াছি, হোমরুল প্রভৃতি আন্দোলনের সঙ্গে তুমি যুক্ত। ইহা গর্বের কথাও বটে আবার অনেকটা শঙ্কার কথাও বটে। এবং ইহা আমাদের ঠিক ভারতীয় ধর্ম নহে। আমাদের শাস্ত্রমতে কলিতে যখন ম্লেচ্ছরাই একছত্রাধিপতি হইবে। এবং সম্রাট ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাহা ব্যতীত এমন শান্তি-শৃঙ্খলা তাহারা স্থাপন করিয়াছে যাহা স্বপ্নাতীত। আজ আমরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া নিরাপদ নিঃশঙ্ক। অথচ তুমি পুরাপুরি ইংরাজীভাবাপন্ন। তবুও তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তুমি শক্তিমান তুমি সাহসী তুমি সত্যবাদী। তুমি ছাড়া অপর কাহারও ভরসা আমি করিতে পারিতেছি না। কিছুদিন শিবেশ্বরের উপর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সে মদ্যপান করে না, সে ত্রিসন্ধ্যা করে, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে। শাস্ত্রাদি পাঠ করে। সে স্ত্রীতে অনুরক্ত। কিন্তু যত দিন যাইতেছে তত আমার চক্ষু খুলিতেছে; সে মদ্যপান করে না, কিন্তু শুনিতেছি সে গঞ্জিকা সেবন করে অতি গোপনে। সে ত্রিসন্ধ্যা করে দেবদ্বিজে ভক্তি করে, শাস্ত্রপাঠ করে কিন্তু শৃগালের মত ভীরু এবং লোভী; ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে বিছানায় বসিয়া সেরখানেক সন্দেশ রসগোল্লা ভক্ষণ করে, কারণ সকাল হইতে কিছু না খাইয়া স্নানাদি সারিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া চা-পান করিবে। দেবতার ব্রাহ্মণের জমি বা বিষয় বেনামে মহাজনী করিয়া বন্ধক লয়। শাস্ত্রপাঠ করে কিন্তু স্ত্রীলোক অপেক্ষাও শুচিবাইগ্রস্ত। স্ত্রীতে অনুরক্ত কিন্তু তাহা অপেক্ষাও চরিত্রহীন হইলেও ভাল হইত। কারণ সে স্ত্রী ছাড়িয়া একটা দিনও থাকিতে পারে না। ইহারই মধ্যে তাহার দুই পুত্র এক কন্যা। এখানে একটা থিয়েটার পার্টি করিয়াছে। কতকগুলা অপোগণ্ড ইতর শ্রেণীর বালক লইয়া নাচ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে প্রমত্ত রহিয়াছে। কখনও সত্য কথা বলে না, বাক্য দিয়া বাক্য রক্ষা করে না। মামলায় মকদ্দমায় প্রবল আসক্তি। কীর্তিহাট এস্টেটের মামলা সেরেস্তা আমিই বড় করিয়া পত্তন করিয়াছি, কিন্তু বাজীকর, স্বত্ব, করবৃদ্ধি প্রভৃতি জমিদারী-সংক্রান্ত মকদ্দমা ছাড়া মকদ্দমা ছিল না। শিবেশ্বর তাহার সঙ্গে মহাজনী যোগ করিয়াছে। লোকের নিকট হইতে সে হ্যাণ্ডনোট তমসুদ কিনিয়া লইয়া খাতকের নামে নালিশ করে।

তোমার পতনের মধ্যে একটা বড় কিছু পতনের মর্যাদা আছে গুরুত্ব আছে। তাহার অধঃপতন ক্ষুদ্রতায় ঘৃণ্য। সম্প্রতি একজন বাদ্যকরের কাছে দেবোত্তরের জমি ক্রয় করিয়াছে

স্ত্রীর নামে। শশকের মত ভীরু। কীটপতঙ্গ ব্যাধি সমস্ত কিছুর ভয়ে অস্থির। ডাকাতের ভয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় না। রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নী দেবীর আমলের মত দারোয়ানগুলিকে সমস্ত রাত্রি হল্লা করিতে হয়।

রামেশ্বরকেও জান। সে তোমাকে অনুকরণ করিতে চায় কিন্তু তাহার ধীশক্তি নাই এবং সাহসও নাই। দুইবার বি-এ ফেল করিয়া বিলাত যাইতে চায়। ব্যারিস্টার হইয়া আসিবে। সেও মদ্যপান করে, সেও চরিত্রভ্রষ্ট। সর্বাপেক্ষা দুঃখ তাহার যত কুদৃষ্টি রায়বাড়ীতে যাহারা আশ্রিত তাহাদের যুবতী স্ত্রী-কন্যাদের উপর।

আমি অসহায়ের মত দেখিতেছি। দেবশক্তির রোষ অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ কোন এক ব্যক্তি পাইলেও পাইতে পারে কিন্তু বংশের উপর অভিশাপ পতিত হইলে আর রক্ষা নাই। কোন এক পুরুষ পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিলেও বংশ পরিত্রাণ পায় না। অথবা ইহাই কালের অভিপ্রায়। কলি শেষে এমত হইবারই কথা। মানুষের সাত্ত্বিক ভাব বিলুপ্ত হইয়াছে রাজসিক ভাবও বিগত হইতেছে, এক্ষণে তামসিক ভাবই সমস্ত মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিতেছে। মনে হইতেছে, অচিরকালের মধ্যেই এ দেশের অবশিষ্ট অর্ধপাদ পুণ্য তাহাও শেষ হইয়া সবই বিলুপ্ত হইবে। তবুও যে কয়টা দিন বাঁচি তুমি ভার লইলে আমি বড় সুখী হইতাম"—

ছেলে উত্তর দিলেন—সংক্ষিপ্ত উত্তর। "আপনার সহিত চিরকালের মত বিচ্ছেদ হয় ইহা কাহারও কাম্য নয়। এই শঙ্কা আছে বলিয়াই অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেছি। তবে আপনি যে আশঙ্কা করিয়াছেন বা দেবরোষ দেবী অভিসম্পাত অপ্রাকৃত দৈব বলিয়া যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা নিতান্তই সাধারণ প্রাকৃত জাগতিক ঘটনা। ইহা চিরকাল ঘটিতেছে ও ঘটিবে। শাস্ত্রীয় ধারণার ও মন্ত্র-তন্ত্রের ফেরের মধ্যে পড়িয়াই শ্যামাকান্তের ঐরূপ মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছিল নতুবা ইহা তো পৃথিবীতে জীবজগতে অতি সাধারণ ব্যাপার; মনুষ্যকুলের মধ্যেও এমন ঘটনা তো অহরহই ঘটিতেছে। বিশেষ করিয়া বিত্তশালী সম্পদশালী যাহারা তাহাদের মধ্যে এবং যাহারা দেহের শক্তিতে একেবারে দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ, যাহাদের গুণ্ডা বলি, তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা খুবই বুদ্ধিমান, চতুর, বিদ্যাবুদ্ধির শক্তিতে বলীয়ান বলিয়া দেশ ও সমাজের চলিত ধ্যানধারণা হইতে সৃষ্ট নিয়মাদির অলীক গণ্ডী পার হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এমন ঘটনা অনেক ঘটিতেছে। তাঁহারা শ্যামাকান্তের মত পাগল হইয়া যান না। আপনি পিতা আপনার সহিত এসব লইয়া তর্ক আমার সাজে না। অন্ততঃ আমাদের সমাজে সাজে না। তবে আপনি কথাটা লইয়া পত্রে বহুং আক্ষেপ করিয়াছেন এবং আপনি এইরূপ ধারণার বদ্ধ সংস্কারে আজীবন ক্লেশ পাইতেছেন বলিয়াই কথাগুলি লিখিলাম। আমার জীবনে আপনার সহিত যে সংঘর্ষ এবং গরমিল তাহাও এই মতভেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াই লিখিতে সাহস পাইলাম। পরিশেষে নিবেদন—সম্পত্তিরক্ষার জন্য আমাকে কীর্তিহাটে লইয়া গিয়া বিব্রত করিবেন না বা নিজেও বিব্রত হইবেন না। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

—মধ্যে মধ্যে সংসারে ঘটনা এমনভাবে ঘটে সুলতা; সুরেশ্বর বললে,—যে দেখেশুনে মনে হয় মানুষ যখন কোন সংকল্প করে তাকে ভাঙবার জন্যেই ঘটনাটা কেউ ঘটালে।

আমাদের কীর্তিহাটের দয়াল দাদু আজ বেঁচে নেই, ১৩৩৭ সালেও ছিলেন, ১৩৪২ সালের সাইক্লোনের পরই মারা গিছলেন। তিনি বলতেন—ভায়া ভগবানের মত রসিকও কেউ নেই আবার দর্পহারীও কেউ নেই। জান মধ্যে মধ্যে মানুষ যখন আস্ফালন করে তখন তিনি কান পেতে শোনেন আড়ালে দাঁড়িয়ে আর মুচকে মুচকে হাসেন। তারপরই তার ঘটনাচক্রের যে বিরাট কলটি সেই কলের একটি ছোট বোতাম-টোতাম টিপে দেন আর এমন ঘটনা ঘটে যে মানুষের আস্ফালন সংকল্প সব কাচের বাসনের মত আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমরে হয়ে যায়।

—এখানেও যেন দর্পহারী ভগবান কথাটা কান পেতে শুনে হেসেছিলেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এল জানবাজারে—"আগামীকাল স্টেশনে গাড়ী রাখ।" রায়বাহাদুর।

সেকালে রায়বাহাদুরেরা খেতাবটাকে বাড়ীতেও ব্যবহার করতেন। গিন্নীরা সাধারণতঃ বলেন, বলতেন—উনি ওঁর ; না হয় কর্তা-কর্তার, নয় তো বাবু-বাবুর ; রায়বাহাদুর হলে তাঁরাও চাকরবাকর থেকে সবার কাছেই বলেন—রায়বাহাদুর, রায়বাহাদুরের। রায়বাহাদুরের টেলিগ্রামে রায়বাহাদুর লিখে ঠিকানার ঘরে নিজের নামটা লিখতেন।

চমকে উঠেছিলেন দেবেশ্বর রায়। এ কোন সময়ে আসছেন তিনি ?—আসবার কারণ তাঁর অনেক ছিল—তখন কলকাতায় নতুন বিডন স্ট্রীটের উত্তরে গোয়াবাগানের কাছ বরাবর এক বিঘে জমির উপর বাড়ী—হুগলকুড়িয়া লেন ; পাশে একটা তেলকল, এ হচ্ছে শিবেশ্বর এবং রামেশ্বরের জন্য। তত্ত্ববিধান যা করবার শিবেশ্বর এসে গিয়েই করতেন। রামেশ্বর থাকতেনই জানবাজারে, দাদার ভক্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর উপর খুব ভরসা শিবেশ্বর করতেন না। কিন্তু দেবেশ্বরের পক্ষে সময়টা খুব ভাল ছিল না, অন্তত বাপের সঙ্গে দেখা করবার মত শান্ত এবং স্থির ছিল না মন। তখন কিছুদিন ধরে ব্যবসা বাড়াবার জন্যে নতুন নতুন পিটখাদ কেটে চলেছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটা ভুয়ো হয়ে গেল। তিনি হুণ্ডী কেটে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সময় বুঝে হুণ্ডীওয়ালারা চেপে ধরেছে। তিনি বিব্রত। টাকা চাই। সে অনেক টাকা, সে আমলে পাঁচ লাখের কাছাকাছি। তারই জন্য তিনি ছুটোছুটি করছেন কিন্তু বাপকে জানান নি ; এ ধরনের বিপদে বাপকে কখনও জানাবেন না এই প্রতিজ্ঞা করেই তিনি নেমেছিলেন স্বাধীন ব্যবসায়।

দেবেশ্বর রায় শুধু জেদী ছিলেন না, তাঁর অনুমান শক্তি ছিল বুদ্ধির সঙ্গে প্রখর, তার উপর ছিল একটা আভিজাত্যবোধ।

সেকালে তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৈতৃক ঋণশোধের একটি আশ্চর্য আভিজাত্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

দেবেশ্বর রায় সেইদিনই সাহেব কোম্পানীকে চারটে কলিয়ারী বেচে হুণ্ডী শোধের ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন ; বলতে গেলে ব্যবসা একরকম উঠিয়েই দিলেন ; কারণ চালু কলিয়ারী রইল না, থাকবার মধ্যে থাকল মানভূম জেলায় বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর, তাও বরাকর থেকে এদিকে ঝরিয়া ওদিকে কাতরাস পর্যন্ত ছড়ানো। তাতে কাজ করতেও বহু অর্থ প্রয়োজন। তা হোক তিনি খুশী হলেন। বাপ যেন তাঁকে এই বিব্রত অবস্থায় না দেখেন।

টাকা তাঁর স্ত্রীর ছিল। উমা দেবী বাপ-মায়ের এক কন্যা। মানুষ হয়েছিলেন দিদিমার কাছে। তাঁর সম্পত্তি টাকায় পরিণত ক'রে কোম্পানীর কাগজ করে দিয়েছিলেন দিদিমা, সে কাগজের পরিমাণ কম নয়—দেড় লাখ। সে কাগজ ছিল রত্নেশ্বর রায়ের কাছে। বউ দিয়েছিলেন রাখতে—বাবা এ আপনি রাখুন। আমি কোথায় রাখব।

রত্নেশ্বর রেখেছিলেন। যখন দেবেশ্বর কীর্তিহাট থেকে বাপের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জিতে ফিরে আসেন তখন তিনি তাঁর ভিক্ষে-মা কৃষ্ণভামিনীর সম্পত্তির তিন ভাগের দু ভাগ বাবদ দাম হিসেব ক'রে নিয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর নামের কোম্পানীর কাগজ তিনি নেন নি। তিনি চান নি রত্নেশ্বর দেন নি; এমন কি উল্লেখও করেন নি।

স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে কোথাও বাইরে একটা বিভেদ ছিল না কিন্তু অন্তরে অন্তরে একটা বিরাট পার্থক্যের দুই তীরে তাঁরা বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন নাস্তিক, স্ত্রী ছিলেন ঘোরতর দেবতা-বিশ্বাসী। দেবেশ্বর বাস করতেন ভাবীকালে, স্ত্রী বাস করতেন ভূতকালে; বীরেশ্বর রায়ের স্ত্রী ভবানী দেবীর মত ছিল বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা! স্বামীকে ভয় করতেন তিনি। প্রমত্ত দেবেশ্বর বিছানায় শুতেন স্ত্রী পায়ের তলায় বসে হাত বুলিয়ে দিতেন, এইটুকু না হলে দেবেশ্বরের ঘুম আসতে দেরি হত, এটুকু বড় ভাল লাগত তাঁর, পায়ে স্ত্রীর আলতো হাতের স্পর্শ পাবা মাত্র তাঁর চোখ বুজে যেত, তারপরই হয়তো মিনিটখানেকের মধ্যে নাক ডাকতো তাঁর। তখন উমা দেবী জানালার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে বসে কাঁদতেন। কোন কোন দিন টের পেয়ে দেবেশ্বর প্রমত্ততার মধ্যেই পুরুষের স্বাভাবিক কামনায় আত্মনিবেদনকারীটিকে টেনে নিতেন আদর করতেন তারপর ঘুমিয়ে যেতেন। স্ত্রীও হয়তো ঘুমিয়ে যেতেন, কিছুক্ষণ পর পাশের খাটে ছেলের সাড়া পেয়ে উঠে যেতেন। সকালবেলা থেকে জীবন আর এক রকম। কায়দা আর কানুনের চাকায় চাকায় দাঁতে দাঁতে লেগে ঘুরে চলত। নিঃশব্দে সে ঘোরা, বিনা সংঘর্ষে সে ঘোরা, দিনের পর রাত্রি আসার মত সে ঘোরা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, তখনও বাংলাদেশে মেয়েদের জীবনে চলছে চরম দুর্ভাগ্য। পুরুষের ক্রীতদাসী, সমাজে বহু সুন্দর বাক্য বহু সম্মানের অভিনয়ের মধ্যে তার আসল স্বরূপ হল কেনাবেচার সামগ্রী। বাপের বুকের বোঝা শ্বশুরের ঘরে নামে লক্ষ্মী হলেও কাজে স্বামীর অনুগ্রহনির্ভরা।

ছেলে বিয়ে করতে যেতো মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেন—কোথায় যাচ্ছ বাবা?

ছেলেকে জবাব দিতে হত—তোমার দাসী আনতে মা।

দেবেশ্বর নিজে এদের দলের ছিলেন না, অন্য মত পোষণ করতেন, কিন্তু কালের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। স্ত্রী সেকেলে মনোভাবের বলে তাকে ঘরের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, নিজের মনের অধিকার দেন নি। সেই কারণেই স্ত্রীর টাকা তিনি বাপের কাছ থেকে চেয়ে নেন নি। স্ত্রী যা হয় করবেন অথবা তাঁর অন্তে উত্তরাধিকারীরা যা হয় করবেন, তিনি ছোঁবেন না নেবেন না এই ছিল তাঁর সংকল্প। স্ত্রী নিজে চেয়ে নিয়ে দিলে তিনি হয়তো নিতেন কিন্তু স্ত্রী তো তা দেন নি।

রত্নেশ্বর রায় সেই কোম্পানীর কাগজ নিয়েই দিতে এসেছিলেন এবং নিজে থেকে বাকী টাকা দিয়ে সব মেটানোই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সে অনুমান করে নিতে দেবেশ্বরের দেরী হয় নি। তাই তিনি একদিনেই কলিয়ারী বেচে দিয়ে প্রশান্তমুখে বাপকে আনতে গিয়েছিলেন হাওড়া স্টেশন।

হাওড়ায় ছেলেকে দেখে রত্নেশ্বর রায়ও ধাঁধাতে পড়েছিলেন। এমন প্রশান্ত মুখ তো তিনি কল্পনা করেন নি।

ছেলে প্রণাম করে জিনিসপত্র গাড়ীর ছাদে চাপিয়ে গাড়ির সামনের সিটে বসে বাপকে প্রশ্ন করেছিলেন—হঠাৎ এমনভাবে এলেন, খবর সব ভাল তো? চিঠি না দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন!

গাড়ীর ভিতর বসে অন্ধকারের মধ্যেই ছেলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছিলেন রত্নেশ্বর রায়। বললেন—হ্যাঁ ভাল।

ছেলে আর প্রশ্ন করলেন না। চুপ করে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—হুগোলকুড়িয়ার বাড়ি সেদিন আমি দেখতে গিছলাম, প্ল্যান আমার ভাল লাগল না। ঘরগুলো—

—ও সব শিবেশ্বর রামেশ্বরের পছন্দ, ওদের বাড়ী ওরা যেমন চায় তেমনি হচ্ছে।

—বাড়ীটা ওখানে না করলেই হত। তেলকলটা কিনছেন তেলকলের জন্যে, ও জায়গাটা রেখে সরে বাড়ী করাই ভাল ছিল।

—থাক ওসব কথা। আমি ওজন্যে আসি নি। আমি হিসেব মেটাতে এসেছি। আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে দিন ফুরিয়ে আসছে। প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন, তারপর থেকে পিতামহ সোমেশ্বরের কাল থেকে সবাই অমোদের স্বল্পায়ু। পঞ্চাশ কেউ পার হয় না। তোমাকে এত ক'রে লিখলাম তুমি গেলে না। আমি এলাম তোমার যা বিশেষ কিছু আমার কাছে পাওনা আছে তাই দেবার জন্য।

—পাওনা? আপনার কাছে আমার বিশেষ পাওনা? হাসলেন দেবেশ্বর।

—হ্যাঁ। তোমার ভিক্ষে-মায়ের টাকা তুমি নিয়েছ। আমি দিয়েছি। কিন্তু বউমায়ের পিতৃধন কোম্পানীর কাগজ আমার কাছে গচ্ছিত ছিল, সেটা তুমি চাও নি। তা ছাড়া বউমায়ের দিদিমা বলেছিলেন—ওর বয়স বিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত ওর হাতে বা—।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—এমন কি তোমার হাতে দিতেও বারণ করেছিলেন।

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—কথাটা তোমাকে বলা হয় নি। এ বিয়ের সম্বন্ধ আমি করি নি; কাশীতে পিসেমশাই আর অন্নপূর্ণা এ সম্বন্ধ করেছিল। তখন তুমি গুলির ক্ষতের জন্যে বিছানায় শুয়ে। তোমার কথাটা তাঁর অগোচর ছিল না। সেইজন্যেই বউমার বিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাকে বা তোমাকে দিতে বারণ করেছিলেন।

দেবেশ্বর সামনের সিটে স্থির হয়ে বসে শুনছিলেন। কোন উত্তর করেন নি।

বাড়ীতে এসে মুখ হাত ধুয়ে খাবার আসনে বসে রত্নেশ্বর পুত্রবধূকে ডেকে কোম্পানীর কাগজগুলি তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—তোমার পৈতৃক ধন মা। তোমার দিদিমা

তোমার বাপের সরিকানী সম্পত্তি বেচে টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাগজ করেছিলেন। বিয়ের সময় আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—উমার বিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত এ কাগজ আপনার হাতে রাখবেন। আমি তার থেকেও বেশী দিন রেখেছি। সুদে আসলে জমে দেড় লক্ষের উপর দাম এর এখন। নাও এখন। নাও তুমি। নিয়ে দেবেশ্বরকে দাও। আমি শুনেছি—দেবেশ্বর বিজনেসে লোকসান খেয়েছে। হুণ্ডির দেনায় বিব্রত হয়েছে। টাকা আমি দিতে পারতাম। কিন্তু সম্ভবতঃ দেবেশ্বর তা নেবে না। ভাইদের অজুহাত দেখাবে। সেটা নেহাৎ মিথ্যেও নয়। শিবেশ্বর এমনিতেই বলে আমি পক্ষপাত ক'রে থাকি। দেবেশ্বর এই টাকা তুমি ব্যবসায়ে লাগাও। প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে এস্টেট থেকে টাকা ধার হিসেবেও দিতে পারি।

চমকে ঠিক ওঠেন নি দেবেশ্বর, তিনি গোড়াতেই অনুমান করেছিলেন, তবুও কথাটা এইভাবে পাড়বেন এ অনুমান করেন নি। ভেবেছিলেন রত্নেশ্বর নিজের স্বভাব অনুযায়ী উপদেশের ছলে তাঁকে অনেক তিরস্কার ক'রে বলবেন—হুণ্ডির ডিটেলস দাও আমি সব মিটিয়ে দিয়ে তবে যাব।

বধূ কোম্পানীর কাগজগুলি হাতে তুলে না নিয়ে বললে—আপনার ছেলেকেই দিন।

—না মা, তুমি নিজে ওকে দাও, দিয়ে প্রণাম কর।

দেবেশ্বর এতক্ষণে বলেছিলেন—হুণ্ডীর ঝঞ্ঝাট সব মিটে গেছে। আজই আমি মিটিয়ে ফেলেছি।

—মিটিয়ে ফেলেছ? কি ক'রে মেটালে? আমি খবর পেয়েছিলাম—তুমি বিব্রত হয়ে পড়েছ। পাগলের মত ঘুরছ টাকার জন্যে। আমার শরীর খারাপ তবু আমি শুনে স্থির থাকতে পারি নি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—মিথ্যে শোনেন নি। দুটো দুটো বড় প্রজেক্ট একেবারে ফেল করে গেল—ডাইক বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এ্যাবণ্ডন করতে হয়েছে। এদিকে পাওনাদারেরা সময় বুঝে চেপে ধরবার চেষ্টা করলে। আমাদের স্বভাব। কিন্তু আমি তাতে দমি নি। ভার্জিন ল্যাণ্ড যা নিয়েছি তা রেখে চালু কলিয়ারি ক'টা বিক্রী করে দিচ্ছি বেঙ্গল কোলকে—চুক্তি হয়ে গেছে। দলিল হতে বাকী আছে। হুণ্ডীর দায় এখন বেঙ্গল কোলের।

—চালু কলিয়ারিগুলো সব বিক্রী করে দিলে, আমাকে জানালে না?

চুপ ক'রে থাকলেন দেবেশ্বর।

—আমি কি তোমার শত্রু দেবেশ্বর?

দেবেশ্বর তবু নীরব হয়ে রইলেন।

—দেবেশ্বর!

এবার দেবেশ্বর বললেন—না। আপনি জন্মদাতা পিতা। কিন্তু এ ব্যবসা আমি আপনার অমতে করেছি। এতে ফেল পড়ে দেনার জন্তে আপনার কাছে গেলে আপনার ছেলের মত কাজ করা হ'ত না।

—বউমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে ?

ঘাড় নাড়লেন দেবেশ্বর। না।

সঙ্গে সঙ্গে বধূ উমা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটির উপর আছাড় খেয়ে।

এর পনর দিনের মধ্যে আবার টেলিগ্রাম এল কীর্তিহাট থেকে। রত্নেশ্বর রায় কীর্তিহাট ফিরে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জ্বর হয়েছে। রত্নেশ্বর রায় টেলিগ্রাম করেছেন—বউমা এবং ছেলেদের নিয়ে এখানে এস, আমি অসুস্থ। ঠিক তার পরের দিন আবার টেলিগ্রাম এল—ফাদারস ইলনেস সিরিয়াস ডিলিরিয়াস কাম ইমিডিয়েটলি—শিবেশ্বর।

এবার ফিরতে হয়েছিল দেবেশ্বরকে। স্ত্রী দুই পুত্র নিয়ে দেবেশ্বর কীর্তিহাটে ফিরেছিলেন বহুকাল পর। অবশ্য দু'একদিনের বা চারদিনের জন্য কয়েকবার এসেছেন এ আসা সে আসা নয়; এবার এসেছিলেন যেন থাকতে হবে ব'লে। সঙ্গে পনের বছরের বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর এবং ছোট ছেলে যোগেশ্বর তখন তের বছরের। যোগেশ্বরের পর আর সন্তান হয় নি।

রুগ্ন বিকারগ্রস্ত বাপের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম নিজেকে হারালেন দেবেশ্বর। এবং হেরেও গেলেন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বকছেন—বাবা, বাবা, বাবা! না-না-না। মা কই মা?—মা?

—স্বর্ণলতা! সরস্বতী বউ! ছি—ছি! কোথা যে যাও! কেন অঞ্জনাকে বার বার আমার কাছে আসতে দাও। ছি—ছি।—ছি-ছি। তুমি কিছু বোঝ না;—না—না—না।

—দেবেশ্বর এল না? দেবেশ্বর? দেবেশ্বর!

টপ্‌ টপ্‌ করে চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করেছিল। এই সময় শিবেশ্বর এসে গম্ভীর মুখে তাঁর হাতে একখানা কাগজ দিয়ে বলেছিল—এখানা বাবা কাল লিখে ম্যানেজারের হাতে দিয়েছিলেন। উনি আমাকে দিয়েছেন। কাগজখানা তুমিই রাখ।

জ্বরে পড়ে অবধি রত্নেশ্বর রায় একটা কঠিন কিছুর আশঙ্কা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির প্রৌঢ় ডাক্তার তাঁকে গোড়া থেকেই দেখছিলেন, তাঁকেও তিনি তাঁর আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা চুলকে বলেছিলেন—কই, তেমন কিছু তো ঠিক মনে হচ্ছে না।

অল্প অল্প জ্বর, শরীর খারাপ; এই পর্যন্তই—তার বেশী কিছু না। রোজ কাছারী করছিলেন। পাঁচ দিনের দিন জ্বরটা একজ্বরীতে দাঁড়াল, ষষ্ঠ দিনের দিন তিনি সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে ডাক্তারকে এবং ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একসঙ্গে। ডাক্তারকে বলেছিলেন—কি বুঝছ?

—আজ্ঞে না, তেমন কিছু নয়, বোধহয় পেট পরিষ্কার নেই—

—তুমি ঠিক ধরতে পারছ না। মেদিনীপুর থেকে সিভিল সার্জেনকে কল দাও। একটু পর বলেছিলেন—না, বেটাদের মুখখানাই লাল আর মুখেই খুব বড়াই। মেদিনীপুরের গোলক ডাক্তারকে কল দাও! বুঝেছ?

ম্যানেজারকে বলেছিলেন—তুমি এই টেলিগ্রামটা পাঠাও কলকাতায়।

প্রথম টেলিগ্রাম নিজে খসড়া করে দিয়েছিলেন—বউমা এবং ছেলেদের নিয়ে অবিলম্বে

এস, আমি অসুস্থ—রত্নেশ্বর।

ম্যানেজার চলে যাচ্ছিলেন রত্নেশ্বর হঠাৎ তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—দাঁড়াও হে। শুনে যাও।

ব'লে একখানা নাম ছাপানো কাগজ টেনে নিয়ে তাতে কিছু লিখে ম্যানেজারের হাতে দিতে গিয়েও দেন নি। কাগজখানাকে সামনে রেখে তার একটা নকল ক'রে নিয়ে বলেছিলেন —"একখানা সদরের উকীলের কাছে পাঠিয়ে দাও। একখানা তোমার হাতে রইল। যদি আমার রোগ কঠিন হয় তা হ'লে এই নির্দেশমত কাজ করবে। বুঝেছ?"

কাগজখানায় লেখা ছিল—"অত্ত হইতে আমার জীবিতকালের শেষক্ষণ পর্যন্ত রায়বাড়ীর সমুদয় এস্টেট ইত্যাদি সমস্তই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান দেবেশ্বর রায়ের হুকুমমত এবং তাঁহার সহিসাবুদে চলিতে থাকিবে। ব্যাঙ্কের কার্যাদি বন্ধ থাকিবে। আদায়ী খাজনা ইত্যাদি ও সিন্দুকে মজুত অর্থ হইতে ব্যয়াদি নির্বাহ হইবেক। সিন্দুকে যাহা মজুদ আছে তাহা গত কালকার রোকড়ের হিসাবের মধ্যে দৃষ্ট হইবেক। তাহার পাশে আমি সহি দিয়াছি। ইহাতে অপর কোন ব্যক্তির অর্থাৎ আমার অপর দুই পুত্রের কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না। দেবেশ্বরের সকল কৃতকার্য আমার কৃতকার্যের তুল্য বলিয়া গণ্য হইবেক। আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বিছানায় বসিয়া এই পত্র লিখিলাম এবং ইহার একখণ্ড নকল সদরে আমাদের উকীলের নিকট প্রেরণ করিলাম।

ইতি রত্নেশ্বর রায়।"

শিবেশ্বর সেই কাগজখানি বড় ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—এই উনি নিজে হাতে লিখে ম্যানেজারের হাতে দিয়েছিলেন। ম্যানেজার আমাকে দিলেন পরশু উনি হুঁশ হারাবার পর। পরশু সাত দিন গেছে। মেদিনীপুরের ডাক্তার বলে গেছে জ্বর বিকার।

থেকে থেমে কথা বলছিলেন শিবেশ্বর।

দেবেশ্বর বুঝতে পারছিলেন যে, শিবেশ্বর কান্না চেপে কথা বলছে। কথাটা ঠিক। ভুল তার হয় নি। ক্ষোভে ক্রোধে তাঁর কান্না আসছিল। শিবেশ্বর জানতেন বিশ্বাস করতেন তিনিই পিতার অনুগত এবং প্রিয়তম পুত্র। দেবেশ্বরের চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল এবার।

বত্রিশ দিন পর রত্নেশ্বর রায়ের সেই জ্বরের পর পথ্য করেছিলেন—জ্বর ছেড়েছিল আটাশ দিনের দিন। বিকার কেটেছিল চব্বিশ দিনে।

বিকারের মধ্যে বার বার বলেছেন—দরজা খোল দেবেশ্বর। দেবেশ্বর! বেশ ধমক দিয়ে বলেছেন। কখনও মিনতি করে বলেছেন। তারপর বলেছেন।—ভাঙো দরজা ভাঙো আবদুল—মহাবীর, তোড়ো দরজা।

বিকার যেদিন কাটল সেদিনও ডেকেছিলেন—দেবেশ্বর! দেবেশ্বর কই? পুত্রবধূকে মাথার শিয়রে দেখে চিনতে পেরেছিলেন—বলেছিলেন, বড়বউমা! এপাশে তাকিয়ে দেখে মেজবউমাকে দেখে বলেছিলেন—মেজবউমা! শিবেশ্বরের প্রথমা স্ত্রী ইনি।—

বড় পুত্রবধূ তাড়াতাড়ি মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডেকেছিলেন—বাবা!

—মা! তারপরই বলেছিলেন—জোরে বল, কানে ঠিক শুনতে পাচ্ছি না।—

বড়বউমা বলেছিলেন—ছোটবউও রয়েছে; এই যে আমার পাশেই রয়েছে। বলে ছোটবউ অর্থাৎ রামেশ্বরের স্ত্রীকে শ্বশুরের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্বশুর একটু ক্ষীণ হেসে, ঘাড় নেড়ে সন্তোষ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দু ফোঁটা জল দুই চোখের কোলে জমে উঠেছিল।

বড়বউমা আবার বলেছিলেন—পিসীমা এসেছিলেন কাশী থেকে। পরশু থেকে জ্বর কমতে শুরু করেছে দেখে কলকাতা ফিরে গেছেন। আবার আসবেন। কথা বুঝতে ভুল করেন নি রত্নেশ্বর রায়—সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন—অন্নপূর্ণা এসেছিল!

—কি কষ্ট হচ্ছে বাবা? বোধ হয় চোখের জল দেখেই বড়বউমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কথাটা—

—কষ্ট? বুঝতে পারছি না। একটু ভেবে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন—বড় দুর্বল মনে হচ্ছে!

—চুপ করে শুয়ে থাকুন। বড় দুর্বলই হয়েছেন যে!

—কদিন হল আজ?

—চব্বিশ দিন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তোমরা কবে এলে?

—আজ আঠার দিন হয়ে গেল বাবা।

—দেবেশ্বর? সে?

—এসেছেন। ওই যে—ওই বারান্দায়, আসছেন বোধ হয়।

সত্যিই বারান্দায় পায়ের শব্দ উঠছিল, সে শব্দ রত্নেশ্বর রায় শুনতে পান নি। দেবেশ্বর শিবেশ্বর রামেশ্বর তিন ভাই—খবর পেয়ে বারান্দা ধরে ঘরে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বড়বউ ইসারা করে ডেকেছিলেন স্বামীকে—এস।—

দেবেশ্বর দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। রত্নেশ্বর দেবেশ্বরকেই বলেছিলেন—এসেছ?—

দেবেশ্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছিলেন। এর উত্তর দিতে তিনি পারেন নি। খুঁজে পান নি। তবে তিন ভাইয়ের চোখই জলে ভরে উঠেছিল। এরই মধ্যে ডাক্তার এসে পড়ে সবিনয়ে মৃদুস্বরে বলেছিলেন—ওঁর এখন বিশ্রাম দরকার বড়বাবু!

বড়বাবু দেবেশ্বর। দেবেশ্বর বলেছিলেন—হ্যাঁ। নিশ্চয়। তবে ওঁকে বলে যেতে হবে। না হলে—

বড়বউ উমা বলেছিলেন—জোরে বলো একটু—কানে ঠিক শুনতে পাচ্ছেন না।

দেবেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন—ডাক্তার বলছেন আপনার এখন বিশ্রাম দরকার।

রত্নেশ্বর রায় ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন—আর কিছু হবে না। হতে দেরি আছে।

বলে গেছে আমাকে।

সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন দেবেশ্বর, তাঁর সঙ্গে অন্য ভাই এবং বউয়েরাও।

রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—তোমার মা। তোমার মা সারা অসুখটা ওই ঘরে আমার সামনে বসে থেকেছে। এই তো সে গেল। বলে গেল—আমি এবার চল্লাম। এখন আসতে তোমার দেরি আছে কিছুদিন। ভাল হয়ে গেলে এবার।

*　　　*　　　*

বত্রিশ দিনের দিন পথ্য পেয়েছিলেন। সেদিন অন্নপূর্ণা দেবী কলকাতা থেকে এসেছিলেন কীর্তিহাট। যাবার সময় তাঁর দেবু ভাইপোকে বলে গিয়েছিলেন—তুই যেন এখনই দাদাকে ফেলে কলকাতা চলে যাস নি দেবু।

দেবেশ্বর হেসেছিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—চলে যাব এটা তোমরা ভাইবোনে ধরেই নিয়েছ পিসী?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্নপূর্ণা বলেছিলেন—হ্যাঁ, দাদা বলছিলেন।

—সে তুমি বলতেই আমি বুঝেছি।

—না, শুধু উনি বলেন নি—আমিও বলছি। আমি তোকে জানি। তোর মত নেমকহারাম আর দুটি নেই। অত্যন্ত স্বার্থপর।

দেবেশ্বর হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ, ওটা আমি মানি। তবে আমার স্বার্থবোধ একটু ভিন্ন রকমের পিসী। স্বার্থ আমার কাছে selfishness যাকে বলে তাও বটে, আবার ওইটের মধ্যেই আমার আসল মানে আসল চেহারা যাকে বলে তাও বটে। তবে এখন যাব না, অন্তত উনি একটু সেরে না ওঠা পর্যন্ত না। এ তোমাকে কথা দিলাম।

কথাটা শুনে খুশী হয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। ছেলেকে বলেছিলেন—অন্নপূর্ণা আমাকে সব বলেছে। আমি শুনে সুখী হয়েছি। একটা পাওয়ার অব এ্যাটর্নী রেজেষ্ট্রী করে দিতে চাই তোমার নামে। আমাকে তোমরা খালাস দাও। আর—

একটু চুপ করে থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আমি বাপ তুমি ছেলে। আমি যা চাই তা তুমি জান। কিন্তু তা বলে তাই নিয়ে তোমাকে কষ্ট আমি দেব না, দিতে চাইনে। শুধু আমার অনুরোধ—ভোগকে ব্যভিচার করো না, মদ যদি খাও বা না খেয়ে থাকতে নাই পার—খাওয়ার যদি দোষ আছে মনে নাই হয় তোমার তবে খেয়ো। আমার বাবা খেতেন, পিতামহ খেতেন—তাঁরাও। মানে সোফিয়া বাঈকে আমি মায়ের মতই দেখেছি—শেষ কালটায়। আমার মা—তাঁর হাতেই বাবার সেবার ভার দিয়ে মারা গিছেলেন। কিন্তু ওই মদে যেন তোমাকে না খায়, আর ভোগকে ব্যভিচার করে তুল না।—

দেবেশ্বর রাঙা হয়ে উঠেছিলেন, মুখে কিছু বলেন নি।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—জমিদারী চালাবার ব্যবস্থা তুমি যেমন ভাল বুঝবে করবে—তাতে আমি কোন আপত্তি করব না। একটু সারলেই আমার ইচ্ছে পুরী গিয়ে আশ্বিন মাসটা

থেকে শরীর সেরে, একবার তীর্থও দর্শন করব। ইংরেজের দৌলতে তীর্থভ্রমণে আর কষ্ট নেই —যার যেমন বিত্তের সাধ্য সে তেমনি আরামে যেতে পারে। শিবেশ্বর তোমার কাছে থাকবে, রামেশ্বর এবং ছোট বউমাকে নিয়ে আমি বরং যাব, কি বল ?—

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে চমৎকার একখানা 'ভারত দর্শন' নামে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচিত হতে পারত। সুন্দর বর্ণনা তাঁর। হয়তো ঐরকম ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয় নি। পুরীতে মাস দুয়েক থেকে পুরী থেকে, দক্ষিণে মাদ্রাজ হয়ে রামেশ্বরম এবং ফেরবার সময় ভারতের পশ্চিম উপকূল হয়ে দ্বারকা, সেখান থেকে রাজস্থান, পাঞ্জাব, চিতোরগড়, জ্বালামুখী হয়ে কুরুক্ষেত্র, সাবিত্রী, দিল্লী, আগ্রা, বৃন্দাবন এসে সেখানে কিছুদিন থেকে বাড়ী ফিরেছিলেন এক বৎসর পর। এর মধ্যে প্রতিটি স্থানে তাঁর কাছে পত্র গেছে—এক কর্মচারীদের লেখা পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র তিনি খোলেন নি পড়েন নি। এক বৎসর পর যখন তিনি ফিরলেন—তখন তাঁর কাছে শিবেশ্বরের লেখা খামের চিঠি বারো-চৌদ্দখানা, না-খোলা অবস্থায় তাঁর ব্যাগে বন্ধ ছিল। কর্মচারীদের চিঠিতে সংসারের পরিজনদের কুশলেই তিনি তুষ্ট ছিলেন—তার বেশী কিছু চান নি।

যেদিন ফিরেছিলেন সেদিন কীর্তিহাটে উৎসব হয়েছিল।

হাসলে সুরেশ্বর।—

দেবেশ্বর রায় এ উৎসবের পরিকল্পনা করেছিলেন।

সে উৎসব খাঁটি সাহেবী কায়দায়। কাঁসাইয়ের ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন পালকিতে। তারপর কাঁসাইয়ের ঘাট থেকে ল্যাণ্ডো-গাড়ীতে। বাপের অনুপস্থিতিতে এ-গাড়ী এবং এক-জোড়া বাদামী রংয়ের ঘোড়া কিনেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

ঘাট থেকে সেই গাড়ীতে চড়িয়ে বাপের সামনের সিটে ছোট দুই ভাইকে বসিয়ে নিজে কোচবক্সে বসে ঘোড়ার রাশ ধরে চালিয়ে গ্রামে ঢুকেছিলেন।

রায়বাহাদুর গাড়ীতে উঠতে গিয়ে পাদানীতে পা রেখে থমকে গিছলেন; বলেছিলেন— কই যজ্ঞেশ্বর কোথায় ? সে আসে নি ? অসুখ-বিসুখ করে নি তো ?

বড় নাতিকে তিনি প্রাণের তুল্য ভালবাসতেন। বয়স তখন ষোল হয়েছে। তাকে তিনি ওই ঘাটেই প্রত্যাশা করেছিলেন এবং তাকে তাঁর পাশে বসিয়ে নিয়ে যাবেন ভাবছিলেন। দেবেশ্বর বলেছিলেন—না, তাকে আনি নি। কারণ যোগেশ্বর ধনেশ্বর জগদীশ্বর এদের তিনজনকেও তা হলে আনতে হত। ওটা ঠিক আমি পছন্দ করি না। যজ্ঞেশ্বর আসবে আর ওরা বাড়ীতে পড়ে থাকবে—কাঁদবে, সেটা অন্যায় হত।

বলেই তিনি বাপকে অনেকটা হাতে ধরে উঠিয়ে দিয়ে নিজে কোচবক্সে উঠে বসেছিলেন তাঁর রাশের টান পেয়েই ঘোড়া দুটো লাল কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর চলতে শুরু করেছিল —ঘাড় বেঁকিয়ে—। দেবেশ্বরের শক্তহাতের টানে ঘাড় বেঁকিয়ে মন্থরগতিতে চলছিল তারা বাধ্য হয়ে।—দ্রুত গেলে রাস্তার দুধারের লোক রায়হুজুরকে দেখতে পাবে না।

এই গাড়ীর জন্যে গ্রামের রাস্তাকে পাকা করতে হয়েছিল। তার উপর ফটক তৈরী করে, দুদিকে কলাগাছ এবং আমের শাখা দেওয়া জলভর্তি কলসী বসিয়ে দিয়েছিলেন—রাস্তার

দুধারে খুঁটি পুতে আমের শাখা ঝুলিয়ে দিয়েই শেষ হয় নি, দুধারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন চাপরাসীদের। তারা বন্দুকের নল উপরদিকে তুলে পর পর ষোলটা ফায়ার করে মালিককে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। শুধু গ্রামের লোক নয়—আশেপাশের পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোক রায়বাহাদুরের প্রত্যাবর্তন দেখতে নিজে থেকেই ভিড় করে জমায়েত হয়েছিল কীর্তিহাটে। সেদিনের ভাণ্ডারের খাতায় চালের খরচ দেখেছি কুড়ি মণ। তার অর্থ দু হাজার লোকের খাবার বরাদ্দ। সন্ধ্যার সময় পুড়েছিল বারুদের কারখানা।

রত্নেশ্বর রায় নিজের ডায়রীতে লিখেছেন—'ল্যাণ্ডা গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া বাঁশ ও ফুলপাতায় নির্মিত তোরণগুলির মধ্য দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম—বন্দুকের ধ্বনি হইতে লাগিল—পথের দুই পার্শ্বে লোকজনেরা ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এসব দেখিয়া ভালই লাগিল। বুঝিতে পারিলাম—শ্রীমান দেবেশ্বর এক বৎসরের মধ্যে এস্টেটের ভোল পাল্টাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত দারোয়ানদের পোশাক এবং চাপরাস দেওয়া হইয়াছে। মনে হইতেছে ইহা যেন একটি ছোটখাটো রাজ্য এবং আমিই তাহার অধীশ্বর। সমস্ত কিছুর মধ্যে আশ্চর্য একটি শৃঙ্খলা দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। দূর হইতে রায়বাড়ীর চিলের ছাদ ও ছাদের আলসেগুলি নীল আকাশের গায়ে গ্রামের গাছপালার শ্যামশোভার উর্ধ্বে চিত্রবৎ শুভ্র শোভায় ঝলমল করিতেছে। বুঝিলাম—মদীয় প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বাড়ীঘর সবই চুনকাম করানো হইয়াছে। জানালা দরজায় রঙ হইয়াছে। গাড়ী আসিয়া রায়জননী মা শ্যামাসুন্দরীর ফটকে দাঁড়াইল। আমি গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে মাটিতে পা দিয়াই বিস্মিত হইয়া গেলাম—। দেখিলাম পুরাতন ফটক নাই—তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া নূতন ফটক তৈয়ারী হইয়াছে। প্রথম প্রবেশপথেই দেখিলাম গোটা জগৎটাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।"

ফটকটা তৈরী করিয়েছিলেন কুড়ারাম রায় নিজে। ফটকের দুই পাশে দুটো বিরাটকায় প্রহরীর মূর্তি ছিল। পঙ্কচুনের কাজকরা মূর্তিদুটো মজবুদ ছিল খুব—কিন্তু রুচিসম্পন্ন ছিল না। সেকালের নতুন তেলেঙ্গী সিপাইয়ের আদর্শে, খাটো কুর্তা হাঁটু পর্যন্ত বগলস আঁটা, টাইট পেন্টুলান পরা মূর্তি ছিল। গোল গোল বড় বড় চোখ—তেমনি পাকানো গোঁফ; সে সব আবার রঙ লাগিয়ে মূর্তি দুটোকে আরও ভয়াল করে তোলা হয়েছিল। ছোট ছোট ছেলে-পুলেরা মূর্তি দুটো দেখলে ভয় খেতো; হয়তো বা যেসব গ্রাম্য দরিদ্র প্রজারা মনের দিক থেকে শৈশব বা বাল্যকাল অতিক্রম করে নি—তারাও জমিদার বাড়ী ঢুকবার সময় আতঙ্কিত হয়ে এখানে প্রবেশ করত।

সে দুটোকে ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার চিহ্নমাত্র নেই। তার স্থলে দুপাশে দুটো পাথরের সিংহ বসানো হয়েছে। সামনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে থাকা ভঙ্গিতে তৈরী সিংহের মূর্তি দুটো অদ্ভুত। রত্নেশ্বর এ ধরনের বা এ গড়নের পাথরের ছোট ছোট সিংহ উড়িষ্যায় দেখেছেন। এ দুটো দেখতে অবিকল সেই রকম হলেও আকারে বেশ বড়; অন্তত নিচের দিকে হাত তিনেক উঁচু পাথরের থামের উপর বসিয়ে অনেক বেশী উঁচু করে তোলা হয়েছে।

রত্নেশ্বর থমকে দাঁড়ানোর জন্তই সমস্ত কিছু যেন একটা হুঁচোট খেয়ে গেল। শুদ্ধ রায়-

বাহাদুর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সিংহ দুটোর দিকে। একবার এটাকে দেখছেন—একবার ওটাকে।

ওদিকে তখন ভিতরে নাটমন্দিরে শাঁখ বাজছে, দুটি সধবা মেয়ে পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে ফটকের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ম্যানেজার থেকে কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে একদিকে—মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ীর মেয়েরা—মানে বড়বউ এবং মেজবউ—তাঁদের পিছনে রায়বাড়ীর অনেক পোষ্য। মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন পুরোহিত; মায়ের পূজক এবং পরিচারকেরা। মিনিট দুয়েক রায়বাহাদুর দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন মূর্তি দুটো। এই দু মিনিট কাল সময়ই যেন অনেক বেশী সময় বলে মনে হয়েছিল সকলের। রায়বাহাদুরের কপালে সারি সারি রেখা জেগে উঠেছে। রত্নেশ্বর রায়ের কপালখানি ছিল প্রশস্ত এবং চিত্তের সামান্য ক্ষোভে বা বিরক্তিতে পাঁচটা সমান্তরাল রেখা জেগে উঠত। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠত তীক্ষ্ণ। তাঁর অসন্তোষ বুঝতে কারুর বাকী রইল না।—

বড়ছেলে দেবেশ্বর এসে কাছে দাঁড়ালেন, বললেন—ভিতরে চলুন। সকলে অপেক্ষা করছেন।

—এ সিংহ দুটো?

—উড়িষ্যার তৈরী। আপনি তীর্থে বেরিয়ে গেলেন পুরী থেকে—আমি ফিরবার সময় কোনারক ভুবনেশ্বর গিয়েছিলাম। সেখান থেকে স্যাণ্ডস্টোনের সিংহমূর্তি নিয়ে এসে, কলকাতায় সাহেব কোম্পানাকে বরাত দিয়ে, মার্বেলের বড় সাইজের করিয়ে আনিয়েছি। সে মূর্তি দুটো অত্যন্ত খারাপ ছিল, দেখতে ভালগার। এ দুটো ভাল হয় নি?

ছেলের মুখের দিকে তাকালেন রায়বাহাদুর। দেখলেন টকটকে ফরসা রঙ বড় বেশী লাল হয়ে উঠেছে, সম্ভবতঃ এতক্ষণ ওই শক্তিমান ঘোড়া দুটোর রাশ ক'ষে টেনে ধরে এসে পরিশ্রম বেশী হয়ে গেছে। তিনি বললেন—ভাল নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু ও মূর্তি দুটো আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীবাড়ী তৈরী করাবার সময় নিজের পছন্দমত করে তৈরী করিয়েছিলেন তো!

—আছে সে দুটো। গোটাগুটি তুলবার চেষ্টা করিয়েছিলাম, কিন্তু ঠিক পারা যায় নি। কিছু কিছু ভেঙে গেছে; ফেটেও গেছে। হয় তো বা আর কিছুদিনের মধ্যেই আপনা-আপনিই ফাটত—বয়স তো কম হল না—১৭৯৫ সাল আর এটা ১৮৯৬ সাল—একশো এক বছর হয়ে গেল।

—হুঁ। বলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়; তারপর অকস্মাৎ যেন সচেতন হয়ে বলেছিলেন—চল ভিতরে চল। ব'লে পা বাড়িয়েছিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে চারিদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে খুঁজতে ডেকে উঠেছিলেন—দাদু, দাদুরা কই? অর্থাৎ নাতিরা!

দেবেশ্বর বলেছিলেন—মাকে প্রণাম করুন, তারপর সকলে এসে আপনাকে প্রণাম করবে।

রত্নেশ্বর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—দীর্ঘজীবী হও।

অপর সকল নাতিরা এসে প্রণাম করলে তাঁকে।—এল না কেবল বড়নাতি। সে শরীর খারাপ বলে ঘরে শুয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে ঢুকলেন রত্নেশ্বর রায়—দেবেশ্বর বারান্দায় থমকে দাঁড়ালেন—বললেন—আমি এখন আসছি। দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন।

বলেই, চলে গেলেন।

রত্নেশ্বর রায় নাতির ঘরে ঢুকলেন।—কি হয়েছে দাদু?

* * *

নাতির ঘর থেকে বের হলেন একটু গম্ভীর মুখে—তারপর রায়বাড়ীটার প্রতিটি ঘর ঘুরে দেখে এসে নিজের ঘরে ঢুকলেন। এতক্ষণে প্রথম কথা বললেন—বললেন, আমার ঘরটা তেল-রঙ না করলেই ভাল করতে। সাদার চেয়ে কোন রঙ আমার ভাল লাগে না, আর তেলরঙের একটা গন্ধ আছে। আঃ। ওটা আবার কি? ও, কেরোসিন তেলে চলা পাখা! না-না-না। ওটা বড়বাবুর ঘরে দাও। না—, বড়বাবুর আর মেজবাবুর ঘরে পাখা তো আছে। তা হলে যেখানে হোক দাও। কেরোসিন তেলে চলা পাখার বাতাস গরম হবে—একটা গন্ধ হবে গ্যাসের। আমার টানা পাখা ভাল।

পরের দিন নতুন কাছারী ঘরে এসে বসেই আবার উঠে গেলেন। এসে বসলেন দেবোত্তরের সাবেক কাছারী ঘরে, যেখানে সোমেশ্বর রায় বসতেন; সেখান থেকে উঠে নিজের শোবার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে বললেন—এখানেই আমার বসবার জায়গা করতে বল। আর তোমাদের বড়বাবুকে গিয়ে বল, গত বছরের কাগজপত্র একটু দেখতে চাই। জমা-খরচ—রোকড়খানা আর মোটামুটি আয়ব্যয়ের হিসেবটা।

তিনদিন পর দেবেশ্বর এসে পাশে দাঁড়ালেন।

খাতা দেখছিলেন রত্নেশ্বর রায়। মুখ তুলে বললেন—ভাবছিলাম তোমাকে ডাকতে পাঠাব। কয়েকটা খরচের ব্যাপার—

—খাতা সব দেখলেন?

—হ্যাঁ। সবই ঠিক আছে প্রায়। হ্যাঁ, তবে মামলা সেরেস্তায় কয়েকটা ডিগ্রী আদায়ের ব্যাপারে—

—আপনার যদি আপত্তি থাকে তবে ও টাকা আমি পূরণ করে দেব। বোধ হয় হাজার পনের হবে।

—হ্যাঁ। চোদ্দ হাজার পাঁচশো কয়েক টাকা কয়েক আনা কত পাই যেন। না-না। ও তুমি ঠিক করেছ বেশ করেছ।

—হ্যাঁ, মহেশ্বর দাসের উপর তিরিশটা নালিশে আমাদের সুদ আর খরচা নিয়ে বিশ হাজার টাকার ডিগ্রী হয়েছিল। সে শুনেছি উদ্ধত লোক। তা উদ্ধত একটু তো হবেই। বছরে সাড়ে তিন হাজার টাকা খাজনা দেয়, জমি অন্তত দু হাজার বিঘের কাছাকাছি। আমাদের গোমস্তাদের মাইনে দিয়ে সে রাখতে পারে। সে লোক এল কাছারীতে, আমি ডিভিশনাল কমিশনার এবং কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় পায়ের কাছে টাকার তোড়া নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললে

হুঁজুর, আমাকে বাঁচান তো বাঁচি নইলে আমাকে মরতে হবে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে ভিক্ষে করতে হবে। আমি কি করব; বহুলোকের সামনে ব্যাপার; আমি ভেবে দেখবারও অবকাশ পেলাম না—টাকার তোড়াটা তুলে নিলাম। ব্যাপারটা খানিকটা জানা ছিল—বললাম, আর আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে না তো? খাজনা দেব না, নালিশ করে নাও গে—বলবে না তো? বললে—তা কখনও বলি নি হুঁজুর; কিন্তু আপনার গোমস্তা—ও তো হুঁজুর আমারই জ্ঞাতি, ওকেও আমিই হুঁজুরদের দরবারে জামীন হয়ে গোমস্তার আমলার কাজে ঢুকিয়েছিলাম। তার পরেতে উন্নতি হল—হুঁজুরদের বিশ্বাসের লোক হল—হয়ে হুঁজুর আমার মাথাতেও পা দিয়ে হাঁটতে চাইলে। চোখ রাঙাতে লাগল। কি করব হুঁজুর, আমি রাগের বশে একদিন, চামড়ার মুখ তো—বলে ফেললাম, নালিশ করে লে গা! বিনা নালিশে দোব না। বলেছিলাম—বলা বটে! আমি টাকার তোড়াটা নিয়ে সেখানেই তাকে খালাস দিয়ে এলাম। তারপর ঠিক এই ধরনের ডিগ্রীর খাতক প্রজা অনেক কজন এল। তাদের সব বিভিন্ন-রকম ব্যাপার। সব ক্ষেত্রেই—

চুপ করে গেলেন দেবেশ্বর। কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তির সারাংশের মত কোন কোন বিশেষ ভূমি বা বাগান বা দীঘির জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিলেন নিজে শিবেশ্বর। তা দিতে রাজী না হওয়ার জন্য শিবেশ্বরই সুকৌশলে গোমস্তাদের দিয়ে প্রজার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে নালিশ চাপিয়েছেন তাদের উপর। কথাটা কিন্তু বাপকে মুখে বলতে পারলেন না দেবেশ্বর।

রত্নেশ্বর বললেন—তোমার নোট আছে আমি দেখেছি। এবং বুঝেছি কার কথা বলতে গিয়েও তুমি পার নি। শিবেশ্বরের এই স্বভাব আমার মাথা হেঁট করে। তাই তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—শিবেশ্বর কটা খরচের কথা বলেছিল,—দেখলাম তোমার নামে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একবার পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছ—

—খাতা সব দেখেছেন তা হ'লে?

—হ্যাঁ, দেখেছি। আরও একবার আট হাজার টাকা—

—সেটা আমাদের এস্টেটের তরফ থেকে খবরের কাগজের শেয়ার কিনেছি। আর আমার নামে নেওয়া টাকাটা—ছোট খোকা যোগেশ্বরের গবর্নেসের অপমান করেছিল যজ্ঞেশ্বর, তার দরুন তাকে ক্ষতিপূরণ বলুন, হ্যাঁ, তাই ছাড়া আর কি বলব—তাই দিয়েছি। কিন্তু সে টাকা তো আমি—

গলা পরিষ্কার করার ছলে রত্নেশ্বর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাতে দেবেশ্বর থামেন নি—তিনি বলেছিলেন—সে টাকা পরে কলকাতা থেকে চেক ভাঙিয়ে এনে তো এস্টেটে জমা দিয়েছি।

রত্নেশ্বর এবার বললেন—কথাটার আলোচনা থাক। আমি সব শুনেছি।

রত্নেশ্বর রায় তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এক বছর। এই এক বছরের মধ্যে দেবেশ্বর এস্টেটের ভার নিয়েছিলেন—কিন্তু কলকাতার বসবাস ছাড়েন নি, ছেলেরা কলকাতার স্কুলে

পড়ে; তিনি আসা যাওয়া করতেন। থাকতেন বিবিমহলে। মেজভাই শিবেশ্বরের স্ত্রী সংসারের গৃহিণী ছিলেন। পূজোর সময় স্কুল আপিস বন্ধ; এই সময় দেবেশ্বর স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে কীর্তিহাট এসেছিলেন। সঙ্গে এসেছিল এক মেমসাহেব।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার বাবাকে তিনি ইংরিজী পড়াতেন, আর দেবেশ্বর রায়ের চিঠিপত্র লিখতেন। অন্ততঃ সেই পরিচয়েই মেমসাহেব এসেছিল। কিন্তু ওই পরিচয়টা ছিল নিতান্তই একটা নামাবলীর মত। কীর্তিহাটের সমাজ, বাড়ীর দেবদেবীর পূজার্চনায় বাধার চেয়েও শিবেশ্বরের আপত্তি খণ্ডনের জন্যই নামাবলী তিনি পরিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির আসল পরিচয় গোপন করবার মত সতর্ক মানুষ দেবেশ্বর ছিলেন না। মেয়েটি ছিল তাঁর অনুগৃহীতা। জীবনে দেবেশ্বর রায় অনেক ভুল করে গেছেন; কিন্তু অনুশোচনা কোনো কিছুর জন্যে করেন নি। অনুশোচনা এবার এই ভুলের জন্য করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর জমিদারীর ঐশ্বর্য দেখাতে এনেছিলেন শ্বেতাঙ্গিনীটিকে। লর্ড বা আর্ল বা ডিউক অব কীর্তিহাটের কাস্‌ল্ এবং এস্টেটের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য এনেছিলেন। পূজোর পরই কালীপূজো, সে সময় কীর্তিহাটে উৎসব হয়; সেবার দেবেশ্বর সে উৎসব বাড়িয়েছিলেন। তাছাড়া রেল লাইন হয়ে অবধি রায়বাড়ীর বজরাগুলো প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো মেরামত করিয়ে কাঁসাইয়ের মোহনায় পড়ে, ভাগীরথী ধরে, সুন্দরবনের শোভা দেখাবার কল্পনাও ছিল তাঁর। কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি। ভাবেন নি বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বরের বয়স পনের বছর হয়েছে এবং ঠিক এই পনের বছর বয়সে তিনি নিজে ভায়লেটের প্রেমে পড়ে রত্নেশ্বর রায়ের মত বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

সুলতা, আমার মাতামহী উমা দেবী ছিলেন মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, তিনি নীরবে সব সহ্য করে যেতেন। স্বামীর যোগ্যা স্ত্রী নন বলে আক্ষেপ ছিল, অভিমান ছিল, অনুচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত তার সমস্ত স্রোত, গতিবেগ অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হত; গভীর রাত্রে কাঁদতেন তিনি। তখন স্বামী বিলিতী মদের নেশায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকতেন। বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর এ সব লক্ষ্য করেছিল। এবং তখন তাঁর কানে এসে পৌঁচেছে বাংলা দেশের নতুন আহ্বান।

স্বামী বিবেকানন্দের তখন শিকাগোতে ধর্মসম্মেলনে বিশ্বজয় হয়ে গেছে। ধনীর পুত্র যজ্ঞেশ্বর মুচী-মেথরকে, নির্ধন-দরিদ্রকে ভাই বলতে পারেন নি, কিন্তু সায়েবীবানার উপর, মদ্যপানের উপর একটা বিদ্বেষ জন্মেছে। ধর্মের প্রতি একটা অনুরাগ এসেছে। কিন্তু সে অনুরাগ—খানিকটা বাপের আচরণের উপর যে ক্রোধ, সেই ক্রোধ। ক্রোধ এবং ক্ষোভ কিম্বা বলতে পার যজ্ঞেশ্বর রায়ের জীবনের ভিতের পত্তন হয়েছে ওই মাল-মশলায়। নইলে চরিত্রে তিনি বিচিত্র, তার পরিচয় কিছু পেয়েছ; বলেছি অর্চনার বিয়ে প্রসঙ্গে কুইনীর বাড়ী প্রসঙ্গে। এক নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কুটিল সন্দেহ আর ওই দিকে নিজের চরিত্রের সততার কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া অন্য কোন সততা বল, সততার সাধনা বল কিছু ছিল না। প্রথম যৌবনে অনেক দিন পর্যন্ত মদ খান নি, তারপর তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়ে দীক্ষার দোহাই দিয়ে মদ্যপান করেছেন। কয়লার ব্যবসায়ে একসময় উথলে উঠেছিলেন, বিশেষ করে গত প্রথম মহাযুদ্ধের

সময়, সে-সময় তিনি জাপানে কয়লা সরবরাহ করতেন। অর্ডার পাবার জন্ত জাপানী ফার্মের সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন বাগানবাড়ীতে। সেখানে নাচগান হত। তিনিই উদ্যোগ করতেন। নারীর রূপ আর তার দেহ, এই ছুটোর বিনিময়ে সব কিছুই পেতে পারে মানুষ। কিন্তু সে যজ্ঞেশ্বর রায় ১৯১৪।১৫ সালের যজ্ঞেশ্বর রায়। ১৮৯৪।৯৫ সালে যজ্ঞেশ্বর রায় আদর্শবাদী ছিলেন। দাম্ভিক আদর্শবাদী। জমিদারের ছেলে, দেবেশ্বর রায়ের বড় ছেলে, রত্নেশ্বর রায়ের প্রথম পৌত্র, তাঁর যদি দম্ভ না হবে তো হবে কার? দাম্ভিক যজ্ঞেশ্বর রায় সেদিন বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সে এই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটিকে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু কলকাতায় কিছু বলবার অবকাশ পেত না। মহিলাটি সকালে একবার আসতেন—যোগেশ্বরকে ইংরিজী শেখাতেন, দেবেশ্বরের কাছে তু-চারখানা চিঠি ডিক্‌টেশন নিতেন, নিয়ে ফিরে যেতেন। দেবেশ্বর রায় তাঁর একটা ভাড়া-করা বাড়ীতে সন্ধ্যার পর গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। মদ্যপান করে গাড়ীতে বেড়ানো ছিল একটা শখ। কোন কোন দিন ডিনার খেয়ে বাড়ী ফিরতেন।

বাড়ীতে স্ত্রী উমা জেগে বসে থাকতেন, একখানি ধর্মগ্রন্থ নিয়ে। পড়েই যেতেন, পড়েই যেতেন। জীবনের কুড়িটা বৎসর ওই একখানি বই-ই তিনি পড়ে গেছেন; কতবার পড়েছেন, তার হিসেব নিজেও রাখেন নি। বইখানি শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ। যজ্ঞেশ্বর রাত্রি এগারটায়-বারোটায় উঠে এসে উঁকি মেরে দেখে যেতেন; মাকে জেগে বই খুলে বসে থাকতে দেখে শুধু বলতেন—এখনও শোও নি মা?

মা বিচিত্র হেসে বলতেন—না রে। ভাগবতের উপাখ্যানটা শেষ করে নিই, তারপর শোব।

যজ্ঞেশ্বর জানতেন। কোন উপাখ্যান পড়ছ জিজ্ঞাসা করলে মাকে বই দেখে তবে বলতে হবে, তাই আর কোন কথা না বলেই চলে যেতেন। ক্রুদ্ধ হতেন বাপের উপর এবং এই বিদেশিনীর উপর। কিন্তু বলতে কিছু পারতেন না। সুযোগ পেলেন এখানে।

সেদিন সকালে বিবিমহলে বসে দেবেশ্বর আর বিদেশিনী বসে চা খাচ্ছিলেন। কীর্তিহাটে এসে অবধি এটা হয়েছিল তাঁর নিত্যকর্ম। মেমসাহেব নিজের চায়ের কাপে চা ঢালছিলেন, দেবেশ্বরের সামনে টেবিলের উপর তাঁর চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছিল, তিনি অপেক্ষা করে-ছিলেন তাঁর প্রিয়পাত্রীর চায়ের জন্য। হঠাৎ ছোট ছেলে যোগেশ্বর ছুটে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর 'আন্টি'র হাত ধরে টেনে বলেছিলেন—আন্টি কাম এ্যাণ্ড সি, আন্টি! এ ভেরী বিগ বীয়ার।

একটা লোক ভালুক নাচাতে এসেছিল, ভালুকটা ছিল খুব বড়, সেইটে সে আন্টিকে দেখাবার আগ্রহে ছুটে এসে তার হাত ধরে টেনেছিল। আন্টিকে যোগেশ্বর ভালবাসত। যজ্ঞেশ্বরের মত তার প্রতি তার বিরাগ ছিল না।

এর পিছনে আরও একটা কারণও ছিল, সেটা দেবেশ্বর রায় বলে গেছেন। এই মহিলাটিকে দেবেশ্বর কেবল যোগেশ্বরের জন্তেই রাখেন নি, তুই ছেলেকেই ইংরিজীতে কথা বলতে শেখাবে বলে রেখেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর গোড়া থেকেই ইংরিজীতে কাঁচা ছিলেন,

ইংরিজী তিনি ভালবাসতেন না ; মেমসাহেবও এই অবাধ্য ছাত্রটির ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু যোগেশ্বর ইংরিজী ভালবাসতেন, বলতে পারতেন চমৎকার! শুধু ইংরিজীতেই নয়, অন্য সব বিষয়েও ভাল ছাত্র ছিলেন। 'আন্টি'কে সে এইজন্যেই ভালবাসত এবং এই জন্যই এত বড় ভালুকটা তাকে দেখাবার জন্যে ছুটে এসে তার হাত ধরে টেনেছিল। সে টানে আন্টির হাতের চায়ের কেটলীটা চায়ের কাপ থেকে সরে এসে তার পোশাকের উপর গড়িয়ে পড়েছিল, খানিকটা পায়ের উপরেও গড়িয়ে পড়েছিল।

আন্টি এটা সহ্য করতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কেটলাটা টেবিলের উপর রেখে যোগেশ্বরের গালে সজোরে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। চড়ের জোরটা সজোর বলেও তার মাত্রা ঠিক বোঝানো যাবে ; গৌরবর্ণ রঙ রায়বংশে কুড়ারাম রায়েরও আগে থেকে বাসা বেঁধেছে ; যোগেশ্বরের গালের সুন্দর রঙের উপর মেমসাহেবের পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছিল।

যোগেশ্বর আঘাত যত পেয়েছিলেন, তার থেকে মনে আহত হয়েছিলেন বেশী। তিনি গালে হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিবিমহল থেকে চলে আসছিলেন অন্দরের দিকে ; পথের উপর ওদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছিলেন বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর। পরস্পরকে দেখে পরস্পরেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর ঘোড়ার রাশ টেনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হল? কাঁদছিস কেন রে?

গালের হাতটা সরিয়ে আঙুলের দাগগুলো দেখিয়ে যোগেশ্বর বলেছিলেন—মারলে।

—কে?

—আন্টি।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে যজ্ঞেশ্বর তার গালের দাগগুলো দেখে ঘোড়াটার লাগাম পথের ধারে একটা গাছের ডালে আটকে দিয়ে চাবুকটা হাতে করে হন হন করে জুতোর শব্দ তুলে বিবিমহলের ছত্রিঘরের দিকে উঠে গিয়েছিলেন। এবং রক্তচক্ষে মেমসাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন—যোগেশ্বরকে এমন করে মেরেছ কেন? হোয়াই?

চমকে গিছলেন মেমসাহেব। দেবেশ্বরও চমকে ছিলেন। কিন্তু করতে কেউ কিছু পারে নি। যজ্ঞেশ্বর নিজের হাতের চাবুক দিয়ে মেমসাহেবের পিঠে আঘাত করে বলেছিল—এইটে বুড়ো আঙুলের দাগের জন্যে, এইটে তর্জনীর দাগের জন্যে, এইটে মধ্যমার দাগের জন্যে, এইটে—

ততক্ষণে দেবেশ্বর উঠে এসে যজ্ঞেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

যজ্ঞেশ্বর চারবারের বার চাবুকটা তুলে আর নামান নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাবুকটা হাতে নিয়ে পিছন ফিরে যেমন হন হন করে গিয়েছিলেন তেমনিভাবেই চলে এসেছিলেন।

দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন, যেন পাথর হয়ে গেছেন।

এর পরের ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত। মেমসাহেব বলেছিলেন—তোমাকে এর জন্য খেসারত দিতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—দাঁড়াও। দয়া করে আধ ঘণ্টা সবুর কর। বলেই হুকুম দিয়েছিলেন, কোচম্যানকে বল গাড়ী আনতে। যত তাড়াতাড়ি হয়।

আর একখানা কাগজে স্লিপ লিখে ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়েছিলেন, পাঁচ হাজার টাকা এখুনিই পাঠিয়ে দিন। আমার নিজের নামে খরচ পড়বে। হাওলাত লিখবেন। টাকাটা পরে দেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ীতে করে মেমসাহেবকে নিয়ে তিনি কলকাতা রওনা হয়ে গিয়েছেন।

* * *

এ টাকা সেই টাকা। কথাটা শিবেশ্বর তাঁকে পত্রে লিখেছিল, কিন্তু তিনি সে-সব পত্র খোলেন নি। এখানে এসে প্রথম নাতির কাছে শুনেছেন। সেই কারণে যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে যান নি দেবেশ্বর নদীর ঘাট পর্যন্ত এবং যজ্ঞেশ্বরও ঠাকুরদাকে অভ্যর্থনা জানাতে নাট-মন্দিরে নামে নি, আগের রাত্রি থেকে শরীর খারাপের অজুহাতে উপবাস করে শুয়ে ছিল। ঠাকুরদা ঘরে এলে সে কেঁদেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতে শুরু করেও বলতে পারে নি, বলেছিল—বড়কাকা তো তোমাকে লিখেছিল। তুমি তো তার উত্তর পর্যন্ত দাও নি।

ঠাকুরদা বলেছিলেন—চিঠি এক ম্যানেজারের ছাড়া আর কারুর চিঠিই খুলে পড়ি নি আমি। শুধু তোমাদের কুশলেই খুশী ছিলাম ভাই। দেবেশ্বরের বিরুদ্ধে শিবেশ্বরের অভিযোগ, শিবেশ্বরের বিরুদ্ধে দেবেশ্বরের, কি দেবেশ্বরের বিরুদ্ধে তোমার, এ সব পড়ে তীর্থযাত্রার আনন্দ, পুণ্য এসব আমি তেতো করতে চাই নি ভাই। আচ্ছা আমি শুনব সব, শিবেশ্বরের কাছে।

শিবেশ্বর মুখে কিছু বলেন নি, তাঁর লেখা না-খোলা চিঠির ভেতর থেকে সেই চিঠিখানা বের করে হাতে দিয়ে বলেছিলেন,—পড়ে দেখুন।

পড়ে দেখে খাতার খরচটায় একটা চিহ্ন দিয়ে রাখছিলেন রত্নেশ্বর রায়, কিন্তু শিবেশ্বর বলেছিলেন—টাকাটা দাদা কলকাতা থেকে এসেই শোধ করে দিয়েছেন, জমা আছে পরে। তবে আরও টাকা তিনি নিয়েছেন এবং মামলা-সেরেস্তার ডিক্রী দরুণ প্রাপ্য টাকা উনি ছেড়ে দিয়েছেন। তা সব দেখতে পাবেন খাতায়। এবং এ ছাড়া আট হাজার টাকা দিয়ে একখানা বাংলা খবরের কাগজ বের হচ্ছে, তার শেয়ার কিনেছেন। এটাও আপনাকে বিবেচনা করে দেখতে বলি। খবরের কাগজ থেকে লাভ কখনও হয় না। যারা ও থেকে লাভ করতে পারে, তাদের জাত আলাদা। আবার যেসব বড় বড় জমিদার কাগজ বের করে শখ ক'রে, লোকসান দেয়, তাঁরা হলেন বড় বড় জমিদার, জোড়াসাঁকের ঠাকুরবাড়ীর মত বড় তাঁরা।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ!

* * *

মেমসাহেবের কথাটা তিনি জানেন, শুনেছেন, এই তথ্যটুকু জানিয়ে রত্নেশ্বর রায় বললেন—ও আমি জানি, শুনেছি। ও কথা থাক। ও আলোচনা থাক। কিন্তু—তুমি আট হাজার টাকা দিয়ে খবরের কাগজের শেয়ার কিনেছ কেন?

—আপনার আপত্তি হবে এটা ঠিক বুঝতে পারি নি আমি। আমাদের দেশে ইংরেজ রাজা হয়ে বসে আছে, থাকল, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। হতেও পারে না। তাছাড়া প্রজারও বলবার কথা থাকতে পারে। থাকতে পারে নয়, থাকেও। আমার এক বন্ধুর

কাগজ, কাগজ ভালই চলে ; হঠাৎ একটা মামলায় পড়েছিল বলেই শেয়ার বিক্রী করলে। সেটা কিনেছি আমি।

—কিন্তু পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় আমরা, জমিদারেরা বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী স্বীকার করেছি—

—আমি জানি সে সব। তারপর অনেক কাল চলে গেছে। জমিদারদের অধীনে রায়তদের সঙ্গে সাবেক টেনেন্সী এ্যাক্টের কত বদল হল। জমিদারদের ক্ষমতা কত খর্ব হয়ে গেল। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের পর পত্তনী আইন হল। সুতরাং কোন শর্তই চিরস্থায়ী নয়। তাছাড়া আমার জন্যেই তার পুরনো সাপ্তাহিক কাগজখানা উঠে গেল।

—তার মানে ?

—আমি কয়েকটা লেখা লিখেছিলাম। যার জন্যে তার কাগজ গবর্নমেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল। আমি এখানকার রাজকর্মচারীদের বিশেষ করে ব্যবসাদার ইংরেজদের কঠিন সমালোচনা করেছিলাম। বলতে গেলে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের হুকুমেই দেশ চলে। ইংলিশম্যান স্টেটসম্যান মারফতে হুকুম তৈরী করে। বিলেত থেকে তাই পাস হয়ে আসে। আমাদের কাগজের মধ্যে বেঙ্গলী আর অমৃতবাজার। বেঙ্গলীর সুরেনবাবুর সঙ্গে আমার খুব বনে না। অমৃতবাজারে মতিলালবাবু, শিশিরবাবু আমাকে ভালবাসেন, আমিও শ্রদ্ধা করি ওঁদের, কিন্তু নিজের কাগজ না হলে অন্তত নিজের ইচ্ছেমত লেখা যায় না। আমার কয়লার ব্যবসা আজ এক বছর ধরে এক রকম অচল হয়ে রয়েছে। না থাকলে এস্টেট থেকে টাকা আমি নিতাম না। বেশ আপনার অমত যখন, তখন ও টাকাও আমি ফিরে দেব এস্টেটকে।

রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—সেইটেই ভাল বলে মনে করি আমি। কারণ শিবেশ্বরের এতে আপত্তি আছে।

এ কথার উত্তর দেন নি দেবেশ্বর, কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নতদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেছিলেন—তাহলে আমি কালই কলকাতা চলে যাব।

চমকে উঠে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কালই ?

—হ্যাঁ। বিলম্বে তো অকারণ সময় নষ্ট। আমার বিজনেসটা শুধু নামে দাঁড়িয়ে আছে, চালু করা প্রয়োজন। হয়তো কোন ল্যাণ্ড বিক্রী করে দেব, দিয়ে কাগজ বের করব, প্রিণ্টিং প্রেস করব।

—কয়লার জমি বিক্রী করবার আগে আমাকে জানিও।

—আপনি কিনবেন ?

—কিনব।

—বেশ জানাব আমি। বলে উঠে চলে গিয়েছিলেন দেবেশ্বর।

সন্ধ্যায় রায়বাহাদুরের চাকর এসে তাঁকে জানিয়েছিল, কর্তা একবার হুজুরকে স্মরণ করেছেন। দেবেশ্বর হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে বসেছিলেন। চাকরটার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন—বল গে, যাচ্ছি। একটু পরে।

কিছুক্ষণ পর দেবেশ্বর এসে সামনে দাঁড়ালেন। রত্নেশ্বর বললেন—বস। একটা কথা

তোমাকে বলা প্রয়োজন। যজ্ঞেশ্বর আমার কাছে এসেছিল। সে আমায় বলে গেছে তোমায় জানাতে যে, সে তোমার সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক।

—অনিচ্ছুক! একটু চুপ করে থেকে বললেন—সে কথা আমাকে বললেই সে পারত।

—পারত। কিন্তু তা করে নি। আমার মনে হয় তাতে সে অন্যায় করে নি। আমি পর নই।

—না, আমি তা বলছি না। তবে তার কোন আশঙ্কার হেতু তো ছিল না, কারণ সে যখন বার্বারাকে চাবুক মেরেছিল, তখন আমি তাকে কিছু বলি নি।

—তা বল নি। তবু তার আশঙ্কা স্বাভাবিক। হয়তো তুমি এর পর তার উপর তুষ্ট থাকবে না।

—বেশ, সে এখানেই থাকতে পারে। আমি উমা আর যোগেশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় যাব।

—ওরাও এখানে থাকলে ভাল হয় না?

—ওরাও কি কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ, বউমারও ইচ্ছে নয় যে উনি এখান থেকে যান।

—ভাল, আমিই একলাই যাব।

বলে মাথা হেঁট করে বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি উঠে চলে এসেছিলেন এবং কীর্তিহাট থেকে স্টেশন পর্যন্ত কয়েক ক্রোশ পথ তিনি ভোরবেলা উঠে পায়ে হেঁটে চলে এসেছিলেন। চাকরকে বলে এসেছিলেন, তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতা ফিরতে। সকালবেলা উঠে খবরটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী জুতিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর। সে গাড়ীও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

রায়বাহাদুর বলেছিলেন—উত্তম।

নাতিদের ডেকে বলেছিলেন—এর জন্য আমার সম্পত্তির তোমাদের বাবার অংশ তোমাদের দিয়ে যাব। শুধু তাই নয়, তোমাদের তিন ভাগের এক ভাগ পাঁচ আনা ছ গণ্ডা দু কড়া দু ক্রান্তির বদলে ছ আনা দিয়ে যাব। বাৎসরিক ষাট হাজার টাকা আয় হলে এক আনায় প্রায় চার হাজার টাকা হবে; বিশ গুণ পণে তার দাম অন্তত আশী হাজার টাকা।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রায়বাড়ীর এক আনা সম্পত্তির আয় বছরে চার হাজার টাকা, ষোল আনায় চৌষট্টি হাজার টাকা। এর বাইরে আছে বারো বারো চব্বিশ হাজার টাকার দেবোত্তর। জমিদারী মুনাফার একসময় কুড়ি গুণ পণ ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড দাম। একেবারে গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডের মত ফিক্সড। গিনির দামের মত দাম তার বেড়েছে কিন্তু কমে নি কখনও। তবে স্বত্ব পত্তনী বা দরপত্তনী হলে তার দাম কম হত নিশ্চয়। রায়দের সম্পত্তির যে-অংশটা ব্যক্তিগত, তা সবটাই পত্তনী বা দরপত্তনী। জমিদারী বা পত্তনী যেটা মূল স্বত্ব—সেটা দেবতার নামে কেনা, সেটা দেবোত্তর। সেই হিসেবে রত্নেশ্বর রায় বড় নাতিকে যে বললেন—এক আনা অংশ আমি বেশী দেব, তার দাম পনের গুণো দরে হয় ষাট হাজার—দশ গুণো পণে হয় চল্লিশ হাজার; গড় করে নিলে দাঁড়াবে পঞ্চাশ হাজারে। ডি এল রায়ের

সাজাহান নাটকে আগ্রা কেল্লায় বন্দী শাজাহান হিন্দুস্থানের মসনদ আর মুকুটের লোভ দেখিয়েও মহম্মদকে পিতৃদ্রোহী করতে পারেন নি। সেটা নেহাৎ কবি-কল্পনা নাও হতে পারে। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর রায়ের ক্ষেত্রে সেটা কবি-কল্পনা বা অবাস্তব। বাবার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করে কীর্তিহাটেই থাকতে রাজী হয়েছিলেন। এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিষয়কর্ম বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন দাদুর কাছে।

পিতার কাছে পুত্রের মূল্য আর পুত্রের কাছে পিতার মূল্য ওই পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছে ছোট হয়ে গেল।

দেবেশ্বরের মত দুর্ভাগা আমি দেখি নি। অথবা এমন আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মপরায়ণ রায়বংশে কেউ জন্মায় নি।

মাটির উপর মানুষ জন্মেছে বলেই মাটির দাম আছে। মাটি নিয়ে কেনা-বেচা মানুষেই করে। অনেকটা মাটি কোনরকমে দখল করে তাকে হাসিল করে তার দাম বাড়ায়। মানুষেরা এসে বসবাস করে প্রজা হয়। যে-মাটির উপর মানুষ নেই, সে-মাটির দাম নেই, তার নামও কেউ করে না, শোনে না। সেই মাটির দাম যখন মানুষের চেয়ে বেশী হয়ে ওঠে, তখন মাটি ব্যঙ্গ করে হাসে না কিন্তু মানুষের দুঃখ-দুর্গতির বাকি থাকে না।

কথাগুলো আমার নয়, দেবেশ্বর রায়ের। তিনি কথাগুলি বাপকে লিখেছিলেন, লিখেছিলেন—সংসারে লোকে দুঃখের মধ্যেও পরম সুখে থাকে, সংসারের আনন্দে। পিতা পুত্রের মুখ চাহিয়া থাকে, স্বামী স্ত্রীর মুখ চাহিয়া থাকে। আপনি অর্থমূল্যে আমার সব কাড়িয়া লইলেন। রায়বংশের চরম অপরাধ আপনি করিয়া গেলেন। বাল্যকালে আমার মনে পড়ে কালীপূজায় কলিকাতার যাত্রায় নরমেধ যজ্ঞ পালা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে পুরাণের কোন রাজা নরকস্থ পিতার মুক্তির জন্য নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য একটি অতি-দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে প্রচুর স্বর্ণ দিয়া লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের তিন পুত্র, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় পুত্র বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াও মুখে বলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র আমার প্রিয়—দিতে পারিব না, ব্রাহ্মণী কনিষ্ঠপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, মধ্যম পুত্র পিতামাতার কথোপকথন শুনিয়া অত্যন্ত বেদনার্ত চিত্তে আমাকে তো কেহ চাহে না বলিয়া স্বেচ্ছায় রাজার লোকের নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলন—আমি যাইব, আমার মূল্যের স্বর্ণ আমার পিতা-মাতাকে দান করুন। মনে আছে সে-পালা দেখিয়া শিবেশ্বর ক্রন্দন করিয়াছিল। বলিয়াছিল—আমাকে কেহ ভালবাসে না। আপনি আমাকে কোন মূল্য না দিয়াই আমার স্ত্রী-পুত্র সংসার সব কাড়িয়া লইলেন। মরুভূমি, যেখানে মানুষ বাস করে না, সেখানকার জমির কোন দাম নাই। মাটির দাম মানুষের জন্য। মানুষই বেচে, মানুষই কেনে। সেই মাটির দাম মানুষের চেয়ে বেশী হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশটাই দ্বিতীয়বার অভিশপ্ত হইল। আমি অভিশাপে বিশ্বাস করি না। আপনি করেন বলিয়াই লিখিতেছি। নারীর জন্য সর্বনাশের অভিশাপ যদি আমা হইতে হয়, তবে সম্পত্তি এবং অর্থের জন্য রায়বংশ সকল হীন কর্মই করিবে—ইহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। চরম অধঃপতনে নামাইয়া দিলেন। বুকের ভিতরটা

নীরেট পাথরের মত জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। ইচ্ছা করিলে আমি মকদ্দমা করিতে পারি বা পারিব। হাইকোর্ট প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্তও চলিতে পারে কিন্তু তাহা আমি করিব না।

রত্নেশ্বর রায় উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি তোমার পুত্র অপহরণ করি নাই। তুমি তোমার পিতার বক্ষে শেলাঘাত করিয়া বিরোধ করিয়াছ। অদ্যাবধি শরাঘাত করিতেছ। দেখিয়া তোমার পুত্র শিক্ষা লইয়াছে; সে আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে মাত্র। আমি স্নেহবশতঃ তাহাকে তোমার আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছি, যতদিন বাঁচিব ততদিন করিব। ষোল বৎসর বয়সে তুমি আমাকে যে-দুঃখ দিয়াছ, তাহা অপেক্ষা সে অধিক দুঃখ দিয়াছে কি ?

উত্তরে এবার একছত্র মাত্র লিখেছিলেন দেবেশ্বর—"আমি আপনার অবাধ্য হইয়া যাহা করিয়াছিলাম, তাহার জন্য আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম—যজ্ঞেশ্বর বলিতে গেলে আমাকেই চাবুক মারিয়াছে। আপনি তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করিলেন। এ-বিষয়ে আর আমি কোন পত্রালাপ করিব না। এইখানেই শেষ হইল।"

এরপর তিনি নতুন করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন দিয়েছিলেন। সেই কয়লার খনির জন্য কেনা জায়গাগুলি পড়েই ছিল, অধিকাংশই যার অযোগ্য মনে হয়েছিল, তারই মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল উৎকৃষ্ট কয়লার জমি। জায়গাটা বরাকরে। জমিদার কাশিমবাজারের রাজ-এস্টেট। তখনও রাণী স্বর্ণময়ীর আমল। দেবেশ্বর রায় আরও জায়গা সেখানে বন্দোবস্ত নিয়ে দস্তুরমত ক্লাইব স্ট্রীটে আপিস খুলে বসলেন। কালের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আফিস কোয়ার্টারে বড় বড় বাড়ী উঠেছে, গ্যাসের আলো হয়েছে। কলকাতায় সম্পত্তির দাম বেড়ে গেছে তিনগুণ চারগুণ। দেবেশ্বর কলিয়ারী ডেভেলপমেণ্টের জন্য জানবাজারের বসতবাড়ী বন্ধক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার যোগাড় করলেন। ওই বরাকর অঞ্চলের কয়লার খনির কাজে দুপুরুষ ধরে তারা কাজ করে আসছে। পরনে ন-হাতি ধুতি, গায়ে পিরান, কয়লার কুঠীতে প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন গরুরগাড়ীর ঠিকাদার হিসাবে। খনির মুখ থেকে কয়লা রেল-সাইডিংয়ে চালাই করবার জন্য গাড়ীর যোগান দিতেন। তা ক্রমে ক্রমে কয়লাকুঠীর—বিশেষ করে ও অঞ্চলের কয়লাকুঠীর সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাঁদের নিবিড় পরিচয়। কয়লার কুঠীতে বসে থেকে তাঁরা খনি তৈরী করবেন, চালাবেন, কলকাতায় বসে দেবেশ্বর কলকাতার আপিস চালাবেন। এই বন্দোবস্ত করেছিলেন। দেখতে দেখতে বছর-তিনেকের মধ্যে রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানী কলকাতায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ওই বরাকর সিমের কয়লার জন্যে।

কয়লার খনির ইতিহাস যদি খুঁজে দেখ সুলতা, তবে দেবেশ্বর রায় আর মহাদেব চক্রবর্তীর নাম খুঁজে তুমি পাবে—তার সঙ্গে পাবে বরাকরের বেগনিয়া সিমের কয়লার উল্লেখ। তার সঙ্গে ঝরিয়ায় পাবে শুরাটার কলিয়ারীর একটা বিশেষ সিমের নাম। পশ্চিমে এডেন হয়ে বিলেত, এদিকে সিংগাপুর-হংকং পর্যন্ত জাহাজে কয়লা চালান করতে শুরু করেছিলেন। কলকাতার আপিসে সায়েব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেখেছিলেন—কয়লার কুঠী দেখবার জন্যে সায়েব জেনারেল ম্যানেজার রেখেছিলেন; কলকাতার বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীর আপিসে বড়-সাহেবদের সঙ্গে বন্ধুর মত অন্তরঙ্গতা ছিল—হ্যালো চার্লি বলে হাত বাড়িয়ে দিতেন। তারাও

হেসে সবিস্ময়ে বলত—রয়! হোয়াটস দি নিউজ?

—আই থিঙ্ক ভেরী এনকারেজিং সামথিং; সো আই থট আই শুড কাম টু ইউ মাইসেলফ্ টু এক্সটেণ্ড মাই ইনভিটেশন টু এ গার্ডেন পার্টি ইন দি ইভনিং। ইউ মাস্ট কাম।

—গার্ডেন পার্টি! নচ-গার্লস উইল বি দেয়ার?

—সার্টেনলি, গার্লস উইল বি দেয়ার, বাট নট নেটিভ নচ-গার্লস দিস টাইম। এ্যাংলো গার্লস টু কীপ কম্পানি।

এইভাবেই সেকালের সমুদ্রে বাণিজ্য-তরী চলতো সুলতা। শুধু সেকালেই আর এ-দেশেই বা বলি কেন, সব কালেই সব দেশেই বোধ হয় বাণিজ্যতরী এইভাবেই চলে। সে শ্রীমন্ত সদাগরের বাপ ধনপতির আমল থেকে দেবেশ্বরের আমল পর্যন্ত।

দেবেশ্বর রায় বলতেন—শুধু বাণিজ্যতরী নয়, জীবনতরীই চলে এইভাবে। প্রকৃতির হাতছানিতে পুরুষ যেভাবে এসে জোটে, সেইভাবে জীবনের সব চলে। নারী-ভূমি-অর্থ চিরকাল টেনে আনছে। চিরকাল। তার মধ্যে নারীই প্রথম। রামায়ণে সীতা, মহাভারতে দ্রৌপদী, ট্রয়ে হেলেন, চিতোরে পদ্মিনী; দুনিয়ার যত আনটোল্ড, আনরিটন ইতিহাস এবং ইতিকথা খুঁজে দেখ, প্রতি মানুষের জীবনেই এই।

উয়োম্যান ইজ দেয়ার ইন দি ডেপ্থ। তারই জন্য ইউ ওয়াণ্ট এ হোম। হ্যাট হোম ইজ সুইট, দি সুইটেস্ট প্লেস ইন দি ওয়ার্ল্ড ওনলি ফর হার। ইউ ওয়াণ্ট এ কিংডাম ফর হার। ইউ ওয়াণ্ট টু মেক হার এ কুইন। শী ইজ এ উইচ। সে তোমাকে মুগ্ধ করে তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে—প্রকৃতি পুরুষের বুকে চড়ে নাচে। ওয়াণ্ডারফুল হ্যাটস হোয়াই ম্যান ফট উইথ উয়োম্যান। পুরুষ উইথ প্রকৃতি। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই পুরুষ সাধনা করে পলিগেমাস নেচারকে ডেভেলপ করেছে। তার পলিগেমাস নেচার তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে। মাকড়সার জীবন দেখো। হ্যাভ ইউ সীন এ স্পাইডারস্ লাইফ চার্লি? ট্রাই টু সী। ভেরি ইণ্টারেস্টিং। দি ফিমেল স্পাইডার ইটস্ দি মেল স্পাইডার এ্যাজ সুন এ্যাজ দেয়ার এনজয়মেণ্ট ইজ কমপ্লিট। বাট ম্যান হ্যাজ টেকন রিভেঞ্জ। হি ইজ দি মাস্টার নাও।—তার সঙ্গে সে প্রভুত্ব পেয়েছে মাটির উপর—মেটিরিয়েলসের উপর।

চার্লি সাহেব মস্তবড় সায়েব কোম্পানীর কলকাতা আপিসের জেনারেল ম্যানেজার। ব্যবসাবুদ্ধিতে কয়লাখনির ভালমন্দতে খুব বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু এসব তার মাথায় ঢুকত না। অবাক হয়ে শুনত। হেসে উড়িয়ে দিতেও পারত না। কারণ গার্ডেন পার্টিতে মধ্যে মধ্যে মিস্টার রায় শেক্সপীয়র আবৃত্তি করতেন। গান করতেন প্রতি পার্টিতে। বাংলা, হিন্দী, এমন কি খাঁটি ইংরিজী সুরে ইংরিজী গানও গাইতেন তিনি, শোনাতেন মধ্যে মধ্যে। চার্লি মুগ্ধ হয়ে বলত—এ চার্মিং ম্যান। ওয়াণ্ডারফুল!

সে-আমলের পলিটিক্স্ তা-ও করেছেন। ইংরিজী কাগজে চিঠি লিখতেন ছদ্মনামে। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি।

* * *

কিছুদিন পর বাপ চেষ্টা করেছিলেন ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘোরাতে। কিন্তু ঘোরেন নি

তিনি। রত্নেশ্বর রায় পুত্রবধূকে নিয়ে এসেছিলেন নিজে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবেশ্বর আপিসে খবর পেয়েছিলেন—বাবা এসেছেন বড় পুত্রবধূকে নিয়ে। তিনি আপিস থেকেই উধাও হয়েছিলেন। দিন-চারেক পর পুত্রবধূ বলেছিলেন—বাবা, আপনি ফিরে যান।

—তুমি?

—আমি থাকব। একটু থেমে থেকে বলেছিলেন—যোগেশ্বরকেও নিয়ে যান। আপনার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।

—না মা। তোমায় আমি ফিরিয়েই নিয়ে যাব। আমার হতভাগ্য ছেলে তোমার মর্যাদা বুঝলে না, কিন্তু একদিন এর জন্য ওকে অনুতাপ করতে হবে।

পুত্রবধূকে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন।

খবর পেয়ে দেবেশ্বর রায় বাগানবাড়ীর আসর ভেঙেছিলেন। দিন-তিনেক পর সকালবেলা এসেছিলেন শিবেশ্বর। সকালবেলা ভিন্ন দেবেশ্বরের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত। আপিসে দেখা হতে পারে কিন্তু সেখানে এসব বলা যায় না। তাছাড়া এখানে দেবেশ্বর রায়ের তৃতীয় মেজাজ বের হয়। খাঁটি এক সায়েবী মেজাজ।

মোম দিয়ে মাজা ও পাকানো গোঁফে অকারণে বাঁ হাতের আঙুল অতি সন্তর্পণে বুলিয়ে কপাল কুঁচকে অন্যমনস্ক ভাবে কথা বলতেন। ছোট ছোট দু-চারটে শব্দে গড়া বাক্য। তার বেশী নয়। এবং হঠাৎ টেবিলে রাখা ব্লটিং-পাডের কাগজ রেখে কিছু লিখতে শুরু করে দিয়ে বলতেন—এক্সকিউজ মি প্লিজ! কাম সাম আদার টাইম। কিম্বা আই হ্যাভ নাথিং মোর টু সে। তাই সকালেই গিছলেন শিবেশ্বর।

শিবেশ্বর অনুযোগ করে বলেছিলেন—তুমি এত বড় হৃদয়হীন তা জানতাম না। তুমি বউদির সঙ্গে দেখা করলে না? বাবার সঙ্গে যা করলে ছিঃ!

চুপ করে থেকেছিলেন দেবেশ্বর। অর্থাৎ অনুযোগ মেনে নিয়েছিলেন, যেটা দেবেশ্বরের পক্ষে অস্বাভাবিক। একটু পর বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমি অপরাধী। কিন্তু কি করব? দ্যাট টাইর‍্যান্ট—আমাদের বাবার জীবনের যত চেপে রাখা ক্ষুব্ধ প্রকৃতিগুলো উনি আমাকে দিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন। হি ইজ রেসপনসিবিল। শিবেশ্বর, উনি বলেন—রায়বংশের উপর অভিশাপ আছে। সেটা আমি মানি নে। কিন্তু এটা মানি যে, ওঁর সাপ্রেসড হাঙ্গার, কৃচ্ছ্রসাধনে চাপা প্রবৃত্তি খোঁচা-খাওয়া সাপের মত আমার বুকে বিষ ঢেলেছে। আমার অপরাধ জানি, তোমার বউদির কাছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় অপরাধ বাবার। আমি ভালবেসেছিলাম ভায়লেটকে। ভায়লেট অঞ্জনাপিসীর মেয়ে। তুমি জান না, আমি জানি। আমাকে অঞ্জনাপিসী ডেকে বলে গিয়েছিল মরবার আগে, দেবু, এই মেয়েটাকে তুই তোর সেবাদাসী করে রাখিস। সাহস থাকে তো বিয়ে করিস রে। ওকে বাঁচাস। নইলে মেয়েটার হাড়ির ললাট ডোমের দুর্গতি হবে। তাই হয়েছে। ওঃ, তার একটা ছেলে হয়েছিল, সেটাকে পড়াতে চেয়েছি, পড়ে নি। চাকরি করে দিয়েছি, সেখানে ক্রিমিন্যালের কাজ করেছে। ভায়লা এখন মাতাল, কুৎসিত, ওঃ শিবেশ্বর! আমি তার জন্যে দায়ী। আমি ভুলতে পারি

না। কিন্তু আসল দায়ী ভ্যাট টাইর‍্যান্ট। কি ক্ষতি হত, বলতে পার, যদি মেয়েটা—

শিবেশ্বর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন—এসব কথা কানে শোনাও পাপ দাদা। আমি শুনতে পারব না। একটা খবর দিয়ে যাই। বউদি তোমাকে খালাস দিয়েছেন। ভগবানকে আশ্রয় করেছেন। আমাকে আসবার সময় বললেন—ঠাকুপো, তোমার দাদাকে বলো, আমি তাঁকে খালাস দিলাম। যাতে তিনি আনন্দ পান, তাই যেন করেন। তবে নিজের দেহের যত্ন নেন। আমার দাদাশ্বশুরের রক্ষিতা সোফি বাঈয়ের কথা শুনেছি। উনি যদি কাউকে ভালবাসেন, তবে তাকেই যেন রাখেন। সে যত্নটত্ন করবে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দেবেশ্বর বলেছিলেন—না। তাহলে সেটা হবে বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গে ইল্লিসিট কনেকশন। সে হয় না। ঠাকুরদা সোফি বাঈকে ভালবাসতেন আগে থেকে। তাছাড়া সে কালটা ছিল আলাদা। তখন রাজা বা বড় জায়গীরদারদের বাড়ীর পাশে পোষা রাণ্ডীমহল থাকত। সেকাল এটা নয়।

হেসে শিবেশ্বর বলেছিলেন—সে এখনও আছে। নেই কে বললে! তুমি তো কীর্তিহাটে বাস করলে না। আমি বাস করেছি বাবার সঙ্গে; বাবার হয়ে আমাকেই যেতে হয় এখানে-ওখানে নেমন্তন্ন রাখতে। এখনও জায়গীরদারের ছেলে ঘেরা বাগানের মধ্যে, পুকুরের ধারে কৃষ্ণলীলা করে।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তারা বর্বর, আই হেট দেম। বলতে পার, ষোল বছর বয়সে I was mad after Violet—সুতরাং তফাৎ কি! কিন্তু তফাৎ আছে, I loved her; অঞ্জনা-পিসীর কাছে কথা দিয়েছিলাম। অঞ্জনাপিসী, বলছি তো ওকে আমাকে দিয়ে গিছল।

—বেশ তো তাকেই রাখ।

—না তা হয় না।

—কেন? নার্স সাজিয়ে রেখে দাও।

—না-না-না। সে আর ভাবা যায় না শিবেশ্বর। আমি তো তাকে নিয়ে একসঙ্গে মরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা পারে নি। তারপর বাবা তাকে আমার দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে পিক্রুজদের এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন—একটা ছেলে হল। থাক, সে তুমি জান। কিন্তু এটা বোধ হয় জান না, সে ভায়লেট ইজ ওয়ার্স দ্যান এ স্ট্রীট গার্ল; ইভন ওয়ার্স দ্যান গোয়ান গার্লস। ছেলেটা বড় হয়েছে। তার লেখাপড়া হয় নি। তাকে চাকরি দিয়েছি, but he is a criminal—a drunkard—sometimes he is violent. সে যদি মায়ের সূত্র ধরে স্বীকৃতি পায় তবে সে আমার বুকে চেপে বসবে। আমার জন্যে আমি ভাবি নে। কিন্তু সে যদি কোন দিন কীর্তিহাটে গিয়ে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের অপমান করে, তাহলে তাকে গুলী করে মারতে হবে, ভায়লেটকে মারতে হবে, নিজে মরতে হবে।

—বেশ তাহলে আর একটা কাজ কর।

—কি?

—আবার তুমি পছন্দ করে বিয়ে কর। সে কথাও বউদি বলে দিয়েছেন। বললেন—বল না ঠাকুরপো, আমি না হয় ভাঁড়ারে খাটব, রান্নাবান্না দেখব, উনি নতুন বিয়ে করে মাথায়

করে রাখুন। ভারতচন্দ্রের ছড়া আউড়ে বললে—গঙ্গা নামে সতী তার তরঙ্গ এমনি,—

—না। তাও হয় না শিবেশ্বর। বিয়ের কাল এখনও যায় নি। চারটে-পাঁচটা-সাতটা বিয়ে করা যায়। কুলীনেরা বিশ-পঁচিশটা আজও করছে। কিন্তু যারা করে তাদের মধ্যে আমি নেই। দেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কীর্তিহাটে থেকে সেটা ঠিক বুঝতে পার না। এক বিয়ের যুগ আসছে। ব্রাহ্মধর্মের হাওয়া বাঁচিয়ে চল, দেখ নি। তার চেয়েও জোরাল হাওয়া এনে দিয়ে গেল কামারপুকুরের এক প্রায় নিরক্ষর বামুনের ছেলে। তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপকে চমকে দিয়েছে। আমি ওই রাজার ছেলের মত কেষ্ট সেজে কীর্তিহাটে কাঁসাইয়ের পাড়ে বৃন্দাবন লীলাও করতে পারব না, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও আঁকড়ে ধরতে পারছি না। I am doomed, শিবেশ্বর। শ্যামাকান্তের উপর যে অভিশাপ তাই হোক, আর না হয় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের কৃচ্ছ্রসাধনের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরা প্রবৃত্তি হোক যার জন্যেই হোক, আই এ্যাম লাইক এ শুটিং স্টার। এই জ্বালা নিয়ে আমাকে কীর্তিনাশার জলে ডুবে নিভে যেতে দাও। পাপ-অভিশাপের বোঝা নিয়ে আমাকে ভেসে যেতে দাও, হারিয়ে যেতে দাও।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি।

—এগুলো তাহলে ফিরে নিয়ে যাব ?

—কি ?

—বউদিদির কোম্পানীর কাগজগুলো। তিনি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন —ওঁর কাজে লাগাতে বলো। এ নিয়ে আমি কি করব ?

ফিরে দেন নি দেবেশ্বর, নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বলো, নিলাম। আর বলো, আমি যেদিন একলা থাকি, সোবার থাকি শিবেশ্বর, সেদিন আমি বসে-বসে ভাবি, আমি মরে যাচ্ছি কি মরে গেছি, বড়বউ বুকের উপর নীরবে মাথা রেখে পড়ে আছে, আর তার চোখের জলে আমার মরা দেহখানার বুক ভেসে যাচ্ছে। ভাবতে ভাল লাগে, আমার এত অপরাধ সত্ত্বেও সে আমার মরামুখ ধরে বলছে—এ জন্মে পেয়েও পেলাম না, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরেও যেন পাই তোমাকে। এবার যেন পেতে দিও। ধরা দিয়ো।

চোখ থেকে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছিল। শিবেশ্বর চোখে রুমাল দিয়ে উঠে চলে এসেছিলেন।

এসব কথা আমি ছোট মেজঠাকুমার কাছে শুনেছি সুলতা। মেজঠাকুর্দা মধ্যে মধ্যে এই গল্প বলে ছোট মেজঠাকুমাকে পতিভক্তি শেখাতেন।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করে চারটে বাজল।

সুরেশ্বর বললে—কথা শেষ করি সুলতা। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। তবে শীতের রাত তাই ভরসা।

এরপর হঠাৎ একটা মোড় ফিরল, এর বছর দেড়েক পর। ছোট ছেলে যোগেশ্বর একদিন পালিয়ে এল কীর্তিহাট থেকে। সকালবেলা দেবেশ্বর উঠে শুনলেন, যোগেশ্বর এসে বসে আছে বসবার ঘরে। ছোট ছেলে তাঁর প্রিয় ছিল, তার সঙ্গে রুচির মিল ছিল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে,

ইংরিজী ভাল আয়ত্ত করেছিল, চমৎকার ইংরিজী বলত, সেই কারণে বেশী ভালবাসতেন।

দেবেশ্বর উঠে কথাটা শুনেই মুখে খানিকটা জল দিয়েই হন-হন করে এসে ঢুকেছিলেন ছেলেকে দেখবার জন্ম। ছেলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সারারাত্রি জেগে এসেছিল সে। ছেলে তখন অনেক বেড়েছে, ছোট নেই। ষোল বছরে পা দিয়েছে। কিন্তু দেবেশ্বর রায় শুধু সুকুমার লাবণ্যযুক্ত আর সুপুরুষ ছিলেন না, বলশালী পুরুষ ছিলেন, তিনি ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন।

ছোট ছেলে যোগেশ্বর সেবার এন্ট্রান্স দেবে। সে পালিয়ে এসেছে, দাদু তাদের দুই ভাইয়ের একসঙ্গে বিয়ের আয়োজন করছেন। কিন্তু সে এখন বিয়ে করবে না। কীর্তিহাটও তার পক্ষে অসহ্য হয়েছে। মা দিন-রাত ঠাকুর নিয়ে আছে আর ভাগবত নিয়ে আছে। আপন মনে কথা বলে। লোকে বলে মাথা খারাপ হয়েছে। দাদা ঠাকুরদার সঙ্গে কাছারী করে। কাকা মামলা-সেরেস্তা দেখে, থিয়েটার করে। কাকীমার বারো মাস অসুখ। সব ভার চাকর আর ঝিয়ের। তার ভাল লাগে নি, সে পালিয়ে এসেছে।

উৎসাহিত হয়েছিলেন দেবেশ্বর রায়। পরের দিনই সমারোহ করে ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, স্কুলে নয়, বাড়ীতে; তার জন্ম তিন-তিনজন মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন। আল-মারীভর্তি বই এনে ঘর বোঝাই করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শান্ত এবং সংযত হয়েছিলেন দেবেশ্বর। রায়বাহাদুরের লোক এসেছিল যোগেশ্বরকে নিতে, কিন্তু দেবেশ্বর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এর পরই বাপের কাছ থেকে পেলেন শেষ আঘাত। সেদিন শিবেশ্বর এসে উপস্থিত হলেন। শিবেশ্বর মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসে, কিন্তু সে ওঠে গোয়াবাগানের বাড়ীতে। রামেশ্বর ল' পড়ে, সেও থাকে ওই বাড়ীতে। কখনও-সখনও আসে সে। কিন্তু শিবেশ্বর আসে না। এবার শিবেশ্বর এল, দেখা করতে; তাতে দেবেশ্বর রায় বিস্মিত হন নি। শুধু ভুরু কুঁচকে উঠেছিল আপনা থেকেই, কিন্তু সেটা পরম বিস্ময়ে পরিণত হল, যখন গাড়ীর ভিতর থেকে শিবেশ্বরের পিছন পিছন নামলেন দেবেশ্বরের কয়লার ব্যবসার পার্টনার। রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানী কলিয়ারী প্রোপাইটারস ও কোল মারচেন্টসের অংশীদার মহাদেব চক্রবর্তী নিজে।

প্রায়ই আসেন চক্রবর্তী; প্রয়োজনে আসতে হয়। তাঁদেরও বাসা আছে এখানে। কিন্তু এবার শিবেশ্বরের পিছনে পিছনে কেন?

চক্রবর্তী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন—কেমন মজাটি হল, দেখেন কেমন? মজা করবার লেগে কিছু বলি নাই আমি। হুঁ।

শিবেশ্বর এবার বললেন—বাবা যজ্ঞেশ্বরের বিয়ের ঠিক করেছেন চক্রবর্তী মশায়ের মেয়ের সঙ্গে।

চক্রবর্তী হা-হা-হা-হা শব্দে হেসে জানবাজারের বাড়ীখানা মুখরিত করে দিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর রায় সমস্ত সম্বন্ধ পাকা করে মেয়ের বাপকে পাঠিয়েছেন, ছেলের বাপকে বলবার জন্যে।

বলেছেন—আমার উপর কথা সে বলবে না। তবু একবার বলা উচিত, বলে আসুন।

শিবেশ্বরের সঙ্গে যান আপনি। খানিকটা কৌতুকও হবে।

দেবেশ্বর স্তম্ভিতও হন নি, বিস্মিতও হন নি ; শুধু তাঁর অংশীদার এবং ভাবী বৈবাহিকের হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে খানিকটা হেসেছিলেন। মত তাঁকে দিতে হয়েছিল। বেয়াইয়ের আরও দাবী ছিল, তাঁর ছোট মেয়ের সঙ্গে যোগেশ্বরের বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু সে হয় নি। দেবেশ্বর বলেছিলেন—না-না, এমন কাজ করবেন না। এ ছেলে আমার বিয়ে দেবার মত নয়। বাজে একেবারে বাজে। তাছাড়া দুই ভাইকে দুই মেয়ে দেবেন, তারপর জামাইরা যদি একজন সামনে থেকে একজন পিছন থেকে আক্রমণ করে আপনার দফা-রফা করে, তখন যে আর বাঁচবার পথ থাকবে না। এটার না আছে জমিদারী বুদ্ধি, না আছে ব্যবসাবুদ্ধি, শুধু বই পড়ে। শুধুই বই। হয়ত বউমাকে আদরই করবে না।

শিবেশ্বর মাথা নিচু করে বসেছিলেন। মহাদেব চক্রবর্তী হা-হা করে হেসে ঘর ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। দেবেশ্বর চুপ করে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। বেয়াইয়ের হাসি শেষ হলে তিনি বলেছিলেন—যজ্ঞেশ্বরের বিয়েতে বাবা মত দিয়েছেন, সেখানে আমার অমতের কোন কারণ নেই।

মহাদেব চক্রবর্তী চলে যাবার পর তিনি বাপকে চিঠি লিখেছিলেন—"আপনি আপনার বড় নাতির বিবাহ শেষ পর্যন্ত একটি বর্বরের গৃহে স্থির করিবেন ইহা আমি ভাবি নাই।"

পিতা উত্তরে লিখেছিলেন—"তোমার ব্যবসা আমি নিরাপদ করিয়া দিলাম। না-হইলে এই চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ তোমার সর্বস্ব উদরসাৎ করিত। মহাদেবের দুইটি কন্যা, ছোটটির সঙ্গে যোগেশ্বরের বিবাহ দিলে ভাল করিতে।"

দেবেশ্বর লিখেছিলেন—"ভারতবর্ষের ইতিহাসে গোলকুণ্ডার কথায় পড়িয়াছি, শাহজাদা ঔরংজীব গোলকুণ্ডার সুলতানের রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য গোলকুণ্ডার সুলতানের এক কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনি যে, কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল আবুল হাসান নামক একজন মাতাল চরিত্রহীন মুসলমান যুবকের, গোলকুণ্ডার সিংহাসন সেই ব্যক্তিই পাইয়াছিল। অদৃষ্টে থাকিলে যজ্ঞেশ্বর একলাই চক্রবর্তীর সব কিছুর মালিক হইতে পারিবে। তবে আমি অবগত আছি যে, মহাদেব চক্রবর্তীর দাদা ভোলানাথের এক পুত্রকে সে পোষ্যপুত্র লইয়া সম্পত্তি তাহাকে দিবে। সুতরাং যোগেশ্বরকে অকারণে কয়লায় কালী ঘাঁটিয়া লক্ষ্মী সন্ধান করিতে দিব না।"

ছেলের বিয়েতে তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু নিতান্তই নিমন্ত্রিতের মত যাওয়া। আগে থেকে লিখেছিলেন—তিনি বিবিমহলে থাকবেন। কারণ লিখেছিলেন যে, তাঁর খাদ্যাখাদ্যের বিচার আদৌ কড়াকড়ি নয়। রোজই মুরগী খান, অবশ্য মুরগী না হলেও যদি বা চলে, মুরগীর ডিম না হলে চলবে না। এবং একটু নিরালা হলেই ভাল হয়। বিবিমহল তাঁর পছন্দমত স্থান।

রত্নেশ্বর রায় সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন ; এমনভাবে সে ব্যবস্থা করেছিলেন যে, দেবেশ্বর রায় অভিভূত এবং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিবিমহলে তাঁকে যিনি অভ্যর্থনা করেছিলেন, তিনি রায়বাড়ীর বড় বউঠাকরুণ উমা দেবী। দেবেশ্বর রায়ের চিরউপেক্ষিতা স্ত্রী। বড় ছেলের বিবাহ, শাশুড়ীহীন সংসারে তিনি জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, তিনিই স্বায়ত্ত কর্ত্রী ; তিনি সব ফেলে

বিবিমহলে দীর্ঘকাল—পাঁচ বছর পর স্বামীকে অভ্যর্থনা করলেন।

দেবেশ্বর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি ?

—হ্যাঁ, আমি।

—বাবার হুকুম বুঝি ?

—না। আমার ঠাকুরের হুকুম।

—তোমার ঠাকুর ?

—হ্যাঁ, গোবিন্দজী। গোবিন্দজী বললেন যে স্বামীকে দেখ গে আগে।

—তাই বললেন ? কথা বলেন নাকি তোমার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ বলেন। হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দেন। মনে-মনে, কানে-কানে বলেন।

প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছেন এই ধরিত্রীর মত সহ্যশক্তিশালিনী মেয়েটি। চাকর এই সময় ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। বড়বউ এগিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—বললাম না, আমাকে ডাকবি, আমি এনে দেব! কেন তুই ডিম ছাড়ালি ? আমি ছাড়াব বলি নি ?

দেবেশ্বর অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তুমি মুরগীর ডিম নাড়বে, ছোঁবে ?

—ছোঁব না ? তুমি খাবে, না ছুঁলে কি করে চলবে ? ঠাকুর পই-পই করে বলে দিয়েছেন। নিজে হাতে ছাড়িয়ে খেতে দিবি। নিজে হাতে। ঘেন্না করবি নি। হ্যাঁ। বাপ রে! বলেন, স্বামীর কাজ না করলেই পাপ।

দেবেশ্বর স্তব্ধ হয়ে বসেই ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর রায়বাহাদুর এসেছিলেন—দেবেশ্বর!

—আজ্ঞে! চমকে উঠে দেবেশ্বর চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। পিতা-পুত্রে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। ছেলে প্রণাম করেছিল। বাপ নীরবে হাত তুলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন— তোমার উপবাস কষ্ট হবে বলে শিবেশ্বরকে বলেছি নান্দীমুখ করবার জন্য। বুঝেছ ?

—হ্যাঁ। ভালই করেছেন।

এর পর মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে রায়বাহাদুর চলে এসেছিলেন।

গভর্মেণ্টের দরবারে রায়বাহাদুর হলে কি হয়, কীর্তিহাটে রত্নেশ্বর রায় রাজা। তাঁর বড়নাতির বিবাহ। উৎসব হয়েছিল বিরাট। বিপুল সমারোহ। আলোতে, বাজীতে, বাজনায়, দানে-ধ্যানে রাজসূয় ব্যাপার, খাওয়ানো-দাওয়ানোতে চোব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় ব্যবস্থা। ক্রমাগত অষ্টাহব্যাপী। নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার নিয়ে এলাহি কাণ্ড। অবশ্য পোষ্যপুত্র হিসেবে রত্নেশ্বরের গদীতে চড়ার সময়ের মত নয়। কিন্তু দেবেশ্বর চতুর্থ দিনে বউভাতের পরই চলে এসেছিলেন।

আসবার সময় স্ত্রীকে বলেছিলেন—আমার সঙ্গে চল।

স্ত্রী বলেছিলেন—ওরে বাপ রে, সে কি করে হবে গো! শ্বশুর কি মনে করবেন ? তাছাড়া আমার ঠাকুর ? ওকে ছেড়ে তো থাকতে পারব না আমি।

—আমাকে পেয়েও থাকতে পারবে না ?

—তা কি করে পারব ? অভ্যেস তো নেই।

—আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব।

—তা নিয়ে যেও না, আমি ভয়ে মরে যাব।

—না। ভয় লাগবে না। আমাকে দেখে তোমার ভয় করে ?

—না। কিন্তু তবু পারব না। ওগো, দয়া করে আমাকে নিয়ে যেও না। আমি যেমন এখানে গোবিন্দজীকে নিয়ে আছি, তেমনি থাকতে দাও। আমি মরে যাব।

তবুও হয়তো জোর করে তাঁকে নিয়ে আসতেন দেবেশ্বর ; তাঁর সংসারী হতে অবজ্ঞাতা স্ত্রীকে ফিরে পেতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, কিন্তু রায়বাহাদুর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। বললেন—তা তো পারব না দেবেশ্বর। এই কুটুম্ব-সজ্জন থাকতে থাকতে বড়বউমা যাবেন, এ শোভা হয় না। লোকে কি বলবে ? তোমার না হয় কাজের ছুতো আছে। তোমার উপরে আমি আছি। ছেলের বিয়ের সব ভার আমার উপর দিয়ে যাচ্ছ—হল, মানালো। কিন্তু তোমার মা নেই, বড়বউমা যাবেন কি বলে ?

চুপ করে রইলেন দেবেশ্বর। একটু পর বললেন—আমি ফিরে আসব নিতে ? চুকে গেলে পর ? এমন কি আমি থেকেও যেতে পারি।

একটু চুপ করে থেকে রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—তুমি থাকলে আমি খুব খুশি হব এবং তোমার কল্যাণ হবে। হয়তো তোমার সঙ্গে তোমার বাপের এবং ছেলের সঙ্গে একটা আপোস হতে পারে। কিন্তু বউমাকে পাঠাবই এ বলতে পারব না। বউমাকে নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। বউমার মাথার গোলমাল হয়েছে বলে লোকে কিন্তু আমি জানি উনি গোবিন্দকে সেবা করে সিদ্ধি পেতে চলেছেন। দেরি নেই। তাঁকে তো পাঠাতে পারব না।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—তাহলে আমি চলে যাই।

—থাকতে যখন পার, তখন থাকাটাই ভাল নয় কি ? তোমার তো অসুবিধা কিছু ঘটছে না। একরকম গুরুর আদরেই তো রাখা হয়েছে। অসুবিধা কিছু ঘটছে তো বল।

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল দেবেশ্বরের। এবার তিনি বলেছিলেন—কিছু অসুবিধা আছে। সেটা ইচ্ছে করলেও দূর করতে পারবেন না। সমাগত প্রজাসজ্জনদের প্রহার দেখছি, দেখে যে কষ্ট পাচ্ছি, তা ঠিক সহ্য করা সম্ভবপর নয়।

—মানে ?

—মানে, শুনেছি সমস্ত মহালে নাতির বিয়েতে চাঁদা মাথট নিয়েছেন টাকায় চার আনা। তার উপর তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে বউমাকে এবং যজ্ঞেশ্বরকে নাটমন্দিরে বসিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করলেন। আপনার অর্থের অভাব ছিল না তবু করলেন। এটা ঠিক আমি—।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় নি সুলতা, কীর্তিহাট থেকে শুধু যোগেশ্বরকে নিয়েই কলকাতা এসে ছদ্মনাম দিয়ে একখানা চিঠি তিনি লিখেছিলেন, সেটা বেরিয়েছিল 'ইংলিশম্যানে'। হেডিং ছিল—"দি ড্রোনস্ অব দি সোসাইটি"। ছদ্মনামটা জানতেন রত্নেশ্বর রায়।

* * *

এরপর আর পিতাপুত্রে দেখা হয় নি। দেবেশ্বর রায় তাঁর মৃতদেহ দেখেছিলেন।

১৯০০ সাল। মাইনটিন্থ সেঞ্চুরী শেষ করে টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীতে পৌঁছেই মারা গেলেন রত্নেশ্বর রায়। খামখেয়ালী দেবেশ্বর রায় এই চার বছরে একটা নতুন পথ ধরেছিলেন। বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে ডেকে কয়লার ব্যবসাতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। এবং নিজে ধীরে ধীরে সরে এসে খানিকটা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন; সেতার, এস্রাজ নিয়ে গান গেয়ে কাটাতেন, কিছুটা পলিটিক্স করেছেন; আর একখানা ভাল কাগজ করবার কল্পনা করেছেন। জীবনে যেন একটা অস্থিরতার মধ্যে পড়েছিলেন তিনি। অস্থির মানুষ চিরকাল। নিত্য প্রতিমুহূর্তে যেখানে মানুষ বদলায়, সেখানে স্থির কি বা কে বল—সুলতা। তবে কিছু কিছু মানুষের অস্থিরতা বড় প্রকট, বড় স্পষ্ট ধরা পড়ে। দেবেশ্বর রায়ের এই সময়ের অস্থিরতা যেন সেই রকম। নইলে ভাবতে পার সুলতা, দেবেশ্বর রায় দক্ষিণেশ্বর যান, বেলুড় মঠে যান। নতুন করে সংস্কৃত পড়েন। কিছুদিন মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ছোট ছেলেকে আমার বাবা যোগেশ্বর রায়কে অহরহ সঙ্গে রাখতেন। আমার বাবা তখন এনট্রান্স, এফ-এ পাস করে বি-এ পড়ছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সবই কিছুদিনের জন্যে। কিছুদিন পর আবার পুরনো দেবেশ্বর রায়। মদের নেশায় গালে, কপালে লালচে আভা ফুটে ওঠে—চোখ লালচে এবং অর্ধ নিমীলিত হয়, মৃদু মৃদু হাসেন অথবা ঠোঁট দুটো মিলে ধনুকের মত ব্যঙ্গে বেঁকে যায়। বাড়ী ছেড়ে বাগানে গিয়ে বাসা গাড়তেন।

কারণ একটা ঘটেছিল, ভায়লেট পিক্রুসের ছেলে, যাকে এলিয়ট রোডের বাড়ী দান করেছিলেন, যে রয় এ্যাণ্ড চক্রবর্তী কোম্পানীতে চাকরি করত, সে মারা গেছে। ভায়লা মদ খেয়ে খেয়ে দুর্দান্ত মাতাল হয়ে পড়েছিল, ছেলের মৃত্যুর পর সে মধ্যে মধ্যে এসে এই বাড়ীর ফটকে এসে চেঁচাতো।

—'রয়বাবু! রয়বাবু!'

তার কণ্ঠস্বর কানে এলেই দেবেশ্বর চীৎকার করতেন—দারোয়ান, নিকাল দো, নিকাল দো। You get out—I say. Shut the gate. দারোয়ান! তারপরই চলে যেতেন বাগানবাড়ী।

এরই মধ্যে ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে কীর্তিহাটের লোক এল চিঠি নিয়ে।

লিখেছেন শিবেশ্বর—"বাবামহাশয়ের কঠিন অসুখ, পত্রপাঠ আপনি চলিয়া আসিবেন। আপনার নাম করিয়া জ্ঞান হারাইয়াছেন। কলিকাতা লইয়া যাইবার অবস্থা নাই। একজন বড় ডাক্তার লইয়া আসিবেন। গোয়াবাগানে রামেশ্বরকে পত্র দিলাম। বিডন স্ট্রীটে যজ্ঞেশ্বরের নূতন বাটীতেও পত্র গেল। সকলকে লইয়া পত্রপাঠ চলিয়া আসিতে অন্যমত করিবেন না। এবং ইহা যেভাবে ঘটিল, তাহা অতীব দুঃখের কথা, আক্ষেপের কথা। বাবামহাশয় লাট ভবানন্দবাটীর কাছারীতে সেখানকার পুনবন্দি সম্পর্কে চাঁদা ধার্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে প্রজাদের সহিত মতান্তর ঘটে, প্রজারা সম্মুখে কিছু বলিতে পারে না কিন্তু শীতকালের রাত্রিকালে কাছারীঘরের চালে অগ্নিসংযোগ করে। ভাগ্যক্রমে

বাবামহাশয় নিরাপদে বাহিরে আসেন বটে কিন্তু শীতরাত্রে ঠাণ্ডায় জ্বরভাব হয়। সেই জ্বরভাব লইয়াই তিনি রাগ করিয়া কীর্তিহাট আসিয়াছিলেন; প্রথমে সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে শীঘ্রই সারিয়া যাইবেন। কিন্তু হঠাৎ জ্বর প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।

পুঃ—হরিশ মুখার্জি রোডে অন্নপূর্ণাপিসিমাকে চিঠি দিলাম।"

বিচিত্র সংঘটন, তখন দেবেশ্বর মধুপুরে গেছেন। কলকাতায় নেই। যোগেশ্বর নিজে মধুপুর গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে এনে হাওড়ায় গাড়ী বদল করে কীর্তিহাটে গিয়ে যখন পৌছুলেন তখন রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর কীর্তিহাটের রাজা—দুষ্টের দমনকর্তা, শিষ্টের শাসক বহুকীর্তিতে কীর্তিমান আর বেঁচে নেই, সকালবেলা মারা গেছেন, শবদেহ নাটমন্দিরে মা-কালীর সম্মুখে রাখা হয়েছে। সকলে অপেক্ষা করে রয়েছেন বড়বাবুর, দেবেশ্বর রায়ের। টেলিগ্রাম এসেছে দুপুর নাগাদ এসে পৌছুবেন, স্টেশনে ষোল বেহারার দুখানা পালকি রাখা হয়েছে।

দেবেশ্বর রায় বেহারাদের বলেছিলেন—মুখ বন্ধ করে যাবি।

—হুজুর, আগের লোকে পথের হাল বলে না দিলে পিছেকার বেহারারা—। চুপ করে গিয়েছিল তারা বড়বাবুর মুখ দেখে।

দেবেশ্বর তাদের বক্তব্য বুঝেছিলেন, আগের বেহারারা পথের অবস্থা না বলে দিলে পিছনের বেহারারা ঠিক চলতে পারবে না। তাদের সামনেটা তো বন্ধ। তিনি বলেছিলেন, তাহলে প্লো হিঁ—হিঁ প্লো হাঁকটা হাঁকবিনে।

শবদেহের পায়ের তলায় বসে দেবেশ্বর রায় গভীর স্বরে বারকয়েক ডাকলেন—বাবা! বাবা! বাবা!—

ডাকতে ডাকতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মত কেঁদেছিলেন বাবার পায়ের উপর মাথা রেখে।

কেউ সান্ত্বনা দিতে পারে নি। দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী উমা দেবী। তিনি সেদিন দশখানা গ্রামের লোকের সামনে স্বামীর দুই কাঁধ ধরে ডেকে বলেছিলেন—ওঠো। বড়বাবু—বড়বাবু ওঠো! ওগো, বাবা তোমাকে ক্ষমা করে গেছেন। শোন শোন, আমাকে নিজে মুখে বলে গেছেন। নিজে চিঠি লিখে দিয়ে গেছেন তোমাকে দিতে। ওঠো। আমার দিকে চেয়ে দেখ; তোমার তো অনেক আছে গো, আমার কেবল তুমি, তুমি তাও আমাকে দাও নি। বাবা আমাকে বলতেন, ভয় কি! আমার দিকে চাও। ওঠো। বাবার শেষ কাজ করে এস। এই চিঠিখানা নাও।

চিঠিখানায় ছেলেকে শুধু ক্ষমা করেই যান নি রত্নেশ্বর রায়, ছেলের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। আরও লিখেছিলেন—হয়তো তোমার কথাই ঠিক। মাতামহ শ্যামাকান্তের অভিশাপ লইয়া যে-বিশ্বাসটা আমাদের বংশে একটা ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হয়তো একটা সংস্কার। তাহা ক্রিয়া করিয়াছে। সম্পদের শক্তির অফুরন্ত তৈলে প্রজ্বলিত অগ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে, তাহাকে আমরা অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। যাই হোক, ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে অপমানকর বটে। পাপ তো বটে। এই পাপচক্র চক্রান্ত সৃষ্টি করিয়া বংশকে পঙ্গু করিতেছে। তুমি ইহা পরিত্যাগ কর। বধূমাতাকে সমাদর কর।

জীবনের স্বাদ পাইবে। শান্তি পাইবে। কল্যাণ হইবে। পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়ো না। ভায়লেটের মাসিক বৃত্তি এবং তাহার পুত্রের যে-বন্দোবস্তাটি আছে, তাহার খরচ যেন বন্ধ না হয়।

পরিশেষে লিখেছিলেন—তুমি মদ্যপানে অভ্যস্ত। অশৌচ অবস্থায় মদ্যপান না করিলে হয়তো স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে। আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।

বিচিত্র বিষণ্ণ একটি হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল।

সুরেশ্বর বললে—এটা অবশ্য আমার কল্পনা, সুলতা। ওই দেখ সেই ছবিখানা। এই দেখ দেবেশ্বরের মুখে সেই বিষণ্ণ বিচিত্র হাসি। প্যানেলে দেখ, বাঁদিকটা কালো অন্ধকারে ঢাকা হতে হতে ফিকে হয়ে লাল হয়েছে, রাত্রির পর প্রভাত হবে, সূর্যোদয় হয় নি, লালচে আভার সবটাই এসে পড়েছে দেবেশ্বরের মুখে। কালো অন্ধকারের মধ্যে নির্বাপিত রত্নেশ্বর রায়ের চিতা। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী শেষ হয়ে গেল। দেবেশ্বর নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীর শেষকৃত্য করে দুফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন। সামনেটা টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীর একশো বছর। দেবেশ্বরের হাতে তুলি—তিনি রায়বংশে তাঁর জীবনশিল্পের পত্তন করতে চাচ্ছেন। হাতের তুলি কাঁপছে।

অজ্ঞান হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত রায়বাহাদুর ডায়রী লিখে গেছেন। শেষ কদিনের ডায়রী অদ্ভুত সুলতা। আশ্চর্য লাগে আমার।

যেদিন রাত্রে কাছারীতে আগুন লাগল, তার আগের দিন হতে প্রজারা কাছারী আসা বন্ধ করেছিল। ব্যাপারটা পুলবন্দীর চাঁদা। নদীর ধারে ধারে বন্যা নিবারণের বাঁধ হবে—সরকার সিকি দেবেন প্রজা সিকি দেবে, জমিদার দেবেন অর্ধেক এই নিয়ম। রায়বাহাদুর বলেছেন প্রজা অর্ধেক দেবে। টাকাটা চাঁদা হিসেবে তিনি আদায় নেবেন। প্রজারা বলেছে—এই সেদিন হুজুরের পৌত্রের বিয়েতে আমরা টাকায় সিকি চাঁদা দিয়েছি আর আমরা দিতে পারব না। কয়েকদিন পর বললে দেব না। সেটা অবশ্য তাঁর সামনে নয়। গ্রামে বাইরে বাইরে। রায়বাহাদুর ডেকে প্রশ্ন করলেন—এইরকম কথা শুনছি। এ সত্যি ?

কেউ উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু এর উত্তর না দিলে ছুটি নেই। রায়বাহাদুর উঠতে দিলেন না কাউকে।

শেষ তারা বললে—আজকের দিনটা সময় দিতে আজ্ঞে হয় হুজুর, কাল দিব উত্তর। খানিক শলাপরামর্শ করি।

ছুটি দিলেন রায়বাহাদুর। ডায়রীতে শেষ লাইন লিখেছেন—"দিনে দিনে দেশকালে কি হইতেছে ? প্রজারা এই ধরনের বেয়াদপি করিতে সাহস করে!"

পরদিন সকাল থেকে গ্রামের সমস্ত পুরুষেরা অনুপস্থিত। কেউ বাড়ী নেই। সকালবেলা জল খেয়ে তাদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু কেউ এল না। ডিসেম্বর মাস, ভরাভর্তি ধান কাটার সময়, লাট ভবানন্দবাটীর চারখানা মৌজা নদীর ধারে, তার কোন গ্রামের মাঠে একটি লোক নেই। সোনার বর্ণ পাকা ধানে ভরা মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী উড়ছে, শীতের উত্তুরে বাতাসে রৌদ্রের সঙ্গে রাত্রের শিশিরভেজা নরম ধান, শুকিয়ে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে,

গোটা মাঠ জুড়ে একটা মুড়মুড় মুড়মুড় শব্দ উঠছে।

সেইদিনই রায়বাহাদুরের হুকুমে সমস্ত গ্রামের গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া ঘরে বন্ধ রইল। ঘর থেকে বের হতে পেলে না। রাখালেরা ফিরে গেল। গ্রামের রাস্তা সরকারী খাসপতিত, জমিদারের জমি, সেখানে বের হতে দেবেন না রায়বাহাদুর। বন্ধ করলেন না পানীয় জল সরকারী পুকুর থেকে। স্নান বন্ধ হল সরকারী পুকুরে। সন্ধ্যেবেলা ঢেঁড়া পড়ল—"কাল সকালবেলা এক প্রহরের মধ্যে প্রত্যেক প্রজা'কে কাছারীতে হাজির হবার জন্য হুকুমজারি করা হচ্ছে। যে-প্রজা হাজির না হবে, তার সরকারী জমি, পুষ্করিণী এবং গাছপালা যা সরকারী পতিতের উপর থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি বাতিল করা হবে।"

এর পরিণাম অতি ভয়ানক স্থূলতা। এ যে না দেখেছে সে বুঝবে না। গরু-বাছুর পথে বের হলে খোঁয়াড়ে যায়, ইচ্ছে করলে বউ-বেটী মেয়েছেলে পথে বের হলে ট্রেসপাসার হত সেকালে। পাকা ফসল মাঠে থাকত, মিলিয়ে যেত। আরও অনেক কিছু হত। তার মধ্যে ঘরে আগুন, লাঠিবাজী, ফৌজদারী নেই স্থূলতা। এসব হল আইনসম্মত শাসনবিধি। কিন্তু ততদূর অগ্রসর হতে পারেন নি রত্নেশ্বর রায়। তিনি জানতেন না যে, কাল তাঁর অজ্ঞাতসারে আরও অনেক এগিয়ে গেছে। প্রজাদের সেই কালই সেই রাত্রেই বোধ হয় খুঁচিয়ে জাগিয়ে এগিয়ে দিয়েছিল—"যা, তার চেয়ে আজ রাত্রি পোয়াবার আগেই কাছারীতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দে। জমিদার বুঝুক তোরাও লড়তে পারিস।"

রত্নেশ্বর রায় তাঁর সেদিনের ডায়রীতে লিখেছেন—রাত্রিতে কাছারীতে আগুন লাগিল। শীতের রাত্রি, প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। পরে যখন লোক-লস্করের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙিল, তখন তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ঘরখানা জ্বলিতেছে। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তৎপর ক্রুদ্ধ হইলাম। দেখিতে দেখিতে মনে পড়িল আর একবার জমিদার দে সরকার আমাকে ঘরে শিকল দিয়া প্রজা হিসাবে পুড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল। রক্ষা করিয়াছিল ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাসের কথা মনে করিয়া অনুশোচনা হইল। কাঁদিলাম। তাহার পর মনোমধ্যে চিন্তান্তরে উপনীত হইলাম। এবং চমৎকৃত হইয়া গেলাম। এবার প্রজারা জমিদারকে ঘরে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া মারিতে চাহিতেছে। আমার মত জমিদারকেও গ্রাহ্য করিল না। কাল কি এতই বদল হইয়া গেল? ইহার পর? ভবিষ্যতে কি হইবে? জমিদারবর্গের সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। আমি চিন্তিত হইতেছি রায়বংশের জন্য। আমার অন্তে মদীয় পুত্রদের কি দশা হইবেক। দেবেশ্বর একসঙ্গে আমীর মেজাজের এবং সাহেবী মেজাজের লোক। প্রজাদের সে ঘৃণাও করে, তাহাদের দয়াও করে। শিবেশ্বর মামলাবাজ এবং শক্তি না-থাকা সত্ত্বেও জবরদস্ত জমিদার হতে চায়। রামেশ্বর কলিকাতাবিলাসী ব্রাহ্মঘেঁষা একটা অপদার্থ বিলাসী। যজ্ঞেশ্বরের সম্বন্ধে আশা করিয়াছিলাম, সে বিবাহ করিয়া শ্বশুরদের সংস্রবে কয়লা ব্যবসায়ী হইয়া গেল। কি করিব অদ্য হইতে তাহাই চিন্তা হইল।

সে-চিন্তার মীমাংসার পূর্বেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মারা গিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

লোকে বলেছিল—ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

দেবেশ্বর মুখাগ্নি করে বাড়ী ফিরে কম্বলের শয্যায় বসে ভাইদের বলেছিলেন—আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। শিবেশ্বর ভেবেছিলেন, বড় ভাই মদ খাবেন। বাপ অনুমতি দিয়ে গেছেন তাঁর শেষ চিঠিতে। চাকরকে তিনি ডেকে বলেই গিয়েছিলেন—বড়বাবুকে মাল দিবি কিন্তু যেন বেশী দিসনে। আর দোহাই বাবা, অখাদ্য-কুখাদ্য যা খায়টায় এর সঙ্গে, ধর না মুর্গীর ডিমফিম সেগুলো যেন চাইলেও দিসনে। অন্ততঃ হুকুম করলে বড়মাকে ডেকে দিস। না—বড়মা কি করবে—আমাকে ডেকে দিস অন্তত। খবরটা দিস বুঝলি!

চাকর তাঁর খাস চাকর নিমাই দাস;—সে কলকাতার মতই ট্রে-তে করে বোতল-গ্লাস-সোডা এনে নামিয়ে দিলে।

তাকিয়ে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। নিমাই চাকর তাঁর নিজের তালিম দেওয়া চাকর। সে তাঁর চাউনির অর্থ বোঝে, কথা বলবার ভঙ্গে মুখ খুললে জানতে পারে এবার কিসের হুকুম হবে। সে তাঁর কোঁচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়ে সভয়ে বললে—আজ্ঞে মেজবাবু বললেন—; কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেবেশ্বর বলেছিলেন—নিয়ে যা। ও আর খাব না। আর কোনদিন আনবিনে সামনে। শোন। যদিই ভুলে গিয়ে আনতে বলি, তবে তুই মনে করিয়ে দিস। যা মাণিকবউকে বল—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসবে। অশৌচের সময় তোর হাতে জল পর্যন্ত খেতে পারব না, বুঝলি!

মাণিকবউ অর্থাৎ উমা দেবী জলের গ্লাস নিয়ে এসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—বাবা তো বলে গিছলেন খেতে তোমাকে। ফিরিয়ে দিলে কেন?

দেবেশ্বর বলেছিলেন—আর কখনও খাব না বলে।

—খাবে না? অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন উমা দেবী স্বামীর মুখের দিকে;—আর কখনও খাবে না?

—না।

—তোমাকে আমি বুঝতে পারি না। ভারী ভয় করে।

—বসো।

—বসবার কি উপায় আছে? যাই দেখি, গোবিন্দমন্দিরের কাজকর্ম আমি করি তো, এবার কাউকে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে করাতে হবে।

—কেন? সেবার যজ্ঞেশ্বরের বিয়ের সময় চব্বিশ ঘণ্টা তো আমার কাছেই থাকতে। মুর্গীর ডিম পর্যন্ত নেড়েছ—

—সেবার গোবিন্দ বলেছিলেন।

—এবার—

—না। এবার তো বলেন নি। বরং মুখ শুকিয়ে গেছে গোবিন্দর, বলছেন—বাবা চলে গেলেন আর কি আমার সেই যত্ন করবে এরা মাণিকবউ? তুমি একটু দেখো। বাবাও বলে গেছেন। কি করব বল?

অকস্মাৎ ফেটে পড়েছিলেন দেবেশ্বর।—তা হ'লে আমি কাকে নিয়ে কার সঙ্গে কথা

বলে থাকব বলতে পার ?

বিব্রত হয়ে মাণিকবউ বলেছিলেন—এ কি বিপদে পড়লাম মা ? আমাকে নিয়ে কি করবে তুমি ? না—না—না। তোমার অনেক আছে। বই আছে, গান আছে, তারপরে লোক আছে জন আছে, বিষয় আছে, ব্যাপার আছে, আমার যে গোবিন্দ ছাড়া আর-কেউ নেই—

—না—আমি আছি। আর আমি ওসব চাইনে, আমি তোমাকে চাই। তুমি বসো। যেতে পাবে না তুমি।

—না—না—না। তোমাকে আমার ভয় করে। আর আমি যে আমাকে গোবিন্দকে সঁপে দিয়েছি। তোমাকেই দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি তো নিলে না। পায়ের তলায় পড়ে কাঁদতাম—কই একদিনও তো দেখ নি। বাবা টেনে এনে এখানে গোবিন্দের হাতে দিয়ে বলেছিলেন—মা, ওই ওঁর পায়ে নিজেকে ঢেলে দাও। কি করব মা! অপরাধ আমার। বিয়ে তো ও করে নি, আমি জোর করে দিয়েছি। আমি তাই আছি। সেবার গোবিন্দ বলেছিলেন—আমি বিবিমহলে তোমার সেবা করেছিলাম। এবার তো বলেন নি। আমি পারব না।

ঠিক এই মুহূর্তেই তুই ভাই এবং ম্যানেজার এত্তেলা পাঠিয়েছিলেন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে তাঁরা আসছেন।

শ্রাদ্ধের কথা প্রায় বাঁধা কথা ছিল সেকালে। দশ দিনে তিলকাঞ্চন সেরে রেখে ছ মাসে সপিণ্ডীকরণের সময় দানসাগর। কিন্তু কথা তা ছাড়াও ছিল। সম্পত্তির কথা। তা ছাড়া আরও একটা বড় কথা তুলেছিলেন শিবেশ্বর। হয়তো সেইটেই রায়বংশের ভবিতব্যের কথা।

শ্রাদ্ধ দানসাগর ছ' মাসে নয়—দশ দিনেই করার কথা হয়েছিল। রামেশ্বর ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত যাবেন। অনুমতি রত্নেশ্বর দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে, প্রয়োজন অনুভব করছিলেন রায়বংশের কারুর বিলেত অন্তত যাওয়া প্রয়োজন, নইলে যেন রায়বংশের সম্মান খর্ব হচ্ছে।

বিষয় তিন ভাগ করে দিয়েই গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। বড় ছেলেকে ছ আনা দিয়ে গিয়েছিলেন পৌত্রদের কাছে প্রতিশ্রুতি মত। এবং নতুন প্রভিশন করে গিয়েছিলেন, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি যা পুত্রেরা পাবে তা থেকে তাঁরা তাঁদের পুত্রদের এক ধর্মান্তর গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন কারণেই বঞ্চিত করতে পারবেন না। সেই মতই ব্যবস্থা হয়েছিল। আদায়পত্র একত্রে হবে। শিবেশ্বর দেখাশুনা করবেন, তার জন্য একটা মাসোহারা পাবেন। মাসে আড়াইশো টাকা, বছরে তিন হাজার।

এর পরই শিবেশ্বর সেই কথা তুলেছিলেন, বাবাকে লাট ভবানন্দবাটীর প্রজারা একরকম পুড়িয়েই মেরেছে। ঘরে আগুন দিয়েছিল। শিকল-তালাও দিয়েছিল। জানালা ভেঙে তিনি বেরিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে মরার সঙ্গে পুড়ে মরার তফাৎ কতটুকু। আমি বলি এ পুড়ে পুড়ে মরাই হয়েছে তাঁর। এর প্রতিকার কি হবে ?

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। উত্তর চট্ ক'রে কেউ দিতে পারেন নি।

কিছুক্ষণ পর দেবেশ্বর বলেছিলেন—বাবা কি করতে চেয়েছিলেন ?

—তিনি ঠিক কিছু করেন নি। তবে—

—তবে কি ?

—ভাবছিলেন দেওয়ানীর পথে যাবেন, না ফৌজদারীর পথে যাবেন।

ম্যানেজার বললেন—ফৌজদারীর পথে একালে হাঙ্গামা অনেক, সে থ'না থেকে ওপর পর্যন্ত মুখ চাপা দিতে দিতে অনেক বেগ পেতে হয়। তার ওপর কাল এমন পড়েছে যে, প্রজার দোষ এ দেখবেই না লোকে, কিছু হলে আগেভাগেই জমিদারকে দায়ী ক'রে ব'সে থাকবে।

শিবেশ্বর বলেছিলেন—তা ব'সে ভয় ক'রে ব'সে থাকলে দু'দিন পর তারা মাথার উপর দিয়ে চলতে শুরু করবে। জমিদারী হয়তো ছেড়ে দিতে হবে।

দেবেশ্বর এবার বলেছিলেন—বাবা ভাবছিলেন কোন্ পথে যাবেন। আমাদের পথের ভাবনা নেই, পথ আমাদের একটি; বাবার মৃত্যুর শোধ। বাবা দেওয়ানীর পথে অবাধ্য দুর্দান্ত প্রজাকে শাসন করবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু আমরা সে ভাবব কি ক'রে ? শোধ তুলতে হলে এ চক্র যারা ক'রেছিল তার লীডার যে তার মাথাটা নিতে হবে। না হলে পিছন থেকে সাপের মত কামড়ে বিষ ঢেলে লুকিয়ে পড়ার মধ্যে আমি নেই। তবে হ্যাঁ, বাবা যদি ক্ষমা ক'রে যেতেন তাহলে আমরা চুপ ক'রে থাকতে পারতাম। অথবা এখনও যদি সে এসে গড়িয়ে পড়ে মাথাটা লুটিয়ে দেয় তবে গলায় খাঁড়া ঠেকিয়ে আমরা ক্ষমা করতে পারি। এই আমার মত। সেইটে হলে আমি খুশী হই। খুন হলে লোকে বলবে—রায়-বাহাদুরকে এমন অপমান বা দুর্দশা কিছু ক'রেছিল যার জন্যে খুন না ক'রে ছেলেদের ঝাল মেটে নি।

* * *

রায়বাড়ীতে ওই সর্বনেশে মামলা ঢুকল সুলতা। এবার মামলা একতরফা নয়। এবার মামলায় প্রতিপক্ষ দাঁড়াল। প্রজারা লড়াই দিলে। ফৌজদারীতে মাঠে লড়াই হল, পথে হল, মোড়ল লোকটা খুন হ'ল, মামলা চলল একটার পর একটা। এক বছর ব'সে রইলেন দেবেশ্বর কীর্তিহাটে। শুধু এই জন্যেই বসে রইলেন! কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। মদ সেই ছেড়েছিলেন আর খান নি। জমিদারী নতুন ধাঁচে চালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে শিবেশ্বরের সঙ্গে বিরোধ বাধল, তার সঙ্গে যোগ দিলেন বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর। তিনি তখন কলকাতায় ব্যবসা দেখেন শ্বশুরের সঙ্গে। অপবাদ রটল পিতৃহন্তাকে সুকৌশলে ক্ষমা করছেন দেবেশ্বর রায়। মরা বাপের উপর শোধ তুলছেন। তার কারণ তিনি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে বলতেন—যথেষ্ট হয়েছে, লোকটাকে এবার মাফ কর। অপবাদ শুনে চমকে উঠে চলে এলেন দেবেশ্বর রায়। জমিদারীর ব্যবস্থা করলেন দুভাগে ভাগ ক'রে। প্রথম অবিভাজ্য দেবোত্তর এস্টেট, তার কমন ম্যানেজার করে দিলেন শিবেশ্বর রায়কে। আর দেবোত্তরের অধীনে পত্তনীদার হিসেবে যে ব্যাপাটা বড়, এবং খাস, যা রায়বংশধরদের ব্যক্তিগত, তা ভাগ ক'রে নিয়ে নিজের অংশের মধ্যে পুরনো

কালের আচার্য দেওয়ান ম্যানেজারের পৌত্রকে ম্যানেজার রেখে কলকাতা চলে এলেন। তখন সম্পত্তিতে তাঁর অংশ সাড়ে আট আনা, রামেশ্বর বিলেত যাবার সময় তাঁর অংশের সম্পত্তি নামমাত্র মুনাফা রেখে দরপত্তনী দিয়ে গেছেন। সেটা দু ভাই-ই নিয়েছেন।

কলকাতায় ফিরে এসে নতুন মানুষ দেবেশ্বর প্রথম দিনই আপিস গিয়ে চমকে গেলেন। কলকাতার আপিসে তাঁর ঘরে তাঁর চেয়ারে বসছেন বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর। রত্নেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর এই কয়েক মাসের মধ্যে পরিবর্তনটা ঘটে গেছে। ব্যবসায় পার্টনার মহাদেব চক্রবর্তী যজ্ঞেশ্বরের শ্বশুর, তিনিই নাকি এ ব্যবস্থা করেছেন। আপিসের স্টাফও বদল হয়ে গেছে। সে বেয়ারা পর্যন্ত।

যজ্ঞেশ্বর বাপকে দেখে চমকে উঠেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—পাখা এখানটায় একটু বেশী পাওয়া যায় সেই জন্যে—।

দেবেশ্বর বলেছিলেন—বসো তুমি। আমি বসব না। আমি চলে যাব ঘণ্টাখানেক পর।

পরদিন এসে চেপে বসে গোটা ব্যবসাটির অবস্থা দেখে তাঁর অংশের প্রাপ্য টাকা বের করে নিয়ে স্বতন্ত্র করে ব্যাঙ্কে মজুত ক'রে বড়ছেলেকে ডেকে বললেন—শোন, কোন বিজনেসের সঙ্গে আর আমি সম্পর্ক রাখব না। ইচ্ছে বিক্রী ক'রে দি, কিন্তু ভেবে দেখলাম—তুমি যখন কাজকর্ম শিখেছ এবং অর্ধেকের অংশীদার চক্রবর্তী যখন তোমার শ্বশুর, তখন ছেড়ে না দিয়ে তোমাকে দেওয়াই ভাল। কি বল?

চুপ ক'রে রইলেন যজ্ঞেশ্বর।

দেবেশ্বর বললেন—একটি শর্তে।

এবার বেশ ধীরভাবেই যজ্ঞেশ্বর বললেন—বলুন।

দেবেশ্বর বললেন—জানবাজারের বাড়ী, ব্যাঙ্কে মজুত এবং কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করা যা টাকাকড়ি আছে, এ সব এখন আমার রইল, আমার অন্তে এ সমস্ত পাবে যোগেশ্বর।

—কীর্তিহাটের সম্পত্তি—

—ওতে তো বাপের ছেলেকে বঞ্চিত করবার অধিকার নেই। সে আমি বলব না। ওতে তোমাদের দুই ভাইয়ের সমান অংশ পাওয়া উচিত, তাই পাবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে যজ্ঞেশ্বর বলেছিলেন—বেশ, আমি তাতে সম্মত, শুধু মায়ের কোম্পানীর কাগজের অর্ধেক, যেটা আমি পাব সেটা আমাকে দিন। আপনি যেভাবে ব্যবসার রিজার্ভ ফাণ্ড তুলে নিয়েছেন তাতে ব্যবসা আমি চালাবো কিসে!

—তোমার মা থাকতেই তাঁর টাকাটা নেবে? সে টাকায় আমি কখনও হাত দিই নি।

—মায়ের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। অর্ধোন্মাদ। সে অবশ্য আপনার জন্যেই।

—থাক। তাই পাবে তুমি। দিয়ে দেব।

—আপনি কি রিটায়ার করবেন? মা কীর্তিহাটে গিয়ে বসবেন?

—না। আমি এখানেই থাকব। রিটায়ার করা বলতে পার। তবে একটা কিছু অবলম্বন রাখতে হবে তো। ভাবছি বাই-উইকলি ইংরিজী খবরের কাগজ করব। কাগজের

প্রয়োজন আছে। আমার পরে ওটা যোগেশ্বর চালাবে। সে এবার বি-এতে ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এম-এতেও তেমনি ফল করবে। আমার বড় শখ ছিল, সেটা যোগেশ্বরকে দিয়ে করে যাব।

*　　　　*　　　　*

সুরেশ্বর বললে—টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীতে ঢুকে দেবেশ্বর রায় আর বেঁচে থাকেন নি। তারপরের কথা তুমি সবই জান সুলতা। জান না শুধু দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর কথাটা। তিনি মারা গেলেন কি ভাবে। লোকে জানে জমিদারের ছেলে যে ভাবে মারা যায় সেই ভাবেই মারা গেছেন তিনি। মদ খেয়ে খেয়ে তিনি হঠাৎ একসময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর জ্ঞান হয় নি। সেকালে বলেছিল—ব্রেন ফিবার ; একালে হ'লে বলত সেরিব্রেল থ্রমবসিস্। সেইটুকু বললেই আমার অতীতকাল শেষ।

*　　　　*　　　　*

তখন লর্ড কার্জন ইণ্ডিয়ার ভাইসরয়। বোধ করি এত বড় কঠিন ইম্পিরিয়েলিস্ট আর এ্যারোগ্যাণ্ট ভারতবর্ষ-বিদ্বেষী কেউ আসে নি। অন্তত ভাইসরয় হয়ে আসে নি। চার্চিল সাহেবের আদর্শ পুরুষ লর্ড কার্জন। তার সঙ্গে লর্ড কিচেনার তখন কম্যাণ্ডার চীফ।

স্যার হেনরী ফ্লাওয়ার সেক্রেটারী অব স্টেট। এদের পায়ের চাপে গোটা ভারতবর্ষ মুমূর্ষুর মত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা সেই চিরন্তন মন্ত্র জপছে ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ! রক্ষ মাম্ জগদীশ্বরে! রক্ষ দেবী—মহাদেবী, ত্রাহি! ত্রাহি! ত্রাহি দেবী মহেশ্বরী!

নিরুত্তর আকাশ থেকে উত্তর যা আসে তা মেঘের ডাকের মধ্যে দিয়ে আসে, আকাশ কখনও কথা কয় না। ভারতবর্ষের গলায় ইংরিজী বুটের চাপটা একটু জোরালো করে হেনরী ফ্লাওয়ার নতুন পলিসি ঘোষণা করেছিলেন—

"The Government of India must always abide by the decision of the British Cabinet even when it was regarded by them as injurious to the interest of India".

এবং বাংলাদেশে তখন নতুন প্রাণের সাড়াতে ইংরেজের মুখ ভারী হয়েছে। এমন কি জমিদারদের উপরেও মেজাজ খারাপ। জমিদারেরা পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের পর আয় বৃদ্ধি করে খাজনা আদায়ের এজেণ্ট বা গোমস্তা থেকে দস্তুরমত বিলেতের লর্ডদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সুযোগ পেলেই জমিদারদের উপর শাসন চালাচ্ছে। বাঙালী ইংরিজী শিখে ইংরেজের সঙ্গে টোক্কর মেরে চলে। এ তাদের সহ্য হয় না। শাসনযন্ত্রটার স্ক্রু ক্রমাগত টাইট দিতে চাইছে তারা।

দেবেশ্বর রায় এর বিরুদ্ধে লিখবার জন্য খবরের কাগজ বের করবেন স্থির করেছিলেন। জমিদারীর মোহ তাঁকে বাঁধতে পারে নি, কয়লার ব্যবসায়ের ঐশ্বর্যও তাঁকে ভোলাতে পারে নি। তিনি নতুন জীবনে নতুন কর্মে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

ছোটছেলে যোগেশ্বরকে বলেছিলেন—নাই বা পড়লে এম-এ। প্রেস কিনে কাজ শুরু

কয়। আমার সঙ্গে লেগে পড়।

সুরেশ্বর বললে—কিন্তু তা হ'ল না।

হঠাৎ বাধা এসে সামনে দাঁড়াল। অলঙ্ঘনীয় বাধা।

বলতে বলতে চঞ্চল হয়ে উঠল সুরেশ্বর। উঠে দাঁড়িয়ে বারকয়েক পায়চারি ক'রে সুরেশ্বর বললে—লোকে বলে এ বাধা রায়বাড়ীর সেই অলঙ্ঘনীয় অভিশাপের বাধা।

সেই ধর্মসাধনার বিকৃত পন্থায় যে অভিশাপ অর্জন করেছিলেন শ্যামাকান্ত, আর যে অভিশাপকে সম্পদের পথে কালনাগিনীকে বুকে ধরার মত ধরেছিলেন সোমেশ্বর রায়—সেই বাধা। নারীর বাধা!

লোকে অন্তত তাই বলে। শিবেশ্বর রায়ও তাই বলেছিলেন, বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায়ও তাই বলেছিল। এবং আরও অনেক জনেই তাই বলেছিল। বলেছিল—যে অভিসম্পাতকে রত্নেশ্বর রায় কঠোরভাবে বংশ থেকে বিদায় করেছিলেন, মুছে দিয়েছিলেন, সেই অভিসম্পাতকে দেবেশ্বর রায় ওই যোগিনীসাধনের সিদ্ধাসনের জঙ্গল থেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতদিন পর তাকে ছাড়তে গেলে সে ছাড়বে কেন? সে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় ফিরে কলকাতায় এসেছেন শুনে তাঁর সামনে দীর্ঘদিন পরে এসে দাঁড়িয়েছিল ভায়লেট। তখন সে দুর্দান্ত মাতাল; পর পর ডাইভোর্স ক'রে তৃতীয় স্বামী নিয়ে ঘর করছে। ঘর করার অর্থ নিতান্তই একটা অর্থহীন ব্যাপার। এই হতভাগিনী মেয়েটাকে নিয়ে কতকগুলো পেশাদার দালাল শ্রেণীর জীব ব্যবসা করত মদ্য খাদ্য আর আশ্রয় দিয়ে। এলিয়ট রোডের যে বাড়ীটা রত্নেশ্বর রায় ভায়লেটের ছেলে পিক্রুসকে দিয়েছিলেন, যাকে লেখাপড়া শেখাবার মাসোহারা দিতেন দেবেশ্বর রায়, সে ছেলের লেখাপড়া হয় নি, শেষ পর্যন্ত তাকে একটা চাকরি দিয়েছিলেন দেবেশ্বর রায় তাঁদের ফার্মে; ডকে তার কাজ ছিল; রায় চক্রবর্তীর কয়লা চালান যেত দেশান্তরে, সে ডকে বোঝাইয়ের কাজ দেখত, সে ছেলে তখন মরেছে। একমাত্র কন্যাকে কোলে নিয়ে তার স্ত্রী শাশুড়ীকে বাড়ীতে ঢুকতে দিত না। সে বেড়াত পথে পথে। তখনও তার রূপ ছিল, তখনও তার দেহ ছিল; বিবাহের নামে আশ্রয় দিয়ে কয়েকটা পাষণ্ড তাকে ব্যবসার সামগ্রী করে তুলেছিল। প্রথম প্রথম হয়তো ভায়লেটের ভাল লেগেছিল কিন্তু ক্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে খুঁজেছিল একটি নিরাপদ আশ্রয়। অথবা তার অতৃপ্ত কামনা চেয়েছিল তার জীবনের প্রথম ভালবাসার মানুষকে। অথবা অভিশাপ নিজের আসন পাতবার জন্য চেয়েছিল অভিশপ্ত জনকে।

সে-কালে দেবেশ্বরের জীবনের পরিবর্তনের ঠিক মুখেই ভায়লেটের আবির্ভাব নিয়ে গবেষণার আর অন্ত ছিল না শুনতা। ছিল না বলেই তার উল্লেখ করছি।

কিন্তু আসলে প্রথমটা ছিল ব্ল্যাক মেলিংয়ের ব্যাপার। ভায়লেটের একটা মাসোহারা ছিল। সে আমলে সে মাসে চল্লিশ টাকা হিসেবে পেত এ বাড়ীর সেরেস্তার খাজাঞ্চির কাছ থেকে। কিন্তু তার বাড়ী ঢুকবার হুকুম ছিল না। টাকাটা লোক-মারফৎ পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এবার ভায়লেটের স্বামী তাকে পাঠালে, তুই যা, বল এ টাকায় আমার কুলুচ্ছে না,

আমাকে আরও কিছু দাও। ওই এলিয়ট রোডের বাড়ী থেকে তোকে তাড়িয়ে দিলে তোর বেটার বউ, তুই থাকবি কোথায়? তোকে একটা বাড়ী দিতে বল। এতনা বড়া আদমী—a rich man. I have seen the big house—beautiful horses and couches—he must pay.

ভায়লেট ভয় করত রায়বাবুকে। ভয় করত ভালও বাসত। দুই-ই। তার ঐশ্বর্য, তার জাঁকজমক—কীর্তিহাটের প্রতাপের স্মৃতি তার মনে পড়লে সে বিহ্বল হয়ে পড়ত। সেই রায়বাবু যখন তাকে চিঠি লিখে ভালবাসার কথা জানিয়েছিল তখন তার মনে হয়েছিল যে তার নিশ্বাস বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তরুণ রায়বাবুর বক্ষলগ্না হয়ে তার ভয় সত্ত্বেও সে কেমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। কেবলই মনে হ'ত রায়বাবু তার রায়বাবু! তার রায়বাবু!—তারপর কলকাতায় এসে কিছুদিনের মধ্যে অনেক কিছু শিখেছিল, অনেক কিছু পেয়েছিল কিন্তু ভয় তবু কাটে নি। সে ভয় আবার প্রচণ্ডতম হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করলে যেদিন রায়বাবু বললে—দাঁড়া তোকে গুলি করি, করে নিজের বুকে গুলি করে দুজনে মরবো।

সে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল নিজের মৃত্যুর জন্য। কিন্তু তাকে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিয়ে নিজের বুকের কাছে বন্দুকের নল লাগিয়ে রায়বাবু যখন অবলীলাক্রমে বন্দুকের ট্রিগার টেনে দিলে, তখন তার আর আতঙ্কের সীমা ছিল না।

রায়বাবু কি না পারে।

তারপর থেকে সে আর রায়বাবুর সামনে আসে নি। রায়বাবুর জন্যে বুক তার ফেটে যেত তবু সে আসতে সাহস করত না। চৌরঙ্গীর পথে কতদিন রায়বাবুর ফিটন দেখে সে লুকিয়ে পড়েছে। ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছে। বুকের ভিতরটায় যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে।

ছেলে মারা গেলে একবার সে এসেছিল, ছুটে এসেছিল ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ধ'রে এই বাড়ীর ফটকে, কিন্তু ফটকেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছতে মুছতে ফিরে গিয়েছিল। সাহস হয় নি। এতকাল পর, তেইশ বছর পর তাকে প্রায় চাবুক মেরে পাঠালে তার নতুন স্বামী মিস্টার জোনস্!

জোনসও তার সঙ্গে এসেছিল প্রথম দিন। এবং রায়বাবুর দেখা পেতে এতটুক ঝামেলা পোয়াতে হয় নি। একেবারে সামনেই পেয়েছিল তাঁকে। দেবেশ্বর রায় বসেছিলেন বাগানের মধ্যে সেই বেদীটার উপর, যে বেদীটার উপর বসে বহুকাল আগে শ্যামাকান্ত স্নানযাত্রার দিন পশ্চিম আকাশে কালো মেঘের উঁকি দেখে মেঘমল্লার গেয়েছিলেন। সেই মার্বেলের বেদীটার উপর ব'সে দেবেশ্বর কথা বলছিলেন যোগেশ্বরের সঙ্গে।

হঠাৎ এসে দাঁড়াল তারা।

—Excuse me, sir—

দেবেশ্বর ফিরে তাকালেন। মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল। ভায়লেট তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে।

দেবেশ্বর ছেলেকে বলেছিলেন—তুমি ভিতরে যাও যোগেশ্বর। হ্যাঁ, আর ফটকের

দারোয়ানটাকে এক্ষুনি ডেকে ডিসমিস্‌ করে দাও।

যোগেশ্বর চলে গিয়েছিলেন। দেবেশ্বর জোনসকে বলেছিলেন—Yes, what can I do for you, well before that—who are you please.—Good evening sir—my name is Albert jones—and let me introduce Violet Mrs. Jones...

—I see—she is Mrs. Jones now. And then?

হলদে দাঁত মেলে হেসে জোনস বলেছিল—She wants money—Roy Babu, she is your old-friend.

ভায়লেট মুখে কিছু বলে নি, বলতে পারে নি, কিন্তু অজস্রধারায় শুধু কেঁদে ছিল। চোখ দিয়ে বাঁধভাঙা নদীর জলের মত জলের ধারা নেমেছিল।

—কত টাকা চাই?—ভায়লেট?

ভায়লেট উত্তর দিতে পারে নি, সে শুধু কেঁদেই গিয়েছিল। জোনস কিছু বলতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু দেবেশ্বর বলতে দেন নি। বলেছিল—Please Mr. Jones—you please keep quiet. বল ভায়লা কত টাকা চাই—বল।

বলতে ভায়লেট কিছু পারে নি; তা না পারুক দেবেশ্বর নিজেই খাজাঞ্চীকে ডেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে ভায়লেটের হাতে দিয়ে বলেছিলেন—নিয়ে যাও। তারপর জোনসকে বলেছিলেন—দেখ মিস্টার জোনস, আর যেন এ বাড়ীর ফটকে ওকে নিয়ে বা একলা মাথা গলাবার চেষ্টা করো না।

ভায়লটকে বলেছিলেন—ভায়লা, তোমার ছেলের মেয়ে তোমার গ্রাণ্ডটার পাঁচ বছরের হল,—তাকে কনভেণ্টে রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়ে আছে।—Don't forget that you are now a Grandma. বুঝতে পারছ আমার কথা?

সেদিন তারা চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে এই বাড়ীটার আশেপাশে হঠাৎ বেদনার্ত নারীকণ্ঠের ডাক উঠতে লাগল—

—রায়বাবু। মাই রায়বাবু!

একটা ফিরিঙ্গী মেমসাহেব—আধ-পাগলের মত তার বেশভূষা—অঝোরঝরে কাঁদত আর ডাকত—রায়বাবু—মাই রায়বাবু!

দেবেশ্বর রায় বাইরে বারান্দায় বা বাগানে থাকলে ঘরে গিয়ে ঢুকতেন। হঠাৎ একদিন ছোটছেলেকে ডেকে বললেন—আমার মনে হচ্ছে নেমেসিসের মত একটা কিছু আসছে। আসবার কথাই বটে যোগেশ্বর। তার জন্যে আমি দুঃখিত নই অনুতপ্ত নই। তবে আমার একটা কাজ বাকী আছে। সেটা আমাকে সেরে ফেলতে হবে তার আগে। কাজটা তোমার মায়ের কাছে—তার সঙ্গে কাজ। তোমাকে একটা জিনিস বলে যাই, মাই লাস্ট ওয়ার্ড। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমি যেটা চেয়েছিলাম নিজে—যেটা আমার সম্পদের জন্যে ঐশ্বর্যের জন্যে, এ্যাণ্ড—আরও কিছুর জন্যে হয় নি—সেটা তোমার হয়েছে। সেই জন্যে তোমাকে আমি নগদ টাকা আর বাড়ী দিয়েছি। তুমি বিজনেস কর, জমিদারী থেকে দূরে

থেকো। এ্যাণ্ড ফ্রম উয়োম্যান। বিয়ে ক'রে যদি সংসারী হ'তে পার—সাধারণ মানুষের মত, তা হ'লে বিয়ে করো। নইলে করো না।

যোগেশ্বর শুনেছিলেন অনেক কিছু। এই জানবাজারের বাড়ীতে পুরনো চাকর-বাকর কর্মচারীদের চাপা কথার ফিসফাসের মধ্যে থেকে শুনেছিলেন, জেনেছিলেন। জানতেন তাঁর বাপের জীবন। তিনি চুপ করে ছিলেন। কি উত্তর দেবেন এর।

দেবেশ্বর ক'দিনের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন কীর্তিহাট।

স্ত্রীর কাছে তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন, হাতজোড় করে বলেছিলেন—আমাকে ক্ষমা কর।

স্ত্রী হেসেই সারা হয়েছিলেন। ক্ষমা? কিসের ক্ষমা?—বেটাছেলে আবার মেয়ের কাছে ক্ষমা চায়। তিনি শুনতেই চান নি কোন কথা। আপনার সেই ধরাবাধা জীবনের ছকের মধ্যে যথানিয়মে ঘুরেই বেড়িয়েছেন দিনরাত্রি। ভোরে উঠতেন—উঠেই গোবিন্দ-মন্দিরে। ফিরতেন গোবিন্দের ভোগের পর। তারপর অতিথিসেবা। বেলা চারটে পর্যন্ত বসে থাকতেন অতিথির জন্য। তারপর আহার। শুতেন রাত্রি বারোটার সময়।

দেবেশ্বর রায় চুপ করে বসে থাকতেন স্ত্রীর প্রতীক্ষায়।

স্ত্রী এসে তিরস্কার করতেন—এ তোমার কি কাণ্ড, কি ব্যাপার? আমার উপর এ কি অত্যাচার শুরু করলে বল তো! কেন? বেশ তো ছিলে। আমি তো কোন আপত্তি করি নি, বাধা দিই নি।—

দেবেশ্বর কথা বলতেন না—হাসতেন।

এরই মধ্যে রায়বাড়ীতে শিবেশ্বর বাধালেন বিরাট মামলা। রত্নেশ্বর রায়ের কাছারীতে আগুন দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার পথ না পেয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি—এমন সময় একটা খাসপতিতের উপর গোপথের অধিকার নিয়ে ফৌজদারী বেধে গেল। একসঙ্গে গোহত্যা, নরহত্যা দুই হয়ে গেল। ওয়ারেন্টের ভয়ে শিবেশ্বর আর তাঁর বড়ছেলে ধনেশ্বরকে গা-ঢাকা দিতে হল। দেবেশ্বরকে বাধ্য হয়ে কাছারীতে বসতে হল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন।

রত্নেশ্বর রায়ের খাস কাছারী—যে-ঘরটায় অতুলেশ্বর পিস্তলের কার্টিজ, বোমার সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা রত্নেশ্বর রায় বড়ছেলেকেই দিয়ে গেছেন—সেই কাছারীর বারান্দায় সন্ধ্যার সময় বসেছিলেন দেবেশ্বর রায়।

হঠাৎ প্রচণ্ড চীৎকারে তিনি যেন ফেটে পড়লেন—গেট আউট, গেট আউট আই সে—গেট আউট।

এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লোকের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চীৎকার এবং তার পরমুহূর্তেই সে-চীৎকার আর্তনাদের মত ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। না দেখেও সকলে বুঝতে পেরেছিল যে কোন একটা লোক ক্রুদ্ধ চীৎকার করে উঠেই পরমুহূর্তে আর্তনাদ করে ছুটে পালাল। তারপরেই একটি নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার।

দেবেশ্বর রায়ের চাকর অনন্ত শুধু সাক্ষী ছিল।

দেবেশ্বর রায় সন্ধ্যায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলেন আর আপনমনে শুরু করে

ইংরিজীতে কিছু বলছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। সে আলো জ্বালতে গিয়েছিল ভিতরে। হঠাৎ বড়বাবু চীৎকার করে উঠেছিল—Get out, Get out I say—Get out. তার চেয়ারের ঠেসানের পিছনে ঝুলিয়ে রাখা ছিল তাঁর মালাক্কা বেতের শখের ছড়িটা, সেই ছড়িটা টেনে নিয়ে তিনি আথালি-পাথালি পিট্‌ছিলেন একটা ফিরিঙ্গিকে। লোকটা প্রথমটা গর্জন করে উঠে হাত দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল এই ছড়িগাছটা কিন্তু তা পারে নি। না পেরে আর্ত চীৎকার করে ছুটে পালাল। তার সঙ্গে ছিল একটা ফিরিঙ্গী মেয়ে। সে-মেয়েটা কাতর আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়েছিল বারান্দার উপর।

নিমাই এসে পাথরের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওদিকে কাছারীর কর্মচারী ও লোকজন সকলে দূরে স্তব্ধ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরুষটার চীৎকারের সঙ্গে নারী-কণ্ঠের চীৎকার শুনে তারা থমকে গেছে।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দেবেশ্বর রায় কঠিনস্বরে তাকে উঠতে বলেছিলেন—সে-আদেশ সে অমান্য করতে পারে নি। উঠে মাথা হেঁট করে চলে গিয়েছিল।

দেবেশ্বর রায় ডেকেছিলেন—নিমাই।

মৃদুস্বরে নিমাই বলেছিল—হুজুর।

—যা, উপরে আমার ঘরে বাবার মৃত্যুর পর যে-হুইস্কির বোতলটা তুই আমার সামনে ধরেছিলি, সেটা আলমারিতে রয়েছে। আজ যেন চোখে পড়েছে আমার। সেটা নিয়ে আয়।

—আজ্ঞে।

—যা, সেটা নিয়ে আয়। আর গ্লাস।

দীর্ঘ এক বছরের উপর সময়ের পর আবার সেদিন দেবেশ্বর রায় হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছিলেন।

বাধা কে দেবে? শিবেশ্বর-ধনেশ্বর মামলার ভয়ে কীর্তিহাট থেকে সরে গেছেন। দেবেশ্বরের ছেলেরা কলকাতায়। পারতেন এক স্ত্রী মাণিকবউ কিন্তু তিনি সন্ধ্যায় তখন গোবিন্দজীর মন্দিরের বারান্দায় হাতজোড় করে বিগ্রহের মুখের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কথা বলছেন, কখনও হাসছেন, কখনও তিরস্কার করছেন। নিমাই তাঁর কাছে গিয়েও ছিল, খবরও দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বুঝতেই পারেন নি নিমাইয়ের কথা।

নিমাই বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছিল। বাবুকে ফেলে ঠাকুরবাড়ীতে দাঁড়িয়ে মা-ঠাকরুণকে সমস্ত বুঝিয়ে বলবার মত সময় তার ছিল না। ফিরে এসে নিমাই চমকে উঠেছিল। বাবু কই? হুজুর?

বারান্দা শূন্য, ঘর শূন্য, দেবেশ্বর রায় নেই।

কোথায় গেলেন?

—হুজুর! বড়বাবু!

কাছারী সচকিত হয়ে উঠেছিল। সে কি? কোথায় গেলেন? বড়বাবু, দেবেশ্বর রায়, যিনি পাহাড়ের মত অটল, তিনি কোথায় গেলেন? কোথায় যাবেন। কাছারী থেকে

হারিকেনের আলো হাতে হিন্দুস্থানী চাপরাসীরা ছুটেছিল। দেখতে দেখতে গোটা গ্রামটা সচকিত হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে রায়বাড়ী কীর্তিহাটে হলেও কীর্তিহাটই ছিল রায়বাড়ীর মধ্যে। রায়বাড়ীর এলাকার বাইরে গ্রামের বসতি সে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার সঙ্গে রায়বাড়ীর সম্পর্ক ছিল মৌজা এবং লাটের সম্পর্ক। তার বেশী কিছু নয়। সম্পর্ক ছিল খাজনা দেওয়া-নেওয়ায়, সম্পর্ক ছিল অনুমতি গ্রহণের ; গাছ কাটবে তার অনুমতি, ঘরের ঘনিয়াদ কাটবে তার অনুমতি, বিয়ের অনুমতি, শ্রাদ্ধের অনুমতি, তাছাড়া জীবনের প্রতি পদে নানা অনুগ্রহের অনুমতি, নেবার জন্য। তাছাড়া অনুগ্রহ, সে অনেক, সে পদে-পদে, অন্নপ্রাশনে, বিয়েতে, পৈতেতে—মাছ চাই, কাঠ চাই, কন্যাদায়ে অর্থও চাই। পিতৃদায়ে-মাতৃদায়ে—বাঁশ, কাঠ, মাছ, অর্থ চাই। প্রয়োজন হলে বিয়েতে রায়দের গাড়ী চাই। এছাড়া ইদানীং শিবেশ্বর শখের থিয়েটার খুলে রিহারসালরুমে একটা প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন গ্রামের কিছু লোককে। সে অল্প কিছু। আজ কথাটা দেখতে দেখতে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল বিচিত্র চেহারা নিয়ে। কে রটালে, কার কল্পনা কেউ জানে না, বললে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে অশরীরী একটা পুরুষ আর একটা নারী, একটা প্রেত আর একটা প্রেতিনী বড়বাবুকে টেনে নিয়ে গেল।

গোটা গ্রামের মানুষের গুঞ্জন একটা কলরব সৃষ্টি করে তুলেছিল। পথে পথে আলো আর মানুষ। মানুষ আর আলো। কংসাবতীর তটভূমির জঙ্গল ভেঙে ভেঙে খোঁজ শুরু হয়েছিল।

—বড়বাবু! হু-জু-র! ব-ড়-বা-বু!

শেষ প্রায় রাত্রি দুপুর নাগাদ দেবেশ্বরকে পাওয়া গিয়েছিল কাঁসাইয়ের গর্ভে বালুচরের উপর। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দেহের তাপ প্রবল। যেন পুড়ে যাচ্ছে। ধরাধরি করে তুলে এনে তাঁকে শুইয়ে দিয়েছিল তাঁর বিছানায়।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলেছিলেন কিন্তু দৃষ্টি বিহ্বল বিকারগ্রস্ত। চীৎকার করে উঠেছিলেন—গেট আউট, গেট আউট! গেট আউট আই সে। শাট দি ডোর। শাট দি ডোর!

রাত্রি দুপুরের পর মাণিকবউ দেবতাকে শয়ন করিয়ে অন্দরে এসে স্বামীর ওই অবস্থা দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কি হল?

কিন্তু উত্তর শোনেন নি। এসে শিয়রে বসে স্বামীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে ডেকেছিলেন —বড়বাবু! বড়বাবু! বড়বাবু গো! বড়বাবু! কথা বল। বড়-বাবু!

কিন্তু বড়বাবুর চেতনা আর ফেরে নি।

ওই এক কথাই তিনি বলেছেন শেষ পর্যন্ত। গেট আউট। আর, শাট দি ডোর!

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, জোন্স ভায়লেটকে নিয়ে কীর্তিহাট পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল সে-কথা নিশ্চয় বলতে হবে না। জোন্সকেই দেবেশ্বর রায় আথালি-পাতালি বেত দিয়ে মেরেছিলেন।

জোন্স পালিয়েছিল সেই রাত্রেই। তার ভয় হয়েছিল—হয়তো বা তাকে খুন করেই ফেলবে রায়বাবু। গোয়ানেরাও তাই বলেছিল তাকে। সে পালিয়েছিল কিন্তু ভায়লেট

পালায় নি। সে ছিল। রায়বাবুর মৃত্যুর পর ভায়লেট ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলে সেই যোগিনীর ঘরের ভিতর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ওখানটায় কল্কে ফুলের গাছ আছে প্রচুর। কল্কেফুলের বীজ বিষ, ওটা শিখেছিল অবশ্য এখানে এসেই। সে-কথা ভায়লেট ভুলে যায় নি।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অর্চনাকে দেখে সেদিন আমি অদৃষ্টকে মেনেছিলাম। অর্চনা বিধবার বেশে বসেছিল। আমাকে দেখে কাঁদে নি। পাথরের মূর্তির মত শুকনো চোখে বসেছিল সে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে অর্চনা।

সুরেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে—তার সঙ্গে সুলতাও। সুরেশ্বর বললে—এত বড় দুঃখ আমি বাবার মৃত্যুসংবাদেও পাই নি। বরং চন্দ্রিকাকে নিয়ে যখন তিনি বম্বে থেকে চলে যান, তখন খবর পেয়ে এমনি ধরনের আঘাত পেয়েছিলাম। তবুও সে-আঘাতের পরিমাণ এর থেকে কম। তাতে বাবার মৃত্যু-সংবাদ ছিল না। এতে একসঙ্গে দুটো। যদিও রথীনের মদ খাওয়ার কথা আমি মেদিনীপুর যাবার আগে জেনে গিয়েছিলাম এবং নারীসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কিছুটা সন্দেহও আমার হয়েছিল। একটা নার্স নিয়ে প্রণবেশ্বরদাদার সঙ্গে ওর সঙ্গে ওর আলাপের কথাও আমার কানে এসেছিল। অনুশোচনা আমার তখনই হয়েছিল কিন্তু হাত তো আর কিছু ছিল না। ১৯৩৬-৩৭ সালে হিন্দুর ঘরে ডাইভোর্স দূরের কথা, স্বামীর দুষ্ট চরিত্রের জন্য স্বামী ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের দৃষ্টান্ত দু-চারটের বেশী ছিল না। তাছাড়া কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর মেয়ে। এবং যে-মেয়ে অবিকল তার বৃদ্ধ পিতামহী সতীবউরানীর মত দেখতে। রায়বাড়ীর প্রবীণদের বিশ্বাস—সতীবউরানীর সে-জন্মে ভোগ করে আশ মেটে নি, তাই এ-জন্মে ভোগ করতে এসেছিল।

সতীবউরানীর ভোগ-আকাঙ্ক্ষার ভাগ্য, আর রায়বাড়ীর ভাগ্য। ভরাভর্তি রায়বাড়ী যিনি এসে সারাজীবন তপস্যা করলেন, সারাজীবন সন্ন্যাসিনী সেজে থাকলেন। বাক্সে ভরা রইল বেনারসী শাড়ী, মুরশিদাবাদের গরদের শাড়ী, বালুচরী বিষ্ণুপুরের গরদ তসরের শাড়ী, ঢাকাই বালুচরী ফরাসডাঙ্গা শান্তিপুরের শাড়ীর বোঝা সিন্দুকে তোলা রইল—মণিমুক্তো-হীরে-জহরতের জড়োয়া গহনা, খাঁটি পাকাসোনার ভারী ভারী গহনা—তপস্যা শেষ হলেও আর গায়ে পরলেন না। ফুলেল তেলের বোতল গড়াগড়ি গেল, চুলে মাখলেন না, বিলিতী খাঁটি ফরাসী দেশের সেন্ট-ল্যাভেণ্ডারের বাহারে শিশি, দামী আতরের পলাকাটা শিশি আলমারিতে সাজানো রইল, কোনদিন মাখলেন না; তিনিই যদি রায়বাড়ীর যে আমলে বেনারসী সিল্ক দূরে থাক, তাঁতের শাড়ীর সাধ মেটে না, এমন কি মিলের শাড়ীও সময় সময় সেলাই দিয়ে পরতে হয়, হাতে সোনার পাত-মোড়া লোহা পিতলের চুড়ি পরতে হয়, সেই আমলে ভোগের জন্য পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন, তবে তার ভাগ্য ছাড়া কাকে দোষ দেব বল?

অর্চনাও সেদিন এ-ঘটনাকে ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল। আমিও তাই মানতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঠিক যেন পারি নি। দোষটা নিজের ঘাড়ে পড়ছিল। বার বার মনে হয়েছিল, ধনেশ্বরকাকার স্ত্রী জনাইয়ের কাকীমার দেওয়া সন্ধান পেয়ে আমি ছুটে এসেছিলাম, এসে

অন্নপূর্ণা-মাকে পেয়ে তাঁর সাজানো সংসার দেখে ডাক্তার-ছেলেটিকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আর খোঁজ করলাম না। তার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। টাকাকড়ির দিক থেকে সুবিধে করতে যাই নি, খরচ আমি অনেক করেছিলাম। এবং এই বিয়ের ব্যাপারটা না ঘটলে অন্নপূর্ণা-মা জানবাজারের বাড়ী আসতেন না। আর কুইনী এবং হলদীকে দেখে আমার পিতামহ তাঁর দেবু-ভাইপোর অপরাধ, তাঁর যৌবনের ভুলের পাপমোচনের কথাও তাঁর মনে হত না। সেটা এমন ভাবে মনে পড়েছিল যে, তিনি এলিয়ট রোডের বাড়ী খালাস করাটা অর্চনার বিয়ের পণের মধ্যে ধার্য করেছিলেন। তাতেও আমি অমত করি নি। বিয়েতে রথীন প্রথম অমত করেছিল, অন্নপূর্ণা-মা জোর করে তাকে রাজী করিয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর'রায় জ্যাঠামশাই আমার স্নেহের অপব্যাখ্যা করে বেনামী চিঠি দিয়েছিলেন, অন্নপূর্ণা-মা তাও অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি অগ্রাহ্য না করলেই ভাল করতেন।

হঠাৎ থেমে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—মাঝখান থেকে একটা কথা বলে নিই সুলতা, কথাটা ১৯৩৭ সালের নয়—কথাটা যুদ্ধের সময়ের বছর কয়েক পরের। জ্যাঠামশায় মৃত্যু-শয্যায় তখন। আমাকে ডেকেছিলেন। তাঁর দুই ছেলেই তখন ওয়ার-কণ্ট্রাক্টের নামে যত হীনতম কাজ হতে পারে তা করছে। রোজগার যথেষ্ট করছে কিন্তু বাপকে দেখতো না। সে-সময় তিনি নিদারুণ অভাবের মধ্যে পড়ে আমাকে ডেকেছিলেন টাকার জন্যে। সে-সময় পাঁচটা কথার মধ্যে বলেছিলেন—অর্চনা সম্পর্কে বেনামী চিঠি লিখেছিলাম, তার জন্ম তখন অনুশোচনা হয় নি, আজ অনুশোচনা হচ্ছে। কিন্তু কি জানিস—আমি তোদের দুজনের যে ভাইবোনের ভালবাসা এটা সহোদর-সহোদরা হলেও আমার মনে সন্দেহ জাগাতো। তাছাড়া আমার একটা রাগ ছিল, আক্রোশ ছিল—কঠিন আক্রোশ। ধনেশ্বর আর জগদীশ্বর দুই ভাই আমার মাকে ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে দেয় নি—বলেছিল, তোমার জাত গেছে জ্যাঠাইমা, তুমি ঠাকুরবাড়ী ঢুকো না! আমি তার শোধ নিয়েছিলাম। সেটা আমি ভুলি নি। জমিদারের বাচ্চা আমি, ব্যবসাদার হতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি কিন্তু জাত যায় নি, জাতে সেই গোখরোই আছি—ডোরাদার বাঘই আছি, রাগ আমরা ভুলিনে। তবে মেয়েটা সতীবউরানীর মত দেখতে, তাই দুঃখ হয়। আজ হচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলে সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর আবার বললে—ঐ কথাটা আগেও তো বলেছিলেন জ্যাঠামশাই, যখন এলিয়ট রোডের বাড়ীর দরুন পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে নেন। সেদিন কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করেছিলাম অর্থগৃধ্নুতা। কিন্তু বিধবা অর্চনাকে দেখে সেদিন মনে হল অর্চনার ভাগ্য।

পরের দিন ফিরে এলেন রথীনের বাপ। মানুষটি অসীম ধৈর্যশীল মানুষ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হতে যেসব ধীর-স্থির মানুষ, আনন্দ-বেদনা-উল্লাস-দুঃখ নিঃশব্দে অভিব্যক্তিহীন মুখে শুকনো চোখে সয়ে গেছেন, তাদেরই দলের মানুষ।

বিবরণ তাঁর কাছে জানলাম, সংক্ষেপে জানালেন তিনি। একান্ত অপরাধীর মতই জানালেন—দেখ সুরেশ্বর, ঠাকুরমা আজ নেই, তিনি খবর পেয়ে বাঁচবেন না এ আমি জানতাম; টেলিগ্রামে খবরটা সেই উদ্দেশ্যেই জানিয়েছিলাম। যদি এই খবরটা শব্দভেদী বাণের মত তাঁর

বুকে বিঁধে প্রাণটা বেরিয়ে যায় তো যাক। তিনি যেন সব খবর না-শোনেন না-জানতে পারেন। অথচ আঘাতটা পান।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ ভালই হয়েছে, তিনি সব না-জেনেই চলে গেছেন। জেনেশুনে গেলে সে তাঁর পক্ষে বড় মর্মান্তিক হত। অনেক অহঙ্কার করে তপস্যা করার মত কৃচ্ছ্রসাধন করে তিনি শ্বশুরবাড়ী বাপের বাড়ী দুই কুল ছেড়ে নিজের কুল নিজে গড়ে এই বাড়ীর পত্তন করেছিলেন। ছেলে, নাতি, তারপর তাদের ছেলেদের নিয়ে তাঁর অহংকার ছিল, প্রচণ্ড অহঙ্কার, লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনের চারখানি চরণকমল তাঁর ঘরে অচঞ্চল হয়ে বিরাজ করছে। বলতেন—আলতারাঙা চারখানি পা আমি চোখ বুজলে দেখতে পাই—পদ্মের উপর রেখেছেন তাঁরা। কিন্তু তিনি জানতেন না, শুধু রথীন নয়, রথীনের আগে থেকেই এ বাড়ীর ধারা পাল্টেছে। কালের হাওয়ায় সব পাল্টে গেছে। লক্ষ্মীর আটন গেছে, সরস্বতীর পিঁড়ে গেছে; লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভোল পাল্টেছে। এ-বাড়ীর ছেলেদের চরিত্র গেছে। মদ ঢুকেছে, তার সঙ্গে—।

কথাটা এই স্থূলতা যে, রথীনের ছোটকাকা গোপনে মদ খেতেন। রথীন ডাক্তারী পড়তে গিয়ে পড়ার সময় থেকে ভাইনাম গ্যালেসিয়া থেকে শুরু করেছিল। হাসপাতালে নার্সদের কাছে সে নিজে আকর্ষণের মানুষ ছিল—নার্সরাও কেউ কেউ তাকে আকর্ষণ করত।

১৯৩০ সালের পর থেকে কালটা অতিবিচিত্র। তার সংজ্ঞা বা তার স্বরূপ তোমার জানা স্থূলতা। রথীনের কাছে জীবনের চরিত্রের মূল্য কিছু ছিল না। কিন্তু সে-কথা সে সত্য হিসেবে ঘোষণা করে বলে নি কোনদিন—ক্লেভারলি সে এ-সত্য গোপন করে চলে এসেছে, চালিয়ে এসেছে। কেউ ধরতে পারে নি। সেদিন মানে যেদিন কলকাতা থেকে মেদিনীপুর আসি, সেইদিন শুধু আমি অনেক রকম ওষুধের গন্ধে ঢাকা-দেওয়া মদের গন্ধটাকে তার মুখের পান-জর্দার গন্ধের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করেছিলাম। আমি চিনতাম গন্ধটাকে, তাই আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে খটকাও বেধেছিল—'অর্চনা এটা সইতে পারবে তো?' জানতে সে পেরেছে এতে সন্দেহ আমার ছিল না, কিন্তু সইতে কতদিন পারবে বা এ নিয়ে তার সঙ্গে এরই মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়েছে কিনা বুঝতে পারি নি।

মেয়েরা দুর্জ্ঞেয় স্থূলতা। তাদের প্রকৃতিটাই অন্ধকারের মত, যতই উজ্জ্বল আলো জ্বালো, তার সবটা আলোয় স্পষ্ট হবে না, আলোর ঠিক নিচেটাতেই জমা করে রাখবে আপনার আসল স্বরূপকে।

নারী-প্রকৃতির আদিম স্বরূপ নাকি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রির অন্ধকারকে একসঙ্গে জমিয়ে তৈরী হয়েছে। ওকে জানা যায় না। নারীও বোধ হয় নিজেকে নিজে জানে না। আয়না না হলে মেয়েদের চলে না, আজকাল ভ্যানিটি ব্যাগে ব্যাগে ছোট আয়না হাতে হাতে ফেরে। অল্প কিছুক্ষণ পর পর আয়না দেখে মুখে তারা পাফ বুলায়। মোহের প্রলেপ বুলিয়ে দেয় প্রলেপের স্তরের উপর। নিজের অন্তরের দিকটা থেকে সে মহারাত্রির মত নিবিড় অন্ধকার। সে জানে না সে কি চায়, সে বোঝে না কেন সে কাঁদে, কেন সে হাসে।

রথীনকে সে মানিয়ে নিতে পারবে? বুঝিয়ে আপন করে নিতে পারবে? আমার সেদিন আপসোস হয়েছিল, আমি অতুলেশ্বরদের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে অর্চনার সম্পর্কের কথাটা গোপন করেছি বলে। বলা আমার উচিত ছিল।

সন্দেহ আমার মিথ্যে হয় নি।

অর্চনার সঙ্গে রথীনের বিরোধ চলছিল এই নিয়ে। অর্চনা প্রকাশ করতেও পারত না—প্রকাশ্যে ঝগড়া করতেও পারত না; ভিতরে ভিতরে গুমরে গুমরে মরত। রথীন ওদিকে একজন এ্যাংলো নার্সের প্রেমে পড়েছিল।

রথীনেরও সন্দেহ ছিল অর্চনার উপর। জ্যাঠামশায়ের বেনামী পত্রের সন্দেহ। প্রণবেশ্বর-দাদার সঙ্গে তার আলাপ ছিল—ওই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ার আলাপ। রথীনের চেম্বারে পেশেণ্ট হিসেবে আলাপ। তার মধ্য দিয়ে সে একটা সত্য জেনেছিল। জেনেছিল—প্রণবেশ্বর বড় জমিদারবংশের ছেলে, এখন জমিদার থেকে তারা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছে, তাদের বংশে সাতপুরুষ ধরে এই ট্রাডিশন চলে আসছে। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন ভূষণ, এ-দোষটাও তেমনি তাদের জীবনের আভিজাত্যের পরিচয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে এত টাকা খরচ করে তার সঙ্গে অর্চনার বিয়ে দেওয়ার ভারটা নেওয়ার মধ্যে, আমার স্নেহের মমতার অপব্যাখ্যাও সে করেছিল।

সে নাকি বলেছিল—গেলা গেল না বলে ওগরাতে হল।

তাতে রথীন খুব বিচলিত হয় নি। কারণ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে কালের হাওয়ায় এমন স্তরে সে তখন উঠেছে, যেখানে বিবাহের পূর্ব-জীবনের পতনস্খলনগুলো নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনার মত; হয়তো বা আরও লঘু কিছু—পথে পড়ে গিয়ে গায়ে ধুলো-কাদার দাগের মত—ধুয়ে দিলেই মুছে যায়, তার উপরেও যদি কিছু হয়, কেটেকুটে যায় এবং তাতে যদি সৌন্দর্যহানিই ঘটে, তবে প্লাস্টিকসার্জারি আছে, তাতে শুধরে যাবে। এরপরও জীবনের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে; সে-দিগন্তে নারীও স্বাধীন, পুরুষও স্বাধীন—কেবলমাত্র গৃহের বন্ধন-টুকু স্বীকার করে পরস্পরকে মেনে নিয়ে যায় যা খুশি সে তা করে বা করতে পারে। কিন্তু খুব সহজ নয়, এবং সহজ হয়ও নি রথীনের পক্ষে। সে নিজের বেলা হাসপাতালে নার্সিংহোমে নার্সদের সঙ্গে কাজও করেছে, আবার অন্তরঙ্গতার চর্চাও করেছে কিন্তু বাড়ী এসে অর্চনাকে প্রশ্ন করেছে—বল, তোমার জীবনের কথা বলো। স্বীকার করো। আমি তা মেনে নেব। কারণ আমার জীবনেও পতনস্খলন হয়েছে। দু'-চারটে গল্পও বলেছে; এবং পাল্টে বলেছে—এবার তোমার কথা বলো।

অর্চনা বাঁচবার জন্য আঁকড়ে ধরেছিল অন্নপূর্ণা দেবীকে। অহরহ তাঁর কাছেই থাকত। তিনিও তাঁকে চাইতেন এবং অর্চনা তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল বলে আনন্দের তাঁর সীমাও ছিল না। ভাবতেন—তাঁর মা পুনর্জন্ম নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছেন তাঁকে যত্ন করতে। তাঁর শৈশবাবস্থায় যে যত্ন তাঁর মায়ের কাছে পাওনা ছিল, সেটা তাঁর মা দিতে এসেছেন তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সে। এবং বলতেন—মরে আবার তোর পেটেই ফিরে আসব। এবার খুব যত্ন করিস।

আশী বছর বয়সে অন্নপূর্ণা-মায়ের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল, তিনি অর্চনার মুখ বোধ হয় ভাল

করে দেখতে পেতেন না, পেলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতেন—হ্যারে অর্চি-মা, কি হয়েছে রে? মুখখানা এমন ধোঁয়াটে আকাশের মত কেন রে?

ব্যাপারটা কিন্তু রথীনের বাপ-মা জানতে পেরেছিলেন। অবশ্য সন্ত সন্ত জেনেছিলেন। ভাবছিলেন কি করবেন? অর্চনা সম্পর্কে তাঁরা খোঁজখবরের বাকি রাখেন নি। এবং অর্চনার সম্পর্কে খোঁজখবর করে সন্তুষ্ট হয়েই নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন যে, এ-মেয়ে নিশ্চয় রথীনকে ফেরাবে।

ফেরাতে হয়তো পারত। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর জন্মেই তা ঠিক হয় নি। অন্নপূর্ণা দেবী কেড়ে নিয়েছিলেন অর্চনাকে এবং অর্চনাও পালিয়ে এসে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল রথীনের জোরার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে।

ফাইনাল ইয়ারে প্রথম ওর মা জানতে পেরেছিলেন, মুখে মদের গন্ধ পেয়েছিলেন। কিন্তু এ-যুগটা cleverness-এর যুগ, truth, sincerity এসবই বাতিল হয়ে গেছে সুরেশ্বর। আমরা যারা এগুলোকে মানি, তারা অধিকাংশই লড়াই করে হেরে যাচ্ছি। দু-চারজন, চারজনই বা কোথায়—চোখে তো পড়ছে দুটি মানুষ, বাংলাদেশে অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ আর বাংলার বাইরে মহাত্মা গান্ধী, তাঁরা হেরেও হার মানতে চাচ্ছেন না। চীৎকার করে সত্যের সততার জয় ঘোষণা করে যাচ্ছেন। পৃথিবী হয়তো হাসছে। তারা অঙ্ক কষে মাপজোক করা cleverness দিয়ে মানুষের জীবনের গতির মোড় ফেরাতে চাচ্ছে, ফেরাচ্ছেও।

একটু হেসে বলেছিলেন—বলতো, রবীন্দ্রনাথ এখন বিরাট পুরুষ, তাঁর শান্তিনিকেতন তাঁর নিজের হাতে বুকের রক্ত ঢেলে গড়া প্রতিষ্ঠান, সেখানে তাঁর অবর্তমানে অন্তত পরের মানুষ না-আসা পর্যন্ত কালটা চালাবার কেউ আছে!

গান্ধীজী? তাঁর সম্পর্কেও সে কথা সুরেশ্বর। তাঁর পর তাঁর আদর্শ, তাঁর সাধনা অব্যাহত রাখবে কে?

শোকার্ত নগেনবাবু বলেছিলেন—কেউ বলে জওহরলাল, কেউ বলে সুভাষচন্দ্র, কেউ বলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ। একজন বললেন—সকলে মিলে। অঙ্ক কষে ওটা বলা চলে সত্য। বস্তু-জগতে গান্ধীজীর যে কাজ, তা এঁরা চালাতে পারবেন কিন্তু ভাবজগতে তা পারবেন না। তা হয় না। এ কালের পরিবর্তন।

বললাম তো, আমার ছোটভাই মদ ধরেছে। জানতে যখন পারলাম তখন দেরি হয়ে গেছে। বললে—স্বাস্থ্যের জন্য খাই, বড্ড খাটুনি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালে।

তারপর রথীন। হেসে রথীনের বাবা বললে—সে ডাক্তারী পড়ত। নানারকম ওষুধের গন্ধ দিয়ে মদের গন্ধ ঢেকে রাখত। তার সঙ্গে বড্ড পান-জর্দা আর সিগারেট। ডিসেকশন করবার সময় গন্ধ লাগে এই অজুহাতে সিগারেট ধরেছিল। আমরা মেনে নিয়েছিলাম। বুঝতে পারি নি—সতর্ক হই নি; ভাবি নি সিগারেট-জর্দা না খেয়েও অনেকে ডিসেকশন করে। কাল এমনি করেই প্রতারণা করে। আমাদের কালে সিগারেটেও দোষ ছিল। আমি, আমার মেজভাই পর্যন্ত খাই নি। মেজ অনেক বয়সে ধরেছে। ছোট তারপর রাত্রে খাওয়ার আগে ঘরে ব্র্যাণ্ডি খায়।

নর-নারীর প্রেম বৈধ-অবৈধ—এ চিরকাল আছে। সংজ্ঞা অবশ্য কালে-কালে পাল্টায়।

কিন্তু একালে সব মিথ্যে হয়ে গেছে। শুনে আশ্চর্য হবে সুরেশ্বর যে রথীন বৌমাকে বিয়ে করার আগেই একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স মেয়েকে বিয়ে করে তাকে বিলেতে মেট্রন ট্রেনিংয়ের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে, টাকা যোগাচ্ছে। এবার সে নিজে পালাচ্ছিল বিলেত। এবং তার জন্যে সে বৌমার গহনা, তার মায়ের গহনা বিক্রী করে হাজার-তিরিশেক টাকা নিয়ে বম্বে পর্যন্ত পৌঁচেছিল। বৌমাই সেটা প্রথম জানতে পেরেছিল। আমরা জানতাম কি কাজে সে বম্বে যাচ্ছে। বৌমা ঠাকুমাকে বললে—ঠাকুমা কপাল চাপড়ে আমাকে ডেকে বললেন—যা গিয়ে দেখ, ধরে নিয়ে আয়। আমি গেলাম। ধরতেও পেরেছিলাম। জাহাজখানা ঠিক দিনে ছাড়ে নি। খুঁজে-পেতে ধরে ওকে নিয়ে এলাম হোটেলে। মাথা হেঁট করেই এল। হঠাৎ বললে—বাথরুম থেকে আসি। ঢুকল ; মিনিট-দুই পরেই ফায়ারিং-এর শব্দ।

* * *

বড় আঘাত পেয়েছিলাম সুলতা। নিষ্ঠুর আঘাত। অর্চনাকে সত্যিই নিজের সহোদরার মত ভালবেসেছিলাম। ভাবছিলাম এ কি হল ? ভাবছিলাম, এরপর ওর কি হবে ? কীর্তিহাটে মেজদিকে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি, সেখান থেকে হিলডা কুইনীকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, তাদের উপর অত্যাচার করছে লোকে, বিশেষ করে ধনেশ্বরকাকার ছেলেরা, সুখেশ্বরকাকার ছেলেরা—তাদের উত্তেজিত করছেন স্বয়ং ধনেশ্বরকাকা, জগদীশ্বরকাকা ; আমি কুইনীকে হিলডাকে বলেছি, আমি ফিরে গিয়ে ওদের বুঝিয়ে বলব। যদি তারা আমার কথা শোনে তবে ভাল ; যদি না শোনে তবে সেই কথাই তোমাদের জানিয়ে দিয়ে বলব—এবার তোমরা যা-খুশি করতে পার। কিন্তু সেসব মনে করেও কলকাতা থেকে নড়তে আমি পারি নি। এই বাড়ীতে শুধু ঘুরেছি আর ভেবেছি।

এ কি করলাম একটা ভ্রান্ত আবেগবশে! অর্চনার চেহারার সঙ্গে ভবানী দেবীর চেহারার মিল আছে বলে অন্নপূর্ণা-মায়ের নাতির ছেলের হাতে তুলে দিলাম। নিজেও তো বিশ্বাস খানিকটা করেছিলাম ওই কথাটা। অন্যত্র বিয়ে দিলেই তো হতো। জগদীশ্বরকাকা তাঁর সম্বন্ধীর সম্বন্ধীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। সে দ্বিতীয়পক্ষ এবং সাব-ইন্সপেক্টর বলে অর্চনা কেঁদে বলেছিল, আমি মরব বিষ খেয়ে। কিম্বা নিজে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা দেব। বলব সকল কথা খুলে। সুতরাং ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কাকে দোষ দেব ?

এরই মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন জগদীশ্বরকাকা। এলেন সস্ত্রীক। উঠলেন আমার এই বাড়ীতেই। সদ্যবিধবা কন্যার বাড়ীতে উঠতেই ইচ্ছে ছিল তাঁর কিন্তু খুড়ীমা তা হতে দেন নি।

খুড়ীমা এসেছিলেন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। কিন্তু জগদীশ্বরকাকা এসেছিলেন রথীনের সম্পত্তির খোঁজখবর নিতে।

রথীনের ইন্সিওরেন্স ছিল কিন্তু সে-পলিসি লণ্ডনবাসিনী স্ত্রীকে দেওয়া ছিল।

জগদীশ্বরকাকা ফিরে এসে আমাকে বললেন—আমার কি সর্বনাশ করেছ তুমি জান ?

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব ? অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

জগদীশ্বরকাকা বলেছিলেন—তুমি জান রথীন অর্চনাকে বিয়ের আগে একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে—

বলেছিলাম—আপনার মতই সেদিন রথীনের বাবার কাছে শুনেছি। এবং তাঁরাও জেনেছেন রথীনের মৃত্যুর পর।

জগদীশ্বরকাকা চীৎকার করে উঠেছিলেন—খুন করে হাম্ ফাঁসি যায়েগা। হাম জগদীশ্বর রায় হ্যায়। কোইকো খাতির হাম নেহি করতা হ্যায়।

আমি কোন কথাই বলতে পারি নি। প্রতিবাদ দূরের কথা। বরং ভাবছিলাম জগদীশ্বর-কাকা যদি আমার ওপর আঘাত করেন তো নিজের কাছ থেকে গ্লানি হতে পরিত্রাণ পাই। কিন্তু জগদীশ্বরকাকার স্ত্রী প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন—ছি-ছি-ছি! তোমাকে ছি! রায়বংশ! রায়বংশের জয়ধ্বজা! বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর! কেন ওকে গাল দিচ্ছ? কি করেছে ও? টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, এই ওর অপরাধ?

সুলতা, জগদীশ্বরকাকা চিরদিন খুড়ীমাকে নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত করেছেন। নিষ্ঠুর কদর্য ভাষায় গালাগাল করেছেন। দুটো কথা তাঁর মুখে প্রায় লেগেই থাকত। হারামীর বাচ্চা হারামী আর বাঁদীর বেটী বাঁদী। শেষটা অভ্যাস করেছিলেন খুড়ীমার ওপর কথাটা প্রয়োগ করে করে। সেদিন তার একটাও বের হয় নি জগদীশ্বরকাকার মুখ থেকে।

আমার দুই কানের চারিপাশে খুড়ীমার একটা কথা বেজেই চলেছিল—বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার উপর? বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর? বজ্রাঘাত হয় না তোমাদের জয়ধ্বজার ওপর?

কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে একটু হাসলে সুরেশ্বর। তারপর বললে—জান সুলতা, সেদিন একটা হিসেব করেছিলাম। বিচিত্র হিসেব। হিসেবের শুরু হল—রায়বংশের শুরু থেকে আমি পর্যন্ত সাতপুরুষের মধ্যে জয়ধ্বজা উড়িয়ে সবার সামনে দাঁড়াবার মত কেউ ছিলেন?

হ্যাঁ, জমিদার হিসেবে ছিলেন, কয়েকজনই ছিলেন। খেয়ালী-বিলাসী হিসেবেও ছিলেন। দাতা হিসেবেও ছিলেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে? রত্নেশ্বর রায়কে প্রণাম করে বলেছিলাম—শুধু তুমিই ছিলে। তোমার অত্যাচার তোমার শোষণ-শাসন সত্ত্বেও এক তুমিই ছিলে রায়-বংশের জয়ধ্বজার মানুষ—আর কেউ না। তবে হয়তো একালে তাও নাকচ হয়ে যাবে, কারণ তুমি রায়বংশের আয়কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বাট হাজার টাকা বৃদ্ধি করেছিলে। কুড়ারাম রায়ের দেবকীর্তির কালও গেছে।

হঠাৎ চিন্তাটা রায়বংশ ছেড়ে গোটা বাংলাদেশের সমস্ত জমিদারবংশ খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন কিন্তু মুহূর্তে মাথাটা নত হয়ে গিয়েছিল।

সুলতা সেটা ১৯৩৮ সাল।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে। অবনীন্দ্রনাথও বেঁচে। কেষ্টনগরের চৌধুরী বংশের প্রমথ চৌধুরী জীবিত। কিন্তু সব প্রাচীন। নূতন কালের উজ্জ্বল মানুষের মধ্যে একজনকেও পাই নি যার কপালে জমিদারবংশের ছাপ মারা আছে! অপরিসীম বিস্ময় বোধ করেছিলাম।

জমিদারবংশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ জন্মালেন কি ক'রে? রাশিয়াতে জন্মেছিলেন 'টলস্টয়'। কাউণ্ট টলস্টয়। ঋষি টলস্টয়।

*　　　*　　　*

সেদিন কোথাও কোন সান্ত্বনা পাই নি সুলতা, হতাশায় আক্ষেপে যেন ভেঙে পড়েছিলাম। দুঃখ যেটা অর্চনার জন্যে অনুভব করেছিলাম, সেইটে—ওই জগদীশকাকার কুৎসিত কথা আর খুড়ীমার এই ক'টা কথা—"বজ্রাঘাত হয় না ওই জয়ধ্বজার উপর" আমাকে যেন পাগল করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল—রায়বংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়াই ভাল।

আবার মনে হয়েছিল—বাঁচতে হবে। যা হয়েছে তা হয়েছে, আমি বাঁচব। আমি কীর্তিহাটের সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে পালিয়ে এসে বাঁচব।

ঠিক এই মুহূর্তে রঘুয়া চাকর এসে বলেছিল—দিদিমণি আইলেন।

—দিদিমণি? চমকে উঠেছিলাম।

—অর্চনা-দিদিমণি!

অর্চনা এসেছে? বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম অর্চনার শ্বশুর তাকে নিয়ে এসেছেন এ-বাড়ী। এসেছেন আমার কাছে। জগদীশ্বরকাকা সকালে দাবী জানিয়ে এসেছিলেন মেয়েকে তিনি বাড়ী নিয়ে যাবেন। রথীনের দরুন যা তার পাওনা তা অর্চনার অভিভাবক হিসেবে তাঁকেই বুঝিয়ে দেওয়া হোক। এবং অর্চনার ভরণপোষণের জন্য মাসিক একটা খোরপোষের ব্যবস্থা করা হোক।

তাই তিনি অর্চনাকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছেন। কারণ এ বিয়ে দিয়েছিলাম আমিই। এবং আমাকে দেখেই তাঁরা আমার খুড়তুতো বোন বলে এবং অর্চনা অবিকল ভবানী দেবীর মত দেখতে বলে বিবাহ দিয়েছিলেন।

রথীনের বাপ বললেন—আমরা বউমার অভিভাবক হিসেবে তোমাকে জানি। জগদীশ্বর রায়কে জানি না। ওঁকে দেখলে এ বিয়ে হ'ত না। উনি যে দাবী জানিয়েছিলেন—বউমাকে সে সম্পর্কে মত জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি কোন উত্তর দেন নি। আমি ওঁকে এনেছি তোমার সামনে ওঁর সঙ্গে কথা বলব। কথা নয় সুরেশ্বর—একটা দলিল করেছি, দেখ।

*　　　*　　　*

দলিলখানা পড়ে আমার মনে পড়েছিল আমার ঠাকুমার কথা। আমার ঠাকুমাকে কীর্তিহাটের ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকতে দেন নি এই জগদীশ্বরকাকা আর তাঁর দাদা ধনেশ্বরকাকা। কলকাতায় তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন আমার জ্যাঠামশাই, আমার বাবা প্রতিবাদ করেন নি। করতে পারেন নি দেবোত্তর সম্পত্তির জন্যে। ঠাকুমা কোন রকমে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন বৃন্দাবনে। সেখানে স্বামীর ভিক্ষেমা, না, তাই বা কেন বলব সুলতা, বলব এক বৃদ্ধা বাঈজীর স্নেহদৃষ্টিতে পড়ে তাঁর আশ্রমে স্থান পেয়েছিলেন। নইলে হয়তো ওই ঘরে বন্দী অবস্থায় মরতেন, না-হয় বৃন্দাবনে একলা পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে ভিক্ষে করতেন। তাঁর পৈতৃক দেড় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ তাঁর বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় নিজের নামে নিজেদের নামে এনডোর্স করিয়ে নিয়েছিল। আমার বাবা নীরব ছিলেন,

কিন্তু টাকার ভাগ নিয়েছিলেন।

আর এই ১৯০০ সালের ৩৭ বছর পর কাল এমন পাল্টেছে যে রথীনের বাবা যে দলিল করে এনেছেন তাতে অর্চনার জন্য মাসিক একশো টাকা মাসোহারা, তা ছাড়া বছরে দুবার দেড়শো করে তিনশো টাকা মোট পনেরশো টাকার ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্য ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছেন। কিন্তু সে মূল টাকায় অর্চনার অধিকার থাকবে না। অর্চনার মৃত্যুর পর সে টাকা তাঁর অন্য উত্তরাধিকারীরা পাবে। যদি বর্তমান কালের ধারা অনুযায়ী অর্চনা বিধবা বিবাহ আইন অনুযায়ী বা তিন আইন মতে বিবাহ করে, তবে অর্চনা এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পাবে তার সংসার পাতবার জন্য; অবশ্য তারপর আর মাসোহারার অধিকারিণী সে হবে না।

ইচ্ছানুযায়ী সে পিত্রালয়ে বা হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ীতে থাকতে পারবে বা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রও থাকতে পারবে সে এবং সেক্ষেত্রে মাসিক তিরিশ টাকা পর্যন্ত বাড়ীভাড়া পেতে পারবে।

আমি বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর উদারতা দেখে।

অর্চনার শ্বশুর বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে বউমা আমার কাছেই থাকেন, পড়াশোনা করেন; এ অবস্থায় পড়াশোনাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আগে হলে দীক্ষা দিয়ে পূজো-অর্চনার পর ধরানো নিয়ম ছিল—এ যুগে শিক্ষা—। কিন্তু ওঁর কি মত তা উনি বলেন নি।

অর্চনা বরাবর এসে অবধি বসে ছিল পাথরের মূর্তির মত। সে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল—না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বলেছিল—সুলতা, অর্চনা এখানে বসে আছে তাই বলছি নইলে রায়বাড়ীর জবানবন্দীর মধ্যে বাংলার নূতন যুগের শিক্ষিতসমাজের একটি উজ্জ্বল ঘরের লুকানো অন্ধকারের কথা প্রকাশ করতাম না। রায়বংশের ছবির সারির মধ্যে মুখুজ্জেবাড়ীর অন্ধকারের ছবি এখানে টাঙিয়ে দিতাম না।

সেদিন কথাটা অনুমান করতেও পারি নি। অর্চনাকেই দোষ দিয়েছিলাম। এদের বাড়ীটাও পচে গিয়েছিল।

অর্চনা নিজেই এবার বললে—আমি অনুমানে বুঝেছিলাম, ঠিক প্রমাণ তখনও পাই নি। তবে ভুল আমি করি নি। আলোর তলার অন্ধকার নয়—লণ্ঠনের উপরেও অন্ধকার জমে গোটা আলোটাকেই কালিপড়া লালচে আলোয় পরিণত হয়েছিল বাড়ীটা। ছ বছর পর ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের সময় আমার দেওরদের যে চেহারা দেখেছি; সে চেহারার পত্তন ছ বছরের অনেক আগে হয়েছে। ওখানে থাকলে আমার নিষ্কৃতি ছিল না, সে যেন আমার অন্তর আমাকে বলে দিয়েছিল। ও বাড়ীতে থাকতে আমার সাহস হয় নি।

সুরেশ্বর বাধা দিয়ে বললে—থাক ওদের কথা। রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে ওইখানেই মানে রথীনের আত্মহত্যা আর অন্নপূর্ণা-মায়ের মৃত্যুর সঙ্গেই ওদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে। ওরা যা হয়েছে তা নিয়ে ওরা আছে। দুনিয়ার অন্তরাত্মা বলে একটা সত্তা আছে। তাতে

আমি বিশ্বাস করি। মাটির বুকের মধ্যে তার উৎস, কিন্তু মানুষের বুকের ভিতরেই সে গঙ্গাধারা হয়ে বয়ে গেছে। আজ সে ধারা কীর্তিনাশা হয়ে সব ভেঙেচুরেই দিক আর ভাগীরথীর মত সে মজেই যাক কাল আবার তার মোড় ফিরবে। নতুন চেহারা নেবে সে। সেই ভরসায় মানুষ বাঁচে। আমিও সেই ভরসায় বেঁচে রয়েছি, জবানবন্দী দিয়ে জমিদার জীবনের পালা শেষ ক'রে নতুন জীবন শুরু করতে চাচ্ছি। এখন জবানবন্দীর কথায় আসি। সুলতা যে কথা অর্চনা বলতে যাচ্ছিল সে বড় মর্মান্তিক। ওর শ্বশুরবাড়ীর কথা। ওর দেওরদের কথা, ওর খুড়শ্বশুরদের কথা। যুদ্ধের সময় ওরা ওয়ার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিল; সে সময় কণ্ট্রাক্টররা যা করেছে তা বলবার প্রয়োজন নেই। সেটার আঁচ শ্বশুরবাড়ীতে মাস আষ্টেকের মধ্যেই অর্চনা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে সময় ভয় ছিল না, কারণ তখন অন্নপূর্ণা-মা বেঁচে-ছিলেন আর রথীনও তখন বেঁচে। রথীনের জীবনে পাপপুণ্য ছিল না, ধর্ম-অধর্ম ছিল না। কিন্তু অর্চনার উপর অধিকারের দাবী তার ছিল। বাপকে সে বলেতে বলেছিল—ভুল করেছি রেজেস্ট্রী করে বিয়ে ক'রে, হিন্দুমতে দশটা বিয়েতে বাধা নেই—হিন্দুমতে বিয়ে করলে আমাকে মরতে হ'ত না। মা-মণির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও হয়তো মাফ পেতাম।

যাক—। অর্চনা কীর্তিহাট ফিরল ওর বাবার সঙ্গে; জগদীশকাকা এবং ওর মা ওকে নিয়ে কীর্তিহাট ফিরলেন। আমি তার আগেই কীর্তিহাটে ফিরেছি এবং কীর্তিহাটেই নয়, আশপাশ চারিদিকের মানুষের কাছে রায়বাড়ীর জমিদারীর প্রজার কাছে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছি; হয়েছি গোয়ানদের সমর্থক হিসাবে এবং সেই সূত্রে ইংরেজ সরকারের সমর্থক হিসেবে।

মেদিনীপুরে কুইনী এবং হিলডা এসে অভিযোগ করেছিল—গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে। তারা তাদের উপর কংগ্রেসবিরোধী হিসেবে অত্যাচার করছে। আমি যদি এর প্রতিকার করি তো ভাল, নাহলে তারা মেদিনীপুরের ডি-এম-এর কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সেই কারণে কুইনী হিলডা খড়্গপুরের মিসেস হাডসনকে নিয়ে এসেছিল। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, অনুরোধ করেছিলাম মিটমাটের চেষ্টা আমি করব এবং বোধ হয় মিটমাটও হয়ে যাবে; তবে তোমাদের কাছে অনুরোধ—তোমরা অপেক্ষা কর।

অপেক্ষা তারা করেছিল। কুইনী হিলডা মেজদির সঙ্গেই কীর্তিহাট ফিরে গিয়েছিল। আমি চলে এলাম কলকাতায় অর্চনার দুর্ভাগ্যের সংবাদ পেয়ে।

সেই কারণেই আমি অর্চনা এবং জগদীশকাকাদের রেখেই কীর্তিহাট চলে এসেছিলাম। দেখলাম সারা অঞ্চলটার মানুষ ওই গোয়ানদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়ে তাঁদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গোয়ানরা ভীত হয়েছে। কিন্তু নত হয় নি। তারাও প্রতিজ্ঞা করেছে তারা নত হবে না। তারা দেশের মালিক ভারতবর্ষের এম্পায়ারের সঙ্গে স্বধর্মাবলম্বী। কেন তারা নত হবে?

দুটো-চারটে ছোটখাটো ঝগড়াও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আমি কলকাতায় তখন, কুইনী হিলডা আমার প্রতিশ্রুতি পেয়েও তার উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারে নি। গোয়ানদের নেত্রীত্ব করেছে কুইনী। ব্যাপারটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত যায় নি। কিন্তু এস-ডি-ও পর্যন্ত

গিয়েছে এবং এস-ডি-ও সার্কেল অফিসারকে তদন্তের ভার দিয়েছিলেন। জেলাটা মেদিনীপুর, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তাণ্ডব শেষ হয়েছে মাত্র দু বছর আগে। সার্কেল অফিসার পুলিস রক্ষী নিয়ে এসেছিলেন তদন্তে। অভিযোগ এখানকার কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় তাদের বয়কট করা হয়েছে এবং নানাভাবে তাদের বিব্রত করা হচ্ছে। তারপর ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে কোন দিন কি অত্যাচার হয়েছে গোয়ানদের ওপর। সে ফিরিস্তি অনেক। শুরু হয়েছে সিদ্ধাসন জঙ্গলে গোয়ানদের প্রবেশাধিকার থেকে। শেষ হয়েছে গোয়ানপাড়ার মেয়েরা এবং ছেলেরা কীর্তিহাটের স্কুলে জায়গা পায় না। এ ছাড়া অভিযোগ হয়েছে রায়বাড়ীর ধনেশ্বরকাকার ছোটছেলে নবযুবক অরুণেশ্বর এবং সুখেশ্বরকাকার ছোটছেলে দীপকেশ্বরের বিরুদ্ধে। তারা এই বয়কটের সুযোগে গোয়ানপাড়ার মেয়েদের উপর ঘৃণ্য অত্যাচার শুরু করেছে।

সাধারণের পক্ষে এসেছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি সেই বৃদ্ধ রঙলাল ঘোষ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন কুইনীকে যে, কোন অন্যায় কীর্তিহাটের লোকে স্বীকার করে না। কীর্তিহাটে থেকে যারা কীর্তিহাটের লোকেদের সমর্থিত প্রার্থীকে সমর্থন করবে না তাদের সঙ্গে কীর্তিহাটের লোকের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ঘরে আগুন তারা লাগাবে না এটা নিশ্চিত কিন্তু তাদের ঘরে আগুন লাগলে নেভাতে যাবে না। তারা কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে যদি একধর্মের লোক না-হয় তবে তাদের কীর্তিহাটের লোকের ধর্মস্থানে ঢুকতে দেবে না। প্রয়োজন হলে লেনদেন কাজকারবার সব বন্ধ করে দেবে।

কুইনী বলেছিল—মুসলমানরা কংগ্রেস-বিরোধী—তাদের সঙ্গে এই রকম করতে পারেন? সারওয়াদী সাহেবের বাড়ী মেদিনীপুর শহর।

ঝগড়া বেশ দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। অরুণেশ্বর দীপকেশ্বরের অপরাধ ঠিক প্রমাণিত হয় নি। কীর্তিহাটের লোকেরা বলেছে—না—না—না। তাদের চরিত্র বড় ভাল।

সার্কেল অফিসার ফিরে গেছেন। প্রমাণ পান নি।

তারপর কুইনীর নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে হাতেলেখা পোস্টার মেরে কীর্তিহাট গোয়ানপাড়ার দেওয়াল ছেয়ে দিয়েছে কারা।

কুইনীর পড়ার খরচা দেয় কেন সুরেশ্বর রায়? কুইনা নেয় কেন? কুইনীর কলকাতার বাড়ী খালাস করতে টাকা কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে?

এই অবস্থায় আমি গিয়ে পৌছুলাম সুলতা।

আমার নায়েব আমাকে সমস্ত কথা বলে বললে—আপনি এ নিয়ে কিছু করবেন না, বলবেন না। ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে উঠবে।

ওদিকে ঠাকুরবাড়ীতে মেজদির প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন ধনেশ্বরকাকারা। ওখানে শিবেশ্বর রায়ের বংশের লোকেরা জোট বেঁধেছে।

মেজদি যেন বোবা হয়ে গেছেন। হবারই কথা। এগুলো আগে থেকেই তিনি কল্পনা করেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন—স্বর্গ-বৈকুণ্ঠ-কৈলাস এ সবের কথা বইয়ে পড়েছি ভাই, গল্পে শুনেছি, যাত্রার দলে থিয়েটারে সাজিয়েগুছিয়ে দেখিয়েছে দেখেছি, যতক্ষণ পড়ি যতক্ষণ

শুনি যতক্ষণ দেখি বেশ লাগে। কিন্তু ভাই পিথিবীতে যেখানে যত ঠাকুর আর ঠাকুরবাড়ী আছে, সেখানে মানুষে যা করে তাই হয়—দেবতার মহিমা কোথাও দেখি নি বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। রায়বাড়ীর কালীমা, গোবিন্দ, সৌভাগ্য-শিলা সত্যি হলে তারা কি ওই পচা মেজতরফের দত্যিগুলোর হুকুমে চলে? ওখানে আর আমি থাকতে পারব না। তার থেকে তুই আমাকে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই। আমি বড়দি'র আশ্রমের উঠোন ঝাঁট দিয়ে ভিক্ষে করে খাব।

তিনি এ সব বিষয়ে একটি কথা বলেন নি। ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে যান নি। বাড়ীতে ওঠেন নি। উঠেছেন বিবি মহলে।

তিনিও আমাকে বললেন—ভাই, ধোঁয়ানো আগুনে খোঁচা দিস নে ভাই, বাতাস দিস নে, দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে।

আমি ভাবলাম—কি করব?

হঠাৎ বিকেলবেলা কুইনী এল ক'জন গোয়ানকে সঙ্গে ক'রে—আমার সামনে মাথা তুলে সদর্পেই জিজ্ঞাসা করলে—এই আপনার কথার দাম? আমি কথা দিয়েছি, সে তার দাম যাচাই করতে ছাড়বে কেন?

নির্ভীক মেয়েটাকে দেখে খুশী হয়েছিলাম এবং তোমার কাছে গোপন করব না আমার দেহের মধ্যে দেবেশ্বর রায়ের রক্ত সাড়া দিয়ে উঠেছিল। আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

মুখচোখ লাল হয়ে উঠল কুইনীর। সে হিলডাকে বললে—চল দিদিয়া, জবাব পেয়েছি। চল। বাবুজাত—রায়বাহাদুরের জাত আলাদা হয় না। চল।

আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। লজ্জিত হলাম। বললাম—মাফ কর কুইনী। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। আমি কথা দিয়েছি চেষ্টা করব। আবার বলছি সে চেষ্টা আমি করব। আমি কালই বলব সকলকে। ওঁরা না-শুনলে যা ইচ্ছা হয় করো।

১৯৩৮ সালের মে মাস। আমি কীর্তিহাটের জমিদার অর্থসম্পদহীন মেজতরফ নয়; অর্থবল আমার ছিল; কিন্তু সেদিন আমিই গেলাম কীর্তিহাটের রঙলাল ঘোষের বাড়ী।

জমিদার মহাজন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সকলে সেদিন মানতে বাধ্য ছিল রঙলাল ঘোষকে।

রঙলাল ঘোষ আমার সঙ্গে দেখাই করলেন না। ফিরিয়ে দিলেন, বললেন—শরীর খারাপ, তা ছাড়া সময় নেই। জবাবটা বহন ক'রে এনেছিলেন রঙলাল ঘোষের বড়ছেলে। লোকটি মিষ্টভাষী লোক। তিনি বললেন—"বাবা কি বলবেন? তিনি জানেন আপনি যার জন্যে এসেছেন। ও হবে না। গোয়ানদের সঙ্গে মিটমাট হবে না। আপনিও ও নিয়ে জড়িয়ে থাকবেন না। আর ওই কুইনী মেয়েটার পড়ার খরচা আপনি দেন তাও আর দেবেন না। আপনার বদনাম রটছে। ওদের সঙ্গে থাকলে লোকে ধর্মঘট করবে। খাজনা দেবে না। সঙ্গে সঙ্গে সোসাল বয়কটও করবে।"

আমি মাথা নিচু ক'রে ফিরে এলাম সদগোপপাড়া থেকে রায়বাড়ী। পথে কতকগুলি ছেলে হাততালি দিলে। হঠাৎ একটা নির্জন জায়গায় কে কোথা থেকে বললে—জমিদার! ফলিয়ে দেব জমিদারী। হেসে সুরেশ্বর বললে—এতদিনের রায়বংশের যে ছেলেটি কীর্তিহাটে

উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করছিল তার গায়ে তারাই অবহেলা অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার কালি মাখিয়ে কালো করে দিল।

তা করুক। আমি অন্যায় করি নি এই জোরটা আমার ছিল। তাই ওখান থেকে চলে আসব সংকল্প করেছি আবার ভেঙেছি, ভেঙে সেখানে ওই কালি মেখেই কালো মুখ নিয়েই থেকেছি দিনের পর দিন। এরই মধ্যে গাঁয়ে ফিরে এলেন জগদীশকাকা অর্চনাকে নিয়ে। এবং কন্যার সম্পদ মাসিক একশো টাকা আয় আর অর্চনার গহনার মূলধন সে প্রায় পনের হাজার টাকার উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে ফিরলেন। অর্চনা তখনও মুহ্যমান।

ঠিক একদিন পর অর্থাৎ পরদিন সকালেই মেজদিদি ওবাড়ী থেকে ফিরে এলেন সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে। দুই চোখ থেকে চোখের জলের ধারার আর বিরাম ছিল না।

জগদীশ্বরকাকা তাঁর গলা ধরে বাড়ী থেকে বের ক'রে পথের উপর ফেলে দিয়েছেন, চাৎকার ক'রে কুৎসিত ভাষায় তাঁর অপমান করেছেন। জেলে গিয়ে তাঁর জাত গিয়েছে। অজাতের হাতে খেয়েছেন—তাছাড়া আরও অনেক কিছু। অর্চনা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু মুহূর্তে জগদীশ্বরকাকা তাকে শাসিয়ে বলেছেন—এখনি গিয়ে পুলিসের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ ক'রে তোমাকে ঠেলে দিয়ে আসব শ্রীঘরে।

শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মেজদি হাতজোড় ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন— আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দে ভাই। তোর পায়ে ধরছি আমি।

তাই ঠিক করে ফেললাম। মেজদিকে বৃন্দাবনেই দিয়ে আসব। সেই ভাল—শিবেশ্বর রায়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী জেল থেকে ফিরে এসে নির্বাসিতা দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রীর পাশেই ব্রজধামের রজের উপর জীবনের শেষ আশ্রয় গড়ে তুলুন। আর কোথায় যাবেন ?

গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করা থেকে ভাল। শহরে বাজারে ব্যবসাদার কি চাকরে বড়-লোকের বাড়ীতে দাসী বা রাঁধুনীবৃত্তি থেকে সে ভাল।

যাবার সময় খবর শুনে শুধু অর্চনা এসেছিল। দেখলাম ওর চোখ দুটো ঝক্ঝক্ করছে। শোকের মুহ্যমানতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে—তাই যাও সুরোদা। সেই ভাল। বললাম—ভালো নয় ? জমিদার শিবেশ্বর রায়ের স্ত্রীর অন্যের বাড়ী দাসী বা রাঁধুনী হওয়া থেকে তো ভাল !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল অর্চনা। তারপর সুরেশ্বর অর্চনার দিকে তাকিয়ে বললে— তোর মনে আছে অর্চি ?

একটি রেখার মত ক্ষীণ হাসি নিঃশব্দে তার ঠোঁটের দুই প্রান্তে ফুটে উঠল—সেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—মনে নেই ? নিজের কথাও তো ছিল ওর মধ্যে সুরোদা। আমি তো তখন বুঝতে পেরেছি, বাবা আমার গয়নার টাকার উপর নজর ফেলেছেন। রাত্রে মাকে বলেছেন—গয়নাগুলো বেচে একবন্দ ভাল জমি কিনে ফেলব অর্চির নামে। আর কিছু টাকা নিয়ে তেজারতি করব। আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। শুনে সারারাত ঘুমুই নি। ভোরে উঠে তোমার ওখানে বিবিমহলে এলাম। তুমি বললে মেজদিকে বৃন্দাবনে রাখতে যাচ্ছি। আমার মনে পড়েছিল দ্রৌপদীর অজ্ঞাতবাসে সৈরিন্ধ্রী হয়ে চাকরি করার কথা।

সেকালে দাসী হয়েও এঁটো খেতে হয় নি, পায়ে হাত দিতে হয় নি ; তা ছাড়াও কীচকের মত মহাপাষণ্ডের হাত থেকেও বাঁচা সম্ভবপর হয়েছিল। একালে দ্রৌপদীরা মানে রাজা জমিদারবাড়ীর মেয়েরা চাকরি করতে গেলে ওর কোনটা থেকে রেহাই পাবে না। যাও তুমি দিয়ে এস। সেই ভাল। সেইদিনই রওনা হয়েছিলাম।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণাবাঈয়ের আশ্রমে আমার জন্যে পরমতম বিস্ময় আর ধ্রুবতারার মত স্থির আর শেষ নির্দেশ অপেক্ষা করে ছিল তা আমি জানতাম না। কোন ভৃগুজাতকের গুণীনও গণনা করে বলতে পারতেন না ; কোন মানুষ কল্পনা করতে পারতেন না।

আশ্রমে ঢুকতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

কত পরিচিতের মত বললেন—এসেছ ?

আমি অবাক হয়ে গিছলাম তাঁকে দেখে। গায়ের রঙটা টকটকে গৌরবর্ণ, ছোটখাটো মাথায়, বেশ মোটাসোটা মানুষটি ; তিনি সুন্দর কি অসুন্দর সে বিচার বোধ হয় কেউ করবে না—দেখলেই মনে হবে আহা কি প্রসন্ন মানুষ!

তিনি আবার বললেন—এসেছ তো অনেক দিন—, এতদিনে। বলতে বলতে থেমে গিয়ে বললেন—দেনাশোধের পালা এবার। নয় ? আমি জানি, আমি জানি। দেনা যে শোধ করতে হবে তোমাকে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সেদিন আমি আমার পিতামহীর সামনে বসে তাঁর কথা শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে কি বলব, তিনি যা বলেছিলেন, তাই মনে হয়েছিল ধ্রুবসত্য। মনে হয়েছিল, তিনি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন, ভবিষ্যৎ যেন দেখতে পাচ্ছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করে বলছেন। মনে হয়েছিল, তিনি আর মানুষ নন। মানুষের দেহেই তিনি দেবতার চেয়েও পবিত্র হয়েছেন, জগতের সব ন্যায়, সব ধর্ম তাঁকে আশ্রয় করে যেন ধন্য হয়ে গেছে।

তিনি বলছিলেন, নাতি, আমার সঙ্গে কথা হয় ঠাকুরের। সে ভাই অনেকদিন থেকে। কীর্তিহাটে মন্দিরে গেলে কথা হতো, এখানে ভাই চব্বিশ ঘণ্টা। আমার আশেপাশে অহরহ ফিরছে, কথা বলছে, বুঝেছ নাতি!

ঘাড় নেড়ে আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ বুঝেছি। মাথার গোলমাল তাঁর অনেকদিন হয়েছে। কিন্তু সে-কথাটা আমলই পায় নি মনের কাছে। আমি দেখলাম, পৃথিবীর সবকিছু আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে তাঁর কাছে। যা ঘটেছে, যা ঘটছে, তার কারণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করে ফেলেন। কিছুই অগোচর থাকে না। সব। সেই সর্বঘটে যাঁর অধিষ্ঠান, তাঁর ইচ্ছে। বলেন—ওই তো, মজা লাগাতে সে ওস্তাদ। মহা ওস্তাদ! বিপদে ফেলে মজা দেখে। বিপদেও ফেলে আবার ভরসা করলে পারও করে সেই।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক তখন, ১৯৩৮ সাল, এর ন' বছর পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। তারও দু বছর আগে এ্যাটমিক যুগ আরম্ভের যুগ। ১৯৪৫ সালে। সেই ১৯৩৮ সালেও তিনি কেমন জান ? মডার্ন ইণ্ডিয়ার মধ্যে আজও যেমন গঙ্গাসাগর মেলায়, পূর্ণকুম্ভে, প্রয়াগে, হরিদ্বারে অতীত ভারতের বিচিত্র রূপ লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে, ঠিক তেমনি। এবং গঙ্গাসাগরে দারুণ শীতে বাংলার মন্ত্রীদের স্নান করার এবং প্রয়াগে কুম্ভে সেণ্টারের

মন্ত্রীদের স্নানের মধ্যে মডার্ন ইণ্ডিয়া যেমন পুরানো ভারতের কাছে সবিস্ময়ে মাথা নত করে আমিও সেদিন তেমনি করে অভিভূত হয়ে তাঁর কথা মেনে নিয়েছিলাম পরম সত্য এবং ধ্রুবসত্য বলে। একবিন্দু সংশয় যেমন তাঁর বলার মধ্যে ছিল না, তেমনি শোনার মধ্যেও আমার এতটুকু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল না।

একটু চুপ করে থেকে আবার সুরেশ্বর একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করলে, বললে—পরে এ নিয়ে আমি বিচার করেছি, খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখেছি। কেবল একটা কথা বা তাঁর একটা ধারণা ছাড়া বাকিগুলির মধ্যে অবিশ্বাসের কিছু ছিলও না।

ঠাকুমা সেই গোড়াতেই আমাকে ডেকেছিলেন—'বড়বাবু' বলে। অর্থাৎ দেবেশ্বর রায়ই জন্মান্তর নিয়ে আমি অর্থাৎ সুরেশ্বর হয়ে জন্মেছি—এই ধারণাটার কথা বলছি। ওটা তিনি ছাড়েন নি। সায়েন্স অব হেরিডিটির কথা মোটামুটি জানি, কিন্তু ভাল ভাবে জানি না, তাঁকে বোঝাতে গিয়েও বোঝাতে পারি নি, আর তিনি তা ঘাড় নেড়ে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিলেন। একটি বুলিই ধরেছিলেন—জানি 'বড়বাবু' জানি। এসব আমি অনেকদিন আগে থেকে জানি। তুমি আবার আসবে, তোমাকে আবার নতুন জন্ম নিয়ে রায়বাড়ীতেই আসতে হবে, তোমাকে দেনা শোধ করতে হবে।

সুলতা, তাঁর কথাগুলো আজও আমার কানে বাজছে। বলেছিলেন—বড়বাবু, যত বড় মানুষটা তুমি, তার শতগুণ ভারী দেনার বোঝা তোমার ঘাড়ে। জন্মে জন্মে বোঝা বাড়িয়েই চলেছ, বাড়িয়েই চলেছ; এবার বোঝা নামাও, শোধ করো, দেনার বোঝা শোধ করো।

আমার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বলেছিলেন—আমার কাছে একটা কথা আদায় করেছিলে, তোমার মনে আছে? সেই তুমি মারা গেলে তার ক'দিন আগে! বলেছিলে—বড়বউ, তোমার ঠাকুর ঠিক বলেছেন—দেনার জন্তেই জন্মে জন্মে তোমাকে পেয়েও আমি পাচ্ছিনে। এবার দেনা শোধ করবই। তোমাকে পেতে হবে বড়বউ, প্রাণটা আমার হাহাকার করছে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বুঝতে পারছিলাম পাগলের প্রলাপ; কিন্তু তবুও অশ্রদ্ধা করে তাকে অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। উঠে পালিয়ে আসতেও পারছিলাম না। শুধু একটা রুদ্ধ বেদনার আবেগ বুকের মধ্যে আমার উথলে উথলে উঠছিল। ভাবছিলাম—রায়বাড়ীর দেবেশ্বর রায়ের গৃহিণী রত্নেশ্বর রায়ের মহাসমাদরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূই এঁর পরিচয় নয়, এঁর পরিচয় সীতা-সাবিত্রীর মত, এঁকে ধনসম্পদ আর মিথ্যা মর্যাদা-স্ফীত রায়বংশ এইভাবে পরিত্যাগ করেছে। হতভাগ্য রায়বংশ! অথবা রায়বংশের মত সব বংশের ভাগ্যই এই। সে সেই রামায়ণের কাল থেকে। সীতাকে বনবাসেই যেতে হয়, শেষ হয় পাতাল প্রবেশে। সঙ্গে সঙ্গে বংশের লক্ষ্মীও উবে যান।

• তুমি জান কিনা আমি জানি না, মহারাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে একটা জনপ্রবাদ আছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাড়ীতে মা ভবানী ছিলেন কন্যারূপা হয়ে। যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্য জামাই রামচন্দ্রকে হত্যা করব বলে স্থির করলেন, রাজ্যের জন্ম, মর্যাদার জন্ম, তখন নাকি তাঁর

মেয়ের রূপ ধরে মা ভবানী এসে বলেছিলেন—বাবা আমার মুখের দিকে তাকাও—। শক্তি আর অহংকারমত্ত প্রতাপাদিত্য বলেছিল—চলে যা আমার সুমুখ থেকে, তোর মুখ আর দেখব না।—

মা সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের অহংকার আর অধর্ম-উত্তপ্ত বাড়ী ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁর ঝাঁপিটি নিয়ে। গিয়ে উঠেছিলেন ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ী।

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে গল্পটা একটু অন্যরকম করে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—মা প্রথম ছিলেন হরি হোড়ের বাড়ীতে। তারপর ঠিক ওইভাবেই কন্যাবেশে হোড়মশায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন—বাবা, আমি আর থাকতে পারছিনে। তোমার জামাই আসছে। হোড় রেগেই ছিলেন মেয়ের ওপর, বলেছিলেন—যা-যা, এখুনি যা।

মা অন্নপূর্ণা গঙ্গা পার হয়ে যাবার সময় ঈশ্বরী পাটনীর কাঠের সেঁউতি সোনা করে দিয়ে আর তার ছেলেরা দুধে-ভাতে থাকবে এই বর দিয়ে মজুমদার-বাড়ী প্রবেশ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের গল্পটা আমাকে বলেছিলেন আমার মেজদিদি, শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষ পুরুত ভটচাজের কন্যেটি; তিনি কার কাছে এটা শুনেছিলেন তা বলতে পারিনে।

আমি সেদিন আমার ঠাকুমার সামনে বসে সেই গল্পটাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, রায়বাড়ীর লক্ষ্মী ছিলেন এই বড়-বউটি; তাঁকে উপেক্ষা করলেন সবাই। স্বামী দেবেশ্বর রায়, ছেলেরা—যজ্ঞেশ্বর রায়, যোগেশ্বর রায়, মেজতরফের দেওর শিবেশ্বর রায় থেকে তাঁর ছেলে ধনেশ্বর, জগদীশ্বর সুখেশ্বর—সবাই।

ইনি বুঝি তিনিই। রায়বাড়ীর লক্ষ্মী। ইনি যা বলছেন, বাস্তব বিচারে তা প্রলাপ হলেও প্রলাপ নয়। এই হল সত্যকারের সত্য।

সুলতা, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কথা ঠাকুমা ?

বৃদ্ধা বিরক্ত হয়ে বললেন—দেখ, ওই ভালবাসিনে! ওইসব কথা চাপা দেওয়া! তুমি বল নি আমাকে, বড়বউ তুমি বল, আমাকে তুমি জন্মজন্মান্তরে কামনা করবে! আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? আমি চুপ করেছিলাম। তোমার সে কি জেদ! কি বলব বল, আমি তো সবই জানি। ঠাকুরের সঙ্গে কথা হত, তিনি তো আমাকে সব বলতেন। আমি তাঁকে শুধিয়েছিলাম—এত কষ্ট কেন আমার কপালে লিখলে? ঠাকুর বললেন—এর আগের ক' জন্ম আমাকে ফেলে তুই ওর পেছনে ছুটেছিস। আমি ডেকেছি আসিস নি। এবার ও তোকে ছুঁড়ে ফেলেছে, এবার তুই আমার কাছে এসেছিস, এবার তোর মুক্তি। তোর স্বামীকে সব দিয়েছিলাম। নিলে কই। নেবার মধ্যে নিলে রূপোর তাল, তার রূপের তাল। তাহলে কি বলব? তবু তুমি ছাড় না। তখন বললাম। তুমি বললে, বড়বউ, আজ থেকে জীবনের দেনা শোধ করব। তুমি শুধু এইটুকু বলো ঠাকুরকে—ঠাকুর, মুক্তি আমাকে দিয়ো না, আমাকে তোমার দাসী করে রাখ, যেদিন তার মুক্তি হবে সেইদিন মুক্তি দিয়ো আমাকে। সে ঋণশোধ করবে, কড়াক্রান্তি হিসেব করে, শোধ করবে বলে কথা দিয়েছে আমাকে। দেবেশ্বর রায় আমার সাধের বর—আমার মোহন বড়বাবু, আর যা করবে করুক, মিথ্যে কথা বলে না।—

—সে-সব বলেক'য়ে আজ ভুলে যাচ্ছ বড়বাবু! ছি-ছি-ছি।

মেজদি অবাক হয়ে সব শুনছিলেন, তিনি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন—তা ও করছে দিদি, তা ও করছে।

—করছে? তবে যে বড়বাবু জিজ্ঞাসা করছ, 'কি কথা ঠাকুমা?'

হেসে বলেছিলেন—আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তা তুমি তো জান আমি ঠাট্টা বুঝি না। বোকাসোকা মানুষ। বাবাঃ যা ভয় লাগত, কথা তো নয় যেন জেরা। এখন নাতি হয়ে জন্মেছ, ভয় আর ঠিক করে না। ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি। করব? আমি বললাম—করুন। জিজ্ঞাসা করলেন—মদ খাও? মাথা হেঁট করে বললাম—খাই ঠাকুমা। বললেন—হুঁ, আমি জানি। বড়বাবু মদ না-খেয়ে থাকবে! বাবাঃ, বড়বাবুর বাপ, বাঘের মত বাপ, তিনি রাগ করে গর্জাচ্ছেন, বড়বাবু টেবিল ধরে টলছেন আর আমাকে বলছেন, বড়বউ, আমার সেই গুলি খাওয়া জায়গাটায় ব্যথা করছে, মালিশ দিয়ে দেবে চল। আর বাবাকে বল, কাল—কাল কথা বলব। আর বিয়ে করেছ? বিয়ে? এবার মেজদি বললেন—না দিদি, বিয়ে করে নি। বললেন—করে নি? তাহলে? বড়বাবু আবার সেই পাপ বাড়াচ্ছ? না-না ভাই আমার, লক্ষ্মী সোনা আমার, ও-পাপ করো না ভাই। ও মহাপাপ। আমি হাত জোড় করে বললাম—না ঠাকুমা, বিয়ে আমি করি নি। কিন্তু যে-পাপের কথা বলছেন, সে-পাপও আমি করিনে। আমি রায়বংশের অভিশাপের কথা জানি, আজ ছ'পুরুষ পর্যন্ত জমানো পাপের কথা জানি।

—রাশি রাশি পাপ। ওরে নাতি, রায়বংশের পাপ জমা করলে পাহাড়-পর্বত হয় রে—পাহাড়-পর্বত হয়।

হঠাৎ যেন পাল্টে গেলেন ঠাকুমা। কি ভাবনায় যেন ডুবে রইলেন, তারপর যেন অনেকটা সহজ মানুষের মত বললেন—কি নাম তোমার নাতি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, সুরেশ্বর। অবিকল তুমি বড়বাবুর মত দেখতে; বড়বাবু শেষকালে কিছুদিন আমাকে ভালবেসেছিলেন। আমি দেবতা দেবতা করতাম, আমাকে বলেছিলেন—দেখ আমি পুরুষমানুষ, তোমাকে আমি বিয়ে করেছি, কেউ যদি তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে আসে, তবে আমি তার সঙ্গে লড়ব, মরব, তার আগে তো ছেড়ে দেব না। সে যদি তোমার গোবিন্দ এসে কেড়ে নেন, তবে আমি তাঁর সঙ্গেও লড়ব। না লড়ে, না মরে তোমাকে আমি ছিনিয়ে নিতে দেব না।

চোখ থেকে তাঁর জল গড়াল। বললেন—দেখ ভাই, তখন কি জানতাম কথাটা এমনি করে ফলবে! তিনি মারা গেলেন। আমাকে ঠাকুর কেমন কৌশল করে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন দেখ। ভাই, আমার ভিক্ষে-শাশুড়ীকে দিয়ে পুরী তৈরী করে এখানে রাখলেন। তা ভাই আমার দশা হল, আমি এসে না পারলাম ঠাকুরকে আত্মসমর্পণ করতে, আর না পারলাম মরতে। দেখ! আঃ, তোমাকে দেখে কত কথা যে মনে পড়ছে। তুমি ভাই অবিকল আমার সেই বড়বাবু। বুঝেছ! বড় আবোলতাবোল যে মনে পড়ছে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—হাঁ যা বলছিলাম, শোন ভাই নাতি। রায়বংশের পাপের কথা। বড়বাবু আমাকে বলেছিলেন—বড়বউ, পাপ আমাদের জমা করলে পর্বত হয়,

গঙ্গার বুকে ফেললে গঙ্গার বুক পুরে ওঠে, মজে যায়। আমি হিসেব করে দেখেছি বড়বউ। পাপ শুধু একরকম নয়, যত রকমের পাপ হতে পারে, সব-সব—সব রকম পাপ জমা হয়েছে রায়বাড়ীর পাপ-পুণ্যের সিন্দুকে। পাপের সিন্দুক বোঝাই। দেখ রায়েদের জমিদারীতে পত্তনীতে, দরপত্তনীতে একশো পঁয়ত্রিশখানা গ্রাম। এ-গ্রামের খাজনা বাড়িয়ে তিন ডবল করেছি। একশো পঁয়ত্রিশখানা গ্রামে কমপক্ষে পনের হাজার লোকের বাস, আজ পাঁচপুরুষ ধরে পাঁচ-পনেরং পঁচাত্তর হাজার লোকের মাথায় পা দিয়ে হেঁটেছি। পুজো করে ওরা যে লক্ষ্মী ঘরে তুলেছে, সে-লক্ষ্মীর ভাগ নিয়েছি। ঘরে আগুন দিয়েছি। চাবুক মেরেছি। বুকে গাছের গুঁড়ি চাপিয়েছি; থামের সঙ্গে বেঁধেছি। তাছাড়া বড়বউ নিজেদের পাপ—মদ খেয়ে নিজের সর্বনাশ করেছি। তোমার মত লক্ষ্মীকে ফেলে কত কদাচার করেছি বড়বউ, ওই ভায়লেট, ওঃ! পাপের কি শেষ আছে বড়বউ? বাবা ভিক্ষেমাকে তাড়ালেন। কেন, না, সে পাপদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছে। অঞ্জনা-পিসীকে, হ্যাঁ একরকম তাকেও তিনি তাড়ালেন। তাছাড়া বাবার মাতামহের পাপ, সে-পাপ তুমি জান না, ভীষণ পাপ, বাবার পিতামহের পাপ, সে-ও ভীষণ পাপ। পাপের বিন্ধ্যপর্বত, মাথা ঠেলে উঠছে—সূর্যের পথ বন্ধ করে দাঁড়াবে একদিন, সেদিন রায়বংশে আর সূর্য উঠবে না, রাত্রি পোয়াবে না। দিনের আলোর মুখ রায়বংশ দেখবে না। হয়তো জন্তু-জানোয়ার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে হাঁক মেরে বেড়াবে। তখন এই মানুষেরাই গুলি করে মারবে, ফাঁদ পেতে ধরবে। বড়বাবু আমার হাত ধরে বলেছিল—নাতি, বলেছিল—তোমাকে দুঃখু দিয়ে তোমার চোখের জল দেখে আমার চোখের মোহ কেটে গেল বড়বউ, আমি দেখতে পাচ্ছি—কত পাপ আজ ঝোলা পাহাড়ের মত মাথার ওপর ঝুলছে। যদি সময় পাই, তবে এই জন্মে এর প্রায়শ্চিত্ত করব, না পেলে কত জন্ম ঘুরতে হবে জানি না। আমি বলেছিলাম—না গো না। ভগবানের নাম কর, শরণ নাও, আগুনে খড় পুড়ে যাওয়ার মত পুড়ে যাবে। তা বড়বাবু হেসে বলেছিলেন—সে যদি তোমার মত পারতাম মাণিকবউ, তবে তো বেঁচে যেতাম। তা যে পারি না। পাপ করব আর হরিনামের ঝোলা নিয়ে জপ করব—আর পাপ ছাই হবে, এত সোজা হলে পাপও মিথ্যে, পুণ্যও মিথ্যে। সত্যি দেনা আর পাওনার মামলা। এতে একদিন না একদিন দেনদারকে হারতেই হয়। কেন জান? মূলধনের অভাব ব'লে। এই যে রাজবাড়ী, জমিদারবাড়ী, নবাববাড়ী, বাদশাবাড়ী এ সব গেছে ওই মূলধনের অভাবে। আমরা তো সামান্য। রামরাজ্য রামের অযোধ্যা, রামের বংশ তাও গেছে, কৃষ্ণের দ্বারকা যদুবংশ তাও গেছে। শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার বিয়ে করেছিলেন। তাদের ছেলে নাতিদের বউ তারাও ছিল—সব নিয়ে লাখ হবে, না—দশ লাখ হবে তার হিসেব বেদব্যাস দেন নি—তবে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরে দেহত্যাগ করলেন। রুক্মিণী সত্যভামা সহমৃতা হলেন—বাদবাকী যারা রইল তাদের এসে শবরেরা ব্যাধেরা ধ'রে নিয়ে গেল। ওদিকে সমুদ্রের বানে দ্বারকা ভেসে ডুবে গেল। দিল্লীর বাদশাদের বংশ নাকি রেঙ্গুনে দোকান করে। দিল্লীতে টাঙা চালায়। এই নিয়ম বড়বউ। দেনা শোধ করতে হয়, পাওনা আদায় করতে পাওনাদার আসে, লাঠি মেরে আদায় করে নিয়ে যায়। এই যে একশো পঁয়ত্রিশখানা গাঁয়ের লোক যাদের কাছে আমরা বাড়তি আদায়

করেছি তারা ছাড়বে মনে করেছ? ছাড়বে না। আদায় করে নেবে। কি ক'রে নেবে তা জানি না, তবে নেবে। দেনার পাহাড়—সেই পাহাড়ের চূড়া হল ওই ভায়লেট। ও তোমার আর আমার মধ্যে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে পেতে হাত বাড়িয়ে পাই নে। ও এসে দাঁড়ায়।

ঠাকুমা চুপ ক'রে গেলেন। তারপর সে কি কান্না। কাঁদতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর আবার যখন কথা বলতে শুরু করলেন তখন আবার কথার গোলমাল শুরু হ'ল।

সুরেশ্বর বললে—মাঝখানে বেশ সহজ মানুষের মতই কথা বলছিলেন, কোন গোলমাল তো ছিল না। তবে হ্যাঁ, পুরনোকালের মানুষ বাহাত্তর বছর বয়স—তাঁর কথাগুলো তোমার আমার কাছে অন্ধ সংস্কারের কথা মনে হ'তে পারে। সে কথা আলাদা।

এবার বললেন—নাতি, তুমি সেই বড়বাবু। সেই রূপ সেই ধরনের কথাবার্তা—চলাফেরা ঢঙ-ঢাঙ সব সেই। মেজবউ বললে তুমি বিয়ে কর নি, তুমি প্রজাদিগে দয়া করেছ; বসত সব নাখরাজ করে দিয়েছ—গোচর ছেড়ে দিয়েছ; গোয়ানদের গোয়ানপাড়া সব শরীকের কাছে কিনে তাদের নিষ্কর করে দিয়েছ; এই তো দেনা শোধ করছ। তা-ছাড়া ভাই এই যৌবনে তুমি বিয়ে না করে বিবাগী হয়েছ।

হেসে ফেললেন। বুকে হাত দিয়ে বললেন—আমার জন্যে বুঝেছ আমার জন্যে। কিন্তু ভাই, এ জন্মে তো হবে না। এখন মরলে আমার বিয়ের বয়েস হতে তো আরও বিশ বছর গো। এখন তো ষোল-সতেরোর কমে মেয়েদের বিয়েই হয় না। লেখাপড়া শিখতে হবে। তার পরে মনে কর তোমার সঙ্গে প্রেম করতে হবে—না কি না মেজবউ? এমনি এমনি কি কাপড়ে-চোপড়ে মুড়ে গয়না পরিয়ে কপালে সিঁদুর ঘষে বিয়ের দিন আছে? নেই। তুমি ভাই এ জন্মটা বিয়ে না-করে দেনা শোধ কর; সেই ভায়লার বংশের কেউ থাকলে তাকে তুষ্ট ক'রো ভাই, এদিকে আমি মরি। তারপর তুমি এস। তোমারও খুশি আমারও খুশি। বৈকুণ্ঠে তুমি হবে দাস আমি হব দাসী। আর আমাদের জন্ম হবে না। কেমন?

আমি কোন উত্তর দিই নি—বা দিতে পারি নি সুলতা, বুকের ভেতর কান্নার উচ্ছ্বসিত বর্ষার কাঁসাইকে বাঁধন দিয়ে কোনমতে শুনে যাচ্ছিলাম।

দেবেশ্বর রায়—রায়বংশের মনোহর পুরুষ—যদুবংশের কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন, তাঁর স্ত্রী, রায়বাড়ীর মাণিকবউ—তাঁর এই অবস্থা! তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম কি করি নি—একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না সুলতা; সে আমি বলতে পারব না। আজ তা আমি ঠিক স্মরণ করতে পারব না। তবে হ্যাঁ—এটুকু বলতে পারি একালের ধারা মত, 'রাবিশ' বলে কথাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হা-হা ক'রে হেসে উল্টে পড়তে পারি নি। বলতে পারি কথাগুলো মনের মধ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে শিলালিপির মত খোদাই করা হয়ে গিয়েছিল বুকের মধ্যে।

রায়বংশের দেনার পরিমাণ জমা করলে পাহাড় হয়ে ওঠে। ভগবানের নামে বিশ্বাস নেই যে তাঁর নাম করলে শিলা বিগলিত হবে—সগরবংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গার ধারা নেমে এসে উদ্ধার করবে শ্যামাকান্ত চাটুজ্জেকে, সোমেশ্বর রায়কে, রাণী কাত্যায়নীকে, বীরেশ্বর

রায়কে, বিমলা দেবীকে ; তারপর—হ্যাঁ, রত্নেশ্বর রায়ও আছেন তাঁদের মধ্যে, নিশ্চয় আছেন ; সম্ভবতঃ তাঁর পাওনাদারের সংখ্যা বেশী, রায়বাড়ীর আয়কে তিনগুণ বাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কুড়ি হাজারকে ষাট হাজারে তুলেছিলেন। দেবেশ্বর রায়, শিবেশ্বর রায়, তারপর আমার বাবা যোগেশ্বর রায় থেকে দেনা শোধ শুরু হয়েছে। অসংখ্য পাওনাদার অসংখ্য হাজারে হাজারে পাওনাদার যেন মুঠি-বাঁধা হাত তুলে তাঁদের কাছে দাবী করছে—"পাওনা শোধ করো—আমাদের পাওনা ফেলো।"

একটা কথা বিশ্বাস করো সুলতা ; এইসব কথা যখন ঠাকুমা বলছিলেন তখন এ সব যেন তিনি চোখে দেখছিলেন। কয়েকবার বলেও ছিলেন—ভাই, আমি দেখতে পাচ্ছি রে, আমি দেখতে পাচ্ছি! পরলোকে রায়বংশের কর্তারা হাতজোড় করে আসামীর মত দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতা, মেজদি এতক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে শুনছিলেন, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তাঁর বড়জায়ের মুখের দিকে। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে ছবিগুলো দেখতে চেষ্টা করছেন। আমার ঠাকুমা থামতেই তিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁর হাত ধরে নাড়া দিয়ে ডেকে বললেন—দিদি!

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো মেজবউ, মেজঠাকুরপোর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী! এ্যাঁ?

—হ্যাঁ দিদি!

সমাদর করে তাঁর মুখে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে ঠাকুমা বললেন—আহারে! কচি বয়েস তোর—তোর এই দশা করে দিয়ে গেল মেজবাবু? না-না-না। মেজবাবু বড় নিষ্ঠুর ছিল রে। দয়া-মায়া তার ছিল না। অন্য দোষ না থাক, মানুষকে পীড়ন আর ওই বুড়োবয়সে তোকে গরীবের মেয়ে পেয়ে বিয়ে করে শেষ অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে যাওয়া—বড় নিষ্ঠুরের কাজ।

—দিদি! অনেক কষ্ট তিনি পেয়েছেন বেঁচে থেকে। অনেক অন্যায়ও করেছেন। আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার—

বাধা দিয়ে ঠাকুমা বললেন—আমার যা করেছিল ঠাকুপো তা আমি ক্ষমা করেছি মেজবউ। সে আমি মাফ্ করেছি। কিন্তু ঠাকুরপো যে বড় বেশী মিথ্যে মামলা করেছে রে! লোকের হ'রেহর্মে নিয়ে যে মনে ভারী সুখ পেত সে।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর দিদি?

—তা হচ্ছে ভাই।

মেজদির চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এসেছিল। বড় ভাল লেগেছিল আমার। হয়তো আমার কথা শুনে তুমি মনে মনে হাসছ। ভাবছ সুরেশ্বরের পাগল ঠাকুমা পটুয়াদের কাছে দেখা এবং শোনা নরকের বর্ণনা আর ছবির কথা বলে যাচ্ছেন, গ্রাম্য পুরুতের মেয়ে মেজদিটি সেই সব কথা ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস ক'রে কাঁদছে, ভাবপ্রবণ অর্ধশিক্ষিত ধনীর দুলাল সুরেশ্বরও তাই বিশ্বাস করছে ধ্রুবসত্য ব'লে। এ যুগে কথাটা হাসিরই বটে, শুনলে, তুমি তো তুমি, একটা ক্লাস টেনের ছেলেও ব্যঙ্গভরে হাসবে। কিন্তু না, ঠিক তা নয়। ঠাকুমার কথায়

এটা আমি ভাবি নি—যে আমিই দেবেশ্বর রায়, জন্মান্তরে আবার আমি রায়বাড়ীতে এসেছি, সুরেশ্বর রায় নাম নিয়ে জন্মের ঋণ শোধ করতে। এও বিশ্বাস করি নি যে আমার পূর্বপুরুষেরা এক অদৃশ্যলোকে কায়াহীন অস্তিত্ব নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন আর পঁচাত্তর হাজার থেকে এক লাখ অভিযোগকারীরা চীৎকার করে অবাঙমনসগোচর ঈশ্বর-বিচারকের কাছে দাবী জানাচ্ছে—মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে ওদের কায়াহীন সত্তার মাংস ছিঁড়ে খাওয়ানো হোক, কি ফাঁসি দেওয়া হোক, কি কের কৃমিকীট করে পৃথিবীর কোন আবর্জনা-স্তূপে ওদের জন্মান্তর নেওয়ার দণ্ড দিয়ে পাঠানো হোক।

না—তা বিশ্বাস আমি করি নি।

তবে ঠাকুমার সে-বিশ্বাসকে আমি মিথ্যাও মনে করতে পারি নি। যা আমার কাছে সত্য নয় তাই যে মিথ্যা—তা আমি মনে করি নে সুলতা। তাই তোমাকে ডেকে তোমার সামনে আমি জবানবন্দী দিচ্ছি। দেখ, ইতিহাসের ধারায় উত্থান-পতনের পিছনে আছে উলঙ্গ শক্তি, তার সঙ্গে ন্যায়নীতি জুড়তে হয়, ন্যায়নীতিকে মূল্য না-দিয়েও বড় বড় অধিনায়কেরা লোককে প্রতারিত করতেই সেটা করে। তার চেয়ে এক কণা বেশী মূল্য তার নেই। কিন্তু লোকে ন্যায়নীতি মানে। লোকের সঙ্গে সঙ্গে জীবন মানে। কত যুগ কত কাল কত জন্মান্তর পার হয়ে মানুষের দেহের মধ্যে জীবন এসে শুধু অমর হ'তেই চায় নি—আরণ্য অন্ধকারের অন্যায় থেকে ন্যায়েও আসতে চেয়েছে। রায়বংশের অন্যায়ের বাঁধনে বাঁধা পড়েই আমি সেটেলমেণ্ট উপলক্ষে কীর্তিহাট গিয়ে আর ফিরি নি। প্রথম টের পেলাম ঠাকুরদাস পালের খুনের কথা। খুন করিয়েছেন রত্নেশ্বর রায়; আর ঠাকুরদাস পালের প্রপৌত্রের কন্যা তুমি। চমকে উঠেছিলাম। এবং খুঁজতে লেগেছিলাম রায়বংশের পাপ-পুণ্যের খতিয়ানের খাতা।

সে খাতাও পেয়েছিলাম। ঋণ বেরিয়েছিল বা পাপ বেরিয়েছিল অজস্র, পুঞ্জ পুঞ্জ, পিটিয়ে পিটিয়ে তাকে জমিয়ে এত ভারী তাকে করে তোলা হয়েছে যে গোটা বংশটাই তার ভারে হাঁটু ভেঙে ধুলোয় মুখ গুঁজে পড়েছে। বৃন্দাবনে ঠাকুমার মুখ থেকে যেন গোটা বংশটা আর্তনাদ করে উঠল—ঋণ শোধ করে আমাদের বাঁচাও। আমাদের বাঁচাও। আমাদের বাঁচাও!

যে সব ছবিগুলো আমি আঁকছিলাম সুলতা—সেগুলো যেন ঠাকুমার কাছে ভাষা পেয়ে কথা ক'য়ে উঠল।

পরের দিন আমি বৃন্দাবন থেকে চলে আসব, প্রণাম ক'রে বিদায় নিতে গেলাম ঠাকুমার কাছে, মেজদির কাছে।

মেজদি'কে কিছু টাকা দিলাম—বললাম রাখ মেজদি। দেখ আমি জানি না, ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসাও করি নি—করবার সাহসও নেই যে এখানে ওঁর অধিকার কি? কি আছে ওঁদের? টাকাটা রাখ যদি কখনও কাজে লাগে!

ঠাকুমাকে প্রণাম করতে গেলাম। দেখলাম তিনি যেন অন্য মানুষ। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললেন—তুমি আমার নাতি, সুরেশ্বর, যোগেশ্বরের ছেলে। যোগেশ্বর তাই করেছিল?

তোমার মাকে দুঃখ দিয়ে ফেলে রেখে কোন একটা বিবি মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল ?

বুঝলাম মেজদির কাছে শুনেছেন। চুপ ক'রে রইলাম। উত্তর কি দেব বল ? হঠাৎ কপালে হাত দিয়ে তিনি বললেন—কপাল। রায়বংশের কপাল !

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল তাঁর বুক থেকে। বললেন—যজ্ঞেশ্বর ভায়লার বাড়ীটা কেড়ে নিয়েছিল ? তুমি তাকে টাকা দিয়ে বাড়ী উদ্ধার ক'রে—তার কে—যেন—ছেলের মেয়ের মেয়ে—হ্যাঁ, তাই তো বললে—তাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ ? তাকে পড়ার খরচ দিচ্ছ ?

এবার বললাম, দিয়েছি। অন্নপূর্ণা-মা বললেন, আর আমারও মনে হল—না দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে।

—হ্যাঁ ভাই। খুব অন্যায় হবে। তোমার ঠাকুরদাদা অবিকল তোমার মত দেখতে ভাই। তাঁর সব থেকে বড়-দেনা ওই ভায়লার কাছে। আমার বড়বাবু তার উপর অবিচার করেছিলেন। চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়েকে ডাকলেন, আয় একসঙ্গে দু'জনে মরি আয়। কিন্তু সে ভয় খেলে। পারলে না। বড়বাবু তো আলাদা জাতের মানুষ—তিনি গুলী খেয়ে মরতে গেলেন। গুলী খেলেন—পড়েও গেলেন। ভায়লা পালালো গোপাল ঘোষের সঙ্গে। বড়বাবু বাঁচলেন, গুলী বুকে বেঁধে নি। বেঁচে উঠে আর তাকে চোখে দেখলেন না। মেয়েটা সারাজীবন কেঁদে মল ; রাস্তার ঝাড়ুদারের হাতের ঝাঁটার মত অবস্থা হল। তবু বড়বাবু তাকে ভালবাসতেন। তার জন্যেই আমি তাঁর ভালবাসা পাই নি। ভায়লাকে দূর করে দিয়ে তাকে খুঁজতেই তিনি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের গর্তে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মারা গেলেন। ভায়লা বিষ খেয়ে মল' সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। পরলোকেও মিলতে পারেন নি বড়বাবু। ওরা কিরিশ্চান তো ! আঃ বড় দুঃখু ! ওদের দেখো। বুঝলে !

দেখব বলে কথা দিয়েই বৃন্দাবন থেকে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু জানতাম না যে ইতিমধ্যে গোয়ানপাড়া আগুন লেগে পুড়ে গেছে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। হিলডা মারা গেছে। তার ঘরেই প্রথম আগুন লেগেছিল।

খবরটা পেলাম কলকাতায় পৌঁছে। একখানা চিঠি এসেছিল। লিখেছিল অর্চনা। লিখেছিল—সুরোদা, বৃন্দাবন থেকে এতদিন ফিরেছ বোধ হয়। খুব গুরুতর ব্যাপার এখানে। একসঙ্গে তোমাকে দুখানা চিঠি লিখছি—একখানা বৃন্দাবনে একখানা কলকাতায়। যেখানে পাও। এখানে গোয়ানদের সঙ্গে ঝগড়া চরমে উঠেছিল। এবং তার ফলও ফলে গেল। সে ঝগড়াটার জন্যে তুমি মিনতি জানিয়ে ক'দিন চুপচাপ থাকতে বলে গেলে সেটা চরমে উঠে গেল দিন তিনেকের মধ্যেই। আমার দুঃখ, আমার লজ্জার কারণ এক রকম বলতে গেলে আমি। কলকাতা থেকে ফেরার পর বাবার নতুন চেহারাটা দেখে গেছ—তাপও সয়েছ খানিকটা, বাবার ভয়েই ঠাকুমা বৃন্দাবন পালালেন, সে তুমিও জান ; আমিও জানি। বাবার এখন সদাসর্বদাই রুদ্রমূর্তি। তার কারণ আমার টাকা। ও টাকা এখন তার মুঠোয় তিনি সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন সকলকে। আমি তোমার সঙ্গে পালালে ভাল করতাম। ওদিকে জেলখানা থেকে অতুলকাকা গোয়ানদের খবর পেয়ে ওদের বয়কট করতে অর্ডার পাঠিয়েছিলেন। তুমি যাবার পরই অর্ডারটা গোপনে জেলখানা থেকে আসে। গ্রামে খুব কড়াকড়ি

হয়। গোয়ানরা মিটিং ক'রে ঠিক করে যে তারা মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। মুসলীম লীগের প্রটেকশন নেবে। বাবা, এই সুযোগে ওদের এখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে আমার টাকায় ওদের জমি কিনবার মতলবে—হঠাৎ খুব কংগ্রেসী হয়ে উঠে ওদের পাড়ায় গিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করে এলেন। তার দিন তিনেক পরেই রাত্রে গোয়ানপাড়ায় আগুন লাগল। গোটা পাড়াটা পুড়ে গেল—মায় গির্জের দু-পাশের রাণীগঞ্জ টালির ছাওয়ানো চাল পর্যন্ত। ছিলডা পুড়ে মারা গেছে। এখানে টেনশন খুব বেশী। তুমি চিঠি পাওয়া মাত্র চলে এস, অন্ততঃ আমাকে বাঁচাও। আমি বোধ হয় মরে যাব সুরোদা। গোটা গাঁয়ের লোক এটা চাপাচ্ছে বাবা এবং জ্যাঠামশায়ের ওপর। বলছে কংগ্রেস এ করতে পারে না। এ করেছেন রায়বাবুরা। ধনেশ্বরবাবু জগদীশ্বরবাবু আর সুখেশ্বরবাবুর ছেলেরা। করেছে কমলেশ্বরের সঙ্গীসাথীরা। আমার প্রণাম নাও। ইতি অর্চনা।

সুলতা সেইদিনই রওনা হলাম কীর্তিহাট।

স্টেশনে নেমে শুনলাম জগদীশ্বরকাকা নিজের বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সুরেশ্বর বললে—রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে পুরনো কাল শেষ হয়ে গেল সুলতা। দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ। যারা বাংলাদেশে প্রথম ইংরিজী শিক্ষা, ইংরিজী সভ্যতা, ইংরিজী আভিজাত্য আমদানি করেছিল তাদের নাম তুমি এক এক ক'রে স্মরণ কর কিম্বা আউড়ে যাও, রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব থেকে প্রত্যেকেই জমিদারীর উপর বংশের প্রতিষ্ঠা করে গিছলেন। আবার যাঁরা শুধু দেশকে শুষেছেন, চুষেছেন রক্তপায়ী বাদুড়ের মত তাঁরাও জমিদার ছিলেন। এঁদের আভিজাত্যের কাল, এঁদের গৌরবের কাল, দাপটের কাল মোটা হিসেবে বলতে গেলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত। ১৯০১ থেকে নতুন কাল আরম্ভ। সেটার প্রকাশ হয়েছিল ১৯০৫ সালে।

ইংরেজ শাসনে লর্ড কার্জন শেষ অপ্রতিহত-প্রতাপ ভাইসরয়। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বিনা প্রতিবাদের ভারতেশ্বরী। দেবেশ্বর রায় রায়বাড়ীর শেষ রাজাবাবু। বাংলাদেশে জমিদারদের অপ্রতিহত প্রতাপের কাল—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী। ১৯০১ সাল থেকে মানুষ জাগতে শুরু করেছে। ব্যবসাদারেরা তাদের থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; ল্যাণ্ড হোল্ডারস এ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেকে দেশী চেম্বার অব কমার্সগুলোর দাম বেড়েছে। উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, ব্যারিস্টার, প্রফেসরের কাল শুরু হল। দেবেশ্বর রায়ের উত্তরাধিকারী আমার জেঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায় হয়েছিলেন কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার—মস্তবড় খনিমালিক। বাবা হয়েছিলেন জার্নালিস্ট।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুরেশ্বর বললে—মানুষ কাল তৈরী করে? না, কাল মানুষ তৈরী করে? হয়তো বা দুটোই সত্যি। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরীতে বীরেশ্বর রত্নেশ্বর দেবেশ্বর রায়দের মত জমিদার অনেক ছিল। এঁদের থেকে উন্নত আর বেশী কেউ ছিল না। থাকবার মধ্যে একটা আধটা ঠাকুরবাড়ীর মত বাড়ী—মানুষের মধ্যে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত মানুষ ছিলেন জমিদারদের মধ্যে।

বলতে গেলে রায়বাড়ীর জবানবন্দী এখানেই শেষ। কারণ তার পরের কথা—আমার

বাবার কথা, যোগেশ্বর রায়ের কথা, এ শুধু তোমারই জানা কথা নয়, হয়তো এ কালের সকলের জানা কথা। আমার জ্যাঠামশায়ের কথা হয়তো তুমি জান না, কিন্তু বাংলাদেশের যারা বাঙালী ব্যবসাদারদের কথা জানে, তারা যজ্ঞেশ্বর রায়ের কথাও জানে। তার কথা জানলেই বাঙালী ব্যবসাদারের কথা জানা হয়ে যাবে। কিন্তু সেসব কথা থাক সুলতা, দেবেশ্বর রায় পর্বের শেষ কথাটা বলে নি। সেটা আমিও জানতাম না।

শেষ কথা, দেবেশ্বর রায়ের পাগল স্ত্রীর বৃন্দাবনে নির্বাসন। নির্বাসন দিলেন কে জান? দিলেন শিবেশ্বর রায় এবং যজ্ঞেশ্বর রায়। এবং নীরবে মাথা নত ক'রে দেখলেন আমার বাবা বাংলাদেশের বিখ্যাত জার্নালিস্ট যোগেশ্বর রায়।

আমি কথাটা আবছা আবছা শুনেছিলাম। কিন্তু কখনো জিজ্ঞাসা করে ভালভাবে জেনে নিতে সাহস হয় নি। জিজ্ঞাসা করব কাকে? ছেলেবেলা থেকে শুনতাম ঠাকুমা থাকেন বৃন্দাবনে। বাবার কোন ব্যগ্রতা দেখি নি কোন দিন মায়ের জন্যে। মায়ের কাছেও তাঁর কথা কিছু শুনি নি। বাবার মৃত্যুর পর তাঁকে পত্র দিয়ে থাকলে জানবাজারের বাড়ীর ম্যানেজার দিয়ে থাকবেন। তিনি পেয়ে থাকলেও কোন উত্তর দেন নি।

তবে চাপা একটা কথা শুনতাম—ঠাকুমা একবস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। তিনি নাকি স্বামীর মৃত্যুর পর উন্মাদ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। লোকে বলে গোয়ানদের পাড়ায় গিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কেউ বলত, তাদের বাড়ীতে নাকি খেয়েছিলেন। কথাগুলো এলোমেলো কথা। যার জন্য এ বাড়ীর সঙ্গে, তাঁর নিজের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক চুকে গেছে।

* * *

তিনি আজও বেঁচে আছেন। কথাটা কিন্তু কারুরই মনে থাকে না। তাঁর কথাটুকু বললেই রায়বাড়ীর কথা শেষ।

সেদিন তাঁর কথা শুনলাম।

সেদিন মানে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। তোমার মনে আছে বোধ হয় মেদিনীপুর শহরের সুধাকরবাবু উকীলের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি কলকাতা থেকে গিছলাম মেদিনীপুর। তখন মেদিনীপুর খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছে; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন মিস্টার বি আর সেন। তিনি মেদিনীপুরের দমননীতির কড়াকড়ি ক্রমশ শিথিল ক'রে আনছেন। মেজঠাকুমার যে জেল হয়েছিল, তার মেয়াদ শেষ হয়েও তিনি খালাস পান নি, জেলগেটেই তাঁকে আটক আইনে আটকে জেলেই রাখা হয়েছিল। মিস্টার সেন তাঁর কেসের ফাইল প'ড়ে তদন্ত করে তাঁকে ছেড়ে দেবেন। উকীল কথাটা জানতে পেরে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। আমি মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করে মেজঠাকুমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। এরই মধ্যে কুইনী হিলডা এসেছিল। সঙ্গে খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানদের একটি মহিলা। কীর্তিহাটের লোকেদের বিরুদ্ধে, বিশেষ ক'রে রায়বাড়ীর লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছে। তারা কংগ্রেসকে ভোট দেয় নি বলে তাদের উপর অন্যায় জুলুম করছে তারা। অভিযোগ করতে এসেও আমার কথা শুনে হিলডা এসেছিল আমার কাছে। কুইনীর ইচ্ছে

খুব ছিল না, কৃশ্চানদের প্রতিনিধিস্থানীয়া মেয়েটির তো আদৌ ছিল না ইচ্ছে। কিন্তু হিলডার জেদে আসতে হয়েছে। তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছি, কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, আমাকে কীর্তিহাট ফিরতে দাও। সেখানে লোকেদের সঙ্গে কথা বলে, বুঝে উত্তর দেব। যদি নিবারণ করতে না পারি তবে তোমাদের বলে দেব, তখন তোমরা যা খুশী করবে। কুইনীকে আমিই খড়্গপুর ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি, আমিই তার খরচ দিই। না হ'লে হয়তো কুইনী হিলডার কথা শুনত না। তার পরের দিনের কথা বলছি। পরের দিন সকালেই মেজঠাকুমা মুক্তি পেলেন। তাঁকে নিয়ে এলাম শহরের বাসায়।

শীর্ণ হয়ে গেছেন মেজদি। তাঁর কান্তি যেন মলিন হয়ে গেছে। দৃষ্টিতে একটা উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে। মাথার চুলগুলো কেটে ফেলেছেন। বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি মেজদি! আমি তো তোমার সঙ্গে মাস দুয়েক আগে দেখা করে গেছি, এর মধ্যে তোমার শরীর এমন খারাপ হ'ল কেন?

মেজদি ম্লান হেসে বললে—ওরে, খালাস পাব শুনে দুর্ভাবনায় এমন হয়ে গেছি ভাই।

—দুর্ভাবনা কিসের মেজদি?

—দুর্ভাবনা কিসের? দুর্ভাবনা সব কিছুর ভাই। অন্নের দুর্ভাবনা, বস্ত্রের দুর্ভাবনা, মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়ের দুর্ভাবনা—দুর্ভাবনা কিসের নয় তাই বল!

—আমি বেঁচে থাকতে দুর্ভাবনা ভাবছ মেজদি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেজদি বললেন—রায়বাড়ীতে আমার বড়দি—রায়বাড়ীর বড়গিন্নী, তোর ঠাকুমাকে, তার দুই ছেলে থাকতেও বৃন্দাবনে নির্বাসনে যেতে হয়েছে। আজও কেউ তাঁর খোঁজ করে না। তাঁর নিজের পৈতৃক টাকা ছিল। তাই তিনি মান বাঁচিয়ে বৈষ্ণব হয়ে বেঁচে আছেন। আমার যে কিছুই নেই সুরেশ্বর।

আমি বলেছিলাম সুলতা, বলেছিলাম—মেজদি আমি তো আছি।

হেসে মেজদি বলেছিলেন—না। ও ভরসা করতে বলিস নে। মানী মানুষ যারা তাদের পান থেকে চুন খসলেই অপমান হয়। তারা সব দুঃখ সইতে পারে অপমানের দুঃখ সইতে পারে না। জেল-ফেরত সৎমাকে ধনেশ্বর, জগদীশ্বর সহ্য করবে না রে। তোর ঠাকুমা—রায়বাড়ীর বড়বাবুর স্ত্রী মাণিকবউ-এর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল স্বামীর অবহেলায়। তার ওপর স্বামীর এই মৃত্যুতে হয়ে গেলেন উন্মাদ পাগল।

বলতে বলতে থেমে গেল সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, দেবেশ্বর রায় নদীর গর্ভে পড়েছিলেন অজ্ঞান হয়ে, লোকজনে অনেক খুঁজেপেতে তাঁকে তুলে নিয়ে এল। আমার ঠাকুমা মাণিকবউ তখন ছিলেন গোবিন্দ মন্দিরে। রাধাগোবিন্দের সামনে সন্ধ্যেবেলা থেকে সে আমলে বারো মাস কথকতা হ'ত; নিযুক্ত কথক ছিল। ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণলীলার কথকতা চলত। মাণিকবউ কথকতা শুনে হাসতেন, কাঁদতেন, কখনও কখনও উঠে গিয়ে গোবিন্দের সামনে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে কথা বলতেন। কথকতা শেষ হ'লে নিজের হাতে শয্যা রচনা ক'রে রাধাগোবিন্দকে শয়ান করিয়ে নিজের ঘরে ফিরতেন। সেদিন বড়বাবুর অসুখের খবর নিয়ে মা'ঠাকরুণকে জানাতে গিয়েছিল অনন্ত, কিন্তু সে তাঁর কানে

যায় নি। তিনি শোনেন নি। বার বার বলেছিলেন—যা যা। বড়বাবুকে ঘুমুতে বলগে যা। এখন আমি যেতে পারব না। গেলে ঠাকুর রাগ করবেন। তাতে তারই অমঙ্গল হবে। যা।

অগত্যা কথকতাতেই মধ্যপথে ছেদ টেনেছিলেন কথকঠাকুর। মাণিকবউ ঠাকুরকে শয়ান করিয়ে এসে স্বামীর ওই অবস্থা দেখে আছড়ে পড়েছিলেন স্বামীর বুকে। আর প্রাণ ফাটিয়ে ডেকেছিলেন—বড়বাবু—বড়বাবু গো, বড়বাবু আমি যে এলাম, কথা বল, আমি তোমার মাণিকবউ, কথা বলবে না? বড়বাবু!

সকালবেলা খবর রটেছিল—সিদ্ধাসনের জঙ্গলে ভায়লা বিষ খেয়ে মরেছে।

মাণিকবউ শুনে নাকি হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। না, হল না সুলতা। শুধু তো বোবা নয়, তিনি যেন শুকিয়েও গিয়েছিলেন। চোখের জল শুকিয়েছিল; কণ্ঠের স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাথরের মূর্তির মত বসেছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে চলে গিয়েছিলেন স্বামীর বিছানার পাশ থেকে।

দেবেশ্বর রায়কে নিয়ে সকলে যখন ব্যস্ত তখন দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে একটি মেয়ে খিড়কির পথে রায়বাড়ী থেকে বেরিয়ে, কাঁসাই পার হয়ে গিয়ে উঠেছিল সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। যেখানে সিদ্ধাসন থেকে খানিকটা দূরে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়েছিল গোয়ান মেয়েপুরুষেরা, মাঝখানে নামানো ছিল ভায়লেটের মৃতদেহ।

ঘোমটার ভিতর থেকে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন—"সর্ তো রে, সর্ তো একটু দেখি! ওরে সর্ না। এবার দেখতে দে।"

পুরুষেরা তাঁকে কেউ চিনত না, কিন্তু গোয়ান মেয়েরা অনেকে তাঁকে দেখেছে, তারা চিনত, তারা তাঁকে রায়বাড়ীর বড়গিন্নী ব'লে চিনেছিল। তারা সসম্ভ্রমে লোকজন সরিয়ে দিয়ে দেখতে দিয়েছিল ভায়লেটের মৃতদেহ। মৃতদেহের পাশে ব'সে মাণিকবউ তাকে বলেছিলেন—"বেঁচে পাস নি তাই ম'রে পেলি। নয়? আমি কি করব বল? বিশ্বাস কর, আমাকে এরা ধরে এর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। তাকে আমি পাই নি। চেয়েছিলাম পাই নি। তুই পেয়েছিলি—তোকে পেতে দেয় নি। আমার দোষ নেই। তা এবার পেলি, এবার শান্তি হল!"

খবর নিয়ে ছুটে এসেছিল একজন গোয়ান। লোকজন গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিল, তখন তিনি বদ্ধ পাগল। কিন্তু পাগলামির একমাত্র সূত্র ওই। ওই ভায়লেট।

বাড়ী এসে ধুয়ো ধরেছিলেন—"ভায়লেট সতী হয়েছে। ওকে সতীঘাটে বড়বাবুর সঙ্গে দাহ কর।"

রায়বাড়ীর অন্দরের মধ্যে একেবারে মাঝখানকার ঘরে তাঁকে জোর ক'রে ভিতরে পুরে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। স্বামীকে আর তিনি দেখতে পান নি। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনে বাধালেন হাঙ্গামা। ছেলেদের বললেন—বড়মায়ের শ্রাদ্ধ কর।

ছেলেদের বড়মা মানে, ভায়লেট।

কোন রকমে তাঁকে স্নান করিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে আবার তাঁকে ঘরে বন্ধ করা হয়েছিল,

কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে যে কে দরজা খুলে দিয়েছিল কেউ জানে না; মাণিকবউ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সটান গিয়ে উঠেছিলেন গোয়ানপাড়ায়। তাঁর হাতে ছিল পুঁটলী-বাঁধা গহনা আর টাকা। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। যখন খোঁজ হল, তখন রাত্রি অনেকটা, লোকজন সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত; কাঙালীতে কীর্তিহাট ভরে গেছে। লোকের দাওয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি গাছতলায় পর্যন্ত মানুষ শুয়ে আছে, বসে আছে। ঘুরছে ফিরছে কাঁদছে এঁটোকাঁটা চেয়ে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে কোথায় খোঁজ করবে মাণিকবউয়ের! মাণিকবউয়ের গায়ের রঙ গৌরবর্ণ, কিন্তু রাত্রি অন্ধকার, তার মধ্যে তাঁকে চিনে বের করা সম্ভবপর ছিল না। গোয়ানপাড়ার কথাটা কারুর মনে হয় নি।

সকালবেলা খোঁজ হয়েছিল।

গোয়ানেরাই খোঁজ দিয়ে গিয়েছিল। মাণিকবউ গহনার পুঁটলী নিয়ে গোয়ানপাড়ায় গিয়ে ওই গির্জের বারান্দায় বসেছিলেন। সকালে লোকজনদের ডেকে বলেছিলেন—আমি রায়বাড়ীর বড়বউ। তোদের ভায়লা আমার সতীন। বড়বাবু তো ওকেই ভালবাসতেন। তা ভায়লা মল, তার শ্রাদ্ধ হল না। ছেলেদের বললাম—ছেলেরা করলে না। আমি করব শ্রাদ্ধ। তোদের পাদরীকে ডাক, আমার যোগাড়যন্ত্র করে দে। এই নে এই গয়নাগুলো নে, বিক্রী করে আন।

*　　　　*　　　　*

শিবেশ্বর রায় আত্মগোপন ক'রে ছিলেন, যজ্ঞেশ্বর রায়ও আত্মগোপন করে ছিলেন। খুনের মামলার জন্য তখন ওয়ারেন্ট বেরিয়ে রয়েছে। শ্রাদ্ধ করেছিলেন যোগেশ্বর রায়, আমার বাবা। এবং মাণিকবউ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন ধনেশ্বর আর জগদীশ্বর। আমার বাবা থেকে ধনেশ্বরকাকা এক বছরের ছোট। জগদীশ্বরকাকা ধনেশ্বরকাকা থেকে দু বছরের ছোট। একজনের বয়স উনিশ, একজনের বয়স সতেরো। আত্মগোপন ক'রে থেকেও শিবেশ্বর রায় এই সময়ের অপূর্ব সুযোগটি ছাড়েন নি। ধনেশ্বরকাকা এবং জগদীশ্বর-কাকা হঠাৎ একদিন গোবিন্দমন্দিরে মাণিকবউয়ের পথ আটকালেন।

মেজদাদু শিবেশ্বর রায় আত্মগোপন ক'রে ছিলেন এই মেদিনীপুরেই—সেই বাড়ীতে; যে বাড়ীতে আমি মেজদির অপেক্ষায় বসে ছিলাম ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। যে বাড়ীতে বসে মেজদির কাছে বসে এই সব কথা শুনছিলাম সেই বাড়ীতেই, আত্মগোপন মানে একটু আড়াল দিয়ে বসবাস করছিলেন। বাইরে Not at home নোটিশ টাঙিয়ে বাস করার মত। তিনি উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন. মাণিকবউয়ের এই অপরাধ, এই গহনাগাঁটি নিয়ে গোয়ানপাড়ার গির্জের বারান্দায় পড়ে থাকার জন্তে, তার উপর পাতিত্য দোষ চাপিয়ে, তার ছেলেদের দেবোত্তরের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা যায় কি না।

উকীল নাকি বলেছিলেন—পাতিত্য চাপানো যায় কিনা সে তো আমি বলতে পারবো না, তবে চাপাতে পারলে, মূল দেবোত্তরের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে এটা নিশ্চিত। আর ভেবে দেখুন সেটা ঠিক হবে কিনা। ওই দেবোত্তরের সম্পত্তি পত্তনীদার, দরপত্তনীদার হিসেবে যা ভোগ করেন, তা তো ওদের যাবে না! ভেবে দেখুন ভাল ক'রে, একই মহালে

শরীক হিসেবে থাকবেন। সেখানে ঝগড়া হবে।

তাতে শিবেশ্বর রায় দমেন নি। ছোট-তরফের রামেশ্বর বিলেত গেছে। তার স্ত্রী মারা গেছে এখানে। রামেশ্বর বিলেত থেকে হয় ফিরবে না, নয় মেম বিয়ে ক'রে ফিরবে। সুতরাং শরীক এখন তিন তরফ নয়, দু তরফ। দু তরফের এক তরফ বড়তরফকে পতিত করতে পারলে থাকবেন এক এবং অদ্বিতীয় মেজতরফের কর্তা—তিনি শিবেশ্বর রায়। তিনি তার দুই ছেলেকে ডেকে উপদেশ দিয়ে ব্যবস্থা করলেন।

মন্দিরে ঢুকতে দিয়ো না—বলো পাতিত্য ঘটেছে। গোয়ানপাড়ায় কোথায় ছিলেন কার বাড়ীতে ছিলেন, কে বলতে পারে! কি খেয়েছেন কে জানে?

ধনেশ্বর তখন গোয়ানপাড়ার চোলাই করা মদের স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। তখন তিনি উনিশ বছরের নবযুবক। সতের বছরের জগদীশ্বর রায়।

একটু থামল সুরেশ্বর। পাশেই বসেছিল অর্চনা। অর্চনা জগদীশ্বর রায়ের বড় মেয়ে; সম্ভবতঃ বলতে কুণ্ঠাবোধ করছিল।

অর্চনা বললে—থামলে কেন সুরোদা? বাবা জ্যাঠামশায়ের চেয়ে দু বছরের ছোট। তখনও ইস্কুলে পড়েন। রায়বাড়ীর রত্নেশ্বর রায় এইচ ই স্কুলে থার্ড ক্লাসে বছর তিনেক আছেন। তিনি মদ খেতেন রাত্রে, দিনে গন্ধের ভয়ে মদ খেতেন না, স্কুলে যেতে হত, তবে তাঁর বার্ডশাইয়ের ভিতর চরস গাঁজা পোরা থাকত। তিনি তিনটে নেশা করতেন—মদ গাঁজা চরস।

* * *

সুলতা বললে—থাক এসব কথা থাক সুরেশ্বর। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

সুরেশ্বর বললে—শুনেই তোমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে সুলতা, আর রায়বাড়ীর হতভাগ্যেরা এরই মধ্যে বাস করছে, চীৎকার করছে, সে চীৎকার সেদিন শুনেছ খানিকটা, আবার আমার মত চীৎকারও করছে, পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর ব'লে। শোন—আর খুব বেশী নেই সেকালের কথা। অর্চনা মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—আমি বলছি সুরোদা, তুমি থাম। বলেই সে বলে গেল—

জ্যাঠামশাই মানে ধনেশ্বর আর বাবা সেদিন উন্মাদিনী মাণিকবউয়ের পথ আগলালে। —যেয়ো না জ্যাঠাইমা—যেতে পাবে না।

চমকে গেলেন মাণিকবউ—যেতে পাব না?

—না, তোমার জাত গেছে।

—কি? কি? কি?

—তো—মা—র জা—ত গে—ছে।

আমার বাবা জগদীশ্বর রায় হাত-পা নেড়ে ভেঙিয়ে কথা বলে সুলতাদি। সে ছেলেবেলা থেকেই। হাত-পা নেড়ে মুখ ভেঙিয়ে সে বললে—সে-দি-ন কি-রি-শ্চা-ন সতীনের শ্রাদ্ধ করতে গয়নার পুঁটলী নিয়ে সারারাত গোয়ানপাড়ায় পড়েছিলে। কোথা খেয়েছিলে? কার বাড়ীতে? তোমার জাত গিয়েছে, দেশসুদ্ধ লোক জানে। হৈ-হৈ উঠছে। দশ

হাজার বাঙালী এসেছিল। কি বলছে তারা শোন গে! ঢুকতে পাবে না তুমি।

তাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিছলেন।

সুরেশ্বর বললে—আশ্চর্য সুলতা, পুরো একদিন অজ্ঞান হয়ে থেকে যখন জ্ঞান হল তখন তিনি যেন বোবা হয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছেন—বড়বাবু তো তাকে ভালবাসতেন, একরকম বিয়ে করেছিলেন। তো বড়বাবুর জাত যায় নাই?

তখন বড়-তরফের সঙ্গীন অবস্থা। আমার বাবা যোগেশ্বর রায় ছুটে গেছেন দাদার কাছে। যজ্ঞেশ্বর রায়ের কাছে। যজ্ঞেশ্বর রায়ও শিবেশ্বরের মত কলকাতায় রয়েছেন। নিজের বাড়ীতে থাকেন না, অন্ত বাড়ীতে থাকেন। বিডন স্ট্রীটে ওর যে বাড়ী ছিল, সেই ঠিক পাশের বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে ওয়ারেণ্ট এ্যাভয়েড করে থাকতেন। তাঁর কাছে গেল ছোটভাই।

যজ্ঞেশ্বর রায় বললেন—মাকে নিয়ে এস কলকাতায়। পাগল সার্টিফিকেট নাও ডাক্তারের কাছে, তারপর একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে বন্ধ করে বেঁধেটেঁধে রেখে দাও। কথাটা বড় চাউর হয়ে গেছে। এ ছাড়া পথ নেই।

বাবা পারেন নি মাকে বেঁধে কলকাতায় আনতে।

জ্যাঠামশাই রাত্রে গিয়ে মাকে নিয়ে এসেছিলেন। তখন মাণিকবউ উন্মাদ নন অথবা উন্মাদরোগের উপসর্গটা পাল্টে গেছে। মধ্যে মধ্যে চীৎকার করেন—ঠাকুর, তুমি এসে বল! সাক্ষী দাও! ঠাকুর!

বাকী সময়টা চুপ ক'রে পড়ে থাকতেন, আর আপন মনে বলতেন—এই তোমার ইচ্ছে, নয়? তোমাকে ভজলে কলঙ্কের ভাগী হতেই হবে? বেশ তাই হোক! হ্যাঁ, আমার জাত গিয়েছে। বড়বাবুকে যখন বিয়ে করেছিলাম তখনই গিয়েছিল। কিন্তু তখন তো শালগ্রাম হয়ে সাক্ষী হয়েছিলে! আপত্তি তো কর নি? কেন?

আবার চেঁচিয়ে উঠতেন—ঠাকুর, এসে বল! সাক্ষী দাও। ঠাকুর!

এরই মধ্যে সুলতা, জ্যাঠামশাই তাঁর কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক কোম্পানীর কাগজ সই করিয়ে নিজেদের নামে ট্রান্সফার করিয়ে নিয়েছিলেন। বাবাও তার ভাগ নিয়েছিলেন।

খবর অন্নপূর্ণা-মা পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন দেখতে ব্যবস্থা করতে। কিন্তু জ্যাঠামশায় তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বাবাকে দিয়ে তখন চেষ্টা করিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা-মা, তাঁকে এই বাড়ীতে এনে যত্নের মধ্যে রাখতে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এরই মধ্যে মাণিকবউ একদিন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে পালালেন।

পালালেন—একেবারে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে ভিক্ষা করেই খেতেন প্রথম প্রথম। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক বৃদ্ধা বাঈজীর। আগ্রার কৃষ্ণাবাঈ। বাংলাদেশের চুঁচুড়ার কায়স্থ জমিদারগৃহিণী কৃষ্ণভামিনী। দেবেশ্বরের ভিক্ষামায়ের। তিনি তখন বৃন্দাবন-বাসিনী হয়েছেন। অর্থ ছিল প্রচুর। তিনি নিজের কুঞ্জ করে সেখানে বাস করতেন। দেববিগ্রহ ছিল নিজের। পুজো করতেন।

পাগলীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। মধ্যে মধ্যে পাগলী চীৎকার করে ডাকত—ঠাকুর—সাক্ষী দাও! এসে বল! ঠাকুর!

বাংলা কথা শুনেই তিনি ওঁকে নিয়ে যেতেন নিজের বাড়ীতে, যত্ন ক'রে খাওয়াতেন।

ওঁরই বাড়ীতে একখানা ফটোগ্রাফ ছিল—এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ, ন্যাড়া মাথা খড়ম পায়ে দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী দেবেশ্বর রায়ের। কৃষ্ণভামিনী দাসীর ভিক্ষাপুত্রের।

সেই ছবি দেখে মাণিকবউ হা-হা করে কেঁদে উঠেছিলেন—ও কে? ও কে? ও কে গো?

তারপর চীৎকার ক'রে ডাকতে শুরু করেছিলেন—বড়বাবু! বড়বাবু! বড়বাবু গো! দেখ—দেখ—তোমার মাণিকবউয়ের দুঃখ দেখ!—ভিক্ষা করছি! বড়বাবু! আমাকে সঙ্গে কর! বড়বাবু!

এরপর পাগলীকে আর চিনতে বাকী থাকে নি কৃষ্ণাবাঈয়ের। তিনি তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে মায়ের মত, শাশুড়ীর মত কেঁদেছিলেন কপাল চাপড়ে বুক চাপড়ে। নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন মাণিকবউকে এবং তাঁকে নিজের সন্তানের মত রেখে কলকাতায় চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন—বউমা এখানে রইলেন।

সেই অবধি তিনি সেখানেই আছেন সুলতা। তিনি ভুলে গেছেন তাঁর সন্তান, সংসার, রায়বাড়ী, কীর্তিহাট; আর যজ্ঞেশ্বর রায় যোগেশ্বর রায়ও ভুলে গেছেন তাঁদের মাকে। কেন জান? কৃষ্ণাবাঈয়ের আশ্রয়ে থাকার পর আর তাঁকে মা বলে স্বীকার করলে কীর্তিহাটের দেবোত্তর সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে না। শুধু তাই নয় সুলতা, বাংলাদেশের ধনী অভিজাতদের মহলে কৃষ্ণাবাঈয়ের সঙ্গে মায়ের বাস করার অপরাধ অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁরা রটিয়ে দিয়েছেন, মা বৃন্দাবনে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন। কোন সম্পর্ক তিনি নিজেই রাখেন না।

তা তিনি রাখেন না। তিনি ভুলে যেতেই চান, কিন্তু ভুলে যেতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে এ দেশের কেউ গেলে তাঁর যত্নের প্রশংসা করেন। আর "বহুমাঈজীর" কথায় ব্রজধামের লোকেরা শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ান।

মেজদি সেদিন রায়বাড়ীর মাণিকবউ, দেবেশ্বরের অবজ্ঞাতা স্ত্রীর কথা বলে বললেন—আমাকে বরং তাঁর কাছে পাঠিয়ে দে ভাই। বাকী দিন ক'টা আমি তাঁর কাছেই কাটাব।

সুলতা, মাণিকবউরাণী সম্পর্কে সেই আমি প্রথম বিস্তৃত বিবরণ শুনলাম; বললেন মেজদি। মেজদি আমার কীর্তিহাটের জীবনে ভাঙা রায়বাড়ীতে আমার মা, আমার সহোদরা বড়দি, আমার রূপসী ঠাকুমা সখি। শুনে আমার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল। মনে হল আমার গলাটা কেউ চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চাচ্ছে।

ওঃ—মাকে নির্বাসন দিয়ে দেবোত্তরের অধিকার নিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই আর বাবা। আর এইভাবে অপবাদ দিয়েছিলেন মেজদাদু শিবেশ্বর রায়!

মেজদি বললেন—ভাই, রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে দিয়ে রাজ্যরক্ষা করেছিলেন। তিনি তো ভগবান।

হায় প্রভু ভগবান! হায় রাজ্য! এ রাজ্যের ভার দায় থেকে আমি কি ক'রে বাঁচব

বলতে পার ঠাকুমা ?—মেজদি ?

মেজদি অবাক হয়ে গিছলেন আমার কথা শুনে।

সুলতা, ঠিক এই সময়ে বেলা তখন ছটো ; মেজদি জেল থেকে রিলিজড হয়ে বাড়ী এসে পৌচেছিলেন আটটা সাড়ে আটটায় ; তারপর ঠাকুমার কথা শুনতে শুনতে ছটো বেজে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না, ছটো বেজে গেছে ; কথায় ছেদ টেনে দিলে বাইসিকিলের ঘণ্টা।

টেলি-গিরাম!

*　　*　　*

টেলিগ্রাম—কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছ—কাম ইমিডিয়েটলি ম্যাটার ভেরী সিরিয়াস।

রথীনের কাকা টেলিগ্রাম করেছেন।

কলকাতায় সন্ধ্যাতেই রওনা হলাম সুলতা। মেজদিকে পাঠাতেই হল কীর্তিহাটে। কারণ মেজদি খালাস পেলেও কীর্তিহাটের মধ্যেই তাঁর গন্তব্যের গতিবিধি টেনে দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতায় পৌছুলাম রাত্রে। রাত্রি তখন এগারটা। হাওড়া থেকে বরাবরই গিয়ে উঠেছিলাম হরিশ মুখ র্জি রোডের বাড়ীতে।

গিয়ে দেখলাম তাঁরা অন্নপূর্ণামায়ের শেষকৃত্য করে সেই মাত্র ফিরছেন কেওড়াতলা থেকে।

ভোরবেলা অন্নপূর্ণামা মারা গেছেন। রাত্রি আটটার সময় থেকে হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় বম্বে থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল রথীন আত্মহত্যা করেছে। টেলিগ্রাম করেছিলেন রথীনের বাবা। রথীন এক নার্সকে নিয়ে বিলেত পালাচ্ছিল। রথীনের বাবা অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়েছিলেন তাকে ধরতে—তাকে ফেরাতে। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন—রথীন নেই। আত্মহত্যা করেছে।

খবরটা শোনবামাত্র অন্নপূর্ণামা বুকে হাত দিয়ে 'কি হল' বলে ব'সে পড়েছিলেন। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যান। ভোর চারটে নাগাদ দীর্ঘ আশী বছরের জীবনে বোধ হয় কালের হাতে হার মেনে ভোরের নিস্তব্ধতার মধ্যে মুখ লুকিয়ে চলে গেলেন।

কীর্তিহাটে যখন গিয়ে পৌছুলাম সুলতা, তখন কীর্তিহাট অত্যন্ত উত্তপ্ত। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় সরকারী তাঁবু ফেলে রিলিফ সেণ্টার খোলা হয়েছে। একটা ছোট পুলিস ক্যাম্প বসে গেছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ; এদিকে কীর্তিহাটে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের জন্ম নেওয়া বাড়ীগুলোতে একটা বড় দল পুলিস এসে বসেছে—তাদের সঙ্গে আছেন একজন এ-এস-পি। সাধারণ তদন্তের জন্ম একজন ডেপুটিও এসে রয়েছেন তাদের সঙ্গে। অতুলেশ্বর যা করেছিল বা করতে পারত তা তার নিজস্ব পুণ্য। কিন্তু সেই পুণ্যে বিচিত্রভাবে বোধ হয় কালমাহাত্ম্যে রায়বাড়ী এবং কীর্তিহাট পুণ্যবান হয়ে উঠেছিল। সেকালে পুলিস যার উপর অত্যাচার করেছে, এই কারণে সে-ই পুণ্যবান বলে খ্যাতিলাভ করেছে। সে তোমার অবিজিত

নয়। বিচিত্রভাবে গোয়ান নির্যাতন পর্বে জমিদার-বাড়ী এবং কীর্তিহাটের হিন্দু প্রজারা একসঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা পড়ার মত অপরাধে অপরাধী বলে নির্ধারিত হলেও তারা দমে নি; কারণ প্রমাণ ঠিক হাতেনাতে কিছু পাওয়া যায় নি। কীর্তিহাটের কেউই দমে নি। এরই মধ্যে জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করেছেন।

গোটা গোয়ানপাড়াটা পুড়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে জীবন্ত পুড়ে মরেছে হিলডা-বুড়ী। চার্চের দুইদিকে দুখানা খড়ের ঘর ছিল—একখানায় ইস্কুল হত, অন্যখানায় থাকতেন পাদরী সাহেব। হিলডা জ্বলন্ত চার্চে ঢুকেছিল মাদার মেরীর ছবিখানা বাঁচাবার জন্যে। গোয়ানপাড়ার লোকে বলে—এর মধ্যে কীর্তিহাটের কংগ্রেসীরা আছে আর রায়-জমিদারেরা। আমরা কংগ্রেসকে ভোট দিই নাই বলে কংগ্রেসওলারা গোসা করে আমাদের এখান থেকে ভাগায়ে দিবে বলেছে, জমিদারবাড়ীর লেড়কা অতুলবাবু ভি কংগ্রেসে আছে। জেল থেকে সে হুকুম ভেজিয়েছে। আর জগদীশবাবু আউর সুখেশ্বরবাবুর লেড়কারা হামাদের ভাগায়কে জমিন কিনে লিবে, এহি মতলবে জবরদস্তি জুলুম লাগাইলে। পহেলে হামাদের গাছ কাটিয়ে লিলে।

এর সঙ্গে আরও অনেক অভিযোগ সুলতা। কমলেশ্বর ওদের খাসী ধরে বিক্রী করে দেয়। ওদের পাড়ার মেয়েদের পিছনে ঘোরে। দু'একজন মেয়ের সঙ্গে তার কলঙ্কের সম্পর্কও আছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ তারা দিতে পারে। তারা এখানে একটা প্রতিবাদ মিটিং করেছিল। সুরাবর্দী সাহেবের লোক এবং খড়্গাপুরের হাডসন এসেছিল মিটিংয়ে। তাদের উপর কংগ্রেসের লোকে যে অত্যাচার করছে তার প্রতিবাদ করেছিল তারা। সে মিটিংয়ে গোপাল সিং ছত্রির বাড়ীর যে ছেলেটির হাত কুপিয়ে খোঁড়া করে দিয়েছে বিমলেশ্বরকাকা, সেও তাতে বক্তৃতা করেছে। ক্রীশ্চান মুসলমান হিন্দুর মিলিত প্রতিবাদ কম্যুনাল বলা চলবে না। মিটিংয়ে প্রিসাইড করেছিল হিলডা। তার পাশে ছিল কুইনা। এই মিটিংয়ে কমলেশ্বরবাবু আর কীর্তিহাটের কংগ্রেস ভলান্টিয়াররা এসে ঢেলা মেরে মিটিং বরবাদ ক'রে দিতে চেষ্টা করেছিল।

জগদীশ্বরবাবু তাদের পাড়ায় বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে শিকার করবার অছিলায় এসে শাসিয়ে বলেছিলেন, চলে যাও তোমলোগ হিঁয়াসে। দাম দেনেকো লিয়ে তৈয়ার হ্যায় হম। লেকেন হিঁয়া রহনে নেহি দেগা। কভি নেহি!

একটু উল্টোপাল্টা হল সুলতা। আগে জগদীশ্বরকাকার শাসানি, তারপর মিটিং। তার পর ছোটখাটো ব্যাপার। তারপরই একদিন পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া। হিডলা পুড়ে মরল। তার ঠিক দুদিন পরই জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করলেন।

জগদীশ্বর রায়ের আত্মহত্যা আর হিলডার অগ্নিদাহে মৃত্যু, এবং কংগ্রেসকে ভোট না-দেওয়া এই তিনটেকে জড়িয়ে পুলিস তার দক্ষ এবং শক্ত পাক দিয়ে বেশ একটা মজবুত রশি তৈরী করছিল, যাতে রায়বাড়ীর তরুণ ছেলে কটি থেকে কংগ্রেসের বৃদ্ধ সভাপতি রঙলাল ঘোষ সহ কীর্তিহাটের কয়েকজন মাতব্বরকে এক কেসে একসঙ্গে বেঁধে চালান দেওয়া যায়।

আমাকে আমার ম্যানেজার বললে, আপনি এখানে থাকবেন না বাবু, আপনি কলকাতায় চলে যান। এখানে থাকলে বিপদ হবে। এবার—।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম শেষটা শুনবার জন্তে। মুখের দিকে চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। বাকীটা সম্ভবতঃ বলার ইচ্ছে ম্যানেজারের ছিল না, তবু সে বললে, এবার মেজতরফকে সেরে দিয়ে যাবে। চষে দেবে পুলিস। গ্রামের লোকও আঙুল বাড়িয়ে সাহায্য করবে না। তার উপর জগদীশ্বরবাবু এবার এলেন যেন সাপের পাঁচ পা দেখে এলেন। অর্চনা বিধবা হল, আপনি তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন—উনি এক পয়সা খরচ করেন নি। সেই মেয়ের টাকা উনি নিজের কাবেজে পেয়ে একেবারে বিলকুল ভুলে বসে ভাবলেন—পুরনো আমলের রায়বাড়ীর দাপট ফিরিয়ে আনবেন। গোয়ানদের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ হয়েছে যেই শুনলেন, অমনি ধরলেন—আমি সোজা করে দিচ্ছি ওদের। হিলডাকে ডেকে বললেন, হিলডা, কিছু কিছু টাকা নিয়ে তোরা এখান থেকে চলে যা। যাদের আবাদী জমি আছে, তাদের দাম আমি দেব। এখানে তোদের থাকা চলবে না। আমি বারণ করলাম, বললাম—বাবু, সুরেশ্বরবাবু আসুন, তিনি বলে গেছেন দু পক্ষকেই। তা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে কোথাকার, তুই আমাকে বারণ করতে আসিস ?—

পিছন থেকে রঘু বললে—লালবাবু! অরচি দিদি আসিয়াছে নিচে।

অর্চনা আমাকে চিঠি লিখেছিল, অত্যন্ত বিব্রত হয়ে চিঠি লিখেছিলো এইসবের জন্তে। তারপর জগদীশ্বরকাকা আত্মহত্যা করেছেন। না-হলে আমি এসেই ওর সঙ্গে দেখা করতাম। হয়তো ও-বাড়ীতেই নামতাম।

নিচে নেমে এলাম। দেখলাম অর্চনা চুপ ক'রে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। স্থির নিস্পন্দের মত। নিশ্বাস পড়াও বুঝা যায় না। টেবিলের উপর নতদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবনায় যেন ডুবে আছে। আমি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি তাও সে বুঝতে পারে নি। আমি ডাকলাম —অর্চনা!

নীরবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বুঝলাম জগদীশ্বর কাকার আত্মহত্যার আঘাতটা মর্মান্তিক হয়ে ওর বুকে লেগেছে। টেবিলের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল অর্চনা। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কাঁদিসনে ভাই। কি করবি বল ? এসব দুর্ঘটনা এমনভাবে ঘটে রে যে এক মিনিট কি আধ মিনিট আগেও কেউ বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না।

অর্চনা বললে, সুরোদা, আমার জন্তে সে আত্মহত্যা করলে। আবার বাবা আমার মুখে কালি লেপে দিয়ে—ছি ছি, সুরোদা—আমি যে ছি ছি করে মরে গেলাম! কি করে আমি মুখ দেখাব বলতে পার ? কোথায় যাব বলতে পার ?

ঘটনাটা বিচিত্র সুলতা। অর্চনার অদৃষ্ট নয়, রায়বাড়ীর অদৃষ্ট অথবা কর্মফল যা বল তাই। গোয়ানপাড়া পোড়া এবং জগদীশ্বরকাকার আত্মহত্যার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ যোগ থাকলেও প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই। জগদীশ্বরকাকা গোয়ানদের উপর খুব চীৎকার ঝঙ্কার করেছেন, অনেক শাসনবাক্য প্রয়োগ করেছেন একথা সত্য, কিন্তু আত্মহত্যা তিনি তার জন্তে করেন নি।

অর্চনা বললে—সুরোদা, এ কথা মাকেও বলতে পারি নি, তোমাকে বলছি। তবে মা হয়তো আন্দাজ করেছে। বাবা আমাকে নিয়ে এখানে আসবার পর থেকেই আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। বড় মানুষ! খাওয়া-দাওয়া চাল-চলন সমস্ত কিছুর হাল বদলে দিলেন। বাড়ীতে কাজ করবার চাকর রাখলেন, চাপরাসী রাখলেন; খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, পোশাক-পরিচ্ছদে হঠাৎ যেন সব কিছুর বদল হয়ে গেল। এখানে এসেই আমার কাছে পাঁচশো টাকা চেয়ে নিয়েছিলেন কয়েক বিঘা জমি আমার নামে কিনবেন বলে। সেই টাকা থেকে এসব হচ্ছিল। জমি পরের নয়, জমি খানিকটা পতিত জমি, তাই তিনি আমার নামে চেক কেটে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আমি এসব জানি, বুঝি—কিন্তু প্রথমটা বুঝতে চাই নি, টাকাটা আমি দিয়েছিলাম। কোন কথা, কোথাকার জমি, কার জমি জিজ্ঞাসা করি নি। ইচ্ছে হয় নি সুরোদা। তবে আপসোস হয়েছিল—কেন ও-বাড়ী থেকে চলে এলাম।

ও বাড়ীর কথা তোমাকে বলি নি সুরোদা, বলতে পারি নি। ওখানে, মানে ও বাড়ীতে ওদের এই পুরুষটা পচে গেছে সুরোদা, একেবারে পচে গেছে। আমাদের মতই পচেছে। তবে শহরের পচন সুরোদা। দেখে ধরা যায় না। সুরোদা—।

অর্চনা এতক্ষণ পাথরের মত বসে শুনেই যাচ্ছিল। সে এবার বাধা দিয়ে বললে—ওদের বাড়ীর কথা তোমার রায়বাড়ীর কথার মধ্যে নাই বা বললে সুরোদা। হয়তো দুনিয়াতে এইটেই সাধারণ নিয়ম সুরোদা। মানুষ ওঠে তপস্যা করে, নামে প্রশংসার মহিমায় অর্থে সামর্থ্যে অসাধারণ হয়ে উঠে বংশ প্রতিষ্ঠা করে যায়। তারপর এক পুরুষ, দু পুরুষ, তিন পুরুষে সব শেষ হয়ে পাঁকের মধ্যে ডুবে যায়। হারিয়ে যায়—আর কেউ খোঁজ করে না। তবে যেখানে যত বড়ত্ব সেইখানেই তত ছোটত্ব সুরোদা; কলকাতা শহর তার এত ঝলমলে সভ্যতা, সেখানে মনুমেণ্টের তলায় গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র মানুষকে ডাকছেন, মানুষেরা ছুটে যায় পাগলের মত—ফাঁসিকাঠে ঝোলে, গুলিতে বুক পাতে; আবার সন্ধ্যের পর মানুষের চেহারা পাল্টায়। সে চেহারা তুমি দেখেছ। এবং সবাই জানে। ওদের বাড়ীতেও তাই হয়েছিল সুলতাদি; আমার নিজের দেওর যে সে আমার স্বামীর সব খবর রাখত, রাখত আমাকে বলবার জন্যে। আমার ভয় ছিল তাকে। তাই পালিয়ে এলাম বাবার সঙ্গে। তখন ম্যাট্রিক পাসও করি নি। কালটাও এখন থেকে পনের বছর আগে। তখনও ভালবাসার দাম ছিল, সতীত্বের দাম ছিল আমার কাছে, আর সত্যি কথা বলছি তোমাকে সুলতাদি, আমার স্বামীকে ওই ছ মাসেই প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলাম।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—বাপের বাড়ী এলাম, এসে আর এক বিপদে পড়লাম। আমার টাকা আমার বিপদ হল। বাবা ওই টাকার উপর দৃষ্টি রেখেই আমাকে কীর্তিহাটে এনেছিলেন। তাঁর জন্যে অনেক চোখের জল ফেলেছিলেন।

পাঁচশো টাকা প্রথম নিয়েছিলেন ক'বিঘে ডাঙা লিখে দিয়ে, সে নিয়ে আমার অভিযোগও ছিল না, আগ্রহও ছিল না, ভাবছিলাম—জীবনটা কাটাব কি করে? কি নিয়ে থাকব? অপেক্ষা করেছিলাম সুরোদাদার, বৃন্দাবন থেকে ফিরলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করব। সংসারে বলতে গেলে একান্ত আপন-জন, আপন সহোদর থেকেও অধিক ছিল ওই। কিন্তু

তার আগেই গোল বেধে গেল।

গোয়ানদের সঙ্গে ঝগড়া একটা কংগ্রেসের চলছিল ভোট দেওয়া নিয়ে। হিন্দুর গ্রামে কংগ্রেস মানেই শতকরা নিরেনব্বই জন। এদিকে সুখেশ্বর কাকার ছেলের সঙ্গে আর একটা ঝগড়া ওদের চলছিল দেনা-পাওয়া নিয়ে। সুখেশ্বরকাকার আমল থেকেই ওঁর নিজের একটা মহাজনী কারবার ছিল। ওঁর পর কল্যাণেশ্বর দাদা প্রকাশ্যেই শুরু করেছিলেন। গোয়ানরা ছিল ওঁদের খাতক। সুখেশ্বরকাকা আগে সোনারূপোর জিনিস রেখে টাকা দিতেন, অনেকে বলত তিনি চুরির মালও সামলাতেন। কিন্তু কল্যাণেশ্বরদা প্রকাশ্যে কারবার ফেঁদে জমি-পুকুর-সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে টাকা ধার দিত। বেশী টাকা কাউকে দিত না, কম টাকা চড়া সুদে দেওয়া ছিল তার কারবার। কারবারটা চলছিল ভাল; যাদের কেউ টাকা ধার দেয় না, তাদের টাকা দেওয়ার সুবিধে হল, মহাজন যা খুসী তাই লিখিয়ে নেয়। হঠাৎ সে সময় নতুন আইন হবে শোনা গেল। ফজলল হক সাহেব ডেট সেটেলমেণ্ট বোর্ড আইন তৈরী করছিলেন। কল্যাণেশ্বর দাদা শোনবামাত্র নালিশ করে বসে থাকলেন। আইন পাস হতে হতে ওদের জমি সব নীলেম করিয়ে নেবেন। ডিগ্রীও হয়ে গেল। বাবাকে ডেকে কল্যাণেশ্বরদা বলেছিলেন—জ্যাঠামশায় অর্চির জন্যে জমি কিনবেন, তা এই ডিগ্রীগুলো কিনে নিন না। ও সবই তো নীলেমে উঠলেই গেল! সে জমি কেনার মতলব মাথায় ঢুকল বাবার। তখন বুঝতে পারি নি আমি। আমার মা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিবাদ তিনিও করেন নি। বরং—একটা গভীর নিশ্বাস ফেললে অর্চনা।

সুরেশ্বর বললে—থাক, তুই চুপ কর। আমি বলছি রে। হ্যাঁ, খুড়ীমা জানতেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন—বাবা, অর্চনার ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা তো আর ফেরাবার পথ ছিল না। বিধবা মেয়ে, জীবনটা গোটাই আছে; নগদ টাকা থাকবে না, থাকে না, টাকাটায় জমি কেনা সব থেকে নিরাপদ, থাকবে। আর তা থেকে গোটা সংসারটাই সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবে; ছেলেগুলোকে পড়াতে পারা যাবে। আর একটা মেয়ে আছে, তার বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অর্চনার এতে সায় ছিল না। একবার পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। তার দরুন উনি পাঁচ বিঘে ডাঙ্গা জমিও লিখে দিয়েছিলেন। একেবারে ফাঁকি দেন নি।

হঠাৎ অতুল জেলখানা থেকে ওর দলের ছেলেদের কাছে খবর পাঠালে, গোয়ানদের ক্ষমা করো না। কঠিন শাস্তি দাও। নইলে এরপর কীর্তিহাটের লোকদের মান-ইজ্জৎ ওরা রাখবে না। লীগের সঙ্গে জোট বেঁধে বুকে বসে দাড়ি উপড়ে দেবে। ওখান থেকে ভাগিয়ে দাও। উঠে যাক ওখান থেকে। সুরেশ্বরের কথা শুনো না। সে একজন ধনীর শৌখীন খেয়ালী ছেলে। তাকে বলো এটা জমিদারীর ব্যাপার নয়। এবং জমিদারী এতে চলবে না।

তারপরই পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া।

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, জ্যাঠামশায়, ডিগ্রীগুলো জারী করবার জন্যে এর থেকে ভাল সময় আর হতে পারে না। আমি আর ফেলে রাখব না। আপনি যদি নিতে চান তবে কিনে নিন। আমার চোদ্দটা ডিগ্রীতে পাঁচ হাজার কয়েক টাকার ডিগ্রী। চার হাজারে অর্চিকে আমি দিতে পারি। দেখুন। নাহলে আমার আরও খদ্দের আছে।

কথাটা ভাঁওতা নয়; গোয়ানদের ঘর পুড়ে গেছে, সরকারী রিলিফ হয়তো মিলবে ঘর করবার জন্য কিন্তু এ অবস্থায় মামলা লড়ে নীলাম ঠেকানো সম্ভবপর হবে না। এবং আদালতের পেয়াদা নিয়ে কীর্তিহাটের লোকেদের সাহায্যে জমি দখলেও বেগ পেতে হবে না। ভেস্ট সেটেলমেণ্ট আইন পাস হয়ে বোর্ড বসতে বসতে এসব কাজ শেষ হয়ে যাবে। জগদীশ্বরকাকা মেয়েকে এসে বললেন—, কিন্তু কি সংকোচ হল কোথায় সংকোচ হল বলা শক্ত…।

কথাটা অসমাপ্ত রেখে একটু যেন ভেবে দেখলে সুরেশ্বর, তারপর বললে—বলা শক্তই বা বলছি কেন সুলতা, বলা বোধ হয় খুব সোজা; জমিটা কিনে স্বার্থটা সিদ্ধি হবার কথা জগদীশ্বরকাকার নিজের বলেই সংকোচ হয়েছিল তাঁর। নাহলে হবার কথা নয়। যাক সংকোচ তাঁর হল, সংকোচভরেই কথাটা প্রথম বললেন অর্চনাকে। চার হাজার টাকার চেক একখানা লিখে দে। এ সুযোগ গেলে আর চট করে আর মিলবে না মা। কিন্তু অর্চনা দিলে না। হয়তো সংকোচ দেখে সন্দেহ হয়েছিল। কিম্বা গোয়ানদের এই বিপদের মধ্যে ডিগ্রীজারী করে তাদের জমিটুকু আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তি হয় নি—এও হতে পারে। সে বললে —না বাবা, ওসব জমিটমিতে আমার কাজ নেই। ও আমি কিনব না।

এক ধরনের বিষণ্ণ হাসি আছে যা কান্নার চেয়েও সকরুণ। সেই হাসি হেসে অর্চনা বললে—আমি বুঝতে পারি নি যে বাবা লোভের এবং জেদের এতখানি বশবর্তী হয়ে পড়েছেন। বুঝলে হয়তো চেকখানা লিখে দিতাম। কি করব আমি টাকা নিয়ে? অন্তত তখন তো তাই ভাবতাম। তখন তো পৃথিবী আমার কাছে অর্থহীন হয়েই গেছে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি। বাবা আরও ত্বার বলে কেমন যেন চোরের মত ফিরে গেলেন। তুপুর-বেলা নিজের ঘরে বসে আমাকে গাল দিচ্ছিলেন নেশা ক'রে। তার সঙ্গে মাও খোঁচা দিয়ে তু-চারটা কথা বলছিলেন। আমি স্বার্থপর। আমি সুরোদার কুহকে পড়েছি। সুরোদা না বললে আমি কিছু করব না, এমন ধরনের কথার গভীরে কুৎসিত ইঙ্গিতও ছিল। শুনে আমার মাথা কেমন গরম হয়ে গেল। আমি তাঁর ঘরে এসে প্রথম সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলে ফেললাম—তোমাদের মতলব আমি বুঝেছি। তোমার আমার কল্যাণের জন্য আমাকে এখানে আনো নি। এখানে আমাকে এনেছ আমার সর্বস্ব শুষে নিতে। কিন্তু সে আমি দেব না। সে আমি বলে দিলাম।

আমি ভাবতে পারি নি সুলতাদি—ওঃ! আমি ভাবতে পারি নি। ওঃ,—একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার অর্চনা বললে—রাত্রে খাবারের সঙ্গে মানে লুচির সঙ্গে সিদ্ধি মিশিয়ে দিয়েছিলেন মা। বাবার পরামর্শমতই দিয়েছিলেন। যাতে আমি অজ্ঞানের মত ঘুমিয়ে পড়ি। কলকাতা থেকে আসবার সময় টাকা রেখেছিলাম ব্যাঙ্কে, আর গয়না রাখবার জন্যে একটা নতুন লোহার সিন্দুক আলমারি এনেছিলাম। সেটা থাকত আমার মাথার শিয়রে। সেদিন খেয়ে উঠে কিছুক্ষণ পরই মনে হল মাথা ঘুরচে যেন, শরীরটা যেন কেমন করছে; তারই মধ্যে এক এক সময় অকারণে হাসতে ইচ্ছে হচ্ছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ এক সময় ঘুম ভাঙল। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না কিছু, তারপর মনে

হল কে যেন কি করছে মাথার শিয়রে। হয়তো নেশার ঝোঁকের মধ্যেই চীৎকার করে উঠেছিলাম—কে? কে? কে?

কার একখানা হাত মুহূর্তে আমার মুখের উপর এসে পড়ল। মুখ চেপে ধরে চাপা গলায় বললে—চুপ্! সে গলার আওয়াজ ভয়ঙ্কর।

হাতখানাও অত্যন্ত কঠিন এবং নির্মম। পেষণের যন্ত্রণার মধ্যে বোধ হয় আমার নেশার ঘোর কেটে গিয়েছিল, আমি একটা গন্ধ থেকে চিনতে পেরেছিলাম এ হাত বাবার। গাঁজার গন্ধ উঠছিল। এদিকে এমনভাবে আমার মুখ চাপা পড়েছিল যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, প্রাণপণে ধাক্কা দিয়ে মুখ ছাড়িয়ে চীৎকার করে উঠলাম—বা-বা! বলতে পারব না সুরোদা, এতখানি শক্তি আমার কোথা থেকে এসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে দুখানা হাত সাঁড়াশীর মত আমার গলার উপর এসে পড়ল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে কার যেন গলা শুনেছিলাম—ওগো, ওগো—।

আর কিছু শুনি নি। জানি না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমার মুখ মাথা জলে ভিজে গেছে, বিছানা ভিজে গেছে; আর কান্না উঠছে; গোলমাল উঠছে। ও ঘরে বাবা নিজের বন্দুকের নলটা মুখে পুরে ঘোড়া টিপে দিয়েছেন, খুলিটা ফাটিয়ে দমদম বুলেট বেরিয়ে গেছে। তেলোর কাছটা এতখানি জায়গায় একটা গহ্বর সৃষ্টি হয়ে গেছে।

এখানেই শেষ নয় সুলতাদি, কিন্তু সে কথা আমি বলতে পারব না। কোন মেয়েছেলে বলতে পারে না। রায়বাড়ী এত বড় বাড়ী। এত তার মান, এত তার মর্যাদা, এখনও জমিদারী সুরোদার টাকার বাঁধনে আটকে আছে—তার মর্যাদা মান তো বাঁচাতে হবে। তার জন্য হতভাগিনী একটা কন্যাকে বলি যদি দিতেই হয় তো না দিয়ে উপায় কি!

ওঃ! বলে সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকলে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সম্পদের মধ্যে বিষ আছে। জীবনকে বিষিয়ে দেয়। রায়বাড়ী সেই বিষে একেবারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। আক্ষেপের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সুরেশ্বর বললে—ধনেশ্বর কাকা, মেজতরফের বড় ছেলে, তিনি ভাইপোদের সঙ্গে পরামর্শ করে রটিয়ে দিলেন, কি জান সুলতা? রটিয়ে দিলেন, অর্চনার ঘরে গভীর রাত্রে সাড়া পেয়ে জগদীশ্বর উঠে এসেছিল বন্দুক হাতে করে। কিন্তু কন্যার কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে নিজের ঘরে গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। অর্চনার মা মুখ টিপে বন্ধ ক'রে রইলেন। প্রতিবাদ করা দূরে থাক, মুখ তুলে মেয়ের দিকে একবার তাকালেন না পর্যন্ত। হয়তো তাকাতে পারলেন না।

সুরেশ্বর বললে—সেদিন দুপুরবেলা বিবিমহলে টেবিলের উপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত কথা আমাকে ব'লে অর্চনা বললে—আমি কোথায় যাব, কি করব, কি করে এরপর জনসমাজে মুখ দেখাবো বলতে পার সুরোদা? আমাকে একটা পথ দেখিয়ে দাও।

আমি চুপ ক'রে বসে সামনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম কাঁসাইয়ের ওপারের সিদ্ধাসনের জঙ্গলের দিকে। যে জানালাটার নিচে মধ্যে মধ্যে গোয়ানপাড়ার মেয়েরা এসে খিল

খিল করে হাসত, এবং বিবিমহলের একটু পশ্চিমে কাঁসাইয়ের দহের মধ্যে তারা মৎস্যকন্যার মত সাঁতার দিত, যে জানালাটার ওপাশেই কাঁসাই তীরভূমির লম্বা অর্জুন গাছগুলোর ডালে বসে 'বউ কথা কও' পাখী ডাকত—এটা সেই জানালা। আমি কোন পথই দেখতে পাচ্ছিলাম না। না সুলতা, পাচ্ছিলাম না নয়, পথ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু সে কথা বলতে, অন্ততঃ অর্চনাকে বলতে আমার সাহস ছিল না এবং পূর্ণ-সত্য প্রকাশ করতে হলে নিজের ক্ষুদ্রতাও বলতে হবে; অকপটে স্বীকার করছি, পথ ছিল; দেখতে পাচ্ছিলাম অর্চনার আবার বিবাহের পথ, সেই পথই একমাত্র তার সার্থকতার পথ। কিন্তু আমি জানতাম অর্চনা সে পথ নেবে না, নিতে পারে না এবং কীর্তিহাটের রায়-বংশের শেষ সমৃদ্ধ এবং সম্পদশালী পুরুষ, আমার জিহ্বা একথা উচ্চারণ করতে পারছিল না; বলবার চেষ্টা করতে গেলে ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের গলা নিজে চেপে ধরি!

অথচ আমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর মডার্ন জার্নালিস্ট যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি নিজে আলট্রামডার্ন আর্টিস্ট সুরেশ্বর রায়। নগ্ন বাস্তবতা যে কি বিচিত্র সত্য তা সেদিন বোধ হয় প্রথম অনুভব করে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জীবনে যাকে জীবনের দাবী বলে অন্তরে অন্তরে মানি, স্বীকার করি, বাইরে তাকে সমাজের দায়ে, বংশমর্যাদার দায়ে স্বীকার করতে পারলাম না। সুলতা, কিছুতেই আমি বলতে পারলাম না অর্চনাকে, অর্চনা তুই আবার বিয়ে কর। বরং মনে করতেই যেন মন কেমন করে উঠেছিল, রায়বাড়ীর বিধবা মেয়ে আবার বিয়ে করবে?

অর্চনা আমাকে আবার প্রশ্ন করলে—বল সুরোদা, বল আমি কি করি এখন! কি করা উচিত?

একটু চুপ করে থেকে বললে—তোমাকে একটা কথা বলি নি সুরোদা, তোমাকে বলি সেটা। আমার ভয় করছে, টাকা-গয়নার জন্যে আমাকে এরা মেরে ফেলতে পারে। কিংবা আমাকে—

চুপ করে গেল অর্চনা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোর মিথ্যে কলঙ্ক দেবে?

—তা দিতে পারে। কিন্তু দিয়ে তো কোন লাভ হবে না। টাকাটা তো তাতে পাবে না। হয়তো আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে যেটা মাসোহারা সেটা বন্ধ হতে পারে, কিন্তু যে টাকাটা ইনসিওরেন্সের দরুন পেয়েছি—যে গয়নাগুলো আছে সে তো আমারই থাকবে। লোভ তো ওদের এইগুলোর ওপরেই।

বুঝতে পারলাম না অর্চনা কি বলতে চাচ্ছে। বললাম—কি বলছিস তুই?

অর্চনা শুধু বললে—সুরোদা, সেজকাকার অসাধ্য কর্ম ছিল না। সে সব পারত। দাদু ঠাকুরদের গহনা গালিয়ে বিক্রী করে নিজেদের কতকগুলো পতিত জমি খারাপ জমি বিক্রী দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সবটা করেছিলেন সুখেশ্বরকাকা। উনি তার মধ্যে থেকেও সোনা সরিয়েছিলেন, আর সরিয়েছিলেন দামী পাথর। জানতে পেরেও দাদু কিছু বলতে পারেন নি। কল্যাণেশ্বরদা তার থেকেও ভয়ানক, সে সব পারে। পারে না এমন কাজ নেই। ভয়

আমার ওকেই। নইলে কত অনাথা বিধবা মেয়ে গ্রামের লোকের ভরসায় কুঁড়েঘরে দুঃখ মেহনত করে জীবন কাটিয়ে দেয়। পেটের ভাবনা ছাড়া আর কিছুর ভাবনা তো থাকে না। শুধু কল্যাণেশ্বর দাদা কেন ?—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে, সুরোদা, আমার সমবয়সী ছ মাসের ছোট আমার থেকে জ্যাঠামশায়ের ছেলে অরুণেশ্বর তোমার জ্যাঠার ছেলে প্রণবেশ্বর—এদের কাউকে বিশ্বাস নেই। তুমি জান না সুরোদা, তুমি যেদিন বৃন্দাবন গেছ, তার পাঁচদিন পর প্রণবেশ্বরদা এখানে এসে হাজির হয়েছে। বাবা মারা যাবার ঠিক পরদিন।

আমি শিউরে উঠলাম সুলতা। চোখ দুটো যেন আপনা থেকে বন্ধ হয়ে এল। রায়-বাড়ীর দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিল। কথাটা মুখে আনতে আনতে আমার জিভ কুঁকড়ে যায়।

অর্চনা বললে—তোমার যায় কিন্তু সেদিন মানে বাবার মৃত্যুর পরই কথাটা ওদের মনে উঠেই ক্ষান্ত থাকে নি, জিভেও বেরিয়েছিল। আমি গিছলাম ঠাকুরবাড়ী। মনের একান্ত দুঃখে মায়ের কাছে চুপ করে বসেছিলাম, কাছারী ঘরে বসেছিল কল্যাণেশ্বর আর প্রণবেশ্বর দা। ওদের কথা হচ্ছিল। দুজনেই তারা আমার মনোরঞ্জন বা মনোহরণের চেষ্টা করবে। কল্যাণেশ্বর বলছিল—পাপ! হুঁ! তুমিও যেমন ও পাপ নিয়েনব্ব্ইটা ঘরে। মুসলমান ক্রীশ্চানদের তো দোষই নেই। আর ও তো খারাপ হবেই। সতের-আঠারো বছরে বিধবা হয়ে ও সতী থাকবে! বেশ আছ তুমি। ও এই পয়সা কপালে সুরোর ভাগ্যে আছে।

প্রণবেশ্বরদা উত্তর দিয়েছিলেন—আমার বিশ্বাস, যা হবার তা হয়ে গেছে। বলে হাত-তালি বাজিয়ে হেসে উঠেছিল, তারপর আবার বলেছিল, আমি তো সাফ কথা বলে দিছলাম জামাই ছোকরাকে—রথীনকে। সে বিশ্বাসও করেছিল।

সুরেশ্বর অর্চনাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—সুলতা আমার সেদিন মনে হয়েছিল রায়বংশ ধ্বংস হয়ে যাক। একটা ভূমিকম্প হোক, গোটা রায়বাড়ী থর-থর ক'রে কেঁপে হুড়মুড় ক'রে সব ছেলেপিলে বুড়ো-বুড়ী সব ধ্বংস করে দিক! এদের বেঁচে থাকবার আর কোন অধিকার নেই। আমি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে কথাটা বলতে পারি নি, সেই কথাটাই বলে ফেললাম, বললাম—তুই আজই আমার সঙ্গে এখান থেকে চলে চল অর্চনা, কলকাতায় চল। সেখানে তুই নতুন করে জীবন আরম্ভ কর। পিছনটা মুছে দে। ভুলে যা। আমি বলি—তুই পড়া-শোনা আরম্ভ কর। পরীক্ষা দে। তোর যা বুদ্ধি তাতে তুই পাস করতে পারবি। নিশ্চয় পারবি। তারপর নিজে বিচার করে যা হয় করিস। ইচ্ছে হয় আবার বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতিস। না-হয় যা ভাল লাগবে করবি।

—ছি! অর্চনা আমাকে এমন একটা ছি-কার দিয়েছিল উত্তরে যে সেটা আমাকে ছুঁচের মত বিঁধেছিল সুলতা।

আমার রায়বংশে জন্ম সেটা যেন আমাকে চাবুক মেরে মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেটা আমি আজও ভুলি নি। ওর কাছে আমি মাথা হেঁট করেই থাকি। আজও ও ওর ওই সত্যটাকে সত্য করেই তুলে ধরে রেখেছে—রয়েছে। মিথ্যে হতে দেয় নি।

এরই মধ্যে কখন যে বিকেল হয়ে গিয়েছিল সেদিন তা জানতেও পারি নি। জানতে

পারলাম নীচের কোলাহলে।

রঘুরা এসে বললে—গোয়ানপাড়ার গোমেশ, ডিকু, আরও দুজন এসেছে, তারা দেখা করতে চায়। সঙ্গে একজন কনেস্টবল আছে।

গোমেশ, ডিক্রুজ আমার কাছেই কাজ করত। তারা এই ভোটের ঝগড়ার পর থেকেই কীর্তিহাটে ঢুকতে হবে বলে ভয়ে আসে না। এবং ভয় শুধু তাদেরই নয়—আমার ওখানকার নায়েবও আমার জ্ঞাতিদের হয়ে তাদের রাখতে সাহস করে নি।

নিচে নেমে গেলাম। গোমেশ, ডিক্রুজ সেলাম ক'রে বললে—হুজুর দুপুরে ফিরে আসছেন শুনে এসেছি হামিলোক। এরপরই "হামিলোকের বাড়ীঘর সব কিছু পুড়ে গেলো বাবু! ছাই হয়ে গেলো!" বলে গোমেশ হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। "কিছু বাঁচলো না বাবু, কিছু না।"

ডিক্রুজ বললে—চার্চ পুড়ে গেলো, মেরী মায়ের ছবি ছিলো পুড়ে গেলো। হামি লোককে রায়হুজুর একশো বরিষের নাগচ হল আনলেন। বসাইলেন। বাবু—

আমি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কি করব বল? আমি থাকলে হয়তো এমনটা হতো না। আমি ছিলাম না এমন হয়ে গেল। বলতে পারব না কার দোষ, কে দায়ী। আর তা বলেও লাভ নেই। যাই হোক, কি করতে পারি ভেবে দেখি। কাল সকালে আমি তোমাদের পাড়ায় যাব। দেখে আসব।

গোমেশ বললে—ডরকে মারে আপনার নোকরি ছেড়ে দিয়েছি হুজুর। এই গাঁয়ে আমরা ঢুকতে পারি না। কুইনী একঠো চিঠি দিয়েছে আপনাকে। উভি আপনেকে যাবার কথা লিখেছে। আপনে নিজের চোখ্‌সে দেখেন কি হাল হ'ল গোয়ানদের।

কুইনীর চিঠিখানা খুলে পড়ে দেখলাম, সে লিখেছে—"আপনার কথায় নির্ভর ক'রে কি অবস্থা হয়েছে গোয়ানদের এসে দেখে যেতে অনুরোধ করছি। আজই এলে সুখী হব। কারণ আমি কালই চলে যাব খড়্গপুর। তার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার প্রয়োজন। আজই আসতে অনুরোধ করছি। গোয়ানরা অনেকে ঠিক করেছে, তারা তাদের জমি বেচে দিয়ে হয় খড়্গপুর চলে যাবে, নয়তো কলকাতা কি আসানসোল।"

মনটা কেমন ক'রে উঠল সুলতা! চলে যাবে? ওরা এতকাল পরে চলে যাবে এখান থেকে? বিবেচনা ক'রে, বিচার ক'রে দেখলে এইটেই ঠিক যে, তাতেই তাদের মঙ্গল ছিল। তারা এসে পড়ত রেলওয়ে কলোনীতে; তাতে ক্রীশ্চানদের মধ্যে এসে অল্পদিনেই তাদের চেহারা পালটাতো। তারা কারখানায় ঢুকে প্রকাশ পেতো নতুন জীবনে। কিন্তু সে কথা মনেই এলো না। তার বদলে মনে এল—মনে হ'ল, চলে যাবে? না—যেতে দেব না।

অহঙ্কারও হ'ল, ওরা আমার কথা শুনবে। গোয়ানপাড়া আমিই নিষ্কর ক'রে দিয়েছি। আমাকেই ওরা আজও রায়বাবু ব'লে মানে। হিলডা, সেদিনও মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে গিয়েও আমি মেদিনীপুরে রয়েছি জেনে আমার কাছে গিয়েছিল।

হিলডা আমার কথা রাখতে গিয়েই এমনভাবে পুড়ে মরল। কুইনীকে মনে পড়ল। কুইনীকে আমিই গড়ে তুলেছি। রায়বাড়ীর বড়তরফের কাছে এত বড় পাওনাদার আর

কেউ নেই। আমার অত্যন্ত আপনার জন। শুধু বড়তরফেরই বা কেন? অঞ্জনা দেবীকে ধরলে সব তরফ দেনদার।

তারই জন্যে, সুলতা, আমার ছবির ধারায় দেখো তুমি অঞ্জনা এবং কুইনীর চেহারা একরকম। তফাৎ শুধু কালের মেকআপে। রত্নেশ্বর রায় অঞ্জনাকে ঘর ছাড়িয়ে নিজের কাছে এনে শুধু কোলের কাছে এক অন্ন পঞ্চাশব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু খেতে দেন নি। উপবাসী রেখেছিলেন। আমার পিতামহের আগে দায় তাঁর।

আমি কোন কথা আর ভাবলাম না। অর্চনাকে বললাম—অর্চনা, তুই যা এখন ও বাড়ীতে। আমি গোয়ানপাড়া থেকে ফিরে এসে ও বাড়ীতে যাব। খুড়ীমার সঙ্গে কথা বলে তোকে আমি নিয়ে আসব এ বাড়ী।

অর্চনা মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—গোয়ানপাড়া যাবে সুরোদা? এই সন্ধ্যের মুখে?

হেসে বললাম—ভয় নেই কিছু, ভাবিসনে। আমি তো ক্ষতি কারুর করি নি!

—তা কর নি। কিন্তু তোমার ক্ষতি হলে অন্যের অনেক লাভ হতে পারে সুরোদা!

বললাম—না—না—না। এত ভয় পেলে চলবে কেন! আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব। গোয়ানদের আমি কথা দিছলাম রে। আমার কথাতেই ওরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ না জানিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিল। আমি বলেছিলাম—আমি চেষ্টা করে দেখি। যদি মেটাতে না পারি, তা হলে যা হয় করবে তোমরা। আমার বিশ্বাস ছিল অর্চনা আমি মেটাতে পারব। রঙলাল ঘোষ এখানকার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, তিনি আমাকে ভালবাসেন। খাতির করেন। আমি এখানকার গোচর বাউ নিষ্কর করে দিয়েছি, আমার কথা থাকবে। কিন্তু তার আগেই তোর সর্বনাশের টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেলাম কলকাতা। তারপর বৃন্দাবন। এর মধ্যে আগুন জ্বলে গেছে। আমার একটা দায় আছে ভাই।

সুলতা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল বৃন্দাবনের ঠাকুমার কথা। হোন তিনি পাগল, তবু তিনি আমার ঠাকুমা। তাঁর কথাটা আমার কানের পাশে যেন বেজে উঠল।—নাতি, ভায়লার দেনা আগে শোধ করো ভাই। তোমার ঠাকুরদার এত বড় দেনা আর নেই। এ দেনা শোধ না করলে তাঁর মুক্তি নেই।

একালে পরকাল অন্তত শিক্ষিত লোকে মানে না। আমি মানি কিনা জানি না, তবে সেদিন দশ আনা অন্ততঃ মানতাম না। তবু তাঁর কথাটা সেদিন সত্য বলেই মনে হয়েছিল।

অর্চনাকে বললাম—বলব, আরও কথা আছে তোকে বলব। এসে বলব। আমার না গিয়ে উপায় নেই।

কাঁসাই পার হয়ে গোয়ানপাড়া যেতে এবং ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেক লাগে, আর ওখানকার কাজ মেটাতে লেগেছিল ঘণ্টাখানেক।

কাজ খুব সংক্ষেপেই সেরে এসেছিলাম। প্রায় দেনদার যেমন পাওনাদারের টাকা দিতে গিয়ে বলে—হিসেবনিকেশ থাক, এই টাকা আমার আছে, এই আমি দিচ্ছি। এতে যদি খালাস দিতে হয় দিন; না-হলে দলিলের পিঠে উশুল দিয়ে লিখে রাখুন; পরে দেখব হিসেবনিকেশ ক'রে আর কত আপনার পাওনা।

কুইনী প্রত্যাশা করেছিল আমি আসব। পোড়া চার্চটার পাশে একটা টিনের চালা বেঁধে তখন সেখানে থাকে। হিলডার বাড়ীটা একেবারে পুড়ে গেছে। হিলডার বাড়ীই কুইনীর বাড়ী। ওই চালাটার সামনে বসবার একটু ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। সেইখানেই বসেছিলাম।

গোয়ানপাড়ার লোকেরা ভিড় করে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। মানুষগুলির দৃষ্টিতে একটা বিরোধের রুক্ষতা যেন ঝিলিক মারছে। একটু অস্বস্তি বোধ না করে পারি নি। এ প্রত্যাশা তো করি নি আমি।

কে একজন বলে উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে—"দেখেন আমাদের হাল দেখেন!"

আমি কুইনীকে কাছে ডেকে বললাম—কুইনী, তুমি ওদের বল যে প্রত্যেক পরিবারকে আমি একশো টাকা হিসেবে সাহায্য দেব। আর তোমাদের চার্চের জন্যে আলাদা পাঁচশো টাকা দেব।

এতে সাধুবাদ উঠল না, জয়ধ্বনি দূরের কথা। চুপ ক'রে রইল সকলে। একজন কেউ বলে উঠল—একশো রূপেয়া সে কি হোবে?

আমি হেসে বললাম—কিন্তু এর জন্যে তো আমার কোন অপরাধ নেই।

—আপনার না থাক, রায়বাবুদের দায় আছে। অতুলবাবু কংগ্রেসী কাম ক'রে জেল গেলো, তব ভি রায়বাড়ীর চাল ছাড়লে না। জেলসে হুকুম পাঠালে কি—গাঁও জ্বালা দেও।

অবাক হয়ে গেলাম, আমি, বললাম—অতুলবাবু হুকুম পাঠিয়েছিল?

—হাঁ অতুলবাবু। আমরা জানি, শুনেছি।

মিসেস হাডসন গম্ভীরভাবে বসেছিল, সে বললে—So we have heard—it is a very strong rumour. We shall try to prove it.

কুইনী বললে—সকলেই তাই বলছে।

বললাম—বলুক। সত্য হলে সেটা অতুলের দায়, আমায় নয়। তবে তোমার দিদিমার ঘর পুড়ে গেছে, সে নিজে পুড়ে মারা গেছে, তার ক্ষতিপূরণ পুরো করব আমি—

বাধা দিয়ে কুইনী বললে—ধন্যবাদ স্যার, কিন্তু সে আমি চাইনে, নেব না। এখানকার লোক আমি নই। আমি বাঙালী ক্রীশ্চান। আমি খড়্গপুর থেকে কলকাতা চলে যাব। কীর্তিহাট থেকে, গোয়ানপাড়া থেকে দূরে থাকতে চাই।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বললে—আপনি চার্চটি আগাগোড়া নতুন ক'রে দিন। আমার দিদিমা ওই চার্চের ভিতর মাদার মেরীর ছবি বাঁচাবার জন্যে ঢুকেছিল আর বের হ'তে পারে নি। ওতেই দিদিমার তৃপ্তি হবে।

বললাম—বেশ তাই দেব। আর নিজে আমি ম্যাডোনার ছবি এঁকে দেবো।

তবু লোকে খুব খুশী হয় নি। কেউ একজন পিছন থেকে ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিল—

জিমিদার! হিঁয়া জিমিদারী মারাতে আসছে। থুক্ ফেকো একশোও রূপেয়া পর। কি হোবে বাবা—?

মনে মনে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলাম। কিন্তু কি করব? কোন উপায় ছিল না।

ফেরবার সময় আমার সঙ্গে গোমেশ ডিক্রুজ আসছিল। ওরা আমার কাছে কাজ করত। ওরা সে কৃতজ্ঞতাটুকু ভুলতে পারে নি। বা ওদের প্রত্যাশা তখনও ছিল। ওরা আমার সঙ্গে আসছিল আমাকে পৌঁছে দিতে। কাঁসাইয়ের গর্ভে তখন অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে উপরের দিকে উঠছে। বিস্তীর্ণ বালুময় গর্ভ জুড়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝিরা মুখর হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে তিনটি মানুষ যেন বোবা হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ এক সময় ডিক্রুজ বললে—নোকর হিসেবে আমাদের বাত্ মনে রাখবেন হুজুর। সব লোককে শ রূপেয়া দিবেন—হামরাদের তো বেশী মিনসা চাই।

না বললাম না। বললাম—আচ্ছা।

ওরা এতক্ষণে মুখর হয়ে উঠতে চাইলে। আবোলতাবোলই বকছিল ওরা। আমি কান দিই নি। আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম টাকাটা বোধ হয় মিথ্যেই অপব্যয় করলাম। বংশের দেনাপাওনা বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। নিরর্থক। অর্থই হয় না। কিন্তু এই কথাটা যেন শক্ত এবং সোজা হয়ে ভেঙে পড়া আমার ভার সইতে পারছিল না। বেঁকে যাচ্ছিল। নুয়ে পড়ছিল। আসলে আমি আহত হয়েছিলাম। ওদের এই অকৃতজ্ঞতা আমি প্রত্যাশা করি নি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম গোমেশের কণ্ঠস্বরে। ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল—বাবুজী অনেক লোক!

বলেই তারা ছুটে পালাল। আমি চমকে উঠে মুখ তুলে দেখলাম কাঁসাইয়ের ঘাটের উপর অনেক কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ নীরব পাথরের মূর্তির মত। জিজ্ঞাসা করলাম—কে?

—আমরা কীর্তিহাটের। আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আমার জন্যে—

—হ্যাঁ। আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে।

—কেন? কি ব্যাপার?

—গ্রামের বিচার সভা বসেছে পঞ্চায়েতের। রায়বাড়ীর কালীমায়ের নাটমন্দিরে। আসুন আমাদের সঙ্গে।

গিয়ে দেখলুম—সত্যই নাটমন্দিরে গ্রামের লোকেরা জমায়েত হয়েছে। রায়বাড়ীর প্রবীণতম পুরুষ ধনেশ্বর রায় থেকে প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর প্রভৃতিরা একদিকে ব'সে আছে; অন্যদিকে ব'সে আছে দয়াল দাদা থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিরা; মাঝখানে বসেছে বৃদ্ধ রঙলাল ঘোষ। পাশে তার উকীল ছেলে।

কংগ্রেসের সভাপতি রঙলাল ঘোষ বিচারক সভাপতি। গ্রামের লোকেরা বিচার প্রার্থনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আজ কণ্ঠস্বর মিলিয়েছেন রায়বাড়ীর রায়বংশধরেরা।

অভিযুক্ত আমি। সুরেশ্বর রায়। রঙলাল ঘোষ বললেন—আসুন বাবা। বসুন। আপনার বিরুদ্ধে তো অনেক নালিশ গো!

সুরেশ্বর বললে—দপ্ করে যেন আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার করে উঠি। একদিন এই নাটমন্দিরেই ভয়ার্ত মেজদিদির হাত ধরে প্রায় টেনে এনে ধনেশ্বর, প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর সকলের মুখের উপর চীৎকার করে বলেছিলাম, এখানকার মালিক আমি। আমার হুকুম ছাড়া অন্যের অন্যায় হুকুম আমি চলতে দেব না। মেজরায়-গিন্নীর অপমান হলে আমি সহ্য করব না। দিন ঠাকুরমশাই মেজদিকে পুষ্প-চরণোদক দিন।

কথাটা তোমার বোধ হয় মনে পড়বে সুলতা। সম্ভবত আরও মনে আছে সেদিনের কথা, যেদিন সেটেলমেণ্ট সার্কেল অফিসার হরেন ঘোষের সামনে গোচর নিয়ে ধনেশ্বরকাকাদের ঝগড়ার মধ্যে আমি আদিপুরুষ কুড়ারাম রায়ের কড়চার কথা স্মরণ করে বলেছিলাম—কীর্তিহাট বসতবাড়ী আর গোচর নিষ্কর দিয়ে গেছেন কুড়ারাম রায়, তখন ধন্য ধন্য করে উঠেছিলেন এই রঙলাল ঘোষ। সেদিন বলেছিলেন—হ্যাঁ, জমিদারের পুত্র ব্রাহ্মণের ছেলে বটেন বাবা আপনি! নমস্কার বাবা আপনাকে।

মনে পড়ে গেল, রত্নেশ্বর রায় যেদিন নিজের অধিকারে ফিরে এই কালী-মায়ের মন্দিরের বারান্দায় প্রথম কাছারী করেছিলেন, প্রজাদের প্রণাম আর সেলামী নিয়েছিলেন।

মনে পড়ল—তার পরের দিন বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বরকে নিয়ে কাছারীতে বসে পুণ্যাহ উপলক্ষে জমিদারীর সীমানার মধ্যে খেয়াঘাটের ডাক, হাটের ডাক আর মৌজা বীরপুরের মণ্ডলান আদায়ের ডাক করিয়েছিলেন, সেদিনের কথা।

আশ্চর্য সুলতা, জমিদারী নিজে কখনও করি নি। করতেও চাই নি। বরং প্রজারাই অযাচিত ভাবে আমার কাছে বিচারের জন্য এসেছে সময়ে সময়ে। আমি বিব্রত বোধ করেছি। কিন্তু সেদিন—সেদিন তারিখ ছিল ১৯৩৮ সালের মে মাসের শেষ, সেদিন ওই রঙলাল ঘোষের সামনে অভিযুক্ত হিসাবে দাঁড়াবার সময় দেখলাম, রায়বাড়ীর জমিদারত্বের সবটুকু আশ্রয়হারা হয়ে কখন আমার মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে বলছে—"আমাকে বাঁচাও। আমাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য, তারপর সোমেশ্বর রায়, বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় আমাকে গড়ে গেছেন; তারপর থেকে আমাকে সকলে হাতুড়ি মেরে ভেঙে ভেঙে আসছে, তার মধ্যে আমার মরতেও ভাল লাগছিল কিন্তু এইভাবে আত্মসমর্পণ করে বলিদানের জন্তুর মত মরতে আমার আর লজ্জার শেষ নেই—সীমা নেই।"

রঙলাল ঘোষ হাত দিয়ে সামনের আসরে আমার বসবার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমি ভুরু কুঁচকে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললাম—নালিশ আমার বিরুদ্ধে কে করলে আপনার কাছে?

সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক বলে উঠল—আমরা। আমরা গ্রামের লোক। সমস্ত কণ্ঠ ক'টি তরুণ। প্রবীণেরা মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—গ্রামের লোকের অভিযোগ কি, তা আমি জানি না কিন্তু অভিযোগের বিচারের এই আইন, এই ব্যবস্থা কে করলে? বিচার উনি করতে

বসেছেন কিসের বলে ?

একসঙ্গে অনেকগুলো হিংস্র মানুষ গর্জন করে উঠল। বললে—আমরা দিয়েছি, আবার কে ? গ্রামের লোকেরাই দিয়েছি। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট উনি, উনি ছাড়া বিচার করবেন কে ?

রঙলাল ঘোষ এবারও বললেন—অন্যায় কথা হল বাবা, অন্যায় কথা হল! দেখুন, জমিদার হোন, ব্রাহ্মণ হোন, যা হোন—দশকে মানব না বললে চলবে না। দেশে আর দশে তফাৎ নেই বাবা। বিচার মানতে হবে। অভিযোগ শুধু গাঁয়ের লোকে করে নাই বাবা। আপনার বংশের এইসব এঁরাও করেছেন।

মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে একটা কি যেন পাক দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চীৎকার করে উঠি। বলি—না-না-না!

আমার নীরবতার মধ্যে একজন কে বলে উঠল—উনি গ্রামের লোকের, দেশের লোকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে একরকম বিরোধ করেই আজ ওই গোয়ানপাড়ায় গিয়ে তাদের ঘরপিছু একশো টাকা সাহায্য দেব বলে এসেছেন। চার্চকে নতুন করে গড়তে যা খরচ লাগবে দেবেন। ইচ্ছে করে গাঁয়ের অপমান করেছেন উনি। তাছাড়া উনি, গোয়ানরা গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে, আনতে চাইছে, তাতেও একরকম সায় দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন।

—এ তো আপনি করতে পাবেন না বাবা। এ তো হতে পারে না।

আমি বললাম—সুলতা, নিজেকে শক্ত করে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বললাম—কে কাকে দান করবে, কেন করবে—এ নিয়ে কারও কোন আপত্তি চলতে পারে বলে আমি মনে করি না ঘোষমশায়। মাফ করবেন, আপনার বিচার আমি মানতে পারলাম না। গোয়ানদের ঘর পুড়েছে, তাদের সাহায্য করাতে যদি আপনাদের সঙ্গে বিরোধ করা হয়, তবে তাই হল। উঠে দাঁড়ালাম আমি।

মুহূর্তে সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল—তাই হল ?

সঙ্গে সঙ্গে জনতিনেক বেশ শক্ত-সমর্থ জোয়ান এসে আমাকে রূঢ়স্বরে বললে—বসুন আপনি।

রঙলাল ঘোষ বললেন—মাথা ঠাণ্ডা করুন বাবা, রাগ করে কোন ফল হবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে বসুন।

আমি চলে যেতে চাইলাম কিন্তু আমাকে জোর করে ধরে রাখলে ক'জনে। আমি স্তব্ধ হয়ে পাথরের মত দাঁড়ালাম। আমি বসব না, আমি মুখ খুলব না—আমি যেন পাথর হয়ে গেছি। কিংবা বলতে পার রায়বংশের শেষ জমিদার আমি পাথরের মত অটল থাকতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ মনে হল যেন রায়বাড়ীর পলেস্তার-খসা নোনা-ধরা ইটের ফাঁক থেকে অসম্ভব অবিশ্বাস্য অভিযোগ দাখিল করছে আমার বিরুদ্ধে।

—উনি অহিন্দু, উনি অধার্মিক, উনি টিপিক্যাল জমিদার, এখানে ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি চালিয়ে আমাদের বুকে বাঁশ দিতে এসেছেন। এই গোয়ানদের রায়বাবুরা এনে

বসিয়েছিলেন মহাল শাসনের জন্মে। প্রজা দুরস্ত করবার জন্য। এখন প্রজার আমল—প্রজাদের শাসন করবার জন্মে গোয়ানদের কোলের কাছে টানছেন। উনি জানেন না কিম্বা হয়তো জেনেও বুঝতে চান না যে, এই গোয়ানরা মুসলিম লীগের সঙ্গে দোস্তি করে যখন হিন্দু কীর্তিহাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, সেদিন রায়বাবুদের কালীবাড়ীর গোবিন্দবাড়ীর উপর আক্রমণ হবে সব থেকে আগে। কম্যুনাল রায়ট বাধলে গোয়ানরা রায়বাবুদের সাহায্য করবে না, লীগের পাণ্ডাদের হুকুমে লীগের গুণ্ডাদের হাতে লাঠি, শড়কি যুগিয়ে দেবে।

তাছাড়া পাকা সাতপুরুষের জমিদারনন্দন উনি, ইংরিজীতে বলে ব্লু ব্লাড, তার মধ্যে লাম্পট্যের তৃষ্ণা আকণ্ঠ। এত বয়স পর্যন্ত বিবাহ করেন নি উনি ; কেন করেন নি ? প্রচুর টাকা আছে, উনি উদারতা দেখিয়ে স্বজন-সেবাপ্রীতি দেখিয়ে টাকা খরচ করেন, মনের এক ধরনের বিলাস চরিতার্থ হয়, প্রশংসা হয়, তার ফাঁকে ফাঁকে ওঁদের মত লোকেরা বাসনা চরিতার্থ করবার সুযোগ করে নেন।

কথাগুলো বলছিলেন রঙলাল ঘোষের উকিল ছেলেটি। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

—ওই গোয়ানদের পিক্রুস গোয়ান আমার বাবার পিসেমশাই ঠাকুরদাস ঘোষকে খুন করেছিল। লোকে বলে রায়বাহাদুর ইসারা দিয়েছিলেন। গোয়ানদের একটা মেয়েকে নিয়ে এই সুরেশ্বরবাবুরই ঠাকুরদাদা দেবেশ্বর রায়—কেলেঙ্কারির আর বাকি রাখেন নি। শেষ পর্যন্ত ওই গোয়ান মেয়েটার পিছনে পিছনে এসে ওই কাঁসাইয়ের ঘাটে মারা যান। মেয়েটা বিষ খেয়ে মরেছিল। সুরেশ্বরবাবু কুইনী মেয়েটাকে পড়ার খরচ যোগাচ্ছেন। কেন ? লোকে বলে—সকলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—কি বলে তা বোধ হয় কারুর অজানা নয়।—রায়বংশে এ-দোষ চাঁদের কলঙ্কের মত। শুধু রায়বাবুরাই বা কেন, প্রায় সব জমিদারবংশেই আছে। যেখানে বিষয়, সেইখানে ব্যাভিচার। তবে রায়বংশে একটু বেশি এই রকম বলে। সে সেই গোড়া থেকে। রক্ষিতা রাখতেন। জাত মানতেন না। ছোটজাত, বড়জাত বামুন পর্যন্ত—আপনাদের আত্মীয় পর্যন্ত মানতেন না।

* * *

সুলতা, এইরকম একটি রাত্রি আমার জীবনে আর কখনও আসেনি। মনে হচ্ছিল আমি মরে গেছি, আমার আত্মাকে অপরাধী করে হাজির করা হয়েছে ঈশ্বরের আদালতে, সেখানে দেখছি যেন আমার বিচারের জন্য টেনে এনে হাজির করা হয়েছে আমার পূর্বপুরুষদের। সে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে আমার বাবা যোগেশ্বর রায় পর্যন্ত। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাঁদের জীবনের আচরণ থেকে। আমি যেন দেখছিলাম, হয়তো কল্পনায় দেখেছিলাম, তাঁরা যেন বিস্মিত, বিরক্ত, তার সঙ্গে বিব্রতও বটে। বীরেশ্বর রায় পর্যন্ত ক্ষুব্ধ, তবে বিব্রত নন। রত্নেশ্বর রায় চিন্তা করছেন। সত্যিই কি অপরাধ তিনি করেছেন ? পুণ্যের বোঝার চেয়ে কি অন্যায়ের পাপের বোঝাটা ভারী হয়ে উঠল কালের হাওয়ায় ? দেবেশ্বর রায় বেদনার্ত, আমার বাবাকে দেখলাম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবেশ্বর রায়, তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন। বীভৎস তাঁর চেহারা। ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে তাঁর হাড়গোড় ভেঙে যে বীভৎস মূর্তি হয়েছিল, ঠিক সেই বীভৎস মূর্তি।

* * *

ঘোষের ছেলে বলেই গেল—শুধু জাত? এঁরা সম্পর্কসূত্র মানেন না। অন্তত এঁর সম্পর্কে যা শুনছি এবং বাইরে থেকে দেখেশুনে যে-সত্য অনুমান করা যায়, বোঝা যায়, তাতে অনুমান মিথ্যে বলে ঠিক মনে হয় না। এই তো রায়বংশের বাবুরা—কল্যাণবাবু, প্রণববাবু, এমন কি প্রবীণ ধনেশ্বরবাবু বসে রয়েছেন, এই তো আমার পিছনেই মাথা হেঁট করে বসে রয়েছেন—বলুন না, ওঁরা বলুন না?

ধনেশ্বরকাকা বলে উঠলেন—ছেড়ে দাও না মশাই। ও-কথাটা ছেড়ে দাও না। এখন যার বিচার হচ্ছে, তাই হোক না। গ্রামের লোকের অমতে তাদের উপেক্ষা করে গোয়ানদের এই সাহায্য দিচ্ছেন উনি—

হঠাৎ একটি ছেলে লাফ দিয়ে উঠে আমার সামনে এসে হাতের আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে বললে—বলুন, স্বীকার করুন অন্যায় হয়েছে! আর বলুন দেবেন না টাকা ওদের?

হঠাৎ যেন আমি আমাকে ফিরে পেলাম। দৃঢ়কণ্ঠে আমি বললাম—না।

—না? ক্রুদ্ধকণ্ঠে সবিস্ময়ে না শব্দটা জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হঠাৎ একটা ঘুঁষি আমার মুখের উপর মেরে বসল। লাগল এই ঠোঁটের ডান কোণে। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটা কেটে গেল, বেশ গভীর ভাবেই কেটেছিল, মুখের মধ্যে রক্তের স্বাদ অনুভব করলাম। তখন আবার সে ঘুঁষি তুলেছে। সুরেশ্বর রায়ের রায়বংশের কাছে পাওয়া দীর্ঘ সবল দেহখানা শক্ত এবং কঠোর হয়ে উঠল। আমার হাতখানা তার থেকে অনেক লম্বা। শক্ত মুঠিতে তার হাতখানা চেপে ধরে রুখে দিলাম। রঙলাল ঘোষ প্রবীণ মানুষ, সম্ভবত নতুন যুগের মোকাবেলা করা নয় সত্যটাকে স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি চীৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলেন—এ কি? এ কি কাণ্ড? না—না—

কিন্তু তাঁর কথা কে শুনবে? কেউ গ্রাহ্য করলে না, সভাপতির নির্দেশ,—একদল অল্পবয়সীর দল লাফ দিয়ে উঠে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে যে কি দিয়ে আঘাত করেছিল তা বলতে পারব না। আমি কিছুক্ষণ—সে বোধ হয় মিনিট-দুয়েক রুখেছিলাম, তার পরই কপালের উপর এসে পড়ল একটা অত্যন্ত কঠিন কিছুর নিষ্ঠুর আঘাত। আমি বুঝতে পারলাম আমি জ্ঞান হারাচ্ছি, বুঝতে পারলাম পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু তবু আর্তনাদ করলাম না, কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইলাম না, রায়বাড়ীর নাটমন্দিরের ওপর পড়ে মরতেই চাইলাম—এইটুকু তোমাকে বলতে পারি। কথাটা আমার বিশ্বাস করো। তারপর আর কিছু মনে থাকবার কথা নয়, মনেও নেই।

জ্ঞান যখন হল, তখন আমি বিবিমহলে বিছানায় শুয়ে। আমার মাথার শিয়রে কেউ বসেছিল দেখতে পাই নি। পাশে দাঁড়িয়েছিল চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারির ডাক্তার। কাঁসাইয়ে ধারের জানালাটার পাশে চেয়ারে বসেছিলেন একজন পুলিস অফিসার। এদিকে দাঁড়িয়েছিল রঘু। সময়টা ভোরবেলা। তার মানে প্রায় সারাটা রাত্রিই এইভাবে কেটেছে। রাত্রে তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয় নি। মাথায় আঘাত, চেতনাহীন

অবস্থা, এ অবস্থায় এক পাল্কী ছাড়া অন্য কোন যানে এমন রোগী পাঠানো যায় না। তাই বিবিমহলে এনে ডাক্তারকে ডেকে পুলিসের পাহারায় রাখা হয়েছে।

শুনলাম, কেউ শক্ত একটা কিছু সম্ভবত লোহার শিক দিয়ে মেরেছিল আমার মাথায়, পিছন দিক থেকে মেরেছিল। কানের খুব কাছাকাছি। একটু এ-পাশে হলেই জীবন-সংশয় হত। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছিল। তারপরই সশব্দে পড়ে গিয়েছিলাম।

এতক্ষণে সকলের উত্তেজনার ছুটন্ত ধারার মুখে একটা ধ্বস ছেড়ে খসে পড়ে তার গতি রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

এক মুহূর্তে গোটা আসরটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শুধু রঙলাল ঘোষ চীৎকার করে উঠেছিলেন—কি হল? ওরে কি হল? ওরে মারামারি করিসনে। ওরে!

কেউ প্রশ্ন করে উঠেছিল—মরে গেল নাকি? বাধালি ফ্যাসাদ!

ঘোষের উকিল ছেলে শুধু মাথা ঠিক রেখে ডেকে বলেছি—জল, জল! ওরে জল আন, জল!

কতক লোক পিছু হটে সরে গিয়েছিল। কেউ কেউ চলেও গিয়েছিল। কেউ গিয়েছিল জলের সন্ধানে।

ঠিক এই সময়ে বাড়ীর অন্দরের দরজার মুখ থেকে একটি তীব্র নারী-কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল—ছি-ছি-ছি! এমন করে পচে গেছে! গোটা বংশটা এমনি করে পচে গেছে! ছি-ছি-ছি!

এ-কণ্ঠস্বর, সুলতা, গোবরডাঙার খুড়ীমার। সারাজীবন যিনি মুখ বুজে স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছেন আর ঘৃণা করেছেন স্বামীকে, শ্বশুরকে, দেওরদের, সৎ-শাশুড়ীদের, কাকে নয়, রায়বাড়ীর মেজতরফের ইট-কাঠকেও ঘেন্না করেছেন। ধনেশ্বরকাকার স্ত্রী—ব্রজদার মা।

ব্রজদা সেই যে বউ নিয়ে এসেছিল, অতুল ধরা পড়বার সময়—সেই সময় সে যে আমার কি পরিচয় তার মায়ের কাছে দিয়ে গিছল বলতে পারব না, তবে এই আশ্চর্য গোবরডাঙার অহঙ্কৃতা মেয়েটি আমায় ভালবেসে ফেলেছিলেন—ব্রজদার চেয়েও বেশী ভালবেসেছিলেন।

তিনি তাঁর অভ্যাসমত আপন ঘরে বসেছিলেন, অর্চনা খবরটা পেয়ে ছুটে দেখতে এসেছিল কি হচ্ছে! দোতলার টানা বারান্দায় যেখানে বসে রায়বাড়ীর মেয়েরা চিকের আড়াল থেকে নাটমন্দিরে যাত্রা শুনত, বাঈনাচ দেখত, সেইখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা দেখেই ছুটে গিয়ে নিজের মায়ের পায়ে মাথা কুটতে লেগেছিল।—এইজন্যে—এইজন্যে নিয়ে এসেছিলে আমাকে? মা হয়ে, বাপ হয়ে তোমরা আমাকে এই কলঙ্ক মুখে মাখিয়ে দিতে এনেছিলে? বাপ আত্মহত্যা করে জুড়িয়েছে। তুমি? তুমি কি করবে? একবার বললে না যে আমার কন্যার কলঙ্ক যে দেয়, তার মাথায় বজ্রাঘাত হোক! পারলে না বলতে?

চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছিলেন গোবরডাঙার বউ। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছে রে অর্চনা, অমন করে চেঁচাচ্ছিস?

অর্চনা চীৎকার করে উঠেছিল—কি হয়েছে গিয়ে দেখে আসুন কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে। সুরোদাকে বলি দিচ্ছে। তার বিচার হচ্ছে।

—বিচার? কিসের বিচার? কে বিচার করছে?

—বিচার করছে রঙলাল ঘোষ। নালিশ করেছে গাঁয়ের লোক, তাদের সঙ্গে কল্যাণদা, প্রণবদা, জ্যাঠাইমা কি বলব—সবাই আছে,—তাদের নালিশ হচ্ছে, সুরোদা অনেক টাকা খরচ করে আমার বিয়ে দিয়েছেন; ছি-ছি জ্যাঠাইমা, ছি-ছি-ছি!

কিসে থেকে কি হয় এবং কেমন করে হয়, এ বলা খুব সহজ নয় সুলতা, কখনও কখনও মনে হয় বলাই যায় না। গোবরডাঙার খুড়িমা মুহূর্তে যেন সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে জ্বলে উঠেছিলেন। অর্চনার হাত ধরে ওই ছি-ছি-ছি বলতে-বলতেই—সারা সিঁড়ি নেমে কাছারীর দরজা পেরিয়ে ঠাকুরবাড়ী ঢুকে সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি। আসর ভেঙেছে। ধনেশ্বরকাকা তাঁকে বাধা দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের কাছে দাঁড়াতে পারেননি। তিনি যত বলেছিলেন—গোবরডাঙার বউ, গোবরডাঙার বউ!—আঃ, করছ কি?

গোবরডাঙার বউ তত বলেছিলেন—তুমি এমন পিশাচ, এমন অমানুষ, ছি-ছি-ছি! দাঁড়িয়ে দেখছ? মিথ্যে নালিশ করছ? ছি-ছি-ছি! এই জন্যে আমার ছেলেগুলো এমন অমানুষ, এমন পশু! ছি-ছি-ছি!—মেজঠাকুরপো গাঁজা খেতো, মদ খেতো, জন্তুর মত রাগ ছিল, তারও লজ্জা ছিল, সেও লজ্জায় আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। আর তুমি? ছি-ছি-ছি! কল্যাণেশ্বর অর্চনাকে জড়িয়ে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে অপবাদ দিচ্ছে, তাই তুমি কানে শুনছ, সায় দিচ্ছ? ছি-ছি-ছি! ওকে তাড়াতে চাও? এই প্রবৃত্তি তোমার? ছি-ছি-ছি!

কথাটা অর্চনার কাছে শোন; তুই বল অর্চনা—আমি দেখি নি সে গোবরডাঙার খুড়িমাকে, তুই দেখেছিস। বল—জীবনে বোধ হয় একবার তিনি ওই মহিমময়ী মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

* * *

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—সেদিন তিনি যেন নিজেকে ফাটিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। আমার কথা শুনে আমার হাত ধরে টেনে নীচে প্রায় হেঁচড়ে নিয়ে এসেছিলেন; মুখে ওই এক বুলি—ছি-ছি-ছি!

তারপর তাঁর সে-মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নাটমন্দিরে—নাটমন্দির ভরা লোক, হেজাকের আলো জ্বলছিল, তুমি পড়ে রয়েছ, রক্তের দাগগুলো কালো দাগড়া-দাগড়া ছোপের মত দেখাচ্ছিল, তারই মধ্যে জ্যাঠাইমা দাঁড়ালেন—সাদা শাঁখের মত গায়ের রঙ, বড় বড় চোখ, মোটাসোটা মানুষ, মাথার কাপড় পড়ে গেছে গ্রাহ্য নেই; হেজাকের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করলেন জ্যাঠামশাইকে। সম্ভবত স্বামীর প্রতি জীবনের জমা-করা ঘেন্না, জীবনে সন্তানদের কাছে পাওয়া লজ্জার দুঃখ—সব যেন ফেটে চৌচির হয়ে আছড়ে পড়ল সেদিন সেই নাটমন্দিরে। কি বলেছিলেন সব কথা মনে নেই, বলতে পারব না। তবে একটা কথা মনে আছে। কানের পাশে আমার যেন বেজে উঠছে

এই মুহূর্তে, শুধু এই মুহূর্তেই কেন সুরোদা, যখনই কোনক্রমে জ্যাঠাইমা কি সেই দিনের ঘটনা, কি আমার নিজের ভাগ্যের কথা মনে করি, তখনই কানের পাশে এইভাবেই বেজে ওঠে তাঁর কথাগুলো, আর চোখ বুজলেই দেখতে পাই সেই রাত্রিরের সেই ছবি—হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয় তেমনি উজ্জ্বল জ্যাঠাইমার মূর্তি, মুখ-চোখ।

ওঃ, বলেছিলেন কথাগুলো যেন বজ্রাঘাতের ধ্বনির মত, চমকে দিয়েছিল সকলকে। আঘাতটা তাঁর নিজের বুকেই বেজেছিল। বলেছিলেন, এইজন্যেই,—এইজন্যেই আমার গর্ভের এতগুলো সন্তান—সবগুলো তার জানোয়ার, জন্তু, প্রেত আর পিশাচ, একটা মানুষ হয় নি। কিন্তু রায়বাড়ীর সব বিষ কি তুমিই খেয়েছিলে? ওঃ, ভাগ্যিস আমার গর্ভে মেয়ে হয় নি! তাহলে তো—। ছি-ছি-ছি!

শেষ পর্যন্ত যে কি হত, কি বলতেন বা করতেন তিনি, তা বলতে পারব না সুলতাদি; ঘটনা বলুন বা যা ঘটেছিল বলুন, তাতে একটা ছেদ পড়ে গেল আর একটা ঘটনা ঘটে। বাইরে পুলিস এসে পড়ল।

ময়না থানায় খবর পাঠিয়েছিল মিসেস হাডসন আর কুইনী। গোমেশ আর ডিক্রুজ সুরোদার কাছেই চাকরি করত, সে জান তুমি; কিন্তু ভোটের ব্যাপার নিয়ে কীর্তিহাটের সঙ্গে গোয়ানপাড়ার ঝগড়া লাগতেই ওদিকে গোয়ানদের পিছনে এসে দাঁড়াল মুসলিম লীগের পাণ্ডা আর খড়্গপুরের মিসেস হাডসন। এদিকে কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে সারাদেশ—তার সঙ্গে মহারাজ নলকে বাড়িয়ে দেওয়া কলির শানানো ছুরির মত রায়বাড়ীর কল্যাণদা, প্রণবদা, আমার বাবা, জ্যাঠামশাই, বলতে গেলে এক সুরোদাকে বাদ দিয়ে সবাই।

নল-দময়ন্তীর ব্যাপারটা কলিযুগে ঘটে নি। ঘটলে অন্য রকম ঘটত। কলির শানানো ছুরিখানা দিয়ে কাপড়খানাকে মাঝখানে চিড়ে বাঁধন কেটে পালানোর মত পালাতেন না নল, কলিযুগ হলে দময়ন্তীর বুকে বসিয়ে দিয়ে গোটা কাপড়খানা নিজে নিয়ে পালাতেন।

এখানেও ঝগড়াটা চরমে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম কীর্তিহাটে উঠল গোয়ানদের বয়কট কর ধুয়ো। তারপরই আরম্ভ হল—গাঁয়ে পেলেই ধরে মারো। ডিক্রুজ, গোমেশ পালালো। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় দোকান হয়ে গেল তিন-চারটে। তারপরই লাগল আগুন। পুড়ে গেল গোয়ানপাড়া।

গোয়ানপাড়া কংগ্রেস পোড়ায় নি। রঙলাল ঘোষ কিছু জানতেন না। তবে তাঁর উকিল ছেলে জানতেন, তার সঙ্গে জানতেন রায়বাড়ীর কর্তারা। কল্যাণের খাতক ছিল অনেকগুলি, গোয়ান খাতক। অল্প অল্প টাকা সুদে-আসলে বেড়ে বেড়ে তিন-চার গুণ হয়ে বন্ধকী তমুসুদে পরিণত হয়েছিল। কল্যাণদা জানতো যে, গোয়ানপাড়া সুরোদা নাখরাজ করে দিলে সেটেলমেণ্টে সে গোয়ানপাড়ার বারো আনা তার। তাই সেদিন যা পেয়েছিল সুরোদার কাছে, তাই নিয়ে সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ নতুন আইন হবার কথা শোনা গেল।

ডেট-সেটেলমেণ্ট বোর্ড হবে। খাতক যত টাকা মূল নিয়েছে, তার বেশী পাবে না। আর তা সহজ কিস্তীবন্দীতে শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। কল্যাণদার দশ হাজার টাকা

পাওনা, সে-হিসেবে পাঁচ হাজারের কমে দাঁড়াবে। কল্যাণদার চক্রান্তেই ধুয়ো উঠল— গোয়ান তাড়াও, হঠাও।

তার জন্যে লাগল আগুন। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল গোয়ানপাড়া। সরকার থেকে সাহায্য এল, রক্ষা করবার জন্যে পুলিস এল, তার উপর এদের হাত ছিল না। কিন্তু সুরেশ্বরদা সাহায্য করায় এরা বসাল বিচারসভা, ওদিকে সেই খবর গোয়ানপাড়ায় পৌঁছুতেই গোয়ানরা পাঠালে পুলিসে খবর। সুরেশ্বরদাকে এরা অনেকেই বড়লোক বলে খাতির করত। পাড়াটা লাখরাজ করে দেওয়ায় সত্যকার শ্রদ্ধাও অনেকে করত। কিন্তু সেদিনের সে-ব্যাপারটা খাতির কিম্বা শ্রদ্ধার জন্যে তারা করে নি—তারা জেদের বশে করেছিল।

"সুরেশ্বর রায়বাবু তাদের সাহায্য করতে চেয়েছে বলে তাকে ধরে-বেঁধে গ্রামসভা বেঁধে বিচার করছে। এখুনি পুলিস এলে নিজের চোখে দেখতে পাবেন। ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলবে। ইয়োরস ফেথফুলি, মিস্ কুইনী মুকুর্জি এবং মিসেস্ হাডসন। সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্ট গোয়ান এ্যাসোসিয়েশন, কীর্তিহাট, গোয়ানপাড়া।"

অর্চনা বললে—চোখের সামনে দেখছিলাম লোকগুলো চলে যাচ্ছে। নাটমন্দিরের ভিড় পাতলা হচ্ছে। খুব খেয়াল সেদিকে ছিল না। আমি অভিভূতের মত তাকিয়েছিলাম জ্যাঠাইমার দিকে।

জ্যাঠাইমার সে কি মূর্তি।

হঠাৎ কে কাকে বললে—উঠে এস! শুনছ—উঠে এস! পুলিস, পুলিস এসেছে। পুলিস!

রঙলাল ঘোষকে বলছিল তার উকিল ছেলে।

জ্যাঠামশাই, ধনেশ্বর রায়, সুলতাদি, এবার এসে বললেন—থাম, এবার থাম গোবরডাঙার বউ—। পুলিস এসেছে। যাও বাড়ীর ভেতর যাও।

জ্যাঠাইমা যেন বুঝতেই পারলেন না। শুধু তাকিয়ে রইলেন জ্যাঠামশাইয়ের দিকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—শুনছ? পুলিস,—পুলিস আসছে।

হঠাৎ জ্যাঠাইমা একটা আর্তনাদ করে দুই হাতে কপাল টিপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। তারপর যেন ঢলে পড়ে গেলেন কালীমায়ের পাট-অঙ্গনে।

ওদিকে অনেকগুলো ভারী জুতোর শব্দ তুলে পুলিস ঘরে ঢুকল।

সুরোদা তখন রক্তাক্ত মাথা নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে নাটমন্দিরে, নাট-অঙ্গনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন জ্যাঠাইমা। নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন দুই বৃদ্ধ—ধনেশ্বর রায় আর রঙলাল ঘোষ। আর আমি।

একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল; বারকয়েক দপ্ দপ্ করে লাফিয়ে জ্বলে হেজাকবাতিটা নিভে গেল।

'জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটল আজ কিন্তু জমিদার রায়বাড়ীর শেষ আলো সেইদিন নিভেছিল সুলতাদি। এ-সত্য দুই চোখ মেলে আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি। সুরোদাও না।

সুরেশ্বর বললে—তাই ঠিক সুলতা, অর্চনা যা বললে, তাই ঠিক। ওই দিনই রায়বাড়ীর শেষ। অন্ততঃ বংশধারার নাটকে জমিদারী অঙ্কের শেষ। মানুষের বংশধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বংশ হয় না, সে কালের সঙ্গে চলে। শুধু এক-একটা পর্বে ছেদ পড়ে। পাঠান মুঘল সুলতান বাদশা—তার আগে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ইতিহাসবিখ্যাত রাজা মহারাজা—তাঁদের বংশ নির্বংশ হয়েছে এমন ভাববার কারণ নেই। খুঁজলে পাওয়া হয় তো যাবে—কোন দোকানদার বা মুটেমজুরের মধ্যে। মানে রাজা মহারাজা বাদশা সুলতান বংশ হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই বেঁচে থাকে তারা। সুলতানশাহী বাদশাহী চরিত্র বা মেজাজ তাদের থাকে না। তাদের কে মনে রাখে বলো? তাদের কথা কে গল্প ক'রে বলো?—করে না। ভাল লাগে না শুনতে। তাই বলি আমার—বংশে ছেদ পড়ল, শেষ হল। রায়-বংশেও তাই হ'ল। সেদিন যখন প্রজাদের ডেকে আমাকে অপরাধী সাজিয়ে তাদের দিয়েই বিচার করালে আমারই জ্ঞাতিরা, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে রায়বংশের নাটকে যবনিকা পড়ল। এর পর যে বংশধারা রইল—সে নদী নয়— সেগুলোকে নালা বলতে পার।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—সে সময়ে মানে ১৯৩৮।৪০ সালে সম্ভবতঃ বাংলাদেশে সব জমিদারী বংশেরই অল্পবিস্তর এই দশা হয়েছে। প্রজারা সকলেই বিচার করতে বসুক না বসুক অভিযোগের ফিরিস্তি তৈরী কর'ছিল। কিন্তু জমিদারদের তখনও কাঠগড়ায় হাজির করতে পারে নি। জমিদারী আমলের শেষ দৃশ্যের শুরুতেই রায়বংশের পালা সারা হয়ে গেল। যারা টিকে রইল তাদের অধিকাংশই সরকারকে আঁকড়ে ধ'রে টিকে রইল। রায়বংশ তা পারলে না। না পারলেন ধনেশ্বর কাকারা, না পারলেন প্রণবেশ্বর দাদারা এবং সব থেকে স্বচ্ছল অবস্থা ছিল আমার—আমিও পারলাম না তা। এবং সেইদিন রাত্রেই যা করলাম, তাতে আমি সরকারকে স্বীকার করলাম না, স্বীকার করলাম প্রজাদের। হ'ল কি জান?

আমার জ্ঞান হতেই আমার বিছানার সামনে উপবিষ্ট এস আইটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে জ্ঞান হয়েছে আপনার! কেমন মনে হচ্ছে বলুন তো সুরেশ্বরবাবু?

নিজের কপালে হাত দিয়ে ব্যাণ্ডেজটায় হাত বুলিয়ে দেখতে দেখতেই সব মনে পড়ে গিয়েছিল। শুধু বুঝতে পারি নি—পুলিস কোথা থেকে এল এবং কেমন করে এল! প্রশ্নটার উত্তর মিলুক বা না-মিলুক প্রশ্নটা থেকে আরও কতকগুলো ফ্যাকড়া প্রশ্ন বেরিয়ে প্রশ্নটার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছিল। কেন—পুলিস এল কেন? পুলিস এমন ক'রে বসে কেন? আমাকে ঘিরে রয়েছে কেন? আমাকে অ্যারেস্ট করেছে কিনা—ইত্যাদি—ইত্যাদি। আমি ভাবছিলাম। দারোগাটি আবার প্রশ্ন করলে—সুরেশ্বরবাবু, কি কষ্ট হচ্ছে আপনার?

বোধ করি দারোগার গলার আওয়াজ পেয়েই ওঘর থেকে এ-ঘরে এসে ঢুকলেন আর একজন পুলিস অফিসার—যাকে দেখে খট্ করে গোড়ালি ঠুকে দারোগাবাবু সেলাম দিল।

নতুন আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন—জ্ঞান হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ স্যার, চোখ মেলেছেন। কিন্তু সাড়া দেন নি।

নতুন আগন্তুকটি অল্পবয়সী এবং উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার আর কোন ভয় নেই—আমরা খুব সময়ে এসে পড়েছিলাম। এখন

আপনি সেফ। কেমন মনে হচ্ছে বলুন তো?

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে ভাবতেই বললাম—ভাল। বিশেষ কষ্ট কিছু নেই—তবে মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

—ওটা খুব সিরিয়াস নয়। কিন্তু একটা স্টেটমেণ্ট দিতে হবে যে আপনাকে। এখন সেটা পারবেন? এখন হলেই ভাল হয়।

পুলিসের কাছে স্টেটমেণ্ট! সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সহস্র প্রশ্ন জেগে উঠল। সহস্র প্রশ্নের সবগুলোই রায়বংশ নিয়ে। মনে তো সবই পড়ছিল। ধনেশ্বর কাকা—প্রণবেশ্বরদা—কল্যাণেশ্বর, অর্চনা, সবার কথা মনে পড়ছিল। স্টেটমেণ্ট দিতে গেলে কোন্ কথা বাদ দেব? কার কথা বাদ দেব? কেমন করে দেব?

জীবনে যে সাহস বা সত্যবোধ থাকলে ব্যাসদেবের মত মহাভারতের প্রথমেই নিজের জন্মকথা—তাঁর পিতা পরাশরের সঙ্গে মা মৎস্যগন্ধার দেহসংসর্গের কথা—অত্যন্ত সহজে বলা যায় বা বলতে পারে মানুষ, তা আমার সেদিন ছিল না—। রায়বংশের কারুরই ছিল না। সে সত্যবোধকে আড়াল করে বা ভ্রূণহত্যার মত হত্যা ক'রে দাঁড়িয়েছিল জমিদারীর মর্যাদা। ওই জমিদারীর মর্যাদাই রায়দের বংশমর্যাদা, তাছাড়া আর কিছু নয়।

ডি-এস-পি, ভদ্রলোকটি ডি-এস-পি, তিনি আবার ডাকলেন—সুরেশ্বরবাবু!

চোখ বুজেই উত্তর দিলাম—বলুন!

—স্টেটমেণ্ট দিতে হবে যে আপনাকে!

—স্টেটমেণ্ট!

—হ্যাঁ। কি হয়েছিল? কি করে আঘাত লাগল আপনার কপালে? কে মেরেছিল আপনাকে? আপনাদের বাড়ীর নাটমন্দিরে এত লোকেরা মিলে কি করছিল?

আমার থেকেও বছর ছয়-সাতের ছোট ছিলেন ভদ্রলোক। ১৯৩৮ সালে আমার বয়স আটাশ—তাঁর বয়স তখন সদ্য বিশ পেরিয়েছে। পুলিস লাইনে তখনও পাকেন নি, পাকলে ওইভাবে সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিতেন না।

তিনি বললেন—ময়না থানায় গোয়ানপাড়া থেকে দুজন লোক এবং আপনার কর্মচারী আচার্যের চিঠি নিয়ে একজন লোক গিয়ে খবর দেয় যে গ্রামের লোকেরা এবং রায়বাড়ীর অন্য অন্য দেউলে-পড়া শরিকেরা মিলে আপনার বিচার সভা বসিয়েছে। গোয়ানপাড়া থেকে মিসেস হাড্‌সন আর মিস কুইনী মুখার্জী চিঠিতে লিখেছিলেন, গোমেশ এবং ডিক্রুজ এরা চোখে দেখেছে—সুরেশ্বর রায়কে কীর্তিহাটের লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে তাদের বিচার সভায়। বাবু সুরেশ্বর রায় একজন কাইণ্ড-হার্টেড ইয়ং মডার্ন জমিণ্ডার—উইথ নো প্রেজুডিস অব এনি কাইণ্ড। গোয়ানরা ক্রীশ্চান বলে তিনি তাদের ঘৃণা করেন না। গোয়ানদের ঘরবাড়ী পুড়ে যাওয়ার জন্যে তিনি সকল গোয়ানকে সাহায্য করতে চেয়েছেন বলে কীর্তিহাট পিপল তাঁকে বিচার ক'রে সাজা দিতে সংকল্প করেছে এবং সুরেশ্বরবাবুর জ্ঞাতিরা—যারা সুরেশ্বরবাবুর মৃত্যুতে লাভবান হতে পারে তারা—। দে হ্যাভ জয়েনড হ্যাণ্ডস উইথ দি ভিলেজারস। তাকে মেরে ফেলাও অসম্ভব নয়। আপনারা তাড়াতাড়ি এলে তাঁর জীবন

রক্ষা পেতে পারে এবং গোয়ানপাড়া কারা পুড়িয়েছে তার অব্যর্থ প্রমাণও পেতে পারেন পুলিস বিভাগ।

আমরা বলতে গেলে দৌড়ে এসেছি। অফিসাররা সাইকেলে এসেছেন—আর্মড কনেস্টবলস ডবল মার্চ করে এসেছে সারাটা পথ। এসে আপনাকে জীবন্ত অবস্থায় পেয়েছি এইটেই লাক্‌ বলতে হবে। মাথাটা কেটে গেছে—অনেকখানি রক্ত পড়েছে। লোকজন কেউ নেই। থাকবার মধ্যে ধনেশ্বরবাবু বসে আছেন তাঁর স্ত্রীর মাথা কোলে ক'রে। ভদ্রমহিলা বোধ হয় মারা গেছেন—তাঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে। সেরিব্রেল থ্রম্বসিস। আর বুড়ো রঙলাল ঘোষ। এবং আপনার খুড়তুতো বোন অর্চনা দেবী।

সুরেশ্বর একটু হাসলে। হেসে বললে—সেদিন সর্বপ্রথম বাঁচাতে চেয়েছিলাম অর্চনাকে। তার কথাটা উল্লেখই করি নি। আর রায়বাড়ীর শরিকদের কথা এবং রঙলাল ঘোষের কথা মনে রেখে ওদের বাঁচাবার জন্য গোয়ানদের কথাটাকেই একমাত্র কথা ক'রে তুলে বলেছিলাম—হ্যাঁ, বিচার একটা হচ্ছিল, রায়বাড়ীর শরিকরাই গ্রামের লোকদের ডেকেছিলেন—বিচার করবার জন্যে। আমারই বিচার হচ্ছিল।

কিসের বিচার? কি অপরাধ করেছিলেন আপনি?

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ভেবে নিয়ে বলে ফেললাম,—আমার একটু বেশী মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাচ্ছিল গোয়ানদের সঙ্গে—মানে—'

কি বলব ভেবে পাই নি। তবু একটা লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিলাম, আন্দাজে আন্দাজে সেই পথেই চলেছিলাম। কথাটা আংশিকভাবে সত্যও বটে। আমার শরিকদের দাবীও ছিল তাই। গোয়ানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যেই হোক আর অন্য অমার্জনীয় কলঙ্কের জন্যই হোক—আমায় ধর্মভ্রষ্ট জাতিচ্যুত ক'রে পতিত করতে পারলেই অন্ততঃ দেবোত্তরের সেবাইয়েত অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত হব। আমি গোয়ানদের কথাটাকে সেই কারণেই আঁকড়ে ধরেছিলাম। তবুও বলতে গিয়ে থামতে হল। সত্যকে খালি মাথায় ধরে নিয়ে অনায়াসে চলা যায়, কিন্তু রাজাগিরি বা জমিদারগিরির পাগড়ী বা তাজের উপর চাপানো যায় না—তাতে ওই তাজ বা পাগড়ী ভেঙে যায় চেপ্টে যায়, অন্ততঃ পাগড়ী তাজ লজ্জিত হয়, লাঞ্ছিত হয়। আমি থেমে গেলাম।

কিন্তু পুলিস অফিসার ছাড়বেন কেন—তিনি যুগিয়ে দিলেন—

—মানে? বলুন—সুরেশ্বরবাবু।

—মানে! মানে তাদের সম্পর্কে কি বলব? বলব আমার কিছু দুর্বলতা আছে!

—দুর্বলতা? I See, কি দুর্বলতা? বলুন!

ভদ্রলোক আমাকে ঠেলে ঠেলে যেন কোণে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যে শক্তিতে আমি নখদাঁত বের করে দাঁড়াতে পারতাম তা আমার ছিল না। আমি বলতে পারতাম সুলতা, বলতে আমি গিয়েওছিলাম আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ঋণের কথা; বলতে পারতাম আমার ঠাকুমার কথা; অনায়াসে বলতে পারতাম—আমার ঠাকুমা আমাকে বলেছেন—ভাই নাতি, তোমার ঠাকুরদার সব থেকে বড় ঋণ ওই গোয়ানদের কাছে। ভাই, তোমার

ঠাকুরদার শ্রাদ্ধের সময় সেই ঋণ শোধ হ'ল না, শোধ করবার কথা কেউ ভাবলে না দেখে আমি গোয়ানপাড়ায় গির্জের পাদরীর কাছে—পাড়ার লোকেদের কাছে গিয়েছিলাম—ঋণ শোধ করতে। কিন্তু তাও হয় নি। উপরন্তু আমার জাত গেছে ব'লে আমাকে ঠাকুরবাড়ী ঢুকতে দেয় নি। আমাকে এনে কলকাতায় বন্ধ রেখেছিল। সেখান থেকে আমি বেরিয়ে ভাগ্যক্রমে বৃন্দাবনে এসে গোবিন্দের আশ্রয় পেয়েছি।

বলতে বলতে সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। সে চুপ করলে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—সুলতা, সেদিনের সে অবস্থা আমি কখনও ভুলব না। ওঃ, কে যেন আমার গলা টিপে ধরলে। সেদিন জানতে পারি নি, বুঝতে পারি নি, তবে আজ বুঝতে পারি, বলতে পারি—গলা টিপে ধরেছিল আমার জমিদারীর ইজ্জৎ; কুড়ারাম ভটচাজ—জমিদার হয়ে রায় খেতাব নিয়েছিলেন। রায়বংশ জমিদারবংশ, রায়বাড়ীর মর্যাদা জমিদারীর মর্যাদা। ব্রাহ্মণের মর্যাদা নয়। বেদব্যাসের মর্যাদা আর পাণ্ডব কৌরবদের মর্যাদা আলাদা সুলতা। বেদব্যাসের পিতৃমাতৃ-পরিচয়ের মধ্যে কোন আবরণ নেই—কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর এবং পাণ্ডবদের সত্যকার পিতৃপরিচয় কানাঘুষোর মধ্যে লোকে বলাবলি করেছে, উচ্চারণ করতে বা এ নিয়ে গবেষণা করতে কারুর সাহস হয় নি।

আজ সত্যকেই তোমার সামনে উদ্‌ঘাটিত করছি। সেদিনের মত জমিদারী ইজ্জতকে বড় করছি না, সেই সঙ্গে এই সত্যটুকুও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি সুলতা যে এই ইজ্জত মিথ্যা হলেও মূল্যের দিক থেকে কম নয়। খাটো কাপড় কি বল্কল পোশাকের সঙ্গে রাজা জমিদারের পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য বিচার করে দেখ,—প্রমাণ তার প্রত্যক্ষ।

পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ঋণের কথা বলতে গিয়ে বলতে পারি নি আমি। জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার ভিতর থেকে কেউ যেন বলেছিল—না, তুমি বলো না। ছি!

ডি-এস-পি আবার প্রশ্ন করেছিলেন—সুরেশ্বরবাবু!

আমার মনে পড়ছে কপালের ব্যাণ্ডেজে আমার চাড় পড়েছিল, টনটন করে উঠেছিল কপাল। আমি কপাল কুঁচকে বলেছিলাম—এই দুর্বলতার মানেও আমাকে বলতে হবে?

—তা হবে সুরেশ্বরবাবু। না হ'লে এর মানে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তা যে কিছু কিছু করি নি তা নয়। করেছি। ধনেশ্বরবাবুর একটা স্টেটমেণ্ট আমরা নিয়েছি। এবং সেটাকে আমরা সত্য বলেই মনে করি। তাঁর স্ত্রী শুনলাম ব্রেনে হেমারেজ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মৃত বলেই ধরা যায়। এই মুহূর্তে তিনি মিথ্যা বলবেন না। কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম; কারণ তখনও আমি গোবরডাঙার খুড়ীমার খবর জানতাম না। আমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর তিনি নাটমন্দিরে ঢুকেছিলেন। ডি-এস-পির কথায় বাধা দিয়ে আমি বললাম—এক্সকিউজ মি সার, কি বলছেন আপনি তা তো বুঝতে পারছি না। কে—কার কথা বলছেন মৃত বলে ধরা যায়?

ডি-এস-পি বললেন—ধনেশ্বরবাবুর স্ত্রী। তিনি এই বিচারের আসরে প্রতিবাদ করবার জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন। এবং সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ডাক্তার দেখেছেন, বলছেন—ব্রেনে কোন শিরা ছিঁড়ে হেমারেজ হচ্ছে। বোধ হয় বাঁচবেন না। বাঁচলেও

প্যারালিটিক হয়ে সেবার ধন হয়ে বেঁচে থাকবেন।

আমার চোখ থেকে জল বেরিয়ে এসেছিল। আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। কি বিচিত্র পরিচয়ই না রেখে গেলেন ব্রজদার মা! ওঃ!

ডি-এস-পি আমাকে ডাকলেন। বললেন—আমার কাজটা আমি শেষ করে নেব সুরেশ্বরবাবু। যা বলছিলাম আমি—যাঁর স্ত্রী এই মুহূর্তে মৃত্যুশয্যায় তিনি মিথ্যা কথা বলবেন না এইটেই ধরা যায়। ধনেশ্বরবাবু এই মুহূর্তে যা বলেছেন তাকে আমি সত্য বলেই ধরে নিয়েছি।

—কি বলেছেন তিনি না জানলে কি ক'রে এর উত্তর দিতে পারি বলুন!

তিনি বলেছেন—রায়বংশের আপনার লাইনটায় একটা দোষ আছে। সেটা আপনার পিতামহের ছিল, আপনার বাবার ছিল এবং আপনার মধ্যেও সেটা ফুটে উঠছে। অন্যেরা নানারকম অপবাদ যা দিচ্ছে তা সবই মিথ্যে। সেগুলো বিষয় নিয়ে আক্রোশবশে দিচ্ছে। কিন্তু গোয়ানপাড়ার হিলডা ক্রুজের সম্পর্কে নাতনী কুইনী মুখার্জি বলে একটি মেয়েকে আপনি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তাকে ইস্কুলে পড়াচ্ছেন। তার কলকাতায় একখানা বাড়ী আছে, তা নিয়ে কি গোলমাল হয়েছিল, আপনি অনেক টাকা খরচ করে সে বাড়ী ঝঞ্ঝাটমুক্ত ক'রে দিয়েছেন—

খানিকটা থেমে ডি-এস-পি বললেন—ধনেশ্বরবাবু বললেন—গোয়ানদের মধ্যে কয়েকটা খারাপ মেয়ে আছে, তারা প্রায় ব্রাত্য শ্রেণীর। তাদের সঙ্গে আপনার কোন অপবাদ বা গোপন সম্পর্কের কথা আজও পর্যন্ত তিনি শোনেন নি। এবং বিশ্বাসও করেন না। তবে কুইনী সম্পর্কে কিছু কথা তাঁর কানে এসেছে। সে কুইনীর ছবি এঁকেছে। কুইনী মধ্যে মধ্যে তার বাড়ী বিবিমহলে আসা-যাওয়া করেছে। কল্যাণেশ্বরবাবু বললেন—তিনি হিলডাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ঐসব কি হচ্ছে হিলডা? সুরোবাবুর মতলবটা কি? তাতে সে বলেছিল—সুরোবাবু যে মতলব করবে তাই হাসিল হবে। তুমরা টাকা খরচ করো, এমনি জিমিদার হও, তুমার মতলব ভি হাসিল করদেগা। কুইনী তো সুরোবাবুর ঠাকুরদাদার—

সুলতা, আমার বুকের ভিতর থেকে মুহূর্তে কে যেন কথা বলে উঠেছিল। আমি ডি-এস-পি'কে বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম—ইয়েস সার, আমি স্বীকার করছি কুইনী সম্পর্কে আমার উইকনেস আছে। পারসোনাল উইকনেস; আমি তাকে স্নেহ করি।

ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডি-এস-পি বললেন—দোহাই আপনার, প্লিজ কল স্পেড এ স্পেড। ভাইয়ের মত, বোনের মত, প্ল্যাটোনিক ইত্যাদি কথাগুলো বলবেন না। আমাদের পুলিসী শাস্ত্রে এগুলো নেহাতই ফাঁকা কলসীর আওয়াজ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের মধ্যে রক্ত যেন বিদ্রোহ করে টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছিল। আমি উঠে বসে বলেছিলাম—লেট মি ফিনিশ,প্লিজ! আমার কথা ঠিক শেষ হয় নি। তার আগেই আপনি কথা বললেন।

—ও, আই এ্যাম সরি! বলুন কি বলছেন? শেষ করুন। আপনি তাকে স্নেহ করেন—।

বলুন!

—হ্যাঁ, আমি তাকে স্নেহ করি। স্নেহ এবং ভালবাসায় তফাৎ খুব বেশী নয়। একটু মাত্র। বয়সে ছোট যাকে ভালবাসি তাকে স্নেহও করি। এবার কুইনী সম্পর্কে আমার ভালবাসার স্বরূপ বা মানে আপনার অভিধান মত করে নিতে পারেন।

—তার সঙ্গে আপনার দেহসম্পর্ক হয়েছে কখনও ?

চমকে উঠেছিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করে বলেছিলাম—না।

—তা হলে ? ইউ স্পেণ্ট সো মাচ মানি অন হার!

আমি হেসে বলেছিলাম—আমার টাকার অভাব নেই স্যার। একলা মানুষ টাকা ঠিক খরচ করতে পথ পাইনে। জমিদারের ছেলেদের মেজাজ এবং চরিত্র তো জানেন; বিয়ে করি নি, চরিত্রদোষ চলিত অর্থে এখনও নেই। কুইনীকে ভাল লেগেছে তাকে গড়ে তুলছি; পিছনে খরচ করতে ভাল লাগছে। তারপর যা হয় হবে। এই পর্যন্ত বলতে পারি। বেশী আজ আর বলতে পারব না। শরিকরা বিচারসভা ডেকেছিল ওই জন্যে। আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন—আমার মতলবটা কি ? অনেকের মনে—মানে আমাদের শরিকদের ধারণা আমি ওকে বিবাহ পর্যন্ত করতে পারি। দু'একজনের ধারণা—মধ্যে কুইনী আর হিলডা বাড়ীর গোলমালের জন্যে কলকাতা গিয়েছিল, তখন রেজেস্ট্রি-কেজেস্ট্রি করে বিয়ে একটা হয়ে গেছে। এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল। আমি ঠিক চিনিনে, একজন আমার সঙ্গে তর্ক করছিল, আমি রাগের বশে তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে পড়ে গেলাম আছাড় খেয়ে, পড়বার সময় শক্ত একটা কিছুতে আঘাত লেগে আমার মাথাটা কেটে গিয়ে থাকবে। আমি মাথায় একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছি মাত্র, তার বেশী কিছু বলতে পারব না। জ্ঞান হয়ে দেখছি আমি এখানে শুয়ে আছি।

ডি-এস-পি এতক্ষণে বুঝলেন—কেসটা ফেঁসে গেল। তিনি দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে আমার মুখের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—সুরেশ্বরবাবু!

—বলুন!

—আপনার মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে নি ?

—না। ওটা পড়ে ছিল। আমারই হাতের কাছে ছিল ওটা। আঘাত আমাকে কেউ করে নি।

ডি-এস-পি আর কিছু না বলে চলে গিছলেন রাত্রির মত।

পরের দিন সকালে ডি-এস-পি আবার এসেছিলেন আমার কাছে। তখন গোবরডাঙার খুড়ীমা মারা গেছেন—এ বাড়ীতে কান্নার রোল উঠেছে। আমি বসে আছি মাথা হেঁট ক'রে। চারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার ব্যাণ্ডেজটা আবার ভাল ক'রে বাঁধছে। কপালের ক্ষত থেকে আবার রক্ত পড়তে শুরু হয়েছিল।

ডি-এস-পি উপরে উঠে এসেছিলেন—সঙ্গে তাঁর কুইনী। কুইনীর মুখ-চোখ যেন থম্‌থম্‌ করছিল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম আমি। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড যেন

চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ল মেদিনীপুরের বাড়ীতে মাসখানেক আগে কুইনীকে দেখে ঠিক এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। সহস্র নারীর মধ্যে যে নারী এক অজ্ঞাত বিচিত্র কারণে এক বিশেষ পুরুষের কাছে সবচেয়ে বেশী কামনীয়া হয়, রূপের ব্যাকরণের শত ত্রুটি সত্ত্বেও সব থেকে বেশী রমণীয়া হয়, সেই বিচিত্র কারণেই কুইনীকে দেখে আমার চিত্ত আমার দেহের অণুপরমাণু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

কুইনী কিন্তু আমার সামনে দাঁড়িয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠেছিল—আপনাকে আমি ঘৃণা করি, অত্যন্ত ঘৃণা করি। আপনাদের বংশকে আমি জানি। আপনারা অত্যাচারী, শোষক, আপনারা ব্যভিচারী, লম্পট। আপনারা মিথ্যাবাদী প্রতারক। আপনি এই কুমতলবে আমাকে পড়ার খরচ দেন এবং আমার বাড়ীর টাকা দিয়েছেন তা আমি জানতাম না। আমি আপনার টাকা আর নেব না। গোয়ানপাড়ার কোন লোক আপনার সাহায্য নেবে না।

আমি তার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। মুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিলাম। কুইনীর রূপের স্বরূপ কেমন, সে বিচার অন্যে করতে পারে, আমি পারি না। তাকে দেখলেই সে আমার একান্ত আপনার, কিংবা সে আমার এমনি একটা—এমান একটা ইমোশনাল ধারণা আমাকে যেন আভভূত করে দিত। তা এখনও দেয় সুলতা।

ডি-এস-পি আমাকে সেই পত্র এবং কাগজগুলো দেখিয়েছিলেন, যেগুলো কুইনী একদিন বিবিমহলে অর্চনার সঙ্গে এসে আমাকে দেখিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার মুখে অস্তগামী সূর্যের আলোপড়া তার মুখ আমার মনে পড়েছিল সেদিন। সেদিন কাঁসাই পার হবার সময় কুইনীর ছবিটা দেখাচ্ছিল শিল্যুটের মত, তাও মনে পড়েছিল।

ডি-এস-পি বলেছিলেন—এগুলো দেখেছেন তো আপনি?

বললাম—দেখেছি।

—তা হলে?

—কি তা হলে?

—কোন্‌টা সত্য?

—যদি বলি দুটোই সত্য।

—বলব মিথ্যে বলছেন একটা।

—না। তা মনে করিনে। তবে যা খুশি ধরে নিতে পারেন।

একটু হেসে বলেছিলাম—আপন বলেই ওকে ভালবাসি। এই সত্যটা কেন সত্য হবে না বলুন তো?

সুলতা, এর পরের দিনই জীবন আমার দুদিক থেকে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। দুদিক থেকে কেন, তিন দিক থেকে।

কীর্তিহাটের শরিকদের তরফ থেকে।

কীর্তিহাটের লোকদের তরফ থেকেও।

গোয়ানপাড়ার লোকদের তরফ থেকেও।

কেউ চাইল না আমাকে।

বারো দিন পর, গোবরডাঙার খুড়ীমার শ্রাদ্ধের পর অর্চনাকে নিয়ে আমি কলকাতা চলে এলাম। ব্রজদা টেলিগ্রাম পেয়ে বিহার থেকে এসেছিল মা'র শ্রাদ্ধ করতে। সাহায্য করেছিল ব্রজদা। কীর্তিহাটের জমিদারী জীবনে যবনিকা টেনে দিলাম বলে ঘোষণা করেই কলকাতা এলাম। কয়েকদিন পর বৃন্দাবন গিয়ে নিয়ে এলাম রায়বাড়ীর মেজহুজুর শিবেশ্বর রায়ের কেনা তৃতীয়পক্ষ সেই পুরোহিতকন্যাকে। গিয়ে বললাম—তোমার স্বামীর মেজ-ছেলের কন্যা অর্চনা। তুমি তাকে বাঁচাতে জেলে গেছ। এবার ফিরে চল—তার ভার তোমাকে নিতে হবে আমি রেহাই নেব। আমার বাবা অনেক টাকা রেখে গেছেন। আমি তা উড়িয়ে দেব! চলে যাব কলিযুগের স্বর্গে; স্বর্গ বল স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বল বৈকুণ্ঠ—জীবনের মোক্ষধাম ইয়োরোপ। ইয়োরোপ যাব। তা ছাড়া কি করব? সংসারে সেকালে পয়সা যার থাকত সে কাশী বৃন্দাবন যেত। একালে ইয়োরোপ যায়। আমি ভেবেছিলাম গিয়ে আর ফিরবই না। ওখানেই থেকে যাব।

যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। যাবার আগে তোমাকে কুইনীর ছবিটা প্রেজেণ্ট করেছিলাম মামাতো বোনের মারফৎ! তুমি রিকিউজ করেছিলে। সেটা সেদিন আমার বগলেই ছিল।

ওঃ; ভাগ্যে তুমি ছবিখানা নাও নি সুলতা! কেন জান? ওই ছবিখানা নতুন করে আঁকতে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে যেতাম। পারতাম না। মনে হ'ত পারব না। কিছুতেই পারব না।

সুরেশ্বর বললে—ভেবেছিলাম, ইয়োরোপ থেকে ফিরব না। ওখানেই থেকে যাব। আমার বাবা জার্মানীর হাসপাতালে জীবনে ছেদ টেনেছিলেন—আমিও তেমনি ভাবে ছেদ টেনে দেব। তারপর যজ্ঞেশ্বর রায়, তাঁর ছেলেরা এবং শিবেশ্বর রায়ের পতিত বংশের প্রেতেরা কে কি করলে বা করবে তা নিয়ে কোন চিন্তাই করব না। ইয়োরোপে গিয়ে জীবনের অবদমিত সমস্ত বাসনাকে মুক্তি দিয়ে দেব; আমার যা অর্থ আছে—তাই দিয়েই সিংহদ্বার না হোক—একটা বেশ প্রশস্ত ফটক খুলে দেওয়া হবে।

বাসনা আমার ছিল। কারই বা থাকে না! তোমাকে নিয়েই তো বাসনা আমার কম উল্লসিত কম উচ্ছ্বসিত হয় নি। কল্পনা তো অনেক করেছিলাম। কিন্তু এক ঠাকুরদাস পালের রক্তের নদীই তোমাকে আমার নাগাল থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। এবং আশ্চর্যভাবে রায়বংশের গোপন পরিচয় আমার সামনে তার গোপন অপরাধের ফিরিস্তি খুলে দেখিয়ে দিলে দুনিয়ার কাছে আমাদের দেনা কত। এবং সেই দেনার সুদ কি বিচিত্রভাবে প্রকৃতির নিয়মে আমরা আদায় দিচ্ছি, দিতে বাধ্য হচ্ছি!

বাবার শেষ চিঠিখানা যা তিনি মাকে লিখেছিলেন—সেখানা আমার স্যুটকেসেই রাখতাম; যে কথাটা তিনি তার মধ্যে আমাকে বলে গিয়েছিলেন তা আমার মনে অক্ষয় হয়ে ছিল। লিখেছিলেন—"মেয়েদের থেকে যদি দূরে থাকতে না পারে তবে যেন বিয়ে না করে সুরেশ্বর।"

আমি ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের থেকে দূরেই থেকেছি—ভয় ক'রে কিন্তু স্থির নিশ্চয় হতে পারি নি; বুঝতে পারি নি, মেয়েদের থেকে দূরে থাকতে পারব কিনা।

ভূসম্পত্তির অধিকার—যারা নিজেদের ভূমির বা পৃথিবীর স্বামী মনে করে—তারা জানে না কি অপরাধ করে! কথাটা জানিয়ে গিছলেন রত্নেশ্বর রায়। বলতেন—ভূমি হল পৃথিবী। পৃথিবী মানুষের মা। পৃথিবীর স্বামী যারা হতে যায় বা হয় বলে মনে করে—তাদের অসাধ্য পাপ বোধ হয় পৃথিবীতে হয় না। জীবনে তারা সম্পর্ক বাছে না। এ কথার নজীর পৃথিবীর সব দেশের রাজা-জমিদারের ঘরে আছে। অপরের স্ত্রী হরণ, দরিদ্র আত্মীয়ের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে অপবাদ জড়ো করলে পাহাড় হয়। জমিদারবাড়ী বা রাজার বাড়ীতে দরিদ্র আত্মীয় সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে এসে অনেক ক্ষেত্রে বহু উপঢৌকন উপহার নিয়ে ফিরে গেছে—অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামী কারুর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অঞ্জনার মত স্নেহের আবরণে অনুগ্রহ পেয়ে থেকে গেছে; অঞ্জনার ভাগ্য—বেচারা দৃষ্টি-ভোগের অতিরিক্ত ভোগে লাগে নি বলে নিজেকে গোয়ানীজের ভোগ্যা করে আপনি গড়িয়ে গিয়ে তার পাতায় পড়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—নিজেকে আমি বার বার বহুবার বিশ্লেষণ করেছি, বিচার করেছি। দেখেছি মেজঠাকুমা, অর্চনা সম্পর্কে আমার অপরাধ কতটা! অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলছি—অকপট চিত্তে তোমাকে বলছি, শুধু তোমাকে নয়, দুনিয়াকেই বলছি, না, ওখানে অপরাধ আমার ছিল না। মুসলমান বা ক্রীশ্চান হলে অর্চনা সম্পর্কে কোন মনোভাবেই দোষ থাকত না কিন্তু হিন্দুধর্ম না মেনেও হিন্দু বলেই ও-কামনা কখনও জাগে নি। তবে একটু বেশী রকম সজাগ সতর্ক থেকেছি বরাবর। বুকের দরজায় কামনার করাঘাত হলেই জেগে উঠেছি। রুষ্ট সাড়ায় সাড়া দিয়েছি—ও-দিক থেকে আঘাত শুরু হয়ে গেছে।

ওইখানেই আমি অনুভব করেছি সুলতা—সম্পদের ঐশ্বর্যের এবং ভূমির অধিকারের কি প্রবল শক্তি! সমুদ্রে পড়েও মানুষ বাঁচে, হয়তো সমুদ্রই তাকে তীরে এনে দেয় কিন্তু সম্পদ ঐশ্বর্যশালীর বাঁধনে ধরা পড়লে তাকে বাঁধনের পীড়নে এলিয়ে পড়তেই হবে। সেখানে কাউকে বাঁচাতে হলে সম্পদশালীকে রাবণের মত অভিশপ্ত করে রাখতে হবে। বাল্মীকি সীতাকে রাবণের কুড়ি হাতের আকর্ষণ থেকে রক্ষা করবার জন্য আগে থেকে নলকুবরকে দিয়ে অভিশাপ দিইয়ে রেখেছিলেন—নারীর অমতে জোর করে নারীধর্ষণ করলে, দশটা মাথা একশো ফাটে ফেটে এক-একটা মাথা দশচির হয়ে যাবে। শুধু সম্পদশালীকেই দোষ দেব না—দরিদ্রকেও দোষ দেব সুলতা। তারা রিক্ত বঞ্চিত বলে তাদের ন্যায়-বিচারে মাফ করবার অধিকার কারও নেই। সে যাঁরা করবেন তাঁরা পলিটিকাল লীডার, খেয়ালী বিধাতা বা ডিক্টেটার। আমি দেখেছি—দরিদ্র পিতামাতা কন্যাকে সম্পদশালীর সামনে এনে ধরে ইচ্ছে করে। দরিদ্র নারী—সেও এসে সম্পদশালীর নজরে পড়তে চায়। কিন্তু সে সব কথা থাক। আমার জবানবন্দীতে আমার কথা বলি। রায়বংশে যে বাসনার স্রোত···সোমেশ্বর থেকে—শ্যামাকান্ত থেকে রায়বংশের জমিদারী আর রূপের দুই কূলের মাঝখান দিয়ে বেয়ে এসেছে—তার বেগ তার স্রোত আমার মধ্যেও ছিল, কিন্তু আমি তার মুখে বাঁধ দিয়েছিলাম।

ইংল্যাণ্ড যাবার আগে ওই দিন রাত্রে ডি এস পি'র কাছে রায়বংশের ইজ্জত মর্যাদা বাঁচাতে

কলঙ্ক নিলাম নিজের মাথায়। কলঙ্ক একতরফা হয় না; কলঙ্ক রটাতে হলে আর একটা তরফের প্রয়োজন হয়। তরফ খুঁজতে গিয়ে আর কাউকে পেলাম না, পেলাম ওই গোয়ানদের; গোয়ানদের মধ্যে ওই কুইনী মেয়েটির সঙ্গে একটা টাকা দেওয়ার সূত্র জড়ানো ছিল। সেই সূত্র ধরে ডি-এস-পি জিজ্ঞাসা করলেন—কুইনীর প্রতি দুর্বলতার স্বরূপটা কি? তার মানেটা কি? আমি কোণঠেসা আসামীর মতই বললাম—প্রেমও এক ধরনের স্নেহ। স্নেহও এক ধরনের প্রেম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর যেন শতমুখ হয়ে সায় দিয়ে উঠল—আমার দেহেও তার ছোঁয়াচ লাগল, কথাটা বলেও ভাল লাগল সুলতা; মনে হল আশ্চর্য একটা সত্যের সাক্ষাৎ পেলাম, সন্ধান পেলাম। জানলাম আমার মধ্যে প্রবল দেহবাসনা এবং নারীহৃদয় কামনা রয়েছে এবং এই মেয়েটিকেই আমি দেহ দিয়ে চাই, মন দিয়ে চাই। একান্তভাবে আপনার করে চাই। আমার জমিদারসত্তা এবং আমার ব্যক্তিসত্তা দুই সত্তা সমান আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিল তাকে পাবার জন্য।

আমি অনেক ভেবেছি, জাহাজে সারা বে-অব বেঙ্গল, এ্যারেবিয়ান সী, মেডিটেরিয়ান অতিক্রম করবার সময় শুধু এই কথাই ভেবেছি; নিজেকে বিচার করেছি; বলতে পার নিজেকে চিরে চিরে সমস্ত কিছু ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেছি এবং বুঝেছি।

জমিদারের বা ধনীর ছেলেদের একটা পাপ অভিপ্রায় থাকে—তারা তাদের উপর নির্ভরশীল বা তাদের দ্বারা যারা উপকৃত, অনুগৃহীত তাদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করে; বিশেষ করে তাদের মেয়েদের উপর ভোগের অধিকার দাবী করে। আগের কালে দাসীদের দেহমনের অধিকার দাবী করত প্রভুরা।

আর একদিক দিয়ে মানুষের, সেটা সব মানুষেরই সুলতা, একটা ছেলেমানুষী রোমান্টিসিজম আছে—যে রোমান্টিসিজমের জন্ম হয় ছেলেবেলায় রাজপুত্র রাজকন্যা বা রাজপুত্র আর চাষীর মেয়ের প্রেমের গল্প শুনে। অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করে মিলন হলেই মন ভরে ওঠে। এইটেকেই বাড়িয়ে নিয়ে গল্প বানাও—দেখবে একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসত, কিন্তু তাদের বিয়ে হল না; সেই দুঃখ তারা মেটাবার জন্য তারা কল্পনা করে এর ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দেবে।

সুলতা, দেবেশ্বর রায়ের পৌত্র—দেবেশ্বর রায়ের প্রথম প্রিয়া—গোয়ান মেয়ে ভায়লেটের ছেলের দৌহিত্রী—কুইনীকে ভালবাসে—তাকে সে চায় এই কথা সর্বসমক্ষে ব'লে আশ্চর্য তৃপ্তি পেয়েছিলাম। এবং পেতেও তাকে চেয়েছিলাম।

আরও একটা সত্য ছিল। সে সত্য সর্বজনীন কিনা জানি না—তবে রায়বংশে এ সত্যটা স্বীকৃত। এবং এটা রাজবংশের একটা ধারা। আমার বাবা চন্দ্রিকাকে ভালবেসেছিলেন—মিশ্র সৌন্দর্যের জন্য। দেবেশ্বর রায় পিক্রুজ আর অঞ্জনার সন্তান ভায়লেটকে ভালবেসেছিলেন। কুইনীর মধ্যেও বোধ হয় আমি তারই আকর্ষণও অনুভব করেছিলাম। এটা বোধ হয় চিরন্তন কামনা মানুষের।

বিলেতে গিয়ে এ আকর্ষণ আমার বাড়ল সুলতা। এবং এই কুইনীর আকর্ষণই আমাকে

ওখানে শ্বেতাঙ্গিনী সমাজে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিলে না। একটা ঘটনা ঘটল।

আমার ছবি কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই ছবিগুলো নিয়ে একটা এগজিবিশন হয়েছিল। এই এগজিবিশনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কুইনীর ছবিখানা। বিচিত্র ঘটনা—সুলতা, যে দেখতে এল, সেই এসে থমকে দাঁড়াল কুইনীর ছবির সামনে। অবাক হয়ে দেখলে। বললে—কি সুন্দর!

শুধু ছবি সুন্দর নয়, যার ছবি সেও কত সুন্দর কি সুন্দর! দুখানা ছবি ছিল কুইনীর। একখানাতে কুইনীর কোলে একটি শিশু দিয়ে এঁকেছিলাম 'Indian Madona'—ওদের চার্চের ছবি পুড়ে গিয়েছিল, ছবিখানা ওদের চার্চের জন্যই এঁকেছিলাম—কলকাতায় এসে এবং যে টাকাটা আমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই টাকার সঙ্গে ছবিখানাও দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু টাকা বা ছবি কিছুই নেয় নি কুইনী। আমি চিঠি লিখেছিলাম, তার উত্তরে সে লিখেছিল—উই আর আনএবেল টু এ্যাকসেপ্ট এনি হেল্প ফ্রম ইউ। থ্যাংকস।

কুইনীর আরও একখানা ছবি আমি এঁকেছিলাম—এ ছবিখানা সেই রক্তসন্ধ্যার আলো মুখে-পড়া কুইনীর ছবি। নাম দিয়েছিলাম 'গোধূলি লগ্ন'।

পাশাপাশি টাঙানো ছিল ছবি দু'খানা। দর্শক খুব বেশী আসে নি, কিন্তু যারাই এসেছিল তারাই ওই ছবি দু'খানার সামনে দাঁড়াত, মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখত এবং প্রশ্ন করত—কত দাম?

প্রথম দিন চমকে উঠেছিলাম—। দাম?

—হ্যাঁ, কত দাম? আমি কিনতে চাই। দাম তো লেখা নেই।

—ও ছবি দু'খানা বিক্রীর জন্য নয়।

—নয়! তাহলে তোমার বাকী ওই রাবিশগুলো কে কিনবে?

উত্তর কি দেব চুপ করেই ছিলাম। উত্তর দিতে পারতাম—বলতে পারতাম, ছবি তুমি বোঝ না তাই বাকীগুলোকে রাবিশ বলছ। ওইগুলোই modern ছবি। কিন্তু তা পারি নি, তার কারণ লোকটির পরিচয় জানতাম, একজন বড় আর্ট-ক্রিটিক। অন্য ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ছবি দু'খানার দিকে তাকিয়েছিলেন ভদ্রলোক, তারপর বলেছিলেন—দেয়ার ইজ লাইফ ইন দোজ টু; সো লিভিং!

আমি এরপর ছবিদুটোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। সত্যিই এক এক সময় মনে হ'ত—সত্যিকারের কুইনী। এখনি হয়তো কথা বলবে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। এগজিবিশন শেষ হল। সব ছবির মধ্যে ওই কুইনীর ছবিরই প্রশংসা হল বেশী। তার মধ্যে "Indian Madona" ছবিটাই বেশী পছন্দ করেছিল। আমি তাকিয়ে থাকতাম আর মধ্যে মধ্যে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতাম—আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটত দুরন্ত আবেগে। আমি অনুভব করতাম ওই মেয়েটিকে আমি জীবনে চাই।

নারীকে জীবনে পুরুষ চায়, পুরুষ নারীকে চায়। এ-চাওয়া দু'রকম। Man wants woman in life—যে woman-এর বিশেষ পরিচয় নেই; পরিচয় সে woman—তার নারীত্বই তার পরিচয়। এইটেই সাধারণ নিয়ম সুলতা। কিন্তু মানুষ একে আশ্চর্যভাবে বদলে

নিয়েছে—সে চায়—একজন বিশেষ নারীকে। সেটা প্রথমে থাকে নেশা—পরে সেটা হয় ভালবাসা।

কুইনীকে মেদিনীপুরের বাড়ীতে মিসেস হাডসন আর হিলডার সঙ্গে দেখে প্রথম আমার নেশা জেগেছিল। শাড়ী প'রে সে আশ্চর্য যৌবন-মোহময়ী হয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। বোধ হয় বলেছি কথাপ্রসঙ্গে; বলেছি, নারীকে নিয়ে মোহ সেই আমার প্রথম জাগল। তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে যা জাগিয়ে তুলেছিলাম, ছোট একটি গাছকে বড় ক'রে তুলে ফুল ফোটানোর মত ফুল ফোটাতে চেয়েছিলাম—তা সেদিন কুইনীকে দেখবামাত্র জেগে উঠেছিল; ফুল ফোটার কথায় বলব—পাতাহীন ভুঁইচাপার গেঁড়ে থেকে হঠাৎ যেন ডাঁটি বেরিয়েছিল কুঁড়ি নিয়ে। সেই কুঁড়িটি ফুটল বিলেতে ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নানা অসম্ভব কল্পনা করতাম। ওই কুইনীকে নিয়ে কল্পনা। ভাল লাগত। সারারাতই প্রায় জেগে থাকতাম।

কিছুদিনের মধ্যেই মদের মাত্রা বেড়ে গেল। এবং—। চুপ ক'রে গেল সুরেশ্বর। স্থির দৃষ্টিতে খোলা জানালার ওপারের দিকে তাকিয়ে বললে—সকল সত্যই বলতে বসেছি সুলতা, রায়বংশের কুড়ারাম রায় ভটচাজ থেকে শুরু করে আমার পিতামহ পর্যন্ত পিতৃপুরুষেরা ন্যায় অন্যায় যা করেছেন তা মুক্তকণ্ঠে বলেছি। অন্যায়গুলোই বড় ক'রে তুলে ধরে বলেছি। বলবার কারণ আছে—কারণ পাপগুলো সব মানুষেই করে, এ পাপ মানুষের—কিন্তু তাঁরা পাপগুলো জমিদারীরই বলে ঘোষণা করে করেছেন। আমার বাবার কথা জান। তাই আর বললাম না। এবার আমার কথা বলি। আমার মধ্যে ওই কামনা-বাসনা ওই প্রকৃতি অথবা পাপ বল পাপ, ক্রিমিন্যাল ইনস্টিংক্ট বল তাই, অন্যায় বল অন্যায়, অমার্জনীয় সামাজিক অপরাধ বল তাই—আমার রক্তের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। আমার পূর্বপুরুষেরা জমিদারীর দৌলতে সামুদ্রিক সরীসৃপের মত যে প্রবৃত্তিকে তাঁদের রক্তের মধ্যে লালন করেছিলেন, পুষ্ট করেছিলেন—যার বীজ মাছের ডিমের মত আমার রক্তে ছিল—তা ফাটল এবং হাঙরের মত হিংস্র স্বভাব নিয়ে সে বেড়ে উঠল।

সারাজীবনই একরকম—একটা সাবধান বাণী আমার কানের কাছে বেজেছিল। আমার বাবার দৃষ্টান্ত আমাকে ভীত করে রেখেছিল—তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে বাজত,—সুরোর যেন বিয়ে দিয়ো না। আমার দৃষ্টান্ত দেখলে। আমাদের বংশের বড় ভয়, মেয়েদের থেকে। বংশগত ব্যাধি এটা।

মায়ের মুখ মনে পড়ত। যেন বিষে নীল হয়ে যাওয়া মুখ। যার জন্য ব্রজদার শেফালির বাড়ী গিয়ে ওই দেহব্যবসায়িনীদের দেখে আকৃষ্ট হয়েও দাতা সেজে আত্মরক্ষা করেছি। কীর্তিহাটে গিয়ে অত্যন্ত সতর্ক থেকেছি। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি। সেই ভয় কাটতে লাগল সন্ধ্যার কনে-দেখা আলো-মাখা তরুণী কুইনীর ছবিখানা দেখতে দেখতে। এগজিবিশনের সময় সেই যে ছবিটার মধ্যে নেশার সন্ধান দিয়ে গেল আমাকে সেই আর্ট-ক্রিটিক—সেই নেশা আমাকে পাগল করে দিলে। মদ খেতাম, আর ছবিখানার দিকে

তাকিয়ে থাকতাম। এবং কল্পনা করতাম। যে কল্পনা করতাম তার মধ্যে প্রচণ্ড উন্মাদনা আছে, সে উন্মাদনা মহাভারতে নাগকন্যা উলূপীর জন্য অর্জুনের সাজে, ইতিহাসে পদ্মিনীর জন্য আলাউদ্দিন খিলজীর সাজে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কোন দেশে কারুর পক্ষেই সহজে ঘটে না, এবং আমার মত যে-মানুষ, আধা-জমিদার বা জমিদার থেকে খারিজ তার পক্ষে তো সাজেই না। কিন্তু তবু মন মানল না। এবং তা থেকেই একদিন আমি যেন লালসার কামনায় উন্মাদ হয়ে উঠলাম।

সুলতা—আমি নারী-দেহের জন্য লালায়িত হলাম। জীবনের অবরুদ্ধ ভোগের প্রবৃত্তি কুইনীর ছবির ইসারাতেই যেন বোতল-খোলা দৈত্যের মত বেরিয়ে এল।

I wanted women in my life. তার পথে কোন বাধা ছিল না, সেই সুদূর শ্বেত দ্বীপে। টাকাও আমার হাতে ছিল প্রচুর। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। টাকাটা যুদ্ধের আগে খুব কম ছিল না। মূল্য তখন তার অনেক ছিল। সেই টাকাটা দুই হাতে মুঠো ভরে নিয়ে নেমে পড়লাম লণ্ডনের নৈশজীবনে।

বন্ধু মিলতে দেরি হয় নি। ভারতীয় বন্ধুই মিলেছিল। তারা ওদেশেই কাজ করে পড়ে; জীবনের শ্লেটে তাদের হাজার হিজিবিজি, কিন্তু সে তারা গ্রাহ্য করে না। তারাও আমার টাকা-পয়সার সাচ্ছল্য দেখে প্রসন্ন উল্লাসেই এগিয়ে এসেছিল। মাস কয়েক প্রায় পাগলের মত ছুটেছি, ছুটতে চেষ্টা করেছি। তারপর হঠাৎ একদিন আমার বংশগত অভিশাপ আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

সকালবেলা ঘরে বসে আছি; ওই কুইনীর ছবির দিকে তাকিয়েই বসে সিগারেটের রিঙ ছাড়ছি আর ভাবছি; ভাবছি, কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছি না, তৃষ্ণা কিছুতেই মিটছে না। বাড়ছে। তার থেকেও কিছু বেশী। কুইনীর জন্যই জীবন-তৃষ্ণা বাড়ছে। সকালবেলা যখন রাত্রির অন্ধকারের ঘোর থাকে না, তখন মাকে মনে পড়ে, ঠাকুমা উমাদেবীকে মনে পড়ে, মেজঠাকুমা মেজদিকে মনে পড়ে, অর্চনাকে মনে পড়ে। বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপনার অজ্ঞাতসারে—আঃ—বলে চিৎকার করে উঠি।

আয়নায় নিজের ছবি দেখে ভয় পাই। চোখের কোলে কালি পড়েছে, গোল একটা কালো বেষ্টনীর মধ্যে আমার এই বড় চোখ দুটো যেন ঘোলাটে রঙ ধরেছে; মনে হয়, সোনার গিল্টী-করা প্রদীপটার গিল্টী উঠে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে লোহা; ঘি নেই, সরষের তেলও নেই, জ্বলছে লালচে কেরোসিনে; লালচে আলোর শিখার মাথায় ধোঁয়া উঠছে রাশি-রাশি।

নারীকে তো ভয় নয়, রায়বংশে ভয় বরাবরই নিজেকে। ধর্ম সাধনা আর ভূমির আধিপত্য করতে গিয়ে, নরনারী দেহ-মিলনের মধ্য দিয়ে প্রেমচেতনাটুকুকে বিসর্জন দিয়েছেন, নয়তো প্রকৃতি-শক্তিকে আজ্ঞাবাহিনী ক্রীতদাসীর মত আয়ত্ত করবার জন্য শ্মশানে যে যজ্ঞ করেছিলেন, তাতেই আহুতি দিয়েছেন। শ্যামাকান্ত মহাপ্রকৃতিকে ভোগ্যা নারীর মত আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন, বীরাচারের সাধনায়। বীরাচারে সিদ্ধ হয়ে তিনি খেলবেন, আর শক্তি তাকে খেলার উপকরণ যোগাবে অথবা নিজেই তার উপকরণ হবে। তিনি তাকে আদিম পুরুষের নারীকে বেঁধে রাখার মত বেঁধে রেখে দেবেন। নারীকে বেঁধে প্রহার করবেন, তবু তাকে

পেলাম না বলে আক্ষেপ করবেন। তারপর সোমেশ্বর থেকে দেবেশ্বর পর্যন্ত, তাই বা কেন, যোগেশ্বর রায় পর্যন্ত এক দশা। তাঁরা ভূমিকে ভোগ করলেন নারীর মত, আর নারীকে ভোগ করলেন ভূমির মত। ভূমিকে কখনও সেবা করলেন না, পূজা করলেন না, আদায় করলেন শুধু কর ; আর নারীকে কখনও প্রেম দিলেন না, তার কাছে চাইলেন শুধু সন্তান। ভূমির গণ্ডীর পরিমাপ যত বৃহৎই হোক, কখনও হলেন না তৃপ্ত, কখনও মিটল না ক্ষুধা, নারীর দেহ ভোগ ক'রে কখনও সুখের শেষ পেলেন না, বেছে-বেছে রূপসী নারী এনে অন্তঃপুর সাজিয়ে কখনও মিটল না তৃষ্ণা। একখানা এক একর দেড় একর জমির ধানে যে সব মানুষের সারা বছ'রের অন্ন জোটে, একটি নারীর প্রেমে যে সব মানু'ষের তৃষ্ণা মেটে, সে মানুষের দল থেকে পৃথক আমি, স্বতন্ত্র আমি। তারাই সভ্য মানুষ, তারাই দেবত্বের অধিকারী। রায়বংশ ধর্মকে আশ্রয় করে বর্বরতায় ফিরে গেছে, আদিম অন্ধকারে ফিরে গেছে, সম্পদকে আশ্রয় করেও তাই, সেই আদিম অরণ্যযুগে ফিরে গেছে। প্রিয়ার প্রতি যার প্রেম নেই, পৃথিবীর জন্যেই বা তার প্রেম কোথায় ?

সে সময় আমি ডায়রী রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। রত্নেশ্বর রায়ের মত নয় ; বীরেশ্বর রায়ের মত। জীবনের স্মরণীয় দিন ও ঘটনা। মেমোরেবল ডে অ্যাণ্ড ইন্‌সিডেণ্টস।

প্রথম দিন যেদিন জীবনে প্রথম একটি কন্যা শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে সারারাত তার দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে রইলাম, কিছুতেই তাকে স্পর্শ করতে পারলাম না ; কেন পারলাম না, সে সম্পর্কে লেখা আছে—"মদের নেশার মধ্যে নৈশ আবরণী-পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কেমন হয়ে গেলাম। বিচিত্রভাবে তার মধ্যে অনেককে দেখলাম। দেখলাম না শুধু তাকেই। মেয়েটি আমাকে গালাগাল দিলে, আমার রাগ হয়ে গেল, আমি চিৎকার করে উঠলাম—

Shut up—I say you shut up.

আমার চিৎকারে সে চমকে গিছল। ভয় পেয়েছিল। সারারাত্রির পর সে ঘুম ভেঙে উঠে আমায় তার ঘরের দরজা খুলে দিলে।"

আবার যেদিন সকল ভয়কে অতিক্রম করেছি, সেদিনও আমি চিৎকার করেছি। এবং সেই রাত্রেই চলে আসতে চেয়েছি। সম্ভব হয় নি। সারারাত্রি বসে কাটিয়েছি, প্রথম দিনের মতই।

সব লিখে রেখেছি। সেদিনও সকালে উঠে ডায়রী লেখা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে কুইনীর ছবি দেখছি, আর ওই সব কথাই ভাবছি, তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কুইনী যেন ছবির মধ্যে সজীব হয়ে উঠছে, আমাকে ডাকছে। অথচ তার শেষ কথা মনে পড়ছে, আমি ঘৃণা করি আপনাদের। আপনাদের গোটা রায়বাড়ীকে ঘৃণা ক'রি।

এমন সময় হোটেলের পরিচারক একখানা কার্ড নিয়ে আমাকে দিতে এল, একজন কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

দেখলাম—প্রিন্স হাররা রে, প্রিন্স অব কীর্টিগাটা। প্রিন্স এ্যাণ্ড এ স্পিরিচুয়াল ম্যান।

মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল, একটা অসহনীয় উদ্বেগ বুকের ভিতরে জমে উঠল, পুঞ্জীভূত হয়ে।

প্রিন্স অব কীর্তিহাট! প্রিন্স অব কীর্তিহাট! কে? কে?

প্রিন্স অব কীর্তিহাট নিজেই পরিচয় দিলেন, তাঁর ফাদার ছিলেন রাজা আর রে, রামেশ্বর রে। আমাদের রাজা উপাধি বংশগত। নো ওয়ান ক্যান ডিনাই আওয়ার রাজা টাইটল। ইউ সি, কীর্তিহাট ইজ ইন দি প্রভিন্স অব বেঙ্গল। উই আর কিংস এ্যাণ্ড ব্রাহ্মিনস বোথ।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তার মুখের দিকে। মিল খুঁজছিলাম চেহারায়, রঙ-এ, কাঠামোয়, নাকে-মুখে-চোখে। পাচ্ছিলাম সে মিল। সে বলেই যাচ্ছিল, আমরা বাংলা-দেশের প্রাচীনতম অভিজাত বংশ।

You see—since the time of Raja Ballal Sen, আমার পূর্বপুরুষ রাজার chief minister ছিলেন। You see, he was and we also are the worshiper of Godess Shakti. We are তান্ত্রিকস। বল্লাল সেনের পর লক্ষ্মণ সেন রাজা হলেন। He was a staunch Baisnav; আমার পূর্বপুরুষ বার বার রাজাকে বারণ করেছিলেন, এইভাবে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। প্রশ্রয় দিয়ো না।

But he turned a deaf ear to him, never cared to follow his advice;—and you,—you certainly know what happened; only seventeen সতেরোজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে বাংলা দেশ জয় করেছিলেন বক্তিয়ার খিলজী!

অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন প্রিন্স হারা রে; রত্নেশ্বর রায়ের তৃতীয় পুত্র রামেশ্বর রায়ের এক পুত্র। কোন্ পুত্র তা জানি না। রামেশ্বর রায় সুকৌশলে বিষয় বিক্রী করে বিলেতে এসে-ছিলেন, ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্ম হয়ে বিয়ে করেছিলেন এক ব্রাহ্ম মেয়েকে। তাঁরই এক ছেলে। বিলেতে এসে বাস করছে। এসেছিলেন আই-সি-এস পড়তে।

হারা রে বললেন—

I was a very brilliant student. My subject of interest was Sanskrit—great poet Kalidasa was my first attraction, then the greatest of all poems—Veda—then Upanisada.—I learnt two things from this Upanisada, the greatest of all poetries of the world—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং,
বরস্তু বরণীয়ঃ স এব।

আপনি একজন বড় আর্টিস্ট and আমি শুনলাম—A great learned man also—also a very rich man—a Brahmin also, আপনি নিশ্চয় জানেন—I am

sure. নচিকেতা এই কথাগুলি বলেছিল যমকে। And you certainly remember—what মৈত্রেয়ী told to her husband গৌতম, যেনাহং নামৃতস্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম।"

I went mad, Mr. Ray—I went mad,—and gave up the idea of apering at the I. C. S. examination, and মিস্টার রে—আমি আমার আত্মাকে দেখতে পেলাম—

—Yes, I could see—I could feel এবং সব সংশয় ছিন্ন হয়ে গেল আমার—

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে
সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি
তস্মিন্ দৃষ্টি পরাবরে।
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং
ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ
যদাত্মবিদো বিদুঃ॥
ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥
ব্রহ্মৈ বেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম
পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

অনর্গল বলে গেলেন হারা রে। সুন্দর কণ্ঠ, প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ, সাদা দাড়ি-গোঁফে হাত বুলোচ্ছিলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল একটি আনন্দময় স্বপ্ন। আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

ঠিক এই সময়েই এসেছিল আমার একজন রাত্রির সহচর। বিনা কার্ডেই—May I come in!—বলে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকে হারা রে-কে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—so you have come—এঁ্যা!

প্রিন্স হারা রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোরের মত সঙ্কুচিত এবং ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—হরি,—হরেশ্বর রায়, রামেশ্বর রায় আমার কনিষ্ঠ পিতামহ, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র; তার সম্পর্কে বিশেষ পরিচয় আমি পাই নি কীর্তিহাটের দপ্তরের কাগজের মধ্যে। এম-এ, বি-এল পাস করে এস্টেটের আইন বিভাগের দেখাশুনো করতেন।

রায়বাহাদুর কিন্তু তাঁর মতের চেয়ে তাঁর পাটোয়ারী মামলার মুহুরীর মতের বেশী দাম দিতেন। তবে ভালোবাসতেন। ভদ্রলোক ছিলেন রামেশ্বর রায়। অনুকরণ করতেন বড়দাদার কিন্তু সে 'মেটাল' ছিল না তাঁর মধ্যে, সুতরাং সে-ধার বা সে-ঝকমকানি পাবেন কোত্থেকে? বড়দাদার অনুকরণে তিনি ছিলেন বিলাসী—ভদ্রলোক। ইংরিজী এবং ইংরেজের প্রেমমুগ্ধ। তিনিই প্রথম বিলেত এসেছিলেন এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে গিয়ে এলাহাবাদে বসেছিলেন। প্রথমা স্ত্রী যখন মারা গেছেন, একটি কন্যা ছিল সে-স্ত্রীর গর্ভজাত, তার বিয়ে দেওয়ার অজুহাতে দেবোত্তরের অধীনে ব্যক্তিগত পত্তনী-দরপত্তনী এবং জোতজমাগুলোর একের-তিন অংশ তিনি বিক্রী করে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে গিয়ে বসেছিলেন এলাহাবাদে। এলাহাবাদে তাঁর প্র্যাকটিস জমে নি কিন্তু জীবনে স্বাধীন প্রেমের ক্ষেত্র এবং সুযোগ পেয়েছিলেন। একটি ব্রাহ্ম মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু তাকে বিয়ে করলে সম্পত্তি নিয়ে গোল বাধবে এবং সে বাধাবেন মেজদা অর্থাৎ শিবেশ্বর রায়, তা তিনি জানতেন। তাই বিক্রী করে দিয়েছিলেন বড়ভাইকে, সব বলেই বিক্রী করেছিলেন। মিস্টার আর রে'র এই পুত্রটি সেই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র হারা রে। ছাত্র তিনি ভাল ছিলেন, সংস্কৃতে, ইংরিজীতে ডবল অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছিলেন। বাপ বিলেত পাঠিয়েছিলেন আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু সে-পরীক্ষা তাঁর আর কখনও দেওয়া হয় নি। এখানকার কাগজে ভারতবর্ষের গৌরব প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। ইংরিজী ভাল লিখতেন, তাঁর লেখার তখন দাম হয়েছিল এবং লেখার জন্য হারা রে-র নামও হয়েছিল, দু-চারটে ছোটখাটো আসরে বক্তৃতাও দিতেন তখন। হাইড পার্কেও টুল কাঁধে করে ঘুরেছেন।

তাঁর কেরিয়ারে ভবিষ্যৎ ছিল। ও-দেশে থাকলেও ছিল, এ-দেশে এলে তো কথাই ছিল না; এ-দেশে নেতৃত্বের সব থেকে বড় কোয়ালিফিকেশন হল E. R. মানে ইংলাণ্ড রিটার্নড। এদের জন্যে চেয়ার খালি হওয়ার অপেক্ষা করতে হয় না—নতুন চেয়ার তোলা থাকে—এলেই নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রায়বংশের ছেলে হারা রে। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন adultery-র দায়ে।

রায়বংশের ছেলে হারা রে, প্রথম বিয়ে করেছিলেন এক মহৎকুলের কন্যাকে। কোন এক স্যার টাইটেলধারীর আত্মীয়াকে, খাস বিলিতী স্যার এবং ভারতবর্ষের কোন এক প্রভিন্সের এক্স-গভর্নর। তাঁর এই আত্মীয়াটি তাঁর গভর্নরগিরির সময় ভারতবর্ষে এসে দেখে গেছেন এ-দেশ। দেখে গেছেন এ-দেশের যোগী-সন্ন্যাসী, ফকির, ফরচুনটেলার, পুরনো মন্দির, তীর্থস্থল, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, গোয়ালিয়র ফোর্ট, আগ্রা ফোর্ট থেকে কাশীতে সারনাথ। এবং তার সঙ্গে দেখে গেছেন ইণ্ডিয়ান প্রিন্সদের বাড়ীঘর, বিরাট মহল, যার মধ্যে তাঁরা বাস করেন। আর মনে-মনে প্রেমে পড়ে গেছেন তরুণ গৌতম বুদ্ধার সঙ্গে, যিনি সদ্যপ্রসূত পুত্র রাহুল এবং সুন্দরী গোপাকে ফেলে নির্বাণ খুঁজতে গিয়েছিলেন।

রায়বাড়ীর রূপবান এবং বিদ্বান বংশধরটির কাছে 'ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্যা' এবং 'যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম্' এই পরমতত্ত্ব শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল আগুনের শিখায় আকৃষ্ট পতঙ্গের মত। বিলেতে তখনও লোকে স্বামী বিবেকানন্দকে ভোলে নি। মেয়েটি

সব থেকে বেশী মুগ্ধ হয়ে গেল, যখন সে এই প্রিন্স হারা রে-র কাছে শুনলে যে, তিনি তাঁর রাজ্য উত্তরাধিকার ত্যাগ করে শুধু ইণ্ডিয়ার এনসেণ্ট কালচারের স্বরূপ এবং মহিমা প্রচারের জন্যই এ-দেশে এসেছেন এবং সারাজীবন তাই করে যাবেন, তাঁর জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন। তরুণী কুমারীটি এই রাজপুত্রটির মধ্যে গৌতমবুদ্ধার নবজন্মকে প্রত্যক্ষ করেছিল। মেয়েটির কিছু পৈতৃক ধন ছিল, সবকিছু নিয়েই তিনিই প্রথম শিষ্যা, সচিব এবং সখিরূপে তাঁকে বরণ করে ধন্য হয়েছিলেন।

সালটা প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পর। যুদ্ধের সময় তিনি ইংল্যাণ্ডেই ছিলেন। এবং কাগজে বৃটনদের জন্য কালীতত্ত্ব বিতরণ করে লিখতেন—এই সর্বশক্তিময়ী মাতৃশক্তি—Mother the all powerful—ব্যাখ্যা করে লিখতেন—তিনিই ক্রুদ্ধ হয়ে মানুষের অন্তরলোকে ক্রোধকে সঞ্চারিত করেন এবং তখনই ওয়ার বাধে এই পৃথিবীতে।

She is peace—She is anger, She is fire, She is water, She is heat, She is cold, She is the cause of everything—এর ফলে তাঁর খ্যাতি বেড়েছিল যথেষ্ট, শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যাও বাড়ছিল সঙ্গে। হঠাৎ একদা অঘটন ঘটে গেল। ১৯১৯ সালে আর্মিস্টিসের পর। হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক বাড়ীতে এসে উঠল অভিনেত্রী। সামান্য কদরের অভিনেত্রী কিন্তু অসামান্য প্রখর তার রসনা, কণ্ঠস্বরও তেমনি উচ্চ এবং কর্কশ।

সে দাবী করলে—রে তার স্বামী এবং তার সন্তানকে সে গর্ভে বহন করে বেড়াচ্ছে আর রে তাকে পরিত্যাগ করে এই ব্যভিচারিণী মহিলার গৃহে প্রমোদ-বাসর যাপন করেছেন।

বৃত্তান্ত তার অনেক স্থূলতা। মামলা হল, তাতে তিনি স্টেটমেণ্ট করলেন। বিচিত্র স্টেটমেণ্ট। বললেন—আমি ইণ্ডিয়ান তান্ত্রিক যোগী। আমি মাদার দি অল পাওয়ারফুলের উপাসক, আমার পক্ষে সংসারে কোন কিছুতে বাধা নেই। There is no bar. I deny all bars. তান্ত্রিক-যোগী আমি, আমি ওই অ্যাকট্রেসটির মধ্যে এমন এক উয়োম্যানকে দেখতে পেয়েছিলাম, যে সাধনার সময় আমার পাশে বসে থাকলে Mother the all powerful নিশ্চয় দেখা দেবেন। So I accepted her as my wife—আমি তাকে ইণ্ডিয়ান তান্ত্রিক-রীতি অনুসারে বিবাহ করেছি।

জেল হয়ে গেল হারা রে-র। প্রথমা স্ত্রী ডিভোর্সের মকর্দমা করে ডিভোর্স পেলেন। কাগজে কেলেঙ্কারি হতে তিনিই দেন নি। না-হলে বোধ হয় খবরটা আগেই জানা হয়ে থাকত।

তারপর হারা রে জেল থেকে বেরিয়ে আবার একবার সেইণ্ট সাজবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে খুব সুবিধে হয় নি। কিন্তু সুবিধে-অসুবিধেতে হারা রে'র কিছু যায়-আসে নি। শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত লোকও বলা যায়, তিনি বিচিত্র জীবন যাপন শুরু করলেন। দাড়ি-গোঁফ-চুল রেখে সে এক ভারতীয় তান্ত্রিক সাজলেন। এবং চিটিং-এর জন্য চুরির দায়ে আরও দু'বার জেল খেটেছেন। তা খাটুন, তবুও এখনও তাঁর লেখা কাগজে বের হয়। ভারতবর্ষের ধর্মের উপর তাঁর রচনার আদর করে ওখানকার কাগজওলারা। বিশেষ করে ১৯২১ সালের পর গান্ধীজীর 'অহিংসা'র বিরুদ্ধে তার কতকগুলো রচনার খুবই সমাদর হয়েছিল। লিখেছিলেন নাকি—

This non-violence is Sudra cult in India. This is for those who are weak—who cannot understand গীতা অর চণ্ডী অর 'ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিৎ'—যাঁর বাণী, যিনি কুরুক্ষেত্রে এত রক্তপাত ঘটিয়েছেন, তাঁর নামে নন-ভায়লেন্স অহিংসা এর থেকে হাস্যকর কিছু হয় না। এ নেহাতই কাওয়ার্ডিস অথবা ডীপ পলিটিক্স বা কেউ বলতে পারে 'ভেরী ক্লেভার কামোফ্লেজ'।

এসব পরিচয় আমার ওই রাত্রি-সহচর বন্ধুটি মিস্টার হারা রায়ের সামনেই দিয়ে গেল। হারা রায় স্থির হয়ে শুনলেন। প্রথম যে একটা অপ্রতিভ শঙ্কিত ভাব তাঁর মুখের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, ক্রমশঃ সেটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। প্রসন্নমুখে দাড়িতে হাত বুলিয়ে হারা রায় বললেন— জেণ্টেলম্যান, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে বলছি—আপনি একটি 'বদ্ধজীব'। আপনার সঙ্গে আর কোন বর্বর জাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ যাদের সঙ্গে জন্তু জানোয়ারের মিল বেশী, তাদের কোন প্রভেদ নেই। আপনি তান্ত্রিক স্পিরিচুয়ালিজিম কিছুই বোঝেন না। হ্যাঁ মহাশয়, আপনি যা ঘটনার বিবরণ দিলেন, তা সত্য অর্থাৎ তা ঘটেছে। কিন্তু ঘটেছে বলেই তা সত্য এমন কথা আমি স্বীকার করি না। বিচারক আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝতে পারে নি, সেই জন্য সে জেল দিয়েছে। ইংরেজ বিচারক আজ ভারতবর্ষে সমস্ত পলিটিক্যাল লীডারসকে জেলে দিচ্ছে না? কিন্তু তাই বলে কি তারা গিল্টী? আর দে ক্রিমিন্যাল? বিচার সহজ নয় মহাশয়। দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্দারকে যে প্রশ্ন করেছিল থেসিয়ান রবার তার উত্তর আজও কেউ দিতে পারে নি। গো এ্যাণ্ড আস্ক কাইজার উইলহেল্ম দি সেকেণ্ড—নাউ লিভিং ইন হল্যাণ্ড, আস্ক হিম—আর ইউ গিল্টী স্যার? এ্যাণ্ড ইউ উইল গেট দি আনসার। তিনি নিশ্চয় বলবেন—যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি বলেই হয়ত আমাকে দোষী বলতে পার কিন্তু যুদ্ধে আমি জয়ী হলে এ-কথার উত্তর কি হত চিন্তা করে দেখ! হ্যাঁ, আমি যখন দিস মিস্টার রে-র কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি, তখন নিশ্চয় আপনি তাঁর সহচর বা পার্শ্বচর হিসেবে যা বলছেন বলতে পেরেছেন। অন্যথায় নিশ্চয়ই এ-কথা বলতে পারতেন না! পারতেন? অল রাইট, আই ফরগিভ ইউ জেণ্টলম্যান, স্মল ক্রাইস্ট ইউ আর—দোষ তোমাদের দেব না। ইট ইজ নট ইজি টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি অর দি গ্রেটনেস অব মাই মিশন। ইয়োর গান্ধী কুড নট আণ্ডারস্টাণ্ড মি। সে আমাকে লিখেছিল—ভারতবর্ষে ফিরে এস। বাট—এখানে ইণ্ডিয়ার ফিলসফি, রিলিজিয়নের গ্রেটনেস না বুঝলে দেশে হাজার মুভমেণ্টেও কিছু হবে না। অলরাইট গুড বাই!

দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে তিনি টুপিটি তুলে নিয়ে লম্বা রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুলের উপর বসিয়ে পিছন ফিরলেন। মনে মনে সহস্র লজ্জা, লক্ষ বেদনা আমাকে যে কি করে দিয়েছিল, তা বলতে পারব না। কখনও মনে হচ্ছিল—এই মুহূর্তে আমি আত্মহত্যা করি। নইলে হয়তো কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশ করে ফেলব যে, ওই লোকটি আমার পিতৃব্য—কীর্তিহাটের রায়বংশের রামেশ্বর রায়ের পুত্র। তবুও আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। বললাম—ওয়েট প্লিজ এ মিনিট অর টু।

—মি? ইউ আস্ক মি টু ওয়েট?

—ইয়েস স্যার।

—হোয়াট ফর ? ইউ হ্যাভ গট সাম মোর স্ট্রং ওয়ার্ডস ফর মি—

—না। কোন কঠিন কথায় বোধ হয় আপনাকে আঘাত বা লজ্জা দেওয়া যায় না।

হেসে হারা রায় বললেন—স্যাটস্ এ কম্প্লিমেণ্ট। থ্যাঙ্ক য়ু।

—এই সামান্য কিছু সাহায্য আপনি নিয়ে যান। দশ পাউণ্ডের নোট বের করে আমি তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে নোট ক'খানা কেড়ে নিয়ে বললেন—অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। অনেক ধন্যবাদ। টাকার আমার প্রয়োজন ছিল। চলে যেতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কয়েক মিনিট তোমার সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে পাইনে রয়!

ভাবলাম, হয়তো এবার কোন দুর্বল মুহূর্ত এসেছে এবং সেই দুর্লভ দুর্বল মুহূর্তটি সে অনুতাপ প্রকাশ করবে বা আমার কাছে সজল চোখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, হয়তো বা আরও কিছু টাকাও চাইতে পারে। আমার কাছে এমন একটি মুহূর্ত যত ভয়ের তত প্রলোভনের। ভয়,—হয়তো প্রকাশ করে ফেলব তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। প্রলোভন—সে-ও ওইটেই, হ্যাঁ, ওইটেই, কেবলমাত্র তার উল্টো পিঠটা।—আমি আমার নৈশ সহচরের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল—ওকে প্রশ্রয় দেবেন না মিস্টার রয়। ডোণ্ট। ও ভয়ানক লোক, নির্লজ্জ; ধর্মাধর্ম ন্যায়নীতিজ্ঞানবর্জিত একটি ধুরন্ধর শয়তান।—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—প্লিজ, প্লিজ। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য। একটু বিরক্তি-ভরেই বলেছিলাম। কারণ, ওই বন্ধুটিও তো হারা রে থেকে উঁচুদরের মানুষ ছিল না। রাত্রির সহচর। রাত্রির লণ্ডনের মোহে তারা লণ্ডনে থেকে গেছে; উপার্জন করে, সামান্যই করে। রাত্রির লণ্ডনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতেই চেয়েছিলাম। কীর্তিহাটের জমি-দারীর মোহ কেটে গিয়েছে। রায়বংশের মোহও কেটে গেছে। এখানে এসেছিলাম টাকা নিয়ে এই জন্যেই। রক্তের মধ্যে থেকে যেন নির্দেশ পাচ্ছিলাম। তাই এই লোকটির সন্ধান পেয়ে তাকে ডেকে নিয়েছিলাম। টাকা পেতো সে আমার কাছে। সুতরাং তার উপর বিরক্ত হবার আমার অধিকার ছিল।

লোকটিও সরে গিয়েছিল। আমার কাছে প্রত্যাশা তার ফুরোয় নি তখনও। লোকটি চলে গেলে আমি হারা রে-কে প্রশ্ন করেছিলাম—বলুন কি বলবেন?

—ইয়ং ম্যান, ইয়ং ব্লাড তোমার—হট ব্লাড—। আমি শুনেছি, তুমি নারীক্ষুধাতুর!

আমার মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করে উঠল। আমার খুড়ো, আমার বাবার নিজের খুড়তুতো-ভাই জিজ্ঞাসা করছেন। উনি অবশ্য জানেন না, কিন্তু আমি তো জানি। কিন্তু কি উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না।

—লজ্জা করছ? নো-নো-নো! লজ্জার কিছু নেই। নাথিং। তুমি জান না, তুমি বোঝ না; এটা অবশ্য দুর্ভাগ্য তোমার—ইণ্ডিয়ান এবং বেঙ্গলী হয়ে তুমি এটা বোঝ না। ফেমাস তন্ত্র কাল্ট অব বেঙ্গল।

হঠাৎ থেমে মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি জাতে কি বল তো? বাই কাস্ট—? ব্রাহমিন অর বৈশ্যা অর কায়স্থা অর এ শূদ্রা? হোয়াট?

বললাম—ব্রাহমিন।

—ব্রাহমিন? শাক্তা অর এ বৈষ্ণবা?

—কেন জিজ্ঞাসা করছ?

—বুঝেছি ওসব মানো না। ছাটস্ অলরাইট। ঠিক আছে। মানলে যে-কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তা বুঝতে সুবিধা হত। ভাল, সে-কথা বলব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করব, সত্যিই তুমি হাংরী? দেখ, আমি তোমার ক্ষুধা মেটাতে কিছু সাহায্য করতে পারি। আমার অনেক শিষ্যা আছে। তারা আমার কাছে এই কারণেই আসে। আমি তাদের কবচ-মাদুলী-গোছের কিছু দিয়ে থাকি। তুমি আমার কাছে নিতে পার। রয়, মেনি উয়োমেন আমার লাইফে এসেছে। আমার কোন লজ্জা নেই। তুমি জানলে বুঝতে পৃথিবীতে ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান রিলেশনসিপ ছাড়া কিছু নেই। পুরুষ এ্যাণ্ড প্রকৃতি। নাথিং এলস্। ইফ ইউ লাইক, আই ক্যান হেল্প ইউ। থ্রো ছাট ননসেন্স ইয়ং ম্যান আউট।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখেই বোধ হয় তিনি বললেন—খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে রয়? কিন্তু আশ্চর্য আদৌ নয়। তোমাদের মনকে ইংরেজেরা ক্রীশ্চানিটি একটা মরালিটি শিখিয়েছে, যে-মরালিটি তোমরা আজকের এডুকেশনে পাও, যেটা ব্রাহ্ম সোসাইটি প্রচার করেছে এককালে, তার জন্যেই এমন মনে হচ্ছে। নাহলে এতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই।

This is the only truth of life.

এবার আমি বললাম—এসব ফিলসফি-স্পিরিচুয়ালিজিম-এর দক্ষিণা তো আমাদের দেশ অনুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য, তার বেশী নয়। কিন্তু যে সাহায্য করতে চাচ্ছেন আমাকে, তার দক্ষিণা ওই যৎকিঞ্চিৎ হলে চলবে, না, বেশী দিতে হবে?

—অবশ্যই বেশী দিতে হবে। আপনি জানেন, আমি বলেছি আপনাকে—আমি ভিক্ষে চাইতে এলেও আমি রাজার ছেলে: ব্লু ব্লাড আছে আমার মধ্যে। আমি সন্ন্যাসী হলেও আমি তাই। এ প্রিন্স। অল্পে আমার হাত ভরে না। আমি তোমাকে সার্বিস দেব—আমার রেমুনারেশন ওই লোফার রাত্রি সহচরটার সমান নিশ্চয় হবে না। তাছাড়া মিস্টার রয়, তোমাকে ফ্রাঙ্কলি বলি—আমার অনেক দেনা। অনেক। আমার নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে। অহঙ্কারটাকেই বড় করছি না—তোমার করুণার কাছেও আবেদন জানাচ্ছি।

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম সুলতা। কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। দেনাতে ডুবে গেছেন হারা রে। শুধু হারা রে নয়, কীর্তিহাটের রায়বংশের সবাই দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দিন-রাত্রি পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে বলে মনে হল। এ-দেনা শোধ করবার কি কারুর সাধ্যি আছে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হারা রে বললেন—আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখ রয়। আমি আবার

আসব তোমার কাছে।

বলে চলে গেলেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আমার মনে পড়ছে সুলতা, স্পষ্ট মনে পড়ছে সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে কোথাও বুঝি আমার বা রায়বংশের কোন সন্তানের সুস্থ হয়ে থাকবার অধিকার নেই।

এই মুহূর্তে এসে ঢুকেছিল আমার সেই নৈশ অনুচরটি। তার নাম মিস্টার ঘোষ-চৌধুরী। স্মার্ট ইয়ং ম্যান, ডেয়ার-ডেভিল। সে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—রয়—কি হল। মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়ে গেছে তো!

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, উত্তর দিতে পারলাম না। সে হেসে বললে—সম্ভবতঃ তুমি এবার আমাকে চলে যেতে বলবে। যাব আমি—আই অ্যাম এ স্পোর্ট; আমি তোমাকে ব্ল্যাক-মেল করব না। আমার পাওনাটা শুধু পেলেই হল। তবে এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড অর কমরেড অর গাইড যাই বল, সেই হিসেবেই বলি—ডোণ্ট ট্রাস্ট দ্যাট ম্যান—ও একটা পাইথন, লেজে জড়িয়ে পাক দিয়ে তোমার হাড়গোড় ভেঙে মাংসের দলা পাকিয়ে ধীরে ধীরে তোমাকে গিলবে।

আমি তাকে বলেছিলাম—ঘোষ-চৌধুরী, তুমি হুইস্কির জন্যে অর্ডার কর, আর দেখ ট্র্যাঙ্কুইলাজার ট্যাবলেট আছে ওই দেরাজে, আমাকে দাও। আমি সুস্থবোধ করছি না। ওই লোকটা আমাকে অসুস্থ করে দিয়ে গেল।

—তোমাকে কিছু খাইয়েছে? কই এরকম তো কিছু করে বলে তো কখনও শুনি নি। তবে হি নোজ হিপনটিজিম। হিপনটাইজ করে টানে নিজের দিকে। স্পেশালি গার্লস—উইমেন।

—না চৌধুরী, খাওয়ায় নি কিছু। তবে হিপনটিজম বলছ তা হতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য শক্তি ওর হিপনটিজমের তোমার কাছে আমি ঠিক ভাবে এক্সপ্লেন করতে পারব না। কিন্তু আমার দেহ-মন সবকিছুকে টানছে, প্রবলভাবে টানছে। আমি ওকে ভুলতে পারছি না। অন্য কথা ভাবতে পারছি না। শুধু ওর কথাই মনে ঘুরছে। দাও, আমাকে ট্রাঙ্কুইলাইজার দাও—ডবল ডোজে দাও। আর হুইস্কি দাও।

চৌধুরী ভিতরের অর্থ বুঝতে পারে নি। সে ভাবছিল হিপনটিজমের কথা। সে তাড়াতাড়ি আমাকে মদের গ্লাস এবং ট্রাঙ্কুইলাইজার ট্যাবলেট দিয়েছিল—আমি ডবল ডোজে খেয়ে শুয়ে ঘুমুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঘুম সহজে আসে নি।

* * *

শুধু ঘুম নয়, আনন্দ-উল্লাস এ সমস্তই যেন ওই হারা রে আমার অপহরণ করে নিয়েছিল। আমার পিছনে সে যেন অশুভ শনিগ্রহের মত অথবা কলির মত ফিরতে শুরু করেছিল। অথবা রায়বংশের প্রেতাত্মার মত ফিরতে শুরু করেছিল।

ওই ঘটনার ঠিক একদিন পর সে আবার এসেছিল আবার হোটেলে। এবার একা নয়। সঙ্গে একটি সুন্দরী তরুণী।

আশ্চর্য সুলতা, আমি কার্ড পেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। ঘরে এল সে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। আমার দেহের রক্ত চঞ্চল যেমন হয়ে উঠল, তেমনি একটা নিদারুণ আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে একটা অসহনীয় উদ্বেগের সৃষ্টি করলে।

উইও হলে হার্টের উপর প্রেসার পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি। তারিখটা স্মরণীয় তারিখ, থার্ড সেপ্টেম্বর নাইনটিন থার্টি-নাইন। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজ ওয়ার ডিক্লেয়ার করবে, তার আগে, এগারটা পনের মিনিটে প্রাইম-মিনিস্টার মিস্টার চেম্বারলেন রেডিয়োতে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করেছে ভোরবেলা। নেভিল চেম্বারলেনের বক্তৃতা শুনছিলাম আমি। হারা রে ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে মেয়েটি।

বললেন—I have come Mr. Roy. Let me introduce Miss Laura Knight to you—She is more than my own daughter—my disciple, a শিষ্যা of mine. And Laura— this is Mr. Ray—S. Ray—an artist a famous artist—and a very learned man—also a very rich man. You see those two pictures on the wall—one a mother and another a darling. But the girl is the same, you see—this is tantra of India. The Eternal Mother and the Eternal She, they are one and the same.

আমি আর সহ্য করতে পারি নি। আমি বলেছিলাম—will you please stop Mr. Ray!

মিস্টার হারা রে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—You dont like Miss Knight—? She is very intelligent with a very soft and sweet mind—She wanted to work as your secretary.—

আমি বলেছিলাম—বাংলায় বলেছিলাম, দয়া করে আপনি চলে যান—আমি জোড়হাত করছি মিস্টার রে—।

সুলতা, মেয়েটির মুখে যেন রায়বংশের আদল দেখতে পাচ্ছিলাম। থরথর করে কাঁপছিলাম আমি।

—কি হল মিস্টার রায়? আপনি অসুস্থ?

আমি এবার চিৎকার করে বলেছিলাম—Get out I say—get out—

রেডিয়োতে তখনও প্রাইম-মিনিস্টার মিস্টার চেম্বারলেনের বক্তৃতা চলছে। সারা ইংল্যাণ্ডের লোক বোধহয় তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গেছে। যুদ্ধ! আবার সর্বনাশা যুদ্ধ বাধল।

হারা রে বললেন—কিছু টাকা ওকে দাও রায়, ওকে আমি নিয়ে এসেছি তোমার নাম করে। অনেক প্রত্যাশা করে এসেছে।

—She must get something. Mr. Ray—please.

আমি বললাম—She is your daughter !

চমকে উঠল হারা রে, বললে—কে বললে ?

—ওর মুখ বলছে।

—তোমার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ রয় কিন্তু She is a good girl—and beautiful also—Is she not ?

এতক্ষণে মেয়েটি কথা বললে—Give me my dues. বলে সে আমার সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে।

আমি ওদের বিদায় করলাম। মূল্য ভালই দিতে হল। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ ছিল না। বরং আসবার সময় ওদের আরও কিছু পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। হারা রে মিথ্যা কথা বলে নি ; ঋণ তার অনেক, আকণ্ঠ ডুবে আছে বললে মিথ্যা বলা হয় না।

দেশে ফিরবার টিকিটের দাম আর পথ-খরচ রেখে বাকিটা হারা রে-কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

দেশে ফিরেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই। ও-দেশে থাকতে আর সাহস হয় নি। লোকে বলেছিল—যুদ্ধের ভয়ে পালাচ্ছি কিন্তু তা নয়, আমি পালিয়েছিলাম হারা রে-র ভয়ে এবং তার মেয়ে শম্পা রে-র ভয়ে।

মেয়েটার নাম লরা নাইট নয়। ওর নাম শম্পা রে। ওদের ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে খানিকটা পায়চারি ক'রে সুরেশ্বর যেন দম নিয়ে বললে—সাত পুরুষ ধ'রে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে সুরেশ্বর রায় পর্যন্ত যত কলঙ্ক রায়বংশ অর্জন করেছে, সুলতা, তার মধ্যে এই হারা রায়ের কলঙ্কের চেয়ে কালো এবং নীরেট অর্থাৎ ওজনে গুরুভার কলঙ্ক আর কেউ অর্জন করে নি।

বলতে-বলতে বলতে পারি নি ; দিনের আলো ফুটছে, লজ্জাবোধ করছিলাম ; কিন্তু না, বলব, না বললে রায়বংশের মুক্তি নেই। খবরটা জেনেছিলাম জাহাজে উঠে। জাহাজে উঠে হঠাৎ দেখা হল একটি মহিলার সঙ্গে। আমি জাহাজে যখন উঠলাম তখন মহিলাটি ডেকের উপর দাঁড়িয়েছিলেন অন্যমনস্ক ভাবে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। পোশাক দিয়ে বোঝা গেল ভারতবর্ষের মেয়ে ; তার কিছুটা পরিচয় চুলে এবং চোখে আছে ; নইলে রঙ দেখে ধরা যায় না। সাদা পাড়হীন শাড়ী এবং ব্লাউস দেখা যাচ্ছিল বোতাম খোলা ওভারকোটের ফাঁক দিয়ে। বয়স হয়েছে, বয়স চেহারাকে খানিকটা ভারী করে। আমার মনে হল যেন চেনা মুখ। একদিন পর তিনি নিজেই এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে চেনা দিলেন—পরিচয় ঝালিয়ে নিলেন। এবং হারা রে'র কথা তিনিই বললেন।

ইনি অন্য কেউ নয় সুলতা, ইনি সেই 'চন্দ্রিকা'। যাই তিনি করে থাকুন, পরিচয় তাঁর যাই হোক, তিনি আমার মাতৃতুল্যা। প্রথমটা জাহাজে তাঁকে দেখে আমি খুশি হই নি, সন্তুষ্ট হই নি। শুধু ভেবেছিলাম আমার ভাগ্যের কথা। আমি তাঁকে চিনতেও চাই নি কিন্তু তিনি আমাকে চিনলেন। আমি চিনি না বলতে পারলাম না। দেখলাম যেন তিনি

অনেকটা পাল্টে গেছেন। তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে জীবনে নিস্পৃহ এবং উদাসীনা হয়ে উঠেছেন। বাবার মৃত্যুর পর একবার মাত্র দেশে গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে বাবার কিছু কাগজপত্র মাকে দিয়ে এসেছিলেন। মা আমার সে ধাক্কা সহ্য করতে পারেন নি। তাতেই তিনি মারা গিছলেন। মা'র মৃত্যুখবর কলকাতাতেই পেয়েছিলেন তিনি কিন্তু এরপর আর তিনি ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। এবং ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এ-দেশে। আবার এতকাল এদেশে কাটিয়ে এবার ইণ্ডিয়ায় ফিরছেন। বহুদিন থেকেই ফিরবেন ইচ্ছা ছিল, এবার এই যুদ্ধ লেগেছে বলে ফিরবার একটা তাগিদ পেয়ে গেছেন।

* * *

তিনি হারা রায়কে চিনতেন। জাহাজে তখন সর্বদাই সবার মনে একটা আতঙ্ক ছাই-চাপা আগুনের মধ্যে চাপা রয়েছে। একটা উত্তাপ অহরহ অনুভব করে। তাই প্রতিটি যাত্রীই সঙ্গী বন্ধু খুঁজে ফেরে, সামান্য অন্তরঙ্গতায় মানুষকে আপনজন ভাবতে চায়। জার্মান ইউ বোট তখন বাহির দরিয়ায় বেরিয়ে পড়েছে হাঙরের মত, তবে তার গতিবিধি তখনও উত্তর মাথায় নরওয়ে সুইডেনের উপকূল এবং উত্তর সমুদ্র হয়ে আটলান্টিকের দিকে। একদিকে ফ্রান্স, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডকে রেখে নিচের দিকে তখনও নামে নি। এই অবস্থায় চন্দ্রিকা মালহোত্রা আমার কাছে আসতেন, আমাকে মাই সন বলে ডাকতেন—আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি।

শুধুই বসে পৃথিবীর অবস্থা নিয়ে কথা হ'ত প্রথম প্রথম। এরই ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে আমার বাড়ীর কথা আমার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করতেন।

একদিন প্রশ্ন করলেন—ইউ হ্যাভ নট ম্যারেড?

বললাম—না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এইবার বিয়ে কর!

বললাম—না।

বললেন—কেন?

উত্তর দিতে গিয়েও দিলাম না, দিতে পারলাম না যে বাবা তাঁর শেষ চিঠিতে বলে গেছেন—যেন আমি বিয়ে না করি।

একদিন বললেন—তুমি এতে ভেসে যাবে না?

বললাম—না। তা মনে করি না। এখনও অন্তত যাই নি।

—মনে কর না? খুব ভাল। এই জোর যেন শেষ পর্যন্ত রেখো। একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখ, তোমার বাবাকে আমি ইচ্ছে করেই টেনেছিলাম—আমিই অপরাধিনী। তিনি ঠিক ছিলেন না। আই ওয়াজ দি ম্যাগনেট। প্রথমটা কষ্ট পেয়েছিলাম আকর্ষণ করতে। কিন্তু একবার যখন তিনি আমার আকর্ষণে সংসার থেকে ছিঁড়ে বের হলেন তখন সে যেন শুটিং স্টার। তাকে ধ'রে রাখা যায় না—গেল না!

চুপ ক'রে রইলাম।

তিনি এইবার বললেন—তোমার বাবার কাছে তোমাদের বংশের গল্প শুনেছি কিছু কিছু। বলতেন—একটা কি অভিশাপ আছে তোমাদের বংশে। আমি বিশ্বাস করি নি—হেসেছি। পৃথিবীতে ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান এদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ নেচার'স ল। একটি পুরুষ একটি নারীকে দেখলেই হি উইল শো হিমসেল্ফ অ্যাণ্ড সি উইল ট্রাই নট টু লুক এ্যাট হিম, বাট সি উইল লুক এ্যাট হিম। তার উপর যেখানে পুরুষের হাতে সম্পদ জমা হয়েছে সেখানে সে জিততে না পারলে কিনবে। কিন্তু তার থেকেও তোমাদের মধ্যে কিছু বেশী আছে। তোমাদের আর একজনকে দেখেছি আমি ইংল্যাণ্ডে। তাকে দেখলে আমার ভয় হয়। একজন বড় পণ্ডিত এবং আশ্চর্য হিপনটিক পাওয়ারের অধিকারী। সম্ভবত সম্পর্কে তোমার খুড়ো—

—আর ইউ স্পীকিং অব হারা রে?

সবিস্ময়ে চন্দ্রিকা বললেন—তুমি জান তাকে? দেখেছ?

বললাম—দেখেছি।

—কতটুকু দেখেছ? কতটুকু জেনেছ? গ্লাস-কেসের মধ্যে কিং কোব্রা দেখা এক কথা সুরেশ্বর, আর মনের মধ্যে তাকে খোলা অবস্থায় দেখা আর এক কথা। তুমি তাকে গ্লাস-কেসের মধ্যে দেখেছ। হয়তো বা তোমার সত্য পরিচয় না জেনে তোমার কাছে তার সেই বহুবার পুনরাবৃত্তি করা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। বলেছিল—হাজার বছর আগে তার পূর্বপুরুষেরা রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ছিলেন।

বিষণ্ণ হেসে বললাম—হ্যাঁ। বলতে এতটুকু বাধল না।

—বাধে না। ওই পরিচয়টাকে সত্য করে তুলেছে হারা রে। লোকে মিথ্যে জেনেও আবার ওটাকে সত্য বলে মানতে চেষ্টা করছে। তারপর হয়তো উপনিষদের শ্লোক শুনিয়েছে, গীতা শুনিয়েছে—ইয়োরোপীয়ান ফিলজফিতেও পণ্ডিত হারা রে। কিন্তু সে তার পরিচয়ের কতটুকু? বারতিনেক সে জেল খেটেছে—

এবার আমি বললাম—আণ্ট চন্দ্রিকা, মিস মালহোত্রাকে এই নতুন করে পরিচয় হয়ে আণ্ট বলতাম, মিস্ মালহোত্রা বলতে কেমন লাগত; বললাম—আণ্ট চন্দ্রিকা, সে তার মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, যার নাম বলে লরা নাইট; কিন্তু যার আসল নাম শম্পা রায়।

চমকে উঠলেন আণ্ট চন্দ্রিকা। বললেন—দেখেছ তুমি তাকে?

—দেখেছি। তার মুখের মধ্যে রায়বংশের মুখের আদল দেখেছি। একটু চুপ ক'রে থেকে চন্দ্রিকা দেবী আবার বললেন—ওটা তুমি ভুল দেখেছ। অথচ আদল যদি সত্য হয় তবে সেটা এ্যাকসিডেণ্টাল। কিন্তু ট্রুথটা আরও ভয়ঙ্কর।

স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম উত্তরের অপেক্ষায়। চন্দ্রিকা দেবী বললেন—তুমি জান কিনা জানি না—এক সময় এক অ্যাকট্রেসের সঙ্গে অবৈধ প্রেম করেছিল হারা রে এবং তার জন্য জেলে গিয়েছিল।

বললাম—জানি।

চন্দ্রিকা বললেন—লরা নাইটই মেয়েটার আসল নাম। ওকে কোলে নিয়েই ওর মা সত্যবিধবা অবস্থায় হারা রে-র দৃষ্টিতে পড়েছিল এবং প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু—

—কি কিন্তু—?

—মেয়েটার নাম ছেলেবেলায় হারা রে-ই পাল্টে দিয়েছিল। বলত—শম্পা। তারপর এখন লোকে বলে—সে তার মিসট্রেস?

চমকে উঠেছিলাম শুনে।—বলছ কি তুমি?

—সত্য বলছি। ওকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও তোমার কে? কি নাম ওর? লরা নাইট না শম্পা রায়? শয়তানের হাসি হেসে হারা রে বলেছিল—"যা তোমার মনে হবে তাই। তাই মনে করতে পার। অথবা বলতে পার both—আমার ঔরসে ওর জন্ম নয়, কিন্তু তার থেকে বেশী ওকে মেয়ের মতই মানুষ করেছি এক সময়। কিন্তু তাতে কি? পৃথিবীতে প্রকৃতি আর পুরুষ ছাড়া কিছু নেই। ম্যান এ্যাণ্ড উয়োম্যান—ইটারনাল হি এ্যাণ্ড সী; সুরেশ্বর আমি ওকে কটু কথা বলে ধমকাতে চেষ্টা করেছিলাম, হারা রে শয়তানের মত হা-হা ক'রে হেসে বলেছিল—তুমি—তুমি বুঝতে পারবে না! বুঝবে না তুমি। রাজাদের ইতিহাসে এ তুমি পাবে, তান্ত্রিকদের তন্ত্রে এর বিধান আছে। আর যদি তুমি মিথ্যে সমাজ-শাস্ত্রের গণ্ডী পার হতে পার তবে বুঝতে পারবে, এসব মিথ্যে সব মিথ্যে। আমি তান্ত্রিকের বংশ, আমি ভূমির অধিকারীর ছেলে—আই ক্যারি রয়াল এ্যাণ্ড তান্ত্রিক সাধকস ব্লাড ইন মাই ভেন্‌স।" মিস মালহোত্রা বলে যাচ্ছিলেন—আমি শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

মানুষের ইতিহাস একদিকে যত আলোকোজ্জ্বল অন্যদিকে তত অন্ধকার; গাঢ়তম চরমতম অন্ধকার, এ নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু তবু মানুষ ওই আলোকোজ্জ্বল দিকটার দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছে, সেইটেকেই সে স্বীকার করে। হারা রায়ের মত অন্ধকারকে—।

মনে আছে সুলতা—হারা রায়কে অভিসম্পাত দিতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম; মনে পড়ে গিয়েছিল শ্যামাকান্তকে। ভবানী দেবী রায়বংশে বধূ হয়ে এসেও শ্যামাকান্তের তামস তপস্যার ধারাকে বিশুদ্ধ করতে পারেন নি।

সুলতা, নিজের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মে গেল। রাত্রে জাহাজে শুয়ে চোখ বুজলেই ওই অন্ধকার আমাকে চেপে ধরত। আমি ভয় পেতাম।

ডেকে মেয়েদের দেখতাম। জাহাজটায় ভারতীয় যাত্রীর ভিড় বেশী; বেশ কয়েকজন মহিলা যাত্রীও ছিলেন। নির্বিঘ্নে সুয়েজ পার হবার পর থেকেই সকলের উল্লাসই বেড়ে গেল। মেয়েদের বেশী। বিলেত থেকে নতুন জাত নিয়ে ফিরছেন তাঁরা। বিলেতের মুক্ত হাওয়ার দমকায় তাঁদের মাথার ঘোমটাই শুধু খসে নি, তাঁরা বেশবাসকে বেশ খানিকটা অসম্বৃত করে উতলা সমুদ্রবাতাসে নতুন যুগের ধ্বজার মত উড়িয়ে ফিরছেন।

আমি ভয়ে কারুর সঙ্গে মিশি নি। মিশতে চাই নি। কেবিনের মধ্যে রঙ তুলি নিয়ে বসে থাকতাম। ছবি আঁকার মধ্যে মগ্ন হতে চাইতাম। কিন্তু ছবি আঁকতে গেলেই মেয়ের মুখ তুলির মুখে ফুটে উঠত।

আমি ভয় পেলাম সুলতা। মনে হল আমার, আর বোধ হয় রায়বংশের বাঁচবার অধিকারই নেই।

দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝতে পারলাম একটা সত্য। শ্যামাকান্ত ধর্মসাধনায় যেখানে পৌছুতে চেয়েছিল পৌছেছিল, সোমেশ্বর রায় সম্পদের জোরেও সেখানে পৌছেছিলেন, আধুনিক শিক্ষাকে আয়ত্ত করে হারা রেও সেইখানে পৌছেছেন। ব্রজদা তোষামুদি শিল্প আয়ত্ত করেও সেইখানে পৌঁছুতে চেয়েছিলেন। আমিও ঠিক সেই পথে চলেছি, আমার ছবিতে ফুটে উঠছে নারীর মুখ।

বম্বেতে নেমেছিলাম অত্যন্ত ভীত হয়ে। মনে হয়েছিল মানুষের বংশলতার মধ্যে রায়বংশ সেই প্রথম পুরুষ থেকে এ পর্যন্ত যে পথে হেঁটেছে তাতে তার আর বাঁচবার অধিকার নেই। তাতে ছেদ টানতে হবে। অথবা এই হারা রে'র সত্যকে এবং শ্যামাকান্তের সত্যকে সাহস করে আঁকড়ে ধরে উঁচু গলায় বলতে হবে—"এই সত্যই শ্রেষ্ঠ সত্য বাকী সবই ভ্রান্তি। মায়া। মিথ্যা।"

কিন্তু তা পারি নি। আমার কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে স্বর বের হয় নি, আমার জিভ বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে গিয়েও উচ্চারণ করতে পারে নি। আমার মনে পড়ত শ্যামাকান্তের সেই আর্তনাদের কথা। নিজেই নিজের গলা টিপে শ্যামাকান্ত বলত, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। বলতে দে! বলতে দে।

* * *

বম্বেতে নেমে মনে হল, কেন এলাম ফিরে?

ইউরোপে যুদ্ধ বেধেছে। হিটলারের বাহিনীর ব্লিৎস ক্রিগের সামনে সমস্ত বাধা ঝড়ের মুখে ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে। ওদিকে পোল্যাণ্ড থেকে বল্কান—এদিকে ফ্রান্স থেকে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া পর্যন্ত জ্বলছে। ইংল্যাণ্ডকে মাশুল দিতে হবে। থাকলেই ভাল হ'ত। যেতাম ধুলো হয়ে উড়ে। ইংরেজের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের প্রসাদপুষ্ট বংশের সন্তান, যুদ্ধেও তো লেগে যেতে পারতাম। বিলেতে অনেক ইংরেজীনবিশ বিলিতি সভ্যতামুগ্ধ ভারত-সন্তান যুদ্ধে যোগ দেবার জল্পনা-কল্পনা করছে, তা শুনে এসেছিলাম। আমি তো দু'দিক থেকেই যোগ্য। আমি সত্যাগ্রহকে বিদায় জানিয়ে সকল আগ্রহকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি, আমার তো স্থান ছিল ওখানেই।

নিজেকে তিরস্কার করেছিলাম সুলতা। এ তুমি ভীরুর মত করলে কি?

বাঁধন-কাটা জীবনের সঙ্গে সুতোকাটা ঘুড়ির কোন তফাৎ নেই। এখান থেকে একটা বাতাসের তোড়ের মুখে গিয়েছিলাম বিলেতের আকাশে, আবার উল্টো বাতাসে ফিরে এলাম ভারতবর্ষে। এসে একটা হোটেলে বসে ভাবতে লাগলাম বাকী জীবনটা কাটাব কি করে?

কাটা ঘুড়ির সঙ্গে যে সুতোটুকু থাকে তা মধ্যে মধ্যে গাছের ডালে, টেলিগ্রাফের তারে আটকে ঘুড়িটাকে বাতাসের ঝাপটা খেতে দেখেছ, তেমনি মনের অবস্থা।

চন্দ্রিকা মালহোত্রার যাবার কথা দিল্লী। উনি বলেছিলেন কোন একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে তিনি নেবেন এবং তার উপর নির্ভর করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। সেও যদি

ভাল না লাগে তবে ক্রিশ্চানমিশনে মানুষের সেবার কাজ নিয়ে কাটিয়ে দেবেন। বম্বেতে নেমে আমার মনের অবস্থা দেখে উনি আমাকে ফেলে দিল্লী রওনা হতে পারলেন না। যে হোটেলে আমি ছিলাম সেই হোটেলে থেকে গেলেন। আমার মনের অবস্থা উনি অনুমান করেছিলেন, আমার মদ খাওয়া দেখে।

বম্বেতে হোটেলে একটা দিন অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে সম্ভবতঃ আক্রোশবশেই মদ বেশী পরিমাণে খাচ্ছিলাম। রায়বংশের যে জীবনধারা আমাকে কীর্তিহাট থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে ইংল্যাণ্ড, আবার ইংল্যাণ্ড থেকে বম্বেতে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে, যার ভয়ে আমি আতঙ্ক দেখি ; মায়ের মরা মুখ ভেসে ওঠে, সেই জীবনধারার জন্যেই যেন আমি পাগল হয়ে উঠছিলাম। আমি জমিদার, রায়বংশের শেষ জমিদার সন্তানের মতই জীবন-যাপন করব। কেন করব না ? আমার অনেক সম্পদ জমে আছে। আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে এসেছি বিলেতে। দেশে ব্যাঙ্কে এখনও লক্ষাধিক টাকা আমার মজুত আছে। আমার বিষয় আছে, কলকাতার বাড়ী আছে। যার মূল্য পাঁচ-ছয় লক্ষের উপর।

লক্ষই হোক আর কোটিই হোক, খরচ ক'রে ফেলতে কতক্ষণ ? তবে খরচ করতে হলে ওই জমিদার বা রাজার ছেলের মত বাঁচতে হবে। ওই বাঁচার মধ্যেই খরচের পথ আছে। এক কথায় দান ক'রে দেওয়া যায়, সেটা আরও সোজা, কিন্তু হিসেবে সোজা হ'লেও কাজে কঠিন। ঠিক করে ফেললাম ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াব, রায়বংশের ছেলের মতই ঘুরে বেড়াব। ভাঙা প্রাসাদ, পুরোনো কেল্লা, বিরাট মন্দির, মসজিদ, গুহার অভ্যন্তর দেখে বেড়াব আর তার সঙ্গে নারী আর সুরা। তারপর সর্বস্বান্ত হয়ে লিভার পাকিয়ে মরব ; কেউ জানবে না পরিচয় ; মুদ্দোফরাসে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে ফেলে দেবে। অথবা দেহটাকে চ্যারিটি করে যাব, লিখে রেখে যাব কোন মেডিকেল কলেজে দিয়ে দিতে। সেইটে হবে আমার লাস্ট উইল। এর থেকে ভাল উইল আর অধিকতর নাটকীয় উইল আর কি হতে পারে একজন রায়বংশের সন্তানের পক্ষে বল ?

সে-কাল হ'লে দেহটা দিয়ে যেতাম বিক্রমাদিত্যের মত কোন রাজাকে। বলে যেতাম —মহারাজ এই দেহটা তুমি নিয়ো, চিতায় পুড়িয়ো না, জলে ভাসিয়ে দিয়ো না, কবর দিয়ো না, বুকে বসে তান্ত্রিক তপস্যা করো, তোমার সামনে সাক্ষাৎ পরমাপ্রকৃতি আসবেন। তুমি তার কাছে চেয়ে নিয়ো তোমার ইচ্ছামত বর। কোন্ বর ? অনন্তকাল পরমায়ু, অমরত্ব ? না, তা নিয়ো না।

তবে কি নেবে ? কোন্ বর নেবে ?

শ্যামাকান্ত শেষ পর্যন্ত মা বলে মুক্তি চেয়েছিল। হেরে গিয়েছিল। নিজে মুক্তি নিয়ে বংশের মধ্যে নিজের কামনা রেখে গেছে। সেই কামনা পূর্ণ হবার বর—।

সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠতাম। পারতাম না ওই বর চাইবার কথা উচ্চারণ করতে।

* * *

এতটুকু বাড়িয়ে বলি নি সুলতা।

সমস্ত কথা যথাযথ ভাবে সাজিয়ে পরের পর বলবার মত ক'রে মনে নেই। কারণ সে

সময় প্রায় একটা বছর আমি প্রায় দিনরাত্রি মদ খেয়েছি। ইচ্ছে করেই মদ খেয়েছি তাদের মত ক'রে যারা মদ খেয়ে মরবে বলে সঙ্কল্প ক'রে মদ খায়।

বিষ খেয়ে মরায় খেদ আছে কষ্ট আছে, সব থেকে বেশী আছে গ্লানিকর অপবাদ। কেউ বিষ খেয়ে মরলেই লোকে সন্দেহ করে, জল্পনা-কল্পনা করে যে নিশ্চয় লোকটা কারুর কাছে মর্মান্তিকভাবে আহত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে; অথবা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে, যার জন্য সারা সমাজ এবং গভর্নমেণ্ট তার বিরোধী হয়ে তাকে সাজা দেবে। সেই সব গ্লানি থেকে এড়াবার জন্য বিষ খেয়েছে।

তার থেকে মদ খেয়ে মরা ভাল। মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এক ধরনের পাগল উল্লাস আছে, যা বিস্মিত করে দেয় সাধারণ মানুষের ঘৃণাকে, হতবাক করে দেয় কটু অপমানকর বাক্যকে।

মোট কথা কীর্তিহাটে গিয়ে রায়বংশের পূর্ণ পরিচয় জেনে এবং পরিণাম দেখে পরিত্রাণ পাবার জন্য এদেশ থেকে পালিয়েছিলাম ইংল্যাণ্ড। কিন্তু সেখানে গিয়েও পেলাম না, রায়বংশের সম্পদলক্ষ্মী হারা রে-কে কলঙ্কের বোঝা সমেত ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। হারা রে আজ একা নয়, ওই মেয়েটি তার কে তা জানিনে, তাকে নিয়ে নির্লজ্জ ভাবে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে এবং ব্যাধির বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সেখান থেকে পালিয়ে এসে এবার আমি ওই ধারাতেই বাঁচতে চাচ্ছি। যে কটা দিন বাঁচব, সে কটা দিন ওই ট্র্যাডিশন রেখে বাঁচাই ভাল।

পুরাণে ইন্দ্রপতনের কথা আছে।

রায়বংশের ছেলে মাত্রেই ইন্দ্র। তারা পড়লে যদি ইন্দ্রপতনের মহিমা দুনিয়াকে চমকে না দেয় তো মরেও যে শান্তি পাব না। এবং সে মৃত্যুতে যে চরম লজ্জা।

ইন্দ্রেরা বিলাসের ব্যভিচারের জন্য চিরকাল মুনিঋষির অভিশাপ মাথায় নিয়েছে।

বম্বে থেকে পনেরো দিন পর মন ঠিক করে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু মিস মালহোত্রা বাধা দিলেন। না, মাই সন, এ তুমি করো না।

বললাম—না, এ ছাড়া আমার আর পথ নেই।

—কিন্তু এ পথ তো তোমার নয়! হলে তুমি হারা রে'র ভয়ে পালিয়ে আসতে না। হারা রে মেয়েদের কাছে ডেঞ্জারাস, হয়তো যারা তাকে জানে না, চেনে না, তাদের কাছে ভয়ঙ্কর কিন্তু তোমার কি ভয় ছিল তার কাছে? কিছু না। ইংল্যাণ্ডে অনায়াসে তাকে এ্যাভয়েড করে আপন সুখের পথে চলতে পারতে। চল ফিরে চল, আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব। আমার তোমাদের কীর্তিহাট দেখা হয়ে যাবে। তোমার বাবা আমার কাছে তোমাদের কীর্তিহাটের গল্প করতেন। কীর্তিহাট আমার কাছে ড্রীমল্যাণ্ড হয়ে আছে আজও পর্যন্ত। একটা মহলের কথা বলতেন 'বিবিমহল'। ওয়াণ্ডারফুল নাম। জাস্ট লাইক দি মুঘলস রঙমহল। চল।

কিন্তু তা আমি শুনি নি। বলেছিলাম, আমাকে তুমি মাফ কর। আমি স্থির করে ফেলেছি। এবং 'আই ডিকায় উইথ ইউ, এই-ই আমার পথ। একমাত্র পথ। জমিদারের

ছেলে আমি, আমাকে জমিদারের ছেলের মতই বাঁচতে হবে, য'দিন বাঁচব এবং মরতে হলেও জমিদারের ছেলের মত মরতে হবে এবং তাই মরব।

—কিন্তু গৌতম-বুদ্ধ কি রাজার ছেলে ছিলেন না? তিনি কি রাজ্য ছেড়ে, সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে—

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলেছিলাম—না, ওই একটা-ছুটো ইতিহাসের নাম আমার কাছে অনুগ্রহ করে করো না। বুদ্ধ গৌতম একটা, হয়তো বা ইতিহাসে নাম ওঠে নি এমন সন্ন্যেসী হয়ে যাওয়া রাজা-জমিদারের ছেলে আরও একশো-ছুশোও ছিল বা আছে। কিন্তু ওদের উল্টো মানুষের সংখ্যা কোটি দরুনে। আড়াই হাজার বছরে অনেক কোটি। প্লিজ লিভ মি। তুমি তোমার পথে যাও। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।

পরের দিনই আমি মিস মালহোত্রাকে এড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অজন্তা গুহা দেখব এবং সেখান থেকে হায়দ্রাবাদ।

নিজামের হায়দ্রাবাদ।

হায়দ্রাবাদ নিজাম হারেমে ক্ষুধিত পাষাণের সুন্দরীরা জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হায়দ্রাবাদের চৌক-বাজারে রূপের হাটের জৌলুষে প্রদীপ আপনি জ্বলে ওঠে; সেখানকার গান-বাজনা-নাচের আসরে সেতারের তার আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায় না, তবলার বোলে ভুল হয় না, গানের তাল কাটে না।

১৯৪০ সাল সুদ্ধ'। আমার বয়স তখন তিরিশ। বিলেতে এক বছর থেকে ফিরেছি। আমার নিজের রূপের জলুষ তখন কম ছিল না। বম্বেতে নতুন করে সব সরঞ্জাম কিনে নিলাম। কল্পনা ছিল সারাজীবনের সরঞ্জাম যোগাড় করে নিচ্ছি।

রঙ, তুলি, ইজেল ক্যানভাস কিনলাম নতুন করে। শুনে হয়তো তোমার মনে হচ্ছে যে, অজন্তায় গিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত ফ্রেস্কোগুলোর নকল করব; কিন্তু না। ওসব তো অনেকে করেছেন। স্বয়ং নন্দলাল বসু করেছেন, অসিত হালদার মশাই করেছেন, আরও অনেকে করেছেন। আমি ওর জন্য এসব সরঞ্জাম কিনি নি। ওসব আমি কিনেছিলাম, অপরূপ রূপসী অবশ্যই দেখতে পাব, তাদের ছবি আঁকব বলে।

আর কিনেছিলাম একটা দামী বেহালা, আর বাঁশের বাঁশী। বাজাব। গান-বাজনার আসরে তেমন গান শুনলে আমি বাজিয়ে সঙ্গত করব।

সুরেশ্বর বললে—সংসারে মানুষের জীবনে কার্যকারণেই হোক বা ভবিতব্যের বিধানেই হোক, যা ঘটবার তার বিপরীত কিছু ঘটানো যায় না। সংকল্প করেও তা ঘটাতে পারে না মানুষ। দু-এক ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তিশালী মানুষ সংকল্প করে ঘটনার গতিরোধ করে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দাম দাঁড়ায় যৎসামান্য।

আমি সংকল্প করেছিলাম—নিজেকে আমি ভাসিয়ে দেব না রায়বংশের বড় বড় পুরুষগুলির জীবন যে খাতে প্রবল স্রোতে বয়ে গেছে সেই খাতে সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেব; কোন খালেবিলে বা পঙ্কপল্বলের মধ্যে হারিয়ে যাব।

হারা রায় এবং শম্পা রায়ের বিবরণ আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল এবং মিথ্যে কথা বলব

না, জীবনে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেও যে তীব্র কামনায় উন্মাদের মত রাবণ সীতাকে হরণ করেছে, শিব মোহিনীর পিছনে ত্রিভুবন ছুটেছে সে কামনা আমি অনুভব করি নি। ইংল্যাণ্ডে শম্পা রায়কে দেখে আমার জীবনকামনা ভীত হল—আমাকে বললে, "ভীত হও তুমি। নত হও তুমি।"

বম্বেতে এসে কয়েক দিন মদ খেলাম, আর রায়বংশের হিসেবনিকেশ করলাম। এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, তুমিই বা এমন পঙ্গুর মত বা ওয়ারেন্টের আসামীর মত এমন ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? দোহাই তোমার, ছিঁচকে চোর তুমি হয়ো না, দুর্ধর্ষ গুণ্ডা হও। পিতৃপুরুষের পথ ছাড়া তোমার পথ নেই, আর সে পথে পায়ে হেঁটে কোন কিছুর আড়াল দিয়ে চলবার উপায় নেই, ওপথে রাবণের পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটতে হবে—অথবা রথে চড়ে ছুটতে হবে।—তাই ছোটো।

রঙ-তুলি বেহালা বাঁশী কিনে বম্বে থেকে এলাম হায়দ্রাবাদ। জাঁকজমক করে হায়দ্রাবাদের বড় হোটেলে উঠলাম। হোটেলেই ভালমন্দ সকল পথের পথিকদের পথ দেখাবার জন্যে পথের দিশারী আছে। তাদের বকশিশ দিলাম। সেলাম নিলাম। সব আয়োজনই করলাম কিন্তু ভেসে যেতে পারলাম না, রায়বংশের জীবনস্রোত আমাকে ওই খাতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না—আরও একটা খাত বেয়ে গিয়েছিল, কীর্তিনাশা পদ্মার প্রবল স্রোতকে পাশে রেখে ভাগীরথীর ধারার মত সেই খাতে আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

ভাগীরথী আর কীর্তিনাশা নাম দুটো ব্যবহার করছি বলে ভেবো না নিজেকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করছি, রায়বংশের মুক্তিদাতা উত্তরপুরুষ বানাচ্ছি নিজেকে। না, তা বানাচ্ছি না। ভাগীরথীর বদলে 'হুগলী নদী' বলব বা বলছি তা'হলে।

আমি পারলাম না ভেসে যেতে; ওই উদ্দাম জীবনস্রোত যেন ব্যঙ্গ করে ঢেউয়ের ধাক্কায় ক্ষীণস্রোতা পাশের ছোট শাখাটার মুখের দিকেই ঠেলে দিলে।

একটু থামলে সুরেশ্বর, তারপর বললে—তা ছাড়া সুলতা, তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা, তুমি একথা নিশ্চয় মানো যে, মানুষের জীবনের গতি এবং তার পরিণতি শুধু তার ব্যক্তিগত এবং বংশগত ভাগ্যলিপি বা কর্মচক্রেই চলে না; কালের একটা হাওয়া আছে মহিমা আছে। সেটা চিরকাল আছে। ভাগীরথী যেদিন এসেছিলেন এবং সমুদ্রে মিশেছিলেন, সেদিন শুধু অভিশপ্ত সগর-সন্তানেরাই উদ্ধার হয় নি—আরও বহু বহু হয়তো কোটি কোটি পতিত আত্মা উদ্ধার পেয়ে গিয়েছিল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার জলের মহিমায়। কালের মহিমা বা হাওয়াও সাহায্য করেছিল।

কালটা ১২৪০ সাল, মার্চ মাস। ইয়োরোপে পোল্যাণ্ডের করিডোর নিয়ে শুরু যে যুদ্ধ তা ধীরে ধীরে ক'মাসে গোটা পোল্যাণ্ডের উপর ভারী রোলারের মত গড়িয়ে চলে এবার দ্রুতবেগে চলতে শুরু করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া অর্ধেক পোল্যাণ্ডের ভাগ নিয়ে ওদিকে ফিনল্যাণ্ড নিয়েছে। এদিকে জার্মানী নরওয়ে দখল করে ফ্রান্সে ঢুকে, ব্লিৎসক্রিগ চালিয়ে ফরাসী এবং ইংরেজ বাহিনীকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে। ব্রেনার গিরিবর্তে হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেছেন।

সারা ভারতবর্ষ থমথম করছে। প্রতীক্ষা করছে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কোন্ নির্দেশ দেবেন মানুষকে। অন্যদিকে ভারতবর্ষ প্রতীক্ষা করছে সুভাষচন্দ্র কি বলবেন! কংগ্রেসের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতারা কি বলবেন! কি নির্দেশ আসবে! যে নির্দেশ যিনি দিন, সে নির্দেশ মারবার এবং মরবার হুকুমের চেয়ে কম হলে বুক ভরবে না কারুর। সে সামান্য নিরক্ষর জনেরও না।

সুলতা, এমন সময় যখন আসে তখন এমন একটা হাওয়া বয়—যেটা বৈশাখী দুপুরের হাওয়ার মত আগুনকে দ্বিগুণ করে জ্বালিয়ে তোলে। সে সময়ে সর্বনাশের নেশা লাগে বটে কিন্তু সুরা আর নারী নিয়ে ব্যভিচারের নেশা নয়। সে নেশা ঠিক তার উল্টো নেশা।

হায়দ্রাবাদের একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা শিলালিপির মত অক্ষয় হয়ে আছে বুকে। সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ রামগড়ে আপোসবিরোধী সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই বক্তৃতার কাগজ মদের গ্লাস হাতে করে পাশে সরিয়ে দিয়েছি কিন্তু আশ্চর্য, নেশা জমে নি এবং কখন যে গ্লাসটা নামিয়ে কাগজখানা টেনে নিয়েছি তা খেয়াল করি নি।

ঘণ্টা দুয়েক বসেছিলাম এইভাবে।

কালটাই ছিল সুরা ও নারীর নেশা ছাড়বার ছুটবার কাল; নেশা করব বলে সংকল্প করলেও সে সংকল্প রাখতে পারি নি। তাছাড়া আরও এক ধরনের মানসিক বিভ্রান্তি ঘটত, সেটাও আমার এই জবানবন্দীর মধ্যে বলে যাই।

সেটা শুধু আমার জীবনের সত্যই নয়, গোটা রায়-বংশেরই জীবনসত্য সেটা। মদের নেশার ঘোর বাড়লেই চোখে কেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটত।

সেদিন হায়দ্রাবাদের হোটেলে নিজেকে সবে প্রস্তুত করে নিচ্ছি; প্রস্তুত অর্থে সুলতা মদের নেশাটাকে বেশ প্রখর করে তুলে মনে মনে ভাবছি রায়বংশের ধুরন্ধর রায়দের কথা; কুড়ারাম রায় ভটচাজের বৈষ্ণবীর কথা, সোমেশ্বরের সেই মনোহারিণী ব্রাহ্মণকন্যার কথা, শ্যামাকান্তকে বর্ষার কাঁসাইয়ে ফেলে দিয়ে যাকে তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন, বিকৃতমস্তিষ্কা কামার্তা মেয়েটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরত। বিশদ বিবরণ থাক, সবই জান, মোট কথা রায়বংশের রুচি ও রীতিগুলোকে স্মরণ করে নিজেও ওই ছাঁচে নিজেকে ফেলব বলে তৈরী হচ্ছি—এমন সময় হোটেলের দালাল এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়াল। বললাম—কি খবর?

সে দুটি বাঈকে নিয়ে এসেছে; অর্থাৎ দেখাতে এনেছে। এরাই নাকি হায়দ্রাবাদের রূপের হাটের সব থেকে সেরা রূপসী পসারিণী, এবং রূপের হাটে রূপ ছাড়া যে গুণের প্রয়োজন সেই গুণের অধিকারিণী—নাচা-গানায় অদ্বিতীয়া; দালাল বললে—ই দোনোকে জুড়ী বাঈ তামাম হায়দ্রাবাদমে নেহি মিলেগী। বললে—ওরা বাইরে বসে আছে, ডাকব ভিতরে?

কেমন সংকোচ বোধ করলাম। মোট কথা, ব্রজদার শেফালির পাড়ায় যে সংকোচ অনুভব করেছিলাম, সেই সংকোচ আড়ষ্ট করলে আমাকে। ব্রজদার শেফালির পাড়াতে তবু তো দয়া করুণা উদারতার বাস্কেট মাথায় করে দয়া চাই করুণা চাই হাঁক দিয়ে আড়ষ্টতা কাটিয়েছিলাম, ব্রাভাডো ছিল, এখানে তার কিছুই পেলাম না এবং নার্ভাস হয়ে বললাম—

"না—ডাকতে হবে না"।

—তা হলে ?

—বারান্দায় বসে আছে বলছ ?

—হাঁ হুজুর, যেখানে লোকজন এসে বসে।

আমি বললাম, আমি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে ওদের দেখে আসছি। বুঝেছ ?

সে বললে—আপনি কেন সরম করছেন হুজুর। এখানকার হালই এমনই। ওরা ডাকলে হোটেলে আসে। নাচা-গানা এখানে ভাল হয় না কিন্তু—।

সুরেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বাকীটা তুমি বুঝতে পারছ সে কি বলেছিল! বোধ করি হোটেল-জগৎটাতেই এ-রীতি—সেই অন্ধকার কাল থেকে একাল পর্যন্ত সমগৌরবে এবং কালোপযোগী পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে খোলস বদলে বদলে সমান শ্রদ্ধায় চলে আসছে।

ট্রেড-জগৎ বড় বিচিত্র জগৎ; ট্রেডের মধ্যে অনেস্টি আছে এবং অনেস্টিই হল সব থেকে বড় ক্যাপিট্যাল কিন্তু শুচিবাই এখানে অচল। শুচিবাই চলবে না। অনেস্টির জন্য হোটেলে মেয়েদের আনাগোনা করতে দিতে হয়। না দিয়ে উপায় নেই।

তত্ত্ব আলোচনা থাক। যা ঘটেছিল বলি—আমি তাদের দেখে এলাম। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়ে দুটি পরস্পরকে ইসারা করে হাসাহাসি করতে লাগল। এবং হাস্যের সঙ্গে কিছুটা লাস্য আপনি তাদের সারা অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ল। ভাল লাগল আমার।

মুসলমানী বাঈজী। একজন ফিরোজা; সেই তরুণী এবং অন্যজনের নাম জুলিখা, সে পরিপূর্ণ যুবতী। রবীন্দ্রনাথের 'দে লো সখি দে, পরাইয়ে গলে সাধের বকুল ফুলহার' গানের গায়িকার মত যুবতী। তার মাথার মিহি ওড়নাখানা সত্যই বার বার মাথা থেকে খসে পড়ছিল। বার বার সে তুলে নিচ্ছিল লীলাচ্ছলে। হঠাৎ কোথায় কোন্ ঘর থেকে কলিংবেল বেজে উঠে আমাকে চমকে দিলে; আমি আত্মস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এলাম; দালালটাও আমার পিছন পিছন এল এবং আমার সোফার পাশে দাঁড়িয়ে বললে—আব ফরমাইয়ে বাবুসাব। হুকুম তো হো যায় আপকা।

আমি মদের গ্লাস যেটা ফেলে গিছলাম সেটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললাম—ঠিক হ্যায়। সন্ধ্যার পর যাব, মহ্ফিল হবে।—

—বলুন কাকে চাই!

ভেবে ঠিক করতে পারি নি, রূপ চাই না যৌবন চাই, নাচ চাই না গান চাই—এর তো এক মুহূর্তে মীমাংসা হয় না। যারা মীমাংসা করে নিতে পারে, তারা রূপও চায় না যৌবনও চায় না, গানও চায় না, নাচও চায় না, চায় একটি নারীদেহ। তারাই সংসারে বেশী। সুলতা, আমি বোধ হয় তা নই। রায়বংশে জন্মে যে কেমন করে এমন হয়েছি আমি একথা ভেবে পাইনে। কালের কথা বলেছি, বাবার জীবনের চরমতম ট্র্যাজেডির কথা জান, মায়ের চোখের জল দেখেছি, ধনেশ্বরকাকার দৈত্যের মত ছেলেটার পরিণাম—তাও আমার চোখের

সামনে ঘটল—হয়তো সেই জন্যে এমন আমি। তার উপর আমি আর্টিস্ট—শুধু দেহ নিয়ে আমার মন ভরে না, আমি বোধ হয় রূপ যৌবন গুণ অর্থাৎ নাচগান বিচার করতে চাই। তাই বলেছিলাম—দুজনেই থাকবে মহফিলে। একজন গাইবে, একজন নাচবে।

লোকটা সাবাস সাবাস করে উঠেছিল এবং বড়রকম মক্কেল মনে করে বার বার তসলীম জানিয়েছিল। ফলে রাত্রে ওদের আস্তানায় যে মহফিলের আসর বসেছিল—তাতে জলুষের একটু বাড়াবাড়ি করেছিল। সেটা আমাকে কায়দা করবার জন্য বা গাঁথবার জন্য।

আমার খারাপ লাগে নি।

জীবনে রাজাগিরি, বাদশাগিরি, নেতাগিরি যাই বল না কেন সবই বলতে গেলে 'আবু-হোসেনি' ব্যাপার।

আবুহোসেন নিশ্চয় জান—আরব্য উপন্যাসের গল্প, হারুণ অল রশিদের হুকুমে মসরুর দেউলেপড়া উদার বণিকপুত্রকে রাত্রির মত বাদশা বানিয়ে দিয়েছিল। গিরিশবাবুর একখানা নাটক আছে এই উপাখ্যান নিয়ে। আবুহোসেন সেজেই বসেছিলাম খুশীর সঙ্গে।

গ্রীষ্মকাল। আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের জলো বাতাসের ঝলক তখনও নিজাম রাজ্যে এসে পৌছয় নি; গরমের মেজাজ তখন চড়া কিন্তু মুসলমানী আমীরিয়ানার ব্যবস্থায় আরামের আয়োজনের ঘাটতি ছিল না। সে তোমার গোলাপজলের ঝাঁঝরিওয়ালা পিচকারি, গোলাপ-পাশ, বেলকুঁড়ির মালা, সুবাসিত পান, আতর, ঠাণ্ডাই শরবৎ নিয়ে জাফরীকাটা আলসে-ঘেরা খোলা ছাদের উপর আসর বসেছিল একটি খণ্ড স্বপ্নলোকের মত। তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দান ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান।

বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা বীয়ার এবং দামী হুইস্কি। সারেঙ্গীদার তবলচীরা বসেছে গোঁফে তা দিয়ে, গলায় বেলকুঁড়ির মালা ঝুলিয়ে।

মেয়ে দুটি সেজেগুজে এসে বসল, সঙ্গে সঙ্গে দুটো বড় স্ট্যাণ্ডিং লাইটের সুইচ অন করে দিলে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এত রূপ! বা রূপের এত ঐশ্বর্য! রূপকে এমন অপরূপ করা যায়, যা পুরুষের মনকে মুহূর্তে লালসায় কামনায় স্থান-কালপাত্র সব ভুলিয়ে দিতে পারে!

সঙ্গীতের যন্ত্রের সুর বাঁধা হচ্ছিল। আমি তাকিয়েছিলাম ওই ওদের দিকে। ইংল্যাণ্ডে ঠিক এই ধরনের পরিবেশ হয় নি। এমন করে ওরা সজ্জা করে অপরূপ হয়ে মন ভুলাতে পারে না। অবশ্য হোটেলে নাচ হয়, সেখানে মেয়েরা সেজে আসে। তার মধ্যে তনুদেহের অনাবৃত বিজ্ঞাপন পুরুষকে চঞ্চল করে তোলে। বুকের মধ্যে রক্তধারা বাঁধভাঙা নদীস্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার থেকেও ভারতীয় প্রথা যেন বেশী মোহময়ী।

যুবতী মেয়েটি একেবারে গৃহের গৃহিণীর মতই অতিথিসৎকারে তৎপরা হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে প্রথম পানের খিলি এগিয়ে দিলে, তারপর বোতল থেকে ঢেলে গ্লাস পূর্ণ করে সোডা মিশিয়ে একটি পরাতে করে আমার সামনে ধরে দিয়ে উর্দুতে বললে—খেতে হুকুম হোক রাজাবাবু!

আমি গ্লাসটি নিয়ে বললাম—তোমার নাম জুলেখা!

—আমি হুজুরের বাঁদী।

—তোমরা খাবে না ?

—হুকুম হলে খাব। কিন্তু হুজুরকে নাচা-গানায় খুশী করতে হবে।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাকে দেখছিলাম। গ্লাসটা শেষ করে নামিয়ে দিলাম—তখন গান সবে শুরু হয়েছে। চোখ বুজে শুনতে লাগলাম। ভাল গায় মেয়েটি। সত্যিকারের ভাল গায়।

এরই মধ্যে ঠুং করে শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি গলায় ডাক শুনলাম—বাবুসাব !

চোখ মেলে দেখলাম, তরুণী মেয়েটি গ্লাস ভরে নিয়ে সামনে ধরেছে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিলাম। নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বীরেশ্বর রায়ের কথা। সোফিয়াকে নিয়ে বীরেশ্বর রায় এমনি ভাবেই জানবাজারের বাড়ীতে আসর পাততেন।

মনের মধ্যে যেন একটা আমীরি আমেজ অনুভব করছিলাম। পকেটে হাত দিয়ে আমার টাকার থলিটা নাড়লাম—বকশিশ দেব। গ্লাসটা চুমুক দিয়ে শেষ করে নামিয়ে দিয়ে বললাম—আবার ঢালো !

মেয়েটি ঢালতে লাগল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। মেয়েটি গ্লাসটি আমার হাতে ধরিয়ে দিতেই আমি বললাম, এটা তুমি খাও।

মেয়েটি ফিক করে হাসলে।

তারপর গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে নামিয়ে রেখে আমার সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে ডান হাতখানা আমার সামনে পেতে বললে, টাকা দাও বাবুজী !

আমি একটু বিস্মিত হলাম। চলে যেতে চায় নাকি ?

মেয়েটা বুঝতে পারলে আমার মনের প্রশ্ন। সে বললে—মুজরায়—গানাবাজানার-নাচনার আসরে দারু আমরা খাইনে বাবুসাহেব, দারু খাই মহব্বতির আসরে। আমার সঙ্গে মহব্বতি করতে হলে সে অনেক টাকার কারবার বাবুজী। তবে বকশিশ করলে আমরা কিছু কিছু দারু খাই। প্রথমেই তো কিছু বকশিশ করো।

আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হাতখানা পেতে মেয়েটা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বললে, আমার পাওনা বকশিশ দাও বাবুজী !

মদের নেশার মধ্যে আমি চমকে উঠলাম। আমার মনে পড়ে গেল, আর একজনের কথা, ঠিক এইভাবে সিগারেট টানতে টানতে, আমার সিগারেটের টিন থেকেই সেও সিগারেট নিয়েছিল, বলেছিল—give me my dues.

লরা নাইট ওরফে শম্পা রায়। যাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন রায়বংশের মুখের গড়নের সঙ্গে ছাঁচের সঙ্গে একটা মিল আছে। সেও বলেছিল—give me my dues.

ফিরোজা—ফিরোজা মেয়েটার নাম, সে তখনও বলছিল—দাও বাবুজী, আমার পাওনা বকশিশ দাও !

পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে তাকে দিয়ে নিজেই টেনে নিয়ে-

ছিলাম হুইস্কির বোতলটা এবং একটা নতুন গ্লাস।

পর পর বোধ হয় দু'তিন গ্লাস মদ খেয়েছিলাম। মনের মধ্যে কি যেন একটা আতঙ্কের মত পাক খাচ্ছিল—যেন কত উদ্বেগ বুকে জমা হয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠছিল। মনে পড়ছিল রায়বংশের ইতিহাস। যে ইতিহাস আমি সেটেলমেণ্টের সময় গবেষকের মত পড়েছি-জেনেছি। কুড়ারাম ভটচাজ থেকে যোগেশ্বর রায় আমার বাবা পর্যন্ত সকলকে মনে পড়েছে, মেজকাকু শিবেশ্বর রায় এবং তার ছেলে ব্রজেশ্বর আর সেই দৈত্যটাকে মনে পড়েছে আর ভয় পেয়েছি। ক্রমাগত একটা প্রমত্ত উল্লাস নাচতে নাচতে দু হাতে ডাক দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল আর তার পিছনে পিছনে আসছিল একটা ভয়ঙ্কর ছায়া—সে আসছিল দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে।

এরই মধ্যে আমার মদের নেশার প্রভাবে আমার চোখে কি করে যে ওই তরুণী মেয়েটার চেহারা পাল্টে গেল তা আমি জানি না। কিন্তু বিশ্বাস কর—গেল। একেবারে পাল্টে গেল। ফিরোজার পোশাক ছিল সেদিন চুড়িদার পায়জামার উপর পেশোয়াজ কাঁচুলি ওড়না, নাকে গয়না, কানে গয়না, কপালে টিকলির ধুকধুকি, কষ হয়ে কালো তৈলমসৃণ চুলে জরি জড়ানো লম্বা বেণী; গলায় জড়োয়ার কণ্ঠী। হাতে কঙ্কণ চুড়ি। কিন্তু আমার মনে হল ফিরোজা নয়, এ সেই শম্পা নয়, অবিকল শম্পা নয়—সে কোন থিয়েটারের গ্রীন রুম থেকে পাকা মেকআপ-ম্যানের হাতে হায়দ্রাবাদের নাচওয়ালী সেজে এসেছে।

বার বার মুখের দিকে তাকালাম। কিছুতেই ফিরোজাকে আবিষ্কার করতে পারলাম না। তার এতটুকু সন্ধান মিলল না। শম্পা নয়। অবিকল রায়বাড়ীর ছাঁচের মুখ!

বার বার অস্বীকার করলাম—না, নয় নয় নয়।

স্থিরদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়েই মনের ভ্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম—অস্বীকার করছিলাম, না—নয় নয় নয়

মেয়েটা তখন ওই যুবতী গাইয়ে মেয়ে জুলেখার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছিল।

আমি ডাকলাম—শোন!

সে মুখ ফেরালে—ফরমাইয়ে।

এবার মনে হল, না—শম্পা নয়—সে মেয়েটা মেমসাহেব। এ এ-দেশের মেয়ে, কিন্তু ফিরোজা নয়। মুখে রায়বাড়ীর ছেলেমেয়ের মুখের ছাপ রয়েছে। অবিকল রয়েছে এতটুকু ভুল হয় নি আমার।

মনে হল—অনেকটা অর্চনার মত দেখতে।

হ্যাঁ, অর্চনার মত।

আমি চোখ বন্ধ করে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললাম—আঃ!

ফিরোজা আমার গায়ে হাত দিয়ে বললে—বাবুজী!

আমি চমকে উঠে সাপ দেখে যেমন সরে যায় তেমনি করে সরে গেলাম। সকলে চমকে উঠল। গানের আসর ভেঙে গেল।

—কি হল—বাবুজী—বাবুজী!

—কুছ না। পানি। এক গিলাস পানি—

ঠাণ্ডা জল নিয়ে এগিয়ে এল জুলেখা যুবতী মেয়েটি। আশ্চর্য, জুলেখার মুখের চেহারাও যেন পাল্টে গেছে!

তার মুখেও দেখেছিলাম যেন রায়বাড়ীর কোন বধূর মুখ! ছবিতে দেখা মুখ।

আবার মনে হয়েছিল, না। রায়বাড়ীর কর্তাদের কোন অনুগৃহীতার মুখ। ঝপ করে ভেসে উঠেছিল মিস মালহোত্রার মুখ। না। পরমুহূর্তে মনে হয়েছিল—না, তার মত নয়। তবে কারুর মত বটে। তাকে হয়তো চিনিনে। হয়তো সোফিয়া।

আমি আতঙ্কিতের মত উঠে দাঁড়িয়ে দালালটাকে বলেছিলাম—আমার শরীর খুব খারাপ মালুম হচ্ছে, ট্যাক্সি ডাক। আমি হোটেলে ফিরব। দুখানা একশো টাকার নোট দিয়ে বলেছিলাম—জলদি করো। জলদি।

জুলেখা এসে আমার হাত ধরে বলেছিল—বাবুজী, বাবুজী, বাবুজী!

আমি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম এবং বলেছিলাম—ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, ছোড় দো—মুঝে ছোড় দো। মুঝে ছোড় দো!

শ্যামাকান্তের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি বোধ হয় আমার কথার মধ্যে ফুটে উঠেছিল সুলতা।

আমি সেই যে হায়দ্রাবাদের জুলেখা বাঈয়ের বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম, তারপর আর জীবনে নারীর জীবন-যৌবন-নীরে অবগাহন করতে ছুটে যাই নি। একটা ভয়, হ্যাঁ, একটা ভয় যেন আমার পা টেনে ধরত। কত সুন্দরী মেয়ে—কেউ আমার রূপে, কেউ আমার শিল্পী-খ্যাতির আকর্ষণে, কেউ আমার অর্থের জন্যে আমাকে আকর্ষণ করেছে, আমিও আকর্ষণ অনুভব করেছি, কিন্তু তবু এগুতে পারি নি। কেমন যেন ভয় পেয়ে এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়ে এসেছি। মনে মনে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি—কেন? এমন হয় কেন? নারীর জীবনস্রোত যৌবনের রূপের খাতে অনন্তকাল বইছে এবং পুরুষেরা দলে দলে ছুটে এসে সেই আদিকাল থেকে এই স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সেখানে আমি তার তীরের ঘাটে এসে ভয় পেয়ে জলাতঙ্ক রোগীর মত ফিরে যাচ্ছি কেন?

কত রকম মনে হয়েছে। সে-সব কথা থাক। এক-একবার ভেবেছি—কোন মনের ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু যাই নি। কি হবে গিয়ে, তারা যা বলবে সে আমার অজানা ছিল না।

আমি তো বুঝতেই পারছি—এ আমার ভ্রম—মনের ভ্রম। আমার বাবার জীবন, মায়ের মুখ, মেজদাদু শিবেশ্বর রায়ের পরিণাম—তাঁর দৈত্যের মত পৌত্রটার পরিণতি, চোখে দেখে এবং রায়বাড়ীর দপ্তর ঘেঁটে এ-বংশের নারীজীবন নিয়ে একটা অস্বাভাবিক আসক্তির ইতিহাস পড়ে আমার মনের অবস্থা এমনি হয়েছে। ব্যাধি আমার ওইটেই। রায়বংশের ইতিহাসকে আমাকে ভুলতে হবে। মনের ডাক্তার আমাকে এই কথাই বলবেন তা আমি জানতাম। বলবেন—ভুলে যান। ওসব ভুলে যান। পৃথিবীতে এইটেই চিরকালের নর-নারীর জীবনের ধারা। আপনাদের বংশের প্রতাপ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, অর্থ ছিল, সম্পত্তি ছিল, স্বাভাবিক ভাবে আপনাদের বংশের পূর্বপুরুষেরা weaker Sex-কে টাকা দিয়ে কিনেছেন, প্রতাপ-

প্রতিপত্তিতে কেড়ে এনেছেন—কেউবা হয়তো পুরানোকালের বিশ্বাসবশে ধর্মসাধনা করে Spiritual Power দিয়ে মেয়েদের আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই পাওয়ার কি, তা তাঁরাই জানেন। যখন যেমন যুগ। ফরগেট অল দোজ থিংস। এ-কালে যেমন যুগ সেইভাবে কোন নারীকে জীবনে পাবার চেষ্টা করুন এবং বিশ্বাস করুন, আপনি শুধু আপনার নিজের জন্তে রেসপন্‌সিব্‌ল, অন্ত কারুর জন্তে নয়; এমন কি কাল কি করেছেন, তার জন্তে অনুশোচনা না করে বিগিন লাইফ উইথ এ ক্লীন শ্লেট ফ্রম টু ডে এবং তার মধ্যেই দেখবেন আপনি পাপীও নন পুণ্যাত্মাও নন, আপনি একজন গুড সিটিজেন। সহজ মানুষ। এর সবই আমি মানি—এ আমারই কথা সুলতা, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই সুলতা, তা আমি পারি নি। কিছুতেই পারি নি। এর জন্তে যে আমাকে যা বলবে আমি প্রতিবাদ করব না, মেনে নেব।

মনে কেমন একটা সংকল্প জাগল, রায়বাড়ীর অন্ত শাখার স্রোত যতদিন চলে চলুক, যতদূর চলে চলুক, দেবেশ্বর রায়ের ছোটছেলে যোগেশ্বর রায়ের জীবন ধরে যে স্রোত এখন সুরেশ্বর রায়ের দেহের খাতে বেয়ে চলেছে, তাকে আমি শেষ করে দেব এবং রায়বাড়ীর সম্পত্তির শক্তিবলটাকেও নিঃশেষিত করে দেব। নানান রকম কল্পনা করতাম, কখনও কল্পনা করতাম গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ করে জমিদারীর মালিকানা তার হাতে দেব—কখনও ভাবতাম সরকারকেই ইস্তফা দিয়ে যাব। মেদিনীপুরে গভর্নমেন্টের খাস জমিদারী অনেক আছে, সেইমত ব্যবস্থা হবে। কখনও ভাবতাম বিক্রী করে দিয়ে সেই টাকায় একটা বড় কিছু করে দিয়ে যাবে। যার থেকে রায়বংশের কোন শাখার কেউ যেন এতটুকু পাথের না পায়।

ভেবেছিলাম কোন একটা আশ্রমে চলে যাব। ১৯৪০।৪১ সাল। কালের দিক থেকে একটু বিলম্বিত হলেও, কালটায় আশ্রমবাসী হওয়ার একটা ঝোঁক তখনও বিগত হয় নি। কিন্তু তা-ও পারি নি; কারণ ঈশ্বর ধর্ম-ধ্যান-জপ এ আমার পক্ষে বিষম বস্তু ছিল। কীর্তিহাটে ঠাকুরবাড়ীতে যেতাম চরণোদক খেতাম না, মাথায় নিতাম, বাল্যভোগের প্রসাদ দু-চার দিন খেয়েছি, এ-সবই সত্যি, মিষ্টি ফল আমিই কিনে দিতাম—খেতেও মিষ্ট লাগত, প্রণামও করেছি—তার মধ্যে ভক্তি কিম্বা সত্যবোধ ছিল না সুলতা, যখনই ঠাকুরবাড়ী গেছি, যখনই ঠাকুরদের কথা ভেবেছি তখনই মনে হয়েছে, ওই কালীঠাকুরুণটির এবং রাধাসুন্দর-ঠাকুরটির আমি অন্নদাতা পিতা। ওরা একান্তভাবে আমার। তবে মুখে সেটা কোনদিন প্রকাশ করি নি। আমাদের দেশে তো ঠাকুরে ঠাকুরে লড়াই হয়, এবং সে-লড়াই তাঁরা করেন ওই পালক-পিতাদের হুকুমে। বিসর্জনের সময় কার প্রতিমা আগে যাবে এই নিয়ে বড় বড় খুন-জখম এবং স্বত্বের মকর্দমার নজীর পাবে হাইকোর্টে। ছোটতরফ বড়তরফের কালী-প্রতিমারা ছোটবাবু আর বড়বাবুর হুকুমে নদীর দিকে ছুটেছে; এ ওর পথ আগলেছে, ও এর পথ আগলেছে। লড়াই করতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়েছে। মুসলমানদের তাজিয়া নিয়েও এমন মামলা বছর বছর হয়। সুতরাং ধর্ম বা ধর্মের আখড়ার দিকে আমার আকর্ষণ কিছু ছিল না। ইদানীং অবশ্য অনেক ভোগী মডার্ন সন্ন্যাসীদের আশ্রম হয়েছে, যেখানে তপস্যা থেকে ভোগ বড়, কিন্তু তাদের প্রতিও, আকর্ষণ ছিল না।

আমি চেয়েছিলাম জীবনে মুক্তি। সে-মুক্তি কেমন করে কোন্ পথ ধরে আসবে জানি না, তবে চেয়েছিলাম তাই।

বিশ্লেষণ করে বলতে পার জমিদার বা ধনীপুত্রের আর এক ধরনের মনোবিলাস। আমি অস্বীকার করব না। অনেকটা তাই-ই বটে। সেকেণ্ড ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তরাবর্ত অভিমুখে মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তাতে ছেদ পড়ল। সময়টা কালীপুজোর পর সম্ভবতঃ রাস-পূর্ণিমার আগের দিন—আমি ছিলাম তখন হরিদ্বারে। হরিদ্বার বড় ভাল লেগেছিল। ভাবছিলাম এই অঞ্চলেই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ লছমনঝোলা পর্যন্ত অঞ্চলটির কোন একটি স্থানে একখানা ঘর বানিয়ে ছবি এঁকে জীবন কাটালে কেমন হয়? হঠাৎ অর্চনার চিঠি এল। কলকাতা থেকে অর্চনা লিখেছে—

সুরোদা,

বৃন্দাবন থেকে খবর দিয়েছে বড়ঠাকুমা, লিখেছেন এবার আমি যাব। লিখেছেন তোমাকেই, লিখেছেন—ভাই, কীর্তিহাটের বড়বাবু আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি রায়দের সঙ্গে বন্ধন কেটে চলে এসে বৃন্দাবনে আমার ভিক্ষে-শাশুড়ীর পাপের অন্নের পিণ্ড গোবিন্দের নাম নিয়ে খেয়ে বেঁচে আছি। ছেলেরা খোঁজ করে নি। আমার বাপের লাখ টাকা ছিল, তা ছেলেরা ঘর ছেড়ে চলে এসেছি বলে নিজেরা নিয়েছে। তাতে ক্ষোভ ছিল না, খেদ ছিল না। তারা ভুলেছিল তাতেও মনে ভাঁটা পড়েছিল—হঠাৎ তুই বার-দুই এসে ঠাকুমা বলে ডেকে নতুন করে রায়বাড়ীর ছেঁড়া বাঁধনে গিঁট বেঁধে বেদনা জাগিয়ে দিয়ে গেলি। মনে পড়ল আমার সব ছিল—স্বামী-পুত্র, বিষয়-বৈভব সব। কিন্তু ভগবান সব কেড়ে নিয়েছিলেন। দেখছি মায়ার বন্ধন কাটে না, কাটতে গেলে প্রহ্লাদের মত হয়ে ওঠে। তাই শেষ সময়ে তুই যদি একবার আসিস, তবে তোকে দেখতে দেখতে চোখ বুঁজি।

ঠাকুরমার নিজের হাতে লেখা চিঠিখানা আমি নিজের কাছে রেখে দিলাম; সঙ্গে কৃষ্ণভামিনী কুঞ্জের কর্মচারী যে-পত্র লিখেছেন, সেখানা তোমার কাছে পাঠালাম। পড়ে দেখো। এবং আমরা কালই রওনা হচ্ছি বৃন্দাবন। বন্দনার বরকে অথবা আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হব। ঠাকুরমাও যাচ্ছেন সে নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ইতি—

অর্চনা।

* * *

হরিদ্বার থেকে বৃন্দাবন খুব বেশী পথ নয়, সেই দিন রাত্রে রওনা হয়ে ভায়া দিল্লী—পরের দিন দুপুরবেলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। যাওয়ার পথে একটা তাড়া ছিল সুলতা। তাড়া ওই ঠাকুরমার চিঠির কথাগুলি। "হঠাৎ তুই বার-দুই এসে ঠাকুমা বলে ডেকে নতুন করে রায়বাড়ীর ছেঁড়া বাঁধনে গিঁট বেঁধে বেদনা জাগিয়ে দিয়ে গেলি।" ওঁর পৈতৃকধন ছিল—তার মূল্য লাখ টাকার বেশী; সে-ও জ্যেঠামশায় এবং বাবা ওঁর হাত থেকে বের করে নিয়েছিলেন। এই সর্ববঞ্চিতা মহিলাটির বুকভরা ভালবাসা সারাজীবনে মানুষকে দেওয়া হয় নি—দিয়েছেন পাথরের দেবতাকে; এবং নিত্যই দেখেছেন এবেলায় দেওয়া তাঁর সে

ভালবাসা পাথরের ঠাকুরের পায়ে দেওয়া ফুলের মত ও-বেলায় বাসী হয়ে শুকিয়ে গেছে এবং তাকে ঘর থেকে বের করে বাইরে বিলিয়ে দিয়েছে কিম্বা ফেলে দিয়েছে। সারাটা পথ সেকালের সেই অতিসুন্দর সুপুরুষ বিদগ্ধ দেবেশ্বর রায়কে মনে মনে শুধু তিরস্কারই করেছি।

মথুরায় নামতেই একটি স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি জোয়ান ছেলে এগিয়ে এল—ছেলেটির রঙটা কালো, বেশ কালো নইলে হয়তো অনায়াসে মনে করতাম অর্চনার ভাই, হঠাৎ বড় হয়ে গেছে, চিনতে পারছি না। তার কারণ, ভদ্রলোকের দেহের গঠন যেমন শক্ত বলশালী, তেমনি লম্বা-চওড়া। আমাকে চিনতে তার খুব দেরি লাগে নি, আমার পরনে বাঙালী পোশাক ছিল, আমার ছবিও সে দেখেছে। এসে আমাকে প্রণাম করলে—বললে, আমার নাম ললিত আচার্য। একটু বিস্মিত হলাম। নামটা ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না। বিলেতে যখন আমি মদ্যপান করে ভেসে যেতে চাচ্ছি, তখনই অর্চনার চিঠিতে বন্দনার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। নামটা মনে রাখবার মত মানসিক সুস্থতা ছিল না, তবে পাত্রটির অসাধারণ পরিচয় আমার মনে ছিল। ছেলেটির বাপ ইস্কুলমাস্টারী করত, ম্যাট্রিকুলেশন পাস, সামান্য অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার, ছেলেটি বি-এ পাস করেছে অনার্স নিয়ে এবং সরকারী চাকরি পেয়েছে ; এখন সে সার্কল অফিসার। কীর্তিহাটের জমিদার কল্যাণেশ্বর রায় ধনেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে গোয়ানদের একটা দরখাস্তের তদন্তে এসেছিল। তারপর যাওয়া-আসা সূত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রায়বাড়ীতে তখনও পাঁচ-সাতটি মেয়ে, তার মধ্যে বিবাহযোগ্যার থেকেও বেশী অরক্ষণীয়া দু-তিনটি। ছেলেটি অবিবাহিত। বন্দনাকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। সে নিজেই লোক পাঠিয়ে সম্বন্ধ করে বন্দনাকে বিবাহ করেছে। পণ নেয় নি, যৌতুক চায় নি। অর্চনা নিজেই কিছু যৌতুক আর গহনা দিয়েছে। অর্চনা লিখেছিল—সুরোদা, রায়বাড়ীর মেয়েদের সম্পর্কে একটা অপবাদ আছে যে রায়বাড়ীর মেয়ের কপালে কখনও সুখ হয় না ; যে সংসারে যায়, সে সংসার ভেঙে যায় ; না গেলে মেয়ের কপাল ভাঙে। একা তো আমার নয়। অন্নপূর্ণা-মাও স্বামী নিয়ে ঘর করতে পান নি। তারপর জ্যাঠামশায়ের মেয়েদের দশা তো জান। তবু মনে হচ্ছে বন্দনার অদৃষ্ট ভাল হবে। বড়-লোকের ঘর নয় ; দালানবাড়ী নেই ; কোনখানে পাপ-তাপ মাটিতে পুঁতে পাথর চাপা দেওয়া নেই। ছেলেটির নাম ললিত, ললিতের যেমন স্বাস্থ্য তেমনি চরিত্র, তেমনি বিনয় আর লেখাপড়ায় ভারী উজ্জ্বল ; সরকারী চাকরি পেয়েছে ; বন্দনা সুখী হবে চাকরির জায়গায় জায়গায় ঘুরবে। তবে জ্যাঠামশায় খুঁতখুঁত করছিলেন—ছোটঘর, ছোটঘর ঠিক হবে না, ঠিক হবে না বিয়ে দেওয়া, কিন্তু মা-জ্যাঠাইমা কেউ তাঁর কথা শুনলেন না। ছোটঘর কিসের ? বিয়ে হয়ে গেল।

এ-বিবরণটুকু মনে ছিল। তার সঙ্গে আর মনে ছিল বরের উপাধি হল আচার্য। ভদ্রলোক পাদপূরণ করে দিলেন, বললেন—আমি বন্দনাকে বিয়ে করেছি।

মনে পড়ে গেল, অর্চনার চিঠি, সে লিখেছিল বন্দনার বর বা ছোটভাইকে সঙ্গে করে কালই রওনা হব আমরা। আমি তাকে আর একবার ভাল করে দেখে সত্যি-সত্যিই বেশী করে খুশী হয়ে বললাম—কাছেই যমুনার ওপারে বৃন্দাবন, তোমাকে দেখে তো ভাই ইচ্ছে

করছে না, তোমাকে ললিত বলে ডাকতে। ইচ্ছে করছে তোমাকে—

ছেলেটি হেসে বলল—মেজদি আমাকে কেলেসোনা বলে নতুন নামকরণ করেছেন বৃন্দাবনে পা দিয়েই।

আমি বললাম—না, কেলেসোনা বলে তোমায় ডাকব না ভাই। ওটা মেজদি বলেছেন—মেজদিকে সাজে। আমি তোমাকে শ্যামসুন্দর বলে ডাকব। ললিতের চেয়ে খারাপ লাগবে না।

ললিত হেসে উঠে বললে—তাই ডাকবেন।

* * *

বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠে ললিত বললে—আপনাকে দেখবার আমার আগ্রহ ছিল দাদা।

আমি চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে ভাবছিলাম—একেই বলে ভাগ্য। আমি কত খুঁজে, কত অর্থব্যয় করে অর্চনাকে অন্নপূর্ণা-মায়ের নাতির ছেলে রথীনের মত ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু তাকে সুখী করতে পারি নি। আর বন্দনার ভাগ্য দেখ, কোথা থেকে এমন একটি গুণবান, সবল স্বাস্থ্যবান, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলে পায়ে হেঁটে রায়বাড়ীতে এসে বন্দনাকে নিজে উপযাচক হয়ে বিয়ে করে নিয়ে গেল।

ললিত সারাটা পথ মথুরা থেকে বৃন্দাবন আমায় কি করে যত্ন করবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না। আমি হেসে বলেছিলাম—ভাই ললিত, তুমি এত ব্যস্ত হলে তো আমাকে ব্যস্ত-ত্রস্ত এবং তার উপরে কিছু থাকলে তাই হতে হয়। তুমি আমার ভগ্নীপতি, আমি তোমার সম্পর্কে বড় হলেও শ্যালক। যাকে সোজা বাংলায় বলে তালব্য-শ-য়ে আকার ল-য়ে আকার। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি ?

ললিতের মধ্যে একটা সত্যকারের বিনয় ছিল। সে বললে—দেখুন দাদা, রায়বংশে বিয়ে করে আমি খুশী হয়েছি নিশ্চয় কিন্তু কল্যাণবাবু-টাবুকে আমার ভাল লাগে না ; ওরা আমার এমন তোষামোদ করেন সার্কল-অফিসার বলে যে, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়। এক অতুল-কাকা আছেন যাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়। আমি সরকারী কর্মচারী, তিনি জেলখাটা স্বদেশী-করা মানুষ, তবু শ্রদ্ধা করি। গোপনে করি। প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা-খাতির করবার তো উপায় নেই। তার উপর মেদিনীপুর। আর শ্রদ্ধা করি আপনাকে। আগে শুনে শ্রদ্ধা করতাম। আজ দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে।

কি উত্তর দেব ? উত্তর কিছু দিলাম না, চুপ করে চোখ বুজে সিগারেট টানছিলাম।

ললিত একটু চুপ করে থেকে বললে—জানেন, কীর্তিহাটের রায়বংশের এত গল্প আমি ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। সে একটা ড্রিমল্যাণ্ড বা ফেয়ারী কিংডামের ব্যাপারের মত। আমার ঠাকুর্মা বলতেন। তিনি গল্পগুলো শুনেছিলেন তাঁর শাশুড়ীর কাছে। শ্বশুরের কাছে। আমাদের তখন বাড়ী ছিল আপনাদেরই জমিদারীর মধ্যে। তখন আপনাদের বংশের মালিক ছিলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় দি গ্রেট। আমার ঠাকুমা বলতেন—তাঁর ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেতো। বলতেন, আমার শ্বশুর কি একটা অপরাধ করে ফেলেছিলেন ; তারপর এমন ভয় হল যে, আর রায়বাহাদুরের এলাকায় থাকতে সাহস হল

না। তখন আমার ঠাকুরদা তিন মাসের কচি ছেলে। ঠাকুরদার বাবা রায়বাহাদুরের ভয়ে যা জমিজমা ছিল, সব বেচেখুচে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন গ্রাম থেকে। ঠাকুরদার মা ঠাকুরদাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন সারা রাস্তাটা। মেদিনীপুর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন হাওড়াতে। সালকের দিকে গঙ্গার ধারে ছোট ছিটেবেড়ার ঘর বেঁধে বাস শুরু করেছিলেন।

আমার চোখ দুটো আপনি খুলে গিয়েছিল।

আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আচার্য? কোন্ আচার্য? রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আমলে তাঁর শাসনের ভয়ে কোন্ আচার্য তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে গ্রাম পরিত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল?

ললিত বলছিল—আপনাদের বংশের রূপের খ্যাতি শুনেছিলাম। শুনতাম আর সাধ হত আপনাদের দেখতে। আমার ঠাকুরদার বাবাকে রায়বাড়ীর কাছারীতে ডাকা হয়েছিল। ভয়ে তাকে একলা যেতে দেন নি আমার ঠাকুরদা-মা। কচি ছেলে কোলে করে তিনি স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কীর্তিহাটের কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি স্বামীকে আগলে ছিলেন। আমার ঠাকুরদা খুব কালো ছিলেন, একেবারে নিকষ কালো। ঠাকুমা বলতেন—ব্যবসাবাণিজ্য করে ছেলে আমার খুব বড়লোক হবে, তখন রায়বাড়ীতে বিয়ে দিয়ে সুন্দর বউ আনব। কালো রঙের দুঃখ ঘুচবে।

সে বকেই যাচ্ছিল, বকেই যাচ্ছিল। লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে, বুদ্ধিমান ছেলে, সরকারী চাকরি করে; তবু আনন্দবিহ্বল ছোটছেলের মত বকেই চলেছে, বকেই চলেছে। সে আনন্দে তার কোন কলুষ ছিল না, কুটিলতা ছিল না। না—একবিন্দু এতটুকু কিছু ছিল না।

আমার মনে পড়ছিল, অন্নপূর্ণা-মায়ের কাছে পাওয়া দেবেশ্বর রায়ের লেখা একখানা চিঠির কথা। যে-চিঠিতে তিনি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের নিষ্ঠুর চরিত্রের কথা লিখতে গিয়ে দুটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন। একটি ঘটনা, কীর্তিহাটের নিকটবর্তী গ্রামের এক পঙ্গু আচার্য ব্রাহ্মণ এবং তাঁর যুবতী স্ত্রী শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল। ক্ষমার অযোগ্য সামাজিক অপরাধের জন্য রায়বাহাদুর হুকুম করেছিলেন, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওই মেয়েটির কোলের ছেলেটি কষ্টিপাথরের মত কালো ছিল এবং সবল-সুস্থ ছিল তার স্বাস্থ্য।

এই ললিত আচার্য—আজ রায় রত্নেশ্বর রায়বাহাদুরের প্রপৌত্রী বন্দনাকে বিবাহ করলে, সে কে?

আর একটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন। সেটি দেবেশ্বর রায়ের ভিক্ষে-মা, জাতিতে কায়স্থ, বিধবা কৃষ্ণভামিনী দাসীর কথা।

তাঁর অপরাধের জন্য রায়বাহাদুর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিতা করেছিলেন। আজ বৃন্দাবনে কৃষ্ণভামিনীর সেবাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়ে শেষ শয্যা পেতেছেন রায়বাহাদুরের পরমাদরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, দেবেশ্বর রায়ের পত্নী আমার ঠাকুমা।

ভাবছিলাম, রায়বাড়ীটা কি আজ এই মুহূর্তে ভূমিকম্প হয়ে চুরমার হয়ে মাটির উপর

একটা ইঁট-চুন-সুরকী-ভাঙা কাঠকাঠরায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেল ?

সেদিন মনে-মনে কামনা করেছিলাম—এই মুহূর্তে একটা ভূমিকম্প হোক এবং সেই ভূমিকম্পে কীর্তিহাটের রায়বাড়ী ভেঙে চৌচির হয়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাক। তার মধ্যে রায়বংশধরেরা চাপা পড়ে শেষ হয়ে যাক। ওদের কাজ শেষ হয়েছে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ এবং নাচগান বিক্রী করা অর্থে গড়া কৃষ্ণভামিনী সেবাকুঞ্জে দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রী শেষশয্যা পেতেছে; এবং যে ব্রাত্যজনসংসর্গজাত সন্তানের জননী এবং পুরুষত্বহীন জনককে নির্বাসিত করেছিলেন রত্নেশ্বর রায় তারই পৌত্রের সঙ্গে রত্নেশ্বর রায়ের প্রপৌত্রীর বিবাহ হয়, সম্প্রদানের সময় এই ললিতের পা ধরে অর্চনা করে বলা হল, হে বিশিষ্ট বর, তোমাকে কন্যাদান করছি, তুমি গ্রহণ কর। ব্যাস্, আর বাকী কি রইল। সব শেষ হয়ে গেল—এবার ছেদ পড়ে যাক। এবং বেশ একটা টেম্পোর মাথায় পড়ুক, ভূমিকম্প হোক—। কিন্তু তা হল না। কারণ ইচ্ছে করলেই কিছু হয় না। তবে ধাক্কাটা লেগেছিল। প্রথমটা যথেষ্ট লেগেছিল। সামলাতে বেগ পেয়েছিলাম।

অর্চনা বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে সুরোদা? শরীর খুব খারাপ? চিঠি-পত্রেও যা লেখ তাও যেন কেমন কেমন, এতকাল পর এলে কিন্তু—। কথা সে খুঁজে পেলে না, একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

কথাটার জবাব দিতে পারি নি, হাসি দিয়ে অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা বা ঢাকা দেওয়া যায়, মানুষে দিয়েও থাকে, সেদিন আমি তা দিতে পারি নি। সত্য কথাটা বলবার মতও বুকে জোর ছিল না, সুতরাং চুপ ক'রেই ছিলাম। অর্চনা তখনও জানত না আচার্যের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পিতামহের বাপের সঙ্গে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের আসল সংঘর্ষের কথা।

বলতে বলতে থামল সুরেশ্বর। তখন দিনের আলো বেশ ফুটে উঠেছে, দিনের আলো কেন রোদ্দুরও ফুটেছে; নিচে ফ্রী স্কুল ধরে যানবাহন লোকজন চলাচলের বিচিত্র মেলানো-মেশানো সাড়া উঠেছে; ট্যাক্সির হর্ন, প্রাইভেটের ইলেকট্রিক হর্ন; ফ্রী স্কুল স্ট্রীট অঞ্চল ফিটনের আড্ং—ফিটনের ঘণ্টার শব্দ, মধ্যে মাঝে গরু মোষের গাড়ী, রিক্সার ঘণ্টা, ঠেলার হুঁশিয়ারি মানুষে মানুষে সংঘর্ষের কলহের হাঁক একসঙ্গে মিশে চলমানতায় দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছে। সুরেশ্বর থামল। বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললে—সামলাতে প্রায় একটা বেলা লেগেছিল। ঠাকুমায়ের শেষ প্রায়শ্চিত্ত দেখে এবং শুনে মনের ক্ষোভটা গেল।

তুমি হয়তো জানো—জানো বলেই ধরে নিচ্ছি, জানো না বলে তোমাকে খাটো করব কেন? আমাদের দেশ হিন্দুসমাজে নানান সংস্কারের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে প্রায়শ্চিত্তের একটা বিধি আছে। মানুষ দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছে, মরণ হচ্ছে না, এমন অবস্থায় মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে, নারায়ণকে ঘটে হোক শিলারূপে হোক সামনে রেখে জীবনের পাপ স্মরণ করে বলে—"ক্ষময়া ক্রিয়তে পাপং"—যে পাপই করে থাকি সে গুরুই হোক আর লঘুই হোক সে সবই তুমি মার্জনা কর। ক্রিশ্চানদের কনফেশনের সঙ্গে এর একটা মিল আছে।

ঠাকুমা—দেবেশ্বর রায়ের স্ত্রী বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন—অসুখ দেখানোর মত কিছু ছিল

না, ক্রমশ ক্রমশ মৃত্যুর দিকে চলছিলেন কিন্তু গতিটা নেহাতই পিঁপড়ের গতির মত। তাই তিনি এই প্রায়শ্চিত্ত করলেন সেদিন।

আয়োজন হয়েই ছিল কিন্তু সকাল থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে অনুষ্ঠান হয় নি; তাঁর চেতনা হলে সেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। পুরোহিত এসেছিল কিন্তু ফিরে গিয়েছিল ঠাকুমাকে ঘুমন্ত দেখে। এবং ঠিক হয়েছিল যদি এরই মধ্যে 'কোমা' এসে যায় তবে মেজঠাকুমা বাঁ হাতে বড় ঠাকুমাকে ধ'রে তাঁর হয়ে মন্ত্র পড়বেন, ভোজ্য দান ইত্যাদি যা উৎসর্গ করবার তা তা উৎসর্গ করবেন।

আমি বসে ভাবছিলাম বৃন্দাবনে এই কৃষ্ণভামিনীর কুঞ্জে বসে মদ্যপান আমি করতে পারি কিনা? করলে বাধা কে দেবে? যিনি দিতে পারেন বা পারতেন আমার ঠাকুমা তাঁর একরকম জ্ঞান নেই। হতচেতনের মত ঘুমুচ্ছেন। কিন্তু আমি যেন অধিকার মানে রাইট খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এসে ডাকলে অর্চনা। এস সুরোদা, ঠাকুমার চেতন হয়েছে, একটু যেন সুস্থ হচ্ছে, বলছেন—প্রায়শ্চিত্ত এখুনি করব। পুরোহিত চলে গেছে, মুস্কিল হয়েছিল কিন্তু বন্দনার বর ললিত বললে—আমি করিয়ে দিচ্ছি দিদি। আমি এককালে বাবার কাছে এসব কাজ শিখে ছিলাম। বাবা ইস্কুলে পণ্ডিতি করতেন আর পুরুতের কাজও করতেন। আমার স্যুটকেসে বইও আছে।

গেলাম। মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তি একটা বেদনা ঘুরপাক খাচ্ছিল এই মুহূর্তে সেটা চরমে উঠল। অথচ আমি আধাইংরেজ যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, নিজে একসময় বাবা মাকে এবং আমাকে যে দুঃখ দিয়েছিলেন তার জন্য পৈতের পর কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু তা রাখতে পারি নি, কিছু দিন যেতে না যেতেই একেবারে আল্ট্রামডার্ন হয়ে উঠেছিলাম। জাতধর্ম ঈশ্বর পরলোক সব লোককে অবিশ্বাস করে বিলুপ্ত করে দিয়েছি, মানি না। দেবতা দেবলোক যেটুকু মানি সে মানি দেবোত্তর সম্পত্তির জন্য এবং এখনও এদেশে ব্রাহ্মণবংশের রক্তের একটা এ্যারিস্টক্রেসি আছে তার জন্য, নিজে ইংরেজের দেশে গিয়েছিলাম ইংরেজললনার দেহসরোবরে ডুবে মরতে। কিন্তু মরতে পারি নি। শম্পা রায় নামধারিণী ললনার দেহসরসীতে তাকিয়ে ভয় পেয়েছিলাম—মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর অপমৃত্যু উঁকি মারছে।

নরকের ভয় নয়, নরক একালে কেউ মানে না, আমিও মানি না, তবু ওটাকে বড় ভালগার অশ্লীল মনে হয়েছিল তাই পালিয়ে এসেছিলাম। ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে, নাহলে হয়তো ফ্রান্স বা ইটালীতে যেতাম মরণ-সরোবরের সন্ধানে। শেষ পালিয়ে এলাম। সে কি এই দেখতে এলাম?

দেবেশ্বর রায়ের অবহেলিত গৃহিণী মরছেন কৃষ্ণভামিনীর সেবা-কুঞ্জে আর তাঁর মৃত্যুকালে প্রায়শ্চিত্ত করাচ্ছে ললিত আচার্যি। ললিত আচার্যি। অন্নপূর্ণাপিসীকে লেখা দেবেশ্বর রায়ের চিঠিখানা আমার মনে পড়ছে।

নিয়তি বা ভগবানের বিচার এ আমি মানি না। এ তা নয় তাও জানি। এমনটা

নেহাতই ঘটনাচক্র। এর পিছনে কোন ত্রিকালের বিধাতার প্ল্যানিং নেই। তবে একটা জিনিস আছে সেটা হ'ল এই নিজে না থামলে কেউ রুখতে পারে না। এবং সংসারে পাপকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এলেই তুমি মুক্ত।

অর্চনা বুঝতে পারছিল একটা খোঁচায় আমি অস্বস্তি ভোগ করছি; সেটা কি তা ঠিক ধরতে পারে নি। সে বলেছিল—তোমার কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

বললাম—বলব পরে। এখন না। চল এখন। বলে পা বাড়ালাম। এসে দাঁড়ালাম প্রায়শ্চিত্তের জায়গায়। কি বলব তোমাকে সুলতা, এসে দাঁড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। সত্যি-সত্যিই সে যেন একটি মুক্তিযজ্ঞের আসর পাতা হয়েছে।

ঠাকুমাকে গরদের কাপড় পরিয়েছে—তিনি বসেছেন মেজদিদির উপর দেহের ভার রেখে; ঠাকুমা মানুষটি বরাবরই ছোটখাটো, বয়স হয়ে আরও ছোট হয়ে গেছেন; আর আমার মেজদিদি মাথায় বেশ লম্বা এবং বন্ধ্যা নারী, তাঁর দেহখানির বাঁধুনি বেশ শক্ত, তিনি তাঁকে পিঠের দিকে জড়িয়ে ধরে বসেছেন।

সামনে আসনের উপর বসেছে জামাই ললিত আচার্য। ধবধবে কাচা কোঁচানো ধুতি পরনে, গায়ে সিল্কের চাদর, গাঢ়-শ্যাম গায়ের রঙ, তার উপর সাবানে পরিষ্কার করে কাচা ধবধবে মোটা পৈতে, চোখে চশমা—ছ'ফিট লম্বা সবল স্বাস্থ্যবান যুবা, সোজা মেরুদণ্ড, বসে নিপুণ পুরোহিতের মত সামনে রাখা ভোজ্য এবং দানগুলির পাত্র পরের পর সাজিয়ে রাখছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ভরাট গলায় সে মন্ত্র উচ্চারণ করাতে শুরু করলে বলুন—কোশাতে—হ্যাঁ।

তখন রায়বাড়ীর বড়বউ কোশাতে হরিতকী ধরে হাতের উপর হাত রেখেছেন। ঠাকুমাকে দেখলাম কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক এঁকেছেন—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে।

বলুন—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু! ওঁ তদবিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবিবচক্ষুরাততং —ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু।

গম গম করে উঠল স্থানটি, যেন অনুষ্ঠানটি সজীব প্রাণময় হয়ে উঠল; আশ্চর্য একটা সঙ্গীত যেন সৃষ্টি করলে ললিত তার ভরাট কণ্ঠস্বরের মহিমায় আর তার জিহ্বার অতি পরিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে।

আমি আজও মনে করতে পারছি, চোখের উপর স্পষ্ট ভাসছে সমস্ত; কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অনুষ্ঠানটির প্রভাবে অভিভূত হয়ে গেলাম। পরলোক, স্বর্গ নরক বাদ দাও, আমার মন যেন পবিত্র হয়ে গেল, একটি উদাসীনতা চিত্তকে স্পর্শ করলে, আমার মনের সব উত্তাপ সব ক্ষোভ যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম তুমি সত্যকুলজাত" অংশটুকুও মনে পড়ে নি, শুধু মনে মনে মেনে নিয়েছিলাম এ অব্রাহ্মণ হলে ব্রাহ্মণ আর দেশে সমাজে নেই। মুক্তি যদি এই অনুষ্ঠানে মেলে তবে এই ছেলেটির চেয়ে শুদ্ধ এবং সিদ্ধ পুরোহিত আর দেশে নেই।

ঠিক এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল সুলতা। ঠাকুমা মন্ত্র পড়তে পড়তে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে আমাকে দেখে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখের দৃষ্টি বিস্ময়বিস্ফারিত হয়ে গেল,

কপালের কুঞ্চনরেখায় মনের অনুচ্চারিত প্রশ্ন ফুটে উঠল শিলালিপির মত; তারপর কাঁপতে শুরু করলেন।

ললিত তখন ব'লে যাচ্ছিল—ওঁ অদ্য মার্গশীর্ষ মাসি শুক্লে পক্ষে—ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্র—

ললিত একটি একটি ক'রে সংস্কৃত শব্দগুলি উচ্চারণ করছিল, ঠাকুমা একটি একটি ক'রে উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বলার পর তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখ যেন বিস্ময়বিস্ফারিত, পুরু চশমার ওপাশে চোখ দুটিকে খুব বড় এবং খুব বেশী বিস্ফারিত মনে হচ্ছিল, দন্তহীন মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে গেছে। তিনি একটু একটু কাঁপছেন। মনে হচ্ছে একটা কিছু হয়েছে। সে একটা কিছুর অর্থ, ওই স্থানকালপাত্র বিচার করলে চরম মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়ালাম বুঝি বলে আশঙ্কা হয়। সবাই আমরা সেই আশঙ্কাই করেছিলাম। কি হল?

ললিত একটু ঝুঁকে বললে—বলুন—তিথৌ—।

অর্চনা সামনে হেঁট হয়ে ডাকলে—ঠাকুমা! ঠাকুমা!

পিছন থেকে মেজদিদি বললেন—কর্তাদিদি। দিদি—গায়ে একটু নাড়া দিলেন।—দিদি!

হঠাৎ যেন সচেতন হলেন ঠাকুমা, তাঁর বাঁ হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন—ছাড়, ছাড়। আঃ, ঘোমটা দিতে দে। দেখছিস না বড়বাবু দাঁড়িয়ে। ছাড়।

বড়বাবু মানে দেবেশ্বর রায়। আমরা চমকে উঠেছিলাম। কোথায় কি দেখছেন—কাকে দেখছেন?

মেজদিদি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললেন—না—না—উনি বড়বাবু নন। সুরেশ্বর, ও সুরেশ্বর—নাতি আপনার নাতি। বড়দি—!

আমার মনে পড়ে গেল আমি দেখতে আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের মত। আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এসে ডাকলাম—ঠাকুমা, আমি সুরেশ্বর!

—সুরেশ্বর? কে সুরেশ্বর!

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম—মন্ত্র বলুন—প্রায়শ্চিত্ত শেষ করুন!

এবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন, বললেন—ও হাঁ, কি বলব?

ললিত বললে—আবার বিষ্ণু স্মরণ করে নিন, আগে বলুন—শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। নমঃ তদ্‌বিষ্ণু পরমংপদং—

আর ভুল হল না ঠাকুমায়ের—তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন একটানা। প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে চোখ থেকে জলের দুটি ধারা নেমে এল।

তিন দিন পর মারা গেলেন ঠাকুমা—দেবেশ্বর রায়ের গৃহিণী—উমা দেবী। মারা যাওয়া তাকে বলে না, যেন চোখ বুজে ঘুমোলেন। কেউ ভাবতে পারে নি যে আর তিনি চোখ মেলবেন না। কারণ প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে রাত্রি থেকে এমন সহজ আর সুস্থ তিনি হয়ে উঠেছিলেন যে আমরা ভেবেছিলাম তিনি হয়তো নতুন ক'রে বাঁচলেন। নতুন ক'রে বাঁচাই

বটে। কারণ পুরনো কথাগুলো যা তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন—যা কেউ জানত না আমাদের মধ্যে—সেই সব কথা বলতে লাগলেন। হাসলেন। আমাকে ললিতকে সমাদর করলেন; অর্চনাকে দেখে দিদিশাশুড়ী ভবানী দেবীকে স্মরণ করে বললেন—কিন্তু ভাই এমন দুঃখভোগ করবার জন্য তো তাঁর ফেরার কথা নয়। দুঃখ পেয়ে গিয়েছিলেন—সুখ করবার জন্য ফিরে আসবার কথা। তা হ'লে? তা হ'লে কেন এমন হ'ল তোর?

আর সময় পেলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বলতেন—অবিকল আমার বড়বাবু। তফাৎ বড়বাবুর মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ ছিল। মাথায় আলবার্ট তুলে টেরি কাটতেন. আর ভয়ানক বাবু ছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা আতরের গন্ধে মো মো করত। মনে হচ্ছে তিনিই তুই হয়ে ফিরে এসেছেন নিজের দেনা শোধ করতে। দেনা যে অনেক। দেখ না ভাই নইলে শেষকালটায় আমার মৃত্যুশয্যায় তুই বসে থাকলি কেন? আমার বড় ছেলে—।

জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায়, তাঁর পৈতৃক এক লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ী ছেড়ে বৃন্দাবন এসে ভিক্ষেশাশুড়ী কৃষ্ণভামিনী সেবাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন ব'লে। তিনি আসেন নি। আসতে সম্ভবত লজ্জা পেয়েছিলেন।

তাও কথাটা বললেন ঠাকুমা।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমার মুখের আগুনও তোকেই দিতে হবে। দেনা শোধ রে, দেনা শোধ। তা ভাই এক কাজ করিস। সারাজীবন তো মানুষকে না পেয়ে ভগবান আর দেবতাকে নিয়ে থাকলাম, ভাগবত পুরাণ অনেক পড়েছি। তোদের বংশের দেনাগুলো শোধ করিস। দেনা অনেক অনেক—অনেক। হয় না শোধ জানতেই পারবিনে। তবে যা জানতে পারবি তা শোধ করিস। তোর কাছেই তো শুনেছি দর-পত্তনীতে পত্তনীতে রায়বাড়ীর সব জমিদারী এসে জমা হয়েছে। তুইই তো আসল মালিক। শোধ করিস—

অর্চনা পাশে বসেছিল সে হঠাৎ বলে উঠল—সুরোদা যে জমিদারী সম্পত্তি সব বেচে দেবে ঠিক করেছে।

—বেচে দেবে? চমকে উঠলেন ইলেকট্রিক শক খাওয়া মানুষের মত। বেচে দেবে? কি বেচে দেবে?

—জমিদারী।

—জমিদারী বেচে দেবে?

আমার চোখের দিকে চোখ রেখে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন আমার কাছে। উত্তর দিতে দেরি হয়েছিল আমার; তিনি খানিকটা অধীর হয়েই বলেছিলেন—বেচে দিবি? হাঁ রে! রায়বংশ—আর কথা খুঁজে পান নি।

অর্চনাই বলেছিল—যে সব পাপের কথা বলছ ঠাকুমা তা সুরোদা জানে। পুরনো কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে বের করেছে। ওই জন্যেই বেচে দেবে। জমিদারী রাখতে হলে নানা অন্যায় করতে হয়। বলে প্রজাদের দান করে দেবে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—দেখ, জমিদার রাজা, এরা হল ইন্দ্রদেবতার জ্ঞাতগোত্র রে। এদের এ না করে উপায় নেই। দেখ না ইন্দ্ররাজা স্বর্গের রাজা; রাজ্য করতে গিয়ে তাকে কত কি করতে হয়েছে। ভেবে দেখ, ব্রহ্মহত্যা করেছে, নারীহরণ করেছে। মুনিঋষিদের অপমান করেছে; রাজ্য করতে গেলেই ওসব করে। কিছু করে কিছু করতে হয়; করেছে; অভিশাপও খেয়েছে, কত লাঞ্ছনা হয়েছে, হাজারটা চোখ হয়েছে; প্রায়শ্চিত্ত করেছে; রাজ্য হারিয়ে আবার রাজ্য পেয়েছে। তা বলে তো বেচে দেয় নি রে! তুই বেচে দিবি?

ললিত ঠাকুমার কথা শুনে খুব তারিফ ক'রে বলেছিল—ঠাকুমা বড় চমৎকার কথা বলেছেন দাদা। ভারী চমৎকার! রাজা—সে ইন্দ্র থেকে দৈত্য দানব রাক্ষস মানুষ জন্তু-জানোয়ার যেই হোক তার অত্যাচারী না হয়ে উপায় নেই। কুটিল পথ ছাড়া তার পথ নেই। পৃথিবীতে পূজা সে পৃথক ভাবে পায় না। দশ দিকপালের মধ্যেই যা পাবার পায়। তার বেশী নয়। তবু ইন্দ্রত্বের চেয়ে কাম্য কিছু নেই। শতকরা নিরেনব্বুইজন তপস্যা করে ইন্দ্রত্বের জন্য। বড় জোর একজন চায় ভগবান কিম্বা মুক্তি। তাই কেউ তপস্যা করলেই ইন্দ্র তাকে ধ্বংস করতে চায়।

ললিত সংস্কৃতের ভাল ছাত্র, সংস্কৃতে এম-এ পাস করেছিল। সে পুরাণ থেকে ইন্দ্রতত্ত্ব বোঝাতে শুরু করেছিল। সেসব কথা ভুলে গেছি, একটা কথা মনে আছে বলেছিল—এক রাম ছাড়া কোন রাজা প্রজার পরম ভক্তি পান নি। অন্যদের ভয় করেছে, ঘৃণা করেছে, সেলামী নজরানা দিয়েছে, পূজো করে নি দেয় নি। ওই এক রাম ছাড়া। এর জন্য রামকে সীতা বিসর্জন দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল।

ঠাকুমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—ভেবে দেখিস ভাই। এত বড় রায়বংশের সন্তান তুই—বড় রায়ের পৌত্র, রায়বাহাদুরের প্রপৌত্র, ওরে লোকে তোর বংশাবলীকে কেউ আর গ্রাহ্য করবে না; দেখলে মাথা নোয়াবে না। ওরে তোকে কীর্তিহাট ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে।

আমার মনে সেদিন যেন একটা কান্নার আবেগ বর্ষার মেঘের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। বর্ষণ হয় নি হ'তে দিই নি, বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর জমিদারীর অতি বৃদ্ধা প্রাণপ্রতিমা বলছেন—বেচে দিয়ো না, আমাকে বেচে দিয়ো না।

* * *

চুপ করে গেল সুরেশ্বর। একটু পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিষণ্ণ হেসে বললে—দেখ ছোটবেলা পড়েছিলাম—'বীরবল কথা'—বীরবল ছিলেন দুঃসাহসী যোদ্ধা। এক রাজার রাজ্যে কাজ করতেন। মাইনে নিতেন খুব বেশী। বলেছিলেন—যা কেউ না পারবে তাই সে করবে। রাত্রে রোজ রাজপুরীতে সারারাত্রি জেগে পাহারা দিতেন। হঠাৎ একদিন শুনলেন রাজপুরী থেকে কেউ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে। তিনি ভয় পেলেন না, এগিয়ে গেলেন; দেখলেন একজন সুন্দরী নারী কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছেন। তিনি

তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে মা? কেন কাঁদছ তুমি?

মেয়েটি বললে—আমি রাজলক্ষ্মী, এই রাজাকে আজ পরিত্যাগ ক'রে যেতে হচ্ছে ব'লে কাঁদছি। দীর্ঘকাল একে আশ্রয় ক'রে ছিলাম, রাজাকে বড় ভালবাসতাম স্নেহ করতাম—তাই বুকটা টনটন করছে।

" বীরবল জিজ্ঞাসা করলেন—কি অপরাধে রাজাকে ত্যাগ করবে মা?

রাজলক্ষ্মী বললেন—রাজার আজ রাত্রি অবসানে পরমায়ুর শেষ হবে। রাজার যিনি পুত্র তাঁর ভাগ্যে রাজ্য নেই।

বীরবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাজাকে কি কোন উপায়ে বাঁচানো যায় না মা!

—যায়। যদি কেউ শ্মশানে যে মহাকালী আছেন তার ওখানে গিয়ে নিজের মুণ্ড কেটে মায়ের পুজো দেয় তবে রাজা তার পরমায়ু নিয়ে বাঁচতে পারেন।

বীরবল বললেন—মা, তা হলে তুমি ফিরে যাও মা। আমি এই রাজার ভৃত্য। তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে সাধ্য হলে জীবন দিয়ে রক্ষা করাই হল যোদ্ধা ভৃত্যের কর্তব্য। সে কর্তব্য আমি পালন করব মা। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও।

রাজলক্ষ্মী তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, অন্তঃপুরের দিকে।

ঠিক সেই গল্পের বীরবলের মতই আমি সেদিন ঠাকুমার কাছে সেই আবেগের বশে বলেছিলাম—আমি কথা দিচ্ছি ঠাকুমা, আমি জমিদারী বেচব না। রাখব।

সে প্রতিশ্রুতি সেদিন যার হিসেব জ্ঞান আছে তার কাছে বড় সহজ ছিল না, এ কথা আমার থেকেও বোধ করি তুমি অনেক ভাল করে জান এবং তার ভিতরের কারণ বোঝো। জমিদারীতে জমিদার সেদিন নিতান্তই পুতুল মালিকের মত মালিক হয়েছে।

প্রজারা তখন জমিদারদের থেকে অনেক বেশী শক্তিমান হয়েছে। যে রাষ্ট্র জমিদারী সৃষ্টি করেছিল সেই রাষ্ট্রই সেদিন দুর্বল হয়ে গেছে দেশের মানুষের কাছে, সুতরাং জমিদারদের অবস্থা হয়েছে প্রায় গাছতলায় পড়ে থাকা হাত-পা-ভাঙা নাক-কাটা পাথরের মূর্তির মত, যাদের নেহাত কৃপাবশে কেউ দুটো আতপ এক মুঠো বেলপাতা এক কুশি গঙ্গাজল দিয়ে যায়।

এক বছরের উপর আমি ইংল্যাণ্ডে ছিলাম। ফিরে এসে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছি জমিদার এবং অভিজাত বংশের যোগ্য একটি জীবনধারার জন্য, তার জন্য বাঈজীপাড়া থেকে শুরু ক'রে হোটেল, বার, সাংস্কৃতিক শিল্পীজীবনের নানা কর্নার খুঁজে বেড়াচ্ছি; অজস্র অর্থব্যয় করছি—এর মধ্যে জানবাজারের নায়েব আচার্যির পত্র পেয়েছি—"এরূপ অর্থব্যয় করিলে আর বৎসর-খানেকের মধ্যেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া দেনাগ্রস্ত হইবেন। আপনার এইরূপ ব্যয় অন্য দিকে জমিদারী একরূপ দায় ও বোঝার মত হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তিহাটের কাছারির সংবাদ এই যে, গত বৎসরের মধ্যে জমিদারীতে একরূপ খাজনা আদায়ই হয় নাই। শুধু আমাদেরই নয়; সকলেরই এক দৃশ্য। অধিকাংশ জমিদারকেই দেনা করিয়া কালেক্টারী রেভেন্যু দাখিল করিতে হইয়াছে। গত বৎসর আমাদের সঞ্চিত তহবিল হইতে কালেক্টারী ও পত্তনী খাজানা দাখিল করিতে কুড়ি হাজার টাকার কিছু বেশী দিতে হইয়াছে। এবং তামাদির মুখে বাকী খাজনার নালিশ করিতে রশুম খরচ দিতে হইয়াছে আট হাজার টাকা।

এ টাকা কতদিনে আদায় হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আপনি এইরূপভাবে দেশান্তরে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া ঘুরিয়া না বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া সরেজমিনে সমস্ত দেখিয়া বুঝিয়া একটি নির্দিষ্ট পথে চলিবার ব্যবস্থা করুন। এদিকে যুদ্ধ বাধিয়াছে। অনেকে অনেক রকম বলিতেছে। আপনি সত্বর আসিয়া কার্যভার স্বহস্তে লইলে ভাল হয়।"

চিঠিখানা বৃন্দাবন আসবার দিন পনের আগে পেয়েছিলাম। এবং ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে জীবনের সঙ্গে বংশের ইতিহাসের সম্পর্কটা ঘুচিয়ে দেব। কিন্তু সেদিন মৃত্যুশয্যায় ঠাকুমা দেবেশ্বর রায়ের লাঞ্ছিতা গৃহিণী আমার পিতার গর্ভধারিণীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলাম—না জমিদারী বেচব না। রাখব—রাখবার চেষ্টা করব জমিদারী।

সত্যিই তো, কীর্তিহাটের লোকে দেখে যদি নমস্কার না করে কীর্তিহাট ঢুকব কি করে?

হঠাৎ হেসে ফেলে সুরেশ্বর বললে—কিছু মনে করো না সুলতা, তুমি পলিটিক্স কর—বল তো একবার মিনিস্টার হয়ে দেশের লোকের সেলাম নমস্কার কুড়িয়ে তারপর কি আর মিনিস্টার না হয়ে লোকের কাছে বের হওয়া যায়!

সুলতা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট রুমালখানা বের করে চোখ মুছে বললে—তোমার ঠাকুমার কথা বল। রাজলক্ষ্মী আর ভোটলক্ষ্মীতে এক ক'রে গণ্ডগোল করো না, পাকা সোনা আর গিল্টী এক নয়।

সুরেশ্বর বিষণ্ণ হেসে বললে—ঠাকুমার কথা তোমার ভাল লেগেছে সুলতা?

—প্রশ্নটা নাই বা করলে সুরেশ্বর। তিনি সত্যিই বাংলাদেশের জমিদারলক্ষ্মীর সিম্বল। বাংলাদেশের জমিদারেরা এই লক্ষ্মীর অঙ্গের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে বাঈজী পুষেছে, জুয়া খেলেছে, এই মাটির ছেলেদের ঘাড়ে বাপ-ছেলে-সম্পর্ক চাপিয়ে তাদের গোলাম করেছে। বল—তাঁর কথা বল।

সুরেশ্বর বললে—তিনি আর এক দিন বেঁচেছিলেন এই কথাবার্তার পর। মৃত্যু হল ভোররাত্রে। সকালবেলা হঠাৎ বললেন—নাতি তুই বিয়ে করবি নে?

বেশ ভাল সেদিন। সকালবেলা উঠে ইষ্ট স্মরণ করে মধু দিয়ে মকরধ্বজ খেয়ে গুন গুন করে নাম করছিলেন, আমি গিয়ে বসলাম। আমাকে হঠাৎ প্রশ্নটা করলেন।

মেজদি ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি বললেন—আপনি বলুন দিদি। বাপ-মা চলে গেছেন, একমাত্র তুমিই বলতে পার—বাধ্য করতে পার। বল তুমি।

—বিয়ে কর ভাই।

অর্চনা বলে উঠল—আমি ভেবেছিলাম ঠাকুমা, বিলেত গেল সুরোদা, মেমসাহেব বিয়ে করে ফিরছে। ওমা কোথায়?

—তা করলি নে কেন রে সুরেশ্বর?

হেসে বললাম—তোমার জন্যেই করি নি ঠাকুমা।

—কেন?

—তা হ'লে কি আমার হাতের শ্রাদ্ধের নৈবেদ্য তুমি খুশী মনে নিতে? নিতে পারতে?

—নিতাম। নিশ্চয় নিতাম। বিয়েতে জাত মানতে নেই রে। তুই বিয়ে কর, দেখ

তার সেবা তার হাতে জল আমি খাই কিনা।

সন্ধ্যেবেলা বললেন—কথাটা ডেকে বললেন—সুরেশ্বর, আমার শ্রাদ্ধ তুই করবি তো? যজ্ঞেশ্বর করবে না। সে এলো না। আমার ভিক্ষেশাশুড়ীর আশ্রমে আছি কিনা তাই। করবে না। তুই করবি?

চোখে আমার জল এল। বললাম—আমি যে তারই জন্যে ছুটে এসেছি ঠাকুমা।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখ, মেজঠাকুরপোর ছেলেরা আমাকে গোবিন্দের চত্বরে ঢুকতে দেয় নি। আমি সেই রাত্রে গোয়ানপাড়া গিয়েছিলাম, গির্জের পাদরীর কাছে, ভায়লার শ্রাদ্ধের জন্য টাকা দিতে। সেখানে জল খেয়েছিলাম। বড়বাবুর মৃত্যুর পর আমি মরতে পারি নি, সঙ্গে যেতে পারি নি, কিন্তু ভায়লা পেরেছিল, সে বিষ খেয়ে মরেছিল। সেইজন্যে আমার ইচ্ছে ছিল—বড়বাবুর শ্রাদ্ধ হল, ভায়লার শ্রাদ্ধ করুক ওরা। তা টাকা ওরা নেয় নি। এদিকে এরা আমাকে পতিত বলে মন্দিরে ঢুকতে দিলে না। যজ্ঞেশ্বর পাগল বলে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে। আমার কোম্পানীর কাগজ কেড়ে নিলে। মনে দুঃখ খুব পেয়েছিলাম, তাই পালিয়ে এসেছিলাম বৃন্দাবন। তা আমার বেশী ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ করবি ভাই, ওই কীর্তিহাটে গোবিন্দের নাটমন্দিরে, দানসাগর-টাগর নয়—চারটে ষোড়শ করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ।

বললাম—করব ঠাকুমা।

তিনি বললেন—সেই তুষ্টিরাম বামুনদের আনাস যেন। বুঝলি। চাবি দিয়ে ঘটি বাজিয়ে গান গাইবে—'ওগো সুরেশবাবু গো, শ্রবণ কর, তুমি শ্রবণ কর গো। তোমার পুণ্যবতী পিতামহী উমাদেবী বৃন্দাবনে গোবিন্দের রাঙা চরণতলে তাঁর মুখারবিন্দ দেখতে দেখতে দেহত্যাগ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে যমুনায় গিয়ে স্নান করে দিব্য নববস্ত্র পরিধান করলেন, ললাটে নাসিকায় তিলক আঁকলেন, বক্ষস্থলে রাধা-গোবিন্দ নাম লিখলেন এবং গোবিন্দমন্দিরে রাধা-গোবিন্দকে দর্শন করে বাহিরে এলেন, সেখানে মকরকেতনে রতিপতির মত দিব্য মনোহরকান্তি তোমার পিতামহ, বড় রায় মহাশয় সমাদর করে বললেন—এস, এস, এস আমার প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী, আমি তোমাকে স্বর্গধাম থেকে নিতে এসেছি—এস—"

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল সুলতা, দু চোখে ধারা বেয়ে নামত লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কেঁদেছিলাম। মেজদি কেঁদেছিলেন হা-হা করে। অর্চনা কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার জীবনের সমস্ত অবরুদ্ধ বাসনা অতৃপ্ত কল্পনা সেদিন শ্রাবণের বর্ষণের মত ঝরঝর ধারায় যেন ঝরে পড়েছিল আমাদের সবারই চোখের জলের ধারায়। কিন্তু যখন মারা গেলেন, তখন একটি কথাও বললেন না। কাউকে ডাকলেন না। আমরা কেউ জানতেই পারলাম না; শুধু সকালে উঠে অর্চনা এবং মেজঠাকুমা দেখলেন, ঠাকুমা নেই, তিনি চলে গেছেন।

রায়বংশের ইতিহাস এবার মোহনার মুখে নদীর অবস্থার মত। গোটা জাতটার জীবনে তখন জোয়ার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের জীবনস্রোতের মুখে বালির চড়া ঠেলে দিয়েছে; গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে; কোনক্রমে শতধারা হয়ে নালার মত ধারায় দু'-চারটে স্রোত গিয়ে

পড়ছে। বাকি সব মজা বিলের মত কাদায়-জলে থক-থক করছে।

সুতরাং জবানবন্দী এখানেই শেষ হত। আমি সঙ্কল্পমত জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে রায়দের বংশতালিকা হতে স্বচ্ছন্দে নাম কাটিয়ে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারতাম। সম্পত্তি বিক্রী না করলে রায়বাড়ীর কৃতকর্মের জের থেকে রেহাই নেই। একটা বিচিত্র কথা বলি, সংসারে ধর্মান্তর গ্রহণ করলে বা জাত ফেলে দিয়ে বংশতালিকা থেকে নাম কাটিয়েও রেহাই মেলে না, সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে শরিকদের দায় ঘাড়ে চাপে। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রী করে দিলেই তুমি খালাস। সে খালাস আমার আর হল না; হল না ঠাকুমার জন্যে। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, সম্পত্তি বেচব না। অবিশ্যি তাঁকে কথা না দিলেও আমি বেচতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আজও মনে হচ্ছে বিক্রী করাই উচিত ছিল, কিন্তু বেচতে বোধ হয় পারতাম না। সম্পত্তির মমতায় যে-কথা ঠাকুমা বলেছিলেন, সেটা মিথ্যে নয়। ভূমির মত সম্পত্তি নেই। ভূমির উপর অধিকার কায়েম করতে পারলে গাছপালা, ফলফুল, জীবজন্তু থেকে মানুষ পর্যন্ত তার সম্পত্তি হয়।

কথাটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম কীর্তিহাটে ফিরে এসে। না, যা ভাবছ তা নয়। প্রজারা সম্বর্ধনা করে নি, তারা গ্রাহ্যই করে নি বলতে গেলে, শরিক অর্থাৎ রায়বাড়ীর মেজতরফের যাঁরা তখনও সক্রিয়, তাঁরা বিরক্ত হলেন, বিদ্বিষ্ট হলেন, এ আপদ আবার কোত্থেকে এল। গ্রামের প্রধান এবং নায়ক তখন কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট। মানুষেরা তাঁকেই মানে। জমিদারের বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত মনোভাব, গর্তের সাপের মত অহরহ উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মত অনুভব করা যায়। তবু ভাল লাগল। রায়বাড়ীর ইঁট-কাট, বাড়ীঘর, পুকুর বাঁধাঘাট, গাছপালা, ক্ষেতখামার—নদীর ওপারে সিদ্ধাসন, জঙ্গলের ওপাশে গোয়ানপাড়া, সবই যেন মনকে ভরে দিলে। যেন আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

শতজনের বিমুখতা এবং অপ্রসন্নতা আমাকে অথবা কীর্তিহাটের প্রকৃতিকে বা রায়বাড়ীকে অপ্রসন্ন করতে পারে নি; অন্ততঃ আমার চোখে দোল-খাওয়া গাছপালা, পাখীর ডাক আমার কানের কাছে বার বার বলেছিল, আমরা তোমার, আমরা তোমার। আমার মন বলেছিল—এসব আমার, এসব আমার!

ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন অগ্রহায়ণ মাসে; প্রথম দশদিনে একটা তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ বৃন্দাবনে করেছিলাম। টেলিগ্রামে জ্যাঠামশাইকে খবর দিয়েছিলাম; কীর্তিহাটে খবর দিয়েছিলাম। প্রথম শ্রাদ্ধ শেষ করে অর্চনা এবং মেজদিকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছিলাম। কলকাতায় মাস দুয়েক থেকে ফাল্গুনের প্রথমে কীর্তিহাটে এলাম। এলাম ওই ঠাকুরমাকে দেওয়া আমার কথা রাখবার জন্য। ওখানে গোবিন্দমন্দিরের চত্বরে, যে চত্বরে মেজতরফের ধনেশ্বর রায় এবং জগদীশ্বর রায় ঠাকুমাকে ঢুকতে দেয় নি, সেই চত্বরে ঘটা করে একটি শ্রাদ্ধ আমি করব। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। চারটি ষোড়শ করব, তার মধ্যে একটি রূপোর। এই সব কল্পনা করে কীর্তিহাটে ফিরলাম। নায়েবকে লিখেছিলাম, এখন হয়ত কিছুদিন থাকব ওখানে। সুতরাং ওখানকার বাড়ীঘর মেরামত করবার ব্যবস্থা করবেন এবং বাড়ীর ভিতরটা সবই চুনকাম এবং বাইরেটা রঙ ফেরাবেন। শরিকেরা যদি তাঁদের অংশে রঙ ও চুনকাম

করতে বাধা দেন, তবে তাঁদের অংশ বাদ দিয়ে আমার অংশই করাবেন।

অনুমান করেছিলাম, বাধা কেউ দেবে না। সে অনুমান ষোল আনার মধ্যে একের ছয় মিথ্যে হয়েছিল, বাকী পাঁচের-ছয় ভাগ হয়েছিল সত্যি; এক ধনেশ্বরকাকা ছাড়া বাকী সকলেই মত দিয়েছিলেন। শুধু ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন, না। আমার অংশ বাদ দিও। রঙের পোঁচড়া আমার অংশে যেন না ঠেকে।

হয়ত জগদীশ্বরকাকা থাকলেও ওঁর সঙ্গে সায় দিতেন; কারণ ঠাকুমার দরজা আটকাতে দুই ভাই দাঁড়িয়েছিলেন এবং ধনেশ্বরকাকাই বলেছিলেন অপ্রিয় কথাগুলি। সে-কথা ধনেশ্বর-কাকা ভুলতে পারেন নি। এবং আমার টেলিগ্রাম যখন ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এখানে তাঁর কাছেই পৌঁছেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, না, অশৌচ নেব না। নিতে আমি পারি না। কিন্তু নিতে তাঁকে হয়েছিল গোবরডাঙার খুড়ীমার নির্দেশে এবং আরও একজন এ নির্দেশ দিয়েছিল, সে হল অতুলেশ্বর। অতুলেশ্বর সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে। গোবরডাঙার খুড়ীমা বলেছিলেন—বাতে পঙ্গু হয়েছ, এবার মুখ থেকে পোকা পড়বে ও কথা বললে। কোন মুখে বলছ এ কথা? অশৌচ নেবে না?

অশৌচ তিনি নিয়েছিলেন, কিন্তু বাড়ী মেরামতের চুনকামের প্রস্তাবে তাঁকে কেউ নড়াতে পারে নি। গোবরডাঙার খুড়ীমা অনেক অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু ধনেশ্বরকাকা কিছুতে রাজী হন নি। না, তা আমি পারব না, এই হয়েছিল তাঁর বুলি, তখন তিনি ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি বাত। বাতে তখন তিনি পঙ্গু। যৌবনের দুরারোগ্য যৌনব্যাধির পরিণাম।

মনে মনে দুঃখ পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম এই জন্তে যে, ওঁরা যাই করে থাকুন, আমি আজও পর্যন্ত তো ওঁদের সঙ্গে কোন বিরোধ করি নি। তবে কেন প্রত্যাখ্যান করলেন! ঠকিয়ে বা জবরদস্তি করেও তো অনেক কিছু নিয়েছেন আমার, তবে যখন আমি উপযাচক হয়ে তাঁর অংশের বাড়ী মেরামত করাতে চাইলাম, তখন না বললেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে আবার ভালও লেগেছিল। তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধের এক কুচি সোনার মতই ভাল লেগেছিল।

* * *

বিচিত্র মানুষের মন, আর তার থেকেও বেশী বিচিত্র মানুষের কর্মফেরের জের, এদের নাগপাশ থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই। গ্রামের লোকেদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ঠাকুমার শ্রাদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্ত বলতে গিয়ে মনে বড় কষ্ট পেলাম।

লোকের বাড়ী বাড়ী যাবার জন্তে পরামর্শ দিয়েছিলেন নায়েব। বললেন—আগের কালে রায়বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে গ্রামে লোকের বাড়ী যাওয়া হত না, ডাকাও হত না; শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়াতে অধিষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করতে যেতেন বাড়ীর পূজুরী আর আহারের নিমন্ত্রণ করতেন ঠাকুরবাড়ীর পরিচারক। পান-সুপুরি-পৈতে দিয়ে বরণের ব্যবস্থা আছে, তা কর্তারা থালাখানা এনে আসরে নামিয়ে দিয়ে বলতেন, ব্রাহ্মণেভ্য নমঃ। বলে চলে যেতেন। আপনার মাতৃশ্রাদ্ধেও তাই হয়েছে। কিন্তু এখন হালচাল পাল্টে গিয়েছে বাবু; এখন নিজে না গেলে লোকে ঠিক—। অতুলেশ্বর তখন খালাস হয়ে এসেছে, সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে,

আমাকে সে প্রায় নির্দেশ দিয়ে কথা বললে। বললে—লোকের বাড়ী বাড়ী যেতে হবে তোমাকে। নাহলে আমি বারণ করব। আমি হেসে বললাম—নিশ্চয় যাব। জমিদার আমি সাজব না। কিন্তু কল্যাণেশ্বর প্রভৃতি রায়বাড়ীর নবীনেরা বললে, দেখ, আমাদের মেজ-তরফে ভাঁটা পড়েছে, আমরা যাই যাই, তুমি যাবে কেন? তুমি সে ইজ্জতটা রাখ। তুমি তো এখানে থাকবে না, সুরোদা! অতুলকার কথা তুমি শুনো না।

মেজদি বললেন—না সুরো, তুই অতুলের কথা শোন।

অর্চনা বললে—না সুরোদা, তুমি যাও।

গোবরডাঙার খুড়ীমা ডেকে বললেন—সুরেশ্বর, তুমি কল্যাণদের কথা শুনো না। তুমি যাও। তোমার পিতামহীর শ্রাদ্ধ, তোমার কর্তব্য, তুমি যাও।

শুধু ব্রাহ্মণবাড়ী নয়, সুলতা—গ্রামের সকল পাড়ায় পাড়ায় প্রধানদের বাড়ীতে বাড়ীতে যেতে হল। রায়বাড়ীর নিমন্ত্রণ বরাবরই পঞ্চগ্রামের-সপ্তগ্রামের, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতারা নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছে, কিন্তু সেকালে নিমন্ত্রণ হত পাড়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রণ ছুঁড়ে দিয়ে; একখানা করে রোকা পাঠাতে হত। লেখা থাকত "অত্র রোকায় রায়বাড়ীর নিমন্ত্রণ জানিবা। রায়বাড়ীতে ··উপলক্ষ্যে ভূদেব ভোজন হইবেক এবং তৎপর অন্যান্য সকলজনকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইবেক, উক্ত ভোজনের আসরে তোমাদের পাড়ার সকলকে মায় আগত-স্বগত কুটুম্বস্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো যাইতেছে।"

এবার আর রোকায় নিমন্ত্রণ চলল না, আমাকে যেতে হল। গেলাম পাড়ায় পাড়ায়। ব্রাহ্মণ এবং বর্ধিষ্ণু শূদ্রদের ঘরে ঘরে। তারপর শ্রাদ্ধের আয়োজনের পরামর্শের জন্য সর্বাগ্রে আহ্বান জানাতে হল কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টকে।

সেখানে নিয়ে গেল অতুলেশ্বর।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রঙ্গলাল ঘোষ তখন নেই। মারা গেছেন। তাঁর জায়গায় প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাঁর উকিল ছেলে। অতুলেশ্বর সেক্রেটারী। গ্রামে সদ্গোপদের সংখ্যাধিক্য, সুতরাং প্রেসিডেন্ট তারা ছাড়া কেউ হতে পারে না। রঙ্গলাল ঘোষের সেই উকিল ছেলেটি দাবী করলেন শ্রাদ্ধ যে রকমই করি, যত খরচই করি, কংগ্রেস কমিটির সামনে একটা সংগ্রাম আসছে, তার জন্য কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা দিতে হবে। সেও দিতে আমি রাজী হলাম, কিন্তু তবু পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেলাম না ওদের কাছে। তার কারণ ওই গোয়ানপাড়ায় ভায়লেটের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করবার সংকল্প করেছিলাম। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বেঁকে বসলেন ওই কথায়—না, তা করতে পাবেন না।

ঠাকুমা বলে গিয়েছিলেন তাঁর শ্রাদ্ধের সঙ্গে যেন ভায়লার জন্যে কিছু করি। বলেছিলেন—ওরে, বড়বাবু মারা গেলেন ভায়লার পিছনে ছুটতে গিয়ে। আর বড়বাবু মারা গেলে আমি মরতে পারলাম না, ভায়লা অনায়াসে বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

ভায়লেট মেয়েটি গলায় কেন দড়ি দিয়েছিল জানি না, তবে আমার ঠাকুমা তার ওই ব্যাখ্যাই করেছিলেন। এবং স্বামীর শ্রাদ্ধের দিনে রাত্রি এক প্রহরের সময় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন গোয়ানপাড়ায় গির্জের পাদরীর কাছে; ভায়লেটের শ্রাদ্ধ হোক, এই তিনি

চেয়েছিলেন। কিন্তু তাও হয় নি, কারণ গভীর রাত্রে কারুর দেখা পান নি। ফলে রায় বাড়ীতে মেজতরফ তাঁকে—।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—আমি তাঁর কথায় সঙ্কল্প করেছিলাম, গোয়ান-পাড়ায় ভায়লেটের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করে দেব। আর ভায়লেটের কবরের যদি কোন সন্ধান মেলে, তবে কবরটিতে অন্ততঃ একটা মার্বেল ক্রশ বসিয়ে কবরটি মার্বেল দিয়ে ঢেকে দেব। কিন্তু বাধা পড়ল তিন দিক থেকে। কীর্তিহাটের কংগ্রেস ও গ্রামের তরফ থেকে, রায় বাড়ীর ছেলেদের তরফ থেকে এবং সব থেকে আশ্চর্যের কথা, গোয়ানপাড়া থেকেও এল বাধা।

* * *

ঠাকুমা যদি কীর্তিহাটে তাঁর শ্রাদ্ধ করতে না বলতেন, আর ভায়লেটের স্মৃতির জন্যে কিছু না বলতেন, তবে এইখানে ছেদ টেনে দিয়ে বলতাম,—এই শেষ। কলকাতায় থাকতাম, নায়েব-গোমস্তরা জমিদারী চালাত, হিসেব দিত; আমি নিশ্চিন্ত মনে আজকের দিনটির অপেক্ষা করে থাকতাম। কিন্তু ঠাকুমার শেষ ইচ্ছা পালন করতে গিয়ে প্রথমেই পেলাম বাধা।

কীর্তিহাটের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বললেন—গোয়ানপাড়ায় কিছু করা হবে না। করতে গেলে বাধা পড়বে। গ্রামের লোকে হয়তো খাবে না। আপনাকে ওদের নিয়েই থাকতে হবে।

না খাওয়ার অর্থ ভীষণ। অন্ততঃ আমার ঠাকুমার শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে। তাহলে যে অপরাধে তাঁকে রাধাসুন্দরের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি, যে অপরাধে তাঁর ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় তাঁর পৈতৃক কোম্পানীর কাগজ তাঁদের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সেই অপরাধ কায়েম হয়ে যাবে।

গোয়ানপাড়ার ক্রীশ্চান বাসিন্দেরা সেই ভোটের সময় থেকে কংগ্রেসবিরোধী—ইংরেজদের সমর্থক হয়েছে প্রকাশ্যে। তাদের সঙ্গে মুসলীম লীগের পাণ্ডারা হাত মিলিয়েছে।

তার সঙ্গে মনে পড়িয়ে দিলে অতুল—তুমি তো একবার ভুগেছ। ভোটের পর গোয়ান-পাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল কারা; তুমি তাদের ঘর নতুন করে গড়বার জন্যে সাহায্য করতে চেয়েছিলে, তার জন্য—।

সবটা না বলে অতুল থেমে গেল। জানে তো মনে আমার আছে। শুধু বলে দিলে এবার আবার তার থেকেও কিছু বেশী হবে।

আমি অতুলকে বলেছিলাম—অতুলকাকা, এটাও তো জান যে, সেদিন পুলিস এসে যখন আমাকে রক্তমাখা অবস্থায় পেয়েছিল, তখন আমি যে জবানবন্দী দিয়েছিলাম, তার জন্যেই কীর্তিহাটের গ্রামের কারুর গায়ে আঁচ লাগে নি।

—জানি। কিন্তু সে না করে তোমার উপায় ছিল না। সে করতে তুমি মরালি বাধ্য ছিলে।

—মরালি বাধ্য ছিলাম?

—অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।

একটু ভেবে আমি বলেছিলাম—তাই যদি মনে কর অতুলকাকা, তবে আমি আর তোমার বা তোমাদের সাহায্য চাইব না। আমি যা পারি যেমন পারি নিজেই করব। গ্রামের

লোক যা করে করুক।

—বেশ কর।

অতুল চলে গিয়েছিল। মেজদিদি, অর্চনা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অতুল এমন কথা বলতে পারে, তারা তা ভাবতে পারে নি।

সাহস দিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গোবরডাঙার খুড়ীমা। এবং শেষ শয্যায় শুয়ে ধনেশ্বর রায়। ক'দিনের মধ্যে তিনি ভেবে ভেবে সব চক্ষুলজ্জা, সব মিথ্যে মর্যাদার মোহ ত্যাগ করে নিজের বিগত অন্যায়কে স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন। স্বীকার করেছিলেন—"রাধাসুন্দরের চত্বরে সেদিন উমা দেবীকে ঢুকতে দেই নি, বড়তরফকে দেবোত্তর থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে। কিন্তু বড়তরফের বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর রায় জটিল বিষয়ী এবং দুর্দান্ত নিষ্ঠুর। তিনি মাকে পাগল বানিয়ে তাঁকে বৃন্দাবনে বনবাসে দিয়ে বিষয়ের মুঠো এতটুকু আলগা হতে দেন নি। আমি দোষ স্বীকার করছি। তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করে যাব সুরেশ্বর, আমি বিছানায় শুয়ে এই পঙ্গুদশায় যতটা পারি সাহায্য করব।"

গোবরডাঙারখুড়ীমা বলেছিলেন—তুই পিছিয়ে আসিস নে সুরেশ্বর। জ্যাঠা মায়ের শেষ ইচ্ছে তোকে পূর্ণ করতেই হবে। ভায়লেট মেয়েটা তাঁর মরণের খবর পেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছিল, এ ভালবাসা কে অস্বীকার করবে! জ্যাঠাইমার মত সতীসাধ্বী হয় কে? ভায়লেটের ভালবাসার দাম তিনি বুঝবেন না তো বুঝবে কে?

বাধা এল অন্য দিক হতে। গোয়ানদের দিক হতে। তারা বললে—ভায়লেটের কবর তারা ছুঁতে দেবে না। সে কবর যেমন আছে তেমনি থাকবে। চাই নে তার মার্বেলের আবরণ, মার্বেলের ক্রশ। দেবেশ্বর রায়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল এ কথা যে বলবে তার জিভ তারা ছিঁড়ে নেবে।

দিন-সাতেকের মধ্যেই আমার নামে একটা নোটিশ এল। তমলুকের এস-ডি-ও আদেশ জারী করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, গোয়ানপাড়ার কবরস্থানে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তোমাকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, সেখানে কোন কিছু করবার চেষ্টা যেন না করা হয়। লোকজনসহ সেখানে যেন না যাই।

আমি নায়েবকে বললাম—গোয়ানপাড়ার কে এসেছে নোটিশ জারী করাতে, তাকে ডাকুন।

নায়েব বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বললে—ওরা কেউ আসবে না।

আমি নিজে বাইরে গেলাম। দেখলাম আদালতের পিওনের সঙ্গে তিন-চারজন গোয়ান এসেছে। তাদের নাম মনে পড়ল না। ভুলে গেছি বছর দুয়েকের মধ্যে। তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম—দু বছর আগে যখন তোমাদের ঘর পুড়েছিল, তখন তোমাদের টাকা দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের অপমান করি নি। ভায়লেটের কবর আমি বাঁধিয়ে দিতে চাই, তোমরা দেবে না। ভাল কথা। কিন্তু ভায়লেটের নামে যদি চার্চে টাকা দিই বা তার নামে একটা কিছু করে দি গোয়ানপাড়ায়, তাহলে তাও কি নেবে না তোমরা?

ওরা চুপ করে রইল। এ-ওর মুখ তাকালে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারিলে না। চলে

গেল। বিকেলবেলা বিবিমহলের ঘরে বসেছিলাম, রঘু এসে বললে—সেই মেয়েটি এসেছে। সেই কুইনী বলে মেয়েটি। তার সঙ্গে আছে পাড়ার পাদরী সাহেব।

কুইনী এল যেন জ্বলতে জ্বলতে। প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে। সে বললে—না, গোয়ানপাড়ার কেউ কিছু নেবে না আপনার কাছে। আপনারা বড়লোক, আপনারা লজ্জাহীন, আপনারা অন্ধ, আপনারা অনুভবশক্তিহীন; আপনারা মনে করেন দুনিয়াকে আপনারা কিনে রেখেছেন; জমির জমিদারীস্বত্ব কিনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও কিনেছেন ভেবেছেন। চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, মনে অনুভব করতে পারছেন না যে দিনকাল পাল্টেছে; মানুষ আর আপনাদের হুকুম মানবে না, আপনাদের দেওয়া অপমান সইবে না। কেন আপনি এমন করে অপমান করতে চাইছেন আমার মাতামহের মা লায়লেট পিক্রুসকে? কি অধিকার আপনার?

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে সে হাঁফাতে লাগল।

আমি অবাকবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

সুলতা—নারীর প্রতি পুরুষের মোহ যদি পাপ হয় তবে পাপদৃষ্টি দিয়েই আমি তাকিয়েছিলাম তার দিকে। বিলেতে হারা রে এবং লরা নাইট অথবা শম্পা রের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে তরুণী নারীর দিকে মোহ নিয়ে তাকাতে গেলেই কেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটত আমার; ধীরে ধীরে তার মুখে চোখে রঙে হাসিতে অশ্রুতে রায়বংশের কারুর না কারুর আদল ভেসে উঠত, জীবন আমার শামুকের মত খোলার মধ্যে গুটিয়ে যেত; এই প্রথম কুইনীর সামনে তার ব্যতিক্রম ঘটল।

মনে পড়ল, মেদিনীপুরের বাসায় ওকে দেখে আমার জীবনে সর্বপ্রথম এই মোহময় বাসনা জেগেছিল। প্রথম যৌবনে তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু জীবনের বাসনা এমনভাবে জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হয়ে অজস্র ফেনা মাথায় করে ফুলে-ফেঁপে ওঠে নি। আদিম মৌলিক দেহবাদের প্রথম উচ্ছ্বাস। রায়বংশে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে ধর্ম শক্তি ও সম্পদের লালনে এই দেহবাদ দুর্দান্ত-দুর্দমনীয় হয়ে রক্তের মধ্যে মিশে ছিল, আজ তাতে প্রবল জোয়ার এসেছে। মেদিনীপুর বাসার সেদিনের উচ্ছ্বাসের প্রথম জাগরণ।

এবার দু বছর পরে কুইনী আরও মোহময়ী হয়ে উঠেছে আমার চোখে।

আমার প্রপিতামহ রায়বাহাদুরের অতৃপ্ত কামনা যেন আমার এই কামনার মধ্যে ফুটেছে।

আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের ভায়লেটের প্রতি যে কামার্ততা, তা যেন আমার বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদ্গার করছে।

ওকে না পেয়েই জীবন আমার শূন্য হয়ে রয়েছে।

ওর উপর অধিকার রয়েছে। ও আমার। অঞ্জনার মেয়ের বংশের মেয়ে, দেবেশ্বর রায়ের প্রথম ভালবাসার (হোক সে অবৈধ ভালবাসা) ফল, প্রথম সন্তানের দৌহিত্রী। ওকে আমিই লেখাপড়া শিখিয়ে এমন রূপে ফুটিয়েছি, ও আমার। ওকে আমায় পেতেই হবে। মনে পড়ল, গতবার পুলিসের হাত থেকে রায়বংশের সন্তানদের এবং এই গ্রামের লোকেদের, বিশেষ করে রঙলাল ঘোষকে বাঁচাবার জন্য বলেছিলাম—"আমার কুইনীর ওপর

দুর্বলতা আছে।"

সে কথাটা আমি মিথ্যা বলি নি। সে কথা সত্য।

কুইনীকে দেখছিলাম। আর মনে হচ্ছিল—।

থামল সুরেশ্বর। চোখ বুজে মনে মনে কোন ভাবনা বা চিন্তাকে উপভোগ করলে সে, মুখে ক্ষীণ রেখায় একটু হাসি ফুটে উঠল। একবার ঘাড়ও নাড়লে, মনে মনে কোন মধুর চিন্তা উপভোগ করার আনন্দে। তারপর বললে—তুমি গিরিশবাবুর বিল্বমঙ্গল পড়েছ বা অভিনয় দেখেছ সুলতা? আমি পড়েছি, অভিনয়ও দেখেছি এ্যামেচারে। তাতে চিন্তামণির রূপ এবং দেহ-মোহে অন্ধ বিল্বমঙ্গল বাপের শ্রাদ্ধের দিন শ্রাদ্ধ করেই চিন্তামণির বাড়ী রওনা হচ্ছে দুর্যোগ মাথায় করে। তুফানে প্রলয়ঙ্করী নদী, খেয়াঘাটে নৌকা নেই, কিন্তু এ উন্মত্ততার কাছে বাধা নয়। সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কাঠ বলে একটা গলিত শবকে আশ্রয় করে নদী পার হল। বাড়ীর পাঁচিলের গর্তে মুখ ভরানো সাপের লেজ ধরে পাঁচিলে উঠে চিন্তামণির ঘরে এল। চিন্তামণির বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে উঠে সব দেখে বললে—তুমি কি? বিল্বমঙ্গল তার মুখপানেই অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, অন্য কথা নেই, শুধু একটি কথা—"চিন্তামণি, তুমি অতি সুন্দর! তুমি অতি সুন্দর!"

আমি ঠিক সেই ভাবেই কুইনীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আশ্চর্য মোহ কুইনীর সর্বাঙ্গে। তার রুক্ষ চুলে, তার রুক্ষ সৌন্দর্যে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মধ্যে ঈষৎ একটা বিদেশী ফ্যাকাশে আভাস। তার আয়ত চোখের শুভ্রচ্ছদের মধ্যে ঈষৎ নীলাভা, আর চোখের তারা কালো নয় পিঙ্গল; তাও আমার কাছে অপরূপ বলে মনে হল।

আমি তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

পুরাণের কাল হলে বলতাম, আমি মদন-বাণ-বিদ্ধ, জর্জরিত। অতি-বাস্তববাদীর ভাষায় আমি তখন আদিম-কামনায় আদিম মানুষের মতই কামার্ত।

কুইনী আমার সে-দৃষ্টির সম্মুখে কেমন যেন ভীতার্ত হয়ে উঠল, বোধ করি আমার দৃষ্টির উত্তাপ তাকে ঝলকে দিচ্ছিল। ভয়ে সে নিজের পাশের দিকে শঙ্কিতদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিলে, তার সঙ্গী বৃদ্ধ পাদরী বসে আছেন কিনা। তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে আমাকেই তিরস্কার করে তাঁকে বললে—উঠে আসুন ফাদার। উনি শুধু অসভ্যই নন, উনি বর্বর। ওঁকে আমি ঘৃণা করি। আই হেট হিম।

আমার দিকে তাকিয়ে বললে—আর আপনি আমাদের এমন করে অপমান করবেন না। ভায়লেট পিক্রুজের আত্মাকে শান্তিতে কবরের তলায় ঘুমুতে দিন।

আমি শুধু একটা কথা বলেছিলাম—আমাকে তুমি ভুল বুঝো না কুইনী। তুমি আমার উপর অবিচার করছ। অপমান আমি তোমাদের করি নি। আমার পিতামহ ভায়লেট পিক্রুজকে ভালবাসতেন এবং ভায়লেটও তাঁকে ভালবাসত।

কুইনী দাঁড়ায় নি, শুনতে চায় নি সে এ-কথা, দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। এতক্ষণে বৃদ্ধ পাদরী আমাকে বলেছিলেন—কুইনী ঠিক বলেছে সুরেশ্বরবাবু, কেন একটি দুঃখিনী মেয়ের অশান্ত আত্মার গলায় কলঙ্কের মণিহার পরিয়ে তাকে আরও দুঃখ দেবেন, লজ্জা

দেবেন! তাছাড়া আর একটা কথা বলি—। আপনি গোয়ানদের জন্তে অনেক কিছু করেছেন। এই চার্চের জন্ত জমি দিয়েছেন, অর্থও দিয়েছেন। তাই আপনার মঙ্গলের জন্তই বলছি, ওরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিছু করতে গেলে হয়তো গোয়ানরা আপনার অনিষ্ট করবে।

* * *

তাতে আমি ভয় পাই নি সুলতা। তখন রায়বংশের রক্ত আমার মধ্যে জেগে উঠেছে। ভয় আমি গোয়ানদেরও পাই নি, কীর্তিহাটের লোকেদেরও পাই নি—আমি ঠাকুমার শ্রাদ্ধে দু'হাত খুলে খরচ করেছিলাম। ব্রাহ্মণদের ভোজন-দক্ষিণা দিয়েছিলাম, দীয়তাং ভুজ্যতাং রব তুলেছিলাম ভোজন আয়োজনে।

তখনও ১৯৪১ সাল সুলতা। জ্যৈষ্ঠ মাস, তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইয়োরোপ-আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ; ফ্রান্স পড়েছে। ডানকার্ক থেকে ইংরেজ কোনও রকমে প্রাণ-মান বাঁচিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছে। হিটলার বলকানে ঢুকেছে। আফ্রিকায় নতুন ফ্রন্ট খুলেছে। আবিসিনিয়ায় ইটালীর বাহিনীর সঙ্গে তার শুরু। তখনও ভারতবর্ষে তার আঁচ পৌঁছোয় নি, জিনিসপত্রের বাজারে ধানচালের গোলায় কন্ট্রোল বসে নি; তখনও বাজার সস্তাগণ্ডা, তখনো শ্রাদ্ধে বিবাহে ক্রিয়াকর্মে বাধানিষেধ নেই। আমি প্রচুর আয়োজন করে ঠাকুমার শ্রাদ্ধ সমারোহের সঙ্গে সুসম্পন্ন করলাম।

পরামর্শটা দিলেন বড়জ্যাঠামশাই।

যজ্ঞেশ্বর রায়। দেবেশ্বর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র; রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম পৌত্র। রায়বংশের মধ্যে নারী সম্পর্কে রত্নেশ্বর রায়ের পর সংযমী পুরুষ। তিনি হাই ব্লাডপ্রেশার নিয়েও এসে শ্রাদ্ধ করে চলে গেলেন। মায়ের শেষকৃত্য করে প্রায়শ্চিত্তই শুধু করলেন না, উমা দেবীর গহনার অর্ধেক ভাগ নিয়ে চলে গেলেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন।

বললেন—রায়বাহাদুর বলতেন, যেখানে চামড়ার জুতো চলে না, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়। পথের ধুলোর উপর হাঁটবে, তখন চামড়ার জুতো পরো, মানুষের মাথার উপর দিয়ে হাঁটতে হলে রুপোর জুতো তৈরি করে পরো, দেখবে মানুষগুলো মাথা পেতে দিয়ে বলবে—আমার মাথায় পা রাখুন। টাকা তোমার আছে সুরেশ্বর, তাই খরচ করে তিনি যা বলে গেছেন তাই কর। যখন করতে নেমেছ তখন পিছিয়ো না। টাকায় সব হয়।

তর্ক নিশ্চয় উঠবে। এবং কথাটাও নিশ্চয় সত্য নয়। কিন্তু তখন সত্য মনে হয়েছিল, সত্য হয়েও উঠেছিল। শ্রাদ্ধে কোন বাধা আসে নি। তবে হ্যাঁ, গোয়ানপাড়া নিমন্ত্রণ নেয় নি কিন্তু কিছু দরিদ্র গোয়ানরা গোপনে এসে মিষ্টি খেয়ে গিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, সংকল্প যা করেছিলাম তা কোনটা অপূর্ণ থাকে নি, তা রাখি নি আমি। শ্রাদ্ধের পরদিনই কাঙালী-বিদায় কাঙালী-ভোজনের মধ্যে আর একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীর সঙ্গে দেবেশ্বর রায় হসপিটালের পত্তন করেছিলাম। তাতে উমা দেবীর নামে চারটে বেড। আর একটা বেড ছিল অহিন্দুদের জন্ত রিজার্ভড। তাঁর নাম কি হবে তা বলি নি, তবে বুঝতে কারুর বাকি থাকে নি ওই বেডটি

শেষ পর্যন্ত কার নামে হবে। তবু কেউ জিজ্ঞাসা করে নি বা করতে সাহস করে নি।

অতুলেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিল—এই বেডটা কি—

বলেছিলাম—অহিন্দু ক্রীশ্চান মুসলমানদের জন্যে থাকবে।

—কার নামে হবে?

—অনুমান করতে তো পেরেছ। কিন্তু ওতে আপত্তি করলে হাসপাতাল আমি এখানে করব না। আশা করি এতে তোমাদের জোর খাটবে না।

অতুলেশ্বর চুপ করেছিল। গোয়ানরা কেউ আসে নি। তবে আলোচনা করেছিল। তাতে তারা অখুশিত্ব প্রকাশ করে নি। খুশি হয়েছে এইটে গোপন করেছিল।

আর একটা মন্দির গড়েছিলাম। গড়েছিলাম সিদ্ধাসনের জঙ্গলে, ছোট একটি মন্দির তৈরী করিয়েছিলাম—পনের ফুট উঁচু মন্দির। যে-ঘরটায় শ্যামাকান্ত মনোহরা যোগিনীকে নিয়ে শক্তিসাধনা করেছিলেন বা শক্তিসাধনার নামে ব্যভিচার করেছিলেন, যে-ঘরে সতেরো বছরের তরুণ কন্দর্পের মত দেবেশ্বর রায় চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরী ভায়লেটের সঙ্গে প্রথম মিলিত হয়েছিলেন, দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর যে-ঘরে চালের কাঠে দড়ি বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল ভায়লেট, সেই ঘরের ভাঙা দেওয়ালগুলোর ভিতে ভিত খুঁড়ে মন্দিরের পত্তন করেছিলাম। সিদ্ধাসনের একটি মার্বেলের বেদী তৈরি করিয়ে দেবার সংকল্প করেছিলাম।

বোধ হয় তোমার মনে আছে, ওই সিদ্ধাসনে পুজো শুধু হিন্দুরাই দিত না, গোয়ানরাও দিত; হিন্দুরা পাঁঠা বলি দিত বিজয়া-দশমীর দিন—গোয়ানরা নৈর্ঋত কোণে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মুর্গী বলি দিত।

বাতাসা-মণ্ডার পুজা ভোগ দিতে তারা বেদীর কাছে এসে নামিয়ে দিত। ১৯৪১ সাল '৪২ সাল পর্যন্তও দিয়েছে।

৪১ সালে হাসপাতালের সঙ্গে ভিত পত্তন করেছিলাম এবং মনে মনে সংকল্প করেছিলাম—মন্দির সম্পূর্ণ হলে ওই মন্দিরের মেঝেতে বেদীর নীচে একটা মার্বেল ট্যাবলেট বসিয়ে দেব, যাতে লেখা থাকবে—'যে-নারী তাঁর প্রেমাস্পদের মৃত্যুতে বিরহ সহ্য করতে না পেরে এখানে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছিলেন, তাঁর অক্ষয়স্বর্গ হয়েছে এই সিদ্ধাসনের প্রসাদে।'

মুখে সংকল্প প্রকাশ করি নি। গোড়ায় কেউ বুঝতেও পারে নি।

* * *

এক বছর পর।

১৯৪২ সাল, অক্টোবর মাস। তখন মেদিনীপুর দাউ-দাউ করে জ্বলছে। আগস্ট মুভমেণ্ট আরম্ভ হয়ে পূর্ণ বেগে চলেছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি বাংলা দেশে—সেই বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলায় তখন থানা পুড়ছে, সরকারী আপিস পুড়ছে। বড় বড় বাঁশের ডগায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মেদিনীপুর বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে। সেই সময় এই মন্দিরে কীর্তিহাটের কড়চার রায়বাড়ীর জবানবন্দীর শেষ ঘটনা ঘটল।

ওই মন্দিরেই আমার কাঁধে একজন গোয়ান ছুরি মারলে।

বিচিত্র ঘটনা। আমার জবানবন্দীর শেষ ঘটনা।

রক্তে মন্দিরের মেঝের সাদা মার্বেল লাল হয়ে গেল। এবং তাতেই ধুয়ে গেল দেবেশ্বর রায়ের অপরাধ। তাতেই আমি মুক্তি পেলাম শ্যামাকান্তের অভিশাপ থেকে। তখন বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন আসছে। পরের দিনই মেদিনীপুরের সমুদ্রকূলে তুফান তুলে ঢুকবে। তাতেই ধ্বসে যাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতের মূল পাথরটা, ফেটে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে রায়বাড়ীর তিন-মহলা বাড়ীও ভাঙবে, ফাটবে।

ঘটনাটা ঘটল পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যায়।

১৯৪২ সালের আশ্বিনের দুর্গাপঞ্চমী। আকাশে তখনও মেঘের কোন ঘটা নেই, কোন ইশারা নেই, বঙ্গোপসাগরে কোথায় কোন্ দিগন্তে বায়ুস্তরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে তা কেউ জানে না, হয়তো প্রকৃতি নিজেও সচেতন নন; শরতের আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা চলেছে; পূজোর ঢাক তখন ভোরবেলা আর সন্ধ্যেবেলা একবার করে বেজে যায়; তাকে ধুমুল দেওয়া বলে। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরের অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর; আগস্ট মুভমেন্ট আরম্ভ হয়ে গেছে।

ইয়োরোপের যুদ্ধ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিগন্তে ছিটকে এসে পড়েছে। পার্ল হারবার থেকে শুরু করে জাপানীরা হংকং সিঙ্গাপুর কেড়ে নিয়ে গোটা বার্মা মুলুকটাই ছিনিয়ে নিয়েছে। ইংরেজের পল্টন হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে ইণ্ডিয়াতে এসে হাঁপ ছেড়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলও কেড়ে নেবে আন্দাজ করে রিট্রিটের প্ল্যানিং করে ফেলেছে। মেদিনীপুর সমুদ্রকূল অঞ্চলে নৌকো সাইকেল এসব ইংরেজ সরকার কেড়ে নেবার নোটিশ দিয়েছে। এরই মধ্যে কংগ্রেস কুইট ইণ্ডিয়া রেজলুশন নিয়ে বলেছে—"ভারতবর্ষ ছেড়ে তোমরা চলে যাও।" অন্য দিকে বাজারে জিনিসপত্রের দর হু-হু করে চড়তে শুরু করেছে।

বাংলা দেশে কলকাতা থেকে শুরু করে আসাম অঞ্চল পূর্ববঙ্গ জুড়ে ইংরেজ এবং আমেরিকান সৈন্যে ছেয়ে গেছে।

এরই মধ্যে কুইট ইণ্ডিয়া রেজলুশন থেকে আগুন লেগে গেল দেশে। গোটা ভারতবর্ষেই লাগল আগুন কিন্তু বাংলা দেশে মেদিনীপুর জেলা হয়ে ছিল বারুদের গাদা, সেই গাদায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

মেদিনীপুরের আত্মার প্রতীক মাতঙ্গিনী হাজরা—তিনি থানা দখল করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেলেন। কিন্তু থানার দখল দিয়ে গেলেন সাধারণ মানুষদের হাতে। কীর্তিহাটের দখল নিয়ে বসল কীর্তিহাট কংগ্রেস, কংগ্রেসের সভাপতি রঙলাল মণ্ডলের ছেলে, সেক্রেটারী অতুলেশ্বর রায়।

থানার দারোগা পালিয়েছিল—কনেস্টবলেরাও পালিয়েছিল—একজন এ-এস-আই ধরা পড়ে দেশী সরকারের হাতে অ্যারেস্টেড হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যারা ইংরেজপক্ষের লোক তারা হয়েছিল নজরবন্দী। তার মধ্যে ছিলাম আমি। আমি জমিদার; আমি এর আগে মেজদির কেসে এবং অতুলেশ্বরের কেসে কংগ্রেসকে সাহায্য করেছি বটে তবুও বার বার

হুকুম অমান্য করেছি। আর নজরবন্দী হল গোটা গোয়ানপাড়ার লোকেরা। যে সব লীগ-পন্থী মুসলমান আনাগোনা করছিল তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে গেল আপন আপন নিরাপদ আস্তানায়।

তখন সবে হাসপাতাল তৈরী শেষ হয়েছে; বিছানাপত্র এবং সরঞ্জামও এসেছে কিন্তু অনুষ্ঠান করে উদ্বোধন হয় নি। পুজোর আগেই উদ্বোধনের কথা—উদ্বোধনের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন এম খানের আসবার কথা। কিন্তু বিপ্লব বল বিপ্লব বিদ্রোহ বল বিদ্রোহ তার আগুন জ্বলবার পরই আমার উপর পরওয়ানা জারী হল—হাসপাতাল অবিলম্বে খোলা হবে। ওপন করবেন কংগ্রেস সভাপতি।

হাসপাতালের জরুরী প্রয়োজন। আহত হচ্ছে যারা তাদের চিকিৎসা চাই।

তাই হ'ল। আমি সেদিন হাত জোড় করে কংগ্রেস সভাপতিকে আহ্বান করে বললাম—আপনি যে অনুগ্রহ করে এই দেবেশ্বর রায় হাসপাতাল উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন তাতে রায়বংশ এবং আমি কৃতকৃতার্থ। আপনি জননায়ক।

জিভে আটকায় নি। সংকোচও বোধ করি নি স্থূলতা। বরং যেন কিছুটা খুশীই হয়েছিলাম। তবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধও করি নি। কারণ এদের দলে আমার স্থান অনেক নিচে এটা মনে করে আড়ষ্ট হয়ে জীবনের ছন্দে সহজ উল্লাস আসবে কি করে বল। তবে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলাম। বিনিময়ে অস্থায়ী স্থানীয় সরকার আমাকে বন্দী করে ঘরে আবদ্ধ রাখে নি বটে তবে নজরবন্দী ক'রে রেখেছিল। গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামের মধ্যে। চিঠি লেখা বারণ ছিল। আরও বাধানিষেধ ছিল কিছু কিছু। আমি এরই মধ্যে চেয়েছিলাম ওপারে সিদ্ধাসনের মন্দিরে যাওয়ার অধিকার।

আমি একটা অজুহাত অনেক খুঁজে খুঁজে বের করেছিলাম। ওই সিদ্ধাসনের মন্দিরে আমি ফ্রেস্কোর মত ছবি আঁকব।

প্রার্থনা আমার মঞ্জুর করেছিলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। কারণ গোটা গোয়ানপাড়াটা গত দু' বছরের ভোট ঝগড়া থেকে সন্দেহ জন হিসেবে তখন সতর্ক স্বেচ্ছাসৈনিকদের কড়া পাহারায় রয়েছে। এবং আমি নজরবন্দী হলেও বিশেষ সম্মানিত নজরবন্দী। আমার দেওয়া হাসপাতালেই কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের চিকিৎসা হচ্ছে। এমন কি প্রেসিডেন্ট নিজেই ওপনিংয়ের সময় ওই অহিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত বেডটির নামও ঘোষণা করেছেন—ভায়লেট পিক্রুজ বেড। কিন্তু রিজার্ভড রাখার শর্তটি তুলে দিয়েছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই জাতিভেদ চলবে না। বলেছেন—হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান ভেদ আমাদের নেই, তারা আমাদেরই আপন লোক। তবে বিশ্বাসঘাতকতা কারুরই বরদাস্ত করা হবে না।

গোয়ানরা বলতে কিছু পারে নি, সাহস করে নি। তারা তখন হেরে গেছে, তখন গোটা পাড়াটাই কড়া পাহারায় বাস করছে। কোন অসম্মান নেই কোন নির্যাতন নেই। তবে বাইরের লোক ভিতরে আসতে পায় না, ভিতরের লোক বাইরে অর্থাৎ গ্রামের বাইরে যেতে পায় না। বাইরে যে কাজ থাক বা বাইরে থেকে যে জিনিসের প্রয়োজন হোক তা করে দেয় বা এনে দেয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা।

এই বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নিত্য আমি যেতাম সিদ্ধাসনের নতুন মন্দিরে ছবি আঁকতে। কিন্তু আঁকা হ'ত না। কি আঁকব ভেবে পেতাম না। কল্পনার মধ্যে ক্রমাগত দেবেশ্বর রায় ও ভায়লেট পিক্রুজের ছবি ভেসে উঠত। আঁকতে ইচ্ছে হ'ত দেবেশ্বর এবং ভায়লেটের প্রথম মিলন দৃশ্য এবং ভায়লেটের ও দেবেশ্বর রায়ের মৃত্যুদৃশ্য।

সে ট্যাবলেটটা তখনও বসানো হয় নি। সেটা কলকাতায় বরাত দেওয়া ছিল, এসে পৌছয় নি।

আসস্ট মাস থেকে অক্টোবর—দুর্গাপঞ্চমীর দিন পর্যন্ত নিত্য যেতাম। ছবি আঁকার অজুহাতে, কিন্তু ছবি আঁকতে নয়। যেতাম আমি কুইনীকে দেখতে।

আমার জবানবন্দীতে আমি মিথ্যা বলব না। এর আগেই আমি বলেছি—ঠাকুমার শ্রাদ্ধের সময় যখন কুইনীকে দেখেছিলাম তখন থেকেই আমি তার মোহে আচ্ছন্ন, তার কামনায় আমি প্রমত্ত এবং কায়িক মিলনের কামনার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিকট এবং নিগূঢ় বলে তার প্রেমেও আমি প্রেমার্ত বলতে দ্বিধা করছি নে।

কুইনী আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে সে আমাকে ঘৃণা করে, কিন্তু আমি তাতেও তিক্ত হই নি, বিমুখ হয় নি, প্রত্যাখ্যানেও আমি আহত হই নি, তার উপর ক্রুদ্ধ হতে পারি নি। বরং উল্টো হয়েছিল, আমি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছি। নিত্য সে প্রেম, সে কামনা তিলে তিলে বেড়ে সে তিলোত্তমার মত সম্পূর্ণ হয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় আছে।

মন্দির শুরু করবার পর থেকেই আমি কাজ দেখবার অছিলায় নিত্য যেতাম। তখনও আগস্ট মুভমেন্ট আরম্ভ হয় নি। তখনও গোয়ানপাড়া কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে রেষারেষি বেধে চলেছে। আমিও তখন জমিদার। স্বাধীন আমার গতিবিধি। প্রয়োজন ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলে বলব—আমার মত লোকের পক্ষে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এমন করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজে তদারক করে কাজ করানো আমার স্বভাবের বাইরে, কখনও করাই নি। হিসেবীও আমি নই। বাবা এত প্রচুর রেখে গিয়েছিলেন যে হিসেব আমাকে করতে হ'ত না। প্রায় শেষ করে এনেছি—তবুও ছিল। ঠাকুমার মৃত্যুর পর হাসপাতাল পত্তন করে ওখানেই থেকে গেলাম। গিয়েছিলাম যে সব আকর্ষণে তার মধ্যে দুটো আকর্ষণ বড় ছিল—একটা ছিল জমিদারীর জেদের আকর্ষণ আর একটা কুইনীর আকর্ষণ। কুইনীকে দেখতে পাব। তার উপর নেশা ধরে গেছে আমার। জীবন কামনার্ত হয়ে তাকে চাচ্ছে।

আমার চোখে তখন কুইনীর রূপ এক আশ্চর্য রূপ।

কিন্তু কুইনী কাঁসাই পার হয়ে কীর্তিহাটে আসত না। গোয়ানরাও না।

কুইনীর এবং বৃদ্ধ পাদরীটির ব্যবস্থায় ওরা এই কীর্তিহাটের সঙ্গে ভোটের ঝগড়া থেকেই একটা সংগঠন গড়ে তুলছিল। ঠাকুমার শ্রাদ্ধে ভায়লেট পিক্রুজ আর দেবেশ্বর রায়ের সম্পর্ক নিয়ে ঝগড়াটাকে আরও পাকিয়ে তুলে নিজেদের সংগঠনটিকেও শক্ত করে তুলেছিল। কীর্তিহাটে তারা আসত না। এখানকার ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাতো না।

এখানকার গার্লস স্কুলে মেয়েরা যারা পড়তে আসত, তাদেরও ছাড়িয়ে নিয়ে কুইনী নিজে একটা কোচিং ক্লাস খুলেছিল। এমন কি কীর্তিহাটের দোকানে জিনিসপত্র কেনাও বন্ধ ক'রে গ্রামেই একটা মুদীর এবং একটা ছোটখাটো মনিহারীর দোকান খুলেছিল। এ গ্রামে প্রয়োজন হলে যখন কাউকে আসতে হ'ত তখন দু'তিনজন মিলে আসত। কীর্তিহাটের লোকেরা যেতে হলে পাঁচ-সাতজন মিলে দর্পভরে যেত। গোমেশ ডিক্রুজ আমার বাড়ীর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। আমি যখন জমিদারীর নেশায় কুইনীর আকর্ষণে ওখানে থাকলাম তখন কলকাতা থেকে দু'জন নেপালী দারোয়ান রেখেছিলাম। কিছুদিন পর আরও একজন ওখানকার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালকেও রেখেছিলাম। দস্তুরমত জমিদারী আসর সাজিয়ে বসে, ঠাকুমার স্মৃতিরক্ষার কাজটাকে আশ্রয় করে ওখানে কুইনীকে জয় করতে চেয়েছিলাম। এ নেশা সম্ভবতঃ সংসারে সব নারীপুরুষই যৌবনকালের সঙ্গে অল্প হলেও করে থাকে কিন্তু নেশা যাকে ধরে তার আর নিষ্কৃতি থাকে না। মদ অনেকে খায় কিন্তু মদে খাওয়া বলে একটা কথা আছে, মদে যাকে খায় তার যেমন আর নিষ্কৃতি থাকে না এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। নারীকে দেখে পুরুষের ভাল লাগে কিন্তু যে পুরুষ কোন বিশেষ নারীর নেশায় পড়ে তার আর ঘৃণা থাকে না, লজ্জা থাকে না, ভয় থাকে না, তার জন্য সে অপমান গ্রাহ্য করে না, আঘাত গ্রাহ্য করে না, সব কিছুকে মাথায় করে নিয়েও তাকে পেতে চায়। আমি কুইনীকে তেমনি করে চেয়েছিলাম।

ওই দারোয়ানদের একজনকে সঙ্গে ক'রে ওই সিদ্ধাসনের মন্দিরের কাজ দেখতে যেতাম। দেখতে যাওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেবার জন্য উড়িষ্যা থেকে পাথরের কারিগর এনে পাথরের কাজ করাবার প্ল্যান জুড়ে দিয়েছিলাম। এবং ওই মন্দির থেকে একটু সরে লাঠিয়াল বাগ্দীদের একটা পল্লী বসিয়েছিলাম, জমি দিয়ে, ঘর করবার খরচ দিয়ে, যেন গোয়ানরা মন্দিরটার ক্ষতি না করে, ভেঙে না দেয়।

গোয়ানরা আসত একটা সীমানা অবধি। তারা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখত। এদের সঙ্গে একবার না একবার কুইনী আসতে। আমি একখানা চেয়ার পেতে বসে থাকতাম এই সময়টুকুর জন্য। কুইনীকে দেখে মন তৃপ্তিতে ভরে যেত। তার দিকেই তাকিয়ে থাকতাম। সে সহ্য করতে পারত না আমার দৃষ্টি, বেশ একটু উত্তপ্ত হয়েই সে চলে যেত। আমার চিত্ত দ্বিগুণ অতৃপ্ত হয়ে উঠত। কিছুদিন সে একেবারেই আসত না। আমি অশান্ত অতৃপ্ত মনে সারাক্ষণ বসে থেকে ফিরে আসতাম অপরাহ্ণে। রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না। মদ্যপান করে ঘরে বসে হয় বাঁশের বাঁশী নয় তো বেহালা নিয়ে সেই ছবির ঘরে ব'সে সুর তুলতাম। গভীর রাত্রি পর্যন্ত বাজত আমার বাঁশী, অথবা আমার বেহালা। লোকে আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। কারণ আমার মনের কথা আমি ঢেকে রাখি নি আবরণ দিয়ে। আবার জবরদস্তি ক'রে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেও কিছু বলি নি, যার জন্যে লোকে আমাকে শাস্তি দিতে পারে।

বেশ কিছুদিন না আসার পর কুইনী একদিন এল। আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বোধ হয়। ওদের সীমানা রেখার ওপাশে দাঁড়িয়ে বললে—শুনুন!

আমি উঠে গেলাম।

তীব্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—আপনি এখানে কেন আসেন? কিসের জন্য?

মন্দির দেখতে আসি বলি নি আমি। আমি বলেছিলাম—আমার ভাল লাগে বলে আসি। স্থানটিকে আমি ভালবাসি। এবং—

—কি?

—থাক সে কথা, অনুক্তই থাক।

—আপনি অতি ইতর। বলে সে চলে যেতে যেতে বলেছিল—আর আসবেন না।

—আমি আসব। আমার কথা সে শোনে নি, সে চলে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর অতুল এসে একদিন বললে—সুরেশ্বর, এতকাল পর তুমি সত্যিই জমিদার রায়বংশের ধারা ধরলে। জ্যাঠামশাই দেবেশ্বর রায়ের পার্টটা রাখবার জন্য কোমর বেঁধে লাগলে শেষ কালটায়!

বেশ খোসমেজাজে ছিলাম। অর্থাৎ নেশার ঝোঁকে। বললাম—তোমার নীল রক্ত দেউলে হয়ে লাল হয়ে গেছে অতুল খুড়ো। যে-মাথা তাজ পরে সেই মাথা কাটা যায়, তাই ব'লে তাজ পরতে কেউ ছাড়ে না। দরকার হলে মাথাটা দেব গো।

অতুল বলেছিল—তার দেরি নেই সম্ভবতঃ—কারণ আগস্ট তখন সামনে। আগস্টের প্রথমেই কংগ্রেস কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট রেজলুশন নিলে।

দেখতে দেখতে সারা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলল। বাংলাদেশে জ্বলল প্রথম মেদিনীপুরে।

মাতঙ্গিনী হাজরার রক্তে দিয়ে সিক্ত মাটির উপর স্বাধীন ভারতের পতাকাদণ্ড পোঁতা হল। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ সরকারের অধিকার উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পল্টন দেড়ে দিয়ে ইংরেজ আবার তাকে কায়েম করতে চেয়েছে, বাইরে দেখানোর মত দখলও একটা নিয়েছিল বটে কিন্তু আর মেদিনীপুরে ঠিক ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয় নি।

সেই সময়ে মন্দিরের পাথর বসানোর কাজ হচ্ছিল। একটা কথা বলতে ভুলেছি, প্রথম যখন মাপ অনুযায়ী লালচে পাথরের স্ল্যাবগুলি এল তখন একটা বিস্ময়ের সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। পাথর বসাচ্ছে মন্দিরে। আশ্চর্য মন্দির তৈরী হচ্ছে!

গোয়ালপাড়ার লোক আগে এসেছিল। ভিড় করে দাঁড়িয়ে তারা দেখেছিল। কিছুক্ষণ পর অনেকদিন পর এসেছিল কুইনী। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে সে চলে গেল।

পাথরের স্ল্যাবগুলির উপর নক্সার ডিজাইন আমি নিজে করে দিয়েছিলাম। রায়বাড়ীর কথা কীর্তিহাটের কড়চার একটা খসড়া আমি তার মধ্যে ফুটিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নক্সার মূল ডিজাইনটা ছিল লতার মধ্যে বিকশিত পদ্মের সারি। যদি কোনদিন কীর্তিহাট যাও তুমি দেখে খুশী হবে এ কথা বলতে পারি।

ওই নক্সা যখন দেওয়ালের গায়ে রূপ নিয়েছে, স্ল্যাবগুলি বসানো হয়েছে, তখন একদিন বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ দেখে আমাকে ডাকলে, বললে—শুনুন!

গেলাম। সে বললে—এত সুন্দর মন্দির তৈরী করছেন কেন? কিসের কার মন্দির?

আমি বললাম—উপলক্ষ্য হিসেবে সবাই যা বলে তাই, সিদ্ধাসনের দেবী যোগিনীর মন্দির। যাঁর পুজো হয় বিজয়াদশমীর দিন, বাসন্তীপুজার সময়। আসলে এ মন্দির আমি উৎসর্গ করছি একটি ভালবাসার উদ্দেশে। এখানে একটি তরুণ একটি তরুণীকে প্রথম ভালবেসে মিলিত হয়েছিল, এবং পরে ওই প্রেমাস্পদের মৃত্যুতে মেয়েটি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে তাঁকে পেতে চেয়েছিল। তারই জন্যে এত সুন্দর করে গড়ছি।

স্থিরদৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকক্ষণ। তার আশেপাশে আরও কয়েকজন গোয়ানও ছিল। আমিও আমার আসনে ফিরে গিয়ে বসি নি, বেড়াটা মাঝখানে রেখে সে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ এক সময় সে ভিড় ঠেলে চলে গিয়েছিল।

পরের দিন থেকে আবার সে আসা বন্ধ করেছিল, কিন্তু শুব্ধ দ্বিপ্রহরে তাকে দেখতে পেতাম সে গোয়ানপাড়ার ভিতরে তার বাড়ীর জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

যেদিন পাথর বসানো শেষ হল সেদিন আশ্বিনের আকাশ ঝলমল করছিল। পিতৃপক্ষ শেষ হয়েছে। মহালয়া গেছে আগের দিন। মন্দিরের বাইরে ভারা খুলল। ভিতরের কাজও শেষ হয়ে গেছে; সেদিন অনেক লোক এল দেখতে।

আমি খুঁজলাম কুইনীকে। এত লোকের মধ্যে কাউকে যেন আর দেখতেও পেলাম না। অনেক খুঁজে তাকে দেখতে পেলাম ভিড়ের মধ্যে। মন্দিরটাই দেখছিল সে। আমি তাকেই দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে চোখ মিলল। সে আমার দিকে তাকালে!

বাড়ী ফিরে এলাম সন্ধ্যাবেলা।

আসবার সময় কাঁসাইয়ের খেয়াঘাটে দাঁড়িয়েছিল গোমেস। সে হেঁট হয়ে নমস্কার করে বললে—হুজুর। আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

বললাম—কেন? দরকার আছে?

সন্ধ্যার আবছা আঁধারের মধ্যে সে আমার হাতে একখানা কাগজ দিলে। তার সঙ্গে গুঁজে দিলে একটা ভাঁজকরা টুকরো কাগজ। বললে—একটা দরখাস্ত দিলাম হুজুর। এবার পুজোর সময় কাপড়চোপড় কিছু হবে না হুজুর!

বাড়ী এসে দাওয়াখানায় চোখ বুলিয়ে টুকরো কাগজটা দেখলাম। খুব সুন্দর ক'রে পিন দিয়ে জুড়ে দেওয়া ছিল। তাতে লেখা ছিল। "মন্দির শেষ হ'ল, এরপর দয়া ক'রে আর এপারে আসবেন না। আমার মিনতি। এরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমি পশুর মত অসহায়। আপনার অনিষ্ট করবে।"

আমি উৎফুল্ল উঠেছিলাম সুলতা। ঠিক সেই সময়েই কে ডেকেছিল—সুরেশ্বর!

চমকে উঠেছিলাম। ডাক মেজদিদির। মেজদিদিকে কলকাতায় অর্চনার কাছে রেখে-ছিলাম। তিনি এসেছেন সেদিন। অতুল তাঁদের খবর দিয়েছে—"শ্যামাকান্তের অভিসম্পাত সুরেশ্বরের ঘাড়ে ভর করিয়াছে! সে গোয়ানপাড়ার কুইনী মেয়েটার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

আমি চমকে উঠেছিলাম। সত্যিই কি তাই? পুরুষ নারীর জন্য পাগল হয়, নারী

পুরুষের জন্য পাগল হয়। দেহসম্ভোগের অন্তহীন অতৃপ্তিতে মানুষ বিকৃতমস্তিষ্ক হয়। আবার মহাপ্রকৃতির অভিসম্পাতে শ্যামাকান্ত ইহকাল পরকাল সব হারিয়ে নিজের গলা টিপে নিজেকে পীড়িত করেন। মাথা কুটে রক্তাক্ত করেন নিজেকে।

আমি কি— হয় তো তাই। কিন্তু ফিরবার শক্তি আমার ছিল না। আমার আপসোসও ছিল না। কুইনীর জন্য ইহকাল হারাতে আমার এতটুকু খেদ ছিল না। আমি সব হারাতে প্রস্তুত ছিলাম। আমার সব সম্পদ। আমার জীবন ব'লে বাড়াবাড়ি করব না। তবে তাও পারতাম। কুইনীর জীবন বিপন্ন হলে তাকে রক্ষা করবার জন্যে সে বিপদের সঙ্গে লড়তে যেতাম, তাতে মৃত্যু হলে মরতাম। কুইনীই যদি সেই প্রকৃতি হয়, রহস্যময়ী হয়, তবে তাকে মা আমি বলব না। তার জন্যে পাগলও হব না।

থাক সুলতা, এখন যা হয়েছিল বলি। তবে—।

তবে—একটা কথা বলে নিই। কুইনীর প্রতি এই আকর্ষণ যে কেন এত প্রমত্ত, তা আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি। ঠিক পুরো বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকু বলতে পারি—তার রূপের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমার পুরুষচিত্তকে প্রমত্ত করে। আর একটা কথা। এটা এর আগে বলেছি। বার বার মনে হত, ও আমাদের—ও আমাদের—আমাদের সম্পর্ক আছে ওর সঙ্গে। মনে পড়ত অঞ্জনাকে, রত্নেশ্বর রায়কে। মনে পড়ত দেবেশ্বর রায় এবং ভায়লেটকে।

* * *

পরদিন সকালে উঠে চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। যাব সিদ্ধাসনের মন্দিরে। কিন্তু কাল মন্দিরের কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ঘরে মেজদি, অতুলেশ্বর থেকে ওপারে গোয়ানদের মধ্যে এ নিয়ে একটা সাড়া পড়ে গেছে। এবং সময়টা এমন যে, আজ আর আমার ব্যক্তিগত অধিকার, সম্পত্তিগত অধিকার, কোন অধিকারই আমার স্বাধীন যথেচ্ছ বিচরণের পথ খোলা রাখে নি। আগস্ট মুভমেন্টের প্রথম ঝাপটা চলে গেছে। সাব-ডিভিশন এবং বড় বড় সরকারী এলাকার জায়গাগুলোয় পুলিস মিলিটারীর সাহায্যে আবার শৃঙ্খলা ফিরেছে বটে কিন্তু তার বাইরে অধিকাংশ অঞ্চলেই বিপ্লবী স্বাধীন সরকারের অধিকার কায়েম আছে। অধিকাংশ মানুষ স্বাধীন সরকারের পক্ষে। তারাই তাদের সৈনিক। সরকারী পক্ষের লোক বলে যারা চিহ্নিত, তারা কড়া নজরের মধ্যে বসবাস করছে। তাদের উপর নির্যাতন নেই, কিন্তু তারাই ভয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছে। চোর-ডাকাত প্রভৃতি দুর্ধর্ষ মানুষেরাও স্বাধীন সরকারের অনুগত সৈনিক হিসেবে সৎ হয়েছে এবং বিনিদ্র হয়ে কাজ করছে।

আমি জমিদার, সেই হিসেবে এবং একদিন বিদায় সত্যাগ্রহ লিখেছিলাম, সেই হিসেবে তাদের খাতায় দাগী আসামী। আবার মেজদিদির কেসে অতুলেশ্বরের কেসে আমি লড়েছি এবং কীর্তিহাটের কংগ্রেস সভাপতি যেদিন আমার বিচার করবার জন্য আসামী হিসেবে তলব করেছিলেন, সেদিন পুলিসের কাছে আমি তাঁদের বাঁচিয়ে জবানবন্দী দিয়েছি বলে আমার নামের পাশে, চিত্রগুপ্তের খাতার মত, তাদের ডোসিয়ারে কিছু পুণ্যফলও আছে। আমার হাসপাতাল আমি কংগ্রেস সভাপতিকে দিয়ে ওপন করিয়েছি এবং আজ গোটা হাসপাতালটাই

তাঁদের হাতে দিয়েছি, এটাও আমার একটা পুণ্যফল। তাই আমার এ স্বাধীনতাটুকু ছিল। আজ সকাল থেকে যেন ওখানে না যাই তার একটা সাবধান-বাক্য অতুলেশ্বর উচ্চারণ করে গেছে। গোমেসের হাত দিয়ে সাবধান করে দিয়েছে কুইনী। কিন্তু তাই আমাকে বেশী করে টানলে। কুইনী আমার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছে। আমি না গিয়ে পারি!

আমি একটু ভেবে রঙ-তুলি একটা ঝোলায় পুরে রওনা হয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্টের কাছে ছবি আঁকবার অজুহাতে ওপারে যাবার নতুন অনুমতি নিয়ে চলে গেলাম।

ওপারের ঘাটে যেখানে নামতাম, সেটা গোয়ানপাড়ার সামনে পড়ে। ওখানে নামতেই কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। তারা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে বললে, বাবু ফের এসেছে আজ!

তারপর ঘটনাটা অতর্কিতেই কতকটা ঘটে গেল। ওখানে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই। বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের ভেতর। সেদিন রাজমজুরেরা নেই। থাকবার মধ্যে সঙ্গে আছে একজন দারোয়ান আর আছে যেসব শক্তপোক্ত লাঠিয়াল-জানা ছোটজাতের হিন্দুদের বাস করিয়েছি তাদের বাড়ীর মেয়েরা। পুরুষেরা চাষের কাজে গেছে। ওদিকে গোয়ানপাড়ায় গোয়ানদের রাগের আগুন সুযোগ পেয়ে জ্বলে উঠেছে।

কেন আসবে বাবু—এই পারে কেন আসবে? তারা জানে কি জন্যে বাবু আসে! তারা আর সইবে না। পাড়ার সব থেকে নওজোয়ান ছেলেটি এসেছিল হনহন করে। তখন কুইনী এসে বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়েছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা। সে হাঁপাচ্ছিল উত্তেজনায়।

সে বললে—কেন এসেছেন? আবার কেন এসেছেন?

হেসে বললাম—মন্দিরের ভেতরে ছবি আঁকব।

—ছবি?

—হ্যাঁ।

—না। আঁকতে হবে না, পাবেন না আঁকতে, যান ফিরে যান বাড়ী।

আমি একটু হেসে বললাম—না। বলেই আমি পিছন ফিরলাম, গিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে—সেই মুহূর্তে ঘটল কাণ্ডটা। বলতে গেলে কয়েকটা নিমেষ ফেলতে যে সময় লাগে, তারই মধ্যে।

প্রথমেই শুনলাম—কুইনী চীৎকার করে বললে—না, না। জন—জন! না।

চমকে পিছন ফিরে দেখলাম একজন জোয়ান গোয়ান। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে প্রায় আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তার ছুরি। ঠিক সেই মুহূর্তে, তার পিছনে ছুটে এসে তাকে সবলে কোমরে জড়িয়ে ধরলে কুইনী।—না। বলে চীৎকার করে উঠল সে। কুইনী তাকে অনুসরণ করেই ছুটে এসেছে তার পিছন পিছন।

জন তাকে ঝাঁকি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমার উপর ছুরি তুললে। যেটুকু সময় পেয়েছিলাম, তাতেই আমি তাকে আটকাবার জন্য হাত তুললাম, ধরলামও কিন্তু আটকাতে পারলাম না। তবে ছুরিখানা সে আমার বুকে বসাতে পারলে না। হাতখানা চেপে ধরে

ঠেলে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম, তারই ফলে বুকে না বসে আঘাতটা লাগল আমার কাঁধে। ওদিকে মাটি থেকে উঠে কুইনী আবার তাকে জাপটে ধরলে। ইতিমধ্যে আমার দারোয়ান ছুটে এসেছে—একটা গোলমাল উঠেছে। চারিদিক থেকে লোকেরা এসেছে।

এরই মধ্যে আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি শুয়ে আছি হাসপাতালে। আমার শিয়রে বসে আছেন মেজদি। শুনলাম জন ধরা পড়েছে, তাকে হাতে-পায়ে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর তার সাহায্যকারিণী এবং এই ষড়যন্ত্রের নায়িকা হিসেবে কুইনীকেও বন্দিনী করা হয়েছে। তবে সেও জনের ছুরিতে আঘাত পেয়েছে। তার আঘাত লেগেছে বাহুতে। হাসপাতালের ভায়লেটের নামে উৎসর্গ করা বেডে তাকে রাখা হয়েছে; ভল টিয়েরের পাহারাধীনে।

ওদিকে পরামর্শ চলছে—কেসটা নিয়ে কি করা হবে।—ইংরেজের থানায় পাঠানো হবে? ইংরেজের আদালতে বিচার হবে? ওদিকে গোটা কীর্তিহাটের লোকেরা গোয়ানদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। একবার তারা গোয়ানপাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল। এবার তারা পাড়াটা নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

মেজদিকে বললাম—মেজদি, তুমি অতুলকে বল। অপরাধ ওদের নয়। অপরাধ আমার। ভালবাসা আমার অপরাধ। কুইনীকে আমি ভালবাসি। ওরা তা সইতে পারেনি। কুইনী আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকে আকাশে ক্রুদ্ধ সাইক্লোনের নাকাড়া বাজল। সে-সাইক্লোন সপ্তমীর দিন এসেছিল কলকাতায়। মেদিনীপুরে এসেছিল ষষ্ঠীর মধ্যরাত্রে। সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ হয়েছিল উন্মত্ত ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর মাতামাতি। সন্ধ্যা থেকে আকাশ নিকষ কালো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। খবর এসেছিল কাঁথির ওদিকে নাকি সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমুদ্রের তুফান এসে সব ধুয়ে নিয়ে যাবে। সমুদ্রের ঝড়ের সঙ্গে মেদিনীপুরের পরিচয় সৃষ্টির আদি থেকে। তারা জানে। তারা খবর পাঠায়। ওরা আকাশের দিকে তাকিয়ে খবর পড়তে পারে। সেদিন কংগ্রেস হুকুম দিয়েছিল—গোটা কীর্তিহাটের লোক এসে আশ্রয় নিক রায়বাড়ীর পাকা ইমারতের মধ্যে। ইস্কুল, হাসপাতাল, কাছারী যেখানে যত পাকাবাড়ী আছে, এস সকলে, তার মধ্যে এসে আশ্রয় নাও। আমাকে হুকুম দিয়েছিল বিবিমহলে যেতে।

আমি আমার বেড থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলাম কুইনীর বেডের ছোট্ট ঘরখানিতে। কুইনী বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। ডাকলাম—কুইনী!

কুইনী মুখ তুলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি তাকে বললাম—ভয় কি? চল, আমার সঙ্গে চল। হাসপাতালে অন্য লোকেরা আসছে। আমার সঙ্গে বিবিমহলে চল—। যাবে না?

—গোয়ানদের কি হবে?

—তারাও এপারে এসে কীর্তিহাটের লোকেদের সঙ্গে রায়বাড়ীতে থাকবে। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে নতজানু হয়ে বলব।

সেই ঝড়ের মাতামাতির মধ্যেই আমি সেই আহত অবস্থাতেই তাকে নিয়ে এসে উঠেছিলাম বিবিমহলে।

সত্য কথা বলতে গেলে, সেই আমার কুইনীর সঙ্গে বিবাহ। সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে ভীতার্ত নির্বাক কুইনীকে আমি সারারাত বুকে জড়িয়ে ধরে বাসর যাপন করেছিলাম। সত্য অর্থে বাসর সুলতা।

মাথার উপর প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের গর্জন একটানা বয়ে চলেছিল। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছিল। বিবিমহলের নীচের তলায় একটা চোরকুঠরীর কথা বোধ হয় বলেছি। সেটা সেকালের স্ট্রং-রুম। এই ঘরেই ব্রজদা লুকিয়ে রেখেছিল বীরেশ্বর রায়ের এবং দেবেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনার খাতা এবং ডায়েরীগুলো। সেই ঘরের মধ্যে মেঝের ওপর কম্বল পেতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আমি ভয়ার্ত কুইনীকে পাশে নিয়ে একটা কম্বল দুজনে গায়ে জড়িয়ে বসেছিলাম। নির্বাক স্তব্ধ। ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল। একটা পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চ ছিল, সেটা জ্বেলে বসেছিলাম। আলোর ফোকাসটা পড়েছিল দেওয়ালের গায়ে, আর চারিপাশে একটা আলোকিত আভাস—হ্যাঁ, তা ছাড়া কি বলব? একটা আভাস ফুটে উঠেছিল। তারই মধ্যে, মধ্যে মধ্যে সে আমার বুকের উপর ঘুমে ঢুলে পড়ছিল, কখনও আমি পড়ছিলাম তার উপর; ঘুম ভেঙে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটি করে হাসি ফুটে উঠেছিল আমার মুখে। দেহসম্ভোগ নয়, পরস্পরের দেহের উত্তাপে একটা নরম নিশ্চিন্ততার আরাম বা আনন্দ যাই বল—তার মধ্যে ডুবেছিলাম। বাংলা কবিতার একটা লাইন মনে পড়ছে—মোহিতলালের নারী কবিতার লাইন।

‘সন্তান মরিছে বুকে, তখনই যে নবগর্ভাধান’। এ-মৃত্যুকে মাথায় করে আমাদের মিলন হয়েছিল সুলতা।

* * *

এখানেই যবনিকা ফেলে দিতাম নাটক হলে। অন্ততঃ মানুষের গড়া স্টেজের নাটক হলে। পৃথিবী রঙ্গমঞ্চে যে-নাটক চলে, সে-নাটকে নাটকীয় মুহূর্ত আসে, সংঘাত আসে; যবনিকা পড়ে না, নাটকও শেষ হয় না। নাটক চলে।

পৃথিবীর কীর্তিহাট যে-কোণে, সেই কোণেও রায়বাড়ীর জীবন-নাটকে এই ঘটনার পরও একটা লৌকিক বিবাহ আমাদের হল। সমাজ-মাটি এরা তো মানুষের মনের বিবাহকে মানে না—তাদের বিধানমত বিবাহ করিয়ে ছাড়ে—তাই হল।

এই প্রাকৃতিক তাণ্ডবে মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত মনে আছে তোমার—তিনদিন ধরে মেদিনীপুর পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে হাজার হাজার দরুনে লোক মরেছে, হাজারে হাজারে জন্তু-জানোয়ার মরেছে। সমুদ্রের পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস সমস্ত দক্ষিণ উপকূল ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গাছপালা কুরুক্ষেত্রের অক্ষৌহিণী সেনার মত ধরাশায়ী হয়েছে। গৃহহীন মানুষ জলসিক্ত মাটির বুকের উপরেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এরই মধ্যে ডি-এম বলেছিলেন—ঈশ্বর মেদিনীপুরকে শাস্তি দিয়েছেন।

স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ক্যাবিনেটের মন্ত্রী তখন। তিনি এসে জনসাধারণের নৌকো কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করায় একজন ডেপুটি বলেছিল—সরকারী প্রয়োজনে নৌকো কেড়ে নেওয়া দরকার হয়েছিল তাই নিয়েছি। অত্যন্ত উদ্ধতভাবে বলেছিল।

কীর্তিহাটেও ওই সরকারী দাপটের ঢেউ এসে লাগল।

দু'দিন পর। রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে এসে হাজির হল একজন ইন্সপেক্টার। তার সঙ্গে খড়্গপুরের মিসেস হাডসন এবং একজন অ্যাংলো ভদ্রলোক। অতুল, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মণ্ডল—এঁরা অবশ্য তার আগেই সরে গেছেন। গ্রামের লোকেই সারিয়ে দিয়েছে।

রিজার্ভ ফোর্স প্রথম এসেই কিছু লোককে অ্যারেস্ট করেছিল। মিসেস হাডসন এবং সেই অ্যাংলো ভদ্রলোক এসেছিলেন গোয়ানদের সাহায্য নিতে। কিন্তু তাদের পেলেন এখানেই। গোয়ানদেরও আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল গার্লস স্কুলে। তাদের কথায় তারা পুলিসের কাছে নালিশ করলে, জমিদার সুরেশ্বর রায় কুইনীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কুইনী আটকে রয়েছে বিবিমহলে।

আমি তখন ঘুরে দেখছিলাম রায়বাড়ী। চারিদিক ঘুরে দেখছিলাম।

রায়বাড়ীর তিনটে সিঁড়ি, তিনটে চিলে-কোঠা।

চিলে-কোঠাগুলো সবই ভেঙে গেছে। উত্তরদিকের গোটা আলসে ভেঙেছে।

সব থেকে বড় ক্ষতি হয়েছে—বিভিন্ন সময়ে তৈরী রায়বাড়ীর বিভিন্ন মহলগুলোর জোড়ের মুখে ফাট ধরেছে।

বিবিমহলের সব থেকে যেটা শোভার বস্তু, আরামের স্থান, ছাদের উপর আটকোণা ছত্রি-ঘর, যেখানে বসে আমি ছবি আঁকতাম, বাঁশী-বেহালা বাজাতাম, যেখানে বসে থাকতেন বীরেশ্বর রায়, সেই ছত্রি-ঘরখানাও ভেঙে পড়ে গেছে।

ধানের গোলা ভেঙে ধান ছড়িয়ে পড়েছে, ভেসে গেছে। ইন্সপেক্টর কনেস্টবল নিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে—আপনাকে এ্যারেস্ট করছি। আপনি কুইনী মুখার্জি বলে ক্রীশ্চান মেয়েটিকে—

মিসেস হাডসন পা ঠুকে বলে উঠল—you are a Scoundrel, you have—

এ্যাংলো ভদ্রলোকটি একটা চড় বসিয়ে দিল আমার গালে। প্রস্তুত ছিলাম না আমি। পরমুহূর্তেই আমার রায়-রক্ত সাড়া দিয়ে উঠল—আমি ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপরে। কিন্তু তাদের সঙ্গে পারি নি আমি। তারা অনেক। আমি একা। সাহায্যের জন্য কেউ ছিল না।

সাইক্লোন এবং বন্যা-বিধ্বস্ত কীর্তিহাট, মানুষেরা ক্লান্ত, ভেঙে পড়েছে। প্রতিবাদ করবারই কেউ নেই। সাহায্য করতে কে আসবে! আমাকে তারা ধরে বেঁধে ফেললে অপরাধীর মত।

—কোথায় কুইনী?

এবার আমি আত্মসম্বরণ করে বললাম—আমার ঘরে। বিবিমহলে। সে আমার ভাবী স্ত্রী—

কথা বলতে দিলে না আমাকে। অপরাধীর মতই কোমরে বেঁধে টেনে নিয়ে এল বিবিমহলে। কুইনী ছুটে বেরিয়ে এল খবর পেয়ে। আমার কোমরে দড়ি দেখে, আমার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে সে থমকে দাঁড়াল।—কেন ওঁকে বেঁধেছেন? কি করেছেন উনি?

মিসেস হাডসন বললেন—কুইনী তুমি সেফ? তোমার কোন অমর্যাদা—?

কুইনী এক কথায় সব কথার জবাব দিলে—আগে ওঁকে ছেড়ে দিন। উনি আমার ভাবী. স্বামী। আমি ওঁকে ভালবাসি।

এ নিয়ে সমস্যা অনেকের কাছে ছিল কিন্তু আমার কাছে ছিল না। কুইনীর কাছেও না।

ওই গোয়ানপাড়ার পাদ্রী বুড়ো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাজ করেছিলেন।

আবার বাড়ীতে মেজদি বলেছিলেন, তাঁরা বিবিমহলে দাঁড়িয়েছিলেন—মেজদি, গোবরডাঙার খুড়িমা, বর্ধমানের খুড়িমা, অর্চনার মা, ব্রজদার বোন; মেজদি বলেছিলেন—কুশুণ্ডিকাটা করবিনে রে? কুইনী তো আসলে মুখুজ্জে। পরে না হয় ক্রীশ্চান হয়েছে।

গোবরডাঙার খুড়িমা একটা বেলপাতায় খানিকটা কালীমায়ের প্রসাদী সিঁদুর বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন—অন্তত এটা দিয়ে দে সুরেশ্বর।

কুইনী তাতে আপত্তি করে নি। একটু হেসেছিল। কালীবাড়ি নারায়ণ-মন্দিরেও সে যেতে চেয়েছিল। অন্তত আগ্রহ ছিল। কিন্তু আবার পথ আটকালে রায়েরা। কল্যাণেশ্বরেরা। এবার কল্যাণেশ্বর একা নয়। গোবরডাঙার খুড়িমাও বলেছিলেন—না, সেটাতে হ্যাঁ বলতে পারব না।

তবে সিদ্ধাসনের নতুন মন্দিরে আমরা দু'জনে প্রণাম করে এসেছিলাম। কেউ আপত্তি করে নি।

ওখান থেকে গোয়ানপাড়ায় ওদের গির্জেতে গিয়েছিলাম দু'জনে। সেখান থেকে ফিরে এসে শুনলাম, রায়বাড়ীর শরিকদের জটলা হচ্ছে।

আমি পরের দিন কুইনীকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। প্রয়োজন নেই। দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্বের একের ষষ্ঠাংশ অংশে আমার প্রয়োজন নেই। আমার ব্যক্তিগত জমিদারী পত্তনী দরপত্তনী স্বত্ব সে কেউ নিতে পারবে না।

যদি পারে তাতেও আমার প্রয়োজন নেই।

না। প্রয়োজন নেই।

গোটা রায়বাড়ীটাই ফেটে হাঁ হয়ে গেছে। ছাদের আলসে ভেঙে পড়েছে। ছাদে জল পড়ছে। বিবিমহলের ছত্রি উড়েছে। এবার পড়বে, ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে।

১৭৯৯ সালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং তাঁর সুযোগ্য পাটোয়ার কানুনগো—কুড়ারাম রায় ভটচাজ লর্ড কর্নওয়ালিসের হুকুমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কালী-মা'র নামে জমিদারী কিনে, সন্তান-সন্ততিদের অন্নপূর্ণার আশীর্বাদে দুধে-ভাতে রেখে হাসিমুখে চোখ বুজেছিলেন—আজ ১৯৪২ সালে আগস্ট মুভমেন্টের মধ্যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড় এসে সে জমিদারীর সব কিছু আছড়ে ফেলে মড় মড় করে ভেঙে দিয়ে গেল।

খবর আসতে লাগল—বড় বড় জমিদারবাড়ীর কোথাও ভেঙেছে মাথা, কোথাও ভেঙেছে মাঝখানে। কোথাও ভেঙেছে ভিত থেকে।

এখন এখানে যে মাথা গুঁজে থাকতে চাইবে সে চাপা পড়বে। প্রজারা আর বেগার দেয় না। ইট-কাঠ চাপা পড়লে তাদের ধরে এনে আর ইট-কাঠ সরানো যাবে না। তোমাদের চাপা পড়ে মরতে দেখলে তারা হাততালি দিয়ে হাসবে। পালাও, এখান থেকে পালাও।

পরিশিষ্ট

চার বছর পর ১৯৫৭ সাল, জুলাই মাস। সন্ধ্যার সময় সুলতা ঘোষ বাসায় ফিরে প্রথমেই টেবিলের উপর রাখা ডাকের কাগজপত্রগুলি নেড়েচেড়ে দেখলে। বেশীর ভাগই কাগজপত্র, সাপ্তাহিক পাক্ষিক পত্র, কিছু ফরেন-এম্বাসী থেকে পাঠানো কাগজ, তাদের প্রচারপত্র। বাকী সব এদেশের। কিছু বিজ্ঞাপন। কিছু বুক পোস্ট। মিটিংয়ের নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা নোটিশ। কয়েকখানা বড় চৌকো দামী খাম সরকারী ফাংশনে নিমন্ত্রণের কার্ড এসেছে। ওগুলিকে ঠেলে রাখতে গিয়ে একখানা এমনি দামী বড় চৌকো খাম তার চোখে পড়ল। সে একটু বিস্মিত হয়ে গেল। খামটার মাথায় লেখা ৺গঙ্গা। অর্থাৎ কারও শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র।

সুলতার জীবন একক জীবন, অধ্যাপনা তার জীবিকা এবং রাজনৈতিক কাজ তার জীবনাদর্শ কিংবা জীবনের নেশা; এমন জীবনে সমাজ ও সংসারের পারিবারিক সুখদুঃখের সঙ্গে বন্ধন তার দুর্বল। মা-বাপ মারা গেছেন বছর তিনেক আগে; ১৯৫৪ সালে। তারপর সে ভাইদের সঙ্গে আলাদা হয়ে বাসা করেছে। তার এই একক জীবনে বান্ধব-বান্ধবীদের ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন বা কোন তরুণ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিয়ের নিমন্ত্রণ আসে কিন্তু 'ওঁ গঙ্গা' লেখা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ আসে না। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ এক-আধখানা আসে পোস্টকার্ড বা খামের ভিতর কার্ড—তাতে শুধু কালো বর্ডার থাকে—ওঁ গঙ্গা-টঙ্গা থাকে না। ওঁ গঙ্গা লেখা খাম এবং খামখানা বুকপোস্ট নয়; রীতিমত খামের টিকিট মারা মুখবন্ধ পত্র। ভিতরে বোধ হয় ব্যক্তিগত পত্রও আছে ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র ছাড়া।

পত্রখানা হাতে নিয়ে সে ভাবলে কোথা থেকে এল? কার পত্র? কে মারা গেল? টিকিটের উপর পোস্টাল স্ট্যাম্প দেখে বুঝতে চেষ্টা করলে কিন্তু নাম পড়া গেল না। কলকাতার কোন পোস্টাপিস থেকে আসছে না। কলকাতার পোস্টাপিসগুলোর সীলের একটা বিশেষত্ব থাকে। এতে তা নেই।

খুলতে যেন খানিকটা সংকোচ হচ্ছে, পিছিয়ে আসতে চাচ্ছে মন। একটু চুপ ক'রে বসে থেকে সে খুলে ফেললে। কার্ড নয় চিঠি এবং একখানা নয় দু'খানা। অনুমানমত একখানা হাতে লেখা, অন্যখানা ছাপা। ভাঁজের উল্টো পিঠ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। সে আগে ছাপা চিঠিখানাই খুলে নিচের দিকে তাকিয়ে নিমন্ত্রণকর্তার নামটা পড়ল।

সাবিত্রী রায়। কীর্তিহাট, মেদিনীপুর। কীর্তিহাটের রায় মানে রায়বাড়ী। কিন্তু

সাবিত্রী রায় কে ? চোখের দৃষ্টি উপরে তুলতেই তার চোখ নিবদ্ধ হল একটা নামের উপর—স্থরেশ্বর রায়।

আমার স্বামী স্থরেশ্বর রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে আগামী ২২শে শ্রাবণ ঝুলনপূর্ণিমার দিন তাঁহার ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পারলৌকিক বৃষোৎসর্গ ক্রিয়াদি—আর পড়তে পারলে না স্থলতা, হঠাৎ বুকের মধ্যে বর্ষার ফুলে-ওঠা মেঘের মত পুঞ্জিত মেঘ ফুলে ফেঁপে উঠে তার অন্তরলোকটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে।

স্থরেশ্বর নেই ?

কিন্তু সাবিত্রী দেবী কে ? স্থরেশ্বর বিয়ে করেছিল কুইনী মুখার্জী বলে একটি ক্রীশ্চান মেয়েকে। গোয়ানপাড়ার ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং সে তো সাবিত্রী নয়। তবে নতুন বিয়ে করেছে স্থরেশ্বর ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে স্থলতা। মনে পড়ল চার বছর আগে দুদিন ধরে সেই রায়-বাড়ীর জবানবন্দী শোনার কথা। ১৯৩২-এর সাইক্লোনের রাত্রে স্থরেশ্বর এবং কুইনী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করেছিল এবং কালী-মায়ের প্রসাদী সিঁদুর রায়বংশের মেয়েদের সামনে কুইনীর সিঁথিতে পরিয়ে দিয়েছিল। এবং কলকাতা চলে এসেছিল ক'দিন পরই। কীর্তিহাটে থাকতে পারে নি, থাকা সম্ভবপর হয় নি। রায়বংশের পুরুষেরা আপত্তি করেছিল। যে-বাড়ীতে পাষাণময়ী কালী প্রতিষ্ঠিতা, রাধাসুন্দর বিগ্রহ এবং রাজরাজেশ্বর সৌভাগ্যশিলা শালগ্রাম অধিষ্ঠিত সে বাড়ীতে এই ধরনের বিবাহ সিদ্ধ নয় এবং কোন ক্রীশ্চান বা ভিন্নজাতীয়া স্ত্রীকে নিয়ে কেউ এই রায়বাড়ী বসবাসেরও অধিকারী নন অথবা সম্পত্তিরও অংশীদার হতে পারেন না কারণ সম্পত্তি সমস্তই দেবোত্তর।

তাই কুইনীকে নিয়ে কলকাতা পালিয়ে এসেছিল সুরেশ্বর। তারপর লেগেছিল ওই বিয়েকে উপলক্ষ করে মামলা প্রকাণ্ড মামলা। স্থরেশ্বর বলেছিল—প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মে রায়বাড়ীকে একদিন হারিয়ে যেতে হবে নগণ্য হয়ে সব মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে হবে। মুঘল বাদশাহদের বংশের ছেলেদের নাকি কুরশীনামা ধ'রে খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ যে টাঙায় চড়ে লোকে তাদের খোঁজে সেই টাঙার টাঙাওয়ালাই হয়তো বাদশা বংশের। রায়বাড়ীরও সেই পালা শুরু হয়েছে। আমি এরই মধ্যে নিজে থেকে এগিয়ে এসে কিছু দেনা শোধ করতে সংকল্প করেছিলাম বাবার মৃত্যুর পর; মৃত্যুশয্যায় মাও আমাকে বলতেন। সেদিনও বলেছেন। সর্বশেষ বলেছিলেন—ঠাকুমা উমা দেবী। তাঁর আশীর্বাদই হোক আর যাই হোক, গোয়ানপাড়ার ক্রীশ্চান মেয়ে কুইনীর রূপের মোহ যখন আমায় টানলে, যখন আমি জমিদারীর অর্থবল নিয়েও তাকে জমিদারের ছেলের মত জয় করে নেবার ভার বুদ্ধি করি নি, তাকে প্রেম দিয়ে জয় ক'রে তার সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বেঁধে কিছু দেনা শোধই করেছিলাম। কিন্তু তা রায়বাড়ীর শরিকেরা মঞ্জুর করলে না। দেবতার দোহাই দিয়ে আদালতে নালিশ করলে—আমার জাত গেছে এ বিয়ে ক'রে, সুতরাং দেব-সেবায় আমার অধিকার নেই। দেবসেবায় অধিকার না থাকলে দেবত্র সম্পত্তি পাব না এবং হিন্দু ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের অর্জিত সম্পত্তির একটি কণারও আমি

অধিকারী হতে পারি না। এ দেশের ধর্মাধিকরণের মামলার ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ইতিহাসেও আছে।

সুলতাই তাকে বাধা দিয়েছিল। চোখে দেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব থেকে বড় কথাটা মনে পড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—ক'বছর আগে যে দেশটা স্বাধীন হতে গিয়ে ধর্মের পর কবন্ধ হয়ে তবে রেহাই পেলে সে দেশে ওর নজীরের আর দরকার নেই সুরেশ্বর। তুমি বল কি হল তারপর?

হেসে সুরেশ্বর বলেছিল—কি আর? মামলা, মামলা দায়ের হল, মেদিনীপুরের জজ কোর্টে। আর কীর্তিহাটের পঞ্চগ্রাম সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণ ও হিন্দুসমাজের মাতব্বরদের ডেকে রায়বংশের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল দু'বছরের মধ্যে মামলা মেদিনীপুর কোর্ট থেকে হাইকোর্টে এসে দাখিল হয়েছিল। এবং এ মামলায় এবার দীর্ঘকাল পর ঘরের কোটরের অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন আমার জ্যাঠামশায় যজ্ঞেশ্বর রায়।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপৌত্র। যজ্ঞেশ্বর রায় দেবেশ্বরের সামনে তাঁর প্রিয়পাত্রী গবর্নেস মেমসাহেবের পিঠে চাবুক মেরে তাড়িয়েছিলেন। যজ্ঞেশ্বর রায় বাপের কদাচারের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর রায় নিজের মাকে ক্রীশ্চানপাড়ায় ক্রীশ্চানের ঘরে জল খাওয়ার জন্য পাগল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁকে বৃন্দাবনে বনবাসিনী করেছিলেন। ভায়লেটের পুত্রের দৌহিত্রী কুইনীকে ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বিয়ে করায় যে অন্যায় এবং যে অনাচার আমি করলাম বলে তাঁর মনে হল তা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাছাড়া তখন তিনি অবস্থার দিক দিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। যুদ্ধের কাল, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধ এসে পড়েছে; বার্মা ফ্রণ্টে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি উঠেছে; কলকাতার আকাশে জাপানী বম্বার এসে বম্বিং করে গেছে। ইংরেজ আমেরিকান কাফ্রি নিগ্রো পল্টনে দেশ ছেয়ে গেছে। তার সঙ্গে এসেছে লাখ লাখ টাকার নোট, দেশের হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই সুযোগে জ্যাঠামশাই আবার নেমেছিলেন ব্যবসাতে। তাঁর দুই ছেলে এক অ্যামেরিকান কর্নেলের সুনজরে পড়ে মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট পেয়েছেন যা থেকে রাতারাতি অবস্থা ফিরে গেছে। আবার গাড়ী কিনেছে বাড়ী কিনেছে; সন্ধ্যার অবকাশ বিনোদনের জন্য ময়দানে ময়দানে নিত্যনতুন বিনোদিনীর সন্ধান ক'রে বেড়ায়। তারাও এসে দাঁড়াল বাপের পিছনে। যজ্ঞেশ্বর রায় কতকগুলো পত্র বের করেছিলেন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেশ্বর রায় লিখেছিলেন পরস্পরকে। তাতে তাঁর স্বপক্ষে যাবার মত অনেক কিছু ছিল।

সে মামলা ১৯৫৩ সালে সেদিনও মেটে নি। তখনও মামলা চলছিল।

সব মনে পড়ছে সুলতার। ওঃ, সুরেশ্বর নেই! সুরেশ্বর! সুরেশ্বর তার জীবনের প্রথম যৌবনস্বপ্নের রাজপুত্র। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়েই সে এসেছিল। সোনার কাঠি রূপার কাঠি নাড়ানাড়ি করতে করতে সে তার ঘুম ভাঙিয়েছিল।

ফুল তুলে এনে ঢেলে দিয়ে বলেছিল—মালা গাঁথ। সে মালা গাঁথলে, সুরেশ্বরও মালা গেঁথেছিল কিন্তু বিনিময় করা হয়ে উঠল না। কোথা থেকে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল

তারই পূর্বপুরুষের রক্তের স্রোত। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের পিছন থেকে ডাক দিয়েছিল তার নরক-যন্ত্রণাকাতর পূর্বপুরুষেরা। 'উদ্ধার কর—আমাদের উদ্ধার কর। আমরা বহু ঋণে ঋণী। সে ঋণ শোধ করে আমাদের মুক্ত কর।'

থাক—সে সব কথা থাক। সে সব কথা চাপাই পড়ে থাক; না—চাপা পড়ে নয়, কালস্রোতে অতীতকালের বিস্মৃতির দিগন্তে অন্ধকারে হারিয়ে যাক।

সুরেশ্বর সেই দেনা শোধ করতে চেয়েছিল।

সেদিনও তাই সে বলেছিল সুলতাকে। বলেছিল—এই মামলা আমার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট ক'রে দিলে সুলতা।

বড় বড় আইনজ্ঞেরা বললেন—ব্যাপারটা কতটা জটিল বুঝতে পারছি না। দলিলে অনেক রকম রয়েছে। অনেক ব্যাখ্যা হয়। আচরণেও তাঁরা অনেক রকম ক'রে গেছেন। তবু একটা কাজ করা ভাল। আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করুন। দেবোত্তর বা পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। তিন আইনে বিয়ে করেছেন, ওতে আপনার ধর্ম আপনার, স্ত্রীর ধর্ম তাঁর, তা আইন মানবে। কিন্তু কীর্তিহাটের দেবোত্তর এলাকার মধ্যে তাঁকে আনবেন না। তাতে ওঁরা সুবিধে পাবেন।

শুনে কুইনী আমাকে বললে—তুমি আমাকে বিদায় দাও। আমি চলে যাই। বিদায় না দাও আমি জোর ক'রে চলে যাব।

সুরেশ্বর বলেছিল—বলতে গেলে সে সংঘর্ষ এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ। কুইনী উপবাস শুরু করেছিল। তার স্বামীর জীবনে ঘরে-সংসারে যদি সে সর্বময়ী কর্ত্রীত্ব না পায় তবে বিবাহ তার কিসের বিবাহ? আর এ যদি দেবেশ্বর রায়ের ঋণশোধ হয় তা হলেই বা সে এ বিবাহ স্বীকার করবে কেন? না, তাও সে চায় না। দেবেশ্বর-ভায়লেটের জীবনের দেনাপাওনার শোধবোধ হিসেবনিকেশ একান্তভাবে তাদের ব্যাপার। সুরেশ্বরও দেবেশ্বর রায় নয়, সেও ভায়লেট নয়।

সুরেশ্বর হেসে সেদিন সুলতাকে বলেছিল, আজও সুলতার মনে পড়ছে তার সে হাসিমুখ; সুরেশ্বর বলেছিল—নারী চরিত্র, নারীর মন, নারীর হৃদয় সবই বিচিত্র—সম্ভবতঃ বিধাতার পরম রহস্যময় সৃষ্টি সুলতা। সম্ভবতঃ সে কথা তোমরা নিজেরাও জান না। কুইনী আমার কাছে দুর্জ্জেয় হয়ে উঠেছিল। আমি যখন বললাম—বেশ চাইনে আমি দেবোত্তরের সেবায়েতের অধিকার। কি হবে ওতে? কি আছে? আছে শুধু দেবতার প্রসাদী অন্ন আর ইস্কুল, ডাক্তারখানায় ফাউণ্ডার হিসেবে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার হওয়ার অধিকার। ও আমি চাইনে।

কুইনী সারাদিন ভেবেচিন্তে বলেছিলে—না, তাও ছেড়ে দিতে পাবে না।

—কি করব তা হ'লে আমাকে বল?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল—সে আমাকে বলে দিতে হবে? তুমি জমিদারের বংশের ছেলে—তুমি জান না? তুমি মামলা লড়ে যাও।

—সেই মামলার জন্যই তো উকীলরা বলেছে—আমরা যেন এখন রায়বাড়ীর দেবোত্তরের

সীমানার মধ্যে বাস না করি। আমরা তিন আইনমতে বিয়ে করেছি; ওতে আমার জাত যায় নি, যাবে না। আজকে বিলেত থেকে এসে কেউ প্রায়শ্চিত্তও করে না। আপত্তি গ্রাহ্য হতে পারে যদি তুমি মনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে দেবতার পূজার্চনার উদ্যোগ-আয়োজনে হাত দাও। মন্দিরে ঢুকতে যাও—

—মন্দিরে না হয় নাই ঢুকলাম কিন্তু তোমার স্ত্রী হয়ে আমি সে অধিকারই বা পাব না কেন? চোখ ফেটে তার জল এসেছিল।

বলেছিল—তোমার ভগবানের কাছে যদি আমি অস্পৃশ্য হই তবে আমি তোমার ঘরের অধিকার নিয়ে কি করব?

এবার কেঁদে ফেলেছিল ঝর ঝর ক'রে—তাহলে আমার ঠাঁই কোথা রইল বল? গোয়ান-পাড়ায় ওদের কাছেও আমার আর স্থান নেই, তোমাদের বাড়ী কীর্তিহাটের বাড়ীতেও না। তোমার স্বর্গেও না? অথচ সম্পত্তির অধিকাংশই আজ তোমার। তুমি জমিদার। আমার জন্যে তুমি চোর সাজবে সেখানে? আমি তোমার স্ত্রী হয়েও আমার প্রাপ্য সম্মান পাব না? তার চেয়ে মুক্তি দাও আমাকে।

সুরেশ্বর বলেছিল—আমি সম্পত্তির অধিকার ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম দেবোত্তরের অধিকার ছেড়ে দেব আমি। আমি ধর্ম বলতে গেলে মানিনে। তবু তোমার ধর্মান্তর গ্রহণ করতেও রাজী আছি। আমি রাজ্যের জন্য রামের মত সীতাকে বনবাস দিতে চাইনে। তার থেকে আমিও বনবাসী হব তোমার সঙ্গে।

কিন্তু তাতেও সে রাজী হয় নি।

—না। না। বলে সে শুধু কেঁদেছিল। শুধু কাঁদাই নয়, সাইক্লোনের রাত্রে সে যেমন ভয়ার্ত হয়েছিল তেমনি ভয়ার্ত হয়ে পড়েছিল। বাড়ী থেকে চলে যাবার জন্যে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়েও সে ফিরে এসেছিল। যেতে তার সাহস হয় নি। ডাইভোর্সের কথাও সে তুলতে পারে নি। কারণ সে তখন একা নয়। তার গর্ভে তখন আমাদের সন্তান এসেছে।

আমি তাকে বলেছিলাম—তা হ'লে এক কাজ কর। তুমিই হিন্দুধর্ম গ্রহণ কর। তোমার পূর্বপুরুষেরা তো হিন্দু ছিলেন।

তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠেছিল সে—না।

মনে পড়ছে সুলতার—সুরেশ্বর বলেছিল—দেখ সুলতা, যদি বলতে পারতাম বা সত্যিই এমন হ'ত যে বিষয়সম্পদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঁচা যায় বা তার আকর্ষণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে একটি পুরুষ এবং একটি নারী পথে বেরিয়ে গাছতলায় বাসা বাঁধতে পারত তা হ'লে সে কথাটা আজ তোমার কাছে উঁচুগলায় বলতে বড় ভাল হ'ত। অন্ততঃ উল্লাস বোধ করতাম। কিন্তু তা হয় নি। এবং সচরাচর তা হয় না। আমাদের দেশে কত অসবর্ণ এবং এ জাতে ও জাতে প্রেম ব্যর্থ হয়েছে তার সংখ্যা নেই। তাতে সমাজ দায়ী বলে এসেছি কিন্তু সমাজের সেখানে শুধু একঘরে করার ক্ষমতাটাই চরম ক্ষমতা নয়, চরম ক্ষমতা সেখানে ঘর থেকে বের করে দেওয়া—সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া। আমার সম্পত্তি কম সম্পত্তি নয়। মূল

দেবোত্তরের আয়ও আমার অংশে খরচখরচা বাদে চার হাজার টাকা। তার সঙ্গে ছিল এক বিচিত্র জেদ। "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী"।

যে জেদে কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী শেষ হয়ে গিয়েছিল। যে জেদের মামলায় শোভাবাজারের দেবেদের বাড়ীর মামলায় ছ-সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছিল।

আবার কুইনীর এবং আমার আকর্ষণ, আমাদের প্রেম এমন ক্ষীণজীবী ছিল না—যা এই স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রথম আঘাতেই মরে যাবে।

আমরা মিথ্যাবাদীও ছিলাম না—আজও নই।

আমরা শেষ পর্যন্ত মামলার জন্যেই আইনজ্ঞদের পরামর্শে আলাদা বাস করতে লাগলাম। কুইনী চলে গেল এলিয়ট রোডের বাড়ীতে। সেখান থেকে নার্সিংহোমে। সেখানেই আমাদের একমাত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল।

সুলতা বিস্মিত হয়েছিল—তোমার ছেলে?

—হ্যাঁ। আমাদের ছেলে। কুইনার এবং আমার। মানবেশ্বর। কুইনী তাকে নিয়ে দেরাদুনে থাকে। ছেলে থাকে রেসিডেনসিয়াল ইস্কুলে, কুইনী থাকে বাড়ীতে—সেখানে একখানা বাড়ী কিনেছে সে। ওখানে সে চাকরিও একটা করে। মানবেশ্বরের জন্মের পর সে ভর্তি হয়েছিল কলেজে; তোমাকে আগে বলেছি সে অর্চনীর সঙ্গে এম-এ পাস করেছিল। সে আমার কাছ থেকে তার নিজের জন্যে কিছুই নেয় না, মানবের খরচ নেয়। সম্ভবতঃ আমরা দুজনে পরস্পর থেকে দূরে গিয়ে পড়েছি। অনেকটা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

পরস্পর থেকে দূরে দূরে থাকলে যা হয়। যেমন তোমার সঙ্গে হয়েছে। তাই। তা ছাড়াও কারণ আছে সুলতা। সে যা চায় আমি তা ঠিক সমর্থন করি না। আমি যা চাই তার সে প্রতিবাদ করে।

দেখ, আমার মনে একটা কল্পনা আছে। রায়বংশের পূর্বপুরুষেরা মানুষের কল্যাণ যা ক'রে গেছেন তার পুণ্য তাঁদের—কিন্তু যে সব অকল্যাণ অত্যাচার করে গেছেন সে তাঁদের পাপ তাঁদের দুর্নাম, যা আজকে রায়বংশের ছেলেদের কপালে উল্কিতে কলঙ্কচিহ্নের মত আঁকা হয়ে গেছে, তার জন্যে কিছু করে যাব।

১৯৪৮।৪৯ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষের ক্রমশ গ'ড়ে ওঠা তোমরাও দেখেছ। হয়তো, রাজনীতি ভাল বোঝ, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছ, তোমরা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পার কিন্তু আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম, শিল্পী হিসেবে কাজ পেয়েছিলাম, সে আমি নিয়েও ছিলাম। অবস্থা স্বচ্ছল বলে প্রত্যাখ্যান করি নি। কয়েকজন বড় নেতা বা ভারতভাগ্যবিধাতার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁরা স্নেহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্দার প্যাটেল একজন। তিনি প্রথম দিন আমাকে দেখে বলেছিলেন—তুমি আর্টিস্ট হয়?

বলেছিলাম—Yes sir.

—আমার মনে হচ্ছে তোমার পিছনে একটা পুরনো ফ্যামিলির ট্রাডিশন রয়েছে। তোমার চেহারা তোমার সহবৎ বলছে।

বলেছিলাম—সামান্য আয়ের জমিদারবংশের ছেলে।

—হাঁ। সেই কথাই বলছি। খুশী হয়েছি তোমাকে দেখে। আরও খুশী হয়েছি তুমি শিল্পী হিসেবে কাজ করছ বলে। গুড।

তাঁর স্নেহ পেয়েছিলাম সুলতা। সেই সূত্রে আমি ভারতবর্ষের ইন্টিগ্রেশন চোখে দেখেছি। ভারতবর্ষের মহারাজা মহারাণাদের সে এক আশ্চর্য মহিমা।

দু'একজন জুনাগড়ের নবাব, হায়দ্রাবাদের নিজাম বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু সেটা ক্ষুদ্র বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়। সেটা ধর্মের গোঁড়ামি বলতে পার আবার সেটাকে উল্টে পাকিস্তানীদের ধর্মের জন্য ত্যাগের মহিমাও বলতে পার।

হেসে বলেছিল সুরেশ্বর—যে বিচারবুদ্ধি সেকুলার স্টেট ভারতবর্ষে সামাজিক বিধানে আমার এবং কুইনীর মধ্যে নল আর দময়ন্তীর মাঝখানে ছুরি হাতে কলির মত আকর্ষণের বন্ধন কেটে দিচ্ছিল।

যাক। মোটমাট দিল্লী থেকে ১৯৫০ সালে আমি একটা মন নিয়ে ফিরেছিলাম। বলতে পার, ইমোশনাল মন। যে মন আমাকে বলেছিল—জমিদারী তুমিও সরকারকে দিয়ে দাও। বল স্বাধীন ভারতবর্ষে গভর্নমেন্টের অধীনে কীর্তিহাটের প্রজাদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে থাকব আমি। তোমরা নাও জমিদারী। জমিদারীর আয় এখানকার মানুষের কল্যাণের জন্য খরচ করা হোক।

এতে কিন্তু কুইনী রাজী হয় নি। মুখে আপত্তি করে নি কিন্তু খুশী সে হয় নি।

আমি বলেছিলাম—এতেই রায়বংশের পূর্বপুরুষদের সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সে বলেছিল—মানবেশ্বরের মা হিসেবে আমি এতে আপত্তি করছি। সে জমিদারবংশে জন্মে কেন সাধারণ প্রজার সঙ্গে এক হয়ে বাস করবে কীর্তিহাটে?

সেদিন সুরেশ্বরের জবানবন্দীতে কীর্তিহাটের কড়চায় এইখানেই ছেদ পড়েছিল। কারণ ঠিক এই সময়টিতেই একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই ট্যাক্সি থেকেই নেমেছিল একটি আধুনিকা মেয়ে এবং তার হাত ধ'রে একটি ছেলে।

সুলতার বুঝতে বাকী থাকে নি তারা কে। ছেলেটির মুখে সুরেশ্বরের ছাপ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। মেয়েটির মধ্যে ছিল একটি মিশ্র সৌন্দর্যের আভাস। রুখু চুলে পিঙ্গল আভাস, চোখের তারাতেও ছিল তাই। তার মধ্যে আছে মোহ।

এই কুইনী। মা ছেলের মুখে পাহাড় থেকে নেমে আসার ছাপ রয়েছে।

সুরেশ্বর প্রপিতামহ-পিতামহের ঋণশোধ করতে—অঞ্জনার মেয়ে ভায়লেটের ছেলের দৌহিত্রী এই মেয়েটিকে সেই আকর্ষণে জীবনে গ্রহণ করতে চেয়েছিল অথবা ওর রূপের মোহে মোহাবিষ্ট শিল্পীর মত আপনাকে হারিয়ে ওকে গ্রহণ করেছিল, তাতে তার প্রশ্ন জেগেছিল।

কিন্তু আর সে ওখানে অপেক্ষা করতে চায় নি। চলে আসতে চেয়েছিল।

আলাপ করিয়ে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আটকে রেখেছিল তাকে সুরেশ্বর। কিন্তু জবানবন্দী বা কড়চার কথার ওখানেই শেষ। তবে আরও খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল সুলতা কথাবার্তা থেকে।

প্রাথমিক আলাপের পর কুইনী হঠাৎ বলেছিল সুলতাকে—আপনি বয়সে বড়—দিদি বলব

আপনাকে। কেমন ?

সুলতা বিব্রত বোধ করেছিল, তবু বলতে হয়েছিল—বেশ তো !

কুইনী বলেছিল—সম্ভবতঃ জানেন যে উনি জমিদারী বিনা কমপেনসেশনে নেবার জন্যে গভর্নমেণ্টকে মানে চীফ মিনিস্টার ডাঃ রায়কে পত্র লিখেছেন ?

সুলতা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—কই জানিনে তো! এ কথা তো বলনি সুরেশ্বর !

হেসে সুরেশ্বর বলেছিল—না, বলি নি। ডাঃ রায়ের জবাব এখনও পাই নি। ২৩শে অ্যাসেম্বলীতে বিলটা পাস হয়েছে। ২৪শে মানে গত পরশু হঠাৎ চিঠিটা লিখে ফেললাম। টেলিফোনে কথাটা কুইনীকে জানিয়েছিলাম। ও রাগ করলে। কথাটা তোমাকে বলা হয় নি। বলবার সময়ও পাই নি। পুরনো কথা—

কুইনী কথাটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল—দেখ, জীবনে বোধহয় আমাদের মেলবার অধিকারই ছিল না। আকর্ষণ অনেক সময় দুর্নিবার হয়, আত্মসম্বরণ করা যায় না। তবু সম্বরণ করতে হয় নইলে চরম মূল্য দিতে হয়। আমাদের তাই হয়েছে। তোমারও ভুল আমারও ভুল। তার মাশুল আমি দিচ্ছি দেব, তুমিও দিচ্ছ—সম্ভবত দিয়ে যাবে। একদিন হঠাৎ দিতে অস্বীকার ক'রে আবার নতুন জীবন আরম্ভ করবে তা বলছিনে। আমরা পৃথক হয়ে রয়েছি, পৃথক হয়েই গেছি। আমার কোন দাবীই তোমার কাছে নেই। সে জানাচ্ছি নে। কিন্তু মানবেশ্বর ? ওর অধিকার ও ছাড়বে কেন ? আপনি বিচার করে বলুন সুলতাদি ?

সুলতাকে বলতে হয়েছিল—কথাটা উনি অন্যায় বলেন নি সুরেশ্বর। এতে কি হচ্ছে ? যেখানে বছরে বছরে ডেভেলপমেণ্টের নাম ক'রে দেশবিদেশ থেকে হাজার কোটী দরুণে টাকা ঋণ নেওয়া হচ্ছে সেখানে তোমার কম্পেনসেশনের অল্প—হয়তো লক্ষই হল—তা গভর্নমেণ্টকে ছেড়ে দিয়ে কি লাভ হবে ?

সুরেশ্বর বলেছিল—রায়বংশের পূর্বপুরুষেরা মুক্তি পাবেন হয়ত। আর আমার মন বলছে, তাঁরা মুক্তি পান আর না পান, আমি মুক্তি পাব। বাংলা দেশের ইতিহাসের নথিপত্রের মধ্যে থাকবে, মহাকালের খাতাতেও থাকবে, অন্ততঃ একজনও জমিদারীর কম্পেনসেশনের টাকা নেয় নি।

এবার কেউ কিছু বলবার আগেই পরশু রায়বাড়ীর যে শরিকরা এসেছেন কলকাতায়, তাঁরা এসে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলেন।

কুইনী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে—এই যে এঁরাও হাজির হয়েছেন। ওঁদের দাবী মিটিয়ে মিটমাট করবে নাকি ? কিন্তু কেন করবে ? আমাদের জীবনের ধারা যুক্তবেণী থেকে মুক্তবেণীতে খুলে দু দিকে বেয়ে গেল ; চলছে সমুদ্রমুখে, আর তো মিলবে না। এখন আর কার স্রোত বন্ধ করে মুখে বাঁধ দেবে ?

—ধর, আমার।

—না, আমারও না, তোমারও না। এই ভাল।

—সুরেশ্বর! কার গম্ভীর আওয়াজ এসেছিল নিচে থেকে।

—যাচ্ছি অতুলকা। বস।

অতুলেশ্বরকে নিয়ে এসেছিল রায়বাড়ীর শরিকেরা। সুরেশ্বরের আগেই সুলতা উঠে বলেছিল—আমি উঠলাম সুরেশ্বর।

ওইখানেই সুরেশ্বর ও কীর্তিহাটের কাহিনী কড়চা জবানবন্দী শেষ হয়েছিল চার বছর আগে। ১৯৫৩ সালের ২৬শে নভেম্বর সকালবেলা নটার সময়। সুলতা চলে এসেছিল। আর খবর রাখে নি। ভুলেই গিয়েছিল এক রকম। ওরাও খোঁজ করে নি। সে নিজেও করে নি।

*　　　　*　　　　*

এতকাল পর আজ হঠাৎ এই চিঠিখানা!

ও! সুরেশ্বর নেই! কয়েক ফোঁটা চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়ল তার। টেবিলে ভর দিয়ে হাতের তালুতে থুতনি রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। ঝিরঝির করে একপশলা বৃষ্টি এসেছে। মৃদু মৃদু জলেভেজা হাওয়া আসছে। তার সঙ্গে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির ছাট।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে হাতেলেখা চিঠিখানা খুললে। নীচে নামটা দেখলে সাবিত্রী দেবী : তার পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখেছে 'কুইনী'।

কুইনীই সাবিত্রী! সাবিত্রী? কে? কেউ দিয়েছিল নামটা? কেউ মানে সুরেশ্বর, বা অর্চনা, না নিজেই ও নিয়েছিল?

হঠাৎ কুইনী থেকে সাবিত্রী কেন?

থাক। থাক সে কথা। সে চিঠিখানা পড়লে। লিখেছে

"ভাই সুলতাদি,

এ ছাড়া আর কি বলে সম্বোধন জানাব আপনাকে? দেখতেই পাচ্ছেন উনি নেই। ছ' মাস আগে দোলপূর্ণিমার দিন আমাকে মানবকে ফেলে চলে গেছেন। আগামী শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমার দিন তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া করবে মানব। আপনি আসবেন দয়া করে? এলে খুব খুশী হব। কীর্তিহাটে আপনাকে একবার নিয়ে আসবার একান্ত অভিপ্রায় ওঁর ছিল। আমি একান্তভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, আসবেন।

ইতি সাবিত্রী রায় (কুইনী)"

সুলতা মনে মনে বললে, যাব বইকি। যাব। নিশ্চয় যাব। দেখে আসব।

গেল সুলতা। খবর দেওয়া ছিল, রাস্তাঘাট এখন সুগম হয়েছে, পিচঢালা রাস্তা, কোন কষ্ট হল না তার। স্টেশনে গাড়ী ছিল, আর ছিল রঘুয়া। পথ, মোটরেও ঘণ্টা দেড়েক লাগল। বাস চলছে, তার সঙ্গে গরুর গাড়ী চলছে। আগে বাস ছিল না, মোটর ছিল না, বড় বড় জমিদারদের পাল্কি চলত, হাতী চলত। জুড়িগাড়ীও মধ্যে মধ্যে চলত।

কীর্তিহাটে এসে যখন ঢুকল, তখন বেশ বেলা হয়েছে, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; রোদ্দুর ওঠে নি এখনও। সব যেন ভিজে নরম হয়ে গেছে। মনটা সুলতার উদাসীন হয়েই ছিল। আরও যেন সজল এবং নরম হয়ে উঠল।

সর্বাগ্রে চোখে পড়ল বিরাট বড় ভাঙা তেমহলা বাড়ীটা। প্রায় মুখথুবড়ে পড়বার মত হয়ে আছে। যে কোনদিন যে কোন মুহূর্তে পড়তে পারে।

সুলতা জিজ্ঞাসা করলে রঘুকে—রঘু ওইটে বুঝি বাবুদের বাড়ী?

—হাঁ দিদিমণি। অন্দরমহল। কাছারী, ঠাকুরবাড়ী ওদিকে আছে।

—ভেঙে ফেটে তো চৌচির হয়েছে!

—হাঁ। বাবুই তো মেরামত করাতেন। থাকত সব শরিকরা। তা মামলা বাধলো তো বন্ধ করে দিলেন মেরামত। শরিকরা সব জানলা-দরজা খুলে নিয়ে গেল। ছাদ ভাঙিয়েছে, কড়ি ভি নিয়ে গেছে।

—বিবিমহল কোনটা?

—সেটা থোড়া দূর। একদম নদীর কিনারে। উ ঠিক আছে। মেরামত করাইসেন বাবু। ওই দেখেন।

বিবিমহল অটুট আছে। তবে নাম পাল্টে গেছে। বাড়ী ঢুকবার ফটকটার থামের গায়ে ট্যাবলেট মারা 'ভবানী নিবাস'। হাসলে সুলতা। শতাব্দীর কালিপড়া দেওয়াল কি একটা পাতলা সাদা কালি চুনের আস্তরণে ঢাকা পড়ে! তবে সুরেশ্বরের মনটা সে বুঝতে পারলে।

অর্চনা তার জন্ম অপেক্ষা করছিল। সে বললে—এস ভাই সুলতাদি। চা খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। চল, শ্রাদ্ধ দেখবে চল। বার বার করে বলেছে কুইনী, যেন সুলতাদিকে নিয়ে যেও।

—সে কি সেখানে? শ্রাদ্ধের আসরে?

—হ্যাঁ।

সবিস্ময়ে সুলতা প্রশ্ন করলে—শ্রাদ্ধ কি রকম হচ্ছে, মানে কি মতে? চিঠিতে বৃষোৎসর্গ লেখা!

অর্চনা বিষণ্ণ হেসে বললে—হ্যাঁ, হিন্দুমতেই হচ্ছে। হিন্দুশ্রাদ্ধের যে পদ্ধতিতে বৃষোৎসর্গ হয়। তুমি যা বলছ বুঝেছি। কিন্তু সুরোদার মৃত্যুর পর এমন ভেঙে পড়ল কুইনী যে, শরিকদের ডেকে তাদের জমি-জেরাত ছেড়ে দিলে, তারপর পণ্ডিতদের মত নিয়ে ক্রিয়া করে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়ে সাবিত্রী নাম নিয়েছে। নামটা অবশ্য সুরোদাই দিয়ে গিছল। মানব শ্রাদ্ধ করবে, সে শ্রাদ্ধের চরু রাঁধবে। সেখানেই রয়েছে সে।

সুলতা বললে—ট্রেনেই ভোরবেলা হাতমুখ ধুয়েছি। স্টেশনে এক কাপ চাও খেয়েছি। চল আগে শ্রাদ্ধের ওখানেই চল।

—এস। বলে চলতে শুরু করলে অর্চনা। বিবিমহল থেকে বেরিয়ে বড় বাগানের ভিতর দিয়ে অন্দরমহল হয়ে ঠাকুরবাড়ী। সুলতার মনে অনেক প্রশ্ন উঠছে। অনেক প্রশ্ন। হঠাৎ সুলতা থমকে দাঁড়াল। বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অর্চনা বিষণ্ণ হেসে বললে—কুইনীর কথা?

—হ্যাঁ। সেবার তো দেখে গেলাম ওঁরা পৃথক বাস করছেন, ডাইভোর্স হবে বলেই মনে হল।

অর্চনা বললে—হ্যাঁ। তাই আমরাও ভেবেছিলাম। চলছিলও ওইভাবে। কুইনী চাকরি নিয়েছিল। দেরাদুনেই থাকত। মানব বড় হতে একটু গোলমালও বেধেছিল। সুরোদা ওকে দেরাদুন থেকে সরিয়ে শান্তিনিকেতনে দিয়েছিলেন। কুইনী নভেম্বরে শীতের ছুটিতে আসত, শান্তিনিকেতনে বাড়ী কিনেছিলেন সুরোদা, সেখানে এসে ছেলেকে নিয়ে থাকত। আবার গরমের সময় মানবকে সুরোদা পাঠিয়ে দিতেন দেরাদুন। নিজে আজ কলকাতা, কাল কীর্তিহাট, পরশু শান্তিনিকেতন করে ফিরতেন। সুরোদা জমিদারী বিনা কম্পেনসেশনে গভর্নমেণ্টকে দিতে চেয়েছিলেন, জানেন কিনা জানি না।

সুলতা বললে—জানি। কি হল তার?

—ডাঃ রায় লিখেছিলেন, আপনি টাকাটা নিয়ে কিছুতে দান করে দিন। আমরা বিনা কম্পেনসেশনে জমিদারী নিতে পারি না। আইনে বাধবে। সুরোদার ইচ্ছে টাকাটা তিনি সই করে হাত পেতে নেবেন না। তাই একটা কিছু করবার চেষ্টায় ঘুরছিলেন। একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তাতে জমিদারী স্বত্বটাই দান করে দেবেন। তারাই টাকাটা নেবে। এই খাটাখাটনি আর ওই দোষ, মদ খাওয়া। ওতেই হঠাৎ হল করোনারি এ্যাটাক। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে কুইনী এল। এসে তাঁর বিছানার পাশে বসল। বাড়াবাড়িটা কমলে একদিন সুরোদাকে বললে, আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দাও। সুরোদা বললে—দেব? কুইনী কেঁদে ফেলেছিল ঝরঝরে করে। ছটা মাস সুরোদার বিছানার পাশ থেকে ওঠে নি। শেষকালটায় ওর কোলেই মাথা রেখে শুয়ে থাকতে ভালবাসতেন। নামটা পাল্টে সুরোদাই সাবিত্রী বলে ডাকতেন। ওর কোলেই মাথা রেখে সুরোদা চলে গেল। গত ফাল্গুন মাসে। তখনই কুইনী ওই দীক্ষা নিয়ে বিধবা সাজলে। ওটার দরকারও ছিল। না করলে এখানকার লোকে আপত্তি করত। নারায়ণ মন্দিরের চত্বরে শ্রাদ্ধ হচ্ছে, সামনে রাজরাজেশ্বরশিলা, মন্দিরে রাধাসুন্দর বিগ্রহ, ওখানে কুইনীকে চরু রাঁধতে দিত না। অবশ্য অন্য কেউ রাঁধলেও চলত। কিন্তু কুইনী ওটা নিজে হাতে করবে বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল যেন। মনে ওর দ্বিধা হয়েছে, কষ্ট হয়েছে দীক্ষা নিতে। আমি বলেছি, কেন, তোমার দীক্ষা নিয়ে কাজটা কি? এখন তো হিন্দু কোডবিল পাস হয়েছে, এখন তো সম্পত্তি নিয়ে গোল বাধবে না।

ও বলেছিল—না, অর্চনা ভাই, তাঁর শ্রাদ্ধে চরু আমি রাঁধব না, অন্যে রাঁধবে, তা সইতে আমি পারব না। বেঁচে থাকতে এই সম্পত্তির জন্যে আর ধর্মের জন্যে আমি তাঁকে পেয়ে হারালাম। তিনি আমাকে পাবার জন্যে তপস্যা করে পেলেন, পেয়েও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তিনি মারা গেছেন। আজ যদি আমি এইটুকু না করি, তবে মানুষেরা বলবে, এ তার কেউ নয়, কেউ ছিল না। হয়তো মানবও বলবে। হয়ত অর্চনা আমার মনও বলবে। বলবে—সে আমার কেউ ছিল না।

আমিও তার কেউ ছিলাম না। ধর্ম আর সম্পদ এ দুটো আমাদের জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিলে। আজ আর আমি আমার কিছু রাখব না। তাঁর ধর্ম, তাঁর কর্ম, তাঁর সম্পদই আজ আমার সব হোক। দীক্ষা নিতে হবে, অন্ততঃ যেন চরু রাঁধতে কেউ বাধা না দেয়। শেষ-

কালটায় সুরোদা কুইনী কুইনী করে পাগল হয়েছিলেন। সরে গেলেই ডাকতেন, সাবিত্রী! সাবিত্রী! আর বলতেন, "আমাকে ভুলে যাবে না তো ?"

কুইনী বলত—আঃ, কি বলছ!

—ভুলে গেলে যদি আত্মা থাকে তবে বড় কষ্ট পাবে, আমার আত্মা! জান এখন আত্মা আছে ভাবতে ভাল লাগছে।

কেঁদে ফেলত কুইনী। ঝরঝর করে কাঁদত। শেষকালটাতেও সেই কথা।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে অর্চনা। সম্ভবতঃ সুরেশ্বরের মৃত্যুকালটা মনে পড়ে গেল।

সুলতা বললে—শেষকালটায় আর কি হয়েছিল ?

—কি আর হবে! যা হয়েছিল—হাইপ্রেসার। ঘুম হত না। মধ্যে মধ্যে কাশত। ঠেস দিয়ে বসা, আধশোয়া হয়ে থাকত। হাতখানা থাকত কুইনীর কাঁধে। কুইনী বুকে হাত বুলোত। একটু সামলে নিয়েই বলত—"আমাকে যেন ভুলো না।" আর আক্ষেপ, রায়-বাড়ীর দেনাশোধ হল না। রায়বাড়ীর অনেক দেনা। ভেবেছিলাম কম্পেনসেশনের টাকা দিয়ে প্রতি গ্রামে একটা করে কিছু করে দেব। তা হল না। এই আপসোস।

কথা বলতে বলতেই তারা পথ চলছিল। বিবি মহল থেকে অন্দরমহলে ঢুকে মহলের পর মহল পার হয়ে চলছিল ঠাকুরবাড়ীর দিকে।

অর্চনা বললে—কখনও বলত, দেখ সাবিত্রী, আমি বোধ হয় মিথ্যে ঋণ-ঋণ করছি। কিসের ঋণ বলত ? রায়েরা তো কীর্তিহাটের জন্য কম করে নি! অনেক করেছে। অনেক। ইস্কুল, ডাক্তারখানা।

একেবারে তিন-চার দিন আগে সিদ্ধান্ত করেছিল, জমিদারী কম্পেনসেশনের টাকা ওই দক্ষিণী ব্রাহ্মণের ভূদান যজ্ঞে দিয়ে দিও সাবিত্রী। "সব ভূমি গোপাল কি হ্যায়!" যে বলে তার যজ্ঞে দিও। তাতেই ঋণশোধ হবে আমাদের।

সোসালিজম কম্যুনিজম বুঝি না কুইনী। 'সব ভূমি গোপাল কি' বললে বুঝতে পারি। মন প্রসন্ন হয়। ওখানে দিও।

বিস্মিত হয়ে সুলতা প্রশ্ন করলে—বিনোবাজীর ভূদান দেবার কথাই বুঝি শেষ সিদ্ধান্ত!

—হ্যাঁ। সুরোদা তাই বলে গেছে। তার থেকে ভাল পথ বা দেবার মত আধার সে আর পায় নি। কুইনী এর মধ্যে গিয়ে দেখা করে এসেছে বিনোবাজীর সঙ্গে—বলতে বলতে তারা এসে ঢুকল রাধাসুন্দরের চত্বরে।

সেখানেই হয়েছে শ্রাদ্ধের আয়োজন। সামনে বেদীর উপর বসানো সিংহাসনে রাজরাজেশ্বর ঠাকুর, তার নীচে সুরেশ্বরের নিজে হাতে আঁকা পোর্ট্রেট। চারটি ষোড়শ। তাছাড়া আরও একটি রূপোর ষোড়শ। ঝকমক করছে, পালিশ করা চাঁদির ঘড়া থালা বাটী গেলাস পিলসুজ প্রভৃতি। একখানা নতুন দামী খাট, দামী বিছানা, তাতে নেটের মশারি টাঙানো। এ ছাড়াও চারখানি খাট, তাও খাটিয়া নয়; তাও বার্নিশ-করা ঝকমকে খাট।

ভাঙা বাড়ীর সমস্ত বিষণ্ণতা এবং সঙ্কোচ যেন ধুয়ে-মুছে গেছে এখানে, এই শ্রাদ্ধের সমারোহে এবং মূল্যবান জিনিসগুলির সমাবেশে। চত্বরের অন্যদিকে শতরঞ্চির উপর ধবধবে

চাদর বিছিয়ে আসর পাতা হয়েছে। সেখানে একদিকে শাস্ত্রজ্ঞেরা বসেছেন, অন্যদিকে বসেছে গ্রামের ভদ্রজনেরা। তার সঙ্গে কয়েকজন নিমন্ত্রিত অতিথি। শাস্ত্রের আলোচনা হচ্ছে।

ওপাশে ভোগবাড়ী। সেখানে রান্নাবান্না হচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে। ব্যঞ্জন-রান্নার গন্ধ আসছে। ঘি পোড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আজ নিয়মমত লুচিসহযোগে ফলাহার।

একদিকে বসেছে রায়বাড়ীর মেয়েরা। রূপ দেখলেই বোঝা যায়।

মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন পুরোহিত, সামনে মুণ্ডিতমস্তক মানবেশ্বর বসে আছে, তার পিঠ ধরে বসে আছে কুইনী। চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থার মত বসে আছে। তারও ঠোঁট নড়ছে। বোধ হয় মনে মনে সেও মন্ত্রপাঠ করে যাচ্ছে, পুরোহিত বলছেন—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবা—

সব কিছু মিলে ভারী ভাল লাগল সুলতার। ধীরে ধীরে যেন অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল সে।

তার মনে হল যেন জমিদারদের শেষ এ্যারিস্টোক্রাট মানুষটি জীবনরঙ্গমঞ্চে তাঁর ভূমিকা শেষ করে প্রস্থান করছেন। প্রস্থান করছেন এই সমারোহের মধ্যে দিয়ে। যাবার সময় তাঁর সঞ্চয় সম্বল সব উজাড় করে দিয়েথুয়ে শূন্যহাতে হাসিমুখে চলে যাচ্ছেন। বংশের দেনা যদি বাকী থেকে থাকে তো থেকে গেছে, থাক। তার জন্য পরলোক থাকলে নরকে খেটে শোধ দেব। না থাকে হল না শোধ। হল না, হল না। আর পাওনাই যদি থাকে তো থাক, তাও তিনি চান না। ও সবই দান করে গেলেন। চলে যাচ্ছেন কোন উর্ধ্বলোকে। কাঁধের চাদর উড়ছে বাতাসে। কোঁচানো ধুতির কোঁচার ভাঁজ খুলে খুলে উড়ছে। সুরেশ্বর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

নীচে ধ্যানস্থার মত বসে আছে কুইনী।

সুলতার বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে কুইনীর উপর। চোখে জল এল তার। সে চোখ বন্ধ করলে। আঁচল দিয়ে মুছলে।

অন্ধকার হয়ে গেল সব।

যবনিকা নামছে বোধ হয়।

নতুন কালের যবনিকা উঠুক। মানুষের কালের।

সপ্তপদী

ভূমিকা

তেরশো ছাপ্পান্ন সালে পূজার আনন্দবাজারে সপ্তপদী প্রকাশিত হয়েছিল। আমার সাহিত্য-কর্মের রীতি অনুযায়ী ফেলে রেখেছিলাম নূতন ক'রে আবার লিখে বা আবশ্যকীয় মার্জনা ক'রে সংশোধন ক'রে বই হিসেবে বের করব। বিগত ১৫।১৬ বৎসর ধ'রে 'কবি'র সময় থেকে এই রীতি আমার নিয়ম ও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার জীবনে ও শিক্ষায় এ শক্তি নেই আমি জানি যে, একবার লিখেই কোনো রচনাকে—নিখুঁত দূরের কথা, আমার সাধ্যমত নিখুঁত করতে পারি। কিন্তু সপ্তপদীর সময়ে ঘটনার জটিলতায় তা সম্ভবপর হয়নি। যেমনটি ছিল তেমনটিই ছেপে বইয়ের আকারে বের হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সংশোধন ও মার্জনা করব, কিন্তু তা-ও সম্ভবপর হয়নি বইখানির চাহিদার জন্য। ছ-বৎসরে আটটি সংস্করণ হয়েছে। প্রকাশকেরা বিলম্ব করতে চাননি, আমাকেও সুযোগ দেননি। এবার জোর ক'রে সুযোগ নিয়ে মোটামুটি সংশোধন ও মার্জনা করলাম। তাও সম্পূর্ণ হ'ল না। সংসারে অসহিষ্ণু উদ্‌গ্রীব মানুষের তাগিদে ভারতের জগন্নাথকেও অসম্পূর্ণ থাকতে হয়েছে। হয়তো জগন্নাথকে রূপ দেবার ক্ষমতার দৈন্য মানুষ ওই কাহিনী দিয়ে ঢেকেছে। আমার এ উক্তির মধ্যেও আমার অজ্ঞাতমনের সেই ভানই হয়তো প্রকাশ পেল। সে দৈন্য সবার কাছে স্বীকার করে তাঁদের কাছে হাত জোড় করাই ভালো।

পরিশেষে সপ্তপদী রচনার ইতিহাস বা এই কাহিনীর আসল সত্য নিয়ে একটি নিবন্ধ যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেটিও পরিশিষ্টে যোগ করে দিলাম। মূল নিবন্ধে কৃষ্ণেন্দুর কথাই আছে। রিনার চরিত্র-ও ঠিক কাল্পনিক নয়। সামান্য দেখা কয়েকবার কয়েকটা ঝলক মাত্র। সেটুকু সপ্তপদীর কথা বলবার সময় বলা উচিত বিবেচনায় যোগ করে দিলাম।

ছ-ফুট লম্বা একটি মানুষ। হয়তো ইঞ্চি দুয়েক বেশীই হবে। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে মনে হয় দেহ যেন কিছু শীর্ণ, কিন্তু দুর্বল বা রোগজীর্ণ নয়। কালো রঙ, বাঙলাদেশের কালো রঙ; মাজা কালো। প্রশস্ত ললাট, লম্বাটে মুখখানির মধ্যে বড়ো বড়ো দুটি বিষণ্ণদৃষ্টি চোখ। বিষণ্ণতা ছাড়াও কিছু আছে, যা দেখে মনে হয়, লোকটির মন বাইরে থাকলে অনেক দূরে আছে, ভিতরে থাকলে অন্তরের গভীরতম গভীরে মগ্ন।

পাগলা পাদরী। এই নামেই ব্যক্তিটি পরিচিত এ-অঞ্চলে। অঞ্চলের লোকের দোষ নেই, এর চেয়ে ভালোভাবে লোকটির স্বরূপ ব্যক্ত করা বোধ হয় যায় না। পরনে পাদরীর পোষাক, কিন্তু সে-পোষাক গেরুয়ায় ছোপানো, যা ভারতবর্ষের বৈরাগ্য-ধর্মের চিরন্তন প্রতীক। এ-অঞ্চলের কোনো গির্জার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট নন। কোনো ধর্মও প্রচার করেন না। শুধু চিকিৎসা করে বেড়ান। পাগলা পাদরী খুব ভালো ডাক্তার। বাইসিক্লে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে রোগী খুঁজে বেড়ান। পথের দু-পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, 'কী মহাশয়গণ, কেমন আছ গো সব? ভালো তো?' সঙ্গে সঙ্গে মুখভরা মিষ্টি হাসি উপচে পড়ে।

'হ্যা বাবা, ভালো আছি।'

'আচ্ছা! আচ্ছা! খুব ভালো। ভালো থাকো; মানুষ ভালো থাকলেই ভগবান ভালো থাকেন গো। জয় ভগবান!' বলেই এগুতে থাকেন। লম্বা মানুষের পা-দুখানাই বেশী লম্বা; কথা বলবার সময় বাইসিক্ল থেকে নামেন না—পা-দুখানা প্যাডেল থেকে নামিয়ে দেন মাটির উপর; চলবার সময় মাটি তুলে প্যাডেলে রেখে একটু ঝোঁক দিয়ে চাপ দেন—চলতে থাকে বাইসিক্ল। যে-কোনো লোকের বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে সে পাগলা পাদরীর প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়েই থাকে। কতক্ষণে কখন শোনা যাবে বাইসিক্লের ঘণ্টা, কখন দেখা যাবে সাইক্লের উপর গেরুয়া পোশাক-পরা পাদরীকে। দেখলেই হাত তুলে আগে থেকেই বলে, 'বাবাসাহেব!'

ছ-ফুট লম্বা মানুষটি বাইসিক্ল থেকে মাটির উপর পা নামিয়ে দেন। নামতে হয় না। 'কী খবর? কার কী হল?'

'জ্বর।'

'কার?'

'আমার ছেলের।'

'চলো; দেখি কি হইছে। জ্বরটা কেমন, বাঁকা না সোজা? কি মনে লাগছে বল দেখি?'

রোগী দেখেন, দেখেশুনে বাইসিক্লের পিছনে বাঁধা ওষুধের বাক্স থেকে ওষুধ দেন। কিংবা বলেন, 'আমার ওখানে গিয়ে ওষুধটো নিয়ে এসো।' না হয় বলেন—'ইটা বাবু দোকান থেকে আনতে হবেক। আমার ভাঁড়ারে নাই।' লিখে দেন কাগজে।

বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে যে-রাস্তাটা—পুরীর পথ বলে খ্যাত—বিষ্ণুপুরের কোল ঘেঁষে

মেদিনীপুর হয়ে চলে গেছে সমুদ্রতট পর্যন্ত, যার সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে কয়েকটা রাস্তাই মিশেছে, তারই ধারে তাঁর মিশন ; না, মিশন নয়—আশ্রম।

শালবন আর গেরুয়া মাটির দেশ। মধ্যে মধ্যে পাহাড়িয়া নদী। বীরাবতী-শিলাবতী-দারুকেশ্বর, বীরাই-শিলাই-দারকা। মধ্যে মধ্যে লালচে পাথর, নুড়ি ছড়ানো অনুর্বর প্রান্তর খানিকটা। এই ধরনের ভূ-প্রকৃতি একটা ঢাল নামার মতো নেমে ছড়িয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আবার এরই দু-ধারে বাঙলার কোমল ভূমির প্রসার। সেখানে জনসমৃদ্ধ গ্রাম, শস্যক্ষেত্র।

উত্তর ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও আরণ্য-ভূমের শেষ উড়িষ্যা ও বিহারের প্রান্তভাগ থেকে বিচিত্র আঁকাবাঁকা ফালির মতো ছড়িয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ক্রমশ। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহলগুলি ইতিহাস-বিখ্যাত। পাথুরে কাঁকুরে এই আঁকাবাঁকা শালজঙ্গল-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যে গ্রামগুলি, সেগুলিতে প্রাচীন আমলের সেই মানুষদের বংশধরেরা বাস করে। বাউড়ি, বাগ্দী, মেটে, মাল, খয়রা, সাঁওতাল। এদেরই মধ্যে সামন্তযুগে প্রধান হয়ে বসেছিল উত্তর ভারতের ছত্রীরা। সিংহ, রায় প্রভৃতিরা। কয়েকখানা গ্রামের পরে পরে এমনই এক-একটি পরিবার আজ এক-একটি বিবদমান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। লেগেই আছে মামলা-মকদ্দমা, দেওয়ানী ফৌজদারী। ঘোর কালো রঙের পীতচক্ষু অভাবশীর্ণ অর্ধনগ্ন মূক মানুষগুলির মধ্যে উজ্জ্বলবর্ণ দীর্ঘাকৃতি উগ্র প্রকৃতির মানুষগুলি বিচিত্রভাবে মিশে রয়েছে। এক-একটি ছত্রীবাড়ির নাম আজও রাজবাড়ি। এ-রাজবাড়ির ভাঙা দেওয়াল, মাটির উঠান, জীর্ণ খড়ের চাল ; রাজার পরনে ময়লা জীর্ণ কাপড়, খোলা গা, বসে বিড়ি খান, অথবা হুঁকো টানেন ; পরস্পরের সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে কটু ভাষায় কলহ করেন। রানী-রাজকন্যা নিজেদের হাতেই রান্নাবান্না করেন, নিজেরাই কাঁখে বয়ে জল আনেন, ধান মেলে দেন পায়ে-পায়ে। উঠান নিকানো, বাসন মাজা, এ-সব এখনও ওই কালো রঙের মানুষদের বাড়ির মেয়েরা করে। পুরুষেরা জমি চষে, গোরু চরায়, জঙ্গল থেকে কাঠ কাটে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এক-আধ ঘর দলপতি বা নায়েক-বাগ্দীর বাস আজও আছে। দলপতি নায়েক এদের উপাধি। এরা একদিন ছত্রী সামন্তদের অধীনে ছিল যোদ্ধা সর্দার। সামন্তদের দেওয়া নিষ্কর জঙ্গল-মহলে জঙ্গলে-ঘেরা গ্রামের মধ্যে আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং অনুচরদের নিয়ে মদে মাংসে, মোটা লাল চালের ভাতে, দুর্দান্ত সাহসে, শিকারে, আর সন্ধ্যায় মাদলের সঙ্গে নাচে গানে জীবনযাপন করত। পাঠান-মোগলের যুদ্ধের কাল থেকে এদের কথা আর প্রবাদ বা কাহিনী নয়, ইতিহাস। মোগলদের শেষ আমলে, মারাঠা অভিযানের সময় এরা রীতিমতো লড়াই করেছে। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে গাছের উপর চড়ে তীর ছুঁড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে পিছন থেকে এসে ছোঁ মেরেছে। তাড়া খেয়ে বাস-বসতি ফেলে নিবিড় জঙ্গলে লুকিয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গেও যুদ্ধ হয়েছে। সামন্ত রাজারা আনুগত্য স্বীকার করার পরও এরা, এই সর্দারেরা, লড়াই করেছে।

বাগ্দী-সর্দার গোবর্ধন দলপতি যে লড়াই করেছিল কোম্পানীর দপ্তরে তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা আছে। গোবর্ধন দলপতি নিজের অধিকারের সীমানা রক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকে নি,

কোম্পানীর সীমানা কেড়ে নিয়ে দখল করেছিল। তার বাইরে এসেও দিনে-দুপুরে গ্রামের পর গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে, গ্রামের রাস্তায় মানুষের মাথা কেটে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এদেরই এক-আধ ঘরের দেখা আজও মেলে।

সমতলভূমে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-নবশাক-প্রধান গ্রামগুলি এদের থেকে একটু দূরে। ওসব গ্রামেও বাগ্দী, বাউড়ী, মেটে, মাল আছে, তাদের চেহারা যেন কিছু আলাদা। রক্তের উত্তাপ এবং ঘনত্বেও বোধ হয় তফাত আছে।

শালবনে ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য এদের আজও হাতছানি দিয়ে ডাকে। শালের সঙ্গে আছে পলাশ আর মহুয়া। পলাশফুলের গুঁড়ো দিয়ে আজও কাপড় রঙ করে এরা; মহুয়া থেকে মদ চোলাই করে। মধ্যে মধ্যে আবগারী পুলিশ হানা দেয়—কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ধরতে পারে না; বিস্তীর্ণ শালবনের মধ্যে কোথায় যে ঘাঁটি, সে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। ধরা কচিৎ পড়ে। ধরা পড়ে জেল খাটে, কিন্তু সে ওদের কাছে বিশেষ কিছু না। মধ্যে মধ্যে শিকারে বের হয়। অবশ্য সাঁওতালেরা এ-ক্ষেত্রে বেশী। কিন্তু এরাও বের হয়ে পড়ে। ময়ূর, বনমোরগ, তিতির, খরগোশ, হরিণ, বরা, ভাল্লুক মেরে পায় বিপুল উল্লাস। বিশেষ করে বরা-ভাল্লুকের উৎপাত হলে মেতে ওঠে এরা। কখনও কখনও বাঘও আসে। তার সঙ্গে লড়াই দেবার মতো সাহসের সে দুর্দান্তপনা আজ আর বোধ হয় নেই। বাঘ এলে স্থানীয় বন্দুকওয়ালা শিকারীদের খবর দেয়। থানা মারফত বিষ্ণুপুর শহরে কর্তৃপক্ষের কাছেও খবর পাঠায়। প্রায় দুশো বৎসর ধরে নিরন্তর শাসনে এবং সুকৌশল শোষণে এদের জীবনে সব গর্বই প্রায় চলে গেছে, এবং সাহস-উল্লাসও কিছুটা খর্ব হয়েছে। কারণ বরা ভালুক মারবার সাহস থাকলেও বাঘ এলে তার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য আজ টাঙি-বল্লম-ধনুক-কাঁড় নিয়ে উন্মত্ত আনন্দে আর বেরিয়ে যেতে চায় না। শুধু রোগের হাতে আত্মসমর্পণে এদের ভয় নেই। রোগ হলে কপালে হাত দেয়। যা করে কপাল। ডাকে শুধু—হে ভগবান,

এদের মধ্যেই থাকেন এই পাগলা পাদরী। আজ কয়েক বছর আগে হঠাৎ এখানে আসেন, এসে থেকে গেছেন। এসেছিলেন যেবার, সেবার এখানে অনাবৃষ্টিতে জল ছিল না। শস্য ছিল না—দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার উপর হয়েছিল মহামারীর প্রাদুর্ভাব। এখানকার মিশনারী সাহেবেরা কাগজে দয়ালু পরহিতব্রতী চিকিৎসকের সাহায্য চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—তারই উত্তরে তিনি একদিন একটা ব্যাগ আর বিছানা দুই হাতে নিজেই বয়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। এবং থেকেই গেছেন সেই অবধি। লোকে বিশ্বাস করে—ভগবান পাঠিয়েছেন।

শালবনের ধারে লালমাটির উপর একখানি ছোট গ্রাম। পাশ দিয়েই চলে গেছে পুরীর পাকা সড়ক। মাইলখানেক উত্তর-পশ্চিমে মোরার গ্রামে ওয়েস্লিয়েন চার্চের দোতলা বাড়িটা। নিতান্তই ছোট নগণ্য একখানি গ্রাম। শালবন এখানটায় বিশীর্ণ এবং বিক্ষিপ্ত। গ্রামখানারও বাইরে—শালবন যেখান থেকে জমাট বেঁধেছে, সেইখানে—ছোট একখানি বাংলো বাড়ি; খানতিনেক ঘর। এইটেই তাঁর আস্তানা। সঙ্গীর মধ্যে কয়েকটা পাখি, দুটি গোরু এবং একটি দম্পতি। যোসেফ আর সিন্ধু। যোসেফরা অনেককাল আগে ক্রিশ্চান

হয়েছে। যোসেফলাল সিং। সিন্ধু মাঝিদের মেয়ে। সে ক্রিশ্চান নয়। বিবাহও ওদের হয় নি। দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন সমাজ থেকে চলে এসেছে। আশ্রয় নিয়েছে পাগলা পাদরীর কাছে। যোসেফ খানিকটা ইংরেজী জানে; পাগলা পাদরী তাকে কম্পাউণ্ডারী শিখিয়েছেন, সে কম্পাউণ্ডারী করে আর ছেলেদের পাঠশালায় পণ্ডিতি করে। সিন্ধু পাখিগুলির পরিচর্যা করে এবং বাঙলোরও গৃহিণী সে, রান্নাবান্না ভাঁড়ার তারই হাতে। আরও একটি সাঁওতাল মেয়ে আছে, নাম ঝুমকি মেঝ্যান। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের আশ্চর্য স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। এমন সরল দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

পাগলা পাদরী ওকে অনেক কষ্টে রক্ষা করেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে। ঝুমকির বিয়ে হয়েছিল তিনবার। তিন স্বামীই অল্প দিনের মধ্যে মারা যায়। তারপর সকলের সন্দেহ হয়, ঝুমকি ডাইন। সাঁওতালদের সমাজপতিরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ওকে। পাগলা পাদরী খবর পেয়ে বাইসিক্ল চড়ে ঝড়ের বেগে সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে ওকে উদ্ধার করে এনেছেন। ওই গ্রামের সাঁওতাল কর্তাকে তিনি চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। আরও অনেকেরই চিকিৎসা করেছেন। পাগলা পাদরীর কথা তারা ঠেলতে পারে নি। পাগলা পাদরী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর কখনও ঝুমকি কোনো সাঁওতাল গ্রামে যাবে না। সে তাঁর বাড়িতে থাকবে, গোরুর সেবা করবে, গাছপালা লাগাবে।

'উকে কেরেস্তান করাবি না তো বাবাসাহেব?'

'না।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'আমি কি কেরেস্তান মাঝি?'

বৃদ্ধ সাঁওতাল সর্দার বলেছিল, 'কে জানে? ই বুলে তু কিরিস্তান বটিস; আবার কিরিস্তানরা বুলে—কিরিস্তান লয়; তুর জাতই নাইক। তু জানিস তু কী বটিস।'

পাগলা পাদরী হা-হা করে হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'উরা বলে মাঝি, জাত আমার নাই। তবে মানুষ তো বটি। তুইও মানুষ আমিও মানুষ। ওই মেয়েটাও মানুষ।'

'তু মানুষ বটে। উ লয়। উ ডাইন বটে'।

'আমি তো চিকিৎসা করে তোর এত বড়ো ভূতে-পাওয়া ব্যামোটা সারালাম,—তু বল! উকেও আমি ডাইনি থেকে সারাব রে।'

'লারবি। তবে তু বলছিস লিয়ে যাবি, লিয়ে যা।'

সেই অবধি ঝুমকিও থাকে এখানে। গোরুর সেবা করে, বাঙলোতে গাছপালা লাগায়। রাস্তায় ঘাটে বাঙলোর সীমানার বাইরে কদাচিৎ বের হয়। সাঁওতাল পুরুষ-মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে ছুটে গিয়ে লুকোয়, যেখানে হোক। তারা যদি আবার বলে, সে তাদের খেয়েছে।

পাগলা পাদরীর ঘরেই হয়তো ঢুকে পড়ে। পাগল মানুষটি চোখ বন্ধ করে ঝোলা ডেক-চেয়ারে বসে থাকে কি ভাবে, সন্তর্পিত পদক্ষেপের শব্দ কানে আসতেই প্রশ্ন করে, 'কে?'

ফিসফিস করে শঙ্কিত ভঙ্গিতে সে অন্ধকার কোণ থেকে বা আলমারির পাশ থেকে উত্তর দেয়, 'মেন এয়াং—বাবাসাহেব। ঝুমকি।'

বাবাসাহেব মুখ তুলে তার দিকে তাকান, কৃষ্ণাঙ্গী অরণ্যনারীর সাদা জলজলে চোখের

দিকে তাকিয়ে, স্বচ্ছ জলতলে নাড়াখাওয়া শ্যাওলার দলের মতো ওই দৃষ্টির মধ্যে ওর ভয়ে-কাঁপা অন্তরকে দেখতে পান। প্রশ্ন করেন, 'ভয় পেয়েছিস? বাইরে মাঝিরা এসেছে বুঝি?'

সে তার দীর্ঘ সরল হাতখানি অন্য এক দিকে বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'অঁ-হঁ, আন-পরম্।' অর্থাৎ না-না, এই দিকে, এই দিকে।

বাইরে আসে নি, ওই দিকে তারা যাচ্ছে।

বাবাসাহেব অভয় দিয়ে বাইরে আসেন। যারা যায় তাদের সঙ্গে ডেকে আলাপ করেন তাদেরই ভাষায়। অনর্গল বলে যান।

সাধারণত এই জেলার চলিত বাঙলাতেই কথা বলেন। কেউ বুঝতে পারে না যে তিনি এখানকার লোক নন। তারা কেউ-কেউ প্রশ্ন করে, 'হঁ্যা বাবাসাহেব, আমাদের কথাবার্তা বাকবাচালি এমন করে কী করে শিখলেন গো আপুনি?'

সাহেব প্রসন্ন প্রাণখোলা হাসিতে উতলা বাতাসে শালগাছের মতো দুলে ওঠেন; বলেন, 'তুমাদিগকে যি ভালোবাসলম হে! সেই মন্তরে শিখে লিলম। হুঁ!'

তারপর আবার বলেন, 'তুমি বল ক্যানে, যাকে তুমি ভালোবাস, তার মুখটি দেখে তুমি তার পরাণের সুখ-দুখটি বুঝতে পার কি না? পার তো! ভালোবাসলে পরাণের কথাটি মুখ দেখে বোঝা যায়, আর মুখের কথা কানে শুনে শিখা যাবেক ইটা আর বেশী কথা কী হে? অঁ্যা? না—কি? তুমিই বল না হে মহাশয়!'

একেবারে সুর স্বর উচ্চারণ সব যেন একতারে বাঁধা।

প্রশ্নকর্তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তার সারা অন্তর উপলব্ধিতে আপ্লুত হয়ে যায়, আপন মনেই সে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, ঠিক কথা! ঠিক কথা! হুঁ! হুঁ!

তবে তাঁর ইংরেজী শুনে ভদ্রসমাজের অনেকে সন্দেহ করেন, হয়তো লোকটির কয়েক পুরুষ ধরেই ইংরেজী ভাষা বলে আসছে—হয়তো কয়েক পুরুষ ধরেই কৃশ্চান। হয়তো বা মাদ্রাজী, কারণ নাম রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী।

চেহারাতেও দক্ষিণের মানুষের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ছ-ফুট লম্বা, মোটা মোটা হাড়, মেদবর্জিত দেহ, কালো মাজা রঙ, ঘন কালো মোটা ধরনের চুল। দক্ষিণের লোকদের মতোই বড়ো বড়ো চোখ।

দৃষ্টি কিন্তু বড় বিচিত্র, বলতে হয় আশ্চর্য, অপার্থিব। বিষণ্ণ অথচ প্রসন্ন। বর্ষণক্লান্ত স্বল্পমেঘাবৃত শান্ত স্নিগ্ধ আকাশের মতো। ভিতরের নীলাভা মেঘের পাতলা আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার মতোই লাগে ম মুখটির হাসি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফের আবরণের মধ্য থেকে যখন সুগঠিত দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে হাসির প্রসন্নতায়, তখন আশপাশের মানুষগুলির মনের ভিতরটাতেও যেন সেই প্রসন্নতার ছটা গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

দুই

পাগলা পাদরী এখানে এসেছে আজ বছর আষ্টেক। ১৯৩৬ সালে। সেবার এখানে দুর্ভিক্ষ মহামারী হয়েছিল। এটা উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল। পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চরম পর্যায়ে উঠেছে।

মহাযুদ্ধের দুর্যোগ একটা সাইক্লোনের মতো পৃথিবীর সঙ্গে ভাগ্যাহত বাংলা দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দেশ সমাজ ঘর ভেঙেচুরে পড়ে গেল। দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মানুষ মরছে—ঝড়ে ঝটকা-খাওয়া পশুপক্ষীর মতো। হাহাকার উঠেছে চারিদিকে। হাহাকার! হাহাকার আর হাহাকার! দেশ-জোড়া স্বাধীনতা-আন্দোলনও সাময়িকভাবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ইংরেজ ও আমেরিকার যুদ্ধোদ্যম বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম-ফেনী-গৌহাটি-ডিগবয়-ডিমাপুর-কোহিমার পরে উখরা-পানাগড়-সিয়ারাডোবা-বাসুদেবপুর-খড়্গপুর-মেদিনীপুর নিয়ে যুদ্ধের ঘাঁটির সে এক বিচিত্র বেষ্টনী। পিচঢালা সুগঠিত পথের একটার সঙ্গে অন্যটার যোগাযোগে একটা বিস্তীর্ণ বিরাট ভূখণ্ডব্যাপী মাকড়শার জাল।

গ্রামে গ্রামে অন্নাভাবে হাহাকার, শহরে শহরে ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার ভিক্ষুকদের সকরুণ কাতর প্রার্থনা, 'একটু ফ্যান! একমুঠো এঁটোকাঁটা! মাগো মা!'

দোকানে চালের বদলে খুদ। তার সঙ্গে বালি ধুলো কাঁকর।

এরই মধ্যে চলে মিলিটারি কনভয়। জীপ-ট্যাঙ্ক-ওয়েপনকেরিয়ার, আরও হরেক রকমের বিচিত্রগঠন অটোমোবিল। মাথার উপরে ওড়ে ইংরেজ আর আমেরিকানদের যুদ্ধের প্লেন। গাড়িগুলোতে বোঝাই হয়ে চলে ইংরেজ এবং আমেরিকার পল্টন। তার সঙ্গে নিগ্রো কাফ্রী। যাবার সময় পথের ধারে মাঠে নেমে পড়ে এ-দেশের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ক্ষুধার্তদের উপর কমলালেবুর খোসা, চিবানো কোয়া ছুঁড়ে দিয়ে যায়। চিৎকার করে ডেকেও যায়, হে—। হাতছানি দিয়েও ডাকে।

হি হি করে হাসে।

কেউ কেউ আবার টাকা আধুলি ছুঁড়ে দেয়। ওরা দল বেঁধে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুলোর উপর। শুকনো মাটির ধুলো ওড়ে। ওদের সর্বাঙ্গে লাগে। ওদিকে বিদেশী সৈনিকদের ক্যামেরা ক্লিক-ক্লিক শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। তাদের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি। ঘৃণা অনুকম্পা কৌতুক সব কিছু আছে সে-হাসির মধ্যে।

মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, দল বেঁধে শ্বেতাঙ্গ সেপাইরা জীপে চড়ে চলেছে। সমস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে, অথবা প্রমত্ত কলরব তুলেছে। এবং তাদের ঠিক মাঝখানে শহর থেকে সংগ্রহ-করা একটা কি দুটো নিম্নশ্রেণীর দেহ-ব্যবসায়িনী, তাদের সকল আনন্দের উৎস, কড়া বিলাতী মদের নেশায় স্খলিতবসনা, অবশদেহ, টলছে বা ঢুলছে, ওদেরই অট্টহাসির সঙ্গে প্রমত্ত উল্লাসে হেসে সুর মেলাতে চাচ্ছে। পথে-ঘাটে যুবতী মেয়ের দেখা পেলেই ডাক—হ্যালো হনি! মাই হনি! হনি হতভাগিনীরা ভয়ে শুকিয়ে কাঁপতে কাঁপতেও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। দু-

চারজন, স্বৈরিণী যারা, তারা দাঁড়িয়ে নির্লজ্জার মত দাঁত মেলে হাসে।

পিয়ারাডোবায় একটা এরোপ্লেনের আড্ডা তৈরি হয়েছে। কয়েক মাইল দূরে বাসুদেবপুরে ছোট একটা। মোরারে ওয়েসলিয়ান চার্চের বাঙলোটার সামনে পুরীর রাস্তা আর স্থানীয় একটা রাস্তার মিশবার জায়গাটার পাশেই শালজঙ্গলের কোল ঘেঁষে প্রান্তরটা খুঁড়ে বড়ো বড়ো পেট্রল-ট্যাঙ্ক বসেছে। এখান থেকে পাইপ-লাইন চলে গেছে বাসুদেবপুরে, পিয়ারাডোবা পর্যন্ত। বুলডোজার চালিয়ে মাটি কেটে বন কেটে জঙ্গলে কয়েকদিনের মধ্যে গড়ে তুলেছে বিচিত্র সামরিক ঘাঁটি। ময়দানবের হাতের মায়াপুরীর মতো। পিয়ারাডোবা স্টেশন থেকে সাইডিং এসেছে। বড়ো বড়ো ট্রেন এসে থামে। ট্রেন থেকে নামে প্রমত্ত বিদেশী সৈনিকের দল। মার্কিন সৈন্যদের পকেটে নোটের তাড়া। সঙ্গে প্রচুর টিনবন্দী খাদ্য। বিস্কুট রুটি। সাইডিঙের পাশে, স্টেশনের রেললাইনের পাশে—টিনের ছড়াছড়ি নয়—টিনের গাদা।

হতভাগা দুর্ভিক্ষপীড়িত অর্ধনগ্ন মানুষেরা টিন কুড়িয়ে নিয়ে যায়, চেটে চেটে খায়। দিনরাত্রি আকাশ মুখরিত করে বম্বার ফাইটারগুলো মাথার উপর ঘুরছে। কোনোটা নামছে, কোনোটা উঠছে।

সন্ধ্যার পর ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে ওঠে। ঠুলি পরানো, কিন্তু তবু তার ছটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের আড্ডাঘরে বাজনা বাজে, নাচ হয়। হো-হো শব্দে উল্লাসধ্বনি ওঠে। ঝিল্লিমুখর শালবনের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার চমকে ওঠে। মাঝে মাঝে ঝিল্লিরাও বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে যায়। বোধ করি প্রায় দুশো বছর আগের সামন্ত রাজাদের আমলে পাইকদের মশালের আলো, মাদলের বাজনা, হা-রা-রা ধ্বনি-তাণ্ডবের পর বনভূমির অন্ধকার এইভাবে আর চমকায় নি, ঝিঁঝিরাও হঠাৎ থামে নি। বর্গীদের আমলের পর বনভূমির মধ্যে ছড়ানো গ্রামগুলি এমনভাবে আর সভয়ে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের আবরণে ঘুমিয়ে পড়ে নি। এসব গ্রামগুলি পাকা রাস্তা থেকে দূরে-দূরে, বনের ভিতরের দিকে। সেখানে তারা অন্ধকারের মধ্যেই শোনে, পাকা রাস্তার উপর ঘর্ঘর শব্দ তুলে মোটর চলছেই, চলছেই। কখনও কখনও পল্টনের হৈ হৈ শব্দ। তারই মধ্যে মেয়ের গলায় খিল্‌খিল হাসি শুনে তারা অন্ধকারের মধ্যেই চোখ বড় করে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে—এ মেয়েরা কারা? কোন দেশের? কোন জাতের?

*   *   *   *

পাগলা পাদরী সরে গিয়ে আস্তানা গেড়েছেন। পাকা রাস্তা থেকে আরও দূরে জঙ্গলের মধ্যে। তিনি যে গ্রামখানায় ছিলেন, সেই গ্রামখানাকেই সরে যেতে হয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে। অবশ্য টাকা তারা অনেক পেয়েছে।

ভোরেও কৃষ্ণস্বামী জঙ্গলের ভিতরের পায়ে-চলা পথ ধরে বাইসিক্লে চড়ে এসে ওঠেন পাকা রাস্তায়। মোরারের মোড় থেকে অনেকটা তফাতে, বিষ্ণুপুরের দিকে এগিয়ে এসে বুধবার শনিবার তিনি ওন্দায় যান। ওখানকার লেপার অ্যাসাইলামে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করেন। পুরী থেকে এই অঞ্চলটায় কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। কুষ্ঠ অন্ধত্ব এ-অঞ্চলের

অভিশাপের মতো : সপ্তাহে দু-দিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী ভোরবেলা উঠে যান, ফেরেন বিকেল-বেলা। সেদিন আষাঢ়ের প্রথম। কৃষ্ণস্বামী বিকেলবেলা ফিরছিলেন। তাঁর বিচিত্র পরিচ্ছদের উপর মাথায় একটা দেশী টোকা, চোখে একটা গগ্‌ল্‌স। বৃষ্টি তখনও নামে নি। আষাঢ়ের দিন—দীর্ঘতম এবং সব থেকে বেশী উত্তাপ; পৃথিবীর নিকটতম সূর্যের উত্তাপে পৃথিবী যেন ঝলসাচ্ছিল। চষা মাঠের উপর গরম বাতাসে ধুলো উড়ছিল।

বাবাসাহেব তাঁর অভ্যস্ত গতিতে বাইসিক্ল চালিয়ে চলেছেন। গোটা রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে একপাশ ধরেই চলেছেন তিনি। প্রচণ্ড জোরে আসে মিলিটারী ট্রাকগুলি, মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় অথবা হিসেবের ভুলে প্রচণ্ড জোরে গিয়ে ধাক্কা মারে পথের পাশের গাড়িতে। ভেঙে উল্‌টে যায় গাড়ি; চালক আরোহীর আর্তনাদ শোনা যায়। কখনও পথ ছেড়ে গিয়ে পড়ে মাঠের উপর। দু-চারখানা উল্‌টে যায়, আরোহীরা ছিটকে পড়ে। আঘাত কম হলে উঠে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে হো-হো করে হাসে। দু-চারখানার চালক আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে স্টীয়ারিং ধরে চষা মাঠের উপর দিয়ে কিছু দূর চালিয়ে গিয়ে গতিবেগ সম্বরণ করে ব্রেক কষে। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ভাষায় একটা অশ্লীলতম গালাগালি উচ্চারণ করে। অকারণে। আশ্চর্য, ঈশ্বরের নাম করে না!

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী ভাবতে ভাবতেই চলেছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের কালে, পাইক-বিদ্রোহের সময় কি এমনই হয়েছিল দেশের অবস্থা? মানুষ কি এমনি করেই দেউলে হয়ে গিয়েছিল? অন্তরের সঞ্চয় তার এত ক্ষীণ এবং ক্ষণজীবী?

হায় বুদ্ধ! হায় ক্রাইস্ট! হায় ঈশ্বরের পুত্র! হায় শচীনন্দন গৌরাঙ্গ!

এ-দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃস্থসর্বস্ব শিক্ষায়-বঞ্চিত এই মানুষগুলির তবু তো দোহাই আছে। হয়তো ভগবানের কাছে রেহাইও আছে। কিন্তু ওই বিদেশী সৈনিকগুলি! এদের চেয়েও ওরা হতভাগ্য। মৃত্যু-ভয়ে অধীর। অসহায়। অহরহ দুরন্ত ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ওরা আকণ্ঠ মদ্যপান করে জীবন নিয়ে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, গাছে ধাক্কা খেয়ে মরছে। গাড়ি উল্‌টে পড়ে চেপটে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে পথের মধ্যে যা পাচ্ছে ভোগ করবার, তা-ই ভোগ করে যাচ্ছে। কোথায় শিক্ষা, কোথায় সভ্যতা, কোথায় জীবন-গৌরব?

হায় ক্রাইস্ট!

ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তোমার মৃত্যুই সত্য। রেসারেকশন কল্পনা। মানুষের রচনা-করা মিথ্যা আশ্বাস!

হায় বুদ্ধ! হায় চৈতন্য!

চৈতন্যদেব এই পথে পুরী থেকে গয়া গিয়েছিলেন। খোলে-করতালে ঈশ্বরের নামে মুখরিত হয়েছিল এ-সব অঞ্চলের আকাশ-বাতাস।

বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব দেবতারাও মিথ্যা। পারলে না রক্ষা করতে মানুষকে। রাজা গোপালদেবের বেগার মিথ্যে। নাম করায় কোনো ফল হয়নি। আত্মরক্ষার শক্তি না থাক, ওদের মতো প্রচণ্ড বর্বর শক্তিকে ঠেকাবার মতো শক্তি মানুষের না থাক, আত্মাকে রক্ষা

করার শক্তিও তারা পেলে না। জপের মালার ঝুলিটা নেহাতই ছেঁড়া নেকড়ার ঝুলি।

সামনেই লেবেল ক্রসিং। বাইসিক্ল থেকে কৃষ্ণস্বামী নামিয়ে দিলেন তাঁর পা দুটো। ছ-ফুট লম্বা মানুষটির পক্ষে ওই যথেষ্ট। ক্রসিংয়ের পাশেই গেটম্যানের বাসা।

কৃষ্ণস্বামীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। বাস্তবে ফিরে এলেন। এ-ই জীবন। এ-জীবন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ নিজের কাজ করতে হবে।

'বংশী! বংশী হে—'

খুলে গেল গেটম্যানের ঘরের দরজা। বেরিয়ে এল গেটম্যান রামচরণ।

'বাবাসাহেব!'

'হুঁ। বংশী কই হে?'

বংশী রামচরণের ছেলে। বংশীর কুষ্ঠ হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থা। কৃষ্ণস্বামীই যাওয়া-আসা'র পথে ছেলেটির মুখের চেহারা দেখে ধরেছেন। এবং অনেক বুঝিয়ে চিকিৎসা করাতে রাজী করিয়েছেন। এ রোগের ইনজেকশনে বড়ো যন্ত্রণা হয়। বংশী অধিকাংশ দিন পালায়। কৃষ্ণস্বামী বংশীকে প্রলুব্ধ করবার জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে আসেন। কোনোদিন একটা পুতুল। কোনোদিন একটা ছবি। কোনোদিন কিছু খাবার। কোনোদিন অন্য কিছু। আজও বংশী পালিয়েছে। রামচরণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখেও ছেলের সন্ধান পেলে না। সে তারস্বরে ডেকে উঠল—'হ—বং—শী রে—! বং—শী—ঈ—!'

কৃষ্ণস্বামী বাইসিক্লটি গেটম্যানের ঘরের দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে, দাওয়ার উপর উঠে দাঁড়ালেন। রামচরণের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে একটা মোড়া পেতে দিলে কৃষ্ণস্বামী মোড়ায় বসে তাঁর আলখাল্লার মতো জামাটার পকেট থেকে বের করলেন একটি বাঁশি। বললেন, 'এইটো বাজিয়ে ডাকো হে! হুঁ। বাঁশির ডাক শুনলে কাছে-পিঠে থাকলে আখুনি বেরায়ে আসবেক।'

তার আগেই কিন্তু সামনে রাস্তার ধারের একটা আমগাছের উপর থেকে ঝপ করে বংশী লাফিয়ে পড়ল। 'আসছেক গ, আসছেক গ! সেই গ বাবা, সেই বটেক গ!'

কৌতূহলের তীব্রতায় তার ঈষৎস্ফীত মুখখানা যেন থমথম করছে। চোখ দুটো জলজল করছে।

'কে? কে আসছেক হে বংশীবদন?' হেসে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণস্বামী। 'আমি তুমার লেগ্যা কেমন বাঁশি এনেছি দেখো হে? বংশীবদন লেগ্যা বংশী।'

বংশীর মন কিন্তু বাঁশিতে ভুলল না। তার স্থির জলজলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সামনের রাস্তার দিকে। দূরে একটা বাঁক, সেই বাঁকের মাথায়। সে বোধ হয় বাবাকেই বললে, 'সেই মেয়াছেল্যাটা গ! সেই মাথায় টকটকে রাঙা ফেটা বাঁধা! গাছের শিরডগাল থেকে আমি দেখ্যাছি। ঝড়ের পারা গাড়িটা আসছেক, আর রাঙা ফেটা বাঁধা সি বসে রইছেক। রোদ লেগ্যা ঝকমকো করছেক। হুঁ। উই—উই—উই।'

দূরে বাঁকের মাথায় গর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সত্যই একখানা জীপ আসছে। সত্যই পিছনের পড়ন্ত রোদে কারও মাথার গাঢ় লাল টুপি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

রামচরণ বললে, 'দেখলাম অনেক বাবাসাহেব। কিন্তুক এমন মেয়েছেল্যা আমরা দেখি নাই বাবার কালে। মেমসাহেব গো!'

হাসলেন কৃষ্ণস্বামী। ধুতি-চাদর আর চটির দেশের শুধু ধুতিসম্বল দরিদ্র রামচরণ এবং বালক বংশীবদনের মন কোনো বিচিত্রবাসিনী বিদেশিনীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। জীপখানা সত্যই ঝড়ের বেগেই আসছে। মেয়েটা—হাঁ, এরা বলেছে ওটি মেয়ে—লাল-টুপি পরা মেয়েটি যেন দুলছে টলছে। এপাশ থেকে ওপাশ। জীপের সামনে চালকের পাশেই বসে টলছে। মনে হচ্ছে শ্বেতাঙ্গিনী। পাশে চালক একজন বলিষ্ঠদেহ শ্বেতাঙ্গ। গায়ে শুধু গেঞ্জি, মাথায় টুপিটা আছে, অফিসারের টুপি। স্পীড কমিয়ে বাঁক নিয়ে লেবেল-ক্রসিংটা পার হয়ে চলে গেল গাড়িটা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ব্রেক কষে দাঁড়াল। তার ঝাঁকিতে মেয়েটা টলে পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেল। সামনের ড্যাশ-বোর্ডে উপুড় হয়ে পড়ে কোনোক্রমে আঁকড়ে ধরলে একটা রড। আবার পিছু হটতে লাগল গাড়িটা। এসে দাঁড়াল রামচরণের বাড়ির সামনে। শ্বেতাঙ্গটি নামল।

তার ট্রাউজারের কাপড়ের চিক্কণতা দেখে কৃষ্ণস্বামী বুঝতে পারলেন, আমেরিকান অফিসার।

হে—ম্যান! ওয়াটার ওয়াটার! পানি!

জড়িত কণ্ঠে আদেশের সুরে মেয়েটিও বললে, 'পানি লাও! ই—উ! ইউ! শুনতা নেহি!'

কৃষ্ণস্বামী উঠে দাঁড়ালেন। চোখের গগ্‌লসটা খুলে দাওয়া থেকে নেমে এসে জীপের কাছে দাঁড়ালেন। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলেন। বিচিত্রবেশিনীই বটে। পরনে পাশ্চাত্তোর আধুনিকতম ফ্যাশনের লালরঙের লম্বা পেণ্টালুন বা শ্ল্যাক্‌স, গায়ে হাফ হাতা টেনিস-কলার মিহি সিল্কের ব্লাউস, মাথায় রাঙা টকটকে সিল্কের কাপড়ের লম্বা ফালির শিরোভূষণ। আশ্চর্যভাবে লালসা-উদ্রেক-করা মোহিনী বেশ। তেমনি যেন নির্লজ্জ!

আমেরিকানটি তাঁর সামনে এসে পেণ্টালুনের পকেট থেকে একখানা নোট বের করে সামনে ধরে বললে, 'ডোণ্ট য়ু আণ্ডারস্টাণ্ড, ম্যান? ওয়াটার, পানি—পানি—'

মেয়েটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ইউ সোয়াইন!'

আমেরিকানটি আবার ধমক দিয়ে উঠল, 'ইউ বিচ, স্টপ, আই সে—ইউ স্টপ! কীপ সাইলেণ্ট!'

কৃষ্ণস্বামী হেসে পরিষ্কার ইংরিজীতে বললেন, 'প্লীজ, প্লীজ ডোণ্ট অ্যাবিউজ হার লাইক ভাট, শী ইজ ইল।'

'নাথিং।' ইউ ডোণ্ট নো ম্যান, একটা পুরো বোতল মদ ওই কুত্তিটা ঢক-ঢক করে গিলেছে। মাতাল হয়েছে। জল দাও। ভেবেছিলাম রাস্তার ধারে পুকুর পেলে ওকে চুবিয়ে ওর নেশা ছুটিয়ে দেব। তোমাদের বাড়ি দেখে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবে। নেশা, কেবল নেশা।'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'অফিসার, আমি একজন ডাক্তার। আমি দেখতে পাচ্ছি, ও অসুস্থ।

আমি বলছি তুমি ওকে নামাও। ওর এক্ষুনি শুশ্রূষা'র দরকার। আমার কল-ব্যাগে ওষুধ আছে। এক দাগ ওষুধও দিতে চাই। বিশ্বাস করো আমাকে, আমি মেডিকাল কলেজের পাস-করা ডাক্তার।'

বলতে বলতে ওদিকে মেয়েটি ঢলে পড়ে গেল গদির উপর।

কৃষ্ণস্বামী গিয়ে তাঁর দীর্ঘ দুটি বাহু প্রসারিত করে তাকে তুলে নিলেন। বললেন, 'রামচরণ, তোমার খাটিয়াটা পেতে দাও।'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন, 'অফিসার, প্লীজ ওর মাথার বাঁধনটা, কাপড়ের ফালিটা, খুলে দাও।'

হাত বাড়িয়ে একটু ঝাঁকি দিয়েই মাথার কাপড়ের ফালিটা টেনে খুলে ফেলে দিলে অফিসারটি। আশ্চর্য ঘন কালো একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়ল!

কৃষ্ণস্বামী সযত্নে তাকে শুইয়ে দিলেন খাটিয়ার উপর।

অনেক শুশ্রূষার পর মেয়েটির চেতনা হল। একদাগ ওষুধও তাকে খাইয়েছিলেন কৃষ্ণস্বামী। চেতনা হবার আগে হড়হড় করে বেশ খানিকটা বমি করলে মেয়েটি। তার গায়ের জামাটা ভেসে গেল। খানিকটা কৃষ্ণস্বামীর হাতে জামায় লাগল। দুর্গন্ধে জায়গাটার বায়ুস্তরও যেন দূষিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণস্বামী সযত্নে সব ধুয়ে মুছিয়ে দিলেন। অফিসারটি নির্লিপ্তের মতো বসে বসে দেখলে, আর সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে দু চারটে কথা বলছিল। সবই প্রশ্ন। যেন থেকে থেকে হঠাৎ মনে উঠছিল। পারম্পর্যহীন। একটা প্রশ্নের সঙ্গে আর-একটার কোনো সম্পর্ক নেই।

চৈতন্যহীন মেয়েটি অসাড় হয়ে পড়ে ছিল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ইজ্‌ন্‌ট্‌ শী বিউটিফুল? ফাইন আইজ অ্যাণ্ড আইব্রেডস—ইজ্‌ন্‌ট্‌ ইট্‌? হে, হোয়াট ডু যু সে?'

কৃষ্ণস্বামী শুশ্রূষা করতে করতেই বললেন, 'ইয়েস, শী হ্যাজ গট এ সুইট ফেস।'

সত্য, মেয়েটির রূপ আছে এবং রূপে আশ্চর্য মোহও আছে। বিশেষ করে মাথার চুল ঘন কালো আর অপরূপ সুন্দর চোখ ও চোখের পাতা। চোখের পাতার রোমগুলি সুদীর্ঘ। সুন্দর আয়ত চোখ দুটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

আবার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'ইজ ইট এনিথিং ভেরি সীরিয়স?'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'হতে পারত। নেশার উপরে এই গরমে হীট্‌ স্ট্রোক হতে পারত। অবশ্য এখনও আশঙ্কা যায় নি।'

আবার কয়েক মিনিট পর প্রশ্ন হল, 'তুমি বললে, তুমি একজন ডক্টর। কোয়ালিফায়েড মেডিক্যাল ম্যান। মনেও হচ্ছে তাই। কিন্তু এ-রকম পোশাক কেন তোমার?'

'আমি একজন সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের নানান রকম পোশাক আছে। কিন্তু এই রঙটা হল সবার রঙ।'

'ক্যান ইউ টেল করচুন?'

'নো।'

'শুধু ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, আর সন্ন্যাসী !'

'এ কি, তোমার গলায় ও কি ? ক্রুশ ?'

'হ্যাঁ, ক্রুশ। আমি ভারতীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী।'

'ভারতীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ! ইয়ু আর এ বেভারেণ্ড।'

কৃষ্ণস্বামী উত্তর দিলেন না। মেয়েটির সেবায় মন দিলেন। মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জ্যামিতির দুটি কোণ সমান দুটি ত্রিভুজে যেমন মিলে যায় তেমনি দুটি মুখ মিলে যাচ্ছে।

আবার কিছুক্ষণ পর অফিসারটি বললে, 'বলতে পার এই ধরনের মেয়ে তোমাদের দেশে কত আছে ? স্ট্রেঞ্জ গার্ল।' আপন মনেই বলতে লাগল, 'ওর সঙ্গে আমার দেখা পুরীতে। অন দ্য সী-বীচ ! স্ট্রেঞ্জ গার্ল ! এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম আশ্চর্য বন্ধ ! কী হাসতে পারে ! কী প্রচণ্ড রাগে ! কী মদ খায় !' সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললে, 'সেই থেকে আমার সঙ্গে ঘুরছে।' আবার বললে, 'শী ইজ এ স্পোর্ট—কিন্তু বড়ো ওয়াইল্‌ড্‌।'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'জ্ঞান হচ্ছে। তোমার কাছে আর একটু মদ আছে ? শী নীডস—'

মেয়েটি মদ খেয়ে মুখ একটু বিকৃত করে বললে, 'ওয়াটার—প্লীজ ! ওয়াটার—টাণ্ডা জল !'

মুখে জল দিলেন কৃষ্ণস্বামী। মেয়েটি আবার হাঁ করলে আবার জল দিলেন কৃষ্ণস্বামী। তারপর চোখের নীচে আঙুল রেখে হেসে বললেন, 'লেট মি লুক অ্যাট ইওর আইজ ! লুক অ্যাট মাই ফেস !'

মেয়েটির ভুরু কুঁচকে উঠল, তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল দৃষ্টি।

আমেরিকান অফিসারটি বললে, 'হে—ডোণ্ট—; ও সব কোরো না, ডু-ই ডীয়ার ?' তার পরে বললে, 'হঠাৎ চিৎকার করে, হঠাৎ চড় মেরে বসে। শী ইজ হিস্টিরিক !'

ততক্ষণে কিন্তু মেয়েটা ধড়মড় করে উঠে বসেছে। তীব্র দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'ইউ ব্ল্যাকি—লীভ মি—; ছেড়ে দাও আমাকে—কালো আদমী কোথাকার !'

অফিসারটি চিৎকার করে উঠল, 'শাট আপ, ইউ বিচ ! শাট আপ, আই সে !'

কৃষ্ণস্বামী হেসে প্রসন্নকণ্ঠে মেয়েটির কপালে ভিজে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি অসুস্থ। আমি ডাক্তার। আমার কথা তোমার শোনা উচিত। আর একটুক্ষণ শুয়ে থাকো তুমি। সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আমি জানি। তুমি এই বড়িটা খেয়ে ফেলো। প্লীজ ! পীস অ্যাণ্ড বি স্টীল।'

মেয়েটি যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাঁর দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কৃষ্ণস্বামী ব্যাগটা খুলতে খুলতে আবৃত্তির সুর এনে বলেই চলেছিলেন, 'পেশেন্স ইউ ইয়ং রোজ-লিপ্‌ড্‌ মেড—পেশেন্স প্লীজ ;—'

শেক্সপীয়রের ওথেলো-নাটকের অংশ আবৃত্তি করছিলেন। এক্ষেত্রে খেটে গেছে।

অফিসারটি হেসে উঠল, 'হে ডক্—ইউ আর এ পোয়েট—আ—দ্যাটস্ ফাইন !'

মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে শুয়েছে এরই মধ্যে। কিন্তু তার মসৃণ ললাটে কয়েকটি রেখা বিস্ময়ের বা প্রশ্নের কুঞ্চনে পুষ্ট হয়ে জেগে উঠেছে। চোখের কোণে কালো দাগ—জীবনে অমিতাচারের রথের চাকার দাগের মত।

'নাও, খেয়ে ফেলো।'—একটা পিল বের করে কৃষ্ণস্বামী ডাকলেন।

বড়িটা খেয়ে মেয়েটি উঠে বসল। বললে, 'নো। নেভার। সে হতে পারে না তুমি। নো।' তারপর হাত বাড়িয়ে অফিসারকে বললে—'এ স্মোক প্লীজ।' তেল-পলিশ-লাগানো আঙুলের ডগায় নিকোটিনের দাগ। অফিসারটি সোৎসাহে বলে উঠল, 'নাউ শী ইজ ও-কে। টেক ইট। গেট আপ মাই হনি। হিয়ার ইজ ফায়ার।' সে সিগারেট দিল মেয়েটিকে। এবং লাইটারটা জ্বেলে ধরিয়ে দিল সিগারেটটা।

তারপর কৃষ্ণস্বামীর দিকে চেয়ে বললে, 'ও ঠিক হয়ে গেছে ডক, ও-কে। আমরা এবার যাব। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এই নাও।'

খান দুয়েক দশ টাকার নোট বের করে ধরলে।

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু মাপ করো আমাকে। এই আমার ধর্ম। এই আমার ঈশ্বরোপাসনা। ক্রাইস্টের নামে তোমাকে অনুরোধ করছি।'

মেয়েটি স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এবং একই ভাবে সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

মুখ ফিরিয়ে নিলেন কৃষ্ণস্বামী।

জীবনের বন্ধ-করা ঘরে যেন ভিতর থেকে ঘা পড়ছে। কে যেন মাথা ঠুকছে।

গাড়িখানা গর্জন করে চলে গেল। বংশী বললে—'মেয়াটা তাকায়ে রইছে দেখ বাবা। বাবাসাহেব উয়ার নেশাটো ছুটায়ে দিলেক কিনা! রেগেছে!'

তিন

কৃষ্ণস্বামী তাঁর আশ্রমে ফিরে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে ছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক।

ঝুমকি এসে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে লাল সিং আর সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'সিং, বাবাসাহেবের কী হইছে?'

লাল সিং আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো দূরে গর্জমান উড়োজাহাজের সন্ধান করছিল। ঝুমকির কথায় সে ফিরে তাকালে, 'কী হয়েছে!'

'বিড়বিড় করে কী বলছে, মন্তর-টন্তর বুলছে শুনলাম আমি। ভয়ে পালিয়ে এলাম। চা দিতে লারলাম। তুরা দে গে যা। বাবা রে!'

মন্ত্র-টন্ত্রের মতো কিছু শুনলে ঝুমকির ভয় করে। মনে হয় হয়তো তাকেই ডাইনি ভেবে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। দিনের বেলা হলে সে পালিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। চুপ করে বসে থাকে

ঝোপের ভিতরে খরগোশ-শজারুর মতো। অনেকক্ষণ কেটে গেলে ভয়টা ধীরে ধীরে কমে আসে। তখন গুনগুনিয়ে গান করে, তারপর উঠে আসে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে লাল সিং কৃষ্ণস্বামীর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সে জানে, মধ্যে মধ্যে বাবাসাহেব বাইবেলের সার্মন আপন মনে বলে যান। সে আপনার কপালে গায়ে প্রথামতো অঙ্গুল ঠেকিয়ে 'আমেন' বলে।

সত্যই বাবাসাহেব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আপন মনে বাইবেল বলে যাচ্ছেন। বাইবেল নয়, কৃষ্ণস্বামী আবৃত্তি করছিলেন,

It is the cause—it is the cause my soul—

Let me not name it to you, you chaste stars—

It is the cause.

Yet I'll not shed her blood.

Nor scar that whiter skin of her's than snow.

শেক্সপীয়রের ওথেলো থেকে আবৃত্তি করছেন কৃষ্ণস্বামী। আজ রামচরণের বাসা থেকেই ওথেলো মনে পড়ে গেছে। ওই যে মেটার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে তিনি ওথেলোর কথা কও ব্যবহার করেছেন।

'লেট মি লুক অ্যাট ইওর আইজ। লুক অ্যাট মাই ফেস। পীস অ্যাণ্ড বী স্টীল।'

ওই সবই ওথেলো নাটকের সংলাপ।

'দেশেল্স, ইউ ইয়ং রোজ-লিপড্ মেড—'

এরও অনেকটা অংশ তাই। আমেরিকান অফিসারটির এসব বুঝবার কথা নয়। খাদ্য-মদ্য নারী-হল্লোড়-যুদ্ধ, এ ছাড়া এ-সব বুঝলে যুদ্ধ চলে না। অবশ্য কিছু কিছু উচ্চস্তরের লোক আছে, হয়তো অনেক কবি কলম ছেড়ে কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে রাইফেল কাঁধে এসেছে, কিন্তু তারা ক-জন? তারা অন্তত এমনিভাবে মেয়েটিকে বগলে নিয়ে বেড়াত না। বেড়ালে বুঝতে হবে—তাদের জীবন-সত্য 'হেসে নাও দু'দিন বই ত নয়' ছাড়া আর কিছুই নয়। বাকী সব তারা মুছে দিয়েছে। হয়তো বা ভুলেই গেছে। রিনা ব্রাউনেরও তাই হয়েছে। অতীত বোধ হয় মুছে গেছে। নইলে এমন কি করে হল? সেই রিনা ব্রাউন! আশ্চর্য—ওথেলোর সেই অবিস্মরণীয় শব্দগুলি কানে ঢুকল কিন্তু তবু স্মৃতির ঘরের দরজা খুলল না? আশ্চর্য!

না। আশ্চর্যই বা কিসে? মদের নেশায় প্রমত্ত রিনা ব্রাউনই—সকল বিস্ময়ের সীমা শেষ। মদের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার স্মৃতি, বুদ্ধি,—বোধ হয় সমস্ত সত্তাকে।

চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে লাল সিং সসম্ভ্রমে সশ্রদ্ধ পদক্ষেপে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ফাদার ঈশ্বরকে ডাকছেন।

রিনা ব্রাউনের মূল্যের তুলনায় একদিন ঈশ্বরের মূল্যও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণস্বামীর কাছে। তখন তিনি কৃষ্ণস্বামী ছিলেন না। তখন তিনি ছিলেন কালাচাঁদ গুপ্ত। অবশ্য তখন

কালাচাঁদ ঠিক ঈশ্বর মানত না। এবং কালাচাঁদ নাম পালটে সম্ভ তখন সে কৃষ্ণ ইন্দু—কৃষ্ণেন্দু হয়েছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

কাল চাঁদ কৃষ্ণেন্দুর প্রথম নাম। পাহাড়ী নদীর মত বন্য। কাল চাঁদ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করত না কিন্তু বিশ্বাস করত নিজের প্রাণশক্তিকে। বন্য পাহাড়ী নদীর মতো শুধু প্রাণচঞ্চল বেগবানই নয়—খানিকটা বর্বরও বটে। মেডিকেল কলেজে ঢুকবারও আগে।

পল্লীগ্রামের ছেলে। কালো ছিপছিপে লম্বা, বড়ো বড়ো চোখ, কপাল পর্যন্ত পুরু ঘন চুল, মুখে-চোখে পল্লীর সারল্য। পল্লীর কর্কশতায় ঈষৎ মলিন। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণবন্ত, বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ। পল্লীগ্রামের নামকরা কামারের গড়া খাঁটি ইস্পাতের দায়ের মতো। ধারালো তীক্ষ্ণ অনমনীয় দৃঢ়; কিন্তু শান-যন্ত্রে ঘষা-মাজা পালিশ-করা ঝকঝকে নয়, একটু ময়লা।

পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান বৈদ্যবংশের সন্তান। কিন্তু সে-খ্যাতি তখন অস্তোন্মুখ। প্রপিতামহ এবং পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রসিদ্ধ ভিষগাচার্য। আয়ুর্বেদের প্রসার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপের উৎসাহ কমে গিয়েছিল। তিনি আয়ুর্বেদে মন না দিয়ে মন দিয়েছিলেন চাষবাস ও ধর্মে কর্মে। একমাত্র ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবেন এই বাসনা। গ্রাম্য স্কুলে ম্যাট্রিক পাস করে কালাচাঁদ আই. এস. সি. পড়তে এল কলকাতায় সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে। আই. এস. সি. পাস করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকবে। সামান্য কৌতুকে হা-হা করে হাসে, হুড়হুড় করে সিঁড়ি ভেঙে নামে, ক্লাসের শতকরা আশিটি ছেলের মাথার উপরে ছিপছিপে লম্বা কালোচাঁদের মাথাটা প্রায় ছ'ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠে থাকে। অশুদ্ধ গ্রাম্য-উচ্চারণে অসংকোচে কথা বলে। অফুরন্ত কৌতূহল। অনবরতই প্রশ্ন—কী? কী? ক্যানে? ক্যানে? ক্যানে? তার সঙ্গে গ্রাম্য সুরের টান। শহরের ছেলেরা হাসে। কিন্তু সে-সব কালাচাঁদ গ্রাহ্য করে না। সেও হাসে। কখনও কখনও গ্রামে-বসে-শেখা পুরনো ব্যঙ্গকথা বলে শোধ নিতে চেষ্টা করে।

বলে, 'তোমরা যে আমকে আঁব বল হে! তাহলে মামাকে কী বল?' বলে অট্টহাসি হাসে।

হঠাৎ কালাচাঁদ বিখ্যাত হয়ে গেল। তখন সেণ্টজেভিয়ার্সের পুরনো বাড়ি। কলেজের দক্ষিণে প্রশস্ত খেলার মাঠ। সে-মাঠে টিফিনের সময় কলেজের ছেলেরা ফুটবল খেলে। সবই কলকাতার স্কুলের ছেলে। মফস্বলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে দেখে। অন্তত গ্রাম থেকে সদ্য-আগত ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরা নামতে সাহস করে না। খেলোয়াড়দের সংখ্যা বাইশে আবদ্ধ থাকে না। বাইশ ছাড়িয়ে যায়। কয়েকদিন দেখে, বোধকরি মাস দেড়েক পর, আগস্ট মাস তখন, কালাচাঁদ বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে গ্রাউণ্ডের ধারে দাঁড়াল। গোল-লাইনের ধারে। টিপিটিপি বৃষ্টিতে পিছল মাঠ। খেলোয়াড়রা বল মারতে গিয়ে পিছলে পড়ে পাঁকাল মাছের মতো চলে যাচ্ছে। হো-হো শব্দে হাসিতে ভেঙে পড়ছে দর্শক ছেলেরা। একটা সিক্সইয়ার্ড শট। গোল-কীপার বলটি ঠিক জায়গায় রেখে সরে এল। ফুল ব্যাক্ বল কিক করতে গিয়ে পা তুলে পিছলে পড়ে চলে গেল খানিকটা দূরে। মুহূর্তে কালাচাঁদ পায়ের জুতো

খুলে ফেলে ছুটে গিয়ে বলটা কিক্ করে দিল। নিপুণ খেলোয়াড়ের শক্তিশালী শট, বলটা উঁচু হয়ে গিয়ে পড়ল সেণ্টার লাইন পার হয়ে ওধারের হাফব্যাক লাইনের সামনে।

'কে হে ছেলেটা? কে হে?' খোঁজ পড়ে গেল। কলেজটিমের ক্যাপ্টেন থার্ড ইয়ারের আশু দাস এগিয়ে এলেন। 'কী নাম? কোথায় খেলেছ? কোন পজিশনে খেল? ম্যাচ খেলেছ?'

'হ্যাঁ, অনেক ম্যাচ খেলেছি। 'এতগুলান' মেডেল পেয়েছি। সিউড়ি, বর্ধমান, কাঞ্চনতলা, শান্তিনিকেতনে ম্যাচ খেলেছি। পাঁচখানা বেস্ট প্লেয়ারস মেডেল আছে। লেফট আউটে 'খেলাই'। কর্নার কিকে বল গোলে ঢুকিয়ে দোব। ফুলব্যাকেও খেলতে পারি। লেফট ব্যাক। সেণ্টারেও 'খেলিয়েছি'। গোলে পারি। দেন ক্যানে একটা কর্নার কিক্ করে দেখিয়ে দি। দেবেন?'

'খেলাই' মানে খেলি—'খেলিয়েছি' মানে খেলেছি—ক্যানে মানে কেন—। লোকে শুনে হাসে কিন্তু কালাচাঁদ একবিন্দু লজ্জা পায় না।

'আনো তো হে বলটা! আনো তো।'

বলেছিলেন ক্যাপ্টেন। এবং কালাচাঁদকে কর্নার কিক্ করতে দিয়েছিলেন।

কর্নার কিকে সত্যই বলটা গোলে ঢুকে গেল। একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে বলটা গোলের সামনে সিক্সইয়ার্ড সীমার ভিতরে এসে বেঁকে গিয়ে একেবারে কোণ ঘেঁষে গোলে ঢুকে গেল। সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। এটা কালাচাঁদের পা আবিষ্কার করেছিল। সেণ্টজেভিয়ার্সের ক্যাপ্টেন অন্তত দেখেন নি। সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদ টিমের প্লেয়ার হয়ে গিয়েছিল।

কালাচাঁদকে লেফট আউটে খেলতেও দেওয়া হল। ছিলছিলে লম্বা কালাচাঁদ পায়ে বল নিয়ে ছুটল। সে-ছোটা তীরের মতো। একেবারে ওপারে লাইনের ধার থেকে বল মারলে। পড়ল গোলের সামনে। কিকে পা পিছলে পড়লও কয়েক বার। লোকে হাসলে। কিন্তু কালাচাঁদ সে শুনতেই পেলে না, দেখতেই পেলে না। হঠাৎ এক সময় রেগে এসে সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে বললে, 'একটা গোলে ঢোকাতে পারলেন না? আমাকে খেলতে দেবেন সেণ্টারে?'

কালাচাঁদ সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে এসেই বল ধরে একটু উপরে তুলে গোলকীপারের হাতে যেন ফেলে দিলে। গোলকীপার বল ধরবার জন্ম হাত বাড়াল, কালাচাঁদ লাফ দিয়ে বল মাথায় নিয়ে পড়ল গোলকীপারের উপর। পড়ল দু'জনেই। কালাচাঁদের হেডে বল গোলে ঢুকে গেল।

দ্বিতীয়বারে গোলকীপার তাকে মারলে। নাক থেকে রক্ত পড়ে জামাটা ভেসে গেল।

মিনিট কয়েক মুহ্যমান হয়ে রইল, তার পরই উঠে দাঁড়াল। মাথার চুলগুলো রক্ত এবং কাদামাখা হাতেই সরিয়ে দিয়ে গ্রাউণ্ডের ভিতর নেমে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন দাস তাকে হাতে ধরে বললেন, 'না, আজ আর নয়। ঘরে ঘরে মারামারি করে না।' কালাচাঁদ আশ্চর্য ছেলে! সে হেসে ফেললে। বললে, 'কী করে জানলেন আমি মারামারি করব? ওঃ, খুব বুদ্ধি আপনার!'

হেসে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমরাও তো খেলি।'

কালাচাঁদ বললে, 'তা বটে। আমাকে মারলে আমি না-মেরে ছাড়ি না।'

কালাচাঁদ বিখ্যাত হয়ে গেল কলেজে সেই দিনই। কিন্তু ওখানেই তার খ্যাতির শেষ নেই। দিন দিন খ্যাতি তার বাড়তে লাগল। কিছুদিন, বোধ-হয় মাসখানেক পরেই, বাঙলার অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বাঙালী অধ্যাপক, সাহিত্যরসিক, সাহিত্যিক। ক্লাসের মধ্যে কে উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছে। সদ্য-খ্যাতি-পাওয়া কালাচাঁদ আতুরে দুর্দান্ত ছেলের মত ওই ক্লাসের মধ্যে অধ্যাপকের ডায়াসে উঠে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। পিছনে একটু কথা ছিল। ক্লাসের রোল নম্বর ওয়ান, মৌলালীর কোন মুসলমান নেতার ছেলে—হালিম, ক্লাসে দুর্দান্তপনা করে। দু'টি পিরিয়ডের মাঝখানে উঠে ডায়াসের উপর উঠে দাঁড়ায়। অধ্যাপকদের নকল করে ভেঙায়। যা খুশি তাই বকে। বোর্ডে খড়ি দিয়ে কার্টুন আঁকতে চেষ্টা করে। একটা ক্লাউনের মতো। ছেলেরা হাসে। হঠাৎ সেদিন বাঙলার ক্লাসে হালিম নেই, সে বাঙলা পড়ে না। কালাচাঁদ বাঙলা কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিলে,

'আজি এ প্রভাতে—প্রভাত বিহগ—
কী গান গাইল রে।
অতিদূর—দূর আকাশ হইতে—
ভাসিয়া আইল রে।'

তারপর বললে, 'শোনো বন্ধুগণ, বয়েজ—বয়েজ—মাই ফ্রেণ্ডস্—কমরেড্‌স্!'

কমরেড শব্দটা তখন এসেছে। উনিশশো আটত্রিশ উনত্রিশ সন।

'আমি কবিতা আবৃত্তি করছি শোনো। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।'

কণ্ঠস্বর তার ভাল ছিল না। তার উপর বয়সের গাঢ়তা কণ্ঠস্বরে তখন সদ্য সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। গলাটা তখন ভাঙা-ভাঙা, খানিকটা চেরা-চেরা। কিন্তু সে-সব তার খেয়ালও নেই, গ্রাহ্যও করে না। সব কিছুতে একটা বিশেষ শক্তিতে সে নিজেকে ঢেলে দিতে পারে, ওই সঞ্চিত জলরাশির নিম্নগতিবেগের মতো, প্রতিটি জলবিন্দুর শক্তি প্রয়োগের মতো ওর দেহমন দুয়েরই প্রতি অণু-পরমাণু যে-কর্ম সে করে তাতেই তন্ময় হয়ে যায়। থরথর করে গলার স্বর কাঁপতে লাগল। বিদ্যুৎ-শক্তির মতো সকল শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হল সে-আবেগ।

'আজি এ-প্রভাতে রবির কর
কেমন পশিল প্রাণের পর।'

কণ্ঠস্বর তার উচ্চ হতে লাগল। আবেগ যেন পুঞ্জীভূত মেঘের মতো আবর্তিত হয়ে চলল। আগাগোড়া মুখস্থ কবিতাটি আবৃত্তি করে শেষ স্তবকে এল।

'কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে

চারিদিকে মোর
এ কি কারাগার ঘোর—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর।'

বলেই সে লাফিয়ে ডায়াস থেকে নেমে এসে ক্লাসের বন্ধ দরজায় দুম-দুম শব্দে কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে দিল। ছেলেরাও হাইবেঞ্চে চাপড় মারতে শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অধ্যাপক ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'দ্যাটস নট দি ওয়ে, দ্যাটস নট দি ওয়ে, মাই ফ্রেণ্ডস। ঝরনার জলের কারাগার ভাঙার ধারা আর মানব-হৃদয়ের পক্ষে রুদ্ধ পথের বাধা ভাঙার ধারা এক নয়। কিন্তু তুমি তো আবৃত্তি ভালো কর কালাচাঁদ!'

কালাচাঁদ আর একদফা খ্যাতি লাভ করলে।

সেবার ইণ্টার-কলেজিয়েট আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তাকে পাঠানোও হল। বাঙলা এবং সংস্কৃত প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি করলে। প্রাইজ পেলে না, কিন্তু সংস্কৃত আবৃত্তিতে সে প্রশংসা অর্জন করলে। কণ্ঠস্বর তার সবচেয়ে বড় বাধা হয়েছিল, নইলে হয়তো পেত। উচ্চারণের জন্যও তার নম্বর কম হয়ে গেল।

খেলার মাঠ থেকে কলেজ পর্যন্ত, ওদিকে নামজাদা রেস্টুরেণ্ট থেকে হোস্টেল পর্যন্ত কালাচাঁদের কণ্ঠস্বরে, গতিবেগে বায়ুস্তর চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল হল। ও বললে, অন্য কলেজে চলে যাবে। কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন রেক্টরকে বলে ওকে প্রমোশন দেওয়ালেন। রেক্টর ডেকে বললেন, 'তোমাকে সাবধান হতে হবে কালাচাঁদ। তুমি তো 'ডাল' ছেলে নও। ইউ আর শার্প।'

সেদিন কালাচাঁদের মনে পড়েছিল তার বাবাকে এবং মাকে।

স্বল্পবাক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ তার বাবা। পূজা আর অর্চনা নিয়ে থাকেন। মুখে-চোখে, আচারে-আচরণে একটি কী যেন আছে। যাতে তাঁর কাছে গেলেই বিমর্ষ হয়ে যেতে হয়। বোধ হয় একটি প্রচ্ছন্ন লজ্জার অনুশোচনা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। মুখে কিছু বলেন না। শুধু গৃহদেবতার দোরে প্রণাম করবার সময় আশে-পাশে কেউ না থাকলে বলেন, 'আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করো প্রভু! তোমার ভোগ কমাতে হয়েছে—এ দুঃখ আমি তোমাকে ছাড়া কাকে বলব?'

মা তার প্রসন্নময়ী। মা তার কল্পতরু। সে যখন যা চেয়েছে, তাই তিনি তাকে যুগিয়েছেন। যে যা চায়, সে তা পাবেই, সে-বিশ্বাস তার মা তাকে দিয়েছেন। অফুরন্ত দুধ ছিল তাঁর স্তনভাণ্ডে, অফুরন্ত স্নেহ ছিল তাঁর বুকে, আর ছিল মনে অফুরন্ত আশা। অবাধ এবং অগাধ ছিল তার প্রশ্রয়।

তার মা তাকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। তিনি নিজে সাঁতার জানতেন। যে-পুকুরে স্নান করতেন সে-পুকুরে পদ্ম ফুটত। সে রোজ আবদার ধরত ফুলের জন্য। মা তুলে এনে দিতেন। কিছুদিন পর বলেছিলেন, 'তুই সাঁতার শেখ, শিখে তুলে আন, আমি পারব না।' সাঁতার শেখার আতঙ্কে কয়েকদিন সে আর পদ্মের কথা তোলে নি। দিন কয়েক পর মা নিজেই একদিন গামছা-কোমরে বেঁধে ঘড়াটা ভাসিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আয়, পদ্ম

তুলবি।'

সে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। আসবার সময় বারকয়েক ঘড়াটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা ধর।'

তারপর সে-ই তাঁকে নিত্য এনে দিত পদ্মফুল, গৃহদেবতার পূজার জন্য।

মা তার কাছে শুয়ে গল্প করতেন ভবিষ্যতের। 'মস্ত বড়ো ডাক্তার হবি। বিলেতে যাবি, জার্মান যাবি। মস্ত বাড়ি করবি, গাড়ি কিনবি। দাসদাসী।'

ঐশ্বর্যের গল্প করে যেতেন। অত্যন্ত সহজ মানুষ ছিলেন। দান-ধ্যান-দয়া-স্বার্থত্যাগ এসব ছিল তাঁর কাছে নিজের ভোগের পরে। নিজে রোজগার করে আগে নিজে খাব, তারপর অন্যের কথা।

সে বলত, 'বিলেত গেলে জাত যাবে না?'

'আজকাল আর সেদিন নেই। ওদে যায় যাবে। জাত নিয়ে কি তোর বাবার মতো ধুয়ে ধুয়ে খাবি?'

'বাবা মত দেবে না।'

'তুই চলে যাবি। আমরা না হয় আলাদাই থাকব। বৃন্দাবন-টন চলে যাব। তুই তো বড় হবি!'

ফেল হয়ে তবে সেদিন তাঁদের কথা মনে পড়েছিল।

এবং সে মনে পড়াটা ভোলে নি সে। অন্তত আই. এস-সি পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত ভোলে নি সে। ফার্স্ট ডিভিশনে আই. এস-সি পাশ করেছিল।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল।

এখানে সে কালাচাঁদ গুপ্ত নয়, কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত। আই. এস-সি পরীক্ষা দেবার আগেই কোর্টে এফিডেভিট করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করে, নাম পাল্টে নিয়েছিল সে।

সেন্টজেভিয়র্সের ফাদার রেক্টর তার পড়াশোনায় উন্নতিতে তার উপর খুশীই ছিলেন। হেসে বলেছিলেন, 'হোয়াট্‌স ইন এ নেম—কালাচাঁদ?'

কালাচাঁদ হেসে বলেছিল, 'কালাচাঁদ ইজ ব্ল্যাক মুন, অ্যাণ্ড কৃষ্ণেন্দু মীনস্ দি সেম—দি ব্ল্যাক মুন। আই হ্যাভ চেঞ্জড দি ওয়ার্ড অনলি, নট দি মীনিঙ। আই অ্যাম দি সেম ওল্ড ব্ল্যাক মুন, ফাদার।'

বাবাকে, মাকেও তাই লিখে উত্তর দিল। লিখলে—'কালাচাঁদ সোনার চাঁদের চেয়েও খারাপ। আমার লজ্জা করে।'

বাবা উত্তর দেন নি, মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'বেশ করিয়াছ; তাহাতে আমরা মনে কিছু করি নাই।'

কিন্তু কলেজে-কলেজে তার কালাচাঁদ নাম তখন তার নিজের মতোই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাতে সে দমে নি। কেউ কালাচাঁদ বলে ডাকলেই বলত, 'নট কালাচাঁদ—আই অ্যাম কৃষ্ণেন্দু, কল মী কৃষ্ণেন্দু প্লীজ।'

এইখানেই রিনা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচয়। সেও ওই কালাচাঁদ নাম নিয়ে। রিনা ব্রাউন

কলেজের নার্স মেট্রন পলি ব্রাউনের সৎ মেয়ে। পলির স্বামী জিমি ব্রাউনের প্রথম পক্ষের মেয়ে। কলেজের স্টাফ কোয়ার্টার্সের মধ্যে মিসেস ব্রাউনের বাসা। রিনার বয়স তখন পনেরো-ষোল। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি তখনও কিশোরী। কিন্তু তখন থেকেই অপরূপ মোহময়ী। গায়ের রঙ সাদা হলেও বাঙলাদেশের একটি শ্যামলিমার আভাস তাতে স্পষ্ট। সবচেয়ে মোহকর মেয়েটার চুল। ছোটো কপাল ঢেকে এমন অপর্যাপ্ত পুরু ঘন কালো চুল দেখা যায় না। তৈলহীন রুক্ষতার মধ্যেও তার কালো-শোভা ক্ষুণ্ণ হত না, ধূসরতার আভাস ফুটত না। কপালের উপর ঘন কালো চুলের সম্ভারের সঙ্গে এখানকার লালপ্রান্তরের প্রান্তে ঘন শালবনের শোভার যেন মিল আছে। কৃষ্ণকুন্তলার চেয়ে অলকাকুন্তলার মতো বললেই যেন ওর উপমা শোভনতর করে বলা হয়। তেমনি দুটি মোটা কালো ভুরু—কপালের মধ্যস্থল থেকে যেন আকর্ণবিস্তৃত। কাঁচা বাঁশের মোটা ধনুকের মতো। তদনুরূপ সুন্দর আয়ত দুটি চোখ—তাকে সুন্দরতর করেছে তার চোখের পাতার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি। ফুলের কেশরের মতো দীর্ঘ। মনে হয় জন্ম থেকেই চোখের পাতায় কাজল-রেখা আর স্বপ্নালুতা মেখে নিয়ে মেয়েটি জন্মেছে। রিনাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দেখা যেত। সে সময়টাতে তখনকার দিনের মিলিটারী মেডিক্যাল স্টুডেণ্টদের সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসত, ঠিক তার কিছুক্ষণ পর, বোধ হয় দশ মিনিট পর মিলিটারী ছেলের দল প্রায় সব বেরিয়ে চলে যেত। থাকত শুধু জন ক্লেটন, মিলিটারী স্টুডেণ্টদের সেণ্টার হাফ। মারপিটে সিদ্ধহস্ত জনি গুণ্ডা। রিনা এবং জনি—কথা বলত হাসত। রঙীন হাসি। জানত সবাই।

জন ক্লেটন। যুদ্ধবিভাগের নামকরা আই. এম. এস. অফিসারের ছেলে। চার্লস ক্লেটনের গল্প সর্বজনবিদিত—অন্তত অফিসার মহলে। কৃষ্ণেন্দুও পরে এসব শুনেছিল ওদের কাছ থেকেই। দুঁদে অফিসার, দুর্দান্ত মাতাল, নামকরা শিকারী, ভালো নাচিয়ে, মারা-মারিতে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি ছিলেন চার্লস ক্লেটন। পলি ব্রাউন বলেছিল, যেখানে চার্লস ক্লেটন থাকত, সে-ক্যাণ্টনমেণ্টে অফিসারেরা সন্ত্রস্ত থাকত। ঝড়ের মতো পরের ঘরসংসার ভেঙে দিয়েই ছিল তার উল্লাস। তার এই দুর্দান্তপনা মেয়েদের পক্ষে ছিল একটা আকর্ষণ। এই আকর্ষণে একদা নাকি পলি ব্রাউনও—তখন মিস পলি মরিসন—পড়েছিল। কিন্তু ক্লেটন তখন বিবাহিত। স্ত্রী ছিল ইংলণ্ডে, জন তখন শিশু। কিছুদিন মাখামাখির পর পলি মরিসন ভগ্নহৃদয়ে মিলিটারী বিভাগের কাজ ছেড়ে এসে কাজ নিয়েছিল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। ক্লেটন সাহেব দুর্দান্ত হলেও পাষণ্ড ছিল না। কলকাতায় কাজ পেতে সে তাকে সাহায্য করেছিল। কয়েকটা বড়ো হাসপাতাল, যেগুলি ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলি ঘুরে সে মেডিক্যাল কলেজে এসে কাজ নিয়েছিল। তখন সে মিস পলি। এখানে থাকতেই সে মিসেস ব্রাউন হয়েছে। জেমস ব্রাউনকে যখন সে বিয়ে করে রিনা তখন দশ বছরের মেয়ে। জেমস আর রিনাকে নিয়ে পলি ব্রাউন সংসারে ডুবে ক্লেটনকে একেবারেই প্রায় ভুলে গিয়েছিল।

কৃষ্ণেন্দু যে-বছর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল—তার আগের বছর জন ক্লেটন এসে ভর্তি

হয়েছিল মেডিকাল কলেজে। মিসেস পলি ব্রাউনের কাছে এসে একখানা চিঠি দিয়ে বলেছিল, 'মেজর চার্লস ক্রেটন অব দি কিংস ওন রেজিমেণ্ট, আপনার কি তাঁকে মনে আছে?'

'মেজর চার্লস ক্রেটন ভিক্টর চার্লি?'

জন হেসে বলেছিল, 'আমি তাঁর ছেলে?'

'তুমি তার ছেলে?'

'হ্যাঁ এখানে মেডিক্যাল কলেজে পড়ব বলে এসেছি।'

বিস্মিত হয়েছিল পলি ব্রাউন। মেজর চার্লস ক্রেটনের ছেলে হোমে না পড়ে এখানে পড়বে ডাক্তারি। আই. এম. ডি. হবে? চার বছরে চিকিৎসাশাস্ত্র শেষ! নরুন চালিয়ে এদেশের হাতুড়েরা ফোড়া কাটে। ওরা ছুরি চালিয়ে তার চেয়ে ভালো কাটতে পারে না। আই. এম. ডি.-র ব্যবহারের জন্য ধারালো ছুরির বদলে ভোঁতা ছুরির ব্যবস্থা। কে জানে কখন ধারালো ছুরিতে বেশী কেটে ফেলে! ওদের ব্রিটিশ-আইরিশ রেজিমেণ্টে চাকরি হবে না। কালা সিপাহীর রেজিমেণ্টের মেডিক্যাল অফিসার হবে।

বিস্ময়ের অবধি ছিল না পলি ব্রাউনের। কিন্তু চিঠিখানা পড়ে পলি ব্রাউন নিজেই বলেছিল, 'স্ট্রেঞ্জ। স্ট্রেঞ্জ লাক্! কী বলব লাক্ ছাড়া?'

মেজর ক্রেটনের জীবনে বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিচিত্র অদৃষ্টই বটে। পাঁচ বছর আগের কথা। ক্রেটন ছিল সি-পিতে একটা বড়ো ক্যাণ্টনমেণ্টে। তখন তার স্ত্রী-পুত্র এখানে এসেছে। ক্রেটন ক্যাপ্টেন থেকে মেজর হয়েছে। স্ত্রী আসার জন্য অফিসারদের সমাজে ঘোরা-ফেরায় পদক্ষেপ সংযত করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। ক্রেটনের স্ত্রী মার্গারেটও ছিল শক্ত মেয়ে। সাহসে, দৈহিক শক্তিতে দুইয়েতেই ছিল ক্রেটনের উপযুক্ত স্ত্রী। ক্রেটন সমাজ ছেড়ে মধ্যভারতের জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করেছিল শিকারের সন্ধানে। শিকারের সন্ধানে বনে ঘুরবার সময় আরণ্য জাতির নারীদের উপভোগের পথটা বেছে নিয়েছিল সে। কিছুদিনের মধ্যে মার্গারেট তার আভাস পেলে। সেও একটা রাইফেল নিয়ে শিকারে তার সঙ্গিনী হল। শেষবার ঘটল বিচিত্র ঘটনা।

ক্রেটন সেই ধরনের লোক, যারা কোনো কথা রেখে-ঢেকে বলে না। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে নয়, জীবনের কোনো ঘটনাই তার কাছে লজ্জার হেতু নয়। পলি ব্রাউনকে লিখেছে, 'পলি, ঘটনাটা আশ্চর্য। আমার মন আমাকে ঠকালে, না এটা নিয়তির খেলা, কি আমার কর্মফলের পরিণতি, আজও ভেবে পাই না। সে এক গভীর বনে একটা গ্রাম। মার্গো সঙ্গে। সেখানে এক বিচিত্র বাঘিনীর আড্ডা। সে মারত কেবল মেয়েদের। লোকে বলত প্রেতিনী বাঘিনী। তাকে মারতে গ্রামে এসে একটি আশ্চর্য বুনো যুবতীকে দেখলাম। মন আমার বাঘিনীর চেয়ে ওর দিকেই বেশি ঝুঁকল। কিন্তু মার্গারেট সঙ্গে। যাই হোক, মাচা বেঁধে দ্বিতীয় দিন রাত্রে বাঘ মারলাম। কিন্তু বাঘিনীটা নয়। মরল যেটা সেটা বাঘ। কোথায় বাঘিনীটা! তিন দিন আর পেলাম না তাকে। কিন্তু তার পায়ের ছাপ আশ্চর্যভাবে চারিদিকে দেখলাম। যেন সামনের দিকে না এসে পিছনের দিকে সে ঘুরেছে ফিরেছে। গ্রামের

সর্দার বললে, 'ফিরে যাও সাহেব, এ বাঘিনী ভয়ঙ্কর। এ তোমার পিছু নিয়েছে।' দিনের বেলা কথা হচ্ছিল। গ্রামের লোকেরা জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে কিন্তু সেই বুনো আশ্চর্য মাদকতাময়ী মেয়েটি। সকলকে লুকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তুমি সে-কালের চার্লিকে ভোল নি। এ-বিষয়ে সে ছিল নিপুণ শিল্পী! চার্লস ক্লেটন কি বাঘিনী পিছু নিয়েছে বলে ওই বুনো মদিরা পান না করে আসতে পারে? মার্গারেট ঠিক বোঝে নি, কিন্তু তবু সে বলেছিল, 'ফিরে চলো।' আমি বলেছিলাম, 'আজকের দিনটা দেখে যাব।' ঠিক এই সময়টিতেই বাঘিনী ঠিক গ্রাম-প্রান্তে দেখা দিয়ে একটা গর্জনে আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম ছুটে। কিন্তু কোথায়? না-পেয়ে ফিরে আসছি হঠাৎ দেখা হল মেয়েটার সঙ্গে। ইশারায় নিমন্ত্রণ জানালে হেসে। আমি তাকে বললাম, 'রাত্রে আজ শিকারে যাব না, গভীর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে তার ইশারা পেলে আসব।' মার্গারেটকে বললাম, 'শরীর খারাপ, মাচায় যাওয়া আজ ঠিক হবে না।' থাকলাম আড্ডায়। আড্ডা বুনোদেরই প্রধানের একখানা ঘর। মদ খেয়েছিলাম। মার্গারেটকেও খাইয়েছিলাম। তাকে ঘুম পাড়াতে হবে। সে ঘুমিয়েও ছিল। হঠাৎ খুটখুট শব্দ শুনলাম। কান পেতে শুনলাম। আমি শিকারী। আমি জানোয়ারের পায়ের শব্দ চিনি। আমি চার্লি ক্লেটন, আমি অভিসারিকার পায়ের শব্দও জানি। এ পায়ের শব্দ সেই বুনো মেয়ের। দরজা খুললাম সন্তর্পণে। ফাঁক করে দেখলাম। চাঁদ ছিল আকাশে। বনের মধ্যে জ্যোৎস্না। আশ্চর্য তার রূপ। ঘন সবুজের ঘেরের মধ্যে সে-শুভ্রতার তুলনা খুঁজে পাই না। তার মধ্যে দেখলাম সে মেয়েকে। ভুল আমি দেখি নি। বুকের ভিতর রক্ত ছলাত করে উঠল। আমি বেরিয়ে গেলাম। শিস দিলাম। সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথায় সে? ঠিক এই মুহূর্তে বাঘের গর্জনে কেঁপে উঠল বনভূমি। পিছন থেকে বাঘিনী লাফ দিয়ে পড়ল আমার উপর। একটু সরতে পেরেছিলাম, তবু সে আমার ডান কাঁধের উপর পড়ল। সেই মুহূর্তে শুনলাম মার্গারেটের চিৎকার। তার পর মুহূর্তে শুনলাম বন্দুকের শব্দ। পর পর দুটো শব্দ। আবার বাঘের গর্জন। তারপর মনে নেই, জ্ঞান হল হাসপাতালে দীর্ঘদিন পর। ডান হাতখানা কেটে ফেলতে হয়েছে। ডান কানটা নেই। ডান পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছিল। তাতেও জোর নেই। বাঘিনী মার্গারেটকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে মরেছিল। দুটো গুলিই লেগেছিল তার বুকে পেটে। মরবার সময় গড়াগড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল আমার উপরেই। আলিঙ্গন করেছিল। আরও মজার কথা কী জান? সেই বুনো গ্রামে ওই মেয়েটার সন্ধান কেউ আমাকে আর দিতে পারে নি। আমি খোঁজ করেছিলাম। তারা বলে, 'কই, এমন মেয়ে তো গাঁয়ে নেই!' আজও আমি ভাবি কী জান? ওই মেয়েটা কি প্রথম থেকেই আমার মত্তবিহ্বল মস্তিষ্ক এবং আমার নারীলোলুপ চিত্তের ভ্রান্তি? অলীক কল্পনা? যাই হোক, আজ আমি বিকলাঙ্গ অসহায়, সামান্য পেনসনের উপর নির্ভরশীল সামান্য ব্যক্তি। জনিকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে পড়াবার সামর্থ্য নেই। ও কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। আমি জানি তুমি ওখানকার মেট্রন। জনিকে একটু দেখো।'

ভগবানের নাম উচ্চারণ করে পলি ব্রাউন গায়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকেছিল। 'হে ভগবান! পুয়োর চার্লি শয়তানের হাতে পড়েছিল। কিন্তু তুমি বসো জন। তুমি মেজর চার্লস ক্লেটনের ছেলে। মেজর ক্লেটন এক সময় আমার বস্ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন। আমার বাড়ির দরজা তোমার কাছে অবারিত রইল। যখন খুশি আসবে।'

আলাপ করিয়ে দিয়েছিল স্বামী জেমস ব্রাউনের সঙ্গে। জেমস ব্রাউন এক সময় মেদিনীপুর অঞ্চলে থাকত। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ জমিদারি কোম্পানিতে কাজ করতেন জেমসের বাবা। সেখানে পাহাড় জঙ্গল কিনে ব্যবসা করতেন। জেমস ব্রাউনও সেই ব্যবসা করত। ব্যবসা ফেল পড়ার পর ইনসলভেন্সি নিয়ে কলকাতায় এসেছে মেয়ে রিনাকে নিয়ে। তারপর দেখা হল পলি মরিসনের সঙ্গে। সে আজ চার বছরের কথা।

'রিনা বড়ো ভালো মেয়ে।'

ডবল বেণী ঝুলিয়ে রিনা বসে মিষ্টি হাসি হেসেছিল।

'ওর বাবা ঠিক করেছিল, ওকে কনভেন্টে রেখে শেষ পর্যন্ত 'নান' করে তুলবে। জিনির ধর্মকর্ম বাতিক। কনভেন্টে রেখেও ছিল। আমি নিয়ে এসেছি জোর করে। দেখ তো কী মিষ্টি স্বভাব মিষ্টি চেহারা।'

জন ক্লেটনের সঙ্গে রিনার প্রেমের কথা কলেজে কিছু দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। জন ক্লেটনের সঙ্গে ফুটবলের মাঠে কৃষ্ণেন্দুর হল একদিন মারপিট। সেই সূত্র ধরে নয়—সেই সূত্রের টানেই যেন রিনা এসে দাঁড়াল কৃষ্ণেন্দুর সামনে।

মিষ্টি স্বভাবের রিনা ব্রাউন ক্ষিপ্ত হয়ে সেদিন কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল 'ইউ ব্ল্যাকি কালাচাঁদ! ইউ হিদেন!'

কৃষ্ণেন্দু কলেজের ভিতর খেলার মাঠে মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বিজয়ী বীরের মতো এসে সবে নেমেছে, ছেলেরা তাকে উল্লাস-কলরবে অভিনন্দন করছে। রিনা ব্রাউন ওদের ফ্ল্যাট থেকে রাগে ফুলতে ফুলতে নেমে এসে গ্রাউণ্ডের ভিতরে খানিকটা ঢুকে চিৎকার করে ডেকেছিল, 'ইউ ব্ল্যাকি কালাচাঁদ! ইউ হিদেন!'

ওর পিছনে পিছনে এসেছিল ওর আয়া। একটি বটা এদেশী মেয়ে। মাথার চুলগুলি পেকে গিয়েছে। মোটা ভুরু! অদ্ভুত লাগত তাকে দেখে। তার অদ্ভুত ছিল চোখের দৃষ্টি। সবদাই যেন আতঙ্কে বিস্ফারিত এবং পলক পড়ত না। সে পিছন থেকে চিৎকার করছিল—'রিনা, রিনা, রিনা, রিনা! নহি! নহি!'

রিনা থামে নি। সে পা ঠুকে বলেছিল, 'ইউ, শুনতে পাও না তুমি?'

কালাচাঁদ তার কাছে এসে বলেছিল, 'বর্ষায় ভিজে কাদার উপর এমন করে পা ঠুকো না। তোমার এমন স্কার্টটা কাদার ছিটেতে ভরে গেল।'

সত্যিই তাই গিয়েছিল। ছেলেরা হেসে উঠেছিল। রিনার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল সে-হাসির প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে। কথার উত্তর খুঁজেও পায় নি, সরাসরি সে অভিযোগ করে বলেছিল, 'কেন তুমি জনিকে এমন করে মেরেছ? হোয়াই? ইউ ব্রুট!'

সে উত্তর দেবার আগেই কলেজ টীমের ফুলব্যাক বসন্ত বলেছিল, 'ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজটা

দেখছ না ? জনিই মেরেছিল ওকে আগে।'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমার বাগদত্তা নেই মিস ব্রাউন, থাকলেও সে এসে জনিকে এ-প্রশ্ন করত না। সে জানে লড়াই আরম্ভ হলে যার জোর বেশী, তার আঘাতটা জোরালো হবেই। কীচকেরা চিরকাল ভীমের হাতে মরে।' ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

ওই আয়া মেয়েটি হঠাৎ হাত জোড় করে কৃষ্ণেন্দুকে পরিষ্কার বাংলায় বলেছিল, 'হে বাবা। দয়া-(দোহাই) তুমার পিতিপুরুষের, হেই ভালোমানুষের ছেল্যা, আমি হাতজোড় করছি। ঘাট মানছি। উকে কিছু বল নাই। হেই বাবা!'

মেয়েটা বাঙালী! সেই বিস্ময়েই সকল ছেলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। রিনা এই অবসরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। চিৎকার করে বলেছিল, 'ইউ উইল বি পানিশ্‌ড, গড উইল পানিশ ইউ।'

* * *

ঘটনাটা সব মনে পড়ছে। সে খেলা ঐতিহাসিক খেলা। খেলা নয় যুদ্ধ।

কলেজের ভিতরের খেলার মাঠে খেলার অধিকার নিয়ে সাধারণ ছাত্র আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মিলিটারী ছাত্রদের ঝগড়া, মারপিট-ভরা সে-যুদ্ধের কথা কলেজের ইতিহাসে লেখা আছে। সেই যুদ্ধ চলেছে তখনও। যুদ্ধের সেই মেলা সেদিন চলেছিল খেলার মাঠে। তার আগের দিন দুই দলের ম্যাচে জনিই একা করেছিল মারপিট। সেদিন শোধ নেবার জন্যে শপথ নিয়ে নেমেছিল কৃষ্ণেন্দু। জনকে সে মারবে। বুটের সুযোগ তো ওদের চিরদিনের, তার উপরে জনি মারপিটে সিদ্ধহস্ত। জনি শুনে হেসেছিল। বেচারা জনি, কৃষ্ণেন্দুকে ঠিক জানত না। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর ছ-ফুট-লম্বা চেহারাখানা দেখে একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া গত দু-বছরে কালাচাঁদের খেলার পার্টির উপরেও শ্রদ্ধা করে মারবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল। প্রথমেই সেণ্টার হাফ জনি বুটের লাথি মেরে জখম করেছিল এদের সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে। বেচারার ডান হাঁটুর নীচে কাপ জখম হয়। উঠল বটে, কিন্তু তখন ছুটবার ক্ষমতা গিয়েছে। তার পরই এদের সেণ্টার হাফের পায়ের বুড়ো আঙুল ফাটিয়ে দিলে। রেফারি তাকে সাবধান করে দিলেন জনি সরে এসে রেফারীকে গাল দিলে 'সন অব এ বিচ' বলে। কথাটা কানে গেল কৃষ্ণেন্দুর। সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে নিজের জায়গায় দিয়ে সে এল সেণ্টার ফরওয়ার্ডে, দাঁড়াল জনির মুখোমুখি।

জনি হেসে বললে, 'You are কালাচাঁও? ছাটস্ অলরাইট। বহুত আচ্ছা ব্ল্যাকি। কাম অন।'

কথাটা শেষ হতে না হতে বল এসে পড়ল দুজনের মধ্যে। জনি বুট ঝাড়লে ওর হাঁটু লক্ষ্য করে। কালাচাঁদ সুকৌশলে হাঁটু বাঁচিয়ে জনির উৎক্ষিপ্ত পাখানার তলার দিকে ঝাড়লে একখানি কিক। ছ- ফুট-লম্বা মানুষের শক্ত বাঁশের মতো পায়ের সে কিকে চিত হয়ে পড়ে গেল জনি। এবং হাঁটু বিনা রক্তপাতে জখম হল। ক্রুদ্ধতর হয়ে উঠল জনি। এবং কিছুক্ষণ পরই জনি মারলে ওর মাথায়। কৃষ্ণেন্দুর মাথাটা ফেটে গেল। রক্তমাখা বড়ো চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু মিনিট দুয়েক পরেই ছুটল বল ধরতে। জনি প্রাণপণে

ছুটে এসে রুখলে। বল তখন কৃষ্ণেন্দু ইন্সম্যানকে দিয়ে সামনে ছুটেছে। উঁচু বল এসে পড়েছে। জনি কৃষ্ণেন্দু সামনাসামনি, দুজনেই হেড দিতে লাফাল। কৃষ্ণেন্দু হেড দিলে, মর্মান্তিক আর্তনাদ করে জনি পড়ল মাটির উপর কাত হয়ে পেট চেপে ধরে, অজ্ঞান হয়ে গেল। ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যেতে হল তাকে। পেটের অন্ত্রে আঘাত লেগেছে। এর পর কৃষ্ণেন্দু করলে হ্যাটট্রিক।

দেশী ছেলেদের কাঁধে চড়ে কৃষ্ণেন্দু চিৎকার করে গান ধরেছে—

দিন আগত ঐ—ভারত তবু কই—

সে কি রহিবে লুপ্ত আজি সবজন পশ্চাতে ?

প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে—জাগ্রত ভগবান হে।

জয় ভৈরব !

এই মুহূর্তেই রিনা ব্রাউন এল—'ইউ ব্ল্যাকি কালাটাণ্ড !' এবং শেষ পর্যন্ত বললে, 'গড উইল পানিশ ইউ।'

কৃষ্ণেন্দু তারপর উত্তর দিয়েছিল, উত্তর দিতে একটু দেরি হয়েছিল ওই আয়াটির মুখের আকুতিভরা বাঙলা কথা শুনে। বিস্মিত হয়ে আধ মিনিট দেরি হয়েছিল, চিৎকার করেই সে বলেছিল, 'হ্যালো মিস, হ্যালো। দেন আস্ক ইওর গড—তোমার ভগবানকে বলো—আমার সামনে আবির্ভূত হতে। কিংবা আমাকে তার সামনে হাজির করাতে। জান, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমার একটা পরম লাভ হবে। আমি তাঁকে দেখতে পাব। তার জন্যে দরকার হয় তো বলো, তোমার জন্যে আমার গুঁতো মারব !'

*　　　　*　　　　*

রিনা ব্রাউন ! আমার দম্ভ চূর্ণ করে তোমার ঈশ্বর আমাকে ধন্য করেছেন। তোমার ঈশ্বরকে আমি দেখেছি রিনা ব্রাউন। কিন্তু আশ্চর্য ! ডাইনী অপবাদে অপরাধিনী আদিম আরণ্য নারী এই বুড়িটির মধ্যেও তাঁকে দেখেছি, দেখেছি। সিন্ধু, লাল সিং, এদের মধ্যেও তাঁকে পেয়েছি। তোমার সঙ্গী ওই মরণ-ভয়-তাড়িত মদ্যপানবিভোর আমেরিকান অফিসারটির মধ্যে তাঁকে দেখলাম, তিনি রয়েছেন। যুদ্ধে যে প্রাণ নেবে তার মধ্যে নয়, যুদ্ধে প্রাণ দেবে বলে এতদূরে এসেছে তার মধ্যে যে তাঁকে আমি দেখলাম। কিন্তু তোমার মধ্যে থেকে তিনি কোথা অন্তর্হিত হলেন, রিনা ব্রাউন ! হে ঈশ্বর সেই মেয়েটিকে তুমি কেন পরিত্যাগ করলে ! এ রিনা ব্রাউন ঈশ্বর-পরিত্যক্ত রিনা ব্রাউন। কৃষ্ণস্বামী মনে মনেই কথা ক'টি বললেন।

'বাবাসাহেব !' সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল সিন্ধু।

'কে ? সিন্ধু ?'

'হঁ বাবাসাহেব। চা দিয়ে গেলু, খেলে নাই। রাত কত হইছেক—খিদা কি তুমার লাগে না বাবাসাহেব ?'

'আমার রুটি ঢাকা দিয়ে রেখ্যা দাও সিন্ধু। ইয়ার পর যখুন হোক খাব।'

'উঁহুঁ। আপনি খেয়ে লও—তবে আমি যাব।'

'না সিন্ধু ! আজ আমাকে ছাড়ান দাও বেটি।'

'শরীর কি ভালো নাই বাবা?'

'শরীর ভালো আছে বেটি। মন ভালো নাই।' বলেই উঠে পড়লেন কৃষ্ণস্বামী। ঘর থেকে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বারান্দা থেকে নামলেন খোলা উঠানে।

চার পাশে বর্ষার ঘনশ্যাম শালবনে জ্যোৎস্নার আভা প্রতিফলিত হয়েছে। দূর দিগন্ত পর্যন্ত বনের মাথায় মাথায় চলে গেছে। নিঃশব্দ নয়, নিস্তব্ধও নয়। কিন্তু যেন থমথম করছে। গাছে গাছে কুঁড়িগুলি পরিপুষ্ট হচ্ছে। কাল সকালে ফুটবে। পরশু যারা ফুটবে তারা বাড়ছে। আজ সকালে যারা ফুটেছিল, তাদের গন্ধ এখনও ছড়িয়ে রয়েছে বাতাসে। মাটির গভীর অন্ধকারে মূল পচনরস পান করছে কৃমির মতো লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্মাগ্র মুখ বিস্তার করে। অবিরাম চলেছে বিচিত্র জীবনতপস্যা। পঙ্করস পুষ্প হয়ে ফুটেছে।

রিনা ব্রাউন মদ খেয়ে হয়তো নাচছে বা চিৎকার করছে, হয়তো আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে বিকৃত লালসায় উন্মত্ত ব্যভিচারে নিজেকে ক্ষয় করছে। বস্তুজগতে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল, বৈজ্ঞানিকেরা বলে সেটা আকস্মিক ঘটনা। তা থেকেই জেগেছিল প্রাণ। সেই প্রাণের জাগরণেই ঈশ্বরের তপস্যার হেমকুণ্ড জ্বলছে। অনন্ত প্রাণের সমিধের আহুতি চলেছে তাতে। প্রাণে তেজ হল। 'তুমি তাতে কালি হয়ে ঝরে পড়লে, রিনা ব্রাউন! এমন কী করে হল?' তাঁর অন্তরাত্মা হাহাকার করছে।

এগিয়ে চললেন কৃষ্ণস্বামী। তাঁর আশ্রমের সীমানা পার হয়ে বনের দিকে চললেন। বনের মধ্যে গাছেরা যেন কথা বলছে। বাতাসে, পাতায় পাতায় সাড়া জেগেছে, সুর জেগেছে। সারাটা দিন ওরা মানুষের জীবজন্তুর প্রাণের খাদ্য অক্সিজেনের ভাগ নিয়েছে। এইবার অক্সিজেন দিচ্ছে। রিনা তুমি দিনরাত্রিই কার্বনডায়োক্সাইড গ্রহণ করছ, সারা দিন রাত্রি কার্বনডায়োক্সাইড দিচ্ছ। লয়ের মধ্যেও বিচিত্র সৃষ্টি স্থিতি আছে। রিনা তোমার মধ্যে শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষয়।

'বাবাসাহেব! ফাদার!'

বাঙলোর দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যোসেফ লাল সিং ডাকছে। তিনি বনের দিকে চলেছেন, তাই শঙ্কিত হয়েছে। বনে ভালুক আছে। বুনো শুয়োর আছে। মধ্যে মধ্যে চিতা আসে। সেই ভয়ে তাঁকে ফিরে আসতে বলছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'বেশী ভিতরে আমি যাব না যোসেফ।'

'না, বাবাসাহেব, গাঁ থেকে লোক এসেছে।'

লোক! তা হলে কারও বাড়িতে অসুখ! বিপদ! ঈশ্বর কি রিনার কথা ভাবতে নিষেধ করছেন? ফিরলেন কৃষ্ণস্বামী। বারান্দায় বসে আছে—একক্রোশ দূরের একখানি ছোটো গ্রাম থেকে, কৃষ্ণস্বামীর চেনা সবাই। এ যে বুড়ো শরণ লায়েক।

'কী হল লায়েক মশয়? এত রাতে?'

'কী হবেক? বিপদ! তা নইলে তুমার কাছে আসব ক্যানে এত রেতে!'

'কার অসুখ? কই জানি না তো কিছু?'

'জানবা কী? এই আমার ছেল্যাটার বড়ো বিটিটো। পেথম পোয়াতি বটেক। সেই

দুপুর থেকে বেথা উঠেছে। দাইটো এই রেতে বলে, 'আমি খালাস করতে লারব লায়েক; গতিক মন্দ বটেক লাগছে। তুমি বাবাসাহেবকে খবর দাও।' মেয়্যাটা গোঙাইছে বাবা। শুনতে পারা যেছে না। যেতে একবার হবেক বাবা।'

'নিশ্চয়! হবেক বই কি।' কৃষ্ণস্বামী দ্রুতপদে উঠে গেলেন ঘরের ভেতরে। ডাকলেন, 'যোসেফ। তুমি চলো। যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যাগটা গুছাঁয়ে লাও হে। তোমরা আলো আন নাই লায়েক?'

'না গো বাবা, ত্যাল কুথাকে পাব গো। একটো কানাকুঁজো হারিকন আছে—তা সিটা দিলাম ঘরে। তা আকাশে জোস্তা রইছে—ঠিক চলে যাব।'

'আমাদের একটা হ্যারিকেন নাও লাল সিং। ব্লেসেড ইজ হি দ্যাট কামেথ ইন দি নেম অফ দি লর্ড। চলো লায়েক।' থাক রিনার কথা। রিনা মৃত। ঈশ্বর তার কথা মনে করতে নিষেধ করছেন।

চার

অথচ রিনা তাঁকে লিখেছিল। একদিন 'উস্ আনটু ইউ।' শেষ চিঠি তার। 'কৃষ্ণেন্দু, তুমি আমার কাছে মৃত। ডেড টু মী।'

পরদিন সকালে শরণ লায়েকের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন কৃষ্ণস্বামী। প্রায় সারা রাত্রি পরিশ্রম করে শরণের নাতনীকে প্রসব করিয়ে বাড়ি ফিরছেন। ভোরের শালবনে এখনও রাত্রিচরদের আনাগোনা স্তব্ধ হয় নি। পাখিরাও বাসা ছাড়ে নি, কলরব শুরু করেছে শুধু। ফুলেরাও সবে ফুটছে। মাথার উপরে আকাশে বকের ঝাঁক উড়ে উড়ে চলেছে, বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলোতে চলেছে, আর পাক খাচ্ছে একসঙ্গে সরালি হাঁস। ভোরের বাতাস ক্লান্ত শরীরে বড়ো ভালো লাগছে। সাইকেলটা থাকলে বড়ো ভাল হত। ফিরতে ফিরতে ওই কথাটা মনে পড়ল। মনে পড়েছে কাল রাত্রেই। কিন্তু এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল। অন্য কোনো চিন্তার অবকাশ ছিল না। আবার অতীত কথা, রিনার কথা মনে পড়েছে। হে ঈশ্বর! মার্জনা করো তুমি। যাকে ভালোবাসে মানুষ—তাকে ভুলতে পারে না। পারে না। পারে না।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু রিনাকে ভালোবেসেছিল। রিনাও ভালোবেসেছিল। দুজনের বিরোধের মধ্যে আশ্চর্যভাবে সেতু গড়ে উঠেছিল। ভাবলে আজও মনে হয় পরমাশ্চর্য! রিনা ওকে দেখলেই বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলত, 'ইউ হিদেন!'

কৃষ্ণেন্দু তখন ধর্ম ঈশ্বর কিছুই মানে না, তা হিদেনইজম্। ম্যাটার আর মাইণ্ডের সংজ্ঞাকে মেনে সে নূতন যাত্রা শুরু করেছে। তবু তাকে হিদেন বললে, তার গায়ে লাগত। কিন্তু সে সত্য অর্থে নয়-বলে নয়, গায়ে লাগত এদেশের মানুষ ব'লে। মেয়েটার উপর একটা শোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে বিক্ষুব্ধ আবেগে ঘুরে বেড়াত। সামান্য সুযোগে

বিচিত্র রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসত। এমনি একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

এই ঘটনার মাসখানেক পরে। সেপ্টেম্বরের শেষে, মেডিক্যাল কলেজের ওদের টীম জিতে নিয়ে এল কলেজ কম্পিটিশনের সবথেকে বড়ো শীল্ডটা। সেবারকার খেলায় কৃষ্ণেন্দুই ছিল সবচেয়ে ভালো প্লেয়ার। মেট্রন পলি ব্রাউনের ভারি শখ ছিল খেলা দেখার। কলেজের টীমের খেলা থাকলে সেই অজুহাত নিয়ে সে ঠিক গিয়ে তার শখের হাতপাখা নিয়ে সামনেই চেয়ারে বসত। পাশে থাকত রিনা। কৃষ্ণেন্দু যেন রিনার উপরে শোধ তুলবার জন্যই এমন উন্মাদের মতো দুর্দান্ত বিক্রমে খেলত। রিনা সত্যসত্যই রাগত। কৃষ্ণেন্দুকে হিদেন বলার ঝোঁক তার বাড়তে লাগল। শীল্ড জিতে কলেজে এসে সেদিন ছেলেরা কৃষ্ণেন্দুকে কাঁধে নিয়ে নাচছিল। রিনা বেরিয়ে এল বারান্দায়। হঠাৎ কৃষ্ণেন্দুর কী মনে হল, রিনা হিদেন বলে সম্বোধন করবার আগেই সে চিৎকার করে উঠল, 'জয় কালী!' বলেই জিভ কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। রিনা ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল। ছেলেদের দল হো-হো করে হেসে উঠল।

এরপর, রিনাকে দেখলেই কৃষ্ণেন্দু চিৎকার করে উঠত, 'জয় কালী!'

রিনাও বলত, 'হিদেন!' প্রথম দিন হতভম্ব হয়ে ঘরে ঢুকলেও, পরে আর হতভম্ব হত না রিনা।

আবার ঘটল আর একটি ঘটনা।

মাস কয়েক পর বড়দিনের সময় মিলিটারী স্টুডেন্টদের সোস্যাল ফাংশন হল। তার মধ্যে ছিল কয়েকটা সিলেক্টেড সীন। একটি সীন ছিল 'ওথেলো' থেকে। ওথেলো আর ডেসডিমোনা। 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ মাই সোল' দিয়ে আরম্ভ ডেসডিমোনাকে হত্যার দৃশ্য। জন ক্লেটন করেছিল ওথেলো, এবং কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ডেসডিমোনার অংশে অভিনয় করেছিল রিনা। ক্লেটনের ওথেলো ভালো হয় নি, কিন্তু চেহারা ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য এবং বিশেষ করে সহজ অভিনয়ের জন্য রিনার অভিনয়ের প্রশংসা হয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু দেখেছিল এই অভিনয়। এর পর এই তার খেয়াল হল, সে ওথেলো নাটকের ওই দৃশ্যটা মুখস্থ করে ফেললে এবং যখন-তখন 'ইট ইজ দি কজ, ইট দি কজ' বলে সলিলকিটুকু আবৃত্তি শুরু করে দিত। রিনা তিক্ত হয়ে এরপর কৃষ্ণেন্দুর সামনে বের হওয়া ছেড়ে দিলে। তবুও কৃষ্ণেন্দু শূন্য বারান্দার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করত, 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ!'

এর পর হঠাৎ একটি ঘটনায় সব কিছু উল্টে গেল। নাটকীয় ভাবে নয়—অত্যন্ত সাধারণ ভাবে—স্বচ্ছন্দ গতিতে। আগে সেই পরিবর্তনের সময় কৃষ্ণেন্দুর কাছে বিস্ময়কর বলে অবশ্যই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ—?

বনপথে চলতে চলতে প্রসন্ন ম্লান হাসি ফুটে উঠল কৃষ্ণস্বামীর মুখে। কিসের বিস্ময়, কোথায় বিস্ময়ের কারণ? মানুষের মধ্যে প্রাণ-ধর্মের এই স্বভাব। এই তো ঈশ্বরের তপস্যা মানুষের দেহের বেদীতে। গুণের আসরে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা যেমন তার স্বভাব, প্রতিযোগিতার পর গুণগ্রাহিতাও তার তেমনি প্রকৃতি-ধর্ম।

মাস আষ্টেক পর পরের বছর ফুটবলের সময়। ইন্টারভারসিটি শীল্ড কম্পিটিশনে মেডিক্যাল টীম যাবার কথা ঠিক হল — আই. এস. সি. এবং এম. বি. কোর্সের ছেলেদের মিলিত টীম। ক্রেটন এবং কৃষ্ণেন্দু দুজনেই নির্বাচিত হল। সিলেকশন হওয়ার পরই দুজনের দেখা হল সিঁড়িতে। দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যালো!' দুজনেই একসঙ্গে হাত বাড়ালে, পরস্পরের হাত চেপে ধরলে। দুজনেই বললে, 'তুমি থাকলে আমি ভাবি না।'

টুর্নামেন্টে ওরা ফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিল, ফাইনালে হারল। খেলাটা হয়েছিল বম্বেতে। ফিরে যখন এল, তখন ওরা দুজনে দুজনের অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

ফিরে এসে ক্রেটনই ওকে নিয়ে গেল পলি ব্রাউনের বাড়ি। চল এবার রিনার সঙ্গে মিটমাট কর। সে বেচারার অত্যন্ত দুঃখ সে তোমার কাছে হেরেছে। পলি ব্রাউন ভারি খুশী হয়েছিল। এই দুর্দান্ত ছেলেটির কলেজে সর্বজনপ্রিয়তা দেখে আশ্চর্য হত। এবং কলেজের সর্বজন থেকে সেও আলাদা নয়। সে তাকে সংবর্ধনা করে বলেছিল, 'ওথেলো, দি টায়রেলেন্ট মুর।' তারপরেই হেসে বলেছিল, 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ। তুমি ওটা বেশ বল। আমার ভালো লাগে। কিন্তু রিনাকে চটাবার জন্য কেন বল? ইউ নটি বয়!'

রিনা তখন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। ক্রেটন বলেছিল, 'লেট বাইগন্স বি বাইগন্স। শেক হাণ্ডস ইউ টু, অ্যাণ্ড বি ফ্রেণ্ডস।'

কৃষ্ণেন্দু এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'আমি ক্ষমা চাইছি।'

রিনা হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণেন্দুর হাত ধরে বলেছিল, 'উই আর ফ্রেণ্ডস।'

আলাপের মধ্যে হঠাৎ পলি ব্রাউন এসে বলেছিল, 'ওটা তুমি একবার আবৃত্তি করো। 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ।' ওইটে। সত্যি ওটা তুমি ভালো কর। তোমার হোর্স ভয়েসে অ্যাণ্ড—অ্যাণ্ড—ইউ ক্যান পুট লাইভলী ইমোশন ইন ইট।'

রিনা বলেছিল, 'অ্যাণ্ড—' বলেই চুপ করেছিল।

ক্রেটন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী?'

রিনা হেসে বলেছিল, 'তোমার থেকে অনেকটা বেশী ওথেলোর মতো। টল, মোর মুরলাইক, ইজ' নট ইট?'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, কিন্তু তোমার চেয়ে ভালো ডেসডিমোনা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমার মনে হয় পারফেক্ট।'

ক্রেটন বলেছিল, 'তা হলে তোমরা দুজনে গোটা সীনটা করো। লেট আস এনজয় অ্যাণ্ড মেক দি মেমরি অব দি ফার্স্ট মীটিং আনফরগেটেব্‌ল। থাক চিরস্মরণীয় হয়ে আজকের এই পরিচয়ের স্মৃতি।

জেমস ব্রাউন একবার এসেই চলে গিয়েছিল। লোকটা অদ্ভুত। অদ্ভুত ঠিক নয়, ও সেই সব ইংরেজের একজন, যারা এদেশের এক-একজন ছোটখাট লাট-সাহেব। কালা মানুষদের সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না। এবং গোঁড়া ক্রিশ্চান হিসেবে হিদেনদের ছুঁলে হাত ধোয়। নিঃস্ব, তাই নিঃশব্দে থাকে।

রিনা ব্রাউন সাহেবের ঘরের দিকে তাকিয়েই আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু ক্লেটন ব্রাউনের কাছে গিয়ে অনুমতি আদায় করে এনেছিল। ব্রাউন সাহেব প্রশ্ন করেছিল, 'শুধু ভালো ছেলে, কলেজে পড়ে না ভালো ঘরের ছেলে!'

ক্লেটন বলেছিল, 'বোথ।'

'তা হলে অবশ্য অনুমতি দিতে পারি। উঁচু জাত? ওদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। হি ইজ এ গুপ্টা। উই হ্যাভ সো মেনি গুপ্টাজ অ্যামঙস্ট আওয়ার প্রফেসরস।'

'ইয়েস, ইয়েস, আই নো। গুপ্টাজ আই নো। ইয়েস।'

অনুমতি দিয়েছিল ব্রাউন সাহেব।

ওরা গোটা সীনটাই আবৃত্তি করেছিল। একটা কাণ্ড ঘটেছিল শেষের দিকে। ডেস-ডিমোনাকে হত্যা করবার সময় সে যখন 'ইট ইজ টু লেট' বলে তার গলা টিপে ধরার অভিনয় করছে, রিনা যখন 'ওঃ লর্ড লর্ড লর্ড' বলে কাতর চিৎকার করছে, তখন সেই মুহূর্তে সেই আয়াটি 'রিনা রিনা' বলে আর্তনাদ করে ঘরে এসে ঢুকে কৃষ্ণেন্দুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে ধরেছিল—ছোড়্যা দাও। ছোড়্যা দাও! ই— যেন একটা বিশ্বস্ত কুকুর হিংস্র হয়ে উঠেছে।

চমকে উঠে সরে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণেন্দু।

রিনা তাড়াতাড়ি উঠে বসে ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু, রিনা সান্ত্বনা দিয়েছিল পরিষ্কার মেদিনীপুর-মানভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের খাস বাঙলা-ভাষায়।

'মিছা-মিছা ; ই সব মিছামিছি ; ই সব থিয়েটারের বক্তৃতা!'

ও ঘর থেকে জেমস ব্রাউন এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। ভয়ার্ত পশুর মতো স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে-মেয়েটা শুদ্ধ মূক হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত মূক থেকে চিৎকার করে উঠেছিল,—আমার—আমার—মেয়েটাকে—।

'নিকালো, ই ঘরসে নিকালো ইউ বিচ, গেট আউট!' ব্রাউন ফেটে পড়েছিল রাগে। কৃষ্ণেন্দু একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। মেয়েটির হাত ধরে রিনাই এ ঘর থেকে ওর ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। পলি ব্রাউন সামলেছিল জেমস ব্রাউনকে।

ক্লেটন হেসে বলেছিল কৃষ্ণেন্দুকে; 'দ্যাট নেটিভ ওম্যান রিনাকে এক মাস বয়স থেকে মানুষ করেছে। অত্যন্ত ভালোবাসে রিনাকে। ওকে অপছন্দ করেন না—বাট, ইউ সি, হি ডাজ নট লাইক ইট। মিস্টার ব্রাউন অকৃতজ্ঞ নন, তিনি ওকে তাড়িয়ে দিতে চান না ; দেনও নি ; কিন্তু ওই যে মায়ের মতো ভালোবাসতে চায়, নিজের মেয়ের মতো দেখতে চায়, সে উনি বরদাস্ত করতে পারেন না। ইউ নো, মিস্টার ব্রাউন ইজ এ পাক্কা সাহিব। শুধু তাই নয়, ব্রাউন একজন গোঁড়া ক্রিশ্চানও বটে।' সেই মুহূর্তেই রিনা ফিরে এসেছিল।

রিনার সে-ছবি এখনও মনে আছে। একবার তাকাচ্ছিল, যে ঘরে ওই মমতায় আবদ্ধ, মূক পশুর মতো তার ওই ধাত্রী আছে সেই ঘরের দিকে, আবার তাকাচ্ছিল বাপের দিকে। হঠাৎ সে এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরের দিকে।

পলি ব্রাউন ফিরে এসে কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত গুপ্টা। তুমি এটা মনে

রেখো না। তুমি জান না। মেয়েটা বড়ো আনক্লীন ইন মাইণ্ড। এবং কিছুটা আউট অব মাইণ্ড। পাগল খানিকটা। রিনা ঘুমোয় আর ও তুক-তাক করে। একটু চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'খুব খুশী হয়েছি। আর কি সুন্দর আবৃত্তি করলে তুমি! আবার এসো। প্লীজ। প্লীজ, ডু কাম।'

* * *

ক্লেটনের সঙ্গে ওর প্রীতির সম্পর্কটাই ছিল গায়ের জোরের ব্যাপার নিয়ে। ওদের হোস্টেলে গিয়েই পাঞ্জা কষা থেকে শুরু হত। ঘরে ঢুকেই হাতখানা বাড়িয়ে বলত, 'কাম অন্!'

তারপর নানান রকমের প্রতিযোগিতা চলত। এবং যেটি বিস্ময়কর মনে হত ক্লেটনের কাছে, সেইটি সে পলি ব্রাউনের বাড়িতে কৃষ্ণেন্দুকে টেনে নিয়ে গিয়ে খাবার করিয়ে তবে ছাড়ত।

শুকনো নারকেল শুধু হাতের জোরে ছাড়িয়ে মাথায় ঠুকে ভেঙে খাওয়া দেখে প্রশ্ন করেছিল, 'পাথর?'

'না। কাটলে রক্ত পড়ে।' হেসে বলেছিল কৃষ্ণেন্দু।

একদিন পঞ্চাশটা সিদ্ধ ডিম খাওয়ার পরিচয়ও দিয়ে আসতে হল ব্রাউনদের বাড়িতে।

এরই মধ্যে কখন যে রিনা এবং সে, বান্ধবী এবং বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল, তার সঠিক দিনটি নির্ণয় করা কঠিন। তিলে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল এই বন্ধুত্ব, হঠাৎ কোনো এক-দিনের আকস্মিক ঘটনার ফলে বা এক-দিনের আকস্মিক কোনো আবেগের উচ্ছ্বাসে নয়। অত্যন্ত সহজভাবে ও স্বচ্ছন্দ গতিতে। এই ফুল ফোটার মতো।

হ্যাঁ, ফুল ফোটার মতো। ফুল যেদিন ফোটে, সেদিন সূর্যোদয়ের আগেও তার বর্ণ-গন্ধের ঘোষণা কাউকে ডাক দেয় না। যখন ফোটে, তখন তার বর্ণশোভা গন্ধের নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি করেই পরস্পরকে ওরা জানলে একদিন।

ক্লেটন দু-বছর ফেল করে যখন পাশ করে বের হল, তখন কৃষ্ণেন্দুর সিক্সথ্ ইয়ার। কৃষ্ণেন্দু তখন শুধু খেলার আসরেই খ্যাতিমান নয়, শুধু দুর্দান্তপনাতেই সর্বজনপরিচিত নয়, বিদ্যার ক্ষেত্রেও তার জীবন-দীপ্তি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। চিকিৎসার কয়েকটা পদ্ধতিতে তখনই সে পাকা চিকিৎসকের মতো নিপুণ হয়েছে। কলেরায় স্যালাইন ইনজেকশন এবং ইনট্রাভেনাস ইনজেকশনে সে পটুত্ব অর্জন করেছে। সে-পটুত্ব এমন যে, কলেরা কেসের 'কলে' নাম-করা ডাক্তারেরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। ইনজেকশন সে-ই দেয়। ডাক্তার উপস্থিত থাকেন। তাতে তার উপার্জন হয়। সালভারসন ইনজেকশন দেবার জন্য তো তখন সে সদ্য-পাশ-করা বন্ধু ডাক্তারের নামে একটি চেম্বার খুলেই বসেছে। এতে ক্লেটন তাকে সাহায্য করেছিল অনেক। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মহলে ওকে পরিচিত করে দিয়েছিল। ক্লেটন ওকে তখন স্যুট পরা ধরিয়েছে। ধুতি-কামিজ-পরা ডাক্তারের কাছে এরা আসতে চায় না। অর্থের অভাব হত না। নিজেই রোজগার করত।

ক্লেটন পাশ করল। ওদের পাশ করলেই চাকরি। নূতন চাকরি নিয়ে চলে যাবে। মিলিটারী স্টুডেণ্টরা বিদায়ী দলকে অভিনন্দন জানালে। ক্লেটনের উদ্যোগেই ওথেলোর সেই

দৃশ্যটি অভিনীত হল। তারই প্রস্তাবে কৃষ্ণেন্দু ওথেলো ডেসডিমোনা রিনা।

ওই অভিনয়ের মধ্যেই কৃষ্ণেন্দু আবেগপ্রখর চাপা গলায় যখন ঘুমন্ত ডেসডিমোনার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আই উইল শ্মেল দী অন দী ট্রী—' তখনই সে যেন আত্মহারা হয়ে গেল। সে হিন্দু, সে কালা আদমি, অভিনয়ে ক্রেটনের আগ্রহে ওথেলোর পার্ট পেয়ে থাকলেও ডেসডিমোনা রিনা ব্রাউনকে চুম্বনের অধিকার তার ছিল না। আত্মহারা আবেগ সত্ত্বেও ওখানটায় সংবরণ করলে নিজেকে, কিন্তু—

So sweet was ne'er so fatal. I must weep.

But they are cruel tears. The sorrow's heavenly.

বলতে বলতে তার বড়ো চোখ দুটি থেকে জলের ধারা নেমে এল। কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হয়ে আসছিল, কোন রকমে সে শেষ করলে,

Its strikes where it doth love. She wakes.

রিনা ব্রাউন চোখ বুজেও অনুভব করছিল সেই আবেগের স্পর্শ। চোখ মেলে দেখলে কৃষ্ণেন্দুর চোখে জলের ধারা। সে অভিভূত হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে সে অনুভব করলে আরও কিছু। প্রখর স্পষ্ট হয়তো নয়, শুধু অন্ধকারাবৃতের মতো অব্যক্ত নয়। কুয়াশার মধ্যে বর্ণের আভাসের মতো অস্পষ্ট। অস্পষ্ট থাকলেও অজ্ঞাত থাকে নি পরস্পরের কাছে। এরপর দুজনের দেখা হলেই একটা কম্পন বুকের মধ্যে অনুভব করত।

রিনা কৃষ্ণেন্দুকে পরে বলেছিল কথাটা। রিনা প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছিল না, কৃষ্ণেন্দুই যুগিয়ে দিয়েছিল। 'তুমি বলছ অন্ধকার কেটে গিয়ে কুয়াশার মধ্যে রামধনুর রঙের আভাসের মতো? জান তো কালো কোনো রঙ নয়, কালো হল রঙের অভাব, বর্ণশূন্যতা।'

রিনা বলেছিল, 'দ্যাটস ইট।' বলেছিল, 'তারপর তুমি যখন বললে, থিঙ্ক অব দাই সিনস, আমি বললাম—দে আর লাভস আই বেয়ার টু ইউ, সেই মুহূর্তে আমারও চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।'

অভিনয়ের শেষে কেউ কারুর সঙ্গে কোন কথা না বলেই চলে গিয়েছিল। পরস্পরের সঙ্গে দেখা করে নি। সাতদিন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণেন্দু কেমন হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন আগে লেখা বাবার চিঠিখানা বার বার পড়ত আর ভাবত। বাবা কলকাতায় এসেছিলেন হঠাৎ। এক মাসের উপর সে চিঠি দেয় নি। চিন্তিত হয়ে তিনি চলে এসেছিলেন। আরও একটা কারণ ছিল। ওদের গ্রামের হরিবিলাস বসু কলকাতায় থাকেন, তিনি দেশে গিয়ে বলেছিলেন, 'ছেলে যে সায়েব হয়ে গেল শ্যামসুন্দরকাকা। কোটপ্যান্ট পরে সায়েব-মেমের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেস্টুরেন্টে টেবিলে বসে খাচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।'

বাবা পরদিনই কলকাতায় এসে ধর্মতলার চেম্বারে উঠেছিলেন। ওই ঠিকানাই সে ইদানীং ব্যবহার করত মেসের ঠিকানার পরিবর্তে। বোধ হয় ওর মধ্যে প্রতিষ্ঠার একটা প্রচ্ছন্ন মোহ বা অহংকার ছিল। সুবিধে ছিল—চিঠিপত্র পেতে গোলমাল হত না।

'কৃষ্ণেন্দু তখন চেম্বারে একটি ফিরিঙ্গী মেয়েকে ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন দিচ্ছে, তার সঙ্গের

আর একটি মেয়ে বাইরে বসে আছে। আর দুটি রোগী অপেক্ষা করছে। সবই সালভারসনের কেস। এদিক দিয়ে এদের মানসিকতা বৈজ্ঞানিক। এরা লজ্জা করে না। এসে সোজাসুজি বলে, 'ওয়েল ডক, আমার সন্দেহ হচ্ছে, এবং সন্দেহের কারণও আছে যে, আমার খারাপ অসুখ হয়েছে। দেখ তো অনুগ্রহ করে।' এবং যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে চিকিৎসা সুশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা চলে যায়। এদেশের লোক শুধু গরীবই নয় কৃপণও বটে। ডাক্তারের ফি নিয়েও দর করে। ফাঁকিও দেয়।

মেয়েটির ইনজেকশন শেষ করে চেম্বার থেকে বেরিয়েই সে বাবাকে দেখেছিল। মেয়েটি তখনও টেবিলে শুয়ে। বিশ্রাম নিচ্ছে।

'বাবা!' বাবাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল সে।

'হ্যাঁ। এক মাসের উপর আটত্রিশ দিন চিঠি দাও নি। চিন্তিত হয়ে এসেছি।' বাবা তার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে যেন পড়তে চেষ্টা করেছিলেন।

'আমি তো চিঠি দিয়েছি।'

'আমরা তো পাই নি।'

হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, একখানা পত্র লিখেছিল ডাকে দেবার জন্য। চেম্বারে ঢুকে ব্লটিং প্যাডটা তুলে চিঠিখানা বের করেছিল। পরাধীর মতোই চিঠিখানা হাতে নিয়ে বাবার কাছে ফিরে এসে বলেছিল, 'কাজের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম, ফেলা হয় নি।'

বাবা বিচিত্র হাসি হেসেছিলেন। তারপর ও সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন না করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এরা সব?'

'রোগী।'

'রোগী? তুমি—?'

'একজন ডাক্তার বন্ধু চিকিৎসা করেন এখানে। তাঁকে সাহায্য করি। আপনার আশীর্বাদে আমি পাশ-করা ডাক্তারের চেয়ে ভালো ইনজেকশন দিই।'

এই সময়ে এসেছিল ব্রেটন এবং রিনা। 'হালো ম্যান—'

কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি তার বাবার পরিচয় দিয়ে বলেছিল, 'ব্রেটন ইনি আমার বাবা। বাবা, ইনি আমার বন্ধু। আমাদের কলেজেই পড়েন, জন ব্রেটন, আর ইনি রিনা ব্রাউন। বন্ধু আমার।'

'গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান!' ব্রেটন সত্যিই খুশী হয়ে বেশ সম্মান দেখিয়ে কথা বলেছিল।

রিনা একদৃষ্টে তাঁকে দেখেছিল।

বাবা আর থাকেন নি—চলে গিয়েছিলেন; দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন। কালীঘাটে। তিনি চলে গেলে রিনা বলেছিল, 'হি ইজ এ ট্রু হিন্দু, এ টিপিক্যাল ব্রাহমিন। আমার ভারি ভালো লাগলো। কী মিষ্টি কথা! অ্যাণ্ড ইউ, টারবুলেন্ট মুর, এ রায়ট র, হিজ সন!' তারপরই বলেছিল, 'কি নাম বল তো সেই ব্রাহ্মণের ছেলের—যে বিদ্রোহ করে দেবতা ভেঙেছিল? ইয়েস। কালাপাহাড়—ব্ল্যাক মাউন্টেন!'

হেসেছিল কৃষ্ণেন্দু। কৃষ্ণেন্দুই ওদের কাছে কালাপাহাড়ের গল্প বলেছে।

পরদিন হাওড়া স্টেশনে সে বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিল। বাবা কথা কমই বলেন, ট্রেনে চড়ে একটি কথাও বলেন নি। ট্রেন ছাড়বার সময় শুধু বলেছিলেন, 'সাবধানে চলো।'

হাসি পেয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর। সাবধানে চলতে হবে? কেন? বাড়ি গিয়ে চিঠি লিখেছিলেন বাবা। লিখেছিলেন, 'ইচ্ছা ছিল আসিবার সময় তোমার সম্মুখেই সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আসি কিন্তু 'সাবধানে চলিবে' এই কথা ছাড়া কোনো কথা বলিতে পারি নাই। পত্রেও সকল কথা খুলিয়া লিখিতে বসিয়াও লিপিতে কেমন যেন বাধা অনুভব করিতেছি। তোমার মাকেও এসব কথা বলিতে পারিতেছি না। তাহা হইতে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। মনে হইতেছে উচিত হইবে না। তুমি উপযুক্ত পুত্র। বিদ্যাবুদ্ধিতে তুমি যখন সুখ্যাতি পাইতেছ, তখন কী করিয়া মন্দ বলিব? কিন্তু তবু বলিতেছি, আমার ভালো লাগিল না। মনে হইতেছে, ভালো হইবে না। যেন বড়ো বেশী আগাইয়া যাইতেছ। আমাদের শাস্ত্রে বলে, উপনয়নের সময় তিন পায়ের বেশী অগ্রসর হইতে নাই। তাহাতে আর ফিরিবার উপায় থাকে না। আমার মনে হইতেছে, তিন পায়ের বেশীই অগ্রসর হইয়াছ তুমি। অপর দিকে বলে, সাত পা একসঙ্গে পথ হাঁটিলে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম, কলিকাতায় তুমি অনেক পা অনেকের সঙ্গে হাঁটিয়াছ। সাত পা কিনা জানি না। সপ্তপদ পূর্ণ না হইয়া থাকিলে আর আগাইও না। গোবিন্দ তোমাকে রক্ষা করুন। সপ্তপদ পূর্ণ হইয়া থাকিলে তিনি যেন আর দুইপদ তোমাকে আগাইয়া দেন।'

চিঠি পেয়েও কৃষ্ণেন্দু হেসেছিল। বাবার অমূলক আশঙ্কায় না হেসে করবে কী? আর আশঙ্কা অমূলক না হলে পাথরের গোবিন্দের রক্ষা করবার শক্তিই বা কোথায়? কিন্তু এই ঘটনায়, অর্থাৎ ব্রেটনদের বিদায়-উৎসব উপলক্ষে ওথেলোর অভিনয়ের মধ্যে আকস্মিকভাবে নিজের যে প্রকাশ তার নিজের কাছে ঘটল, তারপর আবার চিঠিখানা খুলে বার বার না-পড়ে সে পারে নি। কয়েকদিন পরে পেয়েছিল মায়ের চিঠি। তার অভয়দায়িনী উদারদৃষ্টি মা। মা লিখেছেন—'তোর বাবা ভয় পেয়েছেন। তিনি রাগ করলে আমি বুঝতাম হয়তো সহ্য করতে পারছেন না তোর সত্যকে, বুঝতে পারছেন না তোর ন্যায়কে—তাই রাগ করছেন। কিন্তু ভয় যখন পেয়েছেন তখন যে চিন্তা আমারও হচ্ছে কালো। ওরে তুই নিজে হিসেব করে দেখিস।' তা সে করেছিল—নিজেই হিসেব করেছিল, ক-পা সে ছেড়ে এসেছে, ক-পা এগিয়েছে রিনার সঙ্গে। হিসাব করতে বসে আবার মনের জোর ফিরে পেয়েছিল।

ইস্কুল এক পা, সেন্ট জেভিয়ার্স এক পা, মেডিকেল কলেজ এক পা। তিন পা হয়ে গেছে। সে জানে উপনয়নের সময় দু-পায়ের পর শেষ পা ফেলার সময় পিতা বা উপনয়ন-দাতাই পাখানি ধরে পিছিয়ে দেন। ঘরে সংসারী হয়ে আবদ্ধ হয়, বদ্ধ অবস্থাতেই জীবন কেটে যায়। মানুষের প্রাণ বদ্ধ জলার মতো বাষ্প হয়ে পুনর্জন্মের জলধারা হয়ে ঝরে প্রবাহের কামনা করে। সে যদি নদীর স্রোতের গতি পেয়ে থাকে, তবে তাতে খেদের কি আছে? হ্যাঁ সে গতি সত্যিই সে পেয়েছে, অনেকদূর চলে এসেছে। তাকে রক্ষা করবার জন্য গোবিন্দের প্রয়োজন নেই। পাথরের বিগ্রহ গোবিন্দের নাগালের বাইরে সে।

গোবিন্দ সজীব সত্য হলে সে তাকে মানবে। তার সামনে গিয়ে তবে দাঁড়াবে।

কল্পনার গোবিন্দকে সে তো মানে না! বিজ্ঞানের তথ্যগুলি যে তার সম্মুখে নতুন পথ খুলে দিয়েছে। তার কোনো পথই তো পুরাণের বৈকুণ্ঠের দিকে যায় নি।

আর রিনার সঙ্গে? কত পদ? কত পদ হল?

যত পদই হোক—সপ্তপদ হয় নি। এবং ওপথে আর পদক্ষেপ করবে না স্থির করেছিল, কারণ—রিনা, ক্লেটনের মনোনীত বধূ। ক্লেটন তার বন্ধু! এখানে সে বাবা-মার চিঠি না-মেনেও সাবধান হল। পরদিন থেকে রিনাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিলে। রিনাই চিঠি লিখলে। ও তার জবাব দিলে, 'জনি ছিল, জনির সঙ্গে যেতাম। জনি চলে গেছে। আমার সামনে পরীক্ষাও বটে। জনি ফিরে এলে যাব। আমার দোষ নিয়ো না।' জন ক্লেটন চলে গেছে মিলিটারী ট্রেনিংয়ে।

* * *

'বাবাসাহেব!' অতীতকালের স্মৃতিকথাকে ডুবিয়ে দিয়ে বর্তমান যেন কথা কয়ে উঠল। কে তাঁকে ডাকলে।

'কে!' থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী। কারুর অসুখ নাকি?

'ই সকালে পয়দলে কুথাকে যাবেন গো? সাইকেল কী হল?'

কোনো গ্রাম থেকে মাথায় কলসী এবং পাটের শাকের বোঝা নিয়ে কয়েকজন নায়েক চলেছে বিষ্ণুপুরের দিকে। পথে বাবাসাহেবকে দেখে স্মিতহাস্যের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো প্রশ্ন করছে।

পথ ভুল হয়ে গেছে কৃষ্ণস্বামীর। বনের মধ্যে পথ-ভুল একটা সাধারণ ব্যাপার।

নিজের আস্তানার পথ ফেলে অনেকটা চলে এসেছেন। বন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। বন শেষ হলেই একেবারে বিষ্ণুপুরের প্রান্তভাগে উঠবেন। একেবারে যমুনা বাঁধের কাছাকাছি।

থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী।

ফিরবেন এখান থেকে? না।

একবার যাবেন লাল বাঁধের ধারে। লাল-বাঁধের পাড়ের উপর সেই পাথরখানাকে স্পর্শ করে যাবেন, যেখানার উপর রামকৃষ্ণ পরমহংস বসে বিশ্রাম করেছিলেন।

মনের মধ্যে অবাধ্য স্মৃতির পীড়ন আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

মুছে যাক, অতীত কালের সব স্মৃতি মুছে যাক। পরশপাথরের ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়; ওই বৈরাগীশ্রেষ্ঠের আসনখানার স্পর্শে তাঁর মন বৈরাগ্যে ভরে উঠুক। বৈরাগ্যের গেরুয়ার ছাপে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার রামধনুর সাত রঙ নিঃশেষে ঢেকে থাক।

পাঁচ

মহাপুরুষের স্পর্শ মহাপুরুষের সঙ্গেই চলে যায়। অন্তত বস্তুজগতে থাকে না। বস্তুজগতের ধরে রাখবার শক্তি নেই, থাকলে মিশরের ফারাওদের মমিদের কল্যাণেই পুরনো মিশর বেঁচে থাকত। বুদ্ধের অস্থির উপর স্তূপের কল্যাণে ভারতবর্ষে সকল দুঃখ দূরে যেত। ঈশ্বরের পুত্রের আবির্ভাবের পর প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে মিলে ইয়োরোপ জুড়ে এক অপরূপ প্রেমের রাজ্য গড়ে উঠত। এমন ভাবে ইয়োরোপই বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে উঠত না।

থাকে মহাপুরুষের স্মৃতি আর বাণী। মানুষের মনে মনে বয়ে চলে,—নদীর মতো। কিন্তু মনে যখন সংশয়ের ঝড় ওঠে—কোথা কোন্ দূর দিগন্ত থেকে বালি এসে জমা হয়, বা প্রখরতম গ্রীষ্ম জেগে ওঠে—মরুভূমি হয়ে ওঠে মন, তখন সে-নদীর স্রোতও শুকিয়ে যায়। শুষে গিয়ে, উত্তপ্ত বালুর চড়ার মতো হা-হা করে।

ঠিক তেমনি ভাবে কৃষ্ণস্বামীর মন প্রখর তৃষ্ণায় হাহাকার করছে। কোনোক্রমেই তিনি রিনা ব্রাউনের কথা ভুলতে পারছেন না। কী করে পারবেন? এই রিনা দেখে সেই রিনাকে ভুলবেন কী করে? মরুভূমির মধ্যে যে নদীটি আগে বইত—তার স্মৃতি কি ভোলা যায়?

বিষ্ণুপুরের লাল-বাঁধের ধারে পাথরখানিকে ছুঁয়ে বসেই ভাবছিলেন কৃষ্ণস্বামী।

মনে পড়ছে রিনার সেই মূর্তিমতী সান্ত্বনার মতো মূর্তি। দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ ঘেরের মধ্যে জলভরা বড়ো-বড়ো দুটি চোখ। সজল চোখে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ইউ আর হার্টলেস, ইউ আর হার্টলেস কৃষ্ণেন্দু। আই ডিড নট নো। নেভার থট দ্যাট ইভন্!' কথাটা রিনা বলেছিল—কৃষ্ণেন্দুর মাতৃবিয়োগের পর। ছবিটা জলজল করছে।

মা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছিলেন। কৃষ্ণেন্দু টেলিগ্রাম পেয়ে গিয়ে তাঁকে দেখতে পায় নি; পনের-কুড়ি দিন পর শ্রাদ্ধশান্তি সেরে কামানো মাথা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিল। বন্ধুরা জানত। কিন্তু রিনাকে বলে যাবার কথা মনে হয় নি। কারণ এর মধ্যে কয়েক মাসেই খানিকটা দূরে চলে এসেছিল সে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় মনোজগতে রিনার কাছ থেকে দূরে সরেছিল সে সুকৌশলে। ডাক্তার সে। একালের ডাক্তারিতে মানসতত্ত্বও পড়তে হয়। একনাগাড়ে নব্বুই দিন মনকে বেঁধে রাখলে, দূরে সরিয়ে রাখলে মনের আকর্ষণের সূত্র ক্ষীণ-জীর্ণ হয়। বন্ধুর বধূ সম্পর্কে আসক্তিহীন হবার জন্যই সে সংকল্প করে তা-ই করেছিল। রিনা ক্লেটনের মনোনীতা। তারও বাবা-মা আছেন। হাসপাতালে পলি ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হত, তার সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু তাও যথাসাধ্য কম, রিনার কথা তুলতই না। মাতৃশ্রাদ্ধ সেরে ফেরার পর তার কামানো মাথা দেখে পলি ব্রাউন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কী হয়েছে কৃষ্ণেন্দু? এনি মিস্হাপ?'

'আমার মা—'

'মারা গেছেন? বাবা-মা মারা গেলে তোমরা মাথা কামাও?'

'হ্যাঁ মিসেস ব্রাউন। আমার মা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। আমি দেখতেও পাই নি।'

পলি ব্রাউন পরমাত্মীয়ার মতোই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল। অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। সন্ধ্যায় সে ধর্মতলার বন্ধুর চেম্বারে বসে আছে, এমন সময় এল রিনা। চোখে জল নিয়ে সে তাকে তিরস্কার করে অনুযোগ জানালে, 'তুমি হৃদয়হীন কৃষ্ণেন্দু। আমি জানতাম না। ভাবি নি কখনও।'

'বোসো রিনা।'

'না। এই কটা কথাই বলতে এসেছিলাম। তোমার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেদিন একটা খবরও দাও নি? এত পর ভেবেছ?'

তার হাত ধরে তাকে খাটকে কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি।'

তখন বসেছিল রিনা। সেদিন শুধু তার মায়ের কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল এবং কৃষ্ণেন্দু সত্যসত্যই কেঁদেছিল, 'আজকের কথা আমার মনে অক্ষয় হয়ে রইল রিনা। তোমার পবিত্র হৃদয় স্বর্গের মতো। তার স্পর্শে আমার মন জুড়িয়ে গেল।'

একটুখানি হাসি ফুটে উঠেছিল রিনার মুখে। বেদনায় ম্লান, কিন্তু শান্ত। বলেছিল, 'সত্যি, মায়ের স্নেহ আমি কখনও পাই নি কৃষ্ণেন্দু। মাম্মি পলি আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু তার চেয়েও গাঢ় ভালোবাসার স্বাদ পাই আমি কুন্তীর কাছে। ভাবি, ও শুধু আমাকে মানুষ করেছে। আমার আয়া। তাহলে গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহের স্বাদ কেমন?' রিনা চলে গেলে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে ছিল কৃষ্ণেন্দু। এই ঘটনা থেকেই আবার রিনার সঙ্গে যোগসূত্র নতুন হয়ে উঠল। সূত্রটা সূতো ছিল না, কালের সঙ্গে মাত্র কয়েক মাসেই জীর্ণ হয়ে যাবার মতো উপাদানে তৈরী ছিল না। ওটা ছিল সোনার মতো ধাতু থেকে গড়া। হাজার বছর পরেও মাটির তলা থেকে ওঠা সোনার আভরণের মতো হাজার বছর আগের দুটি হৃদয়ের যোগাযোগের সাক্ষ্য দেবে।

খাঁটি সোনা। কোন খাদ ছিল না।

আবার হঠাৎ একদিন। সেদিন হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে, কুন্তী—রিনার আয়া— ছুটে এসে তাকে বললে, 'ডাক্তারবাবু!'

অদ্ভুত তার চোখের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি এমন যে যেন কথা কইতো। বুকের ভিতরে রাগ হোক, হিংসা হোক, ভয় হোক, আতঙ্ক হোক, সে যেন আপনার রূপ নিয়ে স্পষ্ট ফুটে বের হ'ত। কুন্তীর চোখে সেদিন ছিল আশঙ্কা আর আকুতি। দৃষ্টি থেকেই সে বুঝলে কিছু ঘটেছে।

কৃষ্ণেন্দু তখন সদ্য পাশ করেছে। হাউস-সার্জন হয়ে রয়েছে। তার কল্পনা—সে বিলেত যাবে। বছর দুয়েকের মধ্যেই টাকা সে সংগ্রহ করতে পারবে। টাকা তার কিছু আছে। মা তাঁর মৃত্যুকালে গহনাগুলি তাকে দিয়ে গেছেন। শ্রাদ্ধের পর তার বাবা তার হাতে সেগুলি দিয়ে বলেছেন—তুমি নিয়ে যাও। রাখ। আমার খরচের হাত। পাশ করে তুমি ডিসপেন্সারি করবে বলেই সে দিয়ে গেছে। তা ছাড়াও কলেরার চিকিৎসায় স্যালাইন

ইনজেকশনে এরই মধ্যে তার খ্যাতি যথেষ্ট হয়েছে এবং সাহস তার অপার। সেদিকে তার উপার্জনের পথ প্রশস্ত। পাশ যতদিন করে নি, ততদিন অন্য ডাক্তারের পিছনে তাকে যেতে হত। এবার সে একলা যাবার অধিকার অর্জন করেছে। এবং এ-দেশের বড়লোকের বাড়িতে দুষ্ট খাবারের প্রবেশাধিকার আজও অবাধ এবং তাদের গণ্ডেপিণ্ডে খাবার প্রবৃত্তিও প্রচণ্ড। কলকাতা শহরে মাছিরও অভাব নেই। ভ্যাকসিনও এরা নেয় না। ওদের বাড়িতে মোটা টাকা উপার্জনের পথ তার অবারিত। ধর্মতলার চেম্বার ছাড়াও চিৎপুর অঞ্চলে একটা চেম্বার করেছে। সালভারসন ইনজেকশনে নাম সব থেকে বেশী। ধর্মতলায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা লজ্জা না-করে চিকিৎসা করায়। চিৎপুর অঞ্চলে, যারা লজ্জা করে সংগোপনে চিকিৎসা করাতে চায়, তাদের জন্য চেম্বার। এখানে চার টাকার জায়গায় আট টাকা ফী। রিনার কথা গোপন অন্তরে আছে কিন্তু তার খবর রাখে না। বিদেশে চলে যেতে চায়।

কুন্তী সভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিল, 'রিনা কাঁদছে ডাক্তারবাবু।'

'কাঁদছে ?'

'ফুলে ফুলে কাঁদছে। সকাল থেকে।'

'কেন ? কী হয়েছে ?'

'জানি না, জনি সাহেবের বাবার কাছ থেকে কী চিঠি এসেছে সাহেবের কাছে। আমি জানি না, ওরা বলছে।'

কৃষ্ণেন্দু না-গিয়ে পারে নি। রিনা সত্যই পড়ে পড়ে কাঁদছিল। কৃষ্ণেন্দু যেতেই সে একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'আমি কী করব কৃষ্ণেন্দু ?' এবং আবার সে ফুলে ফুলে কেঁদে চলেছিল।

জনির বাবা চার্লস ক্লেটন চিঠি লিখেছে ব্রাউন সাহেবকে ; 'আপনার চিঠি জন পেয়েছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি সত্যকারের একজন ইংরেজ এবং ক্রিশ্চান ; আমিও তাই। জনিও ক্রিশ্চানের ছেলে ক্রিশ্চান। রিনাকে বিবাহ করা নিয়ে সে যখন আপনাকে একখানা চিঠি লিখতে উদ্যত হয়েছিল, তখনই আপনার চিঠি সে পায়। জন যে-কথা আপনাদের জানাতে চেয়েছিল, সে-কথা আমি জানাই। যাচাই না হলে প্রেমের ঠিক মূল্য বোঝা যায় না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, রিনার সঙ্গে মেলামেশার স্বরূপকে সে অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছে। বন্ধুত্বকেই সে প্রেম বলে ভুল করেছিল। জন এখানে এসে চাকরি নিয়ে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে তার প্রকৃত ভালবাসার পাত্রীর সন্ধান পেয়েছে। কর্নেল রেমণ্ড আমার পুরনো বন্ধু। পলি তাঁকে জানে। তাঁর মেয়ে এমিলি। এমিলি রেমণ্ড অত্যন্ত ভালো এবং সুন্দরী মেয়ে। তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছে এবং শীঘ্রই তারা স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হবে। এ পুয়োর গার্ল ইন ডিসট্রেস ইজ এ সেক্রেড থিং ; রিনা দুঃখ পেলে তার জন্য আমার গভীর সহানুভূতি রইল। সময়ে সবই সেরে যাবে। রিনার সম্পর্কে যে সত্য আপনি তাকে জানিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি একজন খাঁটি ক্রিশ্চান।'

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। ক্লেটন সম্পর্কে মনে একটা আঘাত পেয়েছিল। একটা

দুরন্ত ক্ষোভ জেগে উঠেছিল তার। সে আজ এখানে থাকলে—। কৃষ্ণেন্দু খোলা জানালা দিয়ে কলকাতার বাড়িগুলোর মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। ক্রেটন এমন পাষণ্ড!

'আই গেভ হিম মাই এভরিথিং কৃষ্ণেন্দু।' রিনা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল এবার!

'রিনা! কেঁদো না। রিনা! লুক অ্যাট মী, ইন মাই ফেস্—রিনা!'

রিনা তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। মৃদু বিষণ্ণ হেসে বলেছিল, 'তুমি যদি আজ আমাকে ওথেলোর মত গলা টিপে মেরে ফেলতে পার কৃষ্ণেন্দু!'

এক মুহূর্তে কী হয়ে গিয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাঁধকে টলতে টলতে হেলে চলে সশব্দে ভেঙে ভূমিসাৎ হতে কেউ দেখেছে? ঠিক তেমনিভাবে বাঁধ ভেঙে পড়ল আর উন্মত্ত জলস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো জীবনের সকল আবেগ যেন মুহূর্তে মুক্তিলাভ করল। 'রিনা—রিনা—আমি তোমাকে ভালবাসি, কথা কটি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অবশ্য সে উন্মাদের মতো রিনার বুকের উপর পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

'রিনা, আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালবাসি, রিনা! রিনা! মাই লাভ। আমার সব। রিনা! আমি তোমাকে ভালবাসি।'

মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে রিনা শুধু বলেছিল, 'কৃষ্ণেন্দু! মাই কৃষ্ণেন্দু!'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, রিনা!'

সে শুধু বলেছিল—'কৃষ্ণেন্দু—মাই কৃষ্ণেন্দু! মাই কৃষ্ণেন্দু!'

তারপর মুখের উপর মুখ রেখে দীর্ঘক্ষণ তারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ পর কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমি আর দেরি করতে চাই না। যত শিগ্গির হয় বিয়ে করতে চাই। কাল এসে আমি তোমার বাবা-মাকে বলব।

পরের দিন কৃষ্ণেন্দু গিয়ে বলেছিল ব্রাউন সাহেবকে।

ব্রাউন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ইউ সি মিস্টার গুপ্ত, আমি একজন ইংরেজ। তার চেয়েও বেশী, আমি একজন ক্রিশ্চান। আমার মেয়ে রিনা অবশ্য একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তার মধ্যে কিছুটা এদেশের রক্ত আছে, কিন্তু সে আমার মেয়ে। আজকালকার দিনের মতো তিন আইনে রেজেস্ট্রি করে বিয়েতে আমি রাজী নই। সেও হবে না। সে আমার চেয়ে বেশী ক্রিশ্চান ধর্মে অনুরাগী তোমাকে আমি জানি। তুমি কৃতী মানুষ। সাহসী এবং সৎ লোক। বিয়েতে আমার অমত নেই, কিন্তু তোমাকে ক্রিশ্চান হতে হবে।'

ক্রিশ্চান হতে হবে! স্তম্ভিত হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দু। এতটা ভাবে নি সে। ধর্ম-সে মানে না। সেখানে ধর্মান্তরের কথা হয়তো কিছুই নয়। তবু একটা যেন প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করলে।

'ভেবে দেখো, ইয়ং ম্যান! কাল এসে উত্তর দিয়ো। কাল না পার কয়েকদিন পর।'

কৃষ্ণেন্দু মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে ফিরছিল। রিনার ঘরের দোরে থমকে দাঁড়িয়েছিল। রিনার দরজা বন্ধ। সে ডেকেছিল, 'রিনা!'

ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তুমি যাও, তুমি যাও। আমি ভাবি নি। আমি এ-কথা ভাবি নি। গো ব্যাক কৃষ্ণেন্দু, গো ব্যাক।'

'রিনা!'

'না! না। না! ফরগেট ইট। গো ব্যাক।'

সে চলে এসেছিল। সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে কুন্তী। সে কাঁদছিল। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বলেছিল, 'রিনা মরে যাবেক—ডাক্তার বাবা—রিনা মরে যাবেক।'

পৃথিবী ঘুরছিল। আকাশ-মাটি, ঘর-বাড়ি, মানুষ—সব যেন পাক খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। একটা অসীম শূন্যতায় ভরে যাচ্ছিল তার মন। সব শূন্য, সব শূন্য। রিনা ছাড়া আজ আর সে পৃথিবীতে বাঁচবার কল্পনা করতে পারে না। ধর্ম? ধর্ম তো সে মানে না। সত্যই মানে না। ঈশ্বরও মানে না। সে মানে নূতন কালের নূতন সত্যকে। ঈশ্বর নেই, এই সত্যই তার কাছে আজ একমাত্র সত্য। ট্রুথ ইজ গড—সত্য যদি ভগবান হয়, তাহলে সব ধর্মই আজ সমান মিথ্যা তার কাছে। তবু একটাকে অবলম্বন করে থাকতে হয়েছে তাকে। সে মানে না, তবু তাকে লোকে বলে হিন্দু বৈদ্য। তাকে কাগজে লিখতে হয়, ফর্ম পূর্ণ করতে হয়। কিন্তু আজ রিনা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য। তার জন্য সে হবে, ক্রিশ্চানই হবে। তার বাবা—!

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠল।

বাবা। তার বাবা! বাবা কি এটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারবেন? কিন্তু ক্রিশ্চান হয়েও কি সে তাঁর সন্তান থাকতে পারবে না? তাঁর ধর্ম নিয়ে তিনি থাকবেন। তাঁর আচার-আচরণ সমস্ত কিছুকে সে আজ শ্রদ্ধা করে, তেমনি করবে। সে তো কোনো ধর্মের আচরণের মধ্যে নিজের জীবন-সত্যকে সন্ধান করবে না, সে সন্ধান করবে তার ধর্ম এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে চিকিৎসক-জীবনের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। তবে কিসের বিরোধ, কিসের সংঘর্ষ? তবে সে ক্রিশ্চান শুধু নামে রিনার জন্য! দূরান্তরেই সে থাকে, বাবা থাকেন গ্রামে। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন! তাকে তাঁর প্রয়োজন কতটুকু? সেবার? সেবা সে করবে। তিনি ছোঁবেন না? তাঁকে ছোঁবেন না, রিনাকে ছোঁবেন না? কেন ছোঁবেন না! কেন?

অর্ধোন্মাদের মতো সে বেরিয়ে এল। তার অন্তর থেকে দেহের অণু-পরমাণু চিৎকার করছিল, "রিনা—রিনা—রিনা!' রিনাকে ভিন্ন সে বাঁচতে পারে না। এ তার দেহলালসা নয়। সে বার বার পরীক্ষা করেছে। তার চেয়ে বেশি কিছু। অনেক অনেক বেশী।

হাসপাতাল থেকে শরীর অসুস্থ বলে সে চলে এল। ছোটো একটা ব্যাগে সামান্য কটা জিনিস নিয়ে হাওড়ায় ট্রেনে চেপে বসল। বাড়ি পৌঁছে দাঁড়াল বাবার সামনে।

'তুমি হঠাৎ!' বাবা চমকে উঠলেন। এ কি চেহারা?

'আপনার কাছে এসেছি। অনুমতি চাইতে এসেছি। আমি একটি ক্রিশ্চান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

বাবা চমকে উঠলেন না। চিৎকার করলেন না। তার মুখের দিকে চেয়ে অভ্যাসমতো

শান্তভাবেই বললেন, 'এ আমি জানতাম।'

বাবার পা দুটো ধরে উপুড় হয়ে পড়ে কৃষ্ণেন্দু উন্মাদের মতো বলেছিল, 'আপনি বলুন।'

বাবা বলেছিলেন, 'তুমি উন্মাদ। নইলে আমার পায়ে ধরে লজ্জাহীন হয়ে এ-কথা বলতে পারতে না যে একটি ক্রিশ্চান মেয়ের জন্য আমার ধর্ম তুমি ত্যাগ করবে!'

'তাকে ভিন্ন আমি বাঁচব না।'

'তুমি মরে গেলে আমি আত্মহত্যা করব, এ-কথা আমি বললে মিথ্যা বলা হবে কৃষ্ণেন্দু। আত্মহত্যা আমি করব না, কষ্ট নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু বাঁচব, ভগবানের নাম করে বাঁচব। আমার ধর্মে আত্মহত্যা অধর্ম।'

সে চীৎকার করে উঠেছিল, 'বাবা!'

বাবা শান্ত স্বরে বলেছিলেন, 'উত্তর আমি দিয়েছি কৃষ্ণেন্দু। ওই মেয়েকে বিয়ে করলেও আমার কাছে তুমি মৃত, মেয়েটিকে না পেয়ে মরে গেলেও তাই। আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'আর এগিয়ো না।' তুমি শোন নি। তার সঙ্গে জীবনের অগ্নিসাক্ষী করে সাত পা যদি হেঁটে থাক, তা হলে তোমার উপায় কী?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেসে তিনি গোবিন্দ স্মরণ করেছিলেন! আর কথা বলেন নি, উঠে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণেন্দু যেমন উন্মাদের মতো গিয়েছিল তেমনি উন্মাদের মতোই ফিরে চলে এসেছিল। একেবারে স্টেশনে। বাবা তার একবার ফিরেও ডাকেন নি। কলকাতার পথে মাঝখানে নেমে পড়েছিল, সারারাত বসে ছিল প্ল্যাটফর্মের উপর। ভোর রাত্রে আবার ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরেছিল।

এসে রিনার চিঠি পেয়েছিল, 'না—না—না। এ তুমি কোরো না। কৃষ্ণেন্দু আমি মিনতি করছি। এই আমার শেষ কথা কৃষ্ণেন্দু। আমি আসানসোল যাচ্ছি। যাচ্ছি রেভারেণ্ড আরনেস্টের কাছে। তাঁর কাছে শান্তি আছে। শান্তির জন্যে যাচ্ছি আমি। —রিনা।'

কিন্তু কৃষ্ণেন্দু তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে স্থির করেছে।

রিনাকে তাকে পেতেই হবে। জীবনের যে-কোনো মূল্যে রিনাকে তার চাই। ধর্ম-জাতি-প্রতিষ্ঠা—সব, সব দিতে পারে সে। রিনা জানে না, রেভারেণ্ড আরনেস্ট তাকে শান্তি দিতে পারবেন না। পারেন না। তাঁর ধর্মও পারে না। শান্তি-সুখ-আনন্দ-তৃপ্তি—সব আছে তার তাকে পাওয়ার মধ্যে। জীবনের সুখ, জীবনের শান্তি যেমন ভোগের মধ্যে বস্তুর মধ্যে নেই—তেমনি জীবনকে ছেড়ে দিয়ে আদর্শবাদের বা ধর্মের আচার আচরণ মন্ত্র জপ ত্যাগ বা কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও নেই। শুধু কায়ার মধ্যেও নেই আবার কায়া বাদ দিয়ে মায়ার মধ্যেও নেই। কায়া-মায়া মাখামাখি এই জীবন। জীবনের কাম্য যদি কোথাও থাকে তবে সে জীবনের মধ্যেই আছে। রিনা, তুমি যা চাও তা আমার মধ্যে, আমি যা চাই তা তোমার মধ্যে। রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্বাদ মন মাধুর্য স্নেহ প্রেম সান্ত্বনা, এই তো জীবনের কামনা। এ আছে জীবনের মধ্যেই। আর কোথাও নেই—আর কোথাও নেই।

সে বেরিয়ে পড়েছিল আবার। আর দেরি নয়। একবার গিয়েছিল সে ব্রাউনের কাছে,

পলির কাছে। 'আমি ক্রিশ্চান হওয়া ঠিক করেছি, মিস্টার ব্রাউন।'

ব্রাউন কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর উঠে এসে তার হাত ধরে বলেছিল, 'আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, গুপ্টা।'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আশা করি রিনার সঙ্গে বিয়েতে কোনো অমত থাকবে না আপনার?'

'নিশ্চয়ই না। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দেব। রিনা আঘাতে মর্মাহত হয়ে আসানসোল গেছে। সে থাকলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।'

'আজই আমি যাচ্ছি চার্চে।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, যদি বল।'

ব্রাউনের সাহায্যে তার ধর্মান্তর গ্রহণ অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মান্তর গ্রহণের পর ব্রাউন বলেছিল, 'ইউ রান আপ টু রিনা। ব্রিং হার ব্যাক।'

পলি বলেছিল, 'সে কাঁদতে কাঁদতে গেছে। আসুক সে হাসিমুখে।'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'কাল যাব।'

ফিরে গিয়েছিল তার বাসায়। তার আগের দিন সে নতুন বাসা করেছে ধর্মতলায়। রিনাকে নিয়ে সংসার পাতবার মতো বাসা। যেখানে ছিল, ক্রিশ্চান হবার পর আর সেখানে থাকতে চায় নি। নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দেবে প্রতিবেশীরা। মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল। ধর্ম যদি ঈশ্বর দেয়, তবে এমন অনুদার কেন? প্রেমহীন করে কেন মানুষকে? এক মুহূর্তে এতকালের প্রীতি স্নেহ সব মুছে গেল? সব মুছে গেল? ঈশ্বর কি প্রেমহীন, প্রীতিহীন, স্নেহহীন? সে কি বিদ্বেষপরায়ণ? সে কি আঘাত করে? মনটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম সে মানে না। ঈশ্বরকে সে নেই বলেই ধ্রুব জানে। তবু হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে কেমন যেন হয়ে গেল মনটা।

সারাটা রাত বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে রইল। নিউ টেস্টামেন্টখানা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। মন লাগল না। রিনার ছবি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মন তখন আবার উৎসাহে ভরে উঠেছে। সারা রাত রিনার সঙ্গে বিয়ের স্বপ্ন দেখেছে। সে উঠল। আসানসোল! আসানসোলে যাবে সে। রিনা। সকালের রোদ যেন সোনার ঝলক বলে মনে হচ্ছে।

পৃথিবী মাটির। পৃথিবী কঠিন। সূর্যের আলো সোনা নয়, বড়ো উত্তপ্ত। মানুষের সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ তার আত্ম-প্রবঞ্চনায়। নিজেকে নিজে সে যত বঞ্চনা করেছে তার চেয়ে বেশী বঞ্চনা আর কেউ করে নি। অলীককে সত্য বলে ধারণা করে তার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একদিন সে মুখ থুবড়ে পড়ে হাহাকার করে মরে। সেই অলীকের মোহে সোনাকে বলে মাটি। মুখের খাদ্য ঠেলে দিয়ে উপবাসে নিজেকে পীড়িত করে।

রিনার যে-দৃষ্টি, সেই স্তম্ভিত-বিস্ময়ে-ভরা মুখ আজও তার মনে পড়ে।

সে আসানসোলে মিশনে এসে রিনাকে সামনেই পেয়েছিল। রেভারেণ্ড আরনেস্টের বাংলোর সামনে উদাস-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

কৃষ্ণেন্দু উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে ডেকেছিল দূর থেকে, 'রিনা! রিনা!'

রিনা চমকে উঠেছিল। অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'কৃষ্ণেন্দু?'

'হ্যাঁ, রিনা। আমি কাল ব্যাপটাইজ্‌ড হয়েছি। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আর কোন বাধা নেই। তুমি আমার। ইউ আর মাইন।'

রিনার বিচিত্র রূপান্তর ঘটতে লাগল। কৃষ্ণেন্দু তার হাত ধরতে গিয়ে থমকে গেল। রিনা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে, তার মুখের উপরেই নিবদ্ধ, তবু যেন সে তাকে দেখছে না, যৌবনমাধুর্যে অপরূপ তার মুখখানিতে কী লেখা যেন ফুটছে; কপালে, ভ্রূতে, দুটি ঠোঁটে ক্ষীণ রেখায় স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে আরও দুর্বোধ্য কিছু যেন ফুটে উঠেছে সমস্ত কিছুতে। তার মধ্যে আশ্চর্য দৃঢ়তা এবং আশ্চর্য আরও কিছু। মহিমা? হ্যাঁ তাই।

ধীরে ধীরে রিনা বলেছিল, 'ক্রিশ্চান হয়েছ? আমার জন্য?'

'হ্যাঁ, রিনা।'

'তোমার ধর্ম, তোমার ঈশ্বর ত্যাগ করেছ? ছি! ছি!'

'রিনা, কী বলছ?'

'তুমি বুঝতে পারছ না? কি ভয়ানক!'

'রিনা! আমি তোমার জন্য জীবন দিতে পারি! রিনা!'

'লাইফ ইজ মর্টাল! জীবন নশ্বর। একদিন তা যাবেই। অসংখ্য জীবন অহরহ যাচ্ছে কৃষ্ণেন্দু, ইচ্ছে করে মানুষ মরছে, বিষ খাচ্ছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে। মানুষ মানুষকে মেরে নিজে মরছে। কৃষ্ণেন্দু, সেদিন এখান থেকে কিছু দূরে হাজারিবাগে একজন বাঘ মারতে গিয়ে বাঘের হাতে মরেছে! জন ব্রেটনও হয়তো কোনো যুদ্ধে গুলির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেবে। বাধ্য হয়ে দেবে। এমন জীবন দেওয়াটা নেশার ধর্ম কৃষ্ণেন্দু। আমার প্রভু জীবন দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের জন্য, ধর্মের জন্য। তুমি আমার জন্যে তোমার সেই ধর্ম, তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে কৃষ্ণেন্দু! ফর এ গার্ল? ফর দিস আইজ অব মাইন হুইচ ইউ সো অ্যাডোর—'

কৃষ্ণেন্দু প্রথমটায় বিচলিত হয়ে গিয়েছিল রিনার এই আকস্মিক আক্রমণে। এ-রিনাকে সে এই প্রথম দেখছে। ধর্মান্ধতায় উগ্র উন্মাদ! সে নিজেকে সংবরণ করে এবার বাধা দিয়ে বলেছিল, 'ডোণ্ট বি সিলি, রিনা।'

'সিলি?' প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল রিনা।

দৃঢ়স্বরে কৃষ্ণেন্দুও বলেছিল, 'ইয়েস। সিলি। কারণ কোনো একটা ধর্মকে মানুষ অবলম্বন করে, রিনা, ওই ধর্মকে অতিক্রম করে সর্বজনীন মানব-ধর্মে উপনীত হবার জন্য। এই ধর্মের গোঁড়ামি আর বন্ধনের মধ্যে বন্দীর মতো বাঁধা থাকবার জন্য নয়।'

'ইয়েস। মানি। শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারি না। না পারি, এটুকু বলতে পারি যে, যারা ওখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, তারা একটি মানুষকে পাবার জন্য সে-তপস্যা করে না। তপস্যা করে সব মানুষকে আপন-জন বলে পেতে। একটি নারীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না কৃষ্ণেন্দু, সকল জনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, ঢেলে দেয়। ঈশ্বর বড়ো পবিত্র; বড়ো

মূল্যবান। তাঁকে তুমি ত্যাগ করলে কৃষ্ণেন্দু? আমার জন্যে? না। না।'

'কী বলছ তুমি রিনা?'

রিনা আবার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'রিনা!'

রিনা বললে, 'না আমার জন্যে নয়। যে সৌন্দর্য তুমি ভালোবাস সেই সৌন্দর্যময় একটি নারীর জন্য।' কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল এবার!

ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণেন্দু তার হাত ধরে বললে, 'রিনা—'

'ছেড়ে দাও। লীভ মী। ডোণ্ট টাচ্ মী। প্লীজ—প্লীজ।'

'রিনা!'

নিরুচ্ছ্বাস কান্না কাঁদতে কাঁদতে রিনা বললে, 'তুমি ভয়ংকর, কৃষ্ণেন্দু, তুমি ভয়ংকর। একটি নারীর জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরকে ছাড়তে পার। কৃষ্ণেন্দু, আমার চেয়ে সুন্দরী নারী অনেক আছে। তাহলে তাদের কাউকে যখন দেখবে, সংস্পর্শে আসবে, সেদিন আমাকেও তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেবে তুচ্ছ বস্তুর মতো। তোমার যে ঈশ্বরকে তোমার একান্ত আপনার বলে এতদিন জেনে এসেছ, ভালোবেসেছ—বিপদে ডেকেছ,—অভয় পেয়েছ—। ওঃ! তুমি যাও! আমি তোমাকে ভালোবাসি! কিন্তু না। বিবাহ করতে আমি পারব না। তুমি ভয়ংকর!'

কৃষ্ণেন্দু স্তম্ভিত হয়ে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। প্রতিটি কথা তাকে যেন বিদ্ধ করছিল শূলের মত। একটু থেমে রিনা আবার বললে,—'তোমার বাবা যদি আমায় বলেন—তোমার জন্যে আমাকে আমার ধর্মের সঙ্গে আমার ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে হবে—তবে আমি তা পারি? না—না—না। তুমি যাও—তুমি যাও।' বলেই সে যেন ছুটে পালিয়ে গেল। একটা আতঙ্ক যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

পাথর হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দু। স্থির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে, হয়ে গেছে অর্থহীন। তার কেউ নেই। কিছুই তার নেই। কি করবে সে? বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ পাদরি। তিনি বোধ হয় দুজনের কথার মধ্যে আসতে চান নি। তিনি এবার এগিয়ে এলেন।

'ইয়ং ম্যান!'

'গুড মর্নিং, ফাদার।' সে সচেতন হয়ে উঠল এতক্ষণে।

'গুড মর্নিং। বসবে? বিশ্রাম করবে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফাদার। অনেক ধন্যবাদ। তার প্রয়োজন নেই। আমি নেক্সট্ ট্রেন ধরতে চাই।'

ফাদার বলিলেন, 'কোথায় যাবে তুমি? তোমার মনের অবস্থা আমি জানি।'

সে বলেছিল, 'জানেন না ফাদার। আমিও জানি না। আমি ভেবে দেখব। লেট মি থিঙ্ক ফাদার।'

'—My Son——'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমি কথা দিচ্ছি ফাদার—আমি মরব না।'

সে চলে এসেছিল।

*   *   *

সেই রিনা ব্রাউন। যে এর পর বুকে ঝুলিয়ে নেবে ক্রশ আর যার একমাত্র পাঠ্য হবে হোলি বাইবেল, ভেবেছিল কৃষ্ণেন্দু। যে রিনা ব্রাউন সারা জীবন অবিবাহিত থাকবে ভেবেছিল, সেই রিনা ব্রাউন! সে উন্মাদিনীর মতো মদ আর ব্যভিচারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। আমেরিকান অফিসারের জীবনের সাধ-মিটিয়ে-নেওয়া উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হেসে বেড়াচ্ছে। স্মৃতিও বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে।

ওথেলোর কথাও তার মন থেকে মুছে গেছে। বললেও মনে পড়ে না, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে সহ্য করতে না-পারায় ইঙ্গিত ফুটে ওঠে তিক্ত দৃষ্টির মধ্যে।

আর কৃষ্ণেন্দু? সে কৃষ্ণস্বামী হয়ে এই অরণ্য-অঞ্চলে রোগীর চিকিৎসা এবং কুষ্ঠরোগীর সেবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে; রিনা বলেছিল, 'বিশেষ ধর্মকে অতিক্রম করে মানুষ নির্বিশেষে মানবধর্মে পৌঁছেছে। মানুষ একজনের জন্য নয়, একটি নারীকে বা একটি পুরুষকে পাবার জন্য নয়, সকল মানুষকে আপনার বলে পাবার জন্য।'

শুধু রেভারেণ্ড কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত সে নয়। সে ক্রিশ্চান, সে ভারতীয় সন্ন্যাসী: রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী। যে ঈশ্বরকে উপেক্ষা করার জন্য রিনা তাকে জয় করেছিল, সে ঈশ্বরকে তাকে পেতে হবে; তাকে খুঁজেছে। তার সন্ধান সে পেয়েছে।

মানুষের বস্তুময় দেহের মধ্যে তাঁকে সে তপস্যারত দেখেছে।

চিদ্‌বিভ্রান্তিকর মহাসত্তা। বিরাট মহাসত্তায় উপনীত হবে মানুষ। শুদ্ধ পবিত্র মমতায় কোমল, সত্যে নির্মল, প্রেমে পরিশুদ্ধ অহিংস। এই যুদ্ধের মধ্যেও সে তপস্যাকে ডুবিয়ে নিঃশেষ করতে পারে নি। তামসীর মতো সে তাকে গ্রাস করতে গিয়েও পারছে না।

বিচিত্র বিস্ময় এই যে, তাকে সেই ঈশ্বরসন্ধানী দেখেই সেই রিনা আজ ভয় পেল; সঙ্কুচিত হয়ে গেল, হিংস্র হয়ে উঠল মানুষ দেখে সরীসৃপের মতো।

আশ্চর্য, সেই নির্মল আলোকসন্ধানী রিনা, আজ এই যুদ্ধের মধ্যে যে উন্মাদিনী তামসী নিজেকে প্রকট করেছে, সে গ্রাস করতে চায় সমস্ত তপস্যাকে, হত্যা করতে চায় ঈশ্বরকে, সেই তামসীর সে ক্রীতদাসী, ক্রীড়াসঙ্গিনী, প্রেতিনী। হয়তো বা তারই প্রতীক। হে ভগবান! ওহ্ গড!

রিনা—হঠাৎ জীপের গর্জনে তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল! জীপ! তিনি ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। জীপের সঙ্গে রিনার অস্তিত্ব যেন মনের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে মেঘগর্জনের মতো। তিনি উঠে পড়লেন। হঠাৎ নজরে পড়ল জোড়-বাংলা মন্দিরের মাথায় মিলিটারী-পোশাক-পরা কারা ঘুরছে, দেখছে বাইনোকুলার দিয়ে। প্রমোদভ্রমণ আর উল্লাস, উচ্ছৃঙ্খলতা আর উন্মত্ততা। তামসী রিনা সঙ্গে আছে। নিশ্চয়। ভয়ার্তের মতো কৃষ্ণস্বামী উঠলেন। পাকা রাস্তায় নয়। মাঠে মাঠে এসে বনেরই পথ ধরে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

রিনা তার ঈশ্বর তাকে দিয়ে নিজের জীবনে নিঃস্ব হয়ে গেল কি—তার অবিশ্বাস— তার রিক্ততার তিক্ততায় হাহাকারে—ভয়ঙ্করতায় ?

ছয়

বনের ভিতর দিয়ে চলেছিলেন কৃষ্ণস্বামী। দ্রুতপদেই চলেছিলেন। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রায় সাতটা বাজে। রোগীরা এসে বসে আছে। অসুস্থ মানুষ। তাঁর ভগবান। ব্লেসেড্ আর দি পুওর ইন স্পিরিট : ফর দেয়ার্স ইজ দি কিংডম্ অফ হেভেন্। তারাই ভক্ত। 'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ'—ভক্তের হৃদয়ে আমি বাস করি। ওরা অশিক্ষার মধ্যেও ভগবানকে ভক্তি করে। অন্ধকারের মধ্যে বাস করেও ওরা আলো চায়। ওরা জীবনের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে না। আলোর অভাবেই আলো বলে কাঁদে। ওদের মধ্যে ঈশ্বরের তপস্যা আছে।

বনে কোনো ফুল ফুটেছে। গন্ধ উঠেছে। পাখিরা কলকল করছে। সূর্য আজ মেঘের আড়ালে ঢাকা। বনভূমি বর্ষণের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। প্রতিটি পাতার মধ্যে কৃষ্ণস্বামী অনুভব করছেন উদ্ভিদ-প্রাণের ব্যাকুল প্রত্যাশা।

'হ্যালো, হু ঈ হিয়ার ? হ্যালো ?

চমকে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী। নারী-কণ্ঠস্বর, রিনা ব্রাউনের গলা। এই বনের মধ্যে ? এই সকালে ? এদিক ওদিক তাকিয়ে কৃষ্ণস্বামী দেখলেন রিনা ব্রাউন বনের ভিতরে এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় একটা একক বড়ো শালের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। পাশে একটা ফ্লাস্ক ; হাতে সিগারেট। সেই পোশাক।

কৃষ্ণস্বামী শুধু বললেন, 'ইয়েস্ ?'

'কাম হিয়ার, সিট ডাউন। হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক, এ স্মোক ?'

'আই ডোণ্ট ড্রিঙ্ক, ডোণ্ট স্মোক। থ্যাঙ্ক ইউ।'

এবার চিৎকার করে উঠল রিনা, 'কৃষ্ণেন্দু!'

হেসে কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'আমার রোগী বসে আছে রিনা—আমি যাই। আমাকে ক্ষমা করো।' তারপর আবার বললেন, 'তুমি চিনেছ রিনা। কাল ভেবেছিলাম তোমার স্মৃতিও ভ্রংশ হয়ে গেছে।'

'গেছে। অনেক গেছে। কিন্তু ওখেলো ভুলি নি। 'লেট মী লুক্ অ্যাট ইয়োর আইজ, লুক ইন মাই ফেস্' বলে আমার দিকে যখনই তাকালে, তোমার দৃষ্টি আমি তখনই চিনলাম। কিন্তু—।'

সিগারেট টানতে লাগল রিনা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ওর হাতের আঙুল কাঁপছে।

'আমি যাই রিনা।'

'তুমি এখানে কী করছ? এ কী পোশাক? এ কী চেহারা?'

'আমি ক্রিশ্চান হয়েছিলাম তুমি জান। তারপর হয়েছি সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের ক্রিশ্চান সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসীতে যা করে তাই করছি। ঈশ্বরকে খুঁজছি। অবশ্য মানুষের সেবার মধ্যে। আমি ডাক্তার, ওদের চিকিৎসা করি। কিন্তু মূল চিকিৎসা,—কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা।'

রিনার হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রিনা বললে, 'জীবনটাকে নষ্ট করলে কৃষ্ণেন্দু! আই অ্যাম্ দি কজ্, আই অ্যাম্ দি কজ্—'

'না। জীবন আমার নষ্ট হয় নি। তুমি আমাকে যা বলেছিলে, তা মিথ্যা বল নি। পৃথিবীতে ঈশ্বরের চেয়ে বড় কিছু নেই।'

'আমি বলেছিলাম তোমাকে? হ্যাঁ আমি বলেছিলাম। আই অ্যাম্ দি কজ।'

'আমি যাই। গুড বাই।'

'দাঁড়াও। আমি আবার বলছি—আমি ভুল বলেছিলাম। এ পথ তুমি ছাড়।'

'না। আমি যাই। গুড বাই!'

'আর এক মিনিট। আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে না?'

'না। তোমার কথা তোমার রূপের মধ্যেই প্রকাশ, রিনা। কী জিজ্ঞাসা করব?'

'আবার বলছি ঈশ্বর নেই কৃষ্ণেন্দু। আমি তোমাকে ভুল বলেছিলাম। দুঃখ দিয়েছিলাম। ঈশ্বর নেই।'

উঠে দাঁড়াল রিনা ব্রাউন। তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—'শোন আমার কথা। আমি বলছি ঈশ্বর নেই। নাথিং ইজ সিন—পাপ নেই, পুণ্য নেই, ঈশ্বর নেই।'

কণ্ঠস্বর তার তীব্রতর হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে কৃষ্ণস্বামীর পথরোধ করে দাঁড়াল।

'তুমি এ-সব ছাড়ো কৃষ্ণেন্দু। জীবনকে নষ্ট কোরো না। ফিরে যাও। নতুন জীবন আরম্ভ করো।'

'তোমার সঙ্গে?'

হি-হি করে হেসে উঠল রিনা ব্রাউন। তীব্র তীক্ষ্ণ বীভৎস হাসি। হাসি থামিয়ে বললে, 'আমার এখন দাম অনেক কৃষ্ণেন্দু। তোমার দাম আমার কাছে সেদিনের চেয়ে কম! সেদিন ভয় করে বলেছিলাম। আজ করুণা হচ্ছে। হার্মলেস, ডোসাইল, ওয়ার্থলেস, ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্ন্যাসী তুমি, নির্বোধ তুমি, মূর্খ তুমি, আমার ঘৃণার পাত্রও নও, করুণার পাত্র।'

কৃষ্ণস্বামী আর কথা বললেন না, এগিয়ে চললেন।

পিছন থেকে রূঢ় চিৎকার করে উঠল রিনা ব্রাউন, 'শোনো, আমার কথা শোনো। ইউ মাস্ট লীভ দিস প্লেস। এখানে থাকতে তুমি পাবে না। চলে যাও। অনেক দূরে!'

কৃষ্ণস্বামী ঘুরে দাঁড়ালেন।

রিনার এমন তীব্র মূর্তি তিনি কখনও দেখেন নি। তার দীর্ঘ ঘন কালো নেত্ররোমের স্বপ্নালু বেষ্টনীর মধ্যে আয়ত কালো চোখ যে এমন জ্বলন্ত হয়ে উঠতে পারে, তা তাঁর

কল্পনাতীত। চোখ দুটো তার জ্বলছে। ধক-ধক করছে।

রিনা বললে, 'তোমার ওই বাংলোটা আমার চাই। আমি এখানে থাকব। অনেক দিন থাকব। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। ইউ মাস্ট। না হলে আমি ওদের লেলিয়ে দেব। ওরা তোমাকে, ওরা কেন, আমিই তোমাকে গুলি করে মারব।'

কৃষ্ণস্বামী কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে আবার চলতে শুরু করলেন। আর পিছন ফিরলেন না। ভীত তিনি হলেন। নিজের জন্য নয়। ওই ঝুমকির জন্য। সিন্ধুর জন্যও বটে।

রিনা ব্রাউন প্রেতিনীর মতো গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছে। হয়তো ফ্লাস্ক খুলে মদ খাচ্ছে। অনুমান করতে এতটুকু বিলম্ব হল না তাঁর।

*   *   *

ঠিক করলেন, ঝুমকি আর সিন্ধু গ্রামের ভিতরে গিয়ে থাকবে। লাল সিং ওদের আগলাবে। সেও যাবে। তিনি থাকবেন একা।

তাঁর ভয় নেই। ভয় কৃষ্ণেন্দুর কোনো কালে ছিল না। কৃষ্ণস্বামী হয়ে তিনি ঈশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি মৃত্যুকে ভয় করবেন কেন? আসুক মৃত্যু। অন্যায়কে প্রতিরোধ করে তিনি মরবেন। প্রেতিনী রিনা ব্রাউনের ভয়ে তিনি পালাবেন?

রাত্রি তখন নটা। তিনি বসে ছিলেন। প্রতিটি জীপের বা মোটরের শব্দে একটু সজাগ হয়ে উঠছিলেন। মধ্যে মধ্যে এক-একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতার মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন। আকাশ বর্ষার মেঘে ভরেছে। আজ, হয়তো আজই বর্ষা নামবে। দিগন্তে মৃদু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তিনি ও-কথা ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন নিষ্কলুষ পবিত্রতার প্রতিমূর্তি মিনার কথা। প্রেতিনী রিনা ব্রাউনের কথা। প্রেতিনী নয়, সাক্ষাৎ তামসী আজ রিনা ব্রাউন।

রাত্রি তামসী নয়। রাত্রির অন্ধকারে জীবনের মধ্য থেকেই তামসী বেরিয়ে আসে। বস্তু-জগতে, স্থান-জগতে ক্ষোভের কারণ না থাকলে, অনিয়ম না ঘটলে সে জাগে না। ক্ষোভ মিটলেই সে শান্ত হয়, স্থিত হয়। জীবনের মধ্যেই সে সদাজাগ্রত, চেতনার মধ্যে অহরহ সে সক্রিয়। সুপ্তির মধ্যে সে দুঃস্বপ্ন, অবসর-বিশ্রামের মধ্যে সে কুটিল কল্পনা। শান্তির পথে, সুখের পথে, চৈতন্যের পথে মানুষকে এগুতে সে দেবে না। নিষ্ঠুর আক্রোশে পিছন থেকে অজগরের মতো আক্রমণ করছে। গ্রাস করতে চাইছে। একবার জড়িয়ে ধরতে পারলে গ্রাস না করে ক্ষান্ত হবে না।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তন্দ্রা এসেছিল কৃষ্ণস্বামীর। টর্চের আলোয় তন্দ্রা ছুটে গেল। তিনি উঠে বসলেন।

'কে?'

দূর-দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সেই ক্ষণিক আলোতেই দেখলেন, হ্যাঁ, সে-ই বটে। দীর্ঘাঙ্গী নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে। একটু একটু টলছে। রিনা ব্রাউন উত্তর দিল, 'আমি।

তুমি আমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছ দেখছি।'

'আমি। শুধু তোমার নয়, তোমার সঙ্গে আরও লোকের প্রতীক্ষা করছিলাম। যারা ভয়ঙ্করী-লোলুপ ভয়ঙ্কর। যারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলবে। আমি বুঝতে পেরেছি, এ বাড়িতে যত প্রয়োজন তোমার—আমাকে তাড়ানো তার চেয়ে তোমার বেশী প্রয়োজন। তুমি স্বস্তি পাচ্ছ না। কিন্তু কেন?'

একখানা চেয়ারে বসে রিনা বললে, 'ইউ মাস্ট গো অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার। তোমাকে যেতে হবে।'

'নো। আই মাস্ট নট গো। ঈশ্বরের সাধনায় আমি এখানে শপথ নিয়ে এসেছি। এ আমার সাধনার আসন।'

'স্টপ।' চিৎকার করে উঠল রিনা। আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'সব মিথ্যে। ঈশ্বর নেই। কোনোদিন ছিল কি না জানি না। থাকলে সে মৃত। মানুষ তাকে মেরে ফেলেছে। আমার দিকে দেখো। আমি তার সমাধি। আমার বাবা সভ্য ইংরেজ, ধর্মবিশ্বাসী ক্রীশ্চান—তাকে মেরে আমার মধ্যে সমাধি দিয়েছে। আমি তোমাকে বলছি। যা মৃত তা বাঁচে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসের গলিত শবটা ছেড়ে দাও। চলে যাও এখান থেকে।'

'তুমি আজ যা-ই হয়ে থাক রিনা, তুমি ক্রীশ্চান।'

'না, না, না। আমি ক্রীশ্চান নই। এতক্ষণ শুনলে কি?'

'রিনা!'

'কোনোদিন ছিলাম না। আমার ক্রস, আমার বাইবেল আমি ফেলে দিয়েছি। কোনোদিন আমি ব্যাপটাইজ্‌ড হই নি। দীক্ষা আমার বাবা নিতে দেয় নি। কোনো ধর্মই আমার নেই। বাবা জেমস ব্রাউন ইংরেজ, ধর্মে ক্রীশ্চান, অত্যাচারী জমিদার। আমার মা ছিলেন, হিন্দুদের মধ্যেও বন্য অস্পৃশ্য জাতের মেয়ে। লালসা চরিতার্থ করবার জন্য বাবা তাকে উপপত্নী হিসেবে রেখেছিল, তাকে কিনেছিল। আমি তাদের জারজ সন্তান। কৃষ্ণেন্দু, সেই আয়া, সেই কুন্তী আমার মা।'

বিদ্যুৎচমকের মেঘগর্জনটা ঠিক এই মুহূর্তেই ধ্বনিত হয়ে উঠল রিনার কথার প্রতিধ্বনির মতো। কৃষ্ণেন্দু বজ্রাহতের মতোই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোনো কথা, একটা বিস্ময়সূচক মর্মান্তিক ধ্বনিও বের হল না। রিনা হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে কাঁধে-ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা মদ খেয়ে নিয়ে বললে, 'আরও শুনবে? আরও অনেক আছে। আমার ওই মা কুন্তী, সে হল, মেদিনীপুরে যেখানে ব্রাউনের জমিদারি ছিল, সেখানকার জঙ্গল-মহলের পুরনো এক ছত্রী ইজারাদারের রক্ষিতা এমনি এক বুনো মেয়ের গর্ভজাত মেয়ে। ইজারাদারের রক্ষিতা ছিল এক ব্রাহ্মণের ব্যাভিচারের ফল। আরও শুনবে? কালো মেয়েদের রক্তের সঙ্গে অনেক-ফরসা রঙের মিলে হয়েছিল শেষ সাদা ইংরেজের রঙ। সবটা প্রকাশ পেল আমার মধ্যে। কালো চুল, বড়ো বড়ো চোখের পাতা, সাদা রঙ। রঙরূপ আমার যাই হোক, আমার কি কোনো ধর্ম আছে, আমার কি কোনো ঈশ্বর আছে? ঈশ্বরের ধর্মের আমি

জীবন্ত সমাধি। মৃত ঈশ্বর আমার মধ্যে পচছে। গন্ধ উঠছে।'

রিনা স্তব্ধ হয়ে গেল অকস্মাৎ। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

কৃষ্ণস্বামীর মনে হল চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে এসেছে। তিনি বললেন, 'তুমি কাঁদছ।'

'কাঁদছি? লুক'—সে টর্চটা জেলে নিজের মুখের উপর ধরলে। না, রিনা কাঁদে নি। চোখ দুটি তার নেশায় আরক্ত, দৃষ্টি তার অসহনীয় তীব্র।

'চোখের জল আমার অনেক দিন শুকিয়ে গেছে। মরুভূমি হয়ে গেছে। অনেক কেঁদে জল শেষ হয়ে গেছে।'

ধীরে ধীরে রিনা বললে, 'সব তোমার জন্যে কৃষ্ণেন্দু, ইউ আর দি কজ্, ইউ আর দি কজ্, আজ তোমার নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করেই বলছি, ইউ আর দি কজ্।' একটু হাসলে রিনা। বোধ করি ওথেলোর এই দৃশ্যটির অভিনয়ের স্মৃতি খানিকটা মাধুর্যের সঞ্চার করলে ক্ষণিকের জন্য।

'তোমার মতো ভালোবাসার জনকে ফিরিয়ে দিলাম, তুমি ঈশ্বরকে, ধর্মকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস কর না বলে। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি ভাবছি, আমার নিজেকে না দিয়ে সেদিন আমার ঈশ্বর, আমার ধর্ম সব বোধ হয় তোমাকে দিয়েছিলাম। তুমি সব কেড়ে নিয়ে এসেছিলে আমার অজ্ঞাতসারে।'

আবার একটু স্তব্ধ থেকে বললে, 'আসানসোল থেকে ফিরে এলাম। ঈশ্বর এবং ধর্মকে আমি এত ভালোবাসতাম কৃষ্ণেন্দু যে অন্তর হাহাকার করলেও আমি কাঁদি নি। সংকল্প করেছিলাম সারাজীবন 'নান' হয়ে কাটিয়ে দেব। ব্রাউন সাহেব—তাকে বাবা বলতে আমার ঘৃণা হয় কৃষ্ণেন্দু—সে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলে; 'সে কই?' আমি তাকে বললাম, 'আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।' সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন? সে ক্রীশ্চান হয়েছে, তুমি জান না? সে তোমাকে বলে নি?' বললাম, 'বলেছে'। জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে?' আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, সব বললাম। কৃষ্ণেন্দু, এক মুহূর্তে ওর মুখোশ খুলে গেল। চিৎকার করে উঠল, 'ব্যাস্টার্ড—বিচ।' তারপর অনর্গল কুৎসিত, অশ্লীল গালাগাল। বললে, 'ক্রীশ্চান? তুই ক্রীশ্চান? তু ইউ নো, হিদেন ওই কুন্তী, হিদেনদের চেয়েও ঘৃণিত ও। ওরা পর পর তিন জেনারেশন ব্যাস্টার্ড, ওই তোর মা।' বললে, 'জীবনে মুহূর্তের দুর্বলতা আমাকে এত বড় ভুল করালে। তোর সাদা রঙ দেখে আমি ভুলে গেলাম। তোকে বাঁচিয়ে রাখলাম।'

একটা সিগারেট ধরালে রিনা। তারপর আবার কথা বলতে গিয়েই থমকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ইট্স্ রেনিং। বৃষ্টি এল।' হেসে বললে, 'কুন্তী-মা আমার বলত, জল আইচে গ!'

কয়েকটা বড়ো বড়ো ফোঁটা কৃষ্ণস্বামীর কপালে হাতে এসে পড়ল। দূরান্তরে সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে। আসছে বর্ষার বর্ষণ। মৃদুমন্দ নৈঋতী হাওয়া বইছে।

কৃষ্ণস্বামী বললো, 'ভিতরে চলো রিনা।'

'ঘরের ভিতরে ? চলো। কিন্তু তাতেই বা কী দরকার। আমি চলে যাই। শুধু বলে যাই, তোমাকে বলেছি, আবার বলছি, এখান থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে। আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। ইউ মাস্ট।'

'সে হবে রিনা। কিন্তু এই বৃষ্টিতে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যাবে ?'

'ভিজতে ভিজতে চলে যাব। দুর্যোগ আমি ভালোবাসি কৃষ্ণেন্দু। আগে ঝড়-জল এলে ভয় করতাম। এখন আনন্দ পাই। আই ফিয়ার নো ডার্কনেস, আই ফিয়ার নো স্টর্ম, আই ফিয়ার নো থাণ্ডার, লেট মী গো। বাট ইউ মাস্ট লীভ দি প্লেস।'

'না। বোসো।'

ঘরের মধ্যে এসে স্তিমিত লণ্ঠনটি উজ্জ্বল করে দিলেন কৃষ্ণস্বামী।

'নো।' বলে রিনা এসে আলোটিকে কমিয়ে, নিভিয়ে দিল। পলতেটা পড়ে গেল। 'অন্ধকার—অন্ধকার ভালো। জান, ব্রাউনের কাছে সব কথা শুনে তিনদিন আমি অন্ধকারে পড়ে পড়ে কেঁদেছিলাম। দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আলো জ্বালি নি। নিজের দিকে চেয়ে দেখতে ভয় হত আমার। আমার সঙ্গে সমানে কাঁদত আমার মা। কুন্তী। ব্রাউনকে আমি ঘৃণা করি। কুন্তীকে ঘৃণা করতে পারি নি। হতভাগিনী। ব্রাউনের ভয়ে ভয়ার্ত মূক জন্তুর মতো সারাজীবন আমার আয়া হয়ে থেকেছে। কোনোদিন আমাকে মেয়ে বলে একবিন্দু স্নেহ শ্রদ্ধা আমার কাছে চাইতে পারে নি। অন্ধকারে দুজনে কাঁদতাম। নিজের কলঙ্কের ভয়ে—আমার মাতৃপরিচয়ের অমর্যাদা পাছে তাকে স্পর্শ করে, আমাকে স্পর্শ করে, তার লজ্জায়—সে আমাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিতও করে নি। আমাকে নার্সারিতে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মায়ের তখনও রূপ-যৌবন ছিল। সে-রূপে নাকি এক বন্য মোহ ছিল। সে মোহ আশ্চর্য। আমার চুলে চোখে চোখের পাতায় তার পরিচয় আছে। তাকেও সে তাড়ায় নি। তাকে সে কিনেছিল। ভোগ করত, বর্বরের মতো। ক্রীস্টান! ক্রায়েস্ট—সন অব গড! তিনি ছিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। রোমান ইম্পিরিয়লিস্টরা মেরেছিল তাঁকে। লোকের বিশ্বাস, তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন! হয়ে থাকলেও ইম্পিরিয়লিস্টরা যে এখনও মরে নি। তারা যে তাঁকে ক্রুশে নিত্য বিঁধে মারছে। প্রতিদিন তিনি ক্রুশ বিদ্ধ হচ্ছেন!'

হাসলে রিনা। হেসে বললে, 'এরা কিন্তু একটা জায়গায় মহৎ। ক্লেটন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই খাঁটি ইংরেজ জমিদার তার আভিজাত্য বজায় রেখে আমার সব বৃত্তান্ত তাকে জানিয়েছিল। ক্লেটনের বাবা ধন্যবাদ জানিয়েছিল ব্রাউনকে। তুমি হিদেন বলে তোমাকে সত্য বলার প্রয়োজন মনে করে নি। আমি ক্রীশ্চান নই, তবু তোমাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিত না করে আমার সঙ্গে বিয়েতে মত দেয় নি।' আমি হিদেনের গর্ভজাত মেয়ে, আমাকে বাইবেল আর ক্রুশ দিয়েছিল খেলার ছলে। তার কোনো মূল্য নেই। ঈশ্বর ধর্ম কোনো কিছুর উপর আমার কোনো অধিকার নেই। ঈশ্বর মূক, কোনো ভাষা নেই তাঁর, তিনি প্রতিবাদ করেন নি, ধর্মের ঘরের তালা রীতির কোডে মেলে নি বলে খোলে নি। আমি সামনে পেয়েছি নরকের সিংহদ্বার খোলা—তার মধ্যে ঢুকেছি।' সে

সিগারেট ধরাল।

বাইরে তখন প্রবল বেগে বর্ষণ নেমেছে। চারিপাশের সুদীর্ঘ বিশাল শালবনের পল্লবে ধারাপতনের শব্দে শব্দময় মেঘমল্লার বেজে বেজে উঠছে। বিচিত্র ঝর-ঝর এক সঙ্গীত। পৃথিবীর অন্য সব শব্দ ডুবে গিয়েছে। এমন কি, জীপ কি মোটরের শব্দও ভালো শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ রিনা উঠে দাঁড়াল। একটা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বললে, 'কী সুন্দর রাত্রি! মনে হচ্ছে, বিশ্বজগতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।'

কৃষ্ণস্বামী স্তব্ধ হয়ে রিনার কাহিনী শুনে সেই স্তব্ধ হয়েই বসে ছিলেন। বেদনায় করুণায় তাঁর অন্তর মুহ্যমান হয়ে গেছে। বাইরের ওই সজল বাতাসের প্রবাহের মতো হায়-হায় করে সারা হয়ে গেল। এমনি করেই কাঁদছে। হে ভগবান, তুমি ওর অন্তরে পুনরুজ্জীবিত হও। ওর অন্তরের কবরখানা বিদীর্ণ করে জেগে ওঠো। তোমার স্পর্শে কুষ্ঠরোগীর নিরাময় হওয়ার মতোই কঠিন আঘাতে বিকৃত ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরকে সুস্থ সুন্দর করে তোলো। সুন্দর রিনা, এখনও সুন্দর। এখনও সেই মাধুরী তার সর্বাঙ্গে, এখনও তার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মঘেরা আয়ত কালো চোখ দুটি মানস-সরোবরের মতো স্বচ্ছ গভীর। আকাশের প্রতিবিম্বে এখনও সে নীলাভা প্রতিফলনের শক্তি হারায় নি। মেঘ তুমি কাটিয়ে দাও, অপসারিত করো। হে ঈশ্বর! নরকের মুখে উন্মাদ যাত্রীকে তুমি ডাকো, 'ফিরে আয়'—বলে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'রিনা, ঈশ্বরের সমাধি বার বার রচনা করবার চেষ্টা করেছে ঈশ্বরের বিপরীত শক্তি। আলো আর কালো। ভালো আর মন্দ। কিন্তু বার বার মন্দ হেরেছে, ভালো জিতেছে। ঈশ্বর সে-সমাধি বিদীর্ণ করে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন। হায় রিনা, অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, অনেক বেদনা। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তখন দূরে চলে গেছি। আমি জানলে এ দুঃখ তোমাকে পেতে দিতাম না। বলতাম—জীবন, সে ঈশ্বরের অংশ। সৃষ্টির মধ্যে মানুষের জীবনেই ভগবান কথা কন, হাসেন, কাঁদেন, ভালোবাসেন, নিজেকে নিজে বলি দেন, বিশ্বের কাছে বিলিয়ে দেন, মানুষের মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ! মানুষের মধ্যে জীবন, সে যেখান থেকেই উদ্ভূত হোক, সে সমান পবিত্র। ব্রাহ্মণ নেই, চণ্ডাল নেই, ক্রীশ্চান নেই, হিদেন নেই, ধনী নেই, দরিদ্র নেই। গোত্র কুল ইতিহাস পরিচয় থাক না-থাক, মানুষ সমান পবিত্র, তার মধ্যে ঈশ্বর সমান মহিমায় আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল। তোমাকে নিয়ে আমি মহা আনন্দে এই তপস্যা করতাম।'

পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে-ঈশ্বরকে তুমি সমাধিস্থ করেছ বলছ, তিনি আবার উঠবেন।' তুমি শান্ত হও।'

'ডোণ্ট টাচ মী প্লীজ। ডোণ্ট। ডোণ্ট, কৃষ্ণেন্দু! আমাকে স্পর্শ করো না।' চিৎকার করে উঠল রিনা। সে যেন আর্তনাদ।

'পীস্ অ্যাণ্ড বী স্টিল্, রিনা।' ওথেলো মনে পড়িয়ে দিয়ে তার অন্তরে স্বপ্নাবেশের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের চেষ্টা করলেন কৃষ্ণস্বামী।

কিন্তু রিনা অধীর কণ্ঠে বললে, 'শান্তি আমার নেই। স্থির আমি হতে পারব না, কৃষ্ণেন্দু। তুমি জানো না। ও-সবের কোনো কিছুতেই আমার আর অধিকার নেই। আমার ব্যভিচারী জন্মদাতা ব্রাউন আমাকে বলেছিল—আমার ধর্মে অধিকার নেই—ঈশ্বরে অধিকার নেই—পবিত্রতায় অধিকার নেই। যেমন করে ওরা সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে জবরদস্তি বলছে—তোমাদের কোন অধিকার নেই—আর তাদের থাকছে না—হারাচ্ছে। তারাও বিশ্বাস করছে। আমার তাই হয়েছিল—আমার অধিকার নেই বলে নিজেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম নরককুণ্ডে। সেখানে পাঁকের মধ্যে ফুলের মতো আমি পচতে লাগলাম—আজ আমার ভিতরটা নিঃশেষে পচে গেছে। শয়তান আমাকে অধিকার করেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পবিত্রতার কথা আর ভাবতেই আমি পারি না। দুর্দান্ত ক্রোধে অন্তর আমার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড আক্ষেপ জেগে ওঠে শরীরে। আমি কাঁদতে পারি না। আমি ব্রাউনের উপর রাগে আক্রোশে বেরিয়ে এসেছিলাম, ফেলে দিয়েছিলাম বাইবেল; পাছে তোমার সঙ্গে দেখা হয় এই ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম জঘন্য পল্লীতে। সঙ্গে আমার মা। সে এই রাত্রির মতো। অন্ধকার মূক। পাপ কর, পুণ্য কর, কোনো কিছুতে প্রতিবাদ নেই, শাসন নেই, বরং নীরব প্রশ্রয় আছে; কালো সর্বাঙ্গে কাপড়ের কালো ঘের দিয়ে ঢেকে রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। জীবন আরম্ভ করলাম রিপন স্ট্রীট অঞ্চলে। নাইট ডেনের জীবন। ফিটনের কোচম্যান, ডেনের বয়েরা যার পরিচালক। সেখান থেকে হোটেলে গিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে এই যুদ্ধের মধ্যে দেহ বিক্রি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শয়তান বেঁধে রেখেছে আমাকে। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'রিনা!' শিউরে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী।

'না। দোষ কাউকে দেব না। সব আমার জন্মফল। আমার জন্ম থেকেই পঙ্ককুণ্ড কৃষ্ণেন্দু, সেখানে তুমি পাঁকে কবরে চাপা পড়েছ, ঈশ্বর পড়েছে, ঈশ্বরের পুত্র পড়েছে, ব্রাউন সাহেব দিয়েছে চাপা।'

'রিনা।' হাতখানি টেনে নিলেন কৃষ্ণস্বামী।

'আমাকে চাও তুমি? প্রেম নেই। দেহ দিতে পারি আমি। প্রাণ নেই। মন নেই। মনও গেছে। প্রেমও নেই। চাও তুমি প্রাণহীন, মনহীন শুধু কোমল মাংসপিণ্ডের এই দেহ?'

হাত ছেড়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন 'ভগবান তোমাকে দয়া করুন—'

'নো! নো! নো! ও নাম কোরো না।'

'মৃতকে তোমার ভয় কি?'

'ভয় নয়, ঘৃণা। শোনো কৃষ্ণেন্দু, তুমি এখানে থাকতে আমি স্বস্তি পাব না। তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে। তুমি যাও। কৃষ্ণেন্দু! না হলে হয়তো আমি তোমাকে গুলি করে মারব! কিংবা ওরা মারবে। ওরা যদি জানতে পারে—তোমার জন্যে আমি চলে যাব, তা হলে ওরা ক্ষমা করবে না।'

কৃষ্ণস্বামী অন্ধকারের মধ্যেই যেখানে দেওয়ালের ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি মূর্তি টাঙানো ছিল

সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন : হে অবিনশ্বর ! নিজেকে প্রকাশ করো তুমি ।

'কৃষ্ণেন্দু, তুমি যাবে কি না বলো ।'

'না ।'

'না ?'

'না ।'

'অন্যত্র গিয়ে তুমি তোমার কাজ করো । আমাকে উত্ত্যক্ত কোরো না তুমি ।'

'না ।'

'কেন ? কিসের জন্য ? আমার জন্য ? আমার দেহ চাও ?'

অত্যন্ত স্থির সঞ্চালনে ঘাড় নাড়লেন কৃষ্ণস্বামী । বললেন, 'না । তোমার দেহ নিয়ে কী করব ? আমি চাই তোমার আত্মাকে । তোমার মনকে । দেহ মরে যায় পচে যায় । আত্মা অমর । যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ ।' সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিলেন, 'কী হবে ওতে ? আমি তোমার আসল তোমাকে চাই । তোমার চিরন্তন তোমাকে । ইহকালের পরকালের তোমাকে ।'

'সে নেই । পাবে না । তবে কেন ? কিসের জন্য থাকতে চাও এখানে ? কিসের জন্য ? মরবে ?' চিৎকার করে উঠল রিনা ।

'মরব ।' শান্ত কণ্ঠে কৃষ্ণস্বামী বললেন,—'ছাট উইল বি মাই ক্রুশিফিকেশন । আই এ্যাম হিয়ার টু বি ক্রুশিফায়েড এগেন ।'

বলতে বলতেই রিনার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে তিনি জ্বালালেন । ছটাটা গিয়ে পড়ল ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির উপর ।

পর-মুহূর্তেই রিনা ক্ষিপ্রবেগে কী টেনে বের করলে । পিস্তল । পিস্তলটা তুলে গুলি করলে । মূর্তিটা ভেঙে পড়ে গেল । কৃষ্ণস্বামী চিৎকার করে উঠলেন—'রিনা !'

রিনা বেরিয়ে চলে গেল কক্ষচ্যুত উল্কার মতো । এতক্ষণে সচেতন হলেন কৃষ্ণস্বামী । দ্রুত বেরিয়ে এলেন—ডাকলেন—'রিনা ! রিনা । রিনা !'

'নো ! নো ! নো !' উত্তর ভেসে এল দূর থেকে—'নো ।'

* * *

সেই অন্ধকার বর্ষণমুখর রাত্রিতে তিনি পথের ধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন । তাঁর ধারণা হল—রিনা নিশ্চয় ফিরবে । কিন্তু রিনা ফিরল না ।

পরদিন তিনি গেলেন পিয়ারা-ডোবা । রিনা ব্রাউন কোথায় ? কোন খোঁজ মিলল না । বনের ভিতরটা তিনি খুঁজলেন । রিনার মৃতদেহ মিলল না । নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেন—মরেছে সে ? উত্তর পেলেন—না সে মরেনি । নিজে সে মরবে না । না ।

সেই থেকে আর রিনাকে দেখা গেল না ।

আরও কতদিন কৃষ্ণস্বামী গেলেন পিয়ারা-ডোবা ; কতদিন মোরাবে রাস্তার তেমাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন । কতদিন রামচরণের ফটকে অপ্রয়োজনে বসে রইলেন । কত জীপ গেল । কত বিলাসিনী গেল । কিন্তু রিনা নেই তাদের মধ্যে ।

রামচরণ, রামচরণের ছেলে বললে, 'সি মেমটো কোথা গেল বাবাসাহেব ?'

কৃষ্ণস্বামী কী বলবেন ? বলেন, 'কে জানে!'

কে জানে ? সে কোথায় ? কোন দূরান্তরে দূরবিস্তৃত যুদ্ধের সীমানায় রিনা তামসী উল্কার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। অথবা অন্ধকারচারী সরীসৃপের মতো। কে জানে ?

৭

পৃথিবী শুধু জল আর মাটি নয়। সমুদ্র বন পাহাড়—এর মধ্যেই পৃথিবীর সীমানা শেষ নয়। তার একটা ঊর্ধ্বলোক আছে। আকাশে মাধ্যাকর্ষণ যতদূর ততদূর তার সীমানা। আবার মাটির বুকের ভিতরে অন্ধকার গহ্বরে তার একটা অধোলোক আছে। সেই মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। বিচিত্র ভাবে এই মাটির তলায় যে বীজ ফাটে, সে মাধ্যাকর্ষণযুক্ত থেকেও উপরের দিকে মাথা ঠেলে ওঠে। গাছের মূল থাকে মাটির নীচে, ফুল ফোটে আকাশে। পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। আকাশে উঠে আরও আরও উপরে উঠতে চায়। কিন্তু তার নীড় মাটির বুকে ঠেকানো গাছের ডালে, সেখানে তাকে নামতে হয়। সরীসৃপ থাকে মাটির বুকের অন্ধকার গহ্বরে ; তাকে উঠে আসতে হয় মাটির উপরে, বায়ুর জন্য, আহারের জন্য, আলোর জন্য ?

কৃষ্ণস্বামীর মন বিহঙ্গের মতো আকাশ-বিহারী। আলো, আরও আলোর জন্য সে ডানা মেলেছে। রিনা ব্রাউনও একদিন সেই পাখা-মেলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল। আশ্চর্য মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের শক্তি, বাবা জেমস ব্রাউনের আঘাতে সেই রিনা ব্রাউন অন্ধকার গহ্বরে সরীসৃপ হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দু বাল্যজীবনে পুরাণে পড়েছিল একজন রাজা কার অভিশাপে অজগর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে গল্প শুনেছিল কাজলহারার। কাজলহারা ঠিক রিনার মতো স্ফটিকে ডানা মেলে, তার সতীন তাকে জাদুদণ্ডের প্রহারে সাপিনীতে পরিণত করেছিল। ব্রাউন ঘৃণা ও অমর্যাদার এই জাদুদণ্ড দিয়ে আঘাত করে তাকে ঠিক সাপিনীই করে দিয়েছে। রিনা উল্কা নয়, সে সরীসৃপ।

কিন্তু পাখিকেও মাটির বুকে নামতে হয়। সরীসৃপকেও মাটির উপরে আসতে হয়। হঠাৎ দুজনে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাই যেন হয়েছিল। কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে রিনা ব্রাউনের এই জীবনের দেখাটা ঠিক যেন তাই। অন্ধকার রাত্রে সরীসৃপরূপিণী রিনা বিহঙ্গ কৃষ্ণস্বামীর নীড়ে এসে বিষনিশ্বাসে গর্জন করে তাঁকে শাসিয়ে চলে গেল। আর দেখা হল না।

কৃষ্ণস্বামী কয়েকদিন অন্ধকার রাত্রে সরীসৃপের জন্য প্রতীক্ষা করলেন, কিন্তু সে আর এল না। কোথায় কোন দূরে নূতন অন্ধকার বিহারের সন্ধানে সে চলে গেছে। কৃষ্ণস্বামী পক্ষ বিস্তার করে দিলেন আকাশে। ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে উঠবেন তিনি। রিনা তার পথে গেছে, তিনি তাঁর পথে চলবেন। শুধু মাঝে মাঝে আকাশচারী বিহঙ্গের মাটির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর মতো রিনার কথা মনে পড়লে, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, ভগবানের কাছে তাঁর

মঙ্গল কামনা করেন। মঙ্গল করো প্রভু। রিনার চিত্তকে সুস্থ করো, শান্ত করো। কুষ্ঠরোগী এসেছিল তোমার কাছে, তুমি তাকে স্পর্শ করেছিলে। সে নবজীবন লাভ করেছিল। তেমনি করে রিনার চিত্তকে সুস্থ করো। বলো, 'বী দাউ ক্লীন।' আবার কিছুক্ষণ পর রিনার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। অসময়ে বাইসিক্ল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান।

'কেমন আছ হে তোমরা সব ? অঁা ? মহাশয়রা গো ?'

'ভালো কোথা বাবাসাহেব ? খুদ খেয়ে আর বাঁচে মানুষ, প্যাটের ব্যামো ধরে গেল। ছেল্যা মেয়া ছা-ছিড়ি সব—সব।'

'দেখছি, দেখছি এস.ডি.ও-কে বলে দেখছি।'

'কিরাচিনি তেল আর কাপড়ের কথা বলবা বাবা।'

'বলব। কিন্তুক এখনই কারুকে হাত-টাত দেখতে হবে নাই ত ?'

'ছুরুক-ছারুক অসুখ, ই আর কী দেখবেন গো ?'

'ওই বাচ্চাটার পিঠে উ দাগটো কিসের বটে হে ? দেখি দেখি।'

হঠাৎ চোখে পড়েছে একটি ছেলের পিঠের ঘাড়ের কাছে একটি বিবর্ণ সাদা দাগ! 'দেখি রে খোকা, ইদিকে আয়, ইদিকে আয়, শুন শুন।'

'হা ক্যানেরে, হারামজাদা বজ্জাত! দেখা ক্যানে ?'

দেখে-শুনে বলেন, 'তাই ত হে মহাশয়, কেমন পারা লাগছেক যেন গো! ইয়াকে ত দেখাতে হয়। নিয়ে যেয়ো ক্যানে আমার উখানে। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখব।'

আবার রওনা হন। কুষ্ঠের প্রসার দেখে মনে চিন্তিত হন, বেদনা অনুভব করেন। ভুলে যান অন্য সব কিছু।

নিজের মাইক্রোসকোপ কৃষ্ণস্বামীর গোড়া থেকেই আছে, ছাত্রজীবনে যখন বন্ধুর সঙ্গে তার আওতায় থেকে প্র্যাক্‌টিস করতেন, তখন থেকেই আছে। কম দামে যোগাড় করে দিয়েছিল ক্লেটন। কারবারটা চোরাই মালের তা জেনেই কৃষ্ণেন্দু কিনেছিল। তখন সে ছাত্র-আমলের কৃষ্ণেন্দু। দ্বিধা তার হয়নি। ওটা দিয়ে যখন কাজ করেন কৃষ্ণস্বামী তখন ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেন। সঙ্গে প্রণাম করেন মাকে বাবাকে। মা তাঁর সমস্ত গহনাই দিয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণেন্দুকে। সে-গহনা বিক্রী করে সে ঠিক করেছিল বিলেত যাবে। তখনই ঘটল রিনার সঙ্গে জীবন দেওয়া-নেওয়া। এবং তার কিছুদিনের মধ্যে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সে একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো। জেমস ব্রাউন বললে—ক্রীশ্চান হতে হবে। বাবার পায়ে ধরেও মত পেলে না। উন্মত্তের মতো ফিরে এসে রিনাকে জিজ্ঞাসা না করেই ক্রীশ্চান হ'ল। রিনা ঘৃণা ও আতঙ্কভরে মুখ ফেরালে—একটি নারীর জন্যে তুমি তোমার এতকালের ভগবানকে ত্যাগ করেছ কৃষ্ণেন্দু? তুমি ভয়ঙ্কর। না—না। কৃষ্ণেন্দু বের হল সেই ঈশ্বরের সন্ধানে—যে ঈশ্বর রিনার কাছে তার চেয়েও বড়—পৃথিবীর সব কিছু থেকে বড়। টাকাটা থেকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্কে।

আগেকার কৃষ্ণেন্দু ছিল মায়ের গোপাল। সংসারের সব জিনিসে ছিল তারই অগ্র

অধিকার। সে নিতেই জানত, দিতে জানত না। শেখে নি! প্রথম দিতে শিখল, রিনার হাতে নিজেকে দিয়ে। রিনা তাকে ঠেলে দিল ঈশ্বর সন্ধানের পথে। বৈজ্ঞানিক যদি বলে ফ্রাস্ট্রেশনের পথে তো—বলুক, সে একটু হাসবে, প্রতিবাদ করবে না।

থাক রিনার কথা। তার কথা ভাবতে ভাবতে সময়ে সময়ে মনে হয়, রিনা জন্ম থেকেই বোধ হয় পেয়েছিল ঈশ্বরকে; তাকে ফিরিয়ে দেবার সময় তার সেই ঈশ্বরকে নাস্তিক কৃষ্ণেন্দুকে দিয়ে নিজে কাঙাল হয়ে গেল। হিন্দুপুরাণ মহাভারতের কর্ণের কথা মনে পড়ে। তার মায়ের নাম ছিল কুন্তী। কুন্তীর কুমারী-জীবনের সন্তান—কর্ণ কবচকুণ্ডল নিয়ে জন্মেছিল। রিনার জন্মগত ঈশ্বরবিশ্বাসও তাই। কর্ণ কবচকুণ্ডল দান করে মৃত্যুবরণ করেছিল। রিনা ঈশ্বরবিশ্বাস তাকে দিয়ে তামসী হয়ে গেল। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। হে ঈশ্বর, তার জীবনের কবরখানাকে জীবনময় করে তুলে তুমি নূতন করে জাগো। মানুষের প্রাণশক্তির শুভবুদ্ধি, তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকার আলো, হে ঈশ্বর, তুমি জাগ্রত হও। তোমার হাতে রিনাকে সমর্পণ করে কৃষ্ণস্বামী নিশ্চিন্ত। তার কল্যাণের জন্যই কৃষ্ণস্বামী নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করবে তোমার পায়ে, তোমার কর্মে; অন্তরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রিনাকে নীরোগ কর তুমি; কৃষ্ণস্বামী তোমার সংসারে কুষ্ঠরোগীর সেবা করে তোমাকে সেবা করবে।

এবার কৃষ্ণস্বামীর বাবার কথা মনে পড়ে যায়। স্বল্পবাক, নির্লিপ্ত মানুষ। আশ্চর্য কঠিন। তবুও তিনি তাঁর সম্পত্তি-বিক্রি-করা টাকা তাঁকেই দিয়ে গেছেন। এক কথায় কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিলেন, 'যাও। প্রয়োজন নেই তোমাকে।' বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন ঠাকুর নিয়ে। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। কিছু টাকা এবং ঠাকুরটি মঠে দিয়ে গেছেন। নিজের জীবনের জন্য সামান্য টাকাই খরচ করেছিলেন। বাকি তেরো হাজার কয়েক শো ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, উকিলকে বলেছিলেন, কৃষ্ণেন্দুর খোঁজ করে টাকাটা দিতে। সেটা কৃষ্ণস্বামী পেয়েছেন। তাই থেকেই চলে আশ্রম। এবার আশ্রমটিকে কুষ্ঠ হাসপাতাল করে তুলবেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে একটা কুষ্ঠরোগীর ডিসপেনসারি খুললেন কৃষ্ণস্বামী। আউটডোর।

রিনার মঙ্গল হোক। এই কর্মের মধ্যে রিনার আকর্ষণ ছিন্ন করে দাও।

লাল সিং সিন্ধু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। 'বাবাসাহেব; ই ত ভাল হচ্ছে নাই।'

কৃষ্ণস্বামী হাসেন। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করেন, 'তোমারও ভয় লাগছে লাল সিং?'

লাল সিং মৌন থেকে জানায়, হ্যাঁ লাগছে।

সিন্ধু স্পষ্ট বলে, 'হ্যাঁ বাবাসাহেব। মহাব্যাধিকে ভয় কার নাই বলেন? হ্যাঁ—আপনকার নাই বটে। তা আপনার পুণ্য আছে, আমাদের তা নাই। কী করব কন?'

বর্বরা ঝুমকি ভয় করে না। ঘৃণা করে। বলে, 'বড়া খারাপ বাসায়। গন্ধো কী! উঃ, আর কী হয়ে যায়—হাক থু!'

মধ্যে মধ্যে সেই আমেরিকান মিলিটারী অফিসারটি আসে। এখন আর 'হে ম্যান' বলে না। বলে, 'মর্ণিং রেভারেণ্ড!'

মধ্যে মধ্যে সে রিনার খবরের কথা তোলে। বলে,—ডোণ্ট নো—হোয়ার শী ইজ গন! শী ওয়াজ—ওয়াণ্ডারফুল!' হঠাৎ সেদিন বললে,—'শুনলাম আসাম ফ্রণ্টে ঘুরছে। ঠিক তো বলা যায় না। তবে অনেকটা মেলে সেই ডেয়ার-ডেভিল মেয়েটার সঙ্গে।'

'আসাম?'

'ইয়েস। গৌহাটি—শিলং। চিটাগং। জাস্ট লাইক হার, লাইক এ শুটিংস্টার।'

সেই মুহূর্তে ঝুমকি এসে দাঁড়াল,—'বাবা সাহেব!'

অফিসারটি বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে—'এ যে কৃষ্ণমর্মর-মূর্তি রেস্তারেও।'

কৃষ্ণস্বামী মনে করিয়ে দেন, 'এটি আসলে একটি চার্চ, মিস্টার অফিসার!'

সামনে যুদ্ধ! মাথার উপর মৃত্যুর পরোয়ানা যাদের, তারা যত উদ্দাম তত ভীরু। ঈশ্বরের রোষকে ভয় না করে পারে না। অন্তত ঘাঁটাতে চায় না ঈশ্বরকে। গায়ে ক্রশ এঁকে সরে যায়।

কৃষ্ণস্বামী লাল সিংকে ডেকে পরদিন বললেন, 'লাল সিং, আমার শরীরটা বড় খারাপ মনে হচ্ছে, আমি কিছুদিন বাইরে যাচ্ছি।'

'কোথা যাবেন বাবাসাহেব? আপনি না থাকলে ইখানে আমরা কী করে থাকব?'

'পনেরো কুড়ি দিন। তার বেশী নয়। তোমরা গ্রামের মধ্যে যেমন থাক থাকবে।'

পঁচিশ দিন পর ফিরে এলেন কৃষ্ণস্বামী। শরীর সারে নি, বরং শীর্ণ হয়েছে। সিন্ধু বললে, 'শরীর যে খারাপ করে এলেন বাবাসাহেব!'

'অনেক ঘুরেছি সিন্ধু! অনেক কাল ইখানেই থেকে মনটা হাঁপিয়ে ছিল। ছাড়া পেয়ে খুব ঘুরলাম। সেই একেবারে যুদ্ধের লাগালাগি জায়গাতে। শিলং, গৌহাটি, ইখান-সিখান। ঘুরে ঘুরে শরীর খারাপ হবে বইকি! তবে হাঁ, মনটা ভাল হইছে।'

চট্টগ্রাম থেকে গৌহাটি পর্যন্ত যুদ্ধের লাইনের স্থানগুলিতে খবর নিয়ে ফিরেছেন। হাঁ, খবর পেয়েছেন। ঠিক এমনি একটি মেয়ে ছিল। সে মরেছে। কেউ তাকে খুন করে গৌহাটি থেকে শিলংয়ের পাহাড়ের পথে একটা খাদে ফেলে দিয়েছিল।

সম্ভবত কোনো নিষ্ঠুর সৈনিক। রিনার উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। পোস্ট মর্টেমে জানা গেছে, তার পেটে ছিল মদ, আর জানা গেছে যে, হতভাগিনী কদর্যব্যাধিগ্রস্তা ছিল।

নিশ্চিন্ত হয়েছেন কৃষ্ণস্বামী। রিনা তার জীবনের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে গেছে অথবা নিষ্ঠুর মূল্য দিয়ে এই উল্কা-জীবনের দেনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে গেছে। পুলিস বিভাগ তার কোনো পরিচয় পায় নি। কৃষ্ণস্বামীকেই তারা প্রশ্ন করেছিল, 'জানতেন নাকি একে?'

'না। এ সে নয়।'

এই জবাব দিয়েই কৃষ্ণস্বামী চলে এসেছেন। মিথ্যা বলেন নি, এ সে নয়। কিন্তু ঈশ্বর, তুমি কেন তাকে দয়া করলে না। ভাল—তার বিচারের সময় তুমি তাকে দয়া করো।

এইবার,—হে ঈশ্বর, তোমার সেবায় আমাকে মগ্ন করে দাও। সেই সঙ্কল্প নিয়েই ফিরেছেন। কলকাতা থেকে অনেক কষ্টে ওষুধপাতিও কিনে এনেছেন; সেগুলো সেই দিনই সাজিয়ে ফেললেন। ডুবে গেলেন এই সেবাকর্মে।

* * *

বছরখানেক পর একদিন সকালে ঝুমকি এসে দাঁড়াল।

'বাবাসাহেব।'

'কী?'

'লাল সিং কাল রেতে চলে গেছে।'

'চলে গেছে? সে কি? কোথা গেছে?'

'কে জানে? সিউয়া জানে। বললে, কুষ্ঠ নিয়ে কারবার করে সাহেবের কুষ্ঠ হল, আবার থাকে? চল সিন্ধু পালিয়ে বাঁচি।'

'কী বললে? কার কুষ্ঠ হয়েছে?'

'কাপ্তেন হুজুর হয়েছে।'

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণস্বামী। তাঁর কুষ্ঠ হয়েছে? কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁর বুদ্ধি সক্রিয় হল। 'কোথায়? কই?'

নিজের আঙুলগুলি চোখের সামনে মেলে ধরলেন। ছোট আয়না দেওয়ালে টাঙানো ছিল, সেখানার সামনে দাঁড়ালেন। কই? কোথায়?

ঝুমকি বললে, 'উঁহু। উঁহু। যেমন দাগ দেখে তুই বলিস—কুষ্ঠের লক্ষণ ওটা, তেমনি চাকা-চাকা দাগ একটা উঠেছে যে হুজুর। পিঠের দিকে। তুমি দেখবি কী করে?'

'কোথায়?'

কৃষ্ণস্বামীর জামাটা তুলে পিঠের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে ঝুমকি বললে, 'এই যে। এইটা। ঠিক লেগেছে উটি? না?'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৃষ্ণস্বামী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি যেন খানিকটা অবশ হয়ে গেছেন। আঘাত পেয়েছেন তিনি। এর জন্য প্রস্তুত তিনি ছিলেন না। এর সম্ভাবনা ছিল না এমন নয়, তবু যখন সত্যি সত্যি এল, তখন সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে; বড় কষ্ট হচ্ছে। হয়েছে। ঝুমকি যেখানকার আঙুল দিয়েছে সেখানকার সাড় নেই, ঝুমকির আঙুলের স্পর্শ তিনি বুঝতে পারছেন না।

কিনা! কিনার জন্য। কোনো কিছু যেন মনের মধ্যে ধরা পড়ে নি। মন ওইদিকে এমনই ব্যস্ত ছিল যে, অন্য দিকের সব কিছুই চোখের উপর দিয়েই তাঁর অলক্ষ্যে চলে গেছে।

মস্তিষ্কের মধ্যে কোষে কোষে বেদনার আবেগ কুণ্ডলীবদ্ধ আগুনের মতো ফেটে বেরুতে চাচ্ছে। কৃষ্ণস্বামী পাহাড়ের মতো তাকে নিজের মধ্যে রেখেছেন। কাঁপতে দেবেন না। ফাটতে দেবেন না। আগুন ধরিত্রীগর্ভে প্রাণের উত্তাপে পরিণত হোক। প্রাণকোষে-কোষে সে-আগুন সহস্র প্রদীপশিখার মতো জ্বলে উঠুক আনন্দ-দীপালিতে ভগবানের আরতিতে।

অনেকক্ষণ পর তিনি আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'আমি বাঁকুড়া যাচ্ছি ঝুমকি।'

বাঁকুড়ায় নূতন কী বলবে? বলবে, ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে। অনিবার্য এসেছে। এর পর? কোথায় যাবেন, কী করবেন?

হ্যাঁ, এসেছে। কার্যকারণের পরিণাম! কৃষ্ণস্বামীকে তিরস্কারও শুনতে হল। এইভাবে সংঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চেষ্টার বাইরে একক চেষ্টা করার অনিবার্য পরিণাম!

চুপ করেই গেলেন কৃষ্ণস্বামী। শুধু একটি হাস্যরেখা ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল।

লর্ড, আই ক্রাই আন্টু দী: মেক হেস্ট আন্ টু মী।

চিন্তার খুব কারণ আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আর তো এইভাবে লোকের চিকিৎসা করে বেড়ানো ঠিক হবে না আপনার।'

'নিশ্চয়। এ তাঁর নির্দেশ। আসতে আসতে ভেবেছি আমি। আমি চলে যাব। কুম্ভকোণম লেপার অ্যাসাইলামে। সেখানে আমার চিকিৎসাও হবে, আমি ডাক্তার হিসাবে কিছু কাজও করতে পারব।'

'গড বী উইথ ইউ।'

মাদ্রাজ উপকূলে কুম্ভকোণম কুষ্ঠাশ্রম। বিরাট কুষ্ঠাশ্রম। নিপীড়িত ভগবানের সেবায়তন। আজ মনে পড়ল রিনা ব্রাউনকে। স্ফটিকে-গড়া মূর্তির মতো পবিত্র কুমারী রিনা ব্রাউন, আসানসোলের চার্চইয়ার্ডে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার সময় তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে, তাঁর ঈশ্বরকে কি এই পথে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল? না। এই পথ তিনি নিজে বেছে নিয়েছেন?

সেট্ এ ওয়াচ, ও লর্ড, বিফোর মাই মাউথ: কিপ দি ডোর অব্ মাই লিপস্।

একটা ক্ষুব্ধ বাক্যও যেন কৃষ্ণস্বামী উচ্চারণ না করে।

চলো কুম্ভকোণম। শেষ আশ্রম।

* * *

সত্যের চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নেই; ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশন: সত্যে মৃত মানুষও বাঁচে, কল্পনার কাহিনীতে বাঁচালে অবিশ্বাস্য হয়। বাস্তব জগতে বস্তু থেকে প্রাণ কালোর সঙ্গে যুদ্ধ করে তার সীমানা অতিক্রম করার জন্য যুগ যুগ ধরে ছুটছে, সম্মুখে দিগন্তে আলোর রাজ্য উজ্জ্বল মহিমায় আহ্বান জানাচ্ছে, তবু মানুষের কানের কাছে অবিশ্বাসী বুদ্ধি কূট তর্কে মুখর হয়ে বলছে, আলো নয়, আলেয়া। আলো মিথ্যা, কালোই সত্য। অমৃত কল্পনা, মৃত্যুই সত্য।

আরও আট মাস পর।

কুম্ভকোণম সেবায়তনে সেদিন ক্লান্ত শরীরে শুয়ে আছেন কৃষ্ণস্বামী। এইখানেই তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। সবচেয়ে কঠিন রোগের রোগীদের তিনি চিকিৎসা করেন। তাঁর নিজের চিকিৎসাও হয়। রোগ বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়ে এতদিনে তার গতি রুদ্ধ হয়েছে। নাকের পেটি ঈষৎ স্ফীত হয়েছে; মুখে, কপালে, গালে, অসুস্থ রক্তাভ মসৃণতা দেখা

দিয়েছে; কানের পেটি দুটিও ফুলেছে। হাতের আঙুল ঠিক ফোলে নি, তবে তৈলাক্ত হাতের আঙুলের মতো দেখায়। প্রথমদিকে দ্রুতবেগেই বেড়েছিল। এখন রোগের গতি রুদ্ধ হয়েছে।

এদিকে কালের পটভূমিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে বিস্ময়কর রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটল। স্বাধীন হচ্ছে ভারতবর্ষ। বিভক্ত হচ্ছে ভারতবর্ষ। কৃষ্ণস্বামী দেখেন, আর নিত্য বলেন, এ-জয় তোমারই জয়! মানুষের মধ্যে সত্যের তপস্যাই তুমি। তোমারই জয়। যা হচ্ছে—তার মধ্যে ছলনা মিথ্যা যতই থাক মানুষের, তার চেয়েও বেশী আছে তোমার দেওয়া সত্যের তপস্যা। আমি জানি। রিনার জীবনের পাপ বড় নয়, প্রায়শ্চিত্ত বড়। আমি জানি। সে জীবন দিয়েছে নিজে। আমাকে দিয়ে গেছে তোমার করুণা। তার আত্মাকে তুমি শান্তি দিয়ো। তার সমস্ত পাপ আমার দেহে ব্যাধি হয়ে তার পাওনা শোধ করে নিক।

ক্লান্ত দৃষ্টিতে নিজের ঘরে খোলা দুয়ারের পথে তিনি সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। মনে মনে এই কথাগুলিই বলছিলেন। একজন ডাক্তার এসে বললেন, 'রেভারেণ্ড, একজন ইংরেজ ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি বলেছি আপনার শরীর অসুস্থ, কিন্তু তিনি বললেন, অনেক দূর থেকে আসছেন, এবং বললেন, বলবেন, আমার নাম জনি, জন ক্লেটন!'

'জন ক্লেটন!' বিস্ময়ে চমকে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী। জন ক্লেটন সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এই লেপার অ্যাসাইলামে! 'কই? কোথায়?'

দূরে দেখা গেল শ্বেতাঙ্গ দম্পতি আসছে। কিন্তু--কিন্তু—ও-কে? একি এল?

অকস্মাৎ ঘরগুলো দুলতে লাগল, পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে। সামনের গাছপালা আকাশ আলো সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, কী হয়ে যাচ্ছে! জ্যোতির্লোকে যেন বিস্ফোরণ হচ্ছে। ক্লেটনের পাশে ও-কে? কৃষ্ণস্বামী চিৎকার করে উঠলেন, 'রিনা!'

জন ক্লেটনের পাশে রিনা! রিনা ক্লেটনের স্ত্রী!

* * *

'হ্যাঁ কৃষ্ণেন্দু। আমি। আমাকে দেখে তোমার বিস্ময়ের কথাই বটে। কিন্তু তুমি, তুমি আমাকে আশ্চর্যভাবে অশরীরীর মতো অনুসরণ করে আমাকে অহরহ ডেকেছ। কাম ব্যাক্, কাম ব্যাক্, ফিরো এসো, ফিরে এসো বলে ডেকেছ। ফিরতে চাইলাম। পালিয়ে গেলামও এলাকা ছেড়ে; কিন্তু কে আমাকে হাত বাড়িয়ে দেবে? কার হাত ধরে আমি আবার মানুষের হৃদয়ের রাজ্যে প্রবেশ করব? তোমার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু পারি নি। ভয়ে পারি নি আমি গুলি করে—'

চুপ করে গেল রিনা। উচ্চারণ করতে পারল না সে-কথা।

কৃষ্ণস্বামীর বিস্ময় কেটে আসছে।

রিনা বললে, 'তুমি বলেছিলে, মানুষের অন্তরে ভগবানের পুত্রকে তার মন্দ বুদ্ধি নিত্য ক্রুশবিদ্ধ করে, নিত্য তিনি নবজীবনে জেগে ওঠেন। অনুভব করলাম এ সত্য। কিন্তু 'ভবু

তোমার সামনে যেতে পারলাম না। তোমার সেই ভয়ঙ্কর কথা আমার কানে বাজত। তুমি বলেছিলে, আমি এখানে থাকব টু বী ক্রুশিফায়েড এগেন। তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সেইন্ট, তোমার পাশে আমি দাঁড়িয়ে কলুষিত করতে পারি তোমাকে? কিন্তু—'

চোখ দিয়ে রিনার জল গড়িয়ে এল।

জন ক্রেটনও যেন সেই কৃষ্ণেন্দুর বন্ধু জনি নয়। অথবা কৃষ্ণস্বামী কৃষ্ণেন্দু নন। জন ক্রেটনও তাঁর সঙ্গে সম্ভ্রমভরে কথা বলছে। অবশ্য ক্রেটনও আর সে-ক্রেটন নয়। সে পরিণত-বয়স্ক মানুষ। পোড়া-খাওয়া মানুষ। অনেক দুঃখ পেয়েছে। প্রথম স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ করে চলে গেছে। যুদ্ধে বন্দী হয়ে দীর্ঘদিন পূর্বাঞ্চলের বন্দীশিবিরে কাটিয়েছে। আজও তার দেহ শীর্ণ। ভিতরে বাইরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রেটনের কানের পাশে গুলির দাগ। কপালে সারিসারি রেখা দেখা দিয়েছে। কণ্ঠস্বর তার শান্ত। তার জীবনেও বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ক্রেটন বললে, 'যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলাম। মুক্তি পেয়ে ফিরে কিছুদিন পর গেলাম কাশ্মীর। শরীরটা একটু সুস্থ হবে। মনে ক্লান্তির সীমা নেই। হঠাৎ কাশ্মীরে দেখলাম রিনাকে। ঝড়ে ডানাভাঙা বোবা-হয়ে-যাওয়া পাখি দেখেছ কৃষ্ণেন্দু?'

হেসে ক্রেটন বললে, 'তোমাকে কৃষ্ণেন্দু বলতে বাধছে রেভারেণ্ড। তুমি সত্যি পবিত্র।'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'একমাত্র ভগবানই পবিত্র ক্রেটন। যারা জীবনের বেদনাকে তাঁর পায়ে ঢেলে দেবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তাদের উপর তাঁর আলো পড়ে, তাদের পবিত্র মনে হয়। নইলে তারাও মানুষ ক্রেটন।'

বিচিত্র হেসে তারপর বললেন, 'আমি ধারণা করেছিলাম, রিনা শিলং ফ্রন্টে। এখানকার একটি অ্যামেরিকান অফিসার বলেছিল—রিনা শিলংয়ে। সেখানকার কে এক অফিসার তাকে একটি উন্মত্তপ্রায় মেয়ের কথা বলেছিল। তার ধারণা হয়েছিল—সে রিনা। আমি শিলংয়ে গেলাম। ওকে ফিরিয়ে আনব জীবনে। গিয়ে শুনলাম সে মেয়েটি মরেছে। তাকে কে রাত্রে খুন করে খাদে ফেলে দিয়েছিল।'

রিনা সজল চক্ষে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কৃষ্ণস্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কত খাদে, কত জঙ্গলে, এমন কত হতভাগিনীর জীবন শেষ হয়েছে, দেহ শকুন-শেয়ালে খেয়েছে, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তার হিসেব নেই। আমারও যেত কৃষ্ণেন্দু, যদি সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হত, যদি তোমার স্মৃতি আমার পিছনে দেবদূতের মতো অহরহ না ফিরত—তবে আমারও ওই হত। আমি পিয়ারা-ডোবা থেকে পালিয়ে গেলাম সেই রাত্রে। সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই ক্যাম্পের দিকে যেতে যেতে গেলাম না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন দুলছে, কাঁপছে, ভেঙে পড়ছে; ভেঙেচুরে আর একরকম হয়ে যাচ্ছে। মনে হল ক্যাম্পের মধ্যে আকাশের মেঘের মতো পুঞ্জপুঞ্জ বিরক্তি তিক্ততা জমে উঠেছে—ঘুরপাক খাচ্ছে। ওখানকার মানুষগুলোকে বীভৎস কুৎসিত মনে হল। কি যে মনে হয়েছিল ঠিক বলতে পারব না। তবে ওপথে যেতে যেতে অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল—না। ওখানে নয়! না—না—না।'

'দাঁড়ালাম। তারপর দুরন্ত রাগ হল তোমার উপর। ফিরলাম দুরন্ত রাগে—তোমাকে খুন করব। দেখলাম তুমি সেই জলের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ পথের দিকে তাকিয়ে। বুঝলাম—আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ। মুহূর্তে আমি সাহস হারালাম, রাগ হারালাম; কাঁপতে লাগলাম। থর থর করে কেঁপেছিলাম। কেঁদেছিলাম। তারপর ভেবেছিলাম—মুখে রিভলবারের নল পুরে গুলি করে উন্মত্ত যন্ত্রণাজর্জর জীবনটাকে শেষ করে দেব। কিন্তু তাও পারলাম না। তুমি পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য শক্তি তোমার সেই স্থির মূর্তির। আশ্চর্য শক্তি। তারপর তুমি চলে গেলে আমি পালালাম। ছুটে পালিয়েছিলাম মাইলখানেক। তারপর একখানা জিপ পেয়েছিলাম। ব্যাঙ্কুরা এসে ট্রেন ধরলাম। কোথায় যাব? স্থির করলাম অনেক দূরে যাব। অনেক দূরে। প্রচণ্ড উন্মত্ত কোলাহল—ভয়—পাশবিকতার মধ্যে, মরণ নিয়ে খেলার মধ্যে—যেখানে ভাববার অবকাশ নেই। আছে মরা আর মারা; আর অবসরের মধ্যে নেশা আছে, খাওয়া আছে—আর আছে উন্মত্ত দেহভোগ! এলাম আসামে। শিলংয়ে আমি যাই নি—আরও সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এলাম। যখন পৌঁছলাম,—তার আধ ঘণ্টার মধ্যে হল একটা এয়ার-রেড। একটা মাটির গর্তে লুকিয়েছিলাম। রেড শেষ হল। তখন পিছু হটার হুকুম হয়েছে। একজন অফিসার আমাকে জীপে নিয়ে নিলে মরণের মুখে ভোগসংসার। রাত্রের সে অভিজ্ঞতা আমার চিরস্মরণীয়—আমি ভুলব না। অরণ্যভূমের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছিল। আমি দেখলাম একা তুমি সহস্র হয়ে চারিপাশে ঘিরে রয়েছ আমাকে। তারপর চাঁদ ডুবল। অন্ধকারে জিপ উল্টালো, অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান যখন হল তখন শেষ রাত্রি। দেখলাম পড়ে আছি একা, খাদের কিনারায়। আর তুমি আমাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছ। হ্যাঁ তুমি। নির্ভুল তুমি। আমার পিস্তলটা সঙ্গেই ছিল। আমি গুলি ছুঁড়লাম, তুমি নড়লে না। একবার কাঁপলে না, ধরেই রইলে। মনে হল, বললে—'আই অ্যাম হিয়ার টু বী ক্রুশিফাইড এগেন।'—আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আবার যখন জ্ঞান হল—তখন আমি হাসপাতালে। শুনলাম খাদের ধারে আমি একটা গাছে আটকে ছিলাম। নিচে আড়াই হাজার ফুট খাদ। কিন্তু আমি জানি—গাছ সে নয়, হতে পারে না। আজও জানি। সে তুমি। অস্থির অধীর হয়ে উঠলাম। কোথায় যাব? কোথায় গেলে তোমার এই অশরীরী অনুসরণ থেকে রেহাই পাব! ফ্রন্টের আবহাওয়া—ওই ভোগসর্বস্ব মানুষ তখন অসহ্য হয়েছে। তারা যেন রাক্ষস। হ্যাঁ, সমস্ত জীবনের ক্ষুধা পুঞ্জীভূত করে তখন তারা রাক্ষসের মতো বুভুক্ষু।

'ওদের নাগালের বাইরে দূর-দূরান্তরে পালিয়ে যেতে চাইলাম। ওদিক থেকে আমি চলে এসে পালালাম সিমলার দিকে। সেখান থেকে কত জায়গা। ক্লান্ত শ্রান্ত। দেহ ভেঙেছে মন ভেঙেছে—চাইলাম বিশ্রাম। শুধু বিশ্রাম। শুধু মদ খেতাম। আমি তখন কখনও মরে বাঁচতে চাই, কখনও আবার দারুণ ক্ষোভে উল্কার মতো ছুটতে চাই। কিন্তু যতবার এগিয়েছি—ততবার ওই খাদের ধারে গাছের মধ্যে তোমাকে দেখার মতো, কিছু না কিছুর মধ্যে তোমাকে দেখেছি। পথ আগলে দাঁড়িয়েছ। ওঃ! কতবার ওয়ার-জোনের দিকে অর্ধেক পথ গিয়ে ফিরে পালিয়ে এসেছি এমনি ভাবে তোমাকে দেখে। তারপর গেলাম

কাশ্মীরে। তখন আমি অর্ধমৃত। কিন্তু তবু রেহাই নেই। পিছনে লাগল বুভুক্ষু সৈনিক। একদিন মদ খেয়ে আত্মরক্ষা করতে পারলাম না। মাতাল হয়ে পড়ে গেলাম। একটা নির্জন জায়গায়, ছুটো জানোয়ার আমার সঙ্গ নিয়েছিল—তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

স্তব্ধ হল রিনা। আর সে বলতে পারছে না।

কৃষ্ণস্বামীও স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছেন, গভীর রাত্রে শান্ত সমুদ্রের মতো।

ক্লেটন বাকীটা শেষ করলে। ওইখানেই রিনার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর সামরিক শাসনের ভয়ে তারা ফিরতে বাধ্য হল। রিনা তখন প্রায় অজ্ঞান, আর শুধু বিড়বিড় করে বকছে আপন মনে। তারা শবের কাছে আনন্দ পায় নি, তাকে ফেলে চলে যাবার সময় তাকে লাথি মারছিল। ক্লেটন আসছিল সেই পথে। সে দেখতে পেয়ে ছুটে যায়। অফিসারস্ ব্যাজ দেখে তারা পালায়। ক্লেটন দেখে শিউরে ওঠে।

রিনা! রিনা! হ্যাঁ, এই তো রিনা।

সে ডেকেছিল, 'রিনা, রিনা।'

রিনা বিড় বিড় করে বকেই গিয়েছিল। ওরা যা বুঝতে পারে নি—ক্লেটনের তা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নি। রিনা বকছিল, 'ইট ইজ দি কজ্, ইট ইজ দি কজ্ মাই সোল!'

আর সন্দেহ থাকে নি, এই রিনা ব্রাউন! রিনাকে সে কাঁধে করেই প্রায় তুলে এনেছিল। বার বার কানে কানে বলেছিল, 'রিনা মাই ডার্লিং, রিনা মাই লাভ, রিনা মাই এঞ্জেল! আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

রিনা চিৎকার করে বলেছিল,—'লীভ মি—লীভ মি—লীভ মি কৃষ্ণেন্দু! দি গেটস অব হেভেন্স উইল বি ক্লোজড টু ইউ ফর মি—ফর মি। আই ডোণ্ট লাইক টু গো টু হেভেন্স। লীভ মী!'

এক মাস প্রাণপণে সেবা করে চিকিৎসা করিয়ে রিনাকে সে সুস্থ করে তুলেছিল। রিনা বিস্মিত হয়েছিল।

ক্লেটন রিনাকে বলেছিল নিজের কাহিনী। তারপর বলেছিল, 'প্রথম যৌবনের সে-আমি দুঃখের আগুনে পুড়ে গিয়েছে। গ্লানি আবর্জনাই পোড়ে, ছাই হয়; যা খাঁটি তা ছাই হয় না, পুড়ে শুদ্ধ হয়। আমি তোমাকে এইটুকু বলি রিনা, ট্রাই মি, পরীক্ষা করে দেখ আমাকে। আর যদি বলো চলো তোমাকে কৃষ্ণেন্দুর কাছে নিয়ে যাই।'

চমকে উঠেছিল রিনা।—'কার কাছে? না—না—না—। বলো না, বলতে নেই। সে সেইণ্ট!'

* * *

রিনা বললে, 'কী করব? তোমার পাশে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমার তখন নেই। আমি ওকেই বিশ্বাস করলাম। এবং সে তো প্রমাণ করলে। সে ভালোবাসাকে প্রমাণ করলে। দু-হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলে কৃষ্ণেন্দু, আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে। সেটা এল ওর মধ্য দিয়ে। তুমি সেইণ্ট কৃষ্ণেন্দু। তুমি

সেইণ্ট।'

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার দুঃখ রইল, তোমার এই অবস্থায় তোমার সেবা করতে পারলাম না!'

কৃষ্ণস্বামী সামনে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাকিয়ে থেকেই বললেন, 'এই হয়তো আমার পুরস্কার রিনা। এই দিয়েই তিনি আমার সব অতৃপ্ত কামনা তৃপ্ত করে দিলেন।'

এবার হাসলেন, হেসে বললেন, 'দেখো, আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, একসঙ্গে সাত পা হাঁটলে মিত্রতা হয়। আমাদের বিবাহে স্বামী-স্ত্রীতে অগ্নি সাক্ষী করে, সাতপা একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটে। কিন্তু যখন ভগবানকে খোঁজে মানুষ, তখন সে একা, কারুর সঙ্গেই সাত পা হাঁটা যায় না। বন্ধুর সঙ্গেও না। একা। সে-পথে বিচিত্রভাবে আসে আশীর্বাদ, অভিশাপ! এবং—! সাত পা একসঙ্গে না হাঁটলে সংসারের আনন্দে ফেরা যায় না। তোমরা হেঁটেছ, দোর খুলেছে। সুখে তোমাদের সংসার ভরে যাক। আমার যাত্রা—অ্যালোন! আমি সুখী।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

রেটন সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, 'আমরা আবার আসব। আমি ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছি না। রিনাকে নিয়ে এখানেই ঘর বাঁধব। বার বার আসব।'

'এখানে থাকবে তোমরা? তা হলে—তা হলে আমি একটা অনুরোধ করব। রিনা, তুমি আমার আশ্রম জান। সেখানে ক্লার্ক বলে একটি অনাথা মেয়ে আছে—তাকে তোমাদের সংসারে নিও। আচ্ছা। আর নয়। জন, ইউ আর এ মেডিক্যাল ম্যান। চলে যাও, আর না। গুড বাই! গুড বাই। কেঁদো না, নো-নো-নো। আমি দেখতে চাই তুমি হাসছ। লুক ইন মাই ফেস। দেখো, আনন্দ ছাড়া আর কিছু কি আছে? গুড বাই! গুড বাই! গুড বাই!'

দীর্ঘ হাতখানি তুলে দীর্ঘকায় পুরুষটি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। স্থির কিন্তু। এ ওদের বিদায় সম্ভাষণ দিচ্ছেন, না শূন্যলোকে অদৃশ্য ঈশ্বরের পা দুটি শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছেন—সে কৃষ্ণস্বামীই জানেন।

পরিশিষ্ট

কিছুকাল আগে রেডিয়ো থেকে কয়েকজনকে 'মনে রাখার মত মানুষ' এই পর্যায়ে নিজের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা হয়েছিল। এই পর্যায়ের কথিকাগুলি সত্যই একেবারে বিস্ময়কর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ইংরেজীতে যাকে বলে Truth is stranger than fiction ; কিন্তু যিনি fiction রচনা করেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্য অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁর fiction-ভুক্ত বা তার অঙ্গীভূত হয়ে বসে থাকে। অবশ্য যদি সে অভিজ্ঞতালুব্ধ সত্য সত্য-লব্ধ না হয়। পৃথিবীর সব লেখকই এই বিচিত্র বিস্ময়কর সত্যের মধ্য দিয়ে সেই জীবন-সত্যকে খুঁজে বেড়ান, স্বর্ণসন্ধানী বা মণিমাণিক্য-সন্ধানী দুঃসাহসীর মতো। সে সন্ধান যার মেলে সে-ই ফকির থেকে হয় ধনী। এর সন্ধানেই বড় বড় লেখকেরা মানুষের মেলার মধ্যে বিহ্বলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। লিখবার উদ্দেশ্যে ঘোরেন না, দেখবার উদ্দেশ্যেই ঘোরেন। লণ্ডন প্যারিসের পথে-গলিতে, রাশিয়ার শহরে-গ্রামে ব্ল্যাক-সীর তটভূমিতে বড় বড় লেখকেরা ঘুরেছেন, দেখেছেন। যাঁরা পূর্বকালে এদেশে মহাকাব্য লিখেছেন তাঁরা পদব্রজে ভারতের হিমালয় থেকে সমতল নগর গ্রাম অরণ্যভূম পরিভ্রমণ করেছেন। এই সত্য মিলে গেছে এমনই বিচিত্র মানুষের জীবন-সত্য থেকে। আমারও এ স্বভাব ছিল, আজও আছে। এককালে বাংলার মেলায় মেলায় ঘুরেছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। এখনও ঘুরি। এমনি ঘোরার মধ্যে দেখা পেয়েছিলাম একজন মনে রাখার মতো মানুষের। আমি লেখক, আমার মনে রাখার মতো মানুষ মনেই থাকেনি—আমার মনের সাগরে অবগাহন করে আমার লেখার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সপ্তপদী সৃষ্টির এই বিচিত্র সত্যটি—ইদানীং কালে আমার রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বাস্তব-বৈচিত্র্য অনুসারী। এবং সত্য সত্যই এক্ষেত্রে Truth is stanger than fiction.

সপ্তপদীর সমাদর হয়েছে। এবং গল্পের নায়কের অস্তিত্ব ও সত্যের কথা রেডিয়ো-শ্রোতাদের কাছে বলেছি ও প্রবন্ধের বইয়ের মারফৎ পাঠকদের কাছেও হাজির করেছি। সেইটুকু পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করছি।

মানুষের বাস্তব জীবনে রাম মেলে না কিন্তু মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মেলে—মহাত্মা গান্ধী মেলে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র মেলে—আমার জীবনেই মিলেছে। তাঁরা তাঁদের কর্মে কীর্তিতে ইতিহাসের পাতার মারফতে চিরকাল মানুষের মনে থাকবেন। যারা না দেখেছে—তারাও রাখবে। কিন্তু এ-ছাড়া কিছু মানুষ আছে যাঁদের ছবি ওঁদের ছবির নিচের সারিতে ঝুলানো থাকে, যাঁরা একান্তভাবে আমার কালে আমার মনেই অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। আমার মুখে বা আমার লেখার মধ্যে আঁকা তাঁর ছবি হয়তো অনেক লোকের মনেই আঁকা হয়েছে। কতদিন তা উজ্জ্বল থাকবে তা বলতে পারিনে, সে নির্ভর করছে আমার লেখার সার্থকতার উপর। তবে সে মানুষ আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরদিন। আমি লেখক বলেই এ-কথা বলছি। আমার কাছে মনে রাখবার মতো মানুষ যারা—আমার লেখার মধ্যে অবশ্যই রূপ নিয়েছে। এক-শশী ডোমই কি কম বার এসেছে ফিরে ফিরে! আজ বিশ্লেষণ-বিচার

করতে গিয়ে দেখছি—নিজেই আমি ছদ্মবেশ নিয়ে বেশিবার এসেছি। সে আমার নিজের কথা বলেছি। সে মনে রাখার মতো মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু প্রথম থেকেই একটি মানুষ অমৃত-ভরা স্বর্ণপাত্রের মতো আমার চোখের সামনে ভাসছেন।

ক'দিন বা দেখা, কতটুকু বা পরিচয়, হিসেব করে বলতে বললে বলি—

১৯১৬ সালে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলাম। পড়বার সুযোগ হ'য়েছিল মাস ছয়েক। সেই সময় অতি দৃপ্ত প্রচুর উল্লাসে ভরা কলেজ মাতানো একটি লম্বা ছেলেকে দেখেছিলাম। তার পদক্ষেপ বলে দিত—এ আর কেউ নয়, সে; বহু কলরবের মধ্যে একটি সবার উপরে ছাপিয়ে উঠত, শুনেই বুঝতাম সে, খেলার মাঠে গোলের মধ্যে বল নিয়ে ঢুকে গেল যে—সে আর কেউ নয়, সে—সে। যেন একটা ঘূর্ণাবর্ত। বোধ হয় ফোর্থ ইয়ারে পড়ত। আমাদের থেকে বয়সে বড়, কথা বলবার ক্ষেত্রে হয় নি—সুযোগও হয়নি। কলেজের দক্ষিণদিকে তখন জুনিয়ার ও সিনিয়ার কেম্ব্রিজ ইস্কুল—সেখানে পড়ে বড় বড় লোকের ছেলে আর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ছেলে। মধ্যে মধ্যে দেখি সে তাদের মধ্যে বসে সিগারেট খায়। হঠাৎ গুজব শুনলাম ওই ছেলেটি ক্রীশ্চান হচ্ছে। সেকালে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। হিন্দুর ছেলে ক্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছে? ছি—ছি—ছি। অকপটেই আজ স্বীকার করব যে সেকালে ক্রীশ্চান ধর্ম ইংরেজদের ধর্ম—ইংরেজদের ধর্ম বলে তার উপর সাধারণভাবে হিন্দুরা প্রীত ছিল না। তাছাড়া প্রতি ধর্মেই একটা গোঁড়ামি আছে। এবং তার মধ্যে আমাদের ধর্মের বিধিনিষেধের কঠোরতার সঙ্গে বিদ্বেষও বেশী এ-কথা অস্বীকার করব না।

আরও ছি-ছি করে উঠলাম যখন শুনলাম ক্রীশ্চান ধর্ম সে গ্রহণ করবে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করবে বলে। তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছে। কিন্তু মেয়েটির বাপ বলেছেন—ক্রিশ্চান না-হলে তিনি এ-বিবাহে মত দেবেন না। তাই সে বলেছে—ভাল কথা—ক্রীশ্চানই সে হবে।

এরপর সে কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজের পটভূমি থেকে মুছে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। আর সে দুপদাপ পদধ্বনি শোনা যায় না, কণ্ঠস্বর শোনা যায় না; খেলার মাঠে লম্বা একটি খেলোয়াড়কে বল নিয়ে নেটের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখা যায় না। শুনলাম—বিয়ে করে রেলে-টেলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

বাস—মুছে গেল সে কলেজ-স্মৃতি থেকে। আমিও ক'মাস পর পুলিসের তাড়ায় পড়া ছেড়ে গ্রামে এলাম। বাড়িতে অন্তরীণ হলাম। দিনে দিনে বিস্মৃতির স্থূল অন্ধকার সে আমলের দেখা লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তাকে গ্রাস করল—যেমনভাবে মাটির স্তর গ্রাস করছে মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার সঙ্গে কত নামহীন গ্রামকে কত কুটিরকে। মনের বিস্মৃতির গ্রাস বোধ করি আরও বিচিত্র। আমার একটি গল্প আছে—এক তরুণ যাত্রাদলের গায়ক একটি গ্রাম্য তরুণীকে ভালবেসেছিল। কিন্তু মিলন তাদের হল না। দীর্ঘকাল পরে সেই যাত্রাদলের গায়ক—তখন সে প্রবীণ, এলো সেই গ্রামে গাওনা করতে; সেই মেয়েটি তখন গৃহিণী-জননী-প্রৌঢ়া-স্থূলাঙ্গী: যাত্রাদলের গায়ক যতক্ষণ আসরে গান করলে ততক্ষণই সতৃষ্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

খুঁজলে—তাকে যদি দেখতে পায়। মেয়েটি সামনেই বসে গান শুনছিল। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারলে না। বাহির সংসারে মানুষ মরলে তাকে পুড়িয়ে ছাই করি, মাটির তলায় কবর দি। মনের সংসারে মানুষ জীবিতকেও মাটির তলায় চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। তাকে বোধ করি মাস কয়েকের মধ্যেই কবর দিয়েছিলাম মনের মধ্যে।

এর চল্লিশ বৎসর পর। ১৯৫৬ সাল। বিশেষ কারণে স্থান এবং পাত্রের নাম গোপন রেখেই বলছি—সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে—ভারতবর্ষের প্রায় এক প্রান্তসীমায় গিয়েছিলাম সভাসমিতির নিমন্ত্রণে। যাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম তিনি একদা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। আমারই সমবয়সী। জীবনের পরিচয় আদান-প্রদানের সূত্রে প্রকাশ পেল যে তিনি এবং আমি একই সালে, একই কলেজে, একই শ্রেণীতে পড়েছি। মুহূর্তে পরস্পরে বেশ একটু নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে অতীতকাল সাড়া দিয়ে উঠল। সেই কলেজ জীবনের কথা ছোটখাটো টুকরো টুকরো বেরিয়ে আসতো লাগলো। যেন প্রবল একটা বর্ষণে মাটি ধুয়ে বেরিয়ে পড়েছে—কয়েকটা কাঁচের বা শাঁকের চুড়ির টুকরো, কোনো একটা ভাঁড়ের ভাঙা কানাটা হয়তো বা গোটাই একটা খুরি বা পাথরের শীল। একে মনে আছে? ওকে? আছে বই কি। সেই তো রোল নম্বর একশো—কি এক? দাঁত দুটি উঁচু। কপালে চুলের একটা ঘূর্ণি?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আর তাকে?

—কাকে বলুন তো? কেমন দেখতে?

একদিন তাঁর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে জীপে ঘুরছি, দুধারে বন আর পাহাড়, হঠাৎ এক জায়গায় এসে প্রশ্ন করলেন—একে মনে আছে? আমাদের সময়ে ফোর্থ ইয়ারে পড়ত, লম্বা কালো—হৈ হৈ করে মাতিয়ে রাখত সব। মেম বিয়ে করবার জন্যে ক্রীশ্চান হয়েছিল?

বললাম—আছে বৈকি!

—দেখবেন তাকে?

—এখানে কোথায় সে?

—চলুন, দেখবেন।

জীপকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন একখানি গ্রামে। পাহাড়ের কোলে—আদিবাসীদের গ্রাম। তার মধ্যে কাঠে তৈরী একটি চার্চ। সেই চার্চের পাদরী, একজন দীর্ঘ শীর্ণকায় মানুষ—মুখে আশ্চর্য প্রসন্ন হাসি। গ্রামের ছেলেদের পড়াচ্ছেন।

বললেন—উনি।

অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—উনি?

—হ্যাঁ। কিছুদিন হল ওঁকে আবিষ্কার করেছি—কথায় কথায় পরিচয় হল—জানলাম উনিই তিনি।

সেই প্রচণ্ড দুর্দান্ত হৈ হৈ-করা ছেলে—যে একটি নারীর জন্যে ধর্ম-বাপ-মা সব বিসর্জন দিতে পারে—সেই ইনি। শান্ত-প্রসন্ন-মধুর।

বন্ধু বললেন—একটা ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত।

—মেয়েটি মরে গেছে ?

—না। ঘটেছিল কি জানেন ; এই যে ক্রীশ্চান না হলে বিয়ে দেবে না, এ জেদ ছিল বাপের। মেয়েটি তা চায়নি। সে চেয়েছিল তিন আইনে বিয়ে হোক। ইনি ধর্ম মানতেন না, জাত মানতেন না। ইনি ক্রীশ্চান হলেন, নিজের থেকে। এবং গিয়ে বললেন—আমি ক্রীশ্চান হয়েছি। আর তো বাধা নেই।

মেয়ের বাপ বললেন—না।

কিন্তু মেয়ে সমস্ত শুনে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—তুমি আমার জন্মে ; আই মীন একটি মেয়ের জন্যে, তোমার ঈশ্বর, তোমার ধর্ম ত্যাগ করলে ?

উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে হেসেছিলেন—বলেছিলেন—আমার জীবন দিতে পারি তোমার জন্মে।

মেয়েটি বলেছিল—মাফ কর আমাকে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি আমার জন্মে এতকালের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে। কাল আমার থেকে কোনো সুন্দরী মেয়ে তোমার ভালো লাগলে আমাকে ত্যাগ করবে না কে বললে ?

মেয়েটি ওকে বিয়ে করেনি। কোনো মতেই রাজী হয়নি। বাপ-মায়ের অনুরোধও রাখেনি।

উনি চলে এলেন মর্মাহত হয়ে। সারারাত ভাবলেন। স্থির করলেন—ঈশ্বর এত বড় ? এত প্রিয় ? যার জন্মে সংসারের প্রিয়তম জনকেও উপেক্ষা করা যায় ? তাহলে তিনি তাঁকেই খুঁজবেন। তাঁর সেবাতেই জীবন নিয়োগ করবেন। সেই থেকে উনি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রথমে ছিলেন—গারো পাহাড়ে ; সেখানকার আদিবাসীদের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করেছেন। পাকিস্তান হবার পর এখানে এসেছেন।

বললাম—সেই মেয়েটি ?

—তার খবর উনি আর রেখেননি, রাখেনওনি।

আমার মনে হল—আমার অন্তর্লোকের সকল স্তর ভেদ করে এক অতি-সাধারণ—অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। অট্টহাসের বদলে প্রসন্ন ধীর হাস্যে সুপ্রসন্ন, দুর্দান্তপনার পরিবর্তে পরম প্রশান্ত, উল্লাস-চঞ্চলতার অধীরতার পরিবর্তে শান্ত ধীর।

মনে পড়ল বিখ্যাত উপন্যাস কুয়ো ভেডিস।

—Where goest Thou Lord !

উত্তর হল—To Rome, to be crucified again !

অল্প কয়েকটি কথা বলেছিলাম। উত্তরে কথা পেয়েছি অল্প। কিন্তু প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্যে যেন অমৃত, ধারায় স্নানপুণ্য অনুভব করেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—ঈশ্বর পেয়েছেন ?

শুনেছিলাম—পেয়েছি বইকি। নইলে এত আনন্দ পাই কোথা থেকে।

ফিরে এলাম। আমার মনের স্মৃতির ঘরে একটি অতি সাধারণ মানুষের অসাধারণ জ্যোতির্ময় প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম। ঐতিহাসিক বিরাট পুরুষদের ছবির সারি

অনেক উঁচুতে টাঙানো। ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয়। এঁর ছবি ঠিক তাঁদের নিচেই ঝুলছে। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াই। আমার কাছে যিনি অবিস্মরণীয়—তিনি আমার লেখার মধ্যে দেখা না দিয়ে তো পারেন না। সপ্তপদীতে তিনিই কৃষ্ণেন্দু হয়ে দেখা দিলেন।

* * *

বাকী থেকে গেছে নায়িকার কথা। নায়িকার নাম রিনা ব্রাউন। অবশ্যই কাল্পনিক নাম। এবং কৃষ্ণেন্দুর হারিয়ে-যাওয়া প্রেমিকার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাকে আমি দেখিনি। কথাও বিশেষ শুনিনি। রিনা তবু পুরো কাল্পনিক নাম। এ ক্ষেত্রে গল্প একটু সত্য—যা রূপকথার রাজকন্যার খসে-পড়া একগাছি সোনার বর্ণ চুলের এক অপরূপাকে মনে করিয়ে দেবার—যা আমি পেয়েছিলাম তাই বলি। আসল মানুষটি এবং কৃষ্ণেন্দু যেমন এক নয় উপন্যাসের রিনা ব্রাউনও তেমনি সেই অসাধারণ মেয়েটি নয়—যে বলেছিল বা বলতে পেরেছিল, 'আমার মোহে তুমি যখন তোমার এতদিনের ধর্ম এতদিনের বিশ্বাসের ভগবানকে ত্যাগ করছ তখন কে বললে আমার থেকে সুন্দরী কাউকে দেখলে তাকে পরিত্যাগ করবে না।' পূর্বেই বলেছি তাকে আমি দেখিনি তাকে আমি জানি না। যা ঘটেছিল তাতে সেই মেয়ের পক্ষে একমাত্র চিরকুমারী থাকাই উচিত। সত্য ক'রে এই মেয়ের কি হয়েছিল বা হয়েছে তা সেই পাদরীও জানেন না। বাস্তব সত্য, গল্প উপন্যাসের কল্পনার বিচিত্র সত্য থেকেও অদ্ভুত। হয়তো অবিশ্বাস্য। লিখতে বসে রিনার চরিত্র নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়েছিলাম। হঠাৎ একটি দেখা, মাত্র কয়েক বারে কয়েক ঝলক দেখা একটি ইংরেজ বা আমেরিকান বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংরিজীবাসিনী এক বিচিত্র বিদেশিনী মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তার কয়েকটি কথা এবং ছবি মনের মধ্যে ভাসছে।

১৯৪৪ সালে পুরীর সমুদ্রতীরে তাকে প্রথম দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—চোখের পাতাগুলি ঘন কালো এবং ফুলের কেশরের মতো দীর্ঘ। মাথার চুলে ঘনকৃষ্ণ শোভাই শুধু নয়—বিষুবরেখার অঞ্চলস্থ ঘাসের ঘন বর্ণাঢ্যতা এবং সমৃদ্ধিও তার রক্তের ইতিহাসের একটি সাক্ষ্য বহন করছিল। তার পরনে স্ল্যাক; গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ, মাথায় একখানা গাঢ় লাল রঙের রুমাল। উচ্চ হাস্য-প্রমত্ত কণ্ঠস্বরে অর্ধস্থির পদক্ষেপে ঝড়োজীবনের ইঙ্গিত আর ইঙ্গিত ছিল না—স্পষ্ট পরিচয় হয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। একমুহূর্তে পুরীর সমুদ্রতটের সকল মানুষের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সবিস্ময়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ফারিত হত। সঙ্গে অবশ্যই অহরহ কেউ-না-কেউ যুদ্ধের পোশাকপরা শ্বেতাঙ্গ থাকতই। একদিন পূর্ণিমার রাত্রে সমুদ্রতটে তাকে তীব্রকণ্ঠে বলতে শুনেছিলাম—বোধকরি তার সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল—সে বলেছিল—What do I care for God ? I am no Christian. My father did not baptize me. He was ashamed of me. I hate you. Yes I hate you. Your heaven is not my heaven. My heaven is hell. My God is the God of hell.—বর্বর মাতাল সৈনিকটা তাকে মেরেছিল মুখের উপর। ইংরেজের আমল, যুদ্ধের কাল, বি-এন-আর হোটেলের এলাকা—কয়েকজন এদেশের লোকের সঙ্গে আমিও ছিলাম—কিন্তু কেউ কিছু বলেনি, বলতে সাহস করেনি এবং অনধিকার চর্চাও মনে

হয়েছিল। পরদিন আবার তাকে দেখেছিলাম—মুখে তার কালসিটের দাগ ; ঠোঁটটা ফুলে গেছে। সমান উৎসাহে প্রমত্ত পদক্ষেপে ঘুরছে। সর্বনাশের পথের যাত্রিনী।

এই মেয়েকে কলকাতাতেও চৌরঙ্গী অঞ্চলে দেখেছি। একদিন একা ময়দানে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি নিশ্চল প্রতিমার মতো ; তখন অপরাহ্ণ বেলা। কি ভাবছিল কে জানে। তার স্বর্গের কথা ? তার ঈশ্বরের কথা ? তার জীবনের কথা ?

তারপর তাকে দেখি শিলংয়ের পথে। বছর দেড়েক বাদে। এই সময়ের মধ্যেই তার জীবন দেহ অমিতাচারের ফলে দীর্ণ হয়েছে পোকা-ধরা লতা'র মতো।

এর চেয়ে ভাল বাস্তব উপমা মনে হচ্ছে না। এই কিছুদিন আগে বোধ করি মাস ছয়েক হবে একটি ভালো অপরাজিতার লতা এনে বাড়িতে পুঁতেছিলাম। প্রথম সে বাড়তে লাগল ঘন সবুজ বর্ণে, চওড়া পাতার পর পাতা মেলে ; মোটা সরস ডাঁটার সর্পিল বিস্তারে। চোখ জুড়িয়ে যেত। হঠাৎ গাছটায় পোকা ধরল। পাতা ছোট হল—কুঁকড়ে যেতে লাগল, ডাঁটা শীর্ণ হল—শিরা-ওঠা হাতের মতো লম্বা রেখা জাগল তাতে, পাতা ডাঁটার বর্ণে এমন একটা কিছু মিশল যা দৃষ্টিকে পীড়িত করে। এই মেয়েটির অবস্থাও তখন ঠিক তেমনি। গৌহাটি থেকে এক বাসে যাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে ছিল একটি তরুণ যার বয়স তার থেকেও অনেক ছোট, দুগ্ধপোষ্য না হোক নিতান্তই কিশোর একটি, যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে, মেয়েটাই তাকে পাকড়েছে বা কিশোরটি যুদ্ধক্ষেত্রের আবহাওয়ায় তার কাঁচামাটির পেয়ালার মতো কাঁচা অপরিণত জীবন-পাত্রে এই মেয়েটার জীর্ণ যৌবনের ঝাঁঝালো মদ ঢেলে আকণ্ঠ পান করতে ছুটে এসেছে বলির বিল্বপত্রভোজী পশুর মতো। মেয়েটার হাত কাঁপছে অর্থাৎ সুরা কম্পন শুরু হয়েছে। চোখ দুটো অহরহ ঢলঢল করছে। বিড়বিড় করে বকছে। বমি করতে শুরু করলে বাসে। গৌহাটির বাঙালীরা আমাকে প্রচুর কমলালেবু দিয়েছিলেন। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকাচ্ছিল কমলাগুলির দিকে। আমি তাকে কয়েকটি লেবু দিয়েছিলাম। সে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কত দাম ? আমি হেসে বলেছিলাম—তোমাকে দিলাম, তুমি অসুস্থ, খাও। আমি তো লেবু বিক্রি করি না।

মেয়েটিকে একদিন ফুটপাতে পড়ে থাকতেও দেখেছি ; একটা জীপ এসে তুলে নিয়ে গেল।

মেয়েটির এই কয়েকটি কথা মনে হল সপ্তপদীর নায়কের আমূল পরিবর্তনের কথা মনে ক'রে। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না—সে বেরুল ঈশ্বর খুঁজতে, ঈশ্বর কি জানতে! রিনাই তো আঘাতের মধ্য দিয়ে দিলে তার ঈশ্বরকে ; পেলে কি? বৃহত্তর ঈশ্বর-বিশ্বাস, দৃঢ়তর বোধ পাওয়াই সম্ভব।

কিন্তু হারিয়ে রিক্ত হওয়াও তো অসম্ভব নয়।

ঈশ্বরের জন্য প্রিয়তম মানুষকে বর্জন করে। রিক্ততাই সাধারণভাবে মানবিক। পূর্ণতা অসাধারণ। অস্বাভাবিক না হলেও দুর্লভ। তাই মেয়েটির ওই সমুদ্রতীরের কথা মনে ক'রে এবং শ্বেতাঙ্গ জাতির দুর্ধর্ষ বেপরোয়া দুঃসাহসের পথের দুর্মদেরা যে ভাবে পৃথিবীময় নিজেদের দেহের প্রয়োজন মিটিয়ে সন্তান উৎপাদন ক'রে তাদের ফেলে চলে এসেছে এবং বর্ণসঙ্কর সমাজ বলে নিজের সন্তানদেরই ঘৃণা করে এসেছে সে-কথা মনে ক'রে ওই মেয়েটিকেই তার ওই

কয়েকটা কথার মধ্যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে রিনারূপে অঙ্কিত করেছি। জানি যে, মেয়েটার রক্তের মধ্যেই হয়তো পাপ-পুণ্য না-মানার ঈশ্বর না-মানার বীজ ছিল, হয়তো জন্ম-স্বৈরিণী, কিন্তু আমি তার কয়েকটা প্রসঙ্গ কথার মধ্যে একটা ব্যথা-বেদনার আভাস পেয়েছিলাম। কেবলমাত্র ওইটুকুর জন্যেই সে আমার মনে স্মরণী হয়ে আছে, তাই ওই ভাবেই সমবেদনার তর্পণের জল তাকে অর্পণ করে তাকে এঁকেছি আর বলেছি—আমি লেখক তুমি আমার কাছে এই তর্পণের তর্পণীয়া। তুমি আমার অনাত্মীয় অবান্ধব হয়তো বা অপঘাতই তোমার নিয়তি; তোমাকে তবু দিতে হবে আমার শ্রদ্ধার নির্মল জল। আমার শ্রদ্ধাতেই সে ফিরেছে। কুম্ভকোণমের কৃষ্ণস্বামীও সে আমার শ্রদ্ধায় মহিমান্বিত।

উত্তরায়ণ

উৎসর্গ

প্রবোধকুমার সান্যাল

করকমলেষু

আরতির অবস্থাটা বোঝাতে হলে উপমা দিয়ে বোঝাতে হয়।

অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে ভেঙে-পড়া ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে করতে অকস্মাৎ আলো দেখা দিল; সেই আলোতে জীবনের আশ্বাস ফিরে পেয়ে সর্বপ্রথম নজরে পড়ল, এক কোণে মেঝের সঙ্গে গেঁথে রয়েছে একটা আংটি; মলিন গেরে-যাওয়া একটা আংটি। হয়তো পিতলের, নয়তো তামার। কিন্তু তা যাচাই করবার বা সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখবার সময় তো তখন নয়। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মেঝেয় গেঁথে যাওয়া আংটিটা বিচিত্রভাবে মনের মধ্যে মাজা-ঘষা হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে, তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায় অনেক কাল আগে হারিয়ে যাওয়া বহুমূল্য হীরের আংটিটির কথা। সেই গড়ন। ঠিক সেই আকার। ঠিক সেই আংটি। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে ওঠে প্রাণ-মন; হৃৎপিণ্ড ধকধক করে মাথা কুটতে থাকে চরমতম উত্তেজনায়, পায়ের আঙুল থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত সর্বাঙ্গ যেন কাঁপতে থাকে; মাথার ভিতরটার স্মৃতিবাহী সমস্ত স্নায়ু-শিরাগুলি যেন ঝনঝন করে ওঠে; ছুটে গিয়ে সেটিকে ফিরে পাবার, অন্তত যাচাই করে দেখবার আকুল আগ্রহে অধীর হয়ে ওঠে জীবন।

ঠিক তা-ই হল আরতির। অধীর হয়ে উঠল আরতি।

১৯৪৬ সনের ১৬শে আগস্ট।

বউবাজার অঞ্চলে, কপালিটোলা লেনের কাছাকাছি একটি গলিতে একখানা পুরনো আমলের বড় বাড়ি। ১৬।১৭।১৮ তিনদিন তিনতলার ছাদে এক-কোণে-পড়ে-থাকা গত তিরিশ-চল্লিশ বছরের কি তারও বেশী কালের অব্যবহার্য কয়েকটা জলের ট্যাঙ্কের একটার মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে পড়েছি। ১৬ই তারিখের রাত্রি তখন ৮টা। দিনের বেলা থেকেই বাড়ি থেকে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সে-কথা মনে হলেই তার বাল্যকালে মামার বাড়িতে কালীপূজার রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে একশো সওয়াশো পাঁঠা বলি হত। সন্ধ্যা থেকে একটা খোয়াড়ে পাঁঠাগুলোকে এনে পুরে দিত এবং বলির পূর্বকাল পর্যন্ত সতর্ক প্রহরী থাকতো চারিপাশে। লাঠি বা খোঁচা যা-কিছু দিয়ে হোক, যে-পশুটা মুখ বের করবার চেষ্টা করত, তার মুখেই আঘাত করে ভিতরে ঠেলে দিত। তারপর একে একে হত বলিদান। একসঙ্গে দু-তিনটেকে বলি দেওয়াও আরতি দেখেছে। ১৬ই বিকেল থেকে তাদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই। তারা মানুষ, তাই তারাও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল—নইলে ঠিক বলির পশুগুলোর মত ভীতার্ত হয়ে তারা একসঙ্গে এক জায়গায় ঘেঁষা-ঘেঁষি করে জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সন্ধ্যের পর থেকেই তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে নরকের যবনিকা উঠে প্রকট হল পৈশাচিক উৎসব। এতটা আশঙ্কা কেউ করে নি। বিংশ শতাব্দীতে এ ছিল কল্পনার অতীত। বিকট চিৎকার উঠল। লাল মশালের আলো জ্বলল। দল বেঁধে ঘর ভাঙল। দানবের মত চেহারা নিয়ে দলবদ্ধভাবে ঘরে ঢুকল। হত্যা, লুঠ, নারীদেহের উপর পশুর বীভৎস অত্যাচার। তারপর আগুন লাগিয়ে চলে গেল।

দূর থেকে তা চোখে দেখা যায় না, প্রত্যক্ষদর্শী দেখেও বর্ণনা করতে পারে না। যেটুকুও পারে, কানে শুনে মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। অথচ যারা অত্যাচার করলে, তারা তা পারলে। যাদের উপর অত্যাচার হল, তাদের মধ্যে কয়েকজন সহ্য করে বেঁচেও রইল।

একটা দৃশ্য আরতির মনে আছে। একতলায় দরজা ভেঙে তখন সদ্য ঢুকেছে বর্বরের দল। দোতলা বাড়িটা এক-কুঠুরি দু-কুঠুরিতে ভাগ করা বহু-ভাড়াটে অধ্যুষিত একখানা বাড়ি। দুটি তলায় অন্তত কুড়িটি ভাগে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনের বাস। তার মধ্যে শিশু এবং নারীতে পঁচিশ জন। পুরুষের সংখ্যা কুড়ি-বাইশ। পুরুষহীন পরিবার বড় একটা ছিল না, আরতি ছাড়া। আরতি দুখানা ঘর আর একটা স্বতন্ত্র বারান্দা নিয়ে বাস করত—বাবার সহায়সম্বলহীনা এক বুড়ী পিসীকে নিয়ে। বাড়িখানা আরতিরই বাড়ি। আরতির বাবা কিনেছিলেন প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর আগে—লাভের লোভে। সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু রাস্তার স্কীম তখন সদ্য কাজে পরিণত হবে। একজন বাড়ির দালাল তখন তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, পুরনো বাড়িটা সস্তায় কিনে খুব ভালো রঙ্‌চঙ করলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাছে অনেক বেশী দাম পাওয়া যাবে। যারা দাম কষবে, তাদের কিছু টাকা দক্ষিণা দিলেই হবে। সবই হয়েছিল, কিন্তু বাড়িটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে পড়ে নি। নিচের তলার দরজা যখন ভাঙল—তখন একবার একটা কলরব উঠল। কলরব নয়, একটা ভয়ার্ত ক্রন্দন-রোল। ও—! সে 'ও—' রোল ওই বর্বরদের হা-হা শব্দের চেয়েও মর্মান্তিক, এবং তার মধ্যে সে যে কী বিভীষিকা, সে যে না শুনেছে, তাকে বলে বোঝানো যায় না। পুরনো কালের চকমিলানো ভিতরে উঠানওয়ালা বাড়ি; নিচের উঠানে মশালের আলো হাতে তারা ঢুকে হা-হা চিৎকারের সঙ্গে ধ্বনি দিয়ে উঠল। ঈশ্বরের নামকে কলঙ্কিত করে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ধ্বনি! বুড়ী ঠাকুমা সর্বাগ্রে একটা অমানুষিক 'ও—' চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। 'ঠাকুমা—' বলে তাঁকে ডেকে ফেরাতে গিয়ে আরতি এসে পড়ল সিঁড়ির মুখে। নজরে পড়ল, আক্রমণকারীরা তখনও বাড়িতে ঢুকছে এবং প্রথম দল এগিয়ে আসছে সিঁড়ির মুখে। তারা উঠবে উপরে। মুহূর্তে আরতি ছাদের সিঁড়ি ধরল। ছাদের দরজাটায় খিল ছিল না, শুধু ছিল উপরে ছিটকিনি। তাও উপরেরটা অচল, নিচেরটাই ছিল সচল। ছাদে এসে সর্বপ্রথম চেয়েছিল সে ছাদ থেকে দরজা বন্ধ করে শিকল আটকাতে। কিন্তু শিকল ছিল না। তবুও সে কড়াদুটো ধরে দরজাটা টেনে দিয়ে চারিদিকে খুঁজেছিল একটু আশ্রয়। একবার ছুটে গিয়েছিল আলসের ধারে। গিয়ে শিউরে উঠেছিল। নিচের রাস্তা পর্যন্ত উচ্চতার পরিমাপ দেখে নয়। রাস্তায় দানবিক উল্লাস দেখে, মশালের আলো দেখে, চারিপাশের বাড়িতে বাড়িতে চিৎকার শুনে। একটু দূরে একটা বাড়ির ছাদে দেখেছিল, একটি মেয়ে ভয়ে পাগলের মত চিৎকার করে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাকে ধরবার জন্য হা-হা শব্দে অট্টহাস্য করে ছুটছে একটা পশু। তার পাশেই একটা পুরুষকে একখানা ছোরা দিয়ে আঘাত করলে আর দুজন। আরতি এবার বুদ্ধি-বিবেচনা না করেই ছুটে গেল ছাদের দরজার দিকে। নিচে নেমে যাবে সে। কোথায় যাবে তা জানে না—তবে নিচে যাবে। মনে ভাসছিল নিজের ঘরখানি। কিন্তু ছাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিচের সচল ছিটকিনি আটকাবার আংটাটা ভেঙে

যাওয়ার পর সিঁড়ির উপরেই একটা গর্ত খুঁড়ে নিয়েছিল বাড়ির লোকেরাই ; দরজা ঠেলে দিলেই ছিটকিনিটা আপনি পড়ে যেত গর্তটার মধ্যে। চিৎকার আপনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল তার গলা থেকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের মুখ নিজে চেপে ধরেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আত্মরক্ষার সচেতন বুদ্ধি ফিরে এসেছিল তার। ওই স্তূপীকৃত বাতিল জলের ট্যাঙ্কগুলোর কাছে ছুটে এসে, গুঁড়ি মেরে কোন রকমে আলসের ধার ঘেঁষে একেবারে কোণটায় এসে বসেছিল ; কিন্তু তাতেও তার স্বস্তি হয় নি। সব চেয়ে নিচের ট্যাঙ্কটার ভাঙা মুখটার মধ্য দিয়ে গলে সে ভিতরে ঢুকে বসেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই, কি তার মিনিটখানেক পরেই, ছাদের দরজায় ধাক্কা পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্বরদের উচ্চকণ্ঠের কথা শুনতে পেয়েছিল, "বন্ধ্ হ্যায়। তব্ তো আদমি হ্যায় ছাদকা অন্দর। তোড়ো।"

দুমদাম শব্দ উঠল। আরতি দাঁত টিপে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। তারপরেই শুনতে পেল, "আরে-আরে—ইধরসে বন্ধ্ হ্যায়, উয়ো ছিটকিনি উঠাও, উয়ো দেখো। উঠাও।"

পরমুহূর্তেই দরজাটা খুলে গেল। কতগুলো বলতে পারে না আরতি, তবে মনে হল, অসংখ্য উন্মত্ত দর্পিত পদক্ষেপে ছাদখানা বুঝি ভেঙে পড়বে। পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়াল তারা।

"ইধর দেখো। ইয়ে পানিকে টাঙ্কিকে ইধর।"

জীর্ণ ট্যাঙ্কগুলোর উপর প্রথম পড়ল কয়েকটা লাঠির আঘাত, উপরের দুটো ট্যাঙ্ক হুড়মুড় করে পড়ল স্থানচ্যুত হয়ে। একটা পড়ল ছাদের ভিতরের দিকে ; অন্যটা পড়ল আরতির আশ্রয়স্থল ট্যাঙ্কটা এবং আলসের মধ্যবর্তী ফাঁকটার উপর। অন্ধকার হয়ে গেল পৃথিবী। আরতির জীবনের বোধ করি সর্বোত্তম সৌভাগ্য সেই অন্ধকার! ভগবান-দেবতা মানলে সে মনে করত এবং বলে বেঁচে যেত—'ভগবান যেন অন্ধকার হয়ে আমাকে বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।'

কারণ ওতেই বেঁচে গেল সে। ওধারের ট্যাঙ্কটা থেকে পচা জল এবং আরও কিছু এমন বস্তু ছাদময় গড়িয়ে পড়ল, যার জন্য ওই পশুর দল তোবা-তোবা বলে পিছিয়ে গেল। এই ট্যাঙ্কটার মধ্যেও আরতি এমনি দুর্গন্ধময় পচা জলের স্পর্শ অনুভব করছিল, আর তার সঙ্গে নানান্ ধরনের কীটের স্পর্শ। উচ্চিংড়ে, আরশুলা, আরও অনেক কিছু! এরই পর হঠাৎ তীব্র জ্বালাকর দংশন অনুভব করেছিল সে। তারপর আর মনে নেই। যন্ত্রণায় চেতনা বিলুপ্ত হয়েছিল তার। চেতনা যখন ফিরেছিল, তখন দিনের আলো চারিদিকে। যে-কয়টা ছিদ্র ছিল, তার ভিতর দিয়ে কয়েকটা রশ্মিরেখা এসে ভিতরে পড়ে ভিতরের অন্ধকারকে স্বচ্ছ করে তুলেছিল। অসহ্য তৃষ্ণা। কিন্তু চারিদিকে ওই পৈশাচিক উল্লাস কলরোলের বিরাম ছিল না। ছাদের উপর থেকেই টের পেয়েছিল, দোতলায় গোলমাল উঠছে ; নানান্ ধরনের শব্দ উঠছে ; ভারী জিনিস—কারা যেন টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দোতলায় কি হচ্ছে, তা সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিল, ট্যাঙ্কের ছিদ্র এবং আলসের ফাঁক দিয়ে সামনের একটা বাড়ির তেতলার ঘরে যা হচ্ছিল তা প্রত্যক্ষভাবে চোখে দেখে। সে দেখতে পাচ্ছিল সামনের বাড়ির তেতলার ঘরটায়

দিনের আলোতেও খুন হচ্ছে, নারীধর্ষণ হচ্ছে, লুঠ হচ্ছে। সামনের বাড়ির তেতলার ঘরের জানলাটা খোলা, মেঝেটা দেখা যাচ্ছে, একজন বুড়ী রক্তের প্লাবনের মধ্যে ভাসছে, একটি অর্ধোলঙ্গ যুবতী মেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে, গোঙাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে কতকগুলো লোক আসছে এবং ঘরের জিনিসপত্র টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। বাক্স-ব্যাগ, দেওয়াল-ঘড়ি, রেডিও, কাপড়-চোপড়, যে যা পাচ্ছে টেনে নিয়ে চলেছে। সেই মুহূর্তে কয়েকজন খাট খুলছিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়না খুলে ফেলছে। ড্রয়ারগুলো টেনে উপুড় করে ফেলে দেখছে। তৃষ্ণা তার আতঙ্কে শুকিয়ে গেল। মনে হল—চেতনা তার বিলুপ্ত হয়ে আসছে, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সচেতন করে রাখলে সে। অচেতন অবস্থায় সামনের বাড়ির ওই অচেতন মেয়েটার মত এমনি গোঙানি যদি তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে! তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল বর্ষার আকাশ। ঘন মেঘ করে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল; ট্যাঙ্কের উপরের দিকের টিনটার একটা ছিদ্র বেয়ে গড়গড় করে জল পড়তে শুরু হল। সেই জল ব্যাকুল অঞ্জলিতে ধরে খেয়ে বেঁচেছিল। সুস্থ হয়েছিল। বেলা তখন কত, তা তার জানবার কথা নয়। হঠাৎ এই কলরোল আবার বাড়ল। এবার ধ্বনির উত্তরে ধ্বনি হতে লাগল। নজরেও পড়ল, উত্তর দিকে বড় বড় বাড়িগুলির ছাদে লোকের চলাফেরা। তারা এরা নয়। যারা আক্রান্ত, তাদের সম্প্রদায়ের লোক। হাতে বড় বড় থান ইট, আরও কত কিছু, বন্দুকও দেখতে পেলে তাদের হাতে। বন্দুকের শব্দ গত রাত্রি থেকেই হচ্ছে। বড় বড় বিস্ফোরণের শব্দ উঠতে লাগল। জ্বলন্ত কাপড়ের পুঁটুলি পড়তে লাগল। একবার এদের ধ্বনি এগিয়ে যায়, একবার ওদের ধ্বনি এগিয়ে আসে। সন্ধ্যা থেকে বাড়তে লাগল তাণ্ডব। সে-তাণ্ডব শেষরাত্রের দিকে স্তব্ধ হল। তখন একবার বের হয়েছিল সে। আর থাকতে পারে নি। বেরিয়ে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেহখানিকে যতটুকু পারে সুস্থ করে নিয়েছিল। ঊর্ধ্ব-লোকে আকাশের নক্ষত্রমালার দিকে যে ভগবানকে সে বিশ্বাস করে না, সেই ভগবানকে ডেকে বলেছিল, "হে ভগবান—রক্ষা কর, রক্ষা কর। নইলে মৃত্যু দাও।" চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল।

ময়লা জলের ট্যাঙ্ক থেকে আকণ্ঠ জল খেয়েছিল।

ভগবানের পাঠানো কিনা সে জানে না, তবে কাকের বা চিলের মুখ থেকে খসে-পড়া আধখানা পোড়া রুটিও হঠাৎ সে পেয়ে গিয়েছিল। ভোরবেলার আগেই এসে আবার সে সেই ট্যাঙ্কটার ভিতরে ঢুকেছিল। ১৮ই তারিখে এ-বাড়িতে আর কোন সাড়া পায় নি। শুধু বার তিনেক কোন একজনের শিস শুনেছিল; শিসের সঙ্কেত নয়, শিস দিয়ে গান। বাড়িটা যেন ইডেন গার্ডেনের একটি নির্জন প্রান্ত, সেই নির্জন প্রান্তে কোন দেওয়ানা বা বিলাসী ঘুরছে আর শিস দিয়ে গান করছে। কোলাহল ছিল রাস্তায়। প্রচণ্ড কলরব আর কোলা-হল, ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি, বোমার শব্দ। সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণকারীর দলের ধ্বনি পিছনে উঠল। সন্ধ্যার পর নূতন কিছু আরম্ভ হল। অনবরত প্রায় বন্দুকের শব্দ—আর প্রচণ্ড বেগে লরী ছোটার শব্দ।

•ফট-ফট-ফট-ফট দুম্-দুম্। সে আর কান পাতা যায় না।

ধ্বনি কোলাহল প্রায় স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে এক-আধবার শোনা যায় শুধু। কখনও শোনা গেল একজন মানুষের মর্মান্তিক আর্ত চিৎকার।

১৯শে সকালবেলা। আবার বাড়ির নীচে মানুষের পদশব্দ শোনা গেল। অনেক মানুষ। যেন প্রতিটি ঘর খুঁজছে। কথা কানে এল, "কেউ বেঁচে আছ? সাড়া দাও—আমরা উদ্ধার করতে এসেছি।"

সামনের তেতলা বাড়িটার ঘরে কয়েকজন এসে ঢুকল।

"কেউ আছ?"

আর সন্দেহ রইল না। চিৎকার করতে চেষ্টা করল সে, "ওগো—ওগো—আমি আছি! বাঁচাও!" কিন্তু কণ্ঠস্বর তার ফুটল না। সে বের হয়ে আসবার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু তার হাত কাঁপছে পা কাঁপছে, দেহে যেন একবিন্দু শক্তি আর অবশেষ নেই। সামনের ট্যাঙ্কটা তার ঠেলায় পড়ে গিয়ে একেবারে মোক্ষম হয়ে মুখ আটকে বসে গেল। এবার একটা চিৎকার করে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান যখন হল, তখন তাকে ধরাধরি করে নামানো হচ্ছে। তাকে এনে তুললে একটা লরীতে। লরীতে গাদাগাদি লোক, পুরুষ নারী শিশু যুবা বৃদ্ধ। প্রেতার্ততার আতঙ্ক মুখে-চোখে। তাদের বাড়িটার এক বুড়ো রয়েছে, আর পুরুষ কেউ নেই, তিনটি মধ্যবয়সী মেয়ে রয়েছে, মুখে কালশিটের দাগ, বুকে দাগ, মুখাবয়বে আতঙ্ক-লজ্জা-ঘৃণার স্মৃতি মাখানো এক উদাস ক্লান্তি। সূর্যে সর্বগ্রাসী গ্রহণ যে সময়টিতে পূর্ণ হয়, সেই সময়টিতে পৃথিবীর সর্বাঙ্গে যে ছায়া ফুটে ওঠে, এ যেন ঠিক সেই ছায়া; সর্বনাশের ছাপ।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ধরে মোড়কেল কলেজের সামানা পার হয়ে গাড়িটা যখন মীর্জাপুর স্ট্রীট ধরে ঘুরছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল।

এই কয়েক দিনরাত্রির দুরন্ত দুর্যোগকে এক মৃত্যু-বিভীষিকাময় প্রলয়-রাত্রির সঙ্গে তুলনা করে বলতে গেলে বলতে হয়, দুর্যোগ অবসানে সূর্যোদয়ের মত ওই মুহূর্তটিতে নজর পড়ল, মাটিতে ধূলায়, আবর্জনায়-কালিমায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটি আংটি।

একটি মানুষ। রোদে-পোড়া রঙ, তামাটেও নয়, কালোই হয়ে গিয়েছে। মাথায় রুক্ষ ধূসর বড় বড় চুলের কয়েক গোছা লালচে হয়ে গিয়েছে। ঘন চুলের নিচে কপালখানি বড় ছোট, ওই ছোট কপালের ত্রিবলী রেখায় দাগগুলি ময়লা জমে পেন্সিলের দাগের মত হয়ে রয়েছে। বাকি মুখটা দাড়ি-গোঁফে ঢেকে গিয়েছে। চোখে শান্ত উদাস দৃষ্টি।

বারেকের জন্য আরতির দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলল। তারপর ক্লান্তিভরে আরতিও দৃষ্টি নামিয়ে নিলে; সেও অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে। আরতির কোন কিছু মনে করার অবস্থা তখন ছিল না। শুধু মনে হল, লোকটা বড় রোদে পুড়ে গিয়েছে। পরমুহূর্তেই একটি রশ্মিরেখা আপনি জ্বলে উঠে তার মনের অতীতকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্মৃতির ঘরে বারেকের জন্য ঝলকে উঠে আবার নিভে গেল।

লরীটা মোড় ফিরল আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

নিদারুণ ক্লান্তির উপর আগস্টের প্রখর রৌদ্রে আরতি কেমন হয়ে যাচ্ছিল। দ্রুত ধাবমান কোন খোলা যানের উপর বসে যেতে যেতে পাশের বাড়িগুলোকে পিছনে ছুটছে বলে মনে হয় স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু আরতি দেখছে আরও কিছু। সে দেখছে, বড় বড় বাড়িগুলো কাত হয়ে পড়তে পড়তে পিছনের দিকে যেন ডিগবাজি খেয়ে চলে যাচ্ছে।

এরপর একটা বিস্ফোরণের শব্দ তার কানে এসেছিল।

একটা বোমা পড়েছিল আমহার্স্ট স্ট্রীট আর মেছুয়াবাজার স্ট্রীট জংশনে। শব্দ শুনে সে চকিত হয়েছিল, কিন্তু চেতনায় ফিরতে পারে নি। বারেকের জন্য মাথা তুলে আবার ঢুলে পড়েছিল। চেতনা হল বাগবাজার স্ট্রীটে বোসেদের বাড়িতে আশ্রয় পাবার পর। সেও কিছুক্ষণের জন্য, তাকে দেখে—তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করে তারা, উদ্ধার-কর্তারা তাকে একটি ঘরে অল্প কয়েকজন মহিলার সঙ্গে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা গেলেন ভিতর পর্যন্ত, তাঁদের দিকে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে। সেই তাকাবার সময় আর একবার চোখ পড়ল ওই মলিন লোকটির উপর। আবার একবার পড়ল—যখন ডাক্তার এসে তাকে দেখলেন তখন।

তারপর সারারাত ধরে সে ঘুমিয়েছিল।

দুই

পরের দিন সকালে।

ঘুম ভাঙবার ঠিক সূক্ষ্মতম মুহূর্তটিতেই আশ্চর্য কোন কারণে আরতির প্রথম মনে পড়ে গেল ওই মানুষটিকে। তারপর মানুষটির সূত্র ধরে লরী, লরীর সহযাত্রী-যাত্রিনী, তারপরই যেন একটা বড় ঝাঁপ দিয়ে অনেক ঘটনা পার হয়ে মনে পড়ে গেল দুর্যোগের কটি দিনরাত্রি অথবা দুর্যোগের সেই দিনরাত্রির অতীত একটা বিভীষিকাময় কালকে। বউবাজারের গলির সেই বাড়ি।

দুর্যোগের অবসান হয়েছে। সে একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আঃ।

আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই মানুষটিকে। ওই ভেঙেপড়া ঘরের কোণে পড়ে-থাকা —ময়লায় আচ্ছন্ন গেবে-যাওয়া একটা আংটির মতই মনে হল তার। হয়তো পিতলের হয়তো তামার—নয়তো গিল্টীর; কিন্তু তবু এক অজানা কারণে মনের চোখ বারবার আংটিটার দিকেই ফিরছে।

কোথায় কী আছে মানুষটির মধ্যে! মনের ঘরের কোন কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে হঠাৎ যেন টান পড়ে পড়ে যাচ্ছে! লোকটার পোশাকে পরিচ্ছদে মোটর ড্রাইভারী বা মোটর মেরামতের কারখানার কিছু সংশ্রব আছে। পরনে ছিল খাকী ফুল প্যাণ্ট, খাকী হাফ-হাতা শার্ট, হাতে ছিল একটা মোটরের স্টার্টিং হ্যাণ্ডেল—বারবার হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে।

চিন্তায় বাধা পড়ল। ভলেন্টিয়াররা মাটির ভাঁড় আর একটা বড় কেটলি নিয়ে চা দিতে এসেছে। উঠানে বারান্দায় কলরব উঠছে। দুর্যোগ পার হয়ে একরাত্রি এই নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করে জীবন এরই মধ্যে অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। পাথর চাপা-পড়া ঘাস যেমন পাথর সরে গেলে আলো-বাতাসে মুহূর্তে মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে বেঁচে উঠছে মানুষ

ভাঁড়ে চা আরতি বহুকাল আগে খেয়েছে। ওই মামার বাড়ি যাওয়ার সময় রেলপথে স্টেশনে খেয়েছে। বর্ধমান থেকে হাওড়া পর্যন্ত স্টেশনে ভাঁড়ের চায়ের কারবারটা জোর চলে। কিন্তু সেও অনেকদিনের কথা। আরতির মাতামহীর মৃত্যুর পর থেকেই সে যাওয়া-আসাও বন্ধ হয়েছে। মামারা কেউ কলকাতায়, কেউ দিল্লিতে—কেউ বম্বেতে বাস করছেন। মামার বাড়ি শেষ সে যায়, যখন তার বয়স চোদ্দ-পনের বছর। সে আজ বারো বছর আগের কথা। ভাঁড়ে চা বোধ হয় তারপর আর খায় নি। তবুও আজ বেশ লাগল। জানলার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, একটা উনানে হাঁড়িতে জল গরম হচ্ছে এবং সেই জল আর একটা বড় হাঁড়িতে ঢেলে প্যাকেট প্যাকেট গুঁড়ো চা ফেলে দিয়ে পাইকারী হারে চা হচ্ছে। গুঁড়ো চায়ের একটা গন্ধ থাকে। হাঁড়িতে গরম জলের মধ্যেও অল্প হাঁড়ির গন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু সেসব কিছুই তেমন টের পেলে না। বরং তৃপ্তি করে ভাঁড়ের চাটুকু শেষ করে বললে, "আর একটু দেবেন তো!"

"নমস্কার! আপনাদের নাম-ঠিকানা, গার্জেনের নাম, কাকে কাকে পাচ্ছেন না, আর কলকাতায় কোন নিকট আত্মীয়স্বজন আছেন কিনা—যাঁদের কাছে গেলে আশ্রয় পেতে পারেন, এইগুলি বলতে হবে।"

তিনজন ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। আরতি একজনকে চেনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নামকরা অর্থনীতিজ্ঞ। দ্বিতীয়জনও একজন কোনো সম্পন্ন ঘরের সন্তান। বাকী একজন বোধ করি পাড়ার সেই সব ছেলেদের একজন, যারা সাধারণ সময়ে রোয়াকে বসে আড্ডা দেয়, চায়ের দোকানে তর্কাতর্কি করে, এবং যে-কোন বিপদ হলেই সেখানে ছুটে যায়। কালকের সেই লোকটির দেশের কেউ হবে।

আবার কালকের সেই লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। কলকাতার হাজার হাজার মোটর ড্রাইভার, মোটর-মিস্ত্রীদের কেউ!

তাদের এককালে মোটর ছিল; তার ড্রাইভার বরাবর একজনই ছিল—বুড়ো বচ্চন সিং। বৃদ্ধ শিখ। এ লোকটি হিন্দুস্থানী, নয়তো বাঙালী। তার মনের চিন্তাকে খণ্ডিত করে প্রফেসর ঘোষ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "তুমি—তুমি আরতি না? ইউনিভারসিটিতে ইকনমিক্স-এর ক্লাসে—?"

আরতির মুখে এবার একটু স্মিত এবং সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। সে হাতজোড় করে নমস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সামনেই দাঁড়াল।

সবিস্ময়ে প্রফেসার ঘোষ বললেন, "তুমি? মানে তোমরাও আর্টকে পড়েছিলে নাকি? তোমাদের তো নিজেদের বাড়ি। অন্তত তা-ই শুনতাম ইউনিভার্সিটিতে।"

"হ্যাঁ, আমাদেরই বাড়ি। বউবাজারের কপালিটোলা লেনের কাছে।"

"সর্বনাশ! সে তো একেবারে ভয়ানক জায়গা। লুঠটুট হয়েছে নাকি?"

আরতি মৃদুস্বরে বললে—"এক রাত্রি এক দিন লুঠ হয়েছে। যা নিয়ে যেতে পারে নি তা নিচের উঠানে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। চার-পাঁচজন খুন হয়ে পড়ে আছে দেখে এসেছি। আমার এক বুড়ী ঠাকুমা—বাবার পিসীমা—"

আরতির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, চোখ ফেটে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল। আর সে আত্মসংবরণ করতে পারল না।

অধ্যাপক ঘোষ তার মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, "কেঁদো না। বেঁচে যখন গেছ, কিন্তু—কিন্তু তোমায়—তোমায় মানে—I mean মারধোর করে নি তো?"

আরতির কপালে কয়েকটা ছড়ে যাওয়ার দাগ দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। তাঁর শেষের কথা কটা বলবার সময় কণ্ঠস্বরে নিদারুণ আতঙ্ক ফুটে উঠল।

সুকৌশলে প্রফেসর ঘোষ যে প্রশ্ন তাকে করেছিলেন, সে আরতি বুঝেছিল। সে ঘাড় নেড়ে জানালে, "না।"

প্রফেসর ঘোষ তবুও আবার বললেন, "লজ্জার এ সময় নয়। মানে অত্যাচার হয়ে থাকলে তার দুটো প্রতিকার প্রয়োজন, তার যেটা প্রাথমিক, সেটা চিকিৎসা। নয় কি?"

আরতি আবার ঘাড় নেড়েই বললে, "না। আমাকে ওরা খুঁজে পায় নি। আমি প্রথমেই ছাদে উঠেছিলাম। ছাদের কোণে কতকগুলো পুরানো জলের ট্যাঙ্ক ডাঁই করা ছিল। আমি তারই সকলের তলাটার মধ্যে ঢুকেছিলাম। ঢুকতেই উপরেরগুলো হুড়মুড় করে চারিপাশে পড়ে আমার চারিপাশটা দুর্ভেদ্য করে তুলছিল। ওরা উপরের কতকগুলো খুঁজে কিছু না পেয়ে ভিতরের দিকে এগোয় নি। আমি তিন দিন সেই তারই মধ্যে ছিলাম।"

প্রফেসার ঘোষ আবার একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটু হেসে বললেন, "আমারই ভুল। তোমাকে পেলে—তোমাকে ওরা ছেড়ে যেত না।"

আরতি শিউরে উঠল। ওদের বাড়ির ভাড়াটের তিনটি তরুণী বউ, পাঁচটি যুবতী মেয়ে, তারা তো কেউ আসে নি। মনে পড়ে গেল—সামনের তেতলা বাড়িটার সেই যুবতী বধূটির গোঙানি!

"কিন্তু তুমি এখন যাবে কোথায়? ও-বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা এখন ভুলে যাও। এখানকার অবস্থা তো দেখছ। তুমি কি এখানে থাকতে পারবে?"

সঙ্গের ভদ্রলোকটি এবার কথা বললেন, "বিপদের কথা নিশ্চয় স্বতন্ত্র। থাকতেই হয়। কিন্তু কলকাতার কোন নিরাপদ এলাকায় কোন আত্মীয়স্বজন নেই আপনার?"

প্রফেসর ঘোষ বললেন, "আত্মীয় না থাক, তোমার বন্ধু-বান্ধবও তো অনেক আছে। কারও বাড়ি গিয়ে থাকো এখন। এখানে অসুবিধা। আমি তো জানি, এ ঠিক সহ্য করতে পারবে না তুমি।"

তার পরই সঙ্গী ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে বললেন, "ওঁর জন্যে ভাবতে হবে না। আরতির অনেক বন্ধু-বান্ধব। আরতি তুমি ঠিক করো কোথায় যাবে। আজই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা

করব। এর মধ্যে তো তুমি থাকতে পারবে না।"

আরতির কানের পাশ দুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। গায়ের রং করসা হলে বোধ হয় টুকটুকে রাঙা হয়ে উঠত। আরতির সৌভাগ্য যে তার রং ময়লা। ইউনিভারসিটিতে সে-সময় ছেলেরা তার আড়ালে তাকে লেডি কালিন্দী বলে ডাকত।

"ওঁর জন্যে ভাবতে হবে না। আরতির অনেক বন্ধু-বান্ধব।"

"এর মধ্যে তো তুমি থাকতে পারবে না!"

কথা কটা আরতির কানের কাছে যেন বেজে চলেছে। তারই জন্যে কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠেছে তার। প্রফেসর ঘোষ যেন খোঁচা দিয়ে কথাটা বললেন। তবু কথাগুলি সত্য। তা অস্বীকার করে না আরতি। কিন্তু খোঁচাটা না দিলেই আরতি সুখী হত।

গান্ধীবাদী অধ্যাপক। মতবাদ শতকরা নিরেনব্বই জনকে মুক্তি দেয় না, নতুন ক'রে বন্ধনে বাঁধে। জীবনের শিক্ষা—সহজ স্বভাব সব কিছুকে ব্যর্থ করে একটা গোঁড়া মতবাদান্ধ মানুষে পরিণত করে। নইলে বিজ্ঞানের অধ্যাপকটি গান্ধীবাদী হয়ে এমন আধুনিকতা বিরোধী হয়ে উঠতেন না। আরতির আধুনিকতার জন্যই অধ্যাপক ঘোষ খোঁচা দিলেন। গান্ধীবাদীদের জন্যই আধুনিকতাকে প্রফেসর ঘোষ পছন্দ করেন না। আধুনিক কালে যা সহজ এবং স্বাভাবিক-ভাবে জন্মায়, তা-ই উল্লসিত-ভাবে বাড়ে, তা-ই দ্রুততম গতিতে ছোটে। যা পুরনো, তা-ই মন্থর, তা-ই স্থবির, তা-ই বিষণ্ণ, তা-ই মলিন। তবুও নূতনকে আধুনিককে পুরাতনীরা চিরকাল এইভাবে অপছন্দ করে। ওঁরা অর্থাৎ পুরাতনীরা নিজেদের বলেন সনাতনী। অর্থাৎ ওঁরাই সকল কালে সত্য এবং স্থির। বর্তমানের দখলেও তাঁরা তুষ্ট হন না—ভবিষ্যতেও ডিক্রী জারী করে রাখেন। ইংরেজ রাজত্ব চলে যাচ্ছে, এ সত্য চোখে দেখেও ঘোষ তা ভাবতে পারছেন না এবং আরতির ইতিহাসও তিনি জানেন না। এয়ার রেডে লণ্ডনে ভাই মারা গেছে। এখানে তার বাবা মারা গেছেন ১৯৪২ সালে ২৪শে ডিসেম্বর, এয়ার রেডের রাত্রে আতঙ্কে। ঘোষ এসব জানেন না হয়তো!

একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

অধ্যাপক ঘোষ বললেন—"এখানে তুমি তো থাকতে পারবে না।" তাও সত্য কিন্তু ওতেও খোঁচা আছে। ইউনিভারসিটিতে সে-সময় স্টাইলে তার চেয়ে মর্ডান কেউ ছিল না।

আরতির বাবা যে ছিলেন পুরোপুরি মডার্ন। সেকালে এম-এ পাস করেও চাকরি খোঁজেন নি। ব্যবসায়ে নেমেছিলেন, ব্যবসায়ে উপার্জন করেছেন, অনেক লোকসান দিয়েছেন, অনেক খরচ করেছেন। এক ছেলে এক মেয়ে—রথীন আর আরতি। রথীনকে ছেলেবেলা থেকেই পড়তে দিয়েছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্সে, তারপর শিবপুর বি. ই. কলেজ; সেখান থেকে পড়া শেষ করে গিয়েছিল বিলেত। আরতিকে প্রথম দিয়েছিলেন লরেটোতে, তারপর ডায়োসেশনে। আরতির জন্ম এই কপালিটোলার বাড়িতেই। তখন বাড়িটায় ভাড়াটে ছিল না। গোটা বাড়িটাই সাহেবি ঢঙে আধুনিকতম স্বাচ্ছন্দ্য এবং সজ্জায় সাজানো ছিল। জন্ম থেকে আরতি খাবার ঘরে দেখেছে টেবিল-চেয়ার। মধ্যে মধ্যে ছেলেবেলায় মামার বাড়ি গিয়ে

পুরনো কালের ধারাধরনের মধ্যে অসুবিধায় পড়ত। দাদা রথীন কোন কালেই মামার বাড়ি যেত না। তার মামারা আধুনিকপন্থী কিন্তু পৈতৃক দেবত্র সম্পত্তির টানে তাঁরা আজও গ্রামের সঙ্গে বাঁধা আছেন; পূজোপার্বণ আচারবিচার বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তার বাবার ওই বন্ধন ছিল না। তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, পড়াশুনোয় ভাল ছিলেন বলে সম্পত্তিবান ব্যবসায়ীর ঘরে বিয়ে করেছিলেন। সেই সূত্রে ব্যবসায়ে নেমেই পৈতৃক জমি-জিরাত যা ছিল সব বিক্রী করে দিয়ে মুক্তি নিয়েছিলেন। এবং আধুনিকতাপন্থী শ্বশুরবাড়িকে ছাড়িয়ে সত্যকারের আধুনিক হয়েছিলেন। বিদেশের বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আরতির জন্মের আগে, আরতি শুনেছে—প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই তখনকার ইংরেজ আমলের কোল-কন্ট্রোলার, মাইনিং-ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতিরা তার বাবাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁদের ফটোগ্রাফ দু-একখানা এখনও বাড়ির দেওয়ালে ঝোলে। তাদের বাড়িতে তাঁরা নেমন্তন্ন পর্যন্ত খেতে আসতেন মেমসাহেবদের নিয়ে। অবশ্য হোটেল থেকে লোক এসে সার্ভ করত। তার সঙ্গে থাকত তার মায়ের কিছু দিশী রান্না। অনেকে এর জন্যে অনেক নিন্দে করেছে, কিন্তু তার বাবা কোন দিন গ্রাহ্য করেন নি। তিনি মুখের উপর বলতেন, "Please, Please! ওসব কথা বলবেন না আমাকে। আমি মূর্খ নই। আমার কাস্টেশনের পেতু নেই, আমি সংস্কারিক প্রবাহের মানুষ নই, বুড়ো গুরু-টানা একখানি গো-যান নই, আমি সস্তা জনপ্রিয়তার ভিক্ষুক নই, আমি ইতিহাস জানি, আমি সে ইতিহাসের স্বরূপ নিজের চোখেই দেখেছি, এই কালেই দেখেছি। বাঙালী জাত মেছো জাত, আর চাষার জাত। মাছ-ভাত খাত; এককালি লেংটি বস্ত্র; আর পরকীয়া সাধন তার আধ্যাত্মিকতা, ওই রসের গান তার সাহিত্য। খোল বাজিয়ে নেচে নেচে করে নাচ তার নাটক। ওই কালীঘাটের পট তার শিল্পকলা। মাটির ভাঁড় আর খুরি তার তৈজস। খড়ের চালের মাটির কুঁড়ে এবং পূর্ববঙ্গে ছিটে বেড়ার ঘর তার স্থাপত্য। খড়বাঁশকাঠে আটচালা করে ষষ্ঠীতলে বেঁধে-যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ! ভাগ্যে ইংরেজ এসেছিল। তাদের সংস্পর্শে এসে ইংরিজী শিখে জাতটা বাঁচল। ওই ব্রাহ্মরা ভাগ্যে ইংরিজী শিখেছিল, আর হিন্দু সমাজ থেকে কেটে বেরিয়ে এল, তাই রবি ঠাকুরকে পেয়েছে। নইলে ইংরেজী শিখেও ধর্মের টানে বঙ্কিমেই খতম হত পালা।"

তারপরেই বলতেন, "আবার এসেছে এই এক গান্ধী। গুজরাটি বুদ্ধ। দেশটাকে একেবারে কপনি পরিয়ে ছাড়বে। বঙ্কিম করেছিল—মা, মা। এ করছে—রাম রাম! শেষ পর্যন্ত দেশের এনার্জিকে রাম নাম সত্ হায় হাঁক দিয়ে নিমতলায় পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।"

এই ধরনের উক্তির পরে সমালোচকেরা স্তম্ভিত হয়ে যেত। কোন পুজোতে তিনি চাঁদা দিতেন না। তাঁর দম্ভ এবং আদর্শ বজায় রাখবার সঙ্গতি তাঁর ছিল। সে দুদিক দিয়েই। অর্থের দিক দিয়ে তো বটেই, মনের দিক থেকেও। ভেঙে গিয়েছিলেন শেষ দিকটায়, আকস্মিক আঘাতে। উনিশ শো চল্লিশের শেষ দিকে। আরতির মা তখন মারা গেছেন। রথীন বিলেতে। যুদ্ধ লাগল। তার বহুদিন আগে থেকে তিনি জাপানীদের সহযোগিতায় এখানে কাঁচা লোহা তৈরীর একটা বড় প্রচেষ্টায় নেমেছিলেন। জাপানীরা যুদ্ধে নামবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচেষ্টায় একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। বলতে গেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন কয়েক

সপ্তাহের মধ্যে। অথচ তখন তাঁর অবস্থা একেবারে সমৃদ্ধির চরমে; হু হু ক'রে ফাঁপছেন। এ বাড়ি ছাড়াও আরও তিনখানা বাড়ি করেছেন। একটা ব্যাঙ্ক করেছেন। জাপানীদের সঙ্গে মিলে করা কারখানাটা বন্ধ হতেই তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যাঙ্কটা ফেল পড়ল। জাপানী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৪১-এর ডিসেম্বর। রেঙ্গুন পড়েছিল ১৯৪২-এর মার্চ মাসে। তার আগেই যুদ্ধের চেয়েও দ্রুতগতিতে ঘটনাগুলো ঘটে গেল। ব্যাঙ্ক ফেল পড়েই শেষ হল না, তার দায়ে তার বাবা য়্যারেস্টেড হলেন, নতুন তিনখানি বাড়ি বিক্রী করে বাবা মুক্ত হলেন সর্বস্বান্ত হয়ে। আরতি এই সময়টাতেই ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে, এই সময়কার কথা তুলেই প্রফেসর ঘোষ তাকে খোঁচা দিয়ে কথাটা বললেন, "এর মধ্যে তো তুমি থাকতে পারবে না।"

তার কারণ কালো মেয়ে আরতি ইউনিভারসিটিতে ঢুকত তার রূপসজ্জার অপরূপত্বে এবং অভিনবত্বে সকল মেয়েকে ম্লান করে দিয়ে, এবং তার ব্যক্তিত্বে ও গাম্ভীর্যে ছাত্রছাত্রী সকলকেই বেশ একটু দূরত্ব করে তুলে। তার সাজ-সজ্জার উপকরণের প্রাচুর্য ছিল না, বরং কমই ছিল। কিন্তু আশ্চর্য রকমের আকর্ষণ ছিল তার সেই স্বল্প পরিচ্ছন্ন উপকরণের সজ্জায়। গলায় একছড়া মুক্তোর ছোট্ট হার, কানে দুটি দুল ছাড়া আর কোন গহনা সে পরত না। রুক্ষ শ্যাম্পু করা চুলে, মিহি সাদা রেশমী শাড়ি-ব্লাউসে, পাউডারের অতি সূক্ষ্ম প্রলেপ মাখা মুখে, ঠোঁটে ঈষৎ নীলাভ বিলাসের চমকে মেয়েটিকে অসামান্য বিলাসিনী মনে হত। কাপড়ের জমিটা শুধু সাদা নয়, শাড়িটার সবটাই সাদা, কোন পাড় পর্যন্ত থাকত না। চলাফেরা করত একটা অলস ভঙ্গিমায়। কারও সঙ্গেই প্রায় কথা বলত না। ছেলেদের সঙ্গে তো নয়ই। অথচ সকলেই যেন অনুভব করত যে, এর মধ্যে এর একটা খেলা রয়েছে। কিন্তু কেউ জানত না তার আসল খেলাটি কী। বাপের অবস্থার বিপর্যয়ের পর আরতি সাজতে ভালবাসত না। গহনা তখন ব্যাঙ্কে বাঁধা রয়েছে। বাড়ি বিক্রীর টাকায় দেনা শোধ হয়েছে, কিন্তু বাবাকে বলতে পারে নি বাবা গহনাগুলি ছাড়িয়ে আনো। চুল শ্যাম্পু করায় সে আজীবন অভ্যস্ত; কাপড়-চোপড় তার সবই ওই ধরনের। সুতরাং তাকে নিয়ে যে ফিস্‌-ফিসানি উঠেছিল, তাতে তার রাগের চেয়ে দুঃখই হত বেশী। ছেলেদের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল, সে ক্রীশ্চান। ওদের কেউ কেউ তার কম্বুলিটোলার বাড়ি পর্যন্ত তার পশ্চাদনুসরণ করে—ফিরিঙ্গীপাড়ায় বাড়ি দেখে ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। তাতে তার হাসিই পেয়েছিল। হায় রে হিন্দুধর্ম! শেষ পর্যন্ত ফাঁপানো চকচকে চুলে, পাড়ওয়ালা শাড়িতে, আর মুখ না বুজে চলায় তোমার স্থিতি নির্ধারিত হল! তার ঘেন্না হত। তার নাম তারা অনেকে দিয়েছিল, মিস চার্লিচাৎ! একদিন একটা কাগজ তার গায়ে এসে পড়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'তোমার নাম কি শ্যামলী?' মধ্যে মধ্যে এক কলি গান পিছন থেকে ভেসে আসত, 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।' এগুলো সে গ্রাহ্য করত না। হঠাৎ একদিন শুনলে সে, কেউ বলে উঠল, 'লেডি কালিন্দী'! সে ফিরে তাকিয়ে কাছাকাছি কাউকে দেখতে পায় নি। একতলার সিঁড়ির নিচে একদল ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল। অন্যভাবে। ভদ্রভাবে। তারা রাজনীতি করত। তারা চেয়েছিল তাকে দলে টানতে। কিন্তু সেও তারা পারে নি।

হঠাৎ একদিন তার সমস্ত সহশক্তির আবরণটা ভিতরের বিস্ফোরণে ফেটে চৌচির হয়ে গেল; উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন আধা-স্ট্রাইক গোছের কী একটা হয়েছিল; ছেলেমেয়েরা প্রায় অধিকাংশই অনুপস্থিত সেদিন, আরতি লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে নিচে নামছিল। লিফট্‌টা ছিল বিকল। সিঁড়ির একটা মোড়ের চাতালে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। আরতি দেখলে, তাকে দেখে তাদের মধ্যে একটা দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল। দুজনের মুখেই একটু চকিত হাসি খেলে গেল। কুঞ্চিত হয়ে উঠল আরতির ভ্রূ, সে নিচের দিকে তাকিয়ে অবনত দৃষ্টিতে পথ চলতে পারে না, সামনের দিকেই দৃষ্টি রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে নামতে লাগল। মোড়ের চাতালে পা দেবামাত্র একটি ছেলে হাতের খাতা-বই কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললে, "নমস্কার! কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

অগত্যা প্রতিনমস্কার করে আরতি বলেছিল, "বলুন!"

হেসে ছেলেটি বলেছিল, "মানে আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনিই তো রতি দেবী? রতি সেন?"

মুহূর্তে বিস্ফোরণের মত ক্রোধে সে যেন ফেটে পড়েছিল। কিন্তু চিৎকার করে নি। ছেলেটির হাতের বই এবং খাতাগুলি ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নামতে শুরু করেছিল। ছেলেটি হতবুদ্ধি হয়ে বোবার মত মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে তার পিছনে ছুটে এসে বলেছিল, "এ কী, আমার বই-খাতা নিলেন কেন? এ কী? দিন!"

"সেক্রেটারীর ঘরে আসুন। সেখানে তাঁর হাত থেকে নেবেন। এর থেকে আপনার নাম, রোল নম্বর, ক্লাস—এ পরিচয় আমি শুনব। এবং আমার নাম-পরিচয়ও আপনাকে বলব।"

তার চলার গতি দ্রুততর হয়ে উঠেছিল আপনা-আপনি।

"শুনছেন? শুনুন! শুনুন!"

উত্তর দেয় নি আরতি।

"মাপ করুন আমাকে। শুনছেন!"

এরও উত্তর না দিয়ে আরতি সিঁড়ি নেমেই চলেছিল। পিছনের দিকে ফিরেও তাকায় নি।

"আর কখনও—"

"কি হয়েছে? কী ব্যাপার?"

ঠিক পরের চাতালটায় সিঁড়ির মোড়ে প্রফেসর ঘোষ প্রশ্ন করেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই তিনিও বিপরীত মুখে মোড় ফিরে আরতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন থমকে। নিচে থেকে উঠবার সময় এদের কথাগুলি তাঁর কানে গিয়েছিল। হয়তো বা খানিকটা তিনি দেখেও ছিলেন।

আরতি হাঁফাচ্ছিল উত্তেজনায়। কানের পাশ দুটো আজকের মতই ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

যথাসাধ্য আত্মসংবরণ করে সে বলেছিল, "আমি সেক্রেটারীর কাছে ওঁর নামে কমপ্লেন করতে যাচ্ছি।"

ইচ্ছে হয়েছিল এগিয়ে চলে যাবার। এই গান্ধীবাদী, মিষ্টিমুখ আপসপন্থী লোকটিকে তার খুব ভাল লাগত না কোন কালেই। কিন্তু প্রফেসর ঘোষই বলেছিলেন, "কী হয়েছে আমাকে বলতে পারো না? সেক্রেটারী নেই; এই এখুনি ওদিক দিয়ে ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে চলে গেলেন।"

"আমি ওঁর শুধু নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এবং তার জন্যও আমি বারবার মাপ চাইছি।"

"চুপ করো তুমি। আগে ওঁর কাছে শুনব আমি। অবশ্য উনি যদি বলেন।"

আরতি একবার ঠোঁট কামড়ে ধরে আত্মসংবরণ করেছিল, বলতে চেয়েছিল—'না, যা বলবার সেক্রেটারীর কাছেই বলব।' কিন্তু সে কথাটাকে ঠোঁটের মুখে আটকে নিয়ে বলেছিল, "আমার নাম আরতি! উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন নিরীহভাবে—আপনার নাম জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনিই তো রতি দেবী? তাই আমি ওঁর খাতা-বই কেড়ে নিয়ে সেক্রেটারীর কাছে যাচ্ছি।"

প্রফেসর ঘোষেরও মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। রূঢ় কিন্তু নিম্নকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, "ছাত্রদের কলঙ্ক তুমি! এত বড় লজ্জার কথা আর হয় না।"

ছেলেটি আর দাঁড়াতে পারে নি শক্ত হয়ে, ভেঙে পড়েছিল মুহূর্তে। টপটপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরতে শুরু করেছিল। কথা বলতে চেষ্টা করেও পারে নি। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপছিল অবলার মত।

আরতি এবার তার খাতা-বই তার হাতে দিয়ে বলেছিল, "নিন। কিন্তু আর কখনও এমন করে কোন সহপাঠীকে রসিকতা করতে গিয়ে অপমান করবেন না।"

ছেলেটি খাতা-বই পেয়ে মাথা হেঁট করে চলে গেল। আরতিও ফিরল। কিন্তু প্রফেসর ঘোষ তাকে ডেকে বলেছিলেন, "তুমি দাঁড়াও। চল, আমি তোমাকে বাসে বা ট্রামে কিসে যাবে, পৌঁছে দিয়ে আসি।"

এবং সঙ্গে সঙ্গেই নামতে শুরু করেছিলেন। নামতে নামতেই বলেছিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলব। মিষ্টি কথা না হতে পারে—কিন্তু ভুল বুঝো না যেন আমাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসেছিলেন। বোধ হবি রূঢ় কথা মোলায়েম করবার জন্য, কুইনিনের উপর কোটিংয়ের মত মিষ্টি হাসি।

আরতি বলেছিল, "বলুন।"

"তুমি এত অমিশুক কেন? তোমার সঙ্গে যারা পড়ে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করো না কেন? এবং বেশভূষায় আর একটু সহজ, মানে—আমাদের দেশের মত হতে পারো না? আর একটু সোবার? এ নিয়ে অনেক কথা কানে আসে। সেইজন্যই আমি বলছি।"

আরতি বলেছিল, "আমার উপর রাগ করবেন না স্যার, আমি এখানে পড়তে এসেছি, বন্ধুত্বের আসর জমাতে আসি নি। আমার বন্ধু-বান্ধবী অনেক আছে। এবং বন্ধু হতে গেলে

যে সহৃদয়তার প্রয়োজন তা এখানে কারুর আছে বলে মনে করি নে। সেইজন্যেই বলি, আমার নূতন বন্ধু-বান্ধবীর আমার প্রয়োজন নেই। আর আমার এই বেশভূষাতেই আমি ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত। একে আমি আনসোবার বলেও মনে করি নে।"

বলেই বেশ একটু দ্রুতগতিতে প্রফেসর ঘোষকে পিছনে ফেলে চলে যেতে চেষ্টা করেছিল। প্রফেসর ঘোষ বোধ করি এর পর আর তার সঙ্গে যেতে চান নি; ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়েছিলেন।

এর পর এক সপ্তাহের মধ্যে—

তার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন করে দিলেন অধ্যাপক ঘোষ, প্রশ্ন করলেন,—"কিছু ঠিক করেছ? কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে বল তো?" আরতির মনে পড়ল সে আজ দাঙ্গার পর নিরাশ্রয় হয়ে বাগবাজারে এক মুসাফিরখানার মত কোন স্থানে বসে আছে।

অধ্যাপক ঘোষ অপর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ সেরে ঘর থেকে বের হবার মুখে আবার আরতির সামনে দাঁড়ালেন এবং ওই প্রশ্ন করলেন।

আরতির ভুরু কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। উত্তর দেবার মত চিন্তা করবার অবকাশ সে পায় নি। অনেক অতীতে মন ছড়িয়ে পড়েছিল তার। আজ সে প্রায় সব হারিয়েছে। যা আছে তাও তার নাগালের বাইরে। থাকবার মধ্যে এই বাড়িটা আর ব্যাঙ্কে কিছু টাকা। তাও চেক্-বই নেই। কাপড়জামা পরনে যা আছে, তাই সব। আত্মীয় তার আছে। আপনার মামাতো ভাইয়েরা। বন্ধু-বান্ধবও আছে। কিন্তু কোথায় গেলে এই একান্ত রিক্ত অবস্থায় সত্যকারের স্নেহ এবং সমাদর পাবে, সূক্ষ্ম হিসেব না করলে তা নির্ণয় করা যায় না। মামাতো ভাইরা আপনজন হলেও তাদের সব প্রীতি-আত্মীয়তা যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

কাল-যুদ্ধ! পৃথিবীজোড়া বাইরের ধ্বংসলীলাই তার একমাত্র অভিশাপ নয়; নাগাসাকি-হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া বায়ুস্তরেই শুধু বিষ ছড়িয়ে ক্ষান্ত হয় নি, মানুষের মনলোকে যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, তার জ্বালায়-জর্জরতায় সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে তার মামাতো ভাইয়েরা কোন সক্রিয় রাজনীতি করে নি, করার মত যোগ্যতাও তাদের ছিল না, তারা প্রথম যৌবন থেকেই মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত। কিন্তু যুদ্ধের গোড়া থেকেই তারা ওআর কন্ট্রাক্ট খুঁজেছে, পেয়েছেও; ইংরেজের খয়েরখাঁ-গিরি করেছে, কিন্তু দেশপ্রেমের ও স্বাধীনতা কামনার মনোবিলাসে যুদ্ধের গোড়া থেকেই জার্মানীকে সমর্থন করেছে; তারপর জাপান এগিয়ে যোগ দিলে তো তাদের বাড়ির মধ্যে উল্লাস প্রকাশের সীমা ছিল না। তারও পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই যুদ্ধ-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতেই, এই সব মনে-মনে-শৌখিন-বিপ্লবীরা—ঘরের মধ্যে ব'সে ইচ্ছা দিয়ে এই পক্ষকে সমর্থনে সবাক আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়—নানান্ মিথ্যা গল্প ক'রে বন্ধু-বান্ধবের কাছে বাহবা কুড়িয়েছে। অন্যদিকে তার দাদা রথীন মারা গেল লণ্ডনে জার্মান বোমায়। সেই আঘাতে সেরিব্রেল থ্রম্বসিস হয়ে আরতির বাবার ডান দিকটায় হল প্যারালিসিস। এখানেই শেষ নয়। তার পরই

বিয়াল্লিশ সনের ডিসেম্বরের চব্বিশে ডালহৌসি স্কোয়ারে জাপানী এয়ার রেডের রাত্রে আতঙ্কে তিনি মারা গেলেন। এর ফলে আরতি হয়ে উঠল জাপান, জার্মানী এবং তাদের সঙ্গে আছেন বলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও ঘোরতর বিরোধী। প্রায় গোটা দেশেরই তখন থেকে আজও পর্যন্ত এমনি অবস্থা। নানান্ রাজনৈতিক দলের প্রভাবে একটি বাড়ির মধ্যেই হয়তো চারটি ছেলে চার রকম মতবাদে পরস্পরের বিরোধী। মর্মান্তিক আঘাতে আরতির বিদ্বেষের তীব্রতার আর সীমা ছিল না। সেই তীব্রতায় সে মামাতো ভাইদের সঙ্গে মামার বাড়ির সংস্পর্শও প্রায় ত্যাগ করেছে। একজন ভাইয়ের সঙ্গে তার বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ। এই মহা দুর্যোগের মধ্যেও সেখানে যাবার কথা ভাবতে পারছে না আরতি। বন্ধুবান্ধবের কথা মনে করতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে তাদেরই কথা, যারা তার ভাবেই ভাবিত। কিন্তু তাদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। তার মতামত যাই হোক না, নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাকে খর্ব করে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সে আজও জড়িত হয় নি। তবু তাদের ওখানে যেতেও মন সায় দিচ্ছে না।

প্রফেসর ঘোষ আরতির চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন,—"ঠিক করে উঠতে পার নি? আচ্ছা— ও-বেলা পর্যন্ত ভেবে ঠিক করো। তোমার কাপড়-চোপড় তো কিছু নেই! চাই তো!"

"না। ঠিক করেছি। আমার এক মামা থাকেন এখানেই, বালিগঞ্জে, মনোহরপুকুর রোডে। আমি সেখানেই যাব।"

"তাহলে তো নিশ্চিন্ত। ঠিকানাটা বল তো? টেলিফোন থাকলে এখুনি খবর দিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা এসে পড়বেন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে আরতি বললে, "না। এক্ষুনি হয়তো তাঁরা পারবেন না। আমাকে অনুগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন না?"

প্রফেসর ঘোষ সঙ্গের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালেন, "কেশব ভাই—"

সৌম্যদর্শন কেশববাবু বললেন, "ব্যবস্থা করছি। গাড়ি চাই। ও-বেলা মানে তিনটে পর্যন্ত বোধ হয় পাবেব। গাড়ি পেলেও মুশকিল হচ্ছে ড্রাইভারের। নার্ভাস ভীতু লোক দিয়ে তো হবে না। মাধব বা রতন, এদের দুজনের কেউ হলে ভাল হয়। রতন হলে আবার সঙ্গে লোক চাই। হাজার হলেও মিস্ত্রী শ্রেণীর লোক। ভাল জানি না। নতুন। তবু তিনটে পর্যন্ত হবে বলেই মনে করি।"

"আমার জন্যে একজোড়া কাপড় আর জামাটামা চাই। এইটে—"

গলা থেকে লকেট সমেত একছড়া হার খুলে দিয়ে বললে, "এইটে বিক্রী করে বোধ হয় হয়ে যাবে।"

"আমাদেরও ফাণ্ড রয়েছে।"

বাধা দিয়ে হেসেই আরতি বললে, "আমার ভাগ্যক্রমে ব্যাঙ্কে কিছু রয়েছে। ঘরে যা ছিল গয়না টাকা কাপড় গেলেও সব যায় নি। আপনাদের অনেক জনের জন্যে অনেক করতে

হবে। আমারও একখানা কাপড় আর একটা জামায় চলবে না। আরও খরচ আছে। বিক্রী তো আমাকে করতেই হবে।"

প্রফেসর ঘোষ হাত পেতে বললেন, "দাও।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়িটার সিঁড়ির সামনে। নামলেন একটি খাকী পোশাক পরা সবলকায় ভদ্রলোক।

"দাদা।"

"মাধব!" সাড়া দিলেন প্রফেসর ঘোষের সঙ্গী।

মাধব এসে দাঁড়ালেন। আরতি চিনতে পারলে এই ভদ্রলোকই কালকের উদ্ধারকারী দলের কর্তা ছিলেন ও গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

"কাল রাত্রে সাদা রঙের ক্যাডিল্যাকখানার কথা গুজব নয়, সত্যি। নিকিরীপাড়ার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। রতন দেখেছে নিজের চোখে।"

বলেই তিনি ডাকলেন, "রতন!"

প্রফেসর ঘোষ বোধ করি কথাটা ধরতে পারেন নি, তিনি প্রশ্ন করলেন, "সাদা ক্যাডিল্যাক?"

"সুরাবর্দীর একখানা সাদা ক্যাডিল্যাক আছে। লোকে বলছে এখনো—" কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে গেলেন তাঁরা। অর্থাৎ সুরাবর্দী কাল রাত্রে নিজে নিকিরীপাড়া এসেছিলেন। হয়তো বা নিকিরীদের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে অথবা প্রতিশোধাত্মক কিছু করবার উদ্দেশ্য নিয়ে;—যে উদ্দেশ্য নিয়েই আসুন এদের চিন্তিত হবার কারণ আছে।

আরতি জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। নিকিরীপাড়া কথাটা তার মাথায় সাড়া জাগিয়েছে। নিরীহ নিকিরীদের এ-পাড়ায় নাকি নিষ্ঠুর প্রতিশোধের আক্রোশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। দা, লাঠি, ঢেলা, যে যা পেয়েছে—তাই দিয়ে আক্রমণ করেছে, গোটা নিকিরী বস্তিটাতে আগুন লাগিয়ে পাহারা দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টারও বেশী জ্বলেছে বস্তিটা। কেউ কেউ বলছে নিকিরীরা মসজিদের মধ্যে বস্তির মধ্যে অস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছিল। প্ল্যানমত আক্রমণ হলে তারাও যোগ দিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করত। আজ সত্য মিথ্যা বিচারের উপায় নেই। তবে নিকিরী বস্তিটা এখনও ধোঁয়াচ্ছে। এখনও রাস্তায় নিকিরীদের শব পড়ে আছে। পচে দুর্গন্ধ উঠছে। আরতি ভাবছিল দোষ দেবে কাকে?

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে উঠল। বাইরে কে বলছে—"আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর গাড়িটা আমি চিনি।"

আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। ভরাট এবং সবল। যেন কাঁসরের মত। যেন কত চেনা।

উঁকি মারলে সে বাইরে।

কালকের সেই লোকটি!

আশ্চর্য। অদৃশ্য অশরীরীর মত কার অস্তিত্ব তার মনোমণ্ডলে সে যেন অনুভব করছে।

কিন্তু তাকে না পারছে দেখতে, না পারছে স্পর্শ করতে, শুধু একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করে তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড অস্থিরতা জেগে উঠেছে। কে? কে? কে?

তিন

হঠাৎ একটা কথা একজনের মুখ চকিতের জন্য মনে পড়ে গেল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা দেশলাইয়ের কাঠি মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে চকিতের জন্য একখানা মুখের খানিকটা দেখিয়ে যেন নিভে গেল। ধূলিমলিন আংটিটার পলকাটা হীরাটার শুধু একটা পলের উপরের ধূলামালিন্য মুছে গিয়ে আলোকের প্রতিফলনে এক বিন্দু দীপ্তি তীরের মত চোখে এসে পড়ল যেন।

চমকে উঠল আরতি। সমস্ত স্মৃতি-লোকটায় আলোড়ন উঠল। সে? কিন্তু তাও কি হয়? প্রবীর? প্রবীর চ্যাটার্জি—ইঞ্জিনিয়ার; গোঁফ-দাড়ি কামানো—পরিচ্ছন্ন শিক্ষিত মানুষ, মিলিটারীতে চাকরি নিয়ে হয়েছিল—ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি! সুবরণাঙ্গনে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সে কি হতে পারে—এই অপরিচ্ছন্ন কালি-ঝুল মাথা—এই সব ঘোষ-বোসদের অনুগত ভৃত্যের মত এই মোটর-মিস্ত্রী? না।

তিনটের সময় গাড়ি এল।

বাগবাজারে বসুদের বাড়ি থেকে গাড়িতে উঠে আরতি মামাতো ভাইদের অভ্যর্থনার আশঙ্কাতেই নিজের মধ্যেই সে-দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল, ভুলে গেল ওই লোকটির কথা। পৌঁছে দেবার জন্য বসুদের বাড়ি থেকে যিনি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি মাধববাবু। উদ্ধারকারী দলের নেতা। বিশিষ্ট ঘরের ছেলে। সকালবেলা প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে কেশব বলে যিনি এসেছিলেন, নিঃসংশয়ে তাঁর ভাই। মুখের সাদৃশ্যই সে-কথা বলে দেয়। ওবেলায় কেশববাবুকে দাদা বলেই ডেকেছিলেন। সঙ্গে আর একজন ওঁদেরই কেউ হবেন।

বসুদের বাড়ি থেকে গাড়িখানা গঙ্গার ঘাটের দিকে পথ ধরেছিল। পথে পোড়া নিকিরী-পাড়ার বিরাট চিতাটা তখনও ধোঁয়াচ্ছে। রাস্তার পাশ থেকে গলিত শবের গন্ধ আসছে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের রাস্তাঘাট তৈরী করা খোলা বিস্তীর্ণ জায়গাটার ধারেই নিকিরীপাড়া। নতুন রাস্তার উপর কয়েকখানা নৌকো পড়ে রয়েছে। নৌকোর উপর বসে রয়েছে কতক-গুলো শকুন, ঘুরছে কয়েকটা কুকুর, গোটা রাস্তাটা ছাইয়ের গুঁড়োতে কালো হয়ে তারই মধ্যে পড়ে রয়েছে পচে-ফুলে-ওঠা কয়েকটা শব। মসজিদ একটা কালো হয়ে গেছে পুড়ে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল আরতি।

"আপনি আশেপাশে তাকাবেন না। বরং নাকে কাপড় দিয়ে চোখ বুজে থাকুন। এখানে অনেক লাশ পড়ে আছে।"

বললেন মাধববাবু। তারপরই আবার বললেন, "আরও পাবেন শোভাবাজারে। হাবু গুণ্ডার আড্ডার ওখানে।"

মাধববাবুর সঙ্গী মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ রে সেই লাসটা সরিয়েছে? কবন্ধটা?"

"দা দিয়ে ফুঁ-ফাঁক করাটা? সরিয়ে থাকবে। তবে সকালেও ছিল। রতন বলছিল।"

"ওখানেও তো সাদা ক্যাডিলাক এসেছিল।"

"কী করবে এসে! হিন্দুর ঘরে আগুন জ্বালালে, সে আগুন মুসলমানের ঘরেও লাগে। হিন্দুর ঘরের কাছে এসে সে-আগুন নিভে যায় না।"

"এ পথে নিয়ে এলেন কেন?" অধীর আর্তস্বরে কথা কটা বেরিয়ে এল আরতির কণ্ঠ থেকে।

"কী করব বলুন। সব পথের ধারেই এ কিছু না কিছু ঘটেছে। অবশ্য এ-দিকটায় কিছু বেশী। কিন্তু আসতে হল বাধ্য হয়ে। যে গাড়ি ড্রাইভ করে যাবে, তাকে শোভাবাজার থেকে নিতে হবে।"

"আপনি যাবেন না?"

"আমার যাওয়ার উপায় নেই। শোভাবাজারে কিছু মুসলমান আছে—তাদের রেস্কু করতে আসবে পুলিস। আমি সেখানে থাকব। আপনার ভয় নেই, যে ড্রাইভার যাবে, সে আমার থেকে খারাপ চালায় না। সাহস হয়তো আমার থেকেও বেশী। আর সঙ্গে এই শম্ভু রইল। কোন ভয় নেই আপনার।"

হঠাৎ আরতি বলে উঠল, "আমার মামাদের কেউ যদি বাড়িতে না থাকেন?"

হেসে মাধববাবু বললেন, "এই গাড়িতে ফিরে আসবেন। অন্য কেউ কাছাকাছি পরিচিত থাকলে—সেখানেও এরা পৌঁছে দেবে। আপনাকে নিশ্চয়ই সেখানে নামিয়ে দিয়ে আসবে না।"

আরতির মনে তখন মামাতো-ভাইরা কী অভ্যর্থনায় তাকে অভ্যর্থিত করবে—সেই কল্পনা উঁকি মারতে শুরু করেছে। মতভেদের ক্ষেত্রে যেখানে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়, সেখানে বিপন্ন হয়ে গেলেও আক্রমণের সুযোগ সামলাতে পারে না, এমনি মানুষই সংসারে বেশী। তা ছাড়া তার মামাতো ভাইদের মুখ মনে পড়ছে মনুষ্য-চরিত্রহীন একদল শুধু পাস করা বি. এ. এম. এ. ডিগ্রীর জোরে এবং অর্থের জোরে সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে ঠেলে গিয়ে বসে, শুধু অর্থের জোরেই তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং তীব্র। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি দেশের আবেগময় সহানুভূতি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষ্য ক'রে আজ তারা অতি চতুরতার সঙ্গে নিজেদের নেতাজীর দলভুক্ত বলে ঘোষণা ক'রে—ভাবী কালের সামাজিক আসনের দাবী তৈরী ক'রে রাখছে।

এটা আজ ব্ল্যাকমার্কেটীয়ারের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের মত আত্মসাৎ করা মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ এই যুদ্ধের কয়েক বৎসরে তারা গোপনে কত টাকা ব্যয় করেছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আগমন-পথ প্রশস্ত করবার জন্য, কতবার কোন্ মোটর-যাত্রায়, কত ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীদের কোথায় কোন্ অরণ্যে তুলে কোথায় পার করে দিয়েছে, কোন্ নগরের কোন্ গুপ্তবাস থেকে সতর্ক পুলিস-দৃষ্টি থেকে সরিয়ে এনেছে, কোথায় কোন বোমার বা পিস্তলগুলির থলি পৌঁছে দিয়েছে, কোন যাত্রায় ষাট মাইল থেকে আশি একশ-তে স্পীড তুলে কোন অনু-

সরণরত পুলিস-মোটরকে ফাঁকি দিয়েছে, কটা পিস্তল রিভলবার এমন কি রাইফেলের গুলি সাঁই সাঁই করে কানের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করে তারা আজ মহাদর্পিত ব্যক্তি। নিষ্ঠুরভাবে রূঢ়ভাষী!

গাড়িটা থেমে গেল। শোভাবাজারের একটা গলির মোড়।

আরতি চিন্তার ক্লান্তিতে সিটের মাথায় মাথা রেখে ভাবছিল। চোখ বুজে ভাবছিল। সে মাথা তুললে না—চোখও খুললে না। বুঝতে পারলে মাধববাবু নেমে গেলেন। তাঁর জায়গায় নতুন লোক উঠল।

মাধববাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, "চোখে কী হল? গগল্‌স্‌ কেন?"

"লাল হয়েছে একটা চোখ, জল পড়ছে। ওবেলা পোড়াবস্তিটায় ঘুরে দেখলাম, বোধ হয় ছাইটাই পড়েছে।"

"রাত্রে একটু কম্প্রেস ক'রো। চলে যাও। তোমাকে বলার কিছু নেই। খুব হুঁশিয়ার!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"স্ট্র্যাণ্ড হয়ে ময়দানে পড়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের পাশ দিয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরবে।"

গাড়িটা গর্জন করে উঠল। নড়ে উঠল। কণ্ঠস্বরে মনে হল এ কালকের সেই বিচিত্র ভারী কণ্ঠস্বর। ধারেকের জন্য একবার চোখ মেলে দেখে আরতি আবার চোখ বুজল।

হ্যাঁ—এ সেই। কে? কিন্তু সে চিন্তা-প্রশ্ন তার এই মুহূর্তে মুছে গিয়ে বড় মামতো-ভাইয়ের মুখ মনে পড়ে গেল। এবং দেখা হতেই কী কথা বলে সে তাকে সম্ভাষণ করবে, তাও তার কল্পনায় কানের পাশে বেজে উঠল; গাড়িটা ছুটছে হু-হু করে। লোকটি স্থিরভাবে বসে আছে। স্টীয়ারিং কাঁপছে দ্রুতবেগে কিন্তু লোকটির হাতের মুঠো যেন লোহার।

মামার বাড়ির দরজায় কিন্তু বড় মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না। সেখানে দাঁড়িয়েছিল—ছোট মামাতো ভাই। বড় ভাইয়ের ও পিঠ। সে তাকে দেখবামাত্র বলে উঠল, "মাই গড। কমরেড আরতি সেন! যাক, বেঁচে আছ? বেশ বেশ। তা এসো।"

কথা বলার ভঙ্গিতে আরতির মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। এই মুহূর্তে এইভাবে কথা বলতে পারে? পারে বই কি। তার মামাতো ভাই সে কথা প্রমাণ করে দিয়ে বক্র হেসে আবার বললে, "কী ব্যাপার? ইনকিলাব জিন্দাবাদের কার্স্ট শকেই ভেঙে পড়লে? তুমি তো পাকিস্তানের সাপোর্টার গো। কমরেডদের তো ঝাণ্ডা দেখালে পারতে। সুড়সুড় করে ফিরে যেত।"

আরতি আত্মসম্বরণ করতে পারলে না—সে বলে উঠল, "না, কোন ঝাণ্ডাই আমার ঝাণ্ডা নয়। কোন দলের সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক নেই। যাদের বোমায় আমার ভাই মরেছে, যাদের বম্বিংয়ের শকে আমার বাবা মরেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমি চিরদিন থাকব। আমি পাকিস্তানের সাপোর্টার কোনদিন নই। তোমাদের মত একাধারে বিলাসী পলিটিসিয়ান এবং ধর্মধ্বজীও নই। যারা আমার চোখের সামনে ঘরদোর লুঠ করলে, অত্যাচার

করলে জানোয়ারের মত, তারা আমার শত্রু। আবার দেখে এলাম, নিরীহ মুসলমান বস্তি পুড়ছে, তাদের শবদেহ পচছে। এসব যারা করেছে তারাও আমার বন্ধু নয়। তাদেরও আমি কেউ নই। তবে যারা অত্যাচারীর সঙ্গে সামনাসামনি লড়েছে, তাঁদের শ্রদ্ধা করি।" মুহূর্তের জন্য কথায় ছেদ টেনে আবার সে বললে, "জানো কপাল আমি মানি না। তবে কপাল ছাড়া কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলছি, কপালের ফেরেই আজ তোমরা মামাতো ভাই বলে কয়েক দিনের জন্য তোমাদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছি।"

"আশ্রয় আবশ্যই পাবে। তেমন হৃদয়হীন আমরা নই। এগুলো অনেক দুঃখেই বলেছি। কথাগুলো মনে পড়ে যায় যে! জঘন্য স্পাই-বৃত্তি করতেও বাধে নি তখন। আমাদের পিছনে পুলিস লেগেছিল। সে-সব খবর তুমি ছাড়া কে দিয়েছিল? সে বিষয় আমার কোন সন্দেহ নেই!"—

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চিৎকারে থমকে গিয়েছিল সকলে। আরতির মামাতো ভাইও চুপ করে গেল। ঠিক এই সময়ে ওই ড্রাইভারটি তার ভরাট গলায় কল্পনাতীত একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল, "অ্যাও!"

একটা কুকুরকে। এই বাড়িরই পোষা একটা ছুঁকছুঁকে স্প্যানিয়েল জাতীয় কুকুর কখন বেরিয়ে এসেছিল ফটক খোলা পেয়ে। তখনও কথা হচ্ছিল ফটকের মুখে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা মনিবকে পার হয়ে কাটা লেজটা বুড়ো আঙুলের মত নেড়ে একে-ওকে শুঁকে এবং চেটে বেড়াচ্ছিল। মালিক এবং আরতিকে অতিক্রম করে এসে ওই ড্রাইভারটিকে দেখে ঘেউঘেউ করে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাকে এমনি জোরে ধমক দিয়েছে ড্রাইভারটি।

কুকুরটা ভয় পেয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মালিক অর্থাৎ আরতির মামাতো ভাই চিৎকার করে উঠল, "ইউ ব্রুট! কেন তুমি কুকুরটাকে এমন করে ধমক দিলে? কেঁও? Why?"

আশ্চর্য, ঘৃণায় ড্রাইভারটির ঠোঁট উল্টে গেল—সে ঘৃণার সঙ্গে বললে, "আই হেট ডগ্‌স। আই হেট ডগ্‌স। বিশেষ করে যেগুলো অকারণে মানুষ দেখে চিৎকার করে।" সে কথার সুরের মধ্যে কি অবজ্ঞা এবং কি ঘৃণা। যেন ওল্টানো ঠোঁট থেকে অন্তরের মর্মান্তিক ঘৃণা উপচে ঝরে পড়ল এবং তার স্পর্শ লাগল সকলকে।

"হোয়াট?" রাগে খেপে উঠল আরতির মামাতো ভাই। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানা উদ্যত হয়ে উঠল। ড্রাইভারের মাথার চুল ধরবার জন্য।

ড্রাইভারটি তার হাত উঠিয়ে বাড়ানো হাতখানা ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বললে, "কিছু মনে করবেন না, আমার চুল ধরলে আপনার হাত ধরতে হবে আমাকে। আমার হাত অত্যন্ত শক্ত। পনেরো-ষোল বছর বয়সে শেয়ালে কামড়েছিল আমাকে, আমি শেয়ালটার চোয়াল চেপে ধরেছিলাম। চোয়ালটা ভেঙে গিয়েছিল। নখ দিয়ে আঁচড়েছিল অনেক, দেখুন দাগগুলো এখনও আছে। রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না।"

বলেই সে গাড়িতে চেপে বললে, "শম্ভুবাবু আসুন, আমাকে আর হাঙ্গামায় ফেলবেন না। ওদিকে বেলা যাচ্ছে। সন্ধ্যের পর কারফ্যু।"

শম্ভু আরতিকে বললে, "তা হলে আমরা যাই মিস সেন?"

আরতি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; সে যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অন্তরের স্মৃতিলোকে আলোড়ন উঠেছে; যেন ঝড় বইছে।

আরতির মামাতো ভাই তখন চিৎকার করছে—"স্টপ স্টপ, আই সে স্টপ!"

গাড়িখানা স্টার্ট নিয়ে নড়ে উঠেছিল, থেমে গেল।

শম্ভু বললে, "না-না, চলো রতন। চলো।"

নামতে যাচ্ছিল রতন ড্রাইভার, কিন্তু শম্ভুর কথায় নামতে ক্ষান্ত হয়ে শুধু একবার আরতির মামাতো ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িটা বেরিয়ে গেল অস্বাভাবিক প্রচণ্ড গতিতে।

আবার চিৎকার করে উঠল আরতির মামাতো ভাই, "স্টপ, ইউ সোয়াইন! ই-উ র‍্যাসক্যাল!"

"কী হয়েছে? কী?"

বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। "লাটু, এত চিৎকার করছ কেন? এ কী, আরতি? তুই বেঁচে আছিস? ভাল আছিস? আয়, আয়, ভেতরে আয়। বউমা—বউমা!"

আরতি তবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এও কি সত্যি হতে পারে? তাই কি হয়? একটা প্রবল প্রশ্ন তার মনের মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একটা দিগন্ত থেকে দিগন্ত-বিস্তৃত বিদ্যুৎ রেখার মত বিস্ফুরিত হয়ে উঠল। সে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েই রইল।—

দুজন মানুষের 'আই হেট' বলার সঙ্গে এমনি ঠোঁঠ ওল্টানোর ভঙ্গি হয়তো একরকম হতে পারে। হয়। একরকম ছাঁচের মানুষ হয়। নৃতত্ত্বে এর নজির আছে। একরকম মুখ হলে হাসি একরকম হয়, কথা বলার ভঙ্গি একরকম হয়। হয়। হাতের জোরও অনেকের আছে। শুধু হাতে বাঘ মেরেছে এমন মানুষের কথাও শোনা যায়। পাগলা শেয়ালের চোয়াল ভাঙাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু দুজনের হাতে কি ঠিক একরকম ক্ষতচিহ্ন হয়? ঠিক একরকম?

কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? সচ্ছল অবস্থার সরকারী চাকুরের ছেলে—নিখুঁত ফ্যাশন-দোরস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসের ছাত্র; চোখেমুখে অফুরন্ত দীপ্তি, বিলাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ, ভবিষ্যতে যে বিলেত যাবে; বড় ডিগ্রী নিয়ে এসে এখানে বড় সরকারী চাকরি নেবে; মোটর চড়ে ঘুরবে; প্ল্যান তৈরী করবে, নোট লিখবে; সমস্ত মানুষকে অবজ্ঞা করে কথা বলবে; রাত্রে নাইট ক্লাবে যাবে—হৈ-চৈ করবে। এই ভেবে নিজেকে যে তৈরী করছিল, সে কিসের পরিণতিতে ওই ড্রাইভার হতে পারে! কিন্তু—কিন্তু—সেই কণ্ঠস্বর। সেই হাতের ক্ষত-চিহ্ন। সেই 'আই হেট' বলার ভঙ্গি, সেই ক্রোধ।···দাড়িগোঁফে মুখখানা ঢেকে গিয়েছে। মাথায় বড় বড় চুল। অযত্নে, মোবিলে, পেট্রোলে তামাটে হয়ে উঠেছে। তার ছিল সযত্ন ফ্যাশনে ছাঁটা, শ্যাম্পু করা রেশমের মত চুল। তার ছিল উগ্র গৌরবর্ণ। সে-রঙ কি এমনি পুড়ে যায়, না যেতে পারে? চোখের তারা তারও পিঙ্গলাভ ছিল—এরও পিঙ্গলাভ। কিন্তু ত কি এ সে হতে পারে?

প্রবীর! প্রবীর চ্যাটার্জি!

ওই রতন ড্রাইভারের মধ্যে প্রবীর চ্যাটার্জি!

কিন্তু সেদিন হারিয়ে যাওয়া আংটিটা আর আবর্জনাস্তূপের আংটিটা তার শত মালিন্য সত্ত্বেও এক হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এক। একটু মার্জনা করলেই তার সোনার ও হীরার দীপ্তি যেন আপন ঔজ্জ্বল্যে স্বপ্রকাশ হয়ে উঠবে।

মনে পড়েছে প্রবীরের ঠোঁট ঘৃণায় এইভাবে উল্টে গিয়েছিল। চোখের উপর ভাসছে তার সে ছবি। ওই ইউনিভারসিটিতেই। ১৩৪২ সাল।

চার

মনে পড়ছে।—

ঠিক ওই ছাত্র দুইটিকে নিয়ে ঘটনার কয়েকদিন পর। তার আরতি নামের সুবিধে নিয়ে 'রতি' বলে গূঢ় অর্থব্যঞ্জক রসিকতা করার যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর ঘোষ—সেই ঘটনাটার দিন দশেক পর। সেদিন ইউনিভারসিটিতে ঢুকতেই তার চোখে পড়েছিল লনের উপর আড্ডারত কয়েকটি ছেলের একটি দল যেন হঠাৎ একটা বাতাসের দমকায় ছাই-ওড়া অঙ্গারস্তূপের মত দীপ্যমান হয়ে উঠল, চোখে মুখে একটা ইশারা খেলে গেল। একবার মনে হল বাতাসের দমকাটা সঞ্চারিত হল তার আঁচলের দোলা থেকেই। কিন্তু সে তা গ্রাহ্য করে নি, ঢুকে গিয়েছিল যেন দিল্‌ডিয়ে। ও আগুনকে সে ভয় করে না পায়ের জুতোর তলায় চেপে নিভিয়ে দেবে। সমস্ত বাড়িটা যেন নিস্তব্ধ; সে খট খট করে উপরে উঠতে লাগল। আজ সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ছাত্রছাত্রীদের দল যেন অধিকাংশই আসে নি। পরক্ষণেই মনে পড়েছিল,—সিঙ্গাপুর পুড়ে গিয়েছে, জাপানীরা এগুচ্ছে রেঙ্গুনের দিকে; যুদ্ধের অবস্থা দিন-দিন বৈশাখের আগুনলাগা উলুবনের মত হয়ে উঠেছে; ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে আগুন জ্বলবে-জ্বলবে হয়ে উঠেছে। এখন ছাত্র-মহলে মিটিংয়ের পর মিটিং চলছে। নানা মতের প্রবল প্রচার চলছে। এরই মধ্যে চলেছে পূর্বরাগের পালা, বিয়েও কয়েকটা হয়ে গেছে। তা যাক। ওরা এই ছেলেগুলির মত নয়—যারা ছাই-ওড়া অঙ্গারের মত কালো স্বরূপ প্রকট করে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। এরা রাজনীতিবাদী কোন দলের নয় বলেই এইভাবে বাইরে বাইরে পচা পাতার মত উড়ে উড়ে বেড়ায়; ওদের সম্বল ওড়া-পাতার ফরফরানির মত ওই হাসি-রসিকতা। রাখালরাজাদের বাঁশি ছাড়া গতি নেই। হায় কপাল! বাঁশি শুনে ব্রজের গোপিনীরা ভুলেছিল বলে কি বিংশ-শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের তরুণীর দল ভুলবে? বাঁশি, তাও সেই আদ্যিকালের বাঁশের বাঁশি, কিন্তু ওই বাঁশি বাজাতেই জানে—তাছাড়া আর কিছু নয়; গোবর্ধন ধারণ দূরের কথা যে গোপিনীর হাতে থাকে বঁটি কি খন্তা তাদের দেখলে ছুটে পালায়। রাজনীতি যারা করে আরতি তাদের দলের নয়, কোনদিন সে যাবেও না, কিন্তু তবু তাদের সে প্রশংসা করে। হ্যাঁ একটা আদর্শ আছে তাদের, তাদের দলের মধ্যে তরুণ-তরুণীর মনের মিলন ঘটে হাত মিলিয়ে

কাজ করার মধ্যে।

সে প্রথম তলায় উঠেছে এমন সময় কেউ তাকে ডাকলে—

"শুনুন।" একটি মেয়ে; তারই সহপাঠিনী। চেনে সে। নাম বোধ হয় অনীতা।

"আমায় বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বলুন। কিন্তু আজ ব্যাপার কী বলুন তো?"

"ফাঁকা দেখে বলছেন?"

"হ্যাঁ। মিটিং বোধ হয়?"

"হ্যাঁ। বড় মিটিং আজকে। ইউনিভারসিটির বাইরে কোথাও হচ্ছে। ক্লাসটাস বোধ হয় হবে না। আমি আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।"

"আমার জন্যে?"

"হ্যাঁ। চলুন, বাড়ি ফেরবার পথে বলতে বলতে যাই।"

"না। আমি ভাই একটু লাইব্রেরিতে যাব।"

"না। আপনি থাকবেন না। চলুন। আপনাকে অপমান করবার জন্যে বোধ হয় একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে। সেদিন আপনি একজন ছেলের খাতা কেড়ে নিয়ে—"

"হ্যাঁ। আবার কেউ অসভ্যতা করলে আবারও নেব। এবং এবার গালে চড় মারব।" নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল,—"আপসোস হচ্ছে, শু পরে এসেছি, স্যাণ্ডেল পরে আসি নি। শু আবার নতুন—চট করে খোলা যায় না।"

মেয়েটি সভয়ে বলেছিল—

"না না, আপনি জানেন না। সে মারাত্মক বেপরোয়া ছেলে। রাস্টিকেট হওয়াকেও ভয় করে না। শুনেছি বি. এস-সি যখন পড়ত তখন গার্ল স্টুডেন্টদের জ্বালিয়ে খেত। মেয়েদের অ্যাড্রেস করে 'পাগলী' বলে। এক চড় মারলে দু চড় মারবে সে। একবার এক্সপেল্‌ড্ হয়েছিল—। আজ অন্য ছেলেমেয়ে মিটিংয়ে ব্যস্ত আছে জেনে—ওরা দল বেঁধেছে।"

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল তার। বলেছিল, "কোথায় আছে বলুন না। আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে বলি, হ্যালো পাগলা,—"

সঙ্গে সঙ্গেই মোটা গলায় নিচের তলার দিক থেকে কেউ হেঁকে বলেছিল—

"ইয়েস, ইয়েস, হিয়ার আই অ্যাম, পাগলী, হিয়ার আই অ্যাম!"

চমকে উঠেছিল দুজনেই। নিচের সিঁড়ির মুখে কখন এরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে একটি স্যুট-পরা ছেলে। ব্যাকব্রাশ-করা চুল, বড় বড় চোখ, বয়স বেশ একটু বেশী। দেখেই চেনা যায়, যে-ছেলেরা পাঠ্য-জীবনের ভেলা ধরে যৌবন-সমুদ্রের স্নানের ঘাটে দোল খায়, সুইমিং কস্ট্যুমের মত স্টুডেন্টস্ কস্ট্যুম পরে, এ তাদেরই একজন।

এতক্ষণ বোধ করি কোথাও লুকিয়েছিল নিচের তলায়; ওই ছেলেগুলোর কালো মুখের

ইশারা পেয়ে সিঁড়ির মুখে নায়কের মত প্রবেশ করেছে। ছেলেটা প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি উঠে, একমুখ ব্যঙ্গ হাসি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, "আমি এসেছি পাগলী! হিয়ার আই অ্যাম!"

কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরতি। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল—"কী চান আপনি?"

"আই ওয়াণ্ট টু অ্যাডোর য়ু। তোমার এই বেশভূষা, তোমার এই শ্যাম্পু-করা চুলের মধুর গন্ধ, পাউডারের হাল্কা সুরভি, আই অ্যাডোর পাগলী, আই অ্যাডোর। তোমার থুতনিতে হাত দিয়ে বলতে চাই আই অ্যাডোর য়ু।"

"আমি চিৎকার করব।"

"আই ডোণ্ট কেয়ার পাগলী। ওই উপরে দেখ আমার দল আছে; নিচে দেখে এসেছ গেটের সামনে—তোমার চিৎকারে কেউ আসতে আসতে তোমাকে প্রেম নিবেদন করে চলে যাব।"

"কাওয়ার্ড।"

"তা যদি বল তবে অবশ্যই থাকব। যিনিই আসুন, তাঁর সামনেই বলব, আই অ্যাডোর হার। রাস্টিকেট হওয়াকে আমি ভয় করি না। আমি এখানকার রেগুলার ছাত্রও নই।"

ঠিক এই সময় উপরতলার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠেছিল।

সকলেই তাকিয়েছিল উপরের দিকে। উপরতলার ছেলেরা সাড়া দিয়ে ইঙ্গিতে কিছু জানিয়েছিল। সে-ইঙ্গিতে এই অভদ্র দুঃসাহসী ছেলেটি একটু ভ্রূ কুঁচকেছিল। ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল, "কি? কে?"

রেলিংয়ে ঝুঁকে যারা ইশারা জানাচ্ছিল তারা কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু এ ছেলেটি গ্রাহ্যই করে নি। ঠিক তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভারী জুতোর শব্দ তুলে একজনকে নামতে দেখা গিয়েছিল। নেমে আসছিল 'ইউ টি সি'র পোশাক পরা একটি ছেলে। কটা-চোখ, রঙটা খুব ফরসা, দীর্ঘকায় তরুণ। আরতি চেনে না। ইউনিভারসিটিতে দেখে নি। তবুও সে চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল, 'শুনুন!' কিন্তু তার আগেই এই দুঃসাহসী ছেলেটি হেসে তাকে সম্ভাষণ করলে, "হ্যালো প্রবীর!"

সে পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিল—হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললে, "সুব্রত? তুমি?"

"ইয়েস ওল্ড চ্যাপ, ভাল আছ?"

"তা তো আছি। কিন্তু তুমি এখানে কি করছ? আবার পড়বে নাকি? ভর্তি হয়েছ? ওঃ দেখালে বটে!"

"পড়ছি না ঠিক। কলেজের আশেপাশে ঘুরছি। কিন্তু তুমি কোথায়? এ-রাজ্যে—শিবপুর থেকে—"

"স্যার-এর তলব ছিল 'ইউ টি সি'র কাজে। আচ্ছা গুড লাক।" বলে হেসে চলে যাবার উদ্যোগ করেও আরতির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণেই সবিস্ময়ে বললে, "আপনি রথীনবাবুর বোন না? রথীন সেন? শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে পাস করে

বিলেত গেছেন। আমরা রথীনবাবুর জুনিয়র। সে-সময় আপনি তো মধ্যে মধ্যে যেতেন হোস্টেলে। কেমন আছেন রথীনদা?"

"প্রবীর, তুমি যাও। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

প্রবীর এবার দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিল, "আই স্মেল সামথিং সুব্রত!"

মুহূর্তে আরতি বলেছিল, "ইনি আমাকে অপমান করছেন। আপনি—আপনি—", আর কথা বলতে পারে নি—চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল।

"লীভ হার, প্রবীর। ওঁর সঙ্গে ব্যাপারটা বলতে গেলে এখানকার ছেলেদের ব্যাপার।"

"এখানকার ছেলেদের ব্যাপার হলে—তারা কই? তুমি কেন? ছি ছি সুব্রত, এখনও তোমার এই নোংরামিগুলো গেল না!"

"শাট আপ।" চিৎকার করে উঠেছিল সুব্রত।

"চিৎকার করো না। আই ডোণ্ট লাইক ইট। আমার চিৎকার তোমার থেকে অনেক জোরে বের হয় তুমি জান। পথ ছাড়ো। চলুন আপনারা আমার সঙ্গে।"

"না। আবার বলছি প্রবীর, চলে যাও তুমি। আমরা পুরনো বন্ধু—"

"না। উই ওয়্যার নেভার ফ্রেণ্ডস। আই হেট ইউ অলওয়েজ। ভার্টি ভালগার কোথাকার।"

ঘৃণায় ঠোঁট দুটো ঠিক এমনিভাবে উল্টে গিয়েছিল।

"হোয়াট?" সঙ্গে সঙ্গে সে মেরেছিল একটা ঘুষি। অতর্কিতে মারবার জন্যই মেরেছিল। কিন্তু প্রবীর যেন প্রস্তুত ছিল। খপ করে হাতখানা ধরেই একটু মোচড় দিয়ে কায়দা করে ফেলেছিল তাকে এবং হেসে বলেছিল, "আমি তোমার পুরনো ট্রিক্স্ জানি সুব্রত। আমি তৈরী ছিলাম।"

"ছাড়ো। হাত ছাড়ো।"

"জোর করো না। আমার হাতের জোর বেশ একটু বেশী। ছেলেবেলা পনের-ষোল বছর বয়সে একটা পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল আমাকে। পায়ে কামড়াচ্ছিল, আমি হাত দিয়ে তার চোয়ালটা ধরে ভেঙে দিয়েছিলাম। নখ দিয়ে হাতটা আঁচড়ে দিয়েছিল দাগ দেখতে পাচ্ছ তার! দেখেছ!"

"প্রবীর?" এবার সুব্রতের চিৎকারের মধ্যে যন্ত্রণার আভাস ছিল।

"আরও একটু যন্ত্রণা দেব সুব্রত। যাতে তোমার সামলাতে কিছুক্ষণ লাগে।" হাতটায় আরও খানিকটা মোচড় দিতেই একটা আর্তনাদ করে সুব্রত বসে পড়েছিল। এবার তার হাত ছেড়ে দিয়ে, সে আরতি এবং তার সঙ্গিনীকে বলেছিল, "আসুন, আর দাঁড়াবেন না। শুনছেন?"

আরতি এবং তার সঙ্গিনী নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রবীরের কথা শুনে দ্রুতপদে নামতে আরম্ভ করেছিল, সে প্রায় যেন ছুটে পালাচ্ছিল তারা।

"ছুটবেন না। ছুটতে হবে না।"

"ওপর থেকে ওর সঙ্গীরা নামছে।"

"নামুক। যারা নোংরামি করে, তাদের নিরেনব্বুই জন কাওয়ার্ড। একজন সুব্রতের মত ডেভিল থাকে। ওদের সাহস থাকলে ওরা বাইরে থেকে সুব্রতকে ডাকত না। আপনার সঙ্গে কি হয়েছে জানি না। যা-ই হয়ে থাক, নিজেরাই বোঝাপড়া করত। এবং যেদিন এখানকার সব ছেলেই প্রায় দেশের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে অনুপস্থিত, সেই দিনটিতেই করত না।"

বলতে বলতেই তারা বেরিয়ে এসে কলেজ স্ট্রীটের গেটের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। গেটের দলটি তখন ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছিল, শুধু একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলেছিল, "এর বোঝাপড়া বাকী রইল প্রবীরবাবু, কিন্তু হবে একদিন।"

ক্ষতচিহ্নে চিত্রিত হাতখানা প্রসারিত করে প্রবীর বলেছিল, "কলো ইওর ফ্রেণ্ডস। ওই যাচ্ছে। এগিয়ে এসো না।"

"আচ্ছা—"

বাধা দিয়ে প্রবীর বলেছিল, "আই হেট টু স্পীক টু ইউ।" ঘৃণায় প্রবীরের ঠোঁট দুটো উল্টে গিয়েছিল।

সেই প্রবীর, আর এই মোটর-ড্রাইভার অথবা মিস্ত্রী রতন! কী করে মেলে? কিন্তু আশ্চর্য মিল! আশ্চর্য! সেই কণ্ঠস্বর। সেই 'আই হেট' বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটি ঠিক তেমনি করে উল্টে যাওয়া। হাতে সেই ক্ষতচিহ্ন। আশ্চর্য মিল। সেই ক্ষতচিহ্নটা সে নিজে ভাল করে দেখেছিল যে। খুব ভাল করে। সেদিন ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে প্রবীর তাকে একা ছেড়ে দেয় নি। ট্রামেই হোক, আর বাসেই হোক, সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, "এমন কি ট্যাক্সিতেও আপনার আজ একলা যাওয়া উচিত নয়। সুব্রত আসলে কুব্রত। সব সমাজেই কতকগুলো কলঙ্কের মত জীব থাকে। ও ছাত্রসমাজের কলঙ্ক। ওকে জানেন না। ট্যাক্সিতেও আপনার পিছন নিতে পারে।"

আরতির সঙ্গিনীকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিল। আরতির বাড়ি কপালিটোলা শুনে বলেছিল, "তবে তো এই কাছেই। চলুন, হাঁটতে হাঁটতেই চলি।"

আরতির সঙ্গিনী ছিল শ্যামবাজারবাসিনী। মির্জাপুর স্ট্রীট এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মোড়ে সে বিদায় নিয়ে বাসে চড়েছিল। বলেছিল, "এক-বাস লোক রয়েছে—আর ওদের কাউকেও দেখছি না। আমি সেফ্‌লি চলে যাব। আপনি আরতিকে পৌঁছে দিন।"

পথে মাত্র দুটি কথা হয়েছিল। প্রবীর বলেছিল, "আপনাদের তো গাড়ি আছে?"

"না। বিক্রি করে দিয়েছেন বাবা।"

"ও। গভর্নমেণ্ট যুদ্ধের জন্য গাড়ি নিয়ে নিচ্ছে এখন। হ্যাঁ, তার চেয়ে বিক্রি ভাল।"

"না। আমাদের ব্যবসায় অনেক লোকসান হয়েছে। আমাদের প্রায় সব গেছে।"

এর পর আর কথা হয় নি।

বাড়িতে চা খেতে অনুরোধ করেছিল একটু। সেই চা খাবার সময় কৌতূহল-ভরে তার আস্তিন-গুটোনো হাতখানার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "ছেলেবয়সে খ্যাপা শেয়ালের চোয়াল

চেপে ধরতে ভয় করে নি আপনার ?"

"বরাবরই ভয় আমার একটু কম। আমরা তখন জলপাইগুড়িতে থাকি। সেই সময় আমাদের একজন গুর্খা ড্রাইভার ছিল। সেই আমার সাহসের গুরু। যাকে বলে—ডেয়ার-ডেভিল! ছোট হাত-দেড়েক লাঠি নিয়ে বড় বড় সাপ মারত। কুক্‌রি দিয়ে একটা নেকড়ে দুটো ভালুক মেরেছিল! আর গল্প বলত। তাকে জিজ্ঞাসা করতাম—'ভয় করে না?' সে শুধু হাসত। সে যেন পরম কৌতুক। হাসির আতিশয্যে বেচারার চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে যেত। হেসেটেসে নিয়ে বলত একটি কথা—'ডর! না। ডর কাহে লাগা! উ জানবর, হম আদমী। মর্দানা। উসকে তাগদ হ্যায়, দাঁত হ্যায়, নখ হ্যায়, পঞ্জা হ্যায়। হমরা ভি সব আছে। কুক্‌রি আছে। লাঠি আছে।' গল্প বলত, ছেলেবেলায় একবার বনের মধ্যে একটা বড় গর্ত দেখে কৌতূহলবশে হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে ঢুকেছিল। খানিকটা ঢুকেই দেখে একজোড়া চোখ জলজল করছে। অবস্থা বুঝুন। সামনাসামনি। তার বেরুবার পথ—সামনের দিকে অর্থাৎ এর দিকে। এর মুখ তার দিকে। এর পিছন ফেরবারও উপায় নেই, কারণ গর্তের মুখটা তত পরিসর নয়। পিছন ফিরলে আরও বিপদ; সে কামড়াতে আসছে কিনা দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন কি করে? সেই চোখ-বুজে-যাওয়া হাসি হেসে বলত, 'কী করেগা? উসকো সামনে খুব খ্যা-খ্যা-খ্যা'—চিল্লায় দিয়া; বহুত জোর সে। ব্যাস, উ বুড়বক বন গেয়া। উসকে বাদ থোড়া থোড়া পিছে হটনে লাগা। এক একবার থম্ কর—ফিন—খ্যা-খ্যা আওয়াজ দিয়া। ফিন থোড়া হট গিয়া। ব্যস, একদম বাহারমে আ কর গাড়াকে মুসে—একতরফ যা কর্ খাড়া হো গিয়া।' মানে দরজা থেকে বেরিয়ে চট্ করে একপাশে সরে দাঁড়াল আর কি। 'আওর গাড়াসে এক ছোটাসা ভাল্লু নিকালকে একদম ঘোড়াকা মাফিক দৌড়কে বনমে ঘুস গিয়া! যো ডর দেখায়েগা, উসকে আপ ডর দেখাইয়ে না। বস্ যায় গা।' তা ছাড়া বাবার আমার শিকারে শখ ছিল। কাজেই—"

হেসেছিল একটু প্রবীর।

ততক্ষণ আরতি তার সবল হাতখানার দিকেই তাকিয়ে ছিল। এবার হাতখানা ধরে কাছে নিয়ে দেখে বলেছিল, "ওঃ—আপনাকেও জখম করেছিল খুব।"

"হ্যাঁ। আমাকে একবার কামড়ে পালিয়ে গেলে পারতাম না কিছু করতে। কিন্তু বার বার কামড়াতে লাগল। আমারও খুন চেপে গেল। ডান হাটুটায় কামড়াচ্ছিল—সেই হাঁটু দিয়েই সেটাকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরে দুই হাতে মুখের দুটো ভাগ চেপে ধরে জরাসন্ধ বধের মত টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম। যন্ত্রণায় সামনের পা দুটো দিয়ে সেও হাতের উপর থাবা চালাতে চেষ্টা করলে। একটা পা আমার বাঁ পায়ে চাপা পড়েছিল, একটা পায়ের থাবা অন্তিম যন্ত্রণাতে সে আমার এই হাতটার উপর চালিয়েছিল। হাঁটুতেও একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। তবে ট্রপিক্যালে ইনজেকশনের যন্ত্রণার শোধ নেওয়াটা হয় নি।"

প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

ঠিক এই সময়টিতেই তার বাবা বাড়ি ফিরেছিলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত ভেঙে-পড়া মানুষ। কয়েকটা মাসের মধ্যে মানুষটি কী যে হয়ে গিয়েছিলেন। আগেকার কালের সেই দৃঢ়তা

ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। যে মানুষের দৃপ্ত কথায়-বার্তায় মতবিরোধীরা স্তব্ধ হয়ে যেত, সেই মানুষের বুলি হয়েছিল, 'জানি না—ঠিক বুঝতে পারছি না।' যাঁর প্রাণখোলা হাসিতে আশপাশের বাড়ির লোকেরা চমকে উঠত, যাঁর ভয়ে তাদের পোষা চন্দনাটা একটা কর্কশ ক্যা—চ শব্দ করে উঠত, সেই মানুষের হাসি ক্লান্ত মুখের বিবর্ণ ঠোঁট দুটির একটি বিষণ্ণতা-মাখানো রেখার টানে পরিণত হয়েছিল। আরতিকে কলেজের সময়ে বাড়িতে একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কলেজের বয়-ফ্রেণ্ড সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত বিরূপতা ছিল। বলতেন, "জাতিধর্ম আমি মানি না, মানব না। কিন্তু বংশ মানি। ফ্যামিলির পরিচয়টা আমার কাছে সব চেয়ে বড়। আই ডোণ্ট লাইক—আমার এটা আদৌ পছন্দ নয় যে, আমার মেয়ে কলেজে গিয়ে অজ্ঞাত-কুলশীল সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, এবং পরিশেষে এসে বলবে, 'বাবা—আমি একে ভালবেসেছি, ওকেই বিয়ে করতে চাই'।"

তিনি যখন কথা বলতেন, তখন যে-ই থাক ঘরে, স্তব্ধ হয়ে যেত তাঁর আন্তরিকতার দৃঢ়তায়, তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বেও বটে। তিনি খানিকটা পায়চারি করে, আবার বলতেন, "আমার মেয়ে যদি তা করে, তবে কামনা করব, তার আগে আমার যেন মৃত্যু ঘটে।"

তার বাবার সেদিনের সেই মুখচ্ছবি আজও তার চোখের উপর ভাসছে। তাঁর মুখের চেহারা মুহূর্তে যেন শবের মুখের মত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছিল। নিঃশব্দেই তিনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আরতিই ডেকেছিল, "বাবা!"

তিনি উত্তর দেন নি, শুধু দাঁড়িয়েছিলেন।

"ইনি আজ আমাকে বড় অপমান থেকে বাঁচিয়েছেন বাবা।"

"অপমান থেকে?" এবার অমৃত সেন ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, "কী হয়েছিল?"

"একটা বখে-যাওয়া ছেলের দল—সবের মধ্যেই ভাল-মন্দ আছে তো, ছাত্রদের মধ্যেও আছে—তারাই কজনে—তাদের সঙ্গে আগে বোধ হয় মিস্ সেনের কিছুটা ঝগড়া বা মতান্তর হয়েছিল, সেই আক্রোশে তারা বাইরে থেকে একটা অত্যন্ত বখে-যাওয়া ছেলেকে ডেকে এনেছিল—."

"আপনি? আপনি কে? আপনার তো মিলিটারি পোশাক দেখছি।"

"'ইউ টি সি'র পোশাক এটা। আমি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলাম আমাদের কোরের কর্তার ডাকে।"

এবার আরতি বলেছিল, "উনি দাদাকে চেনেন বাবা। আমাকে দেখেই বললেন, আপনি তো রথীনবাবু—মানে রথীন সেনের বোন! আপনাকে অনেকবার দেখেছি আমাদের হোস্টেলে—দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।"

এবারে প্রসন্ন হয়েছিলেন তার বাবা। একখানা চেয়ারে বসে বলেছিলেন, "আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ, ইয়ং ম্যান। আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"প্রবীর চ্যাটার্জী।"

"বাড়ি?"

"বাড়ি ছিল এককালে বর্ধমান জেলায়। কিন্তু সেসব আর নেই। ঠাকুরদা চাকরি করতেন,* তারপরে বাবা চাকরি করেছেন। তাঁরই সঙ্গে প্রথম জীবনটা জেলায় জেলায় ঘুরেছি, তার পর দিল্লীতে—"

"দিল্লীতে? কী চাকরি?"

"সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টে ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন। বছরখানেক হল মারা গিয়েছেন।"

"মা আছেন নিশ্চয়ই?"

"না। মা মারা গিয়েছেন অনেকদিন হল। দাদা আছেন। তিনিও দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন।"

"আই সী—", একটু চুপ করে থেকে হেসে বলেছিলেন, "আমার থিয়োরি সত্য হয়েছে। আমার একটা থিয়োরি আছে। মা-বাপ উচ্চশিক্ষিত—উচ্চশিক্ষা বলতে আমি ইংরেজী শিক্ষা এবং সহবত বুঝি—না হলে ছেলে কখনও ভাল হয় না। একসেপশন অবশ্য আছে। কিন্তু—"

তারপর অনেক কথা হয়েছিল।

তার মধ্যেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কী করবে? মানে স্বাধীনভাবে ব্যবসা—না—চাকরি?"

হেসে প্রবীর বলেছিল, "আমার ভারি ইচ্ছে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ট্রেনিং নিয়ে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে ঢুকি। দেয়ার ইজ লাইফ—"

"ইয়েস, দেয়ার ইজ লাইফ।"

"এখন যুদ্ধের মধ্যে ঢোকারও সুবিধে আছে।"

"নিশ্চয়। ভেরি গুড আইডিয়া। ভেরি গুড। আমি খুব খুশী হলাম যে, দাজ পোলিটিক্যাল ইজ্‌ম্‌স্‌ তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে নি।"

"আই হেট পলিটিক্‌স্‌।"

আবার তার ঠোঁট উল্‌টে গিয়েছিল।

"মিলিটারি লাইফ তোমার স্যুট করবে? পছন্দ কর তুমি?"

"ভী-ষ-ণ। সেণ্টিমেণ্ট-ফেণ্টিমেণ্ট আমি বরদাস্ত করতে পারি নে। আমার কাছে মিলিটারি লাইফ আইডিয়াল লাইফ। সারাটা দিন কাজ করলাম, সন্ধ্যায় একটু ক্লাবে গেলাম, তারপর সারারাত্রি সাউণ্ড স্লীপ। যুদ্ধের সময় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাজ করব, বুলেট ছুটবে, শেল ফাটবে, এয়ার-রেড হবে, এর চেয়ে থ্রিল আর কিছু আছে? বুলডোজার চালিয়ে এক-একদিনে রাস্তা তৈরী করব, এক সপ্তাহে নদীর উপর ব্রিজ তৈরী করব, পাহাড় কাটব। আই লাইক ইট ভেরি মাচ।"

"ভেরি গুড। ভেরি গুড। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, কল্যাণ হোক তোমার। এবং আমি বলতে পারি, তোমার উন্নতি হবেই।"

এর পরই প্রবীর উঠেছিল। "আই অ্যাম লেট। আমি আজ যাই।"

"আবার এসো সময় পেলে। রথীনকে জানতে তুমি—"

"দাদা বলতাম তাঁকে। আমাদের সিনিয়র তো।"

"তা হলে তুমিও আমার ছেলের মত। তার উপর তুমি আরতিকে আজ—"

"ও সামান্য ব্যাপার। ইউনিভারসিটির অন্য ছেলেরা থাকলে এটা কখনও ঘটতে পেত না। তারা পলিটিক্স্ নিয়ে মেতে মিটিং করছে, তাদের সেই অ্যাবসেন্সের সুযোগে—"

"ওঃ, দীজ পলিটিক্স্!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তার বাবা। তারপর বলেছিলেন, "তবুও আমার কৃতজ্ঞতার কারণ আছে। ছেলে জলে পড়ে গেলে যে-কোন বয়স্ক লোক তুলতে পারে। সেটা ঠিক কথা। কিন্তু যে তোলে, মা-বাবার কৃতজ্ঞতা তারই কাছে।"

হেসেছিলেন অমৃতবাবু। "যাও আরতি, প্রবীরকে এগিয়ে দিয়ে এসো।"

দরজার গোড়ায় আরতি অনুরোধ জানিয়েছিল, "আবার আসবেন কিন্তু।"

"আসব সময় পেলে। কিন্তু—"

"কিন্তু কিছু নেই এর মধ্যে।"

"আসবার কথায় কিন্তু নয়। আপনার কথায়। আপনি এর পর ইউনিভারসিটিতে একটু সাবধান হবেন।"

"আপনি ইউনিভারসিটিতে পড়লে ভাল হত।" হেসে বলেছিল আরতি।

সে-ও হেসেছিল। তারপর নমস্কার করে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধের পোশাক-পরা প্রবীর দীর্ঘ পদক্ষেপে গলির মুখে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে আসতেই তার বাবা বলেছিলেন, "আইডিয়্যাল ছেলে, এমনি ছেলেই আজ চাই।"

একমুহূর্ত পরে মধ্যে মধ্যে থেমে বলেছিলেন, "কাল থেকে তুমি আর ইউনিভারসিটিতে যাবে না। আমার ইচ্ছে—তুমি বি. টি ক্লাসে ভর্তি হও। তারপর প্রাইভেটে এম. এ. দিও। আমি আজ সর্বস্বান্ত। এই বাড়িখানা ছাড়া যা ছিল, সব শেষ আজ। তোমাকে চাকরি করেই খেতে হবে। কারণ রথীনের খরচের জন্য এ বাড়িও হয়তো—।...এমনি ছেলে পেলে—।...কিন্তু তোমার বিয়েই আমি দিতে পারব না। কী দেব তোমার বিয়েতে?...না, শুধু হাতেতে পারব না। কিন্তু আশ্চর্য ছেলে—ব্রিলিয়াণ্ট বয়! রথীনের চেয়েও ব্রিলিয়াণ্ট!"

এই ড্রাইভারের হাতে শেয়ালের কামড়ের দাগ; ঠোঁট দুটিও ঘৃণায় ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে উল্টে যায়। কিন্তু তবু এই ড্রাইভার সেই প্রবীর চ্যাটার্জি! তাই কি হয়?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব কথা মনের মধ্যে ভেসে গেল। তার স্তম্ভিত মগ্ন মন ওই প্রশ্নের সামনে অন্ধকার রাত্রে আপন ঘরের সন্ধানে কোন এক অজ্ঞাত ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আকুল আকৃতিতে করাঘাত ক'রে দাঁড়িয়ে গেল।

ততক্ষণে রতন ড্রাইভার আরতিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রচুর গ্যাস ছেড়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচণ্ড বেগে গাড়িখানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তখনও তার ছোট মামাতো ভাই লাটু চিৎকার করছে, উপরের বারান্দায় তার মামা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করছেন, "কী হয়েছে? কী?

লাটু এত চিৎকার করছে কেন ?" তার পরেই আরতিকে দেখে বলে উঠেছিলেন, "আরতি ! তুই বেঁচে আছিস ? ভাল আছিস ? বউমা। বড় বউমা !"

বড় বউ অর্থাৎ বড় মামাতো ভাইয়ের স্ত্রী বেরিয়ে এসেছিল, "বাবা !"

"আরতি। আরতি এসেছে।"

সুধা বউদি ছুটে নেমে এসেছিল। এই বউদিটির সঙ্গে আরতির আর একটি সম্পর্ক ছিল। সে তার পিতৃবন্ধুর কন্যা। তার বড় মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন তার বাবা। তা ছাড়াও মেয়েটি তেজস্বিনী। স্বামীর সমস্ত অনাচারকে উপেক্ষা করে, সকল দুঃখ বুকে চেপে এই বাড়ির মর্যাদা সে ধরে রেখেছে। বৃদ্ধ শ্বশুরের সে মায়ের অধিক। এ সংসারের সকল কর্তব্য, সকল ন্যায়, এই একটিমাত্র মেয়েকে আশ্রয় করে আজও বেঁচে আছে।

আরতিকে সে-ই সাগ্রহে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—"আয়। আয়।"

তার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল, "আরতি ? কী হয়েছে রে ? তোর মুখের চেহারা এমন কেন ? আজ ক'দিন কী ভাবনাই ভেবেছি—যত বাবা ভেবেছেন, তত আমি ! কেঁদেছি। ওই কপালিটোলায় বাড়ি—। আর এই দাদা—এদের দুই ভাইকে ব'লে ব'লে কাল থানা থেকে খোঁজ করিয়েছিলাম। শুনলাম, বাড়িটা লুঠ হয়েছে নিঃসন্দেহে। এখন আর কেউ নেই। আমি ভেবেছিলাম, তুই বেঁচে নেই। এদিকে গুজবের তো শেষ নেই। কেউ বলে, গাড়ি গাড়ি লাস গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। কেউ বলে, গাড়ি গাড়ি মেয়েছেলে কোথায় নিয়ে চলে গেছে। ভাই দুটো কালাপাহাড়। বাবা কেঁদেছেন আর আমি কেঁদেছি। কি ক'রে বাঁচলি তুই ?"

আরতি এতক্ষণে বলেছিল, "সে আর জিজ্ঞাসা করো না বউদি। সে যে তিন রাত্রি দুদিন কীভাবে গেছে। মরে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য ছিল না। বাঁচাই আশ্চর্য। সে এখন বলতে পারব না, শুধিও না। যাঁরা দিয়ে গেলেন, তাঁরাই কাল উদ্ধার করেছিলেন। আমি একটু শোব বউদি।"

ঘরটা খুলে দিয়ে তাকে শুইয়ে বউদি বলেছিলেন, "ঘুমো। কিছু খাবি নে ?"

"না।"

"বেশ ; ঘুম ভাঙলে ডাকিস। কিন্তু—"

"বলো।"

"সন্ধ্যে তো হয়ে এল। গা-টা ধোয়া হয় নি। ধুয়ে নে। শরীরটা অনেক সুস্থ হবে। চান করবি ? যা চেহারা হয়ে আছে !"

"হ্যাঁ বউদি, সেটা ভাল বলেছ।"

"আমার বাথরুমে আয়। বালতিতে গঙ্গাজল আছে। দু ঘটি মাথায় ঢালিস।"

অর্থটা আরতি বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল সারাটা মন। বলেছিল, "না বউদি। তার দরকার হবে না। আমি বুঝেছি, যা বলছ।"

বউদি বলেছিল, "বাঁচলাম ভাই। তবে সাবান মেখে ভাল করে চান কর। কাপড়-চোপড় কী নিবি—নে। বাথরুমের পাশের ঘরটাতেই আলমারিতে আছে।"

বাথরুমে ঢুকে মনে পড়েছিল প্রবীরেরই একটা কথা।

"...কলকাতার এত নর্দমার জল গঙ্গায় পড়েও গঙ্গার জল অপবিত্র হয় না যখন শুল্লি, এবং সেই গঙ্গায় চান করে পবিত্র হওয়ার ধুম দেখি, তখনই বুঝতে পারি, গঙ্গায় এত ইলিশের ঝাঁক কী করে আসে! এরা মরে সব গঙ্গার ইলিশ হয়!"

তার পরই বলেছিল, "এই কারণেই রামভক্ত গান্ধী এদের নেতা; আই-সি-এস সুভাষচন্দ্র নিত্যি কালীপুজো করেন।"

বাথরুম থেকেই সে ভাবতে শুরু করেছিল। স্নান সেরে ঘরে শুয়েও তাই ভাবছে। এক জনকে ভাবতে গেলেই অপরজনকে মনে পড়ছে। কিন্তু এ কি সত্যি হতে পারে? ওই ড্রাইভারটি কি—?

পাঁচ

সমস্ত রাত্রি আরতি ঘুমোয় নি। তার মনের মধ্যে ওই অসম্ভব রকমের দুটি অসম-পর্যায়ের মানুষের বিচিত্র সাদৃশ্যের কথাই শুধু ওকে আলোড়িত ক'রে তুললে। ঘুম এল না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত দাঙ্গার কোলাহল শোনা যাচ্ছে। গভর্নমেণ্ট সৈন্যদের হাতে কলকাতা শহর তুলে দিয়েছে। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারফ্যু জারী হয়েছে। তবুও দূরে থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সমবেত কণ্ঠে দাঙ্গার স্লোগান উঠছে—'বন্দে মাতরম্।' 'জয় হিন্দ্।' 'আল্লাহো আকবর।' 'নারায়ে তকদীর।' মধ্যে মধ্যে রাইফেলের গুলি ছুটছে। মিলিটারি লরী ও ভ্যান প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছে। এ অঞ্চলটা হিন্দুর পক্ষে নিরাপদ। কিন্তু উত্তেজনায় সমান অধীর। কখনও বা ছাদ থেকে ছাদে কথা চলছে। "ও আগুনটা কোথায় জ্বলছে বলুন তো? ওই যে ওই কোণে?"

এরই মধ্যে বিনিদ্র চোখে ভাবছিল প্রবীরের কথা।

তিন বৎসর প্রবীর নিরুদ্দেশ। ইস্টার্ন ফ্রণ্টে চলে যাওয়ার পর খান-দুই পত্র পেয়েছিল। তারপর আর কোন সংবাদ পায় নি। কত রাত্রি সে বসে বসে প্রবীরের কথা ভেবেছে। কতদিন তার মৃত্যু হয়েছে মনে হতেই কেঁদেছে। ইউনিভারসিটির ওই ঘটনা-সূত্রে যে আলাপ—সে দাদার সম্পর্ক ধরে গড়া হয়েছিল। প্রথম দিন প্রবীর চলে গেলে মনে একটু মিষ্টি হাওয়া বয়েছিল। সেদিন বাকী দিন ও রাতের সব সময়টাই মন যেন প্রসন্ন লঘু হয়ে থেকেছিল। পরের দিন সে ইউনিভারসিটিতে যায় নি। সেদিন সকালেই কাগজে খবর বেরিয়েছিল যে নাৎসীরা লণ্ডনে সারা রাত্রি ধ'রে প্রায় বিমান-আক্রমণ চালিয়েছে। বাবা অধীর হয়ে উঠেছিলেন। রথীন, রথীন, রথীন! যে বাবা কখনও কোষ্ঠী বিশ্বাস—সুসময়-দুঃসময় বিশ্বাস করেন নি—তিনিও সেদিন বলেছিলেন—দুঃসময়। এত বড় দুঃসময় আমার জীবনে আসে নি। ব্যবসা গেছে, বাড়ি দুখানা গেছে। শেষে যদি রথীনও—। কথা শেষ করতে

পারেননি, দুহাতে মুখ ঢেকে হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলেছিলেন। দুপুরের পর বলেছিলেন, "আমি বেরুচ্ছি আরতি। ফিরতে সন্ধ্যে হতে পারে।"

আরতি প্রশ্ন করেছিল, "কোথায় যাচ্ছ বাবা ?"

"টাকার যোগাড়ে মা। টাকা যোগাড় করে আমি রথীনকে পাঠাতে চাই। সে ফিরে আসুক। না-হলে—"

বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। না গিয়ে উপায় ছিল না। বাড়ির টেলিফোনটা তখন গিয়েছে। যুদ্ধের জন্য গভর্নমেণ্ট নিয়ে নিয়েছে। ইংরেজ জাতটা তখন যায়-যায়। ওদিকে ইংলণ্ড নাৎসী বিমানের ব্লিৎস্‌ক্রীগে, এদিকে জাপানীরা মালয় উপদ্বীপ ধরে দ্রুততম গতিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সিঙ্গাপুর ভেঙে পড়েছে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার মত। ইংরেজ সৈন্য পালাচ্ছে; সৈন্যবিভাগ থেকে বলছে সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ। এমন সুশৃঙ্খল যে মার্চ ক'রে ক'রে সৈন্যরা প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। যুদ্ধবিভাগ থেকে বলা হয়েছে, 'আমাদের সৈন্যরা এমনই ক্লান্ত যে খেতে বসে তারা ঘুমিয়ে পড়ছে।' রেঙ্গুন এবং বার্মার অন্যান্য স্থান থেকে এদেশের প্রবাসীরা পিঁপড়ের মত সারি বেঁধে দুর্গম পার্বত্য পথে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কলকাতায় একটা আতঙ্ক এসেছে শীতকালে শীতপ্রবাহের মত। দিনে দিনে সেটা ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে—রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে শীতপ্রবাহের ঘন থেকে ঘনতর হওয়ার মত। কলকাতার লোক কলকাতা ছেড়ে পালাবার আয়োজন করছে। ওদিকে কংগ্রেস ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ভূমিকা তৈরী করছে। কলকাতা ইংরেজ অ্যামেরিকান নিগ্রো আফ্রিকান সৈন্যে ভরে গেছে। জীবন হয়েছে অস্থির—পদ্মপত্রের জলের মত। অন্যদিকে একদল মানুষ যুদ্ধের সুযোগে কালো বাজারে লাখে লাখে টাকা উপার্জন করছে। তার মামাতো ভাইরা এর সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তার বাবা হলেন সর্বস্বান্ত। তিনি কিছুতেই ওদের কাছে যাবেন না।

আরতি একা বাড়িতে বসে ভাবছিল বাবার কথা। অসুস্থ শরীরে ভগ্ন মন নিয়ে তিনি বেরিয়েছেন। তার কোন সাধ্য নেই যে সে সাহায্য করে। যেটুকু ছিল তা সে করেছে; তার গায়ের গয়না সব খুলে দিয়েছে। বাবাকেও তা নিতে হয়েছে। চোখের জল ফেলেই তা তিনি নিয়েছেন।

ঠিক এই সময়ে বাড়ির দরজায় ইলেকট্রিক বেল টিপেছিল কেউ। উপরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিচের দিকে ঝুঁকে দেখে সে প্রথমটায় চিনতে পারে নি। কারণ ছিল। সেদিন আর প্রবীর 'ইউ টি সি'র পোশাকে আসে নি। সেদিন তার পরনে ছিল চমৎকার হাল্কা গ্রে রংয়ের স্যুট।

তাতে তার চেহারাটাই অন্যরকম দেখাচ্ছিল। প্রথমটায় সে চিনতেই পারে নি। ছিপছিপে লম্বা, টক্‌টকে রঙ, অবিন্যস্ত ভঙ্গিতে সুচারু বিন্যাসে বিন্যস্ত শ্যাম্পু করা চুল; টাইটা ছিল নীল। তার পাশেই ছিল গাঢ় রাঙা রঙের একটি আধফোটা গোলাপ। উঁকি মেরে দেখে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে বসেছিল, "কাকে চাই ?" ইংরেজীতে প্রশ্ন করেছিল। দেশী ক্রীশ্চান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়াটায় এমন মধ্যে মধ্যে ঘটে। বিশেষ করে বাড়িটা মডার্ন

এবং ফ্যাশনেবল বলে একটু সম্ভ্রান্ত ফিরিঙ্গী হলেই নম্বর না দেখে এ বাড়ির কলিং বেল টিপে বসে। সে হিসেবে প্রথমেই তাকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনে করে নিয়েছিল। প্রবীরের পিঙ্গল চোখ দুটি ঝিকমিক করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু কোন রসিকতা না করে সম্ভ্রমভরেই বলেছিল, "আপনাকেই।" বলেছিল বাংলাতে।

এক মুহূর্ত। তার পরই চিনতে পেরেছিল সে, "আপনি! ওমা!" তার পরই ছুটে নেমে এসেছিল। দোর খুলে দিয়ে বার বার মাফ চেয়েছিল সে। "আসুন—আসুন।" বলে আহ্বান জানিয়েছিল।

বাড়ির মধ্যে ড্রয়িং রুমে বসে প্রবীর সহাস্যে বলেছিল, "আজও ইউনিভারসিটিতে এসেছিলাম। তা সুব্রতদের দেখা পেলাম না। ভেবেছিলাম বোঝাপড়া হবে। তা হল না। ফিরবার পথে ভাবলাম আপনাকে বলে যাই কথাটা।"

আরতি বলেছিল, "আপনি আজ আবার সুব্রতদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিলেন? কিছু মনে করবেন না—আপনি তো খুব ঝগড়াটে লোক!"

প্রবীর বলেছিল, "হ্যাঁ, ও সুনাম আমার আছে। তবে এইটুকু বিশ্বাস করুন, ঝগড়া যা করি—সে অন্যায় সমর্থনের জন্য করি না। অবশ্য নিজের বিচার আছে। আর আপনার ক্ষেত্র তো আলাদা। এক্ষেত্রে ঝগড়া না করলে নিজেকে মানুষই বলার অধিকার থাকত না আমার। আপনি শুধু তো একটি মেয়েই নন—আপনি রথীনদার বোন।"

আরতি বলেছিল, "তা মানলাম। কিন্তু কালকের কথা বলছি নে। আজ যে সেজেগুজে ঝগড়া করতে এসেছিলেন—সেই জন্যে বলছি। এ তো যেচে ঝগড়া করতে আসা।"

"হ্যাঁ। তা বলতে পারেন। এ দিকে আমাকে মধ্যযুগীয় বা পুরাণ-যুগীয় বলতে পারেন। আমি যুদ্ধে নামলে কতকগুলো সে যুগের নীতি মেনে চলি। আমি খেলতে পারি, ফুটবল ভাল খেলি, কিন্তু ফাউল ক'রে খেলি নে। তবে ফাউল ক'রে মারলে আমি তার শোধ নেবই। অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করলে ক্ষমা করি। তারপর কেউ মুখ-খারাপ ক'রে গাল দিলে আমি মুখ খারাপ করি নে, তার মুখে থাবড়া মারি। অতঃপর যত দূর সে চলে আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে যাই। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে—সে চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করি এবং যথাসময়ে যথাস্থানে যুদ্ধ দেবার জন্য উপস্থিত হই। কাল গেটের কাছে ওদের দল আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সুতরাং আমি এসেছিলাম। ওরা কেউ আসে নি বা ওদের দেখা যায় নি। আমি অবশ্য টেলিফোন করে স্টুডেন্টস কংগ্রেস স্টুডেন্টস ফেডারেশনের পাণ্ডাদের ব্যাপারটা জানিয়ে ছি-ছিকার করেছিলাম। বলেছিলাম তোমাদের দেশোদ্ধারের চরণে প্রণাম—তোমাদের এলাকায় এই ঘটে! যদি বল—তোমরা কেউ ছিলে না কাল—তবে বলব সাদা কম্বলের মধ্যে কালো পশম যে-কটা সে-কটা তো কালই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে নি; ও কালো তো বরাবরই কালো চেহারা নিয়ে রয়েছে। তুলে ফেলতে পারতে! ওরা খুব লজ্জিত হয়েছে। এবং এ সম্পর্কে ওরা এরপর থেকে খুব কড়া হবে। অর্থাৎ আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কলেজে যাবেন। সাক্ষাতেও কথাগুলো হল। তাই বলতেই এসেছি। তবে—ওদেরও কিছু বলবার আছে।"

আরতি বলেছিল, "কি সেগুলো ?"

"মানে ওরা বলে আপনি একটু বেশী সাজসজ্জা করেন। একটু কম মেলামেশা করেন। একটু অহঙ্কৃত। অবশ্য ওদের কথা—আমার নয়।"

আরতি একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "আমি হয়তো আর ইউনিভারসিটি যাব না। বি. টি কোর্স নিয়ে ওখানে ভর্তি হব। আমার বাবা আজ পাগলের মত বেরিয়েছেন হাজার কয়েক টাকার জন্যে। দাদাকে পাঠাবেন, তাঁর ফেরবার খরচের জন্যে। কাল বোধ হয় বলেছি যে বাবা সর্বস্বান্ত হয়েছেন প্রায়। গাড়ি—দু'খানা বাড়ি, তার সঙ্গে আমার মায়ের আমার যা গয়না ছিল সব বিক্রী করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক করেছিলেন সেটা ফেল হওয়ায় ওঁকে অ্যারেস্ট করেছিল। এখন যাতে আমার গহনা না-থাকার দৈন্যটা বাবাকে দুঃখ না দেয় তার জন্যেই আমি একটু বেশী সাজি। অবশ্য বাইরেও যে নিজেদের ভেঙে-পড়া অবস্থাটা ঢাকতে না-চাই তাও নয়।"

অত্যন্ত সহজভাবেই কথাগুলি বলেছিল সে। কেমন ক'রে পেরেছিল তা সে নিজেই জানে না। তবে তার দাদাকে যে দাদা মনে ক'রে তাকে অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেছিল—তাকে আত্মীয় বা আপনজন ভেবে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। সেইটেই ছিল বোধ হয় এর কারণ। আরও, বোধ হয় সকালে লণ্ডনের বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে দাদার জন্য উৎকণ্ঠাও আর একটা কারণ। এবং এর পর সেদিন যুদ্ধের কথাই বেশী হয়েছিল।

এর পর সে এসেছিল ২৬শে ফেব্রুয়ারী। তাদের বাড়ি জুড়ে জীবন জুড়ে নেমেছে এক পারাপারহীন অন্ধকার। সে অন্ধকারের যেন শেষ নেই, সে দিনের পর যেন অনন্তকালেও আর দিন নেই,—সব আলো নিভে গেছে, শ্বাসবায়ুও যেন কে হরণ করে নিচ্ছে, খবর এসেছে তার দাদা লণ্ডনের এয়ার-রেডে মারা গেছে।

বাবা অনেক কষ্টে টাকা যোগাড় করেছেন—পাঠাবেন। রথীনকে চিঠি লিখছেন—'তুমি যে ভাবে পারো যা খরচ হয়—চলে এসো, ফিরে এসো। আমি আর এ উৎকণ্ঠা সহ্য করতে পারছি নে। আমার দিন বেশী বাকী নেই। আমি বড় কাতর। আমার অনুরোধ তুমি লঙ্ঘন করো না। আমার কেমন বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে—যে তোমাকে দেখতেও আমি পাব না। তবু—ফিরে আসছ জানলে মৃত্যুর মধ্যেও আমি সান্ত্বনা পাব।' চিঠি চলে গেছে। টাকা যাবে। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল। বেলা তখন তিনটে।

টেলিগ্রামখানা পড়েই বাবার মুখ দৃষ্টি কেমন হয়ে গেল। কাগজখানা হাত থেকে খসে পড়ল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে অস্ফুট একটা 'আঁ' শব্দ করে ঘুরে মেঝের উপর আছড়ে পড়ে গেলেন। সে চিৎকার করে ডেকেছিল, "বাবা—বাবা !"

বাবা নিঃসাড়।

গোটা বাড়িটায় এক চাকর ছাড়া কেউ নেই। তাকেই সে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিল। সব চেয়ে কাছে যে ডাক্তারকে পাওয়া যায়—তাকেই ডেকেছিল। পাড়ার ডাক্তার, পশারে ছোট, তিনি এ পাড়ায় মিঃ সেনকে চিনতেন—সম্ভ্রম করতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন।

দেখে বলেছিলেন, "এ যে—। এ যে—সেরিব্রেল থ্রম্বসিস্ বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয় কোন আকস্মিক শকে। আচ্ছা আমি আপনাদের ডাক্তার বি. সেন মশায়কে খবর দিচ্ছি। তিনি এসে দেখুন। ততক্ষণ একজন নার্স বরং ব্যবস্থা করে দি, কি বলেন?" সে বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করে প্রশ্ন করেছিল—"আর কি জ্ঞান হবে না?"

"না—না। তা হবে না কেন। তবে বাঁ দিকের শিরা ছিঁড়েছে মনে হচ্ছে। হয়তো—প্যারালিসিস হয়ে যাবে। আমি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি। আপনাকে কিন্তু শক্ত হ'তে হবে। আপনার জন মানে আত্মীয়-স্বজনদের খবরটা দেওয়াও উচিত মিস্ সেন।"

আত্মীয়-স্বজন! সংসারে আত্মীয় যে কে—স্বজন যে কে—এ তো সম্পর্ক ধরে বিচার করা যায় না। তবে হঁ্যা সামাজিক সম্পর্ক একটা সূত্র বটে। সেই সূত্র ধরেই আজ এই দাঙ্গা-দুর্যোগের মধ্যে মামাদের বাড়িতে এসেছে, বাধ্য হয়ে এসেছে, হয়তো সমাজের দেওয়া একটা দাবীও আছে—তবু অস্বস্তির সীমা নেই, এই রকম বিছানা এই নিরাপদ ঘর যেন একটা উত্তাপে ভরা মনে হচ্ছে; লাটুর প্রথম সম্ভাষণের কটু কথাগুলো এখনও অন্তরকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছে। তবু এরাই আত্মীয়! সেদিনও এই এদেরই খবর দিতে হয়েছিল!

ওই ডাক্তারটিই নার্স একজন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আধঘণ্টার মধ্যে নার্সটি এসে মনে করিয়ে দিয়েছিল—"ডাক্তারবাবু বলে দিলেন উনি আপনাদের ডাক্তার বি. সেনকে খবর দিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন। আপনাকে আত্মীয়দের খবর দেবার কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছেন।"

হেয়ার স্ট্রীট থানায় গিয়ে ফোন করেছিল এই এদের। ধরেছিল সুধা বউদি। টেলিফোনে—বউদির গলা শুনে বেঁচে গিয়েছিল। সুধা তো শুধু বউদি নয়, সে তার নিজের দিদির মত, বাবার কন্যার মত—অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর কন্যা। এই সুধা বউদিকে নিয়েই ওই মামাতো ভাইদের সঙ্গে এমন বিরোধ। নইলে জীবনের চালচলনের যতই পার্থক্য থাক, তার মামা এবং বাবার মধ্যে অন্তরে অন্তরে যত অমিলই থাক, বাইরে একটা সৌজন্যও ছিল এবং খানিকটা মমতাও ছিল। মামা বাবাকে গরীবের ছেলে বলে অবজ্ঞা করতেন, তাঁদের বাড়িতে বিয়ে করে তাঁদের সম্পর্কে এসেই তিনি ধনী হয়েছিলেন বলে একটা আনুগত্যও দাবী করতেন অন্তরে অন্তরে; আবার বাবা মামাকে ধনীপুত্র বলেই অবজ্ঞা করতেন, বনিয়াদী ধনীর ছেলেদের চাঁদের কলঙ্কের মত দোষগুলির জন্য ঘৃণাও খানিকটা করতেন; মধ্যে মধ্যে শালা-ভগ্নিপতির মধ্যে রসিকতাচ্ছলে বাক্যের বান হানাহানিও চলত। কিন্তু তাতে সম্পর্কচ্ছেদ হয় নি। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল—এই মামাতো ভাইদের নিয়ে। বড় মামাতো ভাইকে তার বাবাই একরকম বি. এ. পাস করিয়েছিলেন। সে আমলেও বার-দুই ম্যাট্রিক ফেল ক'রে পাতুদা পড়া ছেড়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলে তিনিই তাকে নিজের কাছে এনে অবসরমত পড়িয়ে উৎসাহ দিয়ে তৃতীয় বারেই ম্যাট্রিক পাস করিয়েছিলেন। রোল নাম্বার নিয়ে অঙ্কপরীক্ষকের কাছ পর্যন্ত নিজে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর অবশ্য পাতুদা বি. এ. পর্যন্ত নিজেই পাস করেছিল। এবং এই বন্ধুকন্যা সুধার সঙ্গে তিনিই বিবাহের সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই হল কাল! সুধা বউদির রঙ কালো। পাতুদা তাকে অপছন্দ করল। এবং সেই অজুহাত

ধ'রে চন্দ্রের কলঙ্ক-বিলাসের মত বংশগত পতিতা-বিলাসের ধারাটি অবলম্বন করলে। যে দিন থেকে এ কথা বাবা জানলেন সেই দিন থেকে ওদের সঙ্গে তাদের এই সম্পর্ক। অবশ্য মামা বাবার কাছে অনেক মার্জনা চেয়েছেন এবং মামা সুধা বৌদিকে বাপের মত স্নেহ করেন কিন্তু তাতে বাবা মত বদলান নি। বাবাকে মামাতো ভাইরা যত ভয় করে তত ঘৃণা করে। সে নিজেও বাবার মতই এই ভাই দুটিকে ভাল চোখে দেখতে পারে না। রথীন তার দাদাও পারত না। মামাতো ভাইরাও না। তবু সেদিন সুধা বউদিকে বললে, "বাড়িতে আমি একলা বউদি। অন্তত লাটুদা যদি এসে রাত্রিটা থাকে—।" বউদি বলেছিলে, "নিশ্চয় পাঠাচ্ছি। আমার তো উপায় নেই, নইলে আমিই যেতাম। ছেলেটা যে নেহাৎ কাঁচা। আমারও ঠিক সিঁড়ি ওঠা-নামার অবস্থা নয়। আর একটা কথা, টাকা-কড়ির দরকার আছে?"

আরতির চোখ ফেটে জল এসেছিল এক মুহূর্তে; বলেছিল, "না।" বলেই টেলিফোন নামিয়ে দিয়েছিল। দাদার জন্যে সংগ্রহ করা টাকাটা বাড়িতেই রয়েছে। চোখ মুছে থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দরজায় এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিল ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন সত্যকারের আপনজনকে—আত্মীয়কে। বাড়ির দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল প্রবীর। সেদিন তার পরনে ছিল ধুতি টেনিস শার্ট।

"প্রবীরবাবু!" বলতে বলতেই সে কেঁদে ফেলেছিল।

প্রবীর বলেছিল, "হ্যাঁ, আমি অনুমান করেছিলাম। আমাদের প্রফেসর বোসের ছেলে শৌরীন ওই বাড়িতে থাকত। তিনিও টেলিগ্রাম পেয়েছেন। রথীনবাবুর সঙ্গেই তিনি পড়তেন।"

সে উত্তর কী দেবে? শুধুই কেঁদেছিল।

প্রবীর বলেছিল, "কান্না তো আছেই মিস্ সেন। সমস্ত জীবনই রইল। যে বিপদ ঘটে গেছে, সে বিপদ অতীত; তার জন্যে চোখের জল এখন সংবরণ করতে হবে, কারণ তার আঘাতে আর একটা বিপদ ঘটতে চলেছে। এই আশঙ্কা করেই আমি ছুটে এলাম। আপনারা দুজনেই ভেঙে পড়বেন। কিন্তু এসে দেখছি বিপদ অনেক বেশী। চলুন, ভেতরে চলুন।"

রাত্রি আটটার সময় এসেছিলেন ডাঃ সেন।

প্রবীর নীরবে বসেছিল রোগীর ঘরের বাইরে।

বাবাকে দেখা শেষ করে—ভরসা দিয়েছিলেন ডাঃ সেন। বলেছিলেন, "বেঁচে যাবেন। তবে পঙ্গু হয়ে।" তারপর বাইরে এসে প্রবীরকে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন আরতিকে, "ও ইয়ংম্যানটি কে আরতি?"

আরতি উত্তর দিয়েছিল, "দাদার বন্ধু। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। আমাদের পরিবারের বন্ধু হয়ে গেছেন সম্প্রতি। দাদার খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। তারপর এই বিপদে আমাকে একলা দেখে আর যেতে পারেন নি।"

ডাঃ সেন খুশী হয়ে প্রবীরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তার বাবার মত ঈশ্বরে বিশ্বাস ডাঃ সেনেরও ছিল না, তবু সেদিন বোধ করি কী বলে প্রবীরকে শুভেচ্ছা

জানাবেন খুঁজে না পেয়েই তার বাবার মতই বলেছিলেন, "গড উইল ব্লেস ইউ, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড। আমি ভাবছিলাম এঁদের জন্যে। বিশেষ করে আরতির জন্যে। আমারই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু—তা তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে। যখন দরকার হবে, তুমি থানায় গিয়ে আমাকে ফোন করো। আমি যাবার পথে থানা থেকেই ভি-সিকে ফোন করে অনুরোধ করে যাচ্ছি, যেন গেলেই ফোন করতে পাও। ও-সিকে বলে দেবেন তিনি।"

এরও খানিকটা পরে এসেছিল লাটু। বড় মামাতো ভাই সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে গেছে যথাস্থানে; লাটুর পোশাক দেখে মনে হল—সেও সেই পথে বেরিয়েছে—থাকতে আসে নি। কিন্তু তার জন্য আরতি আর চিন্তিত হয় নি। মানুষের আত্মীয় মানুষ; সত্যকারের আত্মীয়কে ডাকতে হয় না, সে অন্তরের ডাক শুনে আপনি আসে। লাটু প্রথমে এসেই—প্রশ্ন করেছিল প্রবীরকে নিয়ে। বাবার কথা নিয়ে নয়।

লাটু—তার ছোট মামাতো ভাইও এসে প্রবীরকে দেখে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল, "ইনি কে আরতি?"

আরতি ঐ একই উত্তর দিয়েছিল।

লাটু বলেছিল, "কই, পরিবার-বন্ধুকে রথীনদা থাকতে তো কোনকালে দেখি নি! নামও শুনি নি! কবে থেকে জুটল?"

কথাগুলি প্রবীরের সামনে হয় নি, পাশের ঘরে হচ্ছিল; কিন্তু এমন জোরে বলছিল লাটু, যাতে পাশের ঘরে, পাশের ঘরে কেন, বাড়ির সকল ঘর থেকেই সকলে শুনতে পায়।

আরতি ক্রুদ্ধ চাপা গলায় বলেছিল, "চুপ কর—উনি শুনতে পাবেন।"

"পেলেন তো পেলেন। আমি কাউকে খাতির করে কথা বলছি না।"

"খাতির কর বা না-কর, অনধিকার চর্চা করার তোমার অধিকার নেই।"

"আই সী; তা হলে অনেকদূর এগিয়েছে।" বলেই, 'শুনছেন মশাই!' বলে বেরিয়ে গিয়েছিল লাটু প্রবীরের কাছে। আরতি পিছনে পিছনে এসে লাটুকে কোন কথা বলবার আগেই, লাটু প্রবীরকে বলেছিল, "আপনাকে বলছি!"

প্রবীর মুখ তুলে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, "বলুন।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে সাহায্য করেছেন তার জন্যে। এখন আপনি আসুন, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি।"

"ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মিস্ সেন কোথায়? তিনি না বললে তো আমি যাব না।"

"আমি তার মামাতো ভাই।"

"শুনেছি। নমস্কার। কিন্তু মিস্ সেন না বললে আমি যেতে পারব না।"

"আপনি যাবেন। আমি বলছি।"

"মাফ করবেন—মিস্ সেন না বললে আমি যেতে পারব না। কারণ আমি শুনেছি, আপনি ড্রাইভারকে আধঘণ্টা পরেই হর্ন দিয়ে আপনাকে ডাকতে বলে বাড়িতে ঢুকেছেন। ড্রাইভার এখনই হয়ত হর্ন দেবে! আপনি থাকবেন না। সুতরাং আমি তো এই বিপদে

একলা রেখে যেতে পারব না। ওই! আপনার ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। যান, আপনার দেরি হচ্ছে।"

"না-না। আপনি যাবেন মশায়। আপনি গেলেন দেখে আমি যাব। সম্পর্কহীন যুবকের সঙ্গে এক বাড়িতে—"

আরতিও আর থাকতে পারে নি; সে ক্ষোভে রাগে অধীর হয়ে বেরিয়ে এসে বলেছিল, "লাটুদা, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও। তুমি তো থাকতে আস নি। তুমি এসেছ, খোঁজ নিয়েছ, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে আমি দিচ্ছি। হাত জোড় করে বলছি, বাড়িতে এসে বাড়ির অপরাধ করে দিও না আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে।"

লাটু এর পর বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।—"ভেরী ওয়েল। প্রয়োজন নেই সে আমি বুঝেছি!"

আরতি মার্জনা চেয়েছিল, "কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি মার্জনা চাচ্ছি।"

হেসে প্রবীর বলেছিল, "ছি-ছি-ছি! কী বলছেন এসব? আমাকে যদি সত্যিই বন্ধু ভাবেন, তবে মার্জনা কেন চাইবেন? না-না-না। যান আপনি, দেখুন, বাবাকে দেখুন।" আবেগহীন অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে একটু মৃদু হেসে কথা ক'টি বলেছিল।

সমস্ত রাত্রি প্রবীর ওই চেয়ারে একভাবে বসেছিল। শুতে অনুরোধ করলেও শোয় নি। বলেছিল, "ঘুমুই তো রোজই। আর এই উৎকণ্ঠার মধ্যে ঘুম আসবেও না। আপনি যান।"

শেষরাত্রে একবার মাত্র সে বেরিয়ে দেখেছিল, চেয়ারের পিছনে মাথা রেখে চোখ বুজেছে প্রবীর। নইলে যতবার উঠেছে, ততবার সে তার সাড়া পেয়েছে।

সকাল বেলায় সে বিদায় নিয়েছিল। তখন তার বাবার অবস্থা ভালোর দিকে।

তিনটি পদক্ষেপ। তিন দিনে তিন বার আসায় তিনটি পদক্ষেপ।

প্রথম পদক্ষেপ ইউনিভারসিটির ঘটনার দিন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ তার পরদিন। তৃতীয় পদক্ষেপ বাবার অসুখের দিন। সেই দিনই সে তাদের পরমাত্মীয় হয়ে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে বাবা জীবনের আশঙ্কা কাটিয়ে উঠলেন। এর মধ্যে—প্রবীর নিত্যই প্রায় খোঁজ করেছে। তার মধ্যে বিলাস ছিল না, মোহ ছিল না, বেদনাভরা আত্মীয়তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারই মধ্যে—এই সহজ যাওয়া-আসার মধ্যে হঠাৎ একদা—অতি অকস্মাৎ একদিন যেন মনে হয়েছিল, তার অন্তরতম প্রকোষ্ঠটির দরজার বাইরে কে যেন হাত দিয়েছে। হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, আঘাত দিয়ে ডাকবে কিনা। সেও অপেক্ষা করে রইল, ডাকুক! একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষের অর্গলে হাত দিয়ে ভিতরে সে এবং বাহিরে প্রবীর—পরস্পরে শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে কোন একটা কিছুর ছায়া যেন পড়েছিল তাদের উপরে। এই পরস্পরের মেলামেশার অনেক অবকাশের মধ্যেও কোন দিন বা কোন বিশেষ সময় একটি আবেগের প্রকাশে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। একটি কারণ সে জানে। সেটি তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের বেদনার প্রভাব। রোগশয্যায় শুয়ে তার পুত্রশোকাতুর সর্বস্বান্ত বাবা যেন সংসারের সব কিছুকে বিষণ্ণ করে রেখেছিলেন। অন্যদিকে প্রবীরের অসাধারণ ভদ্রতাবোধ। আরও কিছু ছিল। প্রবীর তখন পরীক্ষা দিয়েছে। ফল সম্পর্কে

তার সন্দেহ ছিল না। সে তখন যুদ্ধ-বিভাগে চাকরি পাবার চেষ্টা করছে। এবং সেই আকাশ-মাটি-সমুদ্র ব্যাপ্ত করা প্রত্যক্ষ যুদ্ধকে সামনে রেখে কোন আবেগকে সে মুহূর্তের জন্য প্রশ্রয় দিত না।

একদিন আরতি বলেছিল, "আশ্চর্য মানুষ আপনি! আসেন যান—ঘড়ির কাঁটার মত। যেন ডিউটি দিচ্ছেন।"

প্রবীর হেসে বলেছিল, "অভ্যাস করছি। যুদ্ধের চাকরি পাবই। সেটাকে শাসনে রেখে কাজ করা অভ্যাস করছি। ডিউটি ছাড়া তো কিছু থাকবে না জীবনে।"

তবুও তারই মধ্যে কয়েকটি দুর্লভ দিনের স্মৃতি তার মনে আছে। শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের ঘন মেঘাচ্ছন্ন একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশীর রাত্রিতে চাঁদ ওঠার ক্ষণের মত কয়েকটি দিনের স্মৃতি।

তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রবীর কখনও কখনও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কখনও কখনও কর্মরতা আরতির দিকে এই দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবেই বসে থাকত। অবাক হয়ে দেখত। আরতির চোখে চোখ পড়লেও লজ্জিত হত না। কখনও সপ্রতিভভাবেই একটু হাসত। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে যেমন প্রসন্ন হাসি হাসে মানুষ, সেই প্রসন্ন হাসি। যে উদয়ে আলোকাভাস আছে রক্তরাগ নেই, তেমনি উদয়-মুহূর্তের মত সেই হাসি।

তারই মধ্যে একদিন—

সেদিন সে নিজে বোধ হয় অন্তরে অন্তরে আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। প্রবীর তার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। আরতি আত্মসম্বরণ করতে পারে নি—সলজ্জ হেসে বলেছিল, "এমনি করে কী দেখেন বলুন তো?"

এখনও পর্যন্ত তাদের 'আপনি' 'তুমি' হয় নি।

প্রবীর বলেছিল, "আপনাকেই দেখি।"

"আমাকে? আমার মধ্যে কী আছে দেখবার?"

"আপনার মধ্যে একটা কিছু আছে, যা দেখতে ভালো লাগে। আপনার রূপ বলতে পারেন। তবে মানুষ রূপের মধ্যেই তো শেষ নয়—রূপকে ছাড়িয়ে আরও কিছু। বা রূপের অতিরিক্ত অনেক কিছু।"

"আমার রূপ তো নেই। আমি তো কালো! আর গড়নপিটনের মধ্যেও এমন কোন কিছু নেই, রূপের যে সংজ্ঞা আছে তার সঙ্গে যা মেলে। তবে তার অতিরিক্ত কিছু কথা আমি কি করে জানব বলুন।"

বাধা দিয়ে হেসে সে বলেছিল, "আমার একটি জানা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একটু হয়তো সংসারে সমাজে যাকে দুর্নীতিমূলক বলে, তাই আছে এর মধ্যে। তবে যদি সংস্কারকে সরিয়ে বিচার করেন তবে এর মধ্যে আশ্চর্য মানে পাবেন। আমাদের এক আত্মীয় বর্ধমান জেলার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। খুব উচ্চশিক্ষিত না হলেও বংশগৌরবের প্রভাবে বংশের দীক্ষায় ভালই ছিলেন। হঠাৎ তিনি উন্মত্ত হলেন একটি নিম্ন-জাতীয়া কালো মেয়েকে নিয়ে।

ঘর ছাড়তে উদ্যত হলেন। শেষে ঘর ছাড়লেন। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিসের জন্য এমন পাগল হয়েছেন তিনি? কী দেখেছেন তিনি ওর মধ্যে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমার চোখ দুটো যদি তোমাদের দিতে পারতাম তবে বুঝতে পারতে, দেখতে পেতে, কী দেখেছি। এক-একজনের এক এক রঙ ভালো লাগে। কিন্তু বলুন তো রূপের বিচারে মৌলিক রঙগুলোর কোন্ রঙটা কোন্ রঙের চেয়ে নিষ্প্রভ, মলিন? রূপের মধ্যে এক অপরূপ বাস করেন। যে যার মধ্যে তাকে আবিষ্কার করে, তার রূপই তার ভালো লাগে। আপনার মধ্যে একটি সুষমা আছে। সে রঙ-গড়ন দুয়ের অতিরিক্ত কিছু।"

আরতির বুকের ভিতরে স্পন্দন বোধ করি আবেগের স্পর্শে নৃত্যচ্ছন্দোময় হয়ে উঠেছিল। সে হেসে বলেছিল, "আপনার চোখ দুটো ধার পেলে বড় ভালো হত। একবার আয়নায় নিজেকে দেখে সুন্দরী না হওয়ার মনের ক্ষোভটা মুছে ফেলতে পারতাম।"

"দেবার হলে নিশ্চয়ই দিতাম। এবং আমার চোখ পেলে আপনি আরও অনেক সুন্দরকে দেখতে পেতেন। আমার ছেলেবেলা থেকে রূপের একটা নেশা আছে। আকাশের চাঁদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। ফুলের বাগান ছিল আমার সব চেয়ে প্রিয় জায়গা। রূপবান আর রূপবতী যিনিই হোন, আমাদের বাড়িতে এলে তাঁর সঙ্গ ছাড়তে চাইতাম না। দেখুন না, ফুল না পরে আমি থাকি না।" একটু থেমে হেসে বলেছিল, "আমার চোখ পেলে কিন্তু আপনি সেদিন ইউনিভারসিটিতে যে ছেলেটির খাতা বই কেড়ে নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত করেছিলেন, তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করতেন। মানে সে আপনার নামের যে অক্ষরটা কেটে ছোট করে নিয়েছিল, সে অক্ষর বাদ দিতে আপনারই ইচ্ছে হত।"

ঠিক সেই সময়েই বাবা ডেকেছিলেন, নইলে সে জিজ্ঞাসা করত, "তার অর্থ কি এই হয় না যে, আপনার ওই নামে আমাকে ডাকতে ইচ্ছে করে?"

বাবা সেদিন আবার একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার পাশ থেকে সে তাঁর সেবা করেছিল। অনেকবার দুপাশে দুজনে বসে পরস্পরের দিকে একই উদ্বেগ-নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সন্ধ্যার পর নার্সের ব্যবস্থা করে সে গিয়েছিল। সেই দিনই স্পষ্টভাবে সে অনুভব করেছিল, প্রবীর তার পরমাত্মীয়।

বিদায় দেবার সময় কথা খুঁজে না পেয়ে এদেশের একটা অত্যন্ত সেকেলে কথাই বলেছিল, "আর জন্মে আপনি নিশ্চয় আমাদের কেউ ছিলেন।"

প্রবীর বলেছিল, "জন্মান্তর যদি মানেন, তবে বলতে হয়, আপনি এবং আপনার বাবা, দুজনে হয়তো গতজন্মে বাবা-মেয়ে ছিলেন না। আমি হয়তো একজনেরই পরমাত্মীয় ছিলাম। এ-জন্মে আপনাদের দুজনেই আমার পরমাত্মীয়। আসল কথা মমতা, মিস্ সেন। ওই পরমবস্তুটি কী করে যে জন্মায়, এবং কোথায় জন্মায়, এ বলা বড় শক্ত। ওই ওরই জোরে মানুষের ঘর-সংসার, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, সবই দাঁড়িয়ে আছে। ওতেই মানুষ কুৎসিতকে সুন্দর দেখে, গুণহীনকে গুণবান দেখে। 'তনয় যদ্যপি হয় অসিতবরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিতকাঞ্চন।' আপনাদের সঙ্গে সেই পরম বস্তুতে বাঁধা পড়ে গেছি।"

বলে প্রবীর একটু হেসেছিল। আরতি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কথাগুলি বড় ভালো।

প্রবীরের কণ্ঠস্বরে অন্তরের অকপট প্রকাশ। অভিভূত হয়ে যাবারই কথা; তাই গিয়েছিলও, কিন্তু যেন একটা কিছুর জন্যে মনের গভীরে একটি বেদনা অনুভব করেছিল। যেন একটু অভিমান।

"আচ্ছা, আমি আসি আজ। কাল সকালেই খোঁজ নেব।"

চলে গিয়েছিল সে। তারপর আরতি যতক্ষণ জেগে ছিল, উদাস হয়ে বসে ছিল। জীবনের যত নৈরাশ্যজনক ভাবনা সব একসঙ্গে তাকে চেপে ধরেছিল।

রুগ্ণ পঙ্গু বাবার ভাবনা। কী হবে? সংসারে কেউ সত্যকারের আপনার জন নেই, অথচ সম্মুখে গোটা জীবনটা পড়ে রয়েছে। সম্বল ফুরিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। রথীনের ফিরে আসবার জন্য বাবা যে টাকাটা বহু কষ্টে বহু লজ্জা স্বীকার করে, আরতির মায়ের এবং কিছু আরতির গহনা বিক্রী করে সংগ্রহ করেছিলেন, রথীনের মৃত্যুতে সেটা পাঠাতে হয় নি। তাই আজও চলছে। তারপর?

ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি। আশেপাশের ফিরিঙ্গি-পাড়ায় সদ্য আগত ইংরেজ-টমিদের ঘোরা-ফেরায় রাস্তাগুলি কিছু মুখর হয়ে থাকত। রাত্রে দরজা ভালো করে বন্ধ রাখতে হয়। দু-একটা মাতাল সেপাইয়ের স্খলিতকণ্ঠের গান, কি দু-একটা উচ্চ শব্দ, কি হাসি মাঝে মাঝে বেজে উঠছিল। সেদিন খেতেও ভালো লাগে নি। রাত্রে ঘুমও ভালো হয় নি। সকালে বাবা ভালো ছিলেন। প্রবীর এসেছিল আটটা না বাজতেই। বাবা ভালো আছেন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিল, "যাক, দুশ্চিন্তা নিয়ে যেতে হবে না। আজই আমি দিল্লী যাচ্ছি। সাহস করে থাকবেন কিন্তু। আপনি বিংশ শতাব্দীর মেয়ে।"

সেইদিনের কাগজেই খবর ছিল, গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

প্রবীর কাগজখানার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "সাবধানেও থাকবেন। ঝড় উঠল।"

ফিরেছিল প্রায় মাস দুয়েক পর। দিল্লী থেকে আরও কয়েক জায়গায় যেতে হয়েছিল তাকে। এর মধ্যে চিঠিও লিখেছিল একখানা। চিঠিতে লিখেছিল—'জীবনে যে চাকরি যে কর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তারই জন্য ঘুরতে হচ্ছে। কয়েক জায়গায় কয়েক রকম দেখাশুনা, পরীক্ষা, ইণ্টারভ্যু।'

বাবা খুশী হয়েছিলেন। বাবা তখন আস্তে আস্তে যেন সেরে উঠছিলেন। কিন্তু সে ঠিক খুশী হয়নি। প্রতীক্ষা করেছিল তার ফিরে আসার। ফিরে এলে সে ভেবেছিল বলবে—'যুদ্ধের চাকরি ছাড়া কি জীবনের সাধ মিটবে না? যুদ্ধে জীবনের সাধ তো মৃত্যু! না—ও-কাজ নেবেন না।'

দু-মাস পর সে ফিরেছিল চাকরি নিয়ে; পরনে তার মিলিটারী পোশাক—ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের ব্যাজ কাঁধে-বুকে। আরতি কথা বলতে পারে নি। বলেছিল প্রবীর—"কী যে দুশ্চিন্তা হত আপনাদের জন্যে কী বলব! তবু ভরসা ছিল আপনার উপর। আপনি শক্তিমতী মেয়ে।"

আরতি শুধু বলেছিল, "চাকরি হয়ে গেছে ?"

"পোশাক দেখছেন না! এখন লক্ষ লক্ষ বলির প্রয়োজন, এখন বাছাবাছির কড়াকড়ি নেই। যে কোন দিন ডাক আসবে। যে কোন মুহূর্তে।"

আরতির আর ও-কথা বলা হয় নি। প্রবীর নিজেই মুখর হয়ে উঠেছিল নিজের কথায়। একটা থেকে আর একটা প্রসঙ্গে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ এলো আগস্ট আন্দোলনের কথায়। সে চোখে দেখেছে আন্দোলনের তীব্রতা। বোম্বাইয়ে যখন গুলি চলে, তখন সে বোম্বাইয়ে ছিল। গোটা বিহারের অবস্থা দেখে এসেছে। পাটনায় বেয়নটের ডগা উঁচিয়ে বিশিষ্ট লোকদের দিয়ে রাস্তা কাটানোর, ভাঙা কালভার্ট মেরামত করানোর গল্প শুনে এসেছে।

কিছু ফটো তার কাছে ছিল। সেগুলিও দেখিয়েছিল। কলকাতার গল্প, মেদিনীপুরের কাহিনী বলেছিল আরতি। মেদিনীপুর তখনও অর্ধেক ইংরেজের হাতের বাইরে। কোথাও বারোয়ারী পূজোর বাজনা বাজছিল। সেদিন ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ ঘুরছিল, রাত্রির অরণ্যে উল্লাসমত্ত দলবদ্ধ হাতির মত। আসামের জঙ্গলে একবার বাবার সঙ্গে বাবার এক ফরেস্টার বন্ধুর ব্যবস্থায় রাত্রে বন দেখেছিল। সেখানেই দেখেছিল দলবদ্ধ হাতিদের মাতামাতি। ঠিক তেমনি। সীসের মত একটি একটানা মেঘের আস্তরণের উপর ছোট বড় খণ্ড খণ্ড মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার সঙ্গে দমকা বাতাস।

প্রবীরই একসময় এ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে বলেছিল, "এ কি, সাইক্লোন নাকি ?" এবং তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। বলেছিল "কাল আসব।"

"এই দুর্যোগের মধ্যে যাবেন কী করে ?"

"চলে যাব। কাছেই তো। আর তো শিবপুরে থাকছি না। এখন রয়েছি একটা হোটেলে। এই তো চৌরঙ্গীর মোড়ে।"

সপ্তমীর দিন সকালবেলা পর্যন্ত সাইক্লোন তার চেহারা নিয়ে দেখা দিল। হাতির দল যেন রাতারাতি পাগল হয়ে গেল। উন্মত্ত দাপ দাপিতে পৃথিবীকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

বাবা ভয়ার্ত স্বরে জড়িত জিহ্বায় বার বার তাকে ডাকছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, "এ কী? এই ?"

"ঝড়—বৃষ্টি !"

"এত ? তার এত শব্দ ?"

"বোধ হয় সাইক্লোন !"

"সাইক্লোন !" একটুখানি স্থিরদৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "পুরনো বাড়ি, পড়ে যাবে না তো ?"

রোগের জন্য বাবা যেন দিন দিন অবোধ হয়ে যাচ্ছিলেন। কথা বলতে বলতে সেই সাহসী বুদ্ধিদীপ্ত অমৃত সেনের মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল। ছেলেকে বুঝিয়ে বলার মতই সে বলেছিল, "না। ছাদ তো নূতন। ছাদ তো ভেঙে করানো হয়েছে।"

"করানো হয়েছে ?"

"হ্যাঁ। ওই তো ঢালাই ছাদ। দেখছেন না? কড়ি-বরগা নেই।"

"হ্যাঁ। কিন্তু···। ও! কী ভীষণ ঝড়!"

একটু পরে বলেছিলেন, "সে—সে আসে নি?" প্রবীরের নাম মনে পড়ে নি তাঁর। মধ্যে মধ্যে তার নামও ভুলে যেতেন।

আরতি মনে করিয়ে দিয়েছিল, "প্রবীরবাবু? আসবেন কী করে? রাস্তায় যে জল জমে গেছে। আর যে দমকা ঝড় আর বৃষ্টি।"

অনুমান করে ঘাড় নেড়েছিলেন, "হ্যাঁ। হ্যাঁ।"

প্রবীর কিন্তু তার মধ্যেই এসেছিল। এসেছিল কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে। কিছু ডিম, একখানা বড় রুটি, এক টিন মাখন, আর তার সঙ্গে কিছু সোনামুগের ডাল নিয়ে। হেসে বলেছিল, "যা গতিক—তাতে বাজার করাতে পেরেছেন কিনা জানি না। কালও পারবেন কিনা বুঝতে পারছি না। তাই নিয়ে এলাম। এত বড় হগমার্কেট প্রায় জনশূন্য। এ ছাড়া কিছু পাই নি। সোনামুগের ডালটা হঠাৎ পেলাম। সাইক্লোনই হোক, হ্যারিকেনই হোক, খিচুড়ি খাবার বড় ভালো রাত—মানে আবহাওয়া এনেছে। ইলিশ পেলে সোনায় সোহাগা হত। তবুও ডিম খারাপ লাগবে না। যদি তাড়াতাড়ি বানানো সম্ভবপর হয়, আমিও খেয়ে যেতে পারি।"

"কিন্তু জলে ভিজে সপসপ করছেন।"

"রাস্তায় প্রায় সাঁতার দিতে হয়েছে। নতুন ওয়াটারপ্রুফ, ক্যাপ, ছাতা, গামবুট,—রণসাজের, মানে বর্মের আর খুঁত রাখি নি, কিন্তু মিথ্যেই এরা ওয়াটার-বুলেটপ্রুফ বলে বিজ্ঞাপন দেয়, আসলে ছররা আটকায়, বুলেট আটকায় না। সত্যিই আপাদ-মস্তক ভিজে গেছি। গামছার মত কেউ যদি নিংড়ে দিতে পারে তো এক চৌবাচ্চা জল হবে।"

"ছেড়ে ফেলুন ওগুলো। বাবার কাপড়-চোপড় দিচ্ছি আমি।"

"আগে এগুলো ধরুন। এক এক কণা কি দানা নষ্ট হলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না।"

হেসে ফেলেছিল আরতি, "এত খিচুড়ি খাবার লোভ? আপনাকে তো এমন ভোজন-রসিক বলে কোনদিন বুঝতে পারি নি?"

"ঠিক দিনটি না এলে বিশেষ রূপ প্রকাশ পায় কী করে বলুন? আমাদের জাতের এই বিক্রম, এই বুলেটের সামনের বুক পেতে দাঁড়ানো এ রূপ কি এই বিয়াল্লিশের আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর না এলে প্রকাশ পেত কোনদিন? এই সময়ের আগে সুভাষবাবুর যত বড় এ্যাডমায়ারার হোক—কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল যে, হিটলারের পাশে মিলিটারী জেনারেলের পোশাক পড়ে দাঁড়িয়ে তিনি আর্মির স্যালুট নিতে পারেন? তিনি নিজে ভেবেছিলেন?" কথাটা হেসেই সে শুরু করেছিল, কিন্তু বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সুন্দর মুখে যেন রক্তের উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছিল।

আরতিও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে অন্য কারণে।

হিটলারের, জার্মানির নাম সে সহ্য করতে পারে না। তার দাদাকে তারা—

বলেও ছিল, "ওদের নাম আমার কাছে করবেন না। আমি সহ্য করতে পারি না। আমি রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকি কিন্তু সুভাষবাবুকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করতাম। তিনি শেষে—একটা দৈত্যের সঙ্গে—"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে চলে এসেছিল, বলেছিল, "কাপড় দিই দাঁড়ান। ওয়াটারপ্রুফ-ট্রাংকগুলো খুলুন।"

রাত্রে খিচুড়ি খেয়ে সে-রাত্রে প্রবীর আর হোটেলে ফেরে নি। রাত্রিটা তার বাবার পাশে বসে ছিল। রাত্রে তখন সাইক্লোন বোধ করি প্রচণ্ডতম গতিবেগে প্রকট হয়েছে। নিরাপদ ঘরে বসেও মনে হচ্ছে এই দুর্যোগ-রাত্রির বুঝি অবসান হবে না। প্রতি মুহূর্তে একটা ভীষণতম বিপদ যেন আসন্ন মনে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল, গোটা বাড়িটাই বুঝি ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

এমনি একটা মুহূর্ত এসেছিল তাদের খাবার সময়। ও-ঘর থেকে তার বাবা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলেন, বোধ করি কারও বাড়ির টিনের একটা চাল উড়ে এসে তাদের ছাদের উপর বিপুল শব্দে আছাড় খেয়ে পড়েছিল।

খাওয়া ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়েছিল প্রবীর। প্রবীরের সাহসেই সে সাহস পেয়েছিল, নইলে সেও ওই শব্দে হয়তো চিৎকার করে উঠত, নয়তো আড়ষ্ট পঙ্গু হয়ে যেত। বাবার কী হত সে বলতে পারে না। সে যখন উঠে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন বাবার পুরনো খানসামা রামধারী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবীর তাঁর কপালে হাত দিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে বলছে, "ভয় নেই। কিছু হয় নি। আমাদের বাড়ি ঠিক আছে। ভয় পাবেন না। বোধ হয় কোন টিনের চাল উড়ে আমাদের ছাদে পড়েছে।"

বাবা কথঞ্চিৎ সুস্থ হলে বলেছিল, "আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি আপনাকে বলছি, এ বাড়ি এমন সাইক্লোন পর পর ছ-সাতদিন হলেও দাঁড়িয়ে থাকবে।"

বাবা ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। প্রবীর বলেছিল, "কোন ভয় করবেন না। আমি রইলাম আপনার পাশে। আর কয়েক ঘণ্টা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাস্ করে যাবে।"

এর পর সে কাপড় দিয়ে দরজা-জানালার ফাঁকগুলি সযত্নে বন্ধ করে বলেছিল, "যতটা পারি সাউণ্ড-প্রুফ করলাম। এই ভয় করেই আমি এসেছি। আলিপুরের আবহাওয়া আপিসের এক বন্ধুর কাছে খবর পেলাম এত বড় সাইক্লোন একশো বছরের মধ্যে হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কথা মনে হল। ওঁর এই ছেলেমানুষের মত ভয় পাওয়ার কথা জানি। তাই এলাম। একলা আপনি সামলাতে পারবেন না। যান, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন, শেষরাত্রির দিকে ঝড় একটু কমবে বলে মনে করছি ; তখন আপনাকে জাগিয়ে দেব।"

"না। আমিও থাকব।"

"না। থাকবেন না। না-হলে এই ঝড় মাথায় করে ভিজতে ভিজতে আমার আসার কোন অর্থ হয় না মিস্ সেন।"

এই সুরের এই কথাকে অমান্য করতে পারে নি আরতি। কিন্তু ঘুমুতেও পারে নি।

বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব, ছাদের উপর আছড়ে-পড়ে-যাওয়া টিনের চালে বৃষ্টিপাতের বিচিত্র শব্দ, ও-ঘরে বাবার জন্ম চিন্তা, তার সঙ্গে তার বাবার পাশে প্রবীর জেগে বসে আছে, এই অস্বস্তিতে ঘুম তার আসে নি। প্রবীরের কত দান তাকে নিতে হবে? কেন নেবে? এই প্রশ্নে সে ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছিল। এ ক্ষোভ তার এই প্রথম। এতদিন এ ক্ষোভ জাগে নি কেন, হঠাৎ এই কথাটা মনে হয়ে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল।

রাত্রি সাড়ে বারোটা বা একটার পর সে আর থাকতে পারে নি। বাবার ঘরে এসে ঢুকেছিল। একটু আশ্চর্য হয়েছিল। এঘরে ঝড়ের শব্দ কম। ঘরটার উপরে ছাদে একখানা ঘর আছে, সেই কারণে টিনের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দটাও কম। বরং যেন একটি সুরময় শব্দের মত হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ; যতটা পেরেছে, শব্দের প্রবেশ বন্ধ করেছে। বাবা গাঢ়-ঘুমে ঘুমুচ্ছেন। নাক ডাকছে। প্রবীরও চেয়ারের মাথায় হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। চেয়ারখানা আরামপ্রদ ইজিচেয়ারেরই অভিনব সংস্করণ। ঘুমুতে অসুবিধে হয় না। কোণে ঠেস দিয়ে রামধারী ঘুমুচ্ছে। আরতি কাউকে না জাগিয়ে এপাশের চেয়ারখানায় বসে গেল। নীল আলোয় ভরা ঘরখানা যেন স্বপ্নাবেশে ভরে গিয়েছিল। তার মধ্যে স্বাস্থ্যে দীপ্তিতে পরিপূর্ণ ঘুমন্ত প্রবীরকে অপরূপ বলে মনে হচ্ছিল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে জল এসেছিল তার। কেন সে তা জানে, কিন্তু সে থাক। তারপর কখন সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল ঘড়ি বাজার শব্দে। ঢং চং ঢং শব্দে চোখ মেলেছিল সে। চোখ মেলেই আবার সে বন্ধ করেছিল অবশের মত। প্রবীর চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। ঘুমের ভান করে সে পড়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ মেলেছিল। প্রবীর কি এখনও দেখছে? হাঁ৷ দেখছিল। কিন্তু এরপর আর বোজা যায় নি। চোখে চোখ রেখেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "কটা বাজল?"

"চারটে দশ মিনিট।"

প্রবীর অন্তত দশ মিনিট তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সকালেও ঝড় ছিল প্রবল, তবে কমে এসেছে। প্রবীর বিদায় নিয়ে বলেছিল, "ও-বেলা পারলে আসব। ঝড় ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই কমবে। আচ্ছা—।"

আরতি বলেছিল, "ধন্য মানুষ কিন্তু। চিরকাল আমরাই ঋণী থাকলাম

"কী আশ্চর্য! একে আপনি ঋণ বলেন? আপনাদের আত্মীয়ের মত মনে করি—ভালবাসি—"

"তা হলে আজও 'আপনি' সম্বোধনটা কায়েমী হয়ে থাকত না।"

"সেটা উভয়ত।"

"না। আজ আমি একবারও 'আপনি' বলি নি।"

"ওঃ! আশ্চর্যভাবে ঠকিয়েছ কিন্তু। আমি লক্ষ্যই করি নি। আমারও অনেকবার কিন্তু মনে হয়েছে

"হয় নি। কখনও না। বিশ্বাস করব না আমি।"

"অন্তত কাল বলব বলে এসেছিলাম, এটা বিশ্বাস কর।"

"বললে না কেন ?"

"জানি না। বোধ হয় ঝড়ের বেগ, তোমার বাবার আতঙ্ক, এই সবে একটা গোলমাল করে দিল।"

"অথচ তোমারই এটা বলা উচিত ছিল। তুমি দাতা আমরা গ্রহীতা।"

হেসে প্রবীর বলেছিল, "দাতার চেয়ে গ্রহীতা সব ক্ষেত্রে ছোট নয় আরতি। যে গ্রহীতা অসংকোচে মর্যাদার সঙ্গে মাথা তুলে নিতে পারে, সে তো দাতার চেয়েও বড়।"

"তাই কেউ পারে নাকি ?"

"পারে বৈ কি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দান যে ভিক্ষুক অসংকোচে গ্রহণ করে, সে হল পরম গ্রহীতা—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট।"

"বাবাঃ, কী থেকে কী। যাও, খুব হয়েছে।"

"আরও শুনিতে পারো।"

"আর আমি শুনতে চাই না।"

"সেটা তত্ত্বকথা নয়।" তারপর স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল সে। বলেছিল, "ভালবাসা যেখানে অকৃত্রিম, অকপট, সেখানে যে ভালবাসে সে দিতেও পারে, আর নিতেও পারে। হিসেব করে না। নারী পারে পুরুষের কাছে নিতে, পুরুষও পারে নারীর কাছে নিতে। ও প্রাপ্যের পরিমাণও নেই—যত দেবে নেবে।"

তার ইচ্ছা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে দাঁড়াতে এবং বলতে, "দাও না! এইবার দাও!" কিন্তু তা পারে নি। আটকে গিয়েছিল কথাটা।

প্রবীর বলেছিল, "চুপ করে রইলে যে!"

এবার সে বলেছিল, "ভাবছি, পাতব হাত ?"

"সে ভাল কথা। আমি ততদিন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি। আমিও কাল থেকে বলব বলব করে বলতে পারি নি। কালই আমার পরোয়ানা এসে গেছে। আজ রাত্রেই পাড়ি। উপস্থিত পুনা।"

পাথর হয়ে গিয়েছিল আরতি।

"আমি তোমাদের ভালবেসে আপনার ভেবে সামান্য কিছু করলাম। আনন্দ পেলাম, ভালো লাগল বলে করলাম। ও নিয়ে হিসেব কোর না। ঋণ ভেবো না। কেমন ?"

হাসতে হাসতে সে চলে গিয়েছিল। অপেক্ষা করে নি। যেন ও-বেলা ফিরে আসবে।

এরপর আর একদিন দেখা হয়েছিল। সে অনেকদিন অর্থাৎ কয়েক মাস পর। তার আগে বিয়াল্লিশের চব্বিশে ডিসেম্বর বাবা এয়ার রেডের সেই আতঙ্কময় দুঃসময়ে মারা গেলেন।

বাবা সেদিন একবার প্রবীরকে খুঁজেছিলেন, বলেছিলেন, "সে কই ?"

ওঃ, সে কী রাত্রি! ওঃ, আতঙ্কিত মানুষের ঘরে ঘরে সে কী আর্তনাদ! চন্দ্রালোকিত রাত্রি এত ভয়ঙ্কর হতে পারে, এ তার ধারণা ছিল না।

তারও সে-রাত্রে বার বার মনে হয়েছিল প্রবীরকে। ভয়ের মধ্যে বিপদের মধ্যে তাকেই মনে পড়েছিল দুজনেরই। হয়তো বাবার মনে আরও কিছু ছিল। ওদিকে বিস্ফোরণের পর

বিস্ফোরণ হয়ে চলেছিল। একটা প্রচণ্ড শব্দের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বাবা 'আঁ—' চিৎকার করে উঠে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ওঃ!

বাকী রাত্রিটা শবদেহ আগলে বসে ছিল সে। মনে মনে আরতি প্রবীরকেই ডেকেছিল। কিন্তু সে তখন দূরে—ট্রেনিং ক্যাম্পে। অল ক্লিয়ারের পর খবর দিয়েছিল সুধা বউদির বাপের বাড়িতে।

মামারা ছিলেন না। রেঙ্গুন পড়ার কিছুদিন পর থেকেই তাঁরা দেওঘরে চলে গিয়েছিলেন। মামাতো ভাইরা আসা-যাওয়া করত; ব্যবসার জন্যও বটে, এবং কলকাতার নৈশ আনন্দের জন্যও বটে। কিন্তু তার কোন খোঁজখবর করত না। তাই তাদের খবরও সে দেয় নি। কলকাতায় তখন পূর্বরণাঙ্গনের সৈনিকদের কল্যাণে নৈশ আনন্দের রঙ্গমঞ্চে নতুন যবনিকা উঠেছে। নোট উড়ছে বাতাসে। মাসাজ হোম, হোটেল এবং আরও কত বিচিত্র ব্যবস্থায় গৃহস্থ কন্যারাও সন্ধ্যাচারিণী হয়ে উঠেছে। তাদের ব্লাউসের ভিতর থেকে একশো টাকার নোট বের হতে শুরু হয়েছে। কালোবাজারে অদৃশ্য লেনদেনের কল্যাণে মুদি লক্ষপতি হচ্ছে। লক্ষপতি কোটিপতি হচ্ছে। অন্যদিকে ফুটপাথে কঙ্কালের সারি। গৃহস্থ-পাড়ায় রাত্রে কান্না ভেসে বেড়ায়, 'একটু ফ্যান!' 'এক মুঠো এঁটোকাঁটা!'

সেদিন খবর পেয়ে এল সুধা বউদির ভাই এবং ভাইপো। ভাইপো অরুণ। অরুণ আশ্চর্য কার্যক্ষম ছেলে। আগে থেকেই সে চিনত। ইউনিভার্সিটি ছেড়ে রাজনৈতিক কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে। সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা অরুণই করেছিল। লোকজন সংগ্রহ করা থেকে সব কিছু। ফুল এনে শবের উপর ছড়িয়ে দিতে দিতে বলেছিল, "পৃথিবীতে এই বর্বর অত্যাচার যারা করছে তাদের যেন ভগবান ক্ষমা না করেন।" এর পর হঠাৎ দু-লাইন রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে—'

আবৃত্তি করে বলেছিল, "মানুষ কখনও এ ক্ষমা করবে না। মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে।"

চোট দুটো তার জ্বলে উঠেছিল। ওই জ্বলন্ত চোখের জ্বালা আরতির মনের শোকের বিষণ্ণ মেঘাচ্ছন্নতার বুকে একটা বিদ্যুৎশিখা জ্বালিয়ে তুলেছিল।

বাবার শ্রাদ্ধের ব্যাপারেও অরুণই তার সব করে দিয়েছিল। আরতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল—কিন্তু কৃতজ্ঞতা অরুণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, "এ সব কি বলছেন। আপনার বাবা এবং আমার দাদু যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সুধা পিসিমাও এমনি অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন—আমি তাঁকে কি লিখেছি জানেন? লিখেছি—'তাই তো পিসিমা, কথাটা তো তুমি ভাল মনে করে দিয়েছ'।"

শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়ার পরও অরুণ তার খোঁজ নিতে ভোলে নি। নিত্য খোঁজ নিয়েছে। একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে। এবং তাকে সে-ই জোর করে সঙ্গে নিয়ে বের করেছিল ঘর থেকে। বলেছিল, "ঘরে বসে তো জীবন কাটবে না মিস্ সেন। পয়সা থাকলেও না। জীবনের

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে অন্ধকার গুহাতে বসে থাকলেও জীবনের যুদ্ধ সেখান পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। বের হোন। কাজ করুন।"

"কাজ? কি কাজ?"

"কাজের অভাব আছে? মানুষের সেবা করুন। কত কাজ।"

ভাল লেগেছিল অরুণের কথা।

অদ্ভুত ছেলে। প্রবীরের অভাব সে পূর্ণ না করুক—অনুভব করে হতাশায় ভেঙে পড়তে দেয় নি। তাকে নূতন দিকে নূতন কাজে লাগিয়েছিল। নানান্ সমিতির কাজ। তার বাড়িটাকেই এ পাড়ার আপিস করে তুলেছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্য, মহিলা-রক্ষা সভা, আরও অনেক কিছু। তার অনেক কিছু মত্ততা। তার বিচার নতুন, দৃষ্টি নতুন। একক এবং ভাগ্যহত জীবনে তা সেদিন ভাল লেগেছিল আরতির। ক্রমে ক্রমে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল কাজের মধ্যে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন এসেছিল প্রবীর। একেবারে মিলিটারী পোশাকে এবং ভঙ্গিতে। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি! মুখে-চোখে, ভাবে-ভঙ্গিতে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন। উচ্চকণ্ঠে ডেকে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকেছিল, "আরতি! আরতি!"

এসে ঘরের মধ্যে মজলিস দেখে মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল।

"প্রবীর!"

"হ্যাঁ। কিন্তু—"

"এঁরা সব আমাদের সমিতির কর্মী। দেশের এই দুঃসময়ে আমাদের অনেক কাজ। সেই কাজের জন্য সমিতি করেছি।"

"ও। কিন্তু—বাবা—?" শূন্য ঘরটার দিকে সে তাকিয়েছিল।

"বাবা নেই। ২৪শের এয়ার রেডের আতঙ্কে তিনি হার্টফেল করে মারা গেলেন।"

"বাবা নেই!"

"তিনি মুক্তি পেয়েছেন হয়তো। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করে এই কাজ নিয়েছি। আর কি করতে পারি বল? আমার বিশ্বাস বাবার আত্মা, দাদার আত্মা এতেই সান্ত্বনা পাবেন।"

প্রবীর একটা আসনে বসে একটু বিষণ্ণ হেসেছিল। কিছুক্ষণ পর বন্ধু-বান্ধবীরা চলে গেলে সে আর প্রবীর যখন দুজনে রইল তখন সে হেসেছিল, উৎফুল্ল হতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রবীর হয় নি। চা খেয়েছিল নিঃশব্দে। কথা বললেও ভাল করে উত্তর দেয় নি। কিছুক্ষণ পর বলেছিল, "বিদায়! যদি ফিরি তো আবার দেখা হবে। কালই চলেছি। নিরুদ্দেশ যাত্রা। মানে ঠিক কোথায় যাচ্ছি জানি না। ভোররাত্রে মিলিটারী স্পেশাল ছাড়বে। এসেছি আজ সকালে। দেখা করে গেলাম।"

সে তার হাত চেপে ধরেছিল।

প্রবীর বলেছিল, "ছাড়ো!"

সেই শেষ দেখা। শুধু একখানা মাত্র চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, 'আরতি, সেদিন তোমার কাছে শুধু বিদায় নিতেই যাই নি, জীবনে তোমাকে বাঁধতেও গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বলব, রতি, বিদায়ের দিনে বাসর সাজিয়ে আমাদের জীবনের দেওয়া-নেওয়াটা সেরে নিয়ে যাই। যেটা সারা হলে মৃত্যুর মধ্যে হারিয়েও আমরা কেউ কারুর কাছ থেকে হারাব না। কিন্তু পারলাম না। তোমার বন্ধু-বান্ধবীদের দেখে উৎসাহটা এমন ধাক্কা খেল যে—আমার সব কল্পনা একটা ভেলার মত চোরা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফেঁসে গেল। আমার ভালো লাগল না বলব না, বলব আমার উৎসাহটা চলে গেল। তাই খানিকটা নীরবে বসে থেকে ফিরে এলাম। পরে ভেবেছি, ভালই হয়েছে। তোমার জীবনকে টেনে নিয়ে আমার এ অনিশ্চিত জীবনে একদিনের জন্য জড়িয়ে কি হত? তুমি সুখী হও।'

এর পর খানিকটা যুদ্ধের সেন্সার-বিভাগ থেকে কাটা।

চিঠি পড়ে কয়েক ফোঁটা জল তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল।

তারপরই, তার কপালে ভ্রূকুটি-রেখা জেগে উঠেছিল। মনে তার প্রশ্ন জেগেছিল, তার বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে কি সে দেখেছিল যা তার ভাল লাগে নি?

সেই মুহূর্তে সে বসেছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। নিজের প্রতিবিম্বের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে।—কি দেখলে খুশী হত প্রবীর? চুল এলো করে বিছানায় শুয়ে থাকা এবং দাদার জন্ম কাঁদা, তাকে মনে মনে ডাকা—'তুমি এস প্রবীর, আমি আর পারছি নে?'

মনে পড়েছে, অরুণ এসেছিল সেই সময়। এসেছিল দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ নিয়ে এক তরুণ লেখকের লেখা একখানা নাটকের অভিনয় করবার কথা নিয়ে। তাকে একটা পার্ট নেবার কথা বলতে এসেছিল।

নাটকে পার্ট? না। অন্য সব কাজ সে করবে, ঘুরে টিকিট বিক্রী অন্য কাজকর্ম ক'রে দেওয়া সব করবে কিন্তু নাটকে অভিনয় সে করতে পারবে না।

এই প্রবীরের শেষ চিঠি। এরপর আর কোন খবর সে কোনদিন পায় নি। জীবনে সে তখন কাজ নিয়ে মেতে আছে। মনের মধ্যে সুখ ছিল যে, দুঃস্থ আর্ত মানুষের সেবা করছে, তার ক্ষুব্ধ আক্রোশের তৃপ্তি ছিল যে, যাদের বর্বরতায় তার দাদা মরেছেন, বাবা মরেছেন—তাদের বিরোধিতা করছে সে। দিন-রাত্রি সে ঘুরছে, এ-পাড়া ও-পাড়া। বিশ্রাম চাইলেও বিশ্রাম পায় নি। অরুণ তাকে টেনে নিয়ে গেছে। এদিক দিয়ে অরুণ ছিল তার চেয়েও প্রমত্ত। কিন্তু আশ্চর্য, অরুণের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়াবার কথা কোনদিন তার মনে হয় নি। লোকে কানাকানি করেছে, সে ব্যঙ্গহাসি হেসেছে। তারই মধ্যে হঠাৎ এক-একদিন প্রবীরকে সে স্বপ্ন দেখেছে। জেগে উঠে বাকি রাত্রিটা তার কথাই ভেবেছে। কোনদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, কোনদিন চোখের কোণ থেকে দুটি জলের ধারা গড়িয়ে এসেছে। একদিন সারারাত্রি অঝোরঝরে সে কেঁদেছিল। তার আগের দিন অরুণের সঙ্গে ওদের দলের সঙ্গে তার

ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। সেদিন শুধুই প্রশ্ন করেছিল, প্রবীর হারিয়ে গেল ? কেন কেন···তুমি যুদ্ধে গেলে ? পরের দিন চিঠি লিখেছিল প্রবীরের দাদাকে দিল্লীতে। তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন তার কোন খবর তাঁরা পান নি। যুদ্ধবিভাগ থেকে জানিয়েছে উদ্দেশ নেই।

হারিয়ে গিয়েছিল প্রবীর। জীবনের আকাশে একটা নবাগত তারার মত ক'দিনের জন্য উদয় দিগন্তে উঠে আবার মিলিয়ে গেল—যেই অন্ধকারের মধ্যে,—যে অন্ধকার আদিতে এবং অন্তে অমাবস্যার উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণ-সমুদ্রের মত চিরকাল নিঃশব্দে কল্লোলিত হচ্ছে।

সেখানে ডুবলে তো আর ওঠে না। কিন্তু এই দাঙ্গার দুর্যোগের মধ্যে তার চোখের কাছে এগিয়ে এল এই কৃষ্ণ-সমুদ্র, এবং সেই সমুদ্র থেকে উঠে এ কি কালো চেহারা নিয়ে প্রবীর তার সামনে দাঁড়াল ?

অথচ সে তাকে চিনতেও পারলে না !

ছয়

এই চিন্তার মধ্যেই আরতি ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন। কখন অর্থে দুটোর পর। ঘড়িতে দুটো বাজা তার মনে আছে। তার আগে ঘণ্টাখানেক আধো ঘুমের মধ্যে নানান্ এলোমেলো স্বপ্ন। দাঙ্গার কলকাতার চীৎকার তারই মধ্যে কানে এসে ঢুকেছে। সেই সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছে প্রবীর ড্রাইভারের পোশাক ছেড়ে মিলিটারী পোশাক পরে হাতে রাইফেল নিয়ে মিলিটারী ট্রাকে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকটা ছুটছে। তাদের কপালিটোলার বাড়ির সামনে হাতের রাইফেলটা কাঁধে লাগিয়ে গুলি ছুঁড়ছে। একবার দেখলে অরুণের জামার কলার ধরে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে টেনে তুলছে ট্রাকের উপর। এমনি সব স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল গাঢ় নিদ্রায় অল্প কিছুক্ষণের জন্যে।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙেও সে কয়েক মিনিট অভিভূত হয়ে রইল। মামার বাড়ির যে ঘরখানায় সে শুয়েছিল সে ঘরখানাকে ঠাওর করতে কিছুক্ষণ লাগল। তারপর সে উঠে বসল। মাথার ভিতরটা নিদ্রাহীনতার অবসাদে ঝিম-ঝিম করছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে।

বুকের ভিতরটায় একটা অপরিসীম উৎকণ্ঠা। একটা উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের সম্মুখে নিরুত্তর পৃথিবী হতাশায় ভরে উঠেছে। ওকে প্রবীর বলে স্বীকার করতে পারছে না, প্রবীর নয় বলে অস্বীকারও করতে পারছে না। এই অবস্থার মধ্যে জীবন বিস্বাদ, পৃথিবী তিক্ত। বারবার এক দুঃসহ বিরক্তিবোধে 'আঃ—আঃ' বলে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে। একটা মাছি কি একটা মশা, কি জানালার সামান্য ছিদ্র বেয়ে একটু রৌদ্রচ্ছটা, কি কাপড়ে একটা কাঁটার খোঁচা, কিছু একটা উপলক্ষ্য পেলে সে এই বিরক্তি প্রকাশ করে বেঁচে যায়।

বাড়ির সকলে উঠেছে। পায়ের শব্দ, কথার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ তার দোরে কেউ বাহির থেকে দরজায় টোকা দিয়ে তাকে ডাকলে। কিন্তু তার সাড়া দিতে ইচ্ছে হল

না। সে উঠে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকল। মুখ-হাত ধুয়ে মাথাটা পেতে দিলে কলের তলায়। ঠাণ্ডাজল বড় ভাল লাগল। ক্লান্তি যেন ধুয়ে যাচ্ছে। একেবারে স্নান সেরে নিতে ইচ্ছে হল তার। এসবের মধ্যেও কিন্তু প্রবীরের প্রশ্ন স্থির হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে যেন মাথা ঠেলে সব সরিয়ে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে। হঠাৎ মনে হল শেল-শক নয় তো ? শেল-শকে মানুষের স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া কথা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুনে আসছে পড়ে আসছে। এই ভাবনার মধ্যে সে যেন একটা মীমাংসা পেল। হ্যাঁ, তাই হবে। নিশ্চয় তাই। সকল অতীতকে সে ভুলে গেছে।

মনে মনেই সে প্রবীরের সঙ্গে কথা বললে, কল্পনায় ড্রাইভারটিকে সামনে দাঁড় করিয়ে ডাকলে, "প্রবীরবাবু !"

ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে সে বললে, "আমাকে বলছেন ? কিন্তু প্রবীর কে ? আমি তো—আমি তো—!"

"আমাকে চিনতে পারেন না ?"

"আপনাকে ? না তো ! না-না। মনে হচ্ছে দেখেছি—। কিন্তু। উঁহু, মনে পড়ছে না।"

ভাবতে গিয়ে কাঁদতে লাগল আরতি। কিন্তু কাঁদবারও সুযোগ নেই। অবসর নেই,—বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ছে। বোধ হয় সুধা বউদি। বাথরুম থেকেই সে সাড়া দিলে, "যাচ্ছি। একটু অপেক্ষা কর বউদি।"

স্নান সেরে কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে এল সে।

সুধা বউদি নয়,—দরজায় দাঁড়িয়ে বড় মামাতো ভাই পাতুদা।

মুহূর্তে দেহ-মনে সে আড়ষ্ট এবং শক্ত হয়ে উঠল। মনে হল কেন সে এ বাড়িতে এসেছে ? কেন সে অরুণের বাড়ি গেল না ? না। অরুণদের বাড়িও নয়—কেন সে কাল ফিরে যায় নি—শম্ভুবাবুদের সঙ্গে ?

পাতু আজ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। বললে, "যাক প্রাণে বেঁচেছিস এই ঢের। এখন একবার নীচে আসতে হবে তোকে।"

নিরুত্তর হয়েই দাঁড়িয়ে রইল আরতি।

পাতুই বললে, "একটা স্টেটমেণ্ট দিতে হবে।"

"স্টেটমেণ্ট ! কিসের স্টেটমেণ্ট ?"

"এই কপালিটোলার বাড়িতে কি অত্যাচার হয়েছে এই সব আর কি। লীডাররা এসে সব বসে আছেন। আমি খবর দিয়েছিলাম কাল রাত্রে।"

আরতি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। কি স্টেটমেণ্ট সে দেবে ? সেই নিষ্ঠুর অত্যাচার, মানুষের সেই বীভৎস পাশবিকতার নগ্ন প্রকাশ মনে পড়ে সে শিউরে উঠল। কপালিটোলার বাড়ি থেকে বাগবাজার নিকিরিপাড়ার পোড়া বস্তী—রাস্তার ধারে ফুলে-ওঠা সেই ছেলেটার শব—শোভাবাজারের বস্তীর কথা মনে পড়ছে। এক সম্প্রদায় পাশবিক আক্রোশে অপর

এক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করতেই—তারও পাশবিক সত্তা বেরিয়ে এসেছে মনের গুহা থেকে। দুটোতে কামড়া-কামড়ি করছে। অবশ্য হয়তো আক্রান্তের অন্য উপায় ছিল না আত্মরক্ষার। কিন্তু কি বীভৎস! কি ভয়ঙ্কর!

পাতুদা বললে, "বুঝতে পারছি মুখে সে বলতে পারাও যায় না! তা আমি একটা স্টেটমেণ্ট আন্দাজ করে লিখে এনেছি। কাল তোর বউদির কাছে তো সব শুনেছি। এইটে তুই সই করে দে।"

ঠিক এই মুহূর্তে এসে পড়লেন সুধা বউদি। নিচের তলা থেকেই তিনি উঠে এলেন। কপালে সারি সারি কুঞ্চন-রেখা। সিঁড়ির চাতাল থেকেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি ওটা? ওই কাগজটা?"

পাতুদা সুধা বউদিকে ভয় করে। সুধা বউদির এক আশ্চর্য সহ্যশক্তি আছে, যে সহ্যশক্তিতে সে স্বামীর সকল জীবন-ভ্রষ্টতাকে ক্ষমা করে, নিজের জন্য কিছু দাবী না করেই স্বামীর প্রতি এবং এই সংসারের প্রতি তার কর্তব্যগুলি নিখুঁতভাবে নিঃশব্দে করে যায়। সেই আশ্চর্য শক্তিকে পাতুদার ভয় না করে উপায় নেই। শ্বশুর থেকে চাকরটি পর্যন্ত এই মেয়েটির সেবায় স্নেহে পরিতৃপ্ত; তার গাম্ভীর্যের কাছে তারা অবনত। সুধা বউদি মনের ওজনে যেন বড় ভারী। এ সংসারের তৌলদাঁড়িতে তিনি যেদিকে চেপে বসে আছেন সেদিকটাই মাটিতে ঠেকে চেপে স্থির হয়ে রয়েছে, বাকী দিকটায় গোটা সংসারটাই যেন লঘু হয়ে শূন্যে ঝোলে এবং দোলে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর শয্যা আলাদা, শুধু তাই নয়—পাতুদা স্নান না করা পর্যন্ত তিনি তাঁকে ছুঁতে চান না। কোন দিন বেশী মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে, তাঁকে শুইয়ে মাথা ধুইয়ে বাতাস দিয়ে সুস্থ করে নিজে স্নান করে আপন শয্যায় শুয়ে পড়েন। এ মানুষকে ভয় না করে উপায় কি? সেই বউদি সিঁড়ির চাতাল থেকেই প্রশ্ন করে এসে যখন কাগজখানা টেনে নিলেন স্বামীর হাত থেকে, পাতুদা নিরীহভাবে শুধু বললেন, "ওটা স্টেটমেণ্ট একটা। মানে—।"

সে ব্যাখ্যা করবার পূর্বেই সুধা বউদি চোখ বুলিয়ে—কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, "লজ্জাও নেই, পৃথিবীতে কারুর উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাসও নেই। নিজে হাতে তুমি এই সব লিখেছ?"

পাতু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, "কেন? কাল রাত্রে তুমি সব বললে না?"

"কি বলেছি তোমাকে? আরতির এই দুর্ভাগ্য দুর্দশার কথা আমি বলেছি তোমাকে?"

"সেকথা মেয়েছেলেতে বলতে পারে না নিজের মুখে। ওটা অনুমান করে নিতে হয়।"

"অনুমান করে নিতে হয়! অনুমানের মুখে ঝাঁটা!" হঠাৎ চুপ করে গেলেন সুধা বউদি, তারপর অত্যন্ত ঘৃণাভরে বললেন, "তাই বা কেন? এ তোমার মত লোকের পক্ষেই সম্ভব। নিত্য রাত্রে যে লোক দুটোর সময় মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি আসে তার পক্ষে এই অনুমানই তো স্বাভাবিক। তোমাদের যদি লুঠতরাজের সাহস থাকত —সুযোগ পেতে—তবে তোমরা যে কি করতে সে বোধ হয় ভগবানও অনুমান করতে পারেন না। ধর্ম-বিশ্বাসী সব; ধর্মের জন্যে সমাজের জন্যে দরদ আজ উথলে উঠেছে। কি

হচ্ছে নিচে? কিসের জটলা সব? শুনলাম একজন গলাবাজী করছেন, দাঁতের জন্মে দাঁত নেব, চোখের জন্মে চোখ নেব; একটার জায়গায় দুটো নেব। এই তো কিছুদিন আগেও নেতাজীর ঝাণ্ডার তলায় হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যাবে বলে চেঁচাতে। আজ উল্টো গাইছ!"

পাতুদা চীৎকার করে উঠল, "সুধা! তোমার আস্পর্ধা বড় বেড়ে গেছে!"

সুধা বউদি বললেন, "আমার আস্পর্ধা চিরদিন। সে তোমায় গোড়ায় মারপিট করেও দেখেছ ভাঙতে পার নি। এতদিন পর চীৎকার করে ধমক দিয়ে কি আর দমাতে পার? কিন্তু তোমার এ আস্পর্ধা কেন বলতে পার? আরতিকে অপমান করতে এসেছ? যাও, নিচে যাও। সেখানে বসে বাঘ ভাল্লুক গণ্ডার যত পার মুখে মার, আমি চা খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি ওই নিচের যারা বসে গুলতানি করছে—তাদের সকলকেই চিনি—সব মুখে বাঘমারার দল। সকলকে অপমান করাই ওদের স্বভাব। কাল, অমনি, আরতিকে যারা উদ্ধার করে পৌছে দিতে এসেছিল—লাটু কোথা তাদের ধন্যবাদ দেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা না, তাদের অপমান করলে! আর হলও তেমনি ফল—লোকটা ড্রাইভার হলে কি হয়—এমন ধমক দিলে যে লাটুবাবু চমকে উঠলেন। যাও নিচে যাও। আয় আরতি।"

সুধা বউদি বাঁচিয়ে দিলেন তাকে। কিন্তু চোখের জল সে সম্বরণ করতে পারলে না। টপটপ করে চোখের জল ঝরে পড়ল এক মুহূর্তে। বউদি বললেন, "কাঁদিস নে। জীবনে এই বয়সে দুঃখ তো কম পাস নি, সহ্য তো অনেক করতে হয়েছে, করেছিস। এটুকুও সহ্য কর্। আমার দিকে তাকিয়ে দেখে কর্। তোর তো ভাই রে! আমার? ভেবে দেখ্।"

হাসলেন বউদি। সে হাসি আশ্চর্য, তারপর বললেন, "ঘেন্না! আয়!"

সারা সকালটাই সে প্রায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। দুটি ভিন্ন ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। একটি ওই ড্রাইভারটির—না, প্রবীরের; ও যে প্রবীর তাতে ওর আর সন্দেহ নেই। অন্য ভাবনা তার নিজের। আজ কোথায় গিয়ে অসঙ্কোচে স্বাধীনতার মধ্যে বাস করতে পারে? সেখানে থেকে সে প্রবীরের খোঁজ করতে পারবে; তার যে স্মৃতি হারিয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে পারবে। কাল—যুদ্ধ; তার জীবনটাকে তছনছ করে দিয়ে গেল। আজও তার জের মেটে নি। এই দুর্যোগ—এই গণ্ডগোলের মধ্যে কোথায় কোন্ চোরাবালি লুকানো আছে—কোথায় ধুলোর মধ্যে মেশানো আছে ফনিমনসার বিষাক্ত কাঁটা সে নির্ণয় করা তার পক্ষে যেন অসম্ভব মনে হচ্ছে। কোথায় ন্যায় কোথায় সত্য এ সে বুঝতে পারছে না। গত কয়েক বছর অরুণ তাকে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল একটা প্রচণ্ড আবর্তের মধ্যে। তার গতি সামনের দিকে না থাক, আবর্তের ঘূর্ণিপাক ছিল এমনই প্রবল এবং প্রচণ্ড যে তার মধ্যে কোন দিন মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে ভাববার অবকাশ পায় নি। আজ যেন সে আবর্তটাও চারিপাশে এবং তলদেশের গভীর এক কঠিন পাথরের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গতি হারাচ্ছে, আবর্তের পাক মন্দীভূত হয়ে আসছে। ওই আবর্তের কেন্দ্রের সঙ্গে তার

সংস্পর্শ কোন দিন ঘটে নি ; সে এমন কোন কাজ করে নি যার জন্য তাকে লজ্জিত হতে হয় ; সে সেবা-কাজ নিয়ে ছিল, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ; অবশ্য অরুণ তাকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু সে তার হাত ছাড়িয়ে সরে এসেছে ; তার সঙ্গে বারবার তার বিরোধ হয়েছে। প্রতিবারই অবশ্য মিটেছে কিন্তু তারই মধ্যে সে স্পষ্ট বুঝেছে অরুণ তাকে জীবনে ঠিক চাচ্ছে না—চাচ্ছে তাকে দলের মধ্যে। অরুণ কপট নয়—এই ক'বছরে সে নিজের সংসারে—সংসারের বাইরে সমাজে সর্বসংক্ষে অকপট স্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাড়ির সঙ্গে দলের মতের বিরোধ—সে বাড়ি ছেড়েছে, একলা একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। সংসারের জন্য মমতাও সে বোধ করে না। এতদূর পর্যন্ত তার সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও সে তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু একদিন তার মোহ নিদারুণ ভয়ে পরিণত হল, সেদিনের কথা সে কোনদিন ভুলবে না। অরুণ সেদিন তাকে তিরস্কার করতে এসেছিল, অরুণদের বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য : যোগাযোগ অন্য কিছু নয়—১৯৪২ সালের আন্দোলনে যারা জেলে গিয়েছিলেন—তাদেরই কয়েকজন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসে একটি বিশেষ নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ করেছিলেন ; উদ্যোক্তাদের প্রধান ছিলেন শচীন মিত্র। ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের অবিসম্বাদী নেতা। তখন অরুণদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল না। বিয়াল্লিশ সাল থেকে এই মতবিরোধ প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। শচীনবাবু তার কাছে এসেছিলেন—এই নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ নিয়ে। সে সম্মতি দেয় নি কিন্তু অসম্মতি জানিয়ে ফিরিয়ে দেয় নি, বলেছিল—ভেবে দেখব। বিচিত্র ঘটনা, ঠিক ঘণ্টাখানেক পরে অরুণ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল রুদ্র-মূর্তিতে।—"তুমি ওদের সঙ্গে অভিনয় করতে যাচ্ছ ?"

তার সে ভঙ্গি দেখে সেদিন এক মুহূর্তে তার চিত্ত তিক্ততায় ভরে উঠেছিল। বলেছিল, "তুমি শচীনবাবুদের কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ। আর কাদের কথা বলব ?"

"যদি যাই তাতে দোষ কি ?"

"দোষ কি ?"

"হ্যাঁ, দোষ কি ?"

"তোমার সঙ্গে আমাদের তাহলে কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

তারপরই বলেছিল, "তোমার মত অপরচুনিস্ট—কেরিয়ারিস্ট তাদের ধারাই এই।" অকস্মাৎ উগ্রতর হয়ে বলেছিল, "তোমাদের সমস্ত ফ্যামিলিটাই যে তাই। মামা, মামাতো ভাইরা, তোমার বাবাও ছিলেন তাই।"

সে চীৎকার করে উঠেছিল, "অরুণ!"

অরুণ তবু থামে নি—সে বলেই চলেছিল, "তোমাকে চিনত কে ? একটা পচা ঘরের বিলাসী মেয়ে ; কলেজের ছেলেরা নাম নিয়ে কুৎসিত হাসি-তামাশা করত ; অধ্যাপকেরা মুখমিচকে হাসতেন ;—"

সে আবার চীৎকার করে উঠেছিল, "অরুণ!"

অরুণ তবু থামে নি, "সুব্রত একটা গুণ্ডা, সে তোমাকে অপমান করেছিল; সমস্ত জেনেও I took pity on you—I gave you a chance—"

এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "এটা আমার বাড়ি অরুণ!"

"আমাকে বের করে দিতে চাও?"

"বলতে চাই আমারও সহ্যের একটা সীমা আছে। আমি গৃহস্থ বলে আগন্তুকের কাছে পিতৃনিন্দা শুনতে চাই নে।"

"ভাল, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এর ফলভোগ তুমি করবে। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই আর থাকবে না।"

বলেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

"কোনকালেই তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না।" বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

সেইদিন সেই মুহূর্তে সে কামনা করেছিল—এক সামরিক কর্মচারীর আকস্মিক আবির্ভাবের। স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে দীর্ঘক্ষণ। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। বারবার প্রশ্ন করেছিল—প্রবীর কোথায়? সে যদি আজ এই মুহূর্তে আসত!

কিন্তু অকস্মাৎ সে এ কোন্ মূর্তিতে এল? এ কি সে? সত্যই প্রবীর?

সুধা বউদির সামনেই সে বসেছিল, তিনি ভাঁড়ার বের করে দিচ্ছিলেন—সে বসেছিল মেঝেতে একখানা পিঁড়ির উপর। কখন যে তার চোখে জল গড়িয়ে এসেছে—তা তার ঠিক খেয়াল হয় নি। হলে চোখের জলে সে বাঁধ দিত, অন্তত মুছে ফেলত। বউদিই কখন তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল দেখে ফেলেছিলেন। কাছে এসে বলেছিলেন, "এখনও কাঁদছিস!"

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেললে আরতি। এবং হাসতে চেষ্টা করলে।

বউদি বললেন, "তুই এখানে স্বস্তি-বোধ করছিস নে, না?"

চুপ করে রইল আরতি। কি বলবে সে? সে কথা সত্য। কিন্তু তার চেয়েও যে কথা তার এই চোখের জল এবং বিষণ্ণ উদাসীনতার হেতু—তাও যে বলবার নয়।

ঠিক এই সময়েই সুধা বউদির বাপের বাড়ি থেকে একটি বাচ্চা চাকর এসে সুধা বউদিকে মৃদুস্বরে বললে, "একখানা চিঠি দিয়েছেন।"

বউদি বিচিত্র মানুষ। হেসে ফেলে বললেন, "মর মুখপোড়া, তার এত ফিস্‌ফিসিনি কিসের। বাপের বাড়ির চিঠি, প্রেম-পত্তর তো নয়। হতভাগা!"

"না। অরুণবাবু দিয়েছেন।"

"অ! সে বুঝি পার্কসার্কাস থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে এসে বাড়ি ঢুকেছে? কই দে।"

চিঠিখানা বের করে দিতেই বউদি বললেন, "তোর চিঠি। তাই এত চুপিচুপি! তা তুই

দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি? উত্তর চাই?"

"হ্যাঁ।"

আরতি চিঠিখানা খুলে পড়লে। অরুণ লিখেছে—সে গিয়েছিল কপালিটোলার বাড়িতে। সেখান থেকে অনেক খুঁজে বাগবাজার পর্যন্ত। সেখানেই খবর পেয়েছে আরতি এখানে। তাকেও বাধ্য হয়ে পার্কসার্কাস ছেড়ে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু এ বাড়িতে তার আসা সম্ভবপর নয়। তাই আরতিকে অনুরোধ করছে তার সঙ্গে সে যেন আজই দেখা করে। এখন নিরাপদে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সময় নয়। অনেক কাজ। এই দাঙ্গা বন্ধ করা—হিন্দু-মুসলমানের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনাই প্রথম কাজ। মানুষ এরই মধ্যে লড়তে শিখে গেছে। এই দুটো ফাইটিং ফোর্সকে এক করতে পারলে কি বিরাট বিপ্লবী শক্তির সৃষ্টি হবে কল্পনা কর, মনে জোর পাবে, সব অবসাদ কেটে যাবে। এই জন্তে হিন্দু-মুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক প্রভৃতি গুণীদের নিয়ে একটা মিছিল বের করবার চেষ্টা করছি আমরা। এই মিছিলের কাজে তোমাকে যোগ দিতেই হবে। অর্গানাইজ করতে হবে, গান গাইতে হবে। বিকেল তিনটের সময় তুমি এস—তোমার জন্তে অপেক্ষা করব। চারটের সময় ···র বাড়িতে মিটিং।

এর উত্তর স্থির করতে তার এক মুহূর্ত বিলম্ব হল না। না। সে বউদিকে বললে, "একটা কলম কি পেন্সিল আছে বউদি?"

বউদি ভাঁড়ারের তাক থেকে পসন্দ সংসার-খরচের খাতা খুলে একটা কলম বের করে দিলেন, "এই নে। কি লিখেছে সে বাউণ্ডুলে?"

আরতি চিঠিখানার পিঠেই লিখে দিলে—'না'। ছেলেটার হাতে দিয়ে বললে, "এই নে।" ছেলেটা চলে গেলে সে উঠে বললে, "ওরা মিছিল বার করবে।"

"মিছিল?"

"হ্যাঁ। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্তে।"

বউদি বললেন, "মরণ! তা তুই যাচ্ছিস নাকি? তোর তো চড়কের পিঠ, গাজনের ঢাক বাজলেই নাচে।"

হেসে আরতি বললে, "না। আর নাচে না।"

"বাঁচলাম। কিন্তু উঠলি কেন, লড়াইয়ের ঘোড়ার মত?"

"একটা টেলিফোন করব।"

"কাকে?"

"যাঁরা আমায় উদ্ধার করেছেন—ওই বোসেদের ওখানে। ব্যাঙ্কেও টেলিফোন করতে হবে। চেক-বই তো গেছে।"

"বোস। বাইরের ঘরে তো মুখে বাঘ-গণ্ডার বধ হচ্ছে। ওদের শেষ হোক। তারপর।"

বাইরের ঘরে তখন সত্যই বিপুল উত্তেজনা জমে উঠেছে। কোথায় কি নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছে তার বর্ণনা চলেছে। চিৎপুর রোডে কলুটোলা স্ট্রীটে কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসকের বাড়িতে কতজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সে মৃতদেহগুলির কোথায় কি ক্ষতচিহ্ন ছিল—

—কতজন মেয়েকে পাওয়া যায় নি—তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন একজন। শোভাবাজারে কি ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছিল এক গুণ্ডা, তা কেমন করে ব্যর্থ হয়েছে তার আলোচনা চলল তারপর। শোভাবাজার প্রতীক্ষা করেছিল সশস্ত্র পাঠানদের—নৌকা বা স্টীমলঞ্চ করে তাদের এসে নামবার কথা গঙ্গার ঘাটে ; কিন্তু হিন্দুদের চমকপ্রদ অভ্যুত্থানের ফলে তা সম্ভবপর হয় নি। এবং সর্বশেষে সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী করা হল—গান্ধীজিকে। তার সঙ্গে কংগ্রেসকে। তারপর সাম্যবাদী দলকে। একজন বললেন—এখন উচিত সমস্ত জাতের এক হয়ে—এই এদের বিচার করা, রাস্তার ধারে ফাঁসী-কাঠ পুঁতে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত।

দুপুর বেলা সে টেলিফোন করলে। তখন তার মামাতো ভাই দুজনেই ঘুমিয়েছে। ফোন করলে বাগবাজারে কেশববাবুর ওখানে। বললে, "হ্যালো—এটা কি কেশব বোস মশায়দের বাড়ি ?"

"হ্যাঁ। আমিই কেশববাবু, কথা বলছি। আপনি কে ?"

"আমার নাম আরতি সেন। কপালিটোলার ···নং বাড়ি থেকে আপনারাই আমাকে রেস্ক্যু করেছিলেন। কাল আমি বালীগঞ্জে মামার বাড়ি এসেছি। শম্ভুবাবু বলে আপনাদের একজন আর রতন বলে একজন—"

"নমস্কার মিস্ সেন। ভাল আছেন তো ?"

"নমস্কার। আমি ভালই আছি। আপনাদের কাছে আমার অনেক ঋণ অনেক কৃতজ্ঞতা—"

"না—না—না। এসব আপনি কি বলছেন মিস্ সেন। এ তো মানুষের কর্তব্য। আর এ কতটুকু !"

"অনেকটুকু। যারা বিপদ থেকে ত্রাণ পেয়েছে আপনাদের সাহায্যে—তারাই বলতে পারে—এ কত বিপুল—এর কত ওজন। কিন্তু মুখে ধন্যবাদ দিয়ে শোধ করবার জন্যে আমি টেলিফোন করছি নে। আমি একটা খবর জানতে চাই। রতন বলে যে ড্রাইভারটি কাল—"

কথার উপর কথা বলে কেশববাবু বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিস্ সেন। অত্যন্ত দুঃখিত। শুনেছি আমি সব। কাল রতন মেজাজ ঠিক রাখতে পারে নি। একটা অত্যন্ত আনপ্লেজাণ্ট ঘটনা ঘটে গেছে।"

"আমি-আমি—।" কি বলবে ভেবে পেলে না। কিসের জন্য সে তার ঠিকানা জানতে চায় ? কি করে বলবে—'যে আপনারা কি জানেন—ওর সত্য পরিচয় কি ?'

"বলুন ?"

"আচ্ছা, উনি কি আগে আর্মিতে—মানে যুদ্ধে গিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ, তা গিয়েছিলেন—এই কথা কেউ কেউ বলে শুনেছি। মেজাজ বোধ হয় সেই থেকেই ওর খারাপ। তবে আমরা ওর হয়ে আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি। ও অবশ্য এমন করে না। অত্যন্ত ভদ্র। মানে আচারে-ব্যবহারে অত্যন্ত ডিগ্‌নিফায়েড। কি রকম হয়ে গেছে আর কি !"

আর কী বলবে এর পর? আবার চুপ করে গেল আরতি।

ওদিক থেকে বিনীত মার্জনা চাওয়ার একটু হাসির আওয়াজের সঙ্গে কেশববাবু বললেন, "আচ্ছা—তা হলে ছেড়ে দিই?"

এবার সব সঙ্কোচ ঠেলে আরতি বললে, "ওঁর ঠিকানাটা দিতে পারেন? আমি আসবার সময় জায়গাটা দেখেছি, কিন্তু নম্বরটা···আমার অন্য প্রয়োজন আছে। খুব জরুরী। আপনি যে-জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনি ভাববেন না। নম্বরটা বলুন আমাকে।"

"নম্বর তো জানি না। তবে ওর ওই বস্তির ওখানে গিয়ে রতন মিস্ত্রির বাড়ি বললে দেখিয়ে দেবে। ওকে সকলেই চেনে। কিন্তু সন্ধ্যের আগে তো বাড়িতে পাবেন না ওকে। তবে বাড়িতে ওর মা আছেন, বউ আছে, তাদের বললে ওরা পাঠিয়ে দেবে। আমরা বলে দেব? এখানে তো এখন আমাদের সঙ্গে এই বিপদে কাজ করছে।"

চমকে উঠল আরতি। মা-বউ! তবে?

এই মুহূর্তে ওদিক থেকে আবার কথা এল, "এই যে রতন এসেছে। কথা বলুন।" এবং তার পরেই অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলে, "তোমাকে ডাকছেন রতন, টেলিফোনে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ। সেই ভদ্রমহিলা। কপালিটোলার বাড়ির—"

"বলে দিন—ওঁদের যা খুশি করুন। আমি তার কী বলব?"

"না-না। উনি বলছেন সেজন্যে নয়। অত্যন্ত জরুরী বলছেন। শোনো না কী বলছেন। খুব ব্যগ্র দেখলাম। ধরো।"

"হ্যালো!" সেই ভরাট কণ্ঠস্বর। অনুচ্চ হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

আরতি একেবারেই বললে, "প্রবীর।"

এক মুহূর্ত বিলম্ব। উত্তরের প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে একমুহূর্ত দেরি। তারপরই উত্তর এল, "আমার পুরো নাম রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য।"

"না। প্রবীর। রতন ভট্টাচার্য কে তা জানি না, কিন্তু শেয়ালে কামড়ানোর সেই দাগ—"

"মাফ করবেন। আমার অনেক কাজ, আমার সময় নেই।"

টেলিফোনটা খট করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল। রিসিভার নামিয়ে দিয়েছে সে।

আরতির সন্দেহ আরও দৃঢ় হল—এ সেই প্রবীর।

কিন্তু মা-বউ? মা তো তার কলেজ-জীবনের আগে মারা গেছেন। মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর মোটরমিস্ত্রী হয়ে, কেমন বউকে নিয়ে বস্তিতে বাস করছে? সব ঝাপসা হয়ে গেল। যেন একখানা সদ্য আঁকা ছবির উপর হাত দিয়ে নেড়ে ঘেঁটে সব লেপে অস্পষ্ট দুর্বোধ্য করে দিল।

মূঢ় বিস্ময়ে উত্তরহীন শত প্রশ্নে জর্জর হয়ে সে সেদিন সারারাত জেগে বসে রইল। তবু তার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রবীর। কিন্তু এ তার স্মৃতিবিভ্রম, না অন্য কিছু?

সাত

সেদিন প্রবল বর্ষণ। প্রচণ্ড। হয়তো পঞ্চাশ একশো বছরে একসঙ্গে এত বৃষ্টি কলকাতা শহরে হয় নি। পথ ডুবছে ঘাট ডুবছে, ক্রমে ক্রমে বাড়ির মধ্যে জল ঢুকছে। বৃষ্টির তবু বিরাম নেই। কলকাতার পথে পথে গলিতে গলিতে আবর্জনার স্তূপ জমেছিল। এই হানা-হানির মধ্যে কর্পোরেশনের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ পঙ্গু হয়েছিল। শুধু তাই কেন? পথে গ্যাসবাতি জলে নি, ইলেকট্রিক জলেছে সুইচ টিপে জালানোর সুযোগে। পোড়া বস্তী ধোঁয়াচ্ছিল। রক্তের দাগে নানান স্থান রক্তাক্ত হয়েছিল; পচে দুর্গন্ধ উঠছিল। হিন্দু-মুসলমানের এলাকার সংযোগস্থলগুলিই লাল ইশারার এলাকা; সেখানে অলিগলির মোড়ে মোড়ে হিংস্র মানুষের উঁকি-মারামারি চলছিল অবিরাম। আজ এই মুষলধারায় বর্ষণের মধ্যে সব অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণের জন্য।

বউদি বললেন, "ভগবান সব ধুয়ে মুছে দিচ্ছেন। মানুষের লজ্জা ঢাকছেন। লজ্জাও নেই কিনা। নিজে গড়েছেন। তার চেয়ে গঙ্গাসাগরের ঢেউ এনে সব ডুবিয়ে চুবিয়ে মারত তো বুঝতাম ভগবান! বিচার!"

আরতি জানালার ধারে বসে এই বর্ষণ দেখছিল আর ভাবছিল। তার মনে পড়ছিল বিয়াল্লিশ সালের সেই সাইক্লোনের দিনের সেই বর্ষণের কথা। প্রবীর এসেছিল গামবুট পরে—খিচুড়ির উপকরণ নিয়ে।

নিচে ক'দিন ধরেই সেই এক আলোচনা চলেছে। পাতুদা আজ আর শুধু বাক্যবীর নেই; এর আগে যুদ্ধের আমলে যা-ই করে থাক্—এক বিন্দুকে বিপুল সিন্ধু বলে যতই প্রচার করে থাক, এখন ঠিক আর তা নেই। আজ একটা কিছু করবে বা করতে চাচ্ছে। আর-এস-এস-এর লোকজন আসছে যাচ্ছে। পাশের বাড়ি কাদের অর্থাৎ নতুন ভাড়াটে কারা তা ঠিক জানে না, তবে আলোচনা শুনে মনে হয় ওরা হয়তো কংগ্রেসী। ওদের কথার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গার অপরাধ বিচারে নিখুঁত ইতিহাস আলোচনা চলছে। সেই প্রথম আমল থেকে এ পর্যন্ত থাকে থাকে এদিকে ওদিকে অপরাধের ফাইল পরের পর খোলা হচ্ছে। মুসলিম লীগকে শুধু ষোল আনার পরিবর্তে আঠারো আনা অপরাধে দায়ী করা হচ্ছে। এই কারণেই মনে হয় এরা কংগ্রেসী। ইতিহাস কম্যুনিস্টদের সব ঘটনার আদি অকৃত্রিম পটভূমি। সুতরাং কম্যুনিস্ট হতে পারত কিন্তু তা নয় এই কারণে যে তাহলে ওই আঠারো আনা দায়ের ন-আনা কংগ্রেসের উপরে নিশ্চয় চাপাত।

বিচারে দোষ দায় যার হোক, এ দাঙ্গায়—কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মুসলমান হটেছে এবং হেরেছে। আক্রমণ তারাই করেছিল এ সত্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণার মধ্যে স্বীকৃত। তাদের প্রত্যাশা পরিকল্পনা যাই থাক—সব ব্যর্থ হয়েছে। পাশের বাড়িতে কাল কেউ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—একজন মুসলিম লীগ এম-এল-এ বাড়ি পৌঁছেছেন—শবের মত বিবর্ণ চেহারা নিয়ে। রাজনীতি থেকে তিনি চিরদিনের মত সংস্রব ছিন্ন করছেন।

প্রতিজ্ঞা করেছেন।

আর একজন বললেন—চিরদিনের মধ্যে এই কয়েকটা বছর স্বতন্ত্র। এর মধ্যে কেউ একা বসে আপনার চিন্তা বা শুধু আপনার ভাল-মন্দ নিয়ে থাকতে পারে না। অসম্ভব।

কথাটা বারেকের জন্য আলোড়ন তুলেছিল আরতির মনে। নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল—তাই তো, সে কেমন করে ভাবনাহীন এক দিগদিগন্তহীন সমুদ্রতুল্য বিষণ্ণ উদাসীনতার মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে প্রবীরের ভাবনা—রতন সম্পর্কে প্রশ্ন তার স্তিমিত হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে ভুল—এ তার ভুল। হয়তো ভুল না হয়েও ভুল। মা-বউ নিয়ে সে সংসার করছে। ইঞ্জিনীয়ার নয়—মোটর ড্রাইভার। স্মৃতি-বিভ্রান্ত মানুষ ফিরে এসে বিবাহ করেছে, সংসার পেতেছে; মা যিনি তিনি ওর মা নন, ওই বউটির মা সুতরাং ভুল না হয়েও ভুল। নিজের দিক থেকে হিসেব করেছে। দেখেছে ভুল এখানে। সে মনে করেছিল প্রবীরকে সে ভুলে গেছে। সে জানতে পারে নি—বুঝতে পারে নি—তার জীবনের কামনা বাসনা আশা কতখানি প্রবীরকে জড়িয়ে ছিল। সে কাজ নিয়ে মেতেছিল—সে শুধু ছোটছেলের দিনের বেলার খেলার আসরের মত। এই ভুলগুলিই তার আসল ভুল। তাই আজ অকস্মাৎ এই দাঙ্গার মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যায় আপনজন-হারা ছোট্ট মেয়ের মত অকস্মাৎ নিতান্ত একলা হয়ে গেছে।

আজ প্রবীরকে ডেকে প্রশ্ন করতে যাওয়ারও কোন মানে হয় না। আর এই বিপুল জনতার স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়ারও কোন যোগ খুঁজে পাচ্ছে না। সে যেন তীরের কাছে ঘাসের সঙ্গে আটকে গেছে। জলস্রোত তীরবেগে কলকল শব্দে ছুটে চলেছে। সংসারের মধ্যে ওই ভদ্রলোক যাকে অসম্ভব বললেন—সে সেই অসম্ভব। তার মনের অবস্থা কেউ বুঝতে পারবে না। সে-ও বোধ হয় বোঝাতে পারবে না। যে বিধবার একমাত্র পুত্র গেছে অকস্মাৎ—তার মন যেমন সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্তব্ধ গতিহীন; অভিসম্পাত নেই, আক্ষেপ নেই; আবার বিপ্লবের মুখে সংঘর্ষের মুখে—ঢালের নদীর মত জীবনের ধাবমানতা—তার সঙ্গেও তটভূমির গোষ্পদের জলের মত কোন যোগ নেই—ঠিক তেমনি।

কখন বউদি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "বৃষ্টি দেখছিস?"

সে বললে, "হ্যাঁ।"

বউদি হেসে বললেন, "নবীন মেঘের সুর লেগেছে মনে-ভাবনায়?"

আরতি বললে, "তুমিও কাব্য কর বউদি?"

"করি নে। তবে ছিল বই কি মনে রে। আজ তোর চুপ ক'রে বসে থাকা দেখে চাপা কাব্য উথলে উঠল। হাসির ছলটা পেলাম। ক'দিন থেকেই ছলছুতোটা খুঁজছিলাম। তোর কি হয়েছে বল তো? তুই অমন হয়ে গেলি কেন? সেদিন গঙ্গাজল মাথায় ঢালতে বলতেই বলেছিলি না বউদি দরকার নেই। তোর গল্প শুনেছি; অবিশ্বাসের কিছু পাই নি; আর তুই আমার কাছে কিছু লুকোস নি—লুকনো তোর স্বভাব নয় এও জানি। তবে তুই এমনি ক'রে আছিস কেন? তুই সর্বদা যেন কোন দুঃখের মধ্যে ডুবে আছিস। তোকে একসময় ডেঁপো মেয়ে বলেছি তোর বক্তৃতার বহর শুনে; তোর হল কি যে তুই এমন বোবা হয়ে

গেলি।"

আরতি চুপ করেই রইল, ভাবছিল কি বলবে।

সুধা আবার প্রশ্ন করলেন, "আরতি?"

আরতি বললে, "হয়েছে বউদি পরে বলব। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছি।" আবার একটু ভেবে নিয়ে বললে, "নিজের যে কথাটা নিজে জানতাম না, সেই কথাটা সেই ধাক্কায় হঠাৎ জানিয়ে দিলে। একেবারে যেন ফকীর হয়ে গেলাম বউদি।"

"অরুণের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—অথচ মনে হচ্ছে—"

"দূর! অরুণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

"তবে?"

"বলেছি তো পরে বলব।" তারপর হেসে বললে, "ভেবেছিলাম আজ ব্যাঙ্কে যাব, চেকবই নিয়ে আসব। ওরা যেতে লিখেছে কিন্তু এ বৃষ্টিতে তো হয় না। বসে বসে বৃষ্টি দেখছি। আর ভাবছি। কাটা ঘুড়ির মত গাছের ডালে আটকে গেছে বউদি। না পাচ্ছি মাটি, না পাচ্ছি আকাশ।"

সেদিন ১লা সেপ্টেম্বর।

দাঙ্গা ধিকিধিকি আগুনের মত জলছেই, জলছেই, এই নিভছে এই দপ করে অন্যত্র জলছে। মানুষ বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক না ফিরলেই আর ফিরবে না—এইটেই শতকরা নব্বুই ভাগ নিশ্চিত। বিশেষ ক'রে হিন্দু-মুসলমান এলাকার সংযোগস্থল যাকে পার হ'তে হবে। রাত্রে এখনও বন্দেমাতরম্ জয়হিন্দ ধ্বনি ওঠে। অন্যদিকে ধ্বনি ওঠে—আল্লাহো আকবর, নারায়ে তকদীর! রাত্রে বস্তি জলে। বস্তিতে হানা পড়ে। মফস্বলে এ আগুন ছড়াচ্ছে।

অরুণদের মিছিল ঘুরে এসেছে। বড় বড় বক্তৃতা হয়েছে। বাংলার লাটসাহেব থেকে মন্ত্রী থেকে নাম-করা রাজনৈতিক নেতারা রেডিয়োতে বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু সব খবর আরতির মনে নেই। শোনেও নি সব। সে শুধুই ভাবছে। 'মা, বউ'! এরপর কি হবে খোঁজ করে? কি প্রয়োজন তার ওকে মনে করিয়ে দিয়ে এবং ওই বউ আর বউএর মাকে সত্য কথা বলে? স্মৃতি-ভ্রষ্ট মোটর ড্রাইভারকে,—তুমি ড্রাইভার নও, তুমি ইঞ্জিনীয়ার; তুমি রতন বা রত্নেশ্বর নও, তুমি প্রবীর—এ বলে কি হবে? জীবনটা তার শুধু অশান্ত প্রশ্নে ভরে উঠবে। আর ওই মা-বউ তার কাছ থেকে সভয়ে সরে যাবে; সহজ সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন ব্যাঙ্কে গিয়ে শোভাবাজারের পথ থেকে সে এই ভেবেই ফিরে এসেছে। যে হারিয়েছে সে হারাক। কি করবে? তাকে ভুলতে হবে। ভুলে যাওয়া মানুষের স্বভাব-ধর্ম। সংকল্প করে এসেছিল মনকে বাঁধবে সে। মনকে বেঁধে আবার কাজে নামবে। তবে অরুণের সঙ্গে বা আর কারুর সঙ্গে মিছিলের কাজে নয়! নিজের জন্য একটি নির্দিষ্ট কাজ। সে দিক দিয়ে ভাববার সময় হয়েছে তার। কপালিটোলায় বাড়ি নামেই রইল, কাজে ও বাড়ি গেছে। ও বাড়িতে আর বাস করবার কল্পনা করতে পারে না সে। বাংলাদেশে মুসলমান গরিষ্ঠতাও থাকবে—রাষ্ট্রশক্তিও থাকবে। ও-পাড়ায় মুসলমান প্রাধান্য; ওরাই ঢুকে বসে থাকবে।

ভাড়াও দেবে না, বিক্রীও হবে না। হ'লে নাম মূল্যে। পার্কসার্কাসে এরই মধ্যে বাড়ি বিক্রী শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ তার সম্মুখে প্রশ্নের ভঙ্গি নিচ্ছে। ব্যাঙ্কে মজুত বিশেষ নেই। তাকে কিছু করতে হবে। কি করবে? কি করবে তা জানে না কিন্তু যাই করুক কলকাতার বাইরে। এখানে প্রবীর আর রতনের প্রশ্ন কখন যে তাকে চঞ্চল অধীর ক'রে তুলবে সে তা বলতে পারে না। কখন কোন অতি ব্যস্ত মুহূর্তে বিচিত্রভাবে জেগে উঠে সব পণ্ড করে দেবে।

তাই দিচ্ছে। এ ক'দিন ধরে তাই হচ্ছে। হঠাৎ কৌতূহল বিস্ময় নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খবরের কাগজে 'চাকরি খালি'র বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ে যায় 'হারানো-নিরুদ্দেশ' কলমটার উপর। 'লম্বায় সাড়ে পাঁচফুট, বাঁ চোখের ভুরুর উপর লম্বা কাটা দাগ—' আর পড়তে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় প্রবীরের সেই হাতের দাগ। 'রং অসাধারণ ফরসা, মাথার চুল কটা, মাথায় ছিট আছে'—অমনি মনে পড়ে প্রবীরকে স্মৃতিভ্রষ্ট প্রবীর।

সেদিন ১লা সেপ্টেম্বর ওই বিজ্ঞাপনটা ছিল। তার মনে পড়ে গেল স্মৃতিভ্রষ্ট প্রবীরকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত একটা নতুন প্রশ্ন জাগল তার মনে। স্মৃতিভ্রষ্ট? স্মৃতিভ্রষ্ট যদি তবে সেদিন কথা এমনভাবে কইলে কেন? সুরে অর্থে যেন কি একটা ছিল।—হ্যাঁ কি একটা ছিল; সে যেন কথা কইতে চাইলে না। লাটু তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল—তাতে তার রাগ হওয়াই উচিত কিন্তু—। এ চিন্তা শেষ হবার পূর্বেই আর একটা নতুন প্রশ্ন জাগল। স্মৃতিভ্রষ্ট? স্মৃতিভ্রষ্ট তো হাতে শেয়ালের কামড়ের দাগটার স্মৃতি তার মনে থাকল কি করে? কি করে? প্রশ্নটা উচ্চ চীৎকারে তার অন্তর থেকে কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল; 'কি' শব্দটা বেরিয়েও এল, 'কি' বলে সে বিষাক্তকীটের দংশনে চকিত চমকিত ব্যক্তির মত উঠে দাঁড়াল। ঘরের ওপাশের আলমারিটার গায়ের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে থমকে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে সম্বিৎ ফিরল তার। কি করছে সে? এ যে পাতুদাদের বাড়ি। অনেকক্ষণ জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। চিন্তা আর কিছু নয়; যাবে? অথবা—যাবে না? গিয়ে ফল কি? যাবারই বা অধিকার কি?

আছে বৈকি অধিকার। সে তো তাকে ভালবেসেছিল। তাকে 'রতি' বলে ডাকবার জন্যে এসেছিল। সে তো তার পত্রেই সে লিখেছিল। বলবার অবকাশ হয় নি বা তার সেদিনের সঙ্গীদের দেখে বলে নি; সে দায়িত্ব তার নয়। মুখের কথায় প্রকাশ করে নি বলেই তার অন্তরের সত্য মিথ্যা হয়ে গেছে! আরতি তার কত সন্ধান করেছে। কত রাত্রি জেগে তার কথা ভেবেছে। আজও তাকে ভুলতে পারে নি, পৃথিবীর সঙ্গে সংস্রবহীন হয়ে নিজের মধ্যে ডুব দেবার সে অবকাশ পায় নি এ কথা ঠিক। তাতেই কি তার দাবী মিথ্যা হয়ে যাবে?

দাবী?!

ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। যে বৈচিত্র্য সুধাবউদির হাসিতেও ফুটে ওঠে পাতুদার প্রসঙ্গে। দাবী তার গেছে। বহুচারী পুরুষেরা এমনি করেই চিরকাল মেয়েদের দাবী—আইনের ফাঁকে, গায়ের জোরে বাতিল করে দেয়। তার দাবী নাকচ করে দেবার

অধিকার নিয়ে এসে দাঁড়াবে তার বউ! বলবে—'তোমার দাবী? বেহায়া কোথাকার? সাতপাক জড়িয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, মন্তর পড়ে। আর ও বলে—দাবী!'

কিন্তু সে বউ কেমন? যাকে দেখে ভুলে ইঞ্জিনীয়ার প্রবীর আজ মোটর ড্রাইভার রতন হল—সে কেমন? রূপ ছাড়া দেহ ছাড়া তার কি থাকতে পারে?

সে এবার অধীর হয়ে উঠল। সে যাবে। সে একবার দেখবে। আর একবার প্রবীরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবে—কেন সে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে? আর কেন সে এমন করে মোটর-মিস্ত্রী সেজে আছে? কেন?

যাবে সে। বস্তিটা সে চেনে। কেশববাবু বলেছিলেন—যে কোন লোককে বললেই রতন মিস্ত্রীর বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

শোভাবাজার বস্তিতে এসে সে দাঁড়াল। হাবু গুণ্ডার বস্তিটার পোড়া দাগ সেদিনের প্রবল বর্ষণের পরেও শুকিয়ে-যাওয়া ক্ষতের উপর কালো মড়মড়ির মত দেখাচ্ছে। প্রবীরের হাতের দাগের মত। একদিন দেখলেও জায়গাটা চিনতে দেরি হল না।

সে দাঁড়াতেই দশ-বারো জন লোক বেরিয়ে এসে দূরে দূরে দাঁড়াল। তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। অপরিচিত আগন্তুককে এই দাঙ্গায় কেউ বিশ্বাস করে না। নানান বিচিত্র সন্দেহ! সরকারী অর্থাৎ লীগ সরকারের গুপ্তচর! হয়তো আর কিছু!

অনেকগুলো ছেলে বরং কাছে এল। একজন বললে, "কি চাই আপনার?"

"রতন ভটচাজ মোটর মেকানিকের বাড়িটা কোথায় বলতে পার?"

"রতনদা? রতনদাকে খুঁজছে বটুদা!" কথাটা বললে বয়স্কদের—যারা দূরে অপেক্ষা করছিল।

"কি দরকার আপনার? গাড়ি মেরামত বুঝি?" এগিয়ে এল বটু।

আরতি বেঁচে গেল কৈফিয়তটা পেয়ে। সে বললে, "হ্যাঁ।"

বটু বললে, "সে তো এখন বাড়ি নেই। কাজে বেরিয়েছে।"

"তার বাড়িটা কোথায়?"

"বাড়ি তো ওইটে। ওই যে। এই কেষ্ট তুই যা না—দেখিয়ে দে। তুই হুঁকোর ভাই,—হুঁকো তো মোটরের কাজ করে। তোকে কিছু বলবে না।"

বাচ্চা একটা ছেলে—হুঁকোর ভাই কেষ্ট। সে সঙ্গে যেতে যেতেই বললে, "রতনদা'র মা ভারি গাল দেয় কেউ ডাকলে। রতনদা'র বউ খুব সুন্দর কিনা তাই ভাবে—।" ফিক করে হেসে ফেললে সে।

"খুব সুন্দরী?"

"খুব। রাজকন্যার মত। রতনদা খুব ভালবাসে বউকে। ওই ওইটে। কড়া নেড়ে ডাকুন।"

প্রকাণ্ড একটা লম্বা জায়গার উপর একটানা টিনের দেওয়াল, টিনের চাল, লম্বা গুদামের মত একটা বস্তি। টিনের দেওয়ালে সারি সারি জানালা, মধ্যে মধ্যে দরজা। দশ-বারোটা দরজা, খানিকটা পর পর। আরতি বললে, "তুমিই একটু ডাক না।"

কণ্ঠে বললে, "আপনি ডাকুন। রতনদা তো নেই। সে তো কাজে গিয়েছে। বললাম তো ওর মা কানা, ভারী বজ্জাত। ডাকিনীর মত গালাগাল করে। কড়া নেড়ে ডাকুন। বাবা; ওই জন্যেই ওই উঠোনে আর কে-উ থাকে না। মায়ের জন্যে রতনদাকে সবটাই ভাড়া নিতে হয়েছে। তবে রতনদার বউ খুব ভালো। ডাকুন।"

কড়া নাড়লে আরতি। একটা তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণু নারীকণ্ঠের আওয়াজ উঠল, "কে-রে? কোন্ ল্যাংড়া? কি চাই? মস্করা—না?"

কটু বাক্যের জন্যে প্রস্তুত থাকলেও—একবার কড়া নাড়ায় এতগুলি তীক্ষ্ণ বাক্য শুনবে —আরতি এ প্রত্যাশা করে নি, সে একটু দমে গেল। তবুও বললে, "আমি রতনবাবুকে চাই।"

"মেয়েছেলে? কোন মেয়েছেলেকে রতনের আমার দরকার নেই।"

"আছে। কাজ আছে আমার। জরুরী কাজ। খুব জরুরী।"

একটি মেয়ের মুখ উঁকি মারলে এবার। চকিতের জন্য। কিন্তু সেই চকিত দেখার মধ্যে তাকে যতটুকু দেখা গেল, তাতেই চমকে উঠল আরতি।

এ কী রঙ! এ কী চোখ! আশ্চর্য দৃষ্টি! শান্ত প্রসন্ন নীলাভ দুটি গোধূলি-তারার মত! রঙ টকটকে ফরসা বলে ঠিক মনে হল না, কিন্তু অপরূপ মাধুরী! এই বউ?

তখন ভিতর থেকে বউটি বলছিল, "কোন ভাল ঘরের বাবু মেয়ে মা!"

"ভাল ঘরের বাবু মেয়ে?"

"বোধ হয় গাড়িটাড়ি খারাপ হয়েছে বড় রাস্তায়, কেউ বলেছে, তোমার ছেলের কথা।"

"বলে দাও, সে বাড়িতে নাই। ওই সেই শ্যামবাজারের দাক্তার আপিস দেখতে বল।"

আরতি বললে, "আমি অপেক্ষা করব। দেখা আমাকে করতেই হবে।"

এবার বউটি সামনে এসে দাঁড়াল। মুগ্ধ হয়ে গেল আরতি। এত রূপ! এত মাধুরী! এত প্রসন্নতা! প্রসন্নমুখে স্নিগ্ধ হেসে সে বলল, "আসুন।"

নিতান্তই বস্তি। ছোট একটুকরো উঠানের দুপাশে ঘর—অন্য দুপাশে একটুকরো করে টিনের চালা এবং একটুকরো ঘর। রান্নার ব্যবস্থা সেখানে।

"কোথায় বসবেন এখানে? আমাদের এই ঘরে—?"

"ঘরেই বসব!" বউটির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে সে তখনও চেয়ে ছিল। মেয়েটি বয়সে তার থেকে ছোট। কুড়িও এখনো হয় নি।

ওপাশে ঘরের দরজায় বসেছিল এক বৃদ্ধা। সাদা ঘোলাটে চোখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল—কী বলছে বউ ফিসফিস করে! বললে, "ফিসফিস করে কী কথা?"

বউটি একটু অপরাধের হাসি হেসে বললে, "কথা একটু জোরে বলুন। চোখে তো দেখতে পান না। কথা না শুনতে পেলে রেগে ওঠেন। মাথাও খারাপ। উনি যখন যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন আট মাস দশ মাস কোন খবর ছিল না। তখন লোকে বলত, উনি মারা গিয়েছেন।"

একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে, "তখনই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ওই

এক ছেলে তো!"

"বলি ওলো হারামজাদি! কথা কানে যায় না? কিসের ফিস-ফিসিনি? অ্যাঁ?" এবার বুড়ী চিৎকার করে উঠল।

হেসে বউটি বললে, "না মা, ফিস্‌ফিসিনি নয়, বলছি, বড় ঘরের মেয়ে আপনি, কোথায় বসবেন এখানে?"

শান্ত হয়ে বৃদ্ধা বললে, "ঘরে বসাও।" তারপরই বললে, "হুঁ, বড়ঘরের মেয়ে, সুবাস উঠেছে; গন্ধ মেখেছে বুঝি? গাড়ি বুঝি আর কেউ সারাতে পারলে না? সে রতন এসে হাত দিলেই ফের ভরভরিয়ে ধোঁয়া ছুটতে লাগবে।"

বস্তির মতই ছোট টিনের ঘর। কিন্তু আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা। একখানি একজনের মত তক্তপোশে একটি পরিচ্ছন্ন বিছানা। একটি সস্তা টিপয়ের উপর ধবধবে সাদা একখানি চাদরের টুকরো। তার উপর একটি ছোট ফুলদানিতে রাঙা টকটকে এক গুচ্ছ ক্যানা। মলাট-ছেঁড়া একখানা ইংরিজি বই। মাথার দিকে দেওয়ালে দুখানা ছবি। গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র। ওদিকের দেওয়ালে কয়েকখানি দেবদেবীর ছবি।

খটকা লাগল। প্রবীর গান্ধী বা সুভাষচন্দ্র কারও ভক্ত কোনদিন ছিল না। আর একখানা ফটো। যুদ্ধের পোশাকে একটি তরুণ সৈনিকের ফটো। মুখে দাড়িগোঁফ, বুকে হাত জড়াজড়ি করে বেশ বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ফটোর তলায় একটি ফুল। কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। কে? প্রবীর নয়? না; সাদৃশ্য আছে, কটা চোখ, দাড়িগোঁফ, সব আছে, কিন্তু তবু সে নয়। কই ডান হাতের অর্ধেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দাগ কই?

আরতি হেসে বললে, "এ তো তোমার স্বামীর ছবি!"

"হ্যাঁ, যুদ্ধে যাবার আগে শখ করে তুলিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

"যুদ্ধে যাবার আগেই তোমার বিয়ে হয়েছে? কই তেমন তো লাগে না।"

হেসে বউটি বললে, "যুদ্ধের অনেক আগে। দু'বছর আগে।"

আরতি চমকে উঠল। তবে ঘটনাটা কি? একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলে, "ছবিতে ফুল দিয়েছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"জীবন্ত লোকটা থাকতে ছবি পুজো করেছ?" কোথায় একটা কি খটকা লাগছে। প্রশ্নটা আপনি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

মুহূর্তের জন্য মেয়েটি কেমন হয়ে গেল। তারপর বললে, "তাও করি, ছবিতেও ফুল দিই। তাতে দোষ কী হল?"

"দোষ না। তবে এ-যুগে এমন ভক্তি তো দেখি নে!"

মেয়েটি ফস করে বলে উঠল, "এ-যুগে এমন ভালবাসাও হয়তো নেই, তাই দেখেন নি। দেখেন নি, দেখে যান।"

মেয়েটি কথা বললে না, যেন দপ করে জ্বলে উঠল। আরতি অবাক হয়ে গেল একটু। একটু কৌতুক-হাস্যও উঁকি দিল তার ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু কৌতুকবশে কিছু বলবার

আগেই মেয়েটি আবার শান্ত হেসে বললে, "হাসছেন? তা একালের মেয়ে তো আমি নই। আমার কথা—"

বাধা দিয়ে আরতি সেই কৌতুকের বশেই বললে, "কোন্ কালের তুমি? আদ্যিকালের?"

"বলতে পারেন। একালে জন্মেও আদ্যিকালেরই বটে। আপনি একালের লেখাপড়া শেখা কলকাতার বাবুঘরের মেয়ে। আমার বাবা পাড়াগাঁয়ের ভটচাজ পণ্ডিত। স্বামীও ভটচাজ বাড়ির ছেলে। বয়সে বদ্যিবুড়ী না হলেও আদ্যিকালের ছাড়া আর কি? আমাদের এসব আপনি বুঝবেন না।"

"বুঝব না? না-না। বুঝি বৈ কি, স্বামী দেবতা—"

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে, "মানে জানা আর মনে মানেটা বুঝতে পারা তো এক কথা নয়। আগুনে হাত না পুড়লে হাত পোড়া কি আগুন কি তা কেউ শুনে বুঝতে পারে? আপনারা ঠিক এসব বুঝবেন না। তবু শুনতে চাচ্ছেন শুনুন—মানুষ দেবতা হয়, তবে সে অনেক কালে একজন। আমরা ছেলেবেলায় বেরতো করেছিলাম, রামের মত, শিবের মত, স্বামী পাব। আরও করেছি, নারায়ণকে স্বামী পাব। তার মানে—বাবা বলেছিলেন আমি তা মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে বুঝেছিলাম তার মানে হল, পৃথিবীর সব কালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুরুষোত্তমকে স্বামী পাব। পুরুষোত্তম বহুকালে একজন আসেন। তাঁকে যে পায়, সে হয় সীতা, নয় সতী, নয় রুক্মিণী। নয় গোপা, নয় বিষ্ণুপ্রিয়া। বাকী মেয়ের মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই থাকে। তাই তো সব মেয়েই ষোল আনা সুখী হয় না। সে আপনাদের কালে, আপনাদের মধ্যে আমাদের চেয়ে আরও অনেক বেশী। সে অসুখের পুরনো ওষুধ আমরা মানি। আপনারা মানেন না। আপনারা যার সঙ্গে বনলো না তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে আর একজনের হাত ধরেন। তার সঙ্গে না বনলে আর একজন; ও নিয়মটা ভাল বলে মানলে—জনের পর জন। কিন্তু শেষে বহুজনকে ধরেও মনে মনে যাকে চাই তাকে পাওয়া হয় না; সব শূন্যই থেকে যায়। তাই আমরা যাকে পাই, সেই পুরুষের মধ্য দিয়েই ভজি সেই পুরুষোত্তমকে। ঘর আমরাও অবশ্য ছাড়ি। সে হল মীরার ঘর ছাড়া। কিন্তু সে তো সহজ নয়। আর খোঁপাতে ফুল পরি, পুরুষের বুকে পরিয়ে দিই, শুধু ছবির পায়ে দিলেই দোষ?"

তক্তায় বসে অল্প অল্প পা দুলিয়ে মেয়েটি বেশ লজ্জার সঙ্গেই কথাগুলি বলে গেল। যেন কোন অন্তরঙ্গ সখীকে গত রাত্রির বাসরের কথা বলছে।

অভিভূত হয়ে গেল আরতি। ভটচাজ কন্যাটিকে দেখে যত নিরীহ মনে হয়েছিল তা তো নয়। এ যে ছোট্ট আকারের মহা-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। খোঁচাটা হয়তো বেশীই একটু লেগেছে। কিন্তু কথা কয় তো বেশ গুছিয়ে। মূর্খ যাকে বলে তা তো নয় এ মেয়ে, এবং চেহারায় যত নরম এবং মিষ্টি হোক, আসলে এ মেয়ে অত্যন্ত শক্ত এবং এর মিষ্টতার মধ্যে ঝাঁজ আছে। কথাগুলিও তো সোজা নয়! এ মেয়েকে তবে প্রবীর প্রতারণা করেছে? না হলে যুদ্ধের আগে বিয়ের কথা বললে কেন মেয়েটি?

আরতির স্তম্ভিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে মেয়েটিই আবার বললে, "বলেছিলাম তো এসব

সেকেলে কথা আপনার ভালও লাগবে না, হয়তো মানে খুঁজেও পাবেন না। আপনাদের কথা শুনেও তা-ই হয় আমাদের। এমনিই হাসি পায়, কখনও কখনও বা ভয় হয়।"

মেয়েটির শেষ কথা কটায় খোঁচা আছে ; কিন্তু সে তার গায়ে লাগল না, সে স্তব্ধ হয়ে রইল। মেয়েটিও চুপ করলে—বোধ করি উত্তরের প্রত্যাশায়। বাইরে বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বকেই চলেছে। কী বকছে, সেদিকে কান দেবার মত অবস্থা নয় আরতির। এ আলোচনায় কৌতুক অনুভব করবার মত মনও নেই আর। মনের মধ্যে সব মানুষেরই একটা ঝাঁপি-চাপা সাপ আছে, সেটাকে ফোঁস করতে দেওয়ার লজ্জা আছে। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যদি ইতর জীব হয়! কিন্তু মেয়েটা যেন খোঁচা দেবার কাঠিটা উদ্যত করেই আছে। আরতি নিজেকে সংযত করে, কথার মোড়টা ফিরিয়ে দেবার জন্যই বললে, "তোমার নামটি কী বল তো? বেশ কথা বল তুমি।"

"নাম?" মেয়েটি যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল।

"নাম বলতেও লজ্জা?"

"একটু।" বলতে গিয়েও হেসে ফেললে, "মানে নামের আমার বদল হয়েছে। বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সতী : বিয়ের সময় আমার পিসশাশুড়ীর সতী নাম বলে পাল্টে রাখা হল সীতা। তারপর উনি যুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ হলে শাশুড়ী বললেন, 'ওই সীতা নামের দোষ।' তাই উনি ফিরে এলে বললেন, 'ওই নাম আমি আগে পাল্টাব।' তা উনি হেসে বললেন, 'তা হলে এমন রূপ যখন তোমার বউয়ের, তখন সতীর সীতা হয়ে কাজ নেই, সীতা হোক রতি। আমার এই নিখোঁজেই তো মদনভস্মের ফাঁড়া পার হয়েছে।' আমার নাম রতি।"

আরতি যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

এর কয়েক মুহূর্ত পরেই ভরাট কণ্ঠস্বরের ডাক বাইরের দরজায় বেজে উঠল, "মা।"

"বাবা!"

বৃদ্ধার এ কণ্ঠস্বর কল্পনা করা যায় না। কঠিন বরফের স্তর গলে যেন জলধারা হয়ে ঝরঝর শব্দে সঙ্গীতময় হয়ে ঝরে পড়ছে। কলধ্বনি তুলে পৃথিবীর বুকের তৃষ্ণা হরণ করে ছুটে চলেছে।

"তোর জন্যে একটি বাবুঘরের মেয়ে সেই থেকে বসে আছে। বেচারীর গাড়ি কেউ ঠিক করে দিতে পারে নি। আহা যা বাবা, দিয়ে আয়। খেতে না-হয় একটু দেরিই হবে!"

আরতি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মুহূর্তে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে।

বিহ্বল, মুহূর্তের জন্যও বিহ্বল হল কিনা কে জানে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নমস্কার করে বললে, "নমস্কার। চলুন আপনার গাড়ির কী হয়েছে দেখি।"

আরতি কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েই ছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণাতিতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, জ্যামিতিক দুটি ক্ষেত্রকে যেমন করে সূক্ষ্ম হিসেবে মিলিয়ে দেখে, তেমনি করেই

মিলিয়ে দেখছিল। 'রতি' নামের পর আর সন্দেহের কথা ওঠেই না। তবুও দেখছিল। দেখছিল তার স্থিরদৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায় কেমন করে তার চোখ নেমে যায়। তা গেল। প্রবীরের কথায় সে বুঝলে, প্রতারণা গভীর; এদের সামনে কথাবার্তা বলতে চায় না। মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। না, সে যাবে না। এদের সামনেই প্রতারকের প্রতারণার খোলসটা ছিঁড়ে টেনে ফেলে দিয়ে তার স্বরূপটা প্রকাশ করে দেবে! কিন্তু পরমুহূর্তে বউটির দিকে তাকিয়ে সে আত্মসম্বরণ করলে; বললে, "এস!"

বেরিয়ে এল তারা বাড়ি থেকে। বৃদ্ধা বোধ করি পদশব্দ শুনে বললে, "চললি বাবা রতন? যা বাবা, কী করবি, বিপদে পড়েছে। বউ, খিল দে।"

দরজাটা ক্যাঁচ করে উঠল। সেই শব্দে ফিরে তাকাল আরতি। দেখলে দরজা বন্ধ করতে এসে বন্ধ না করে দরজার ফাঁক দিয়ে বউটি সাপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেয়েরা এ সব বুঝতে পারে। কিছু অনুভব করেছে সে।

"চলুন, গঙ্গার ধারে চলুন। সেখানে নিরিবিলি হবে।"

গঙ্গার ধারে একটি নিরিবিলি জায়গায় এসে বললে, "এখানেই বসুন।"

"বসুন বলে অতি দুর্বল প্রতারণার শনের দাড়িগোঁফ আর পরে রয়েছ কেন? সোজা সহজভাবে কথা বল। বস!"

একটু দূরে বসে সে বললে, "না; আমি আপনাকে আপনিই বলব। আমি সত্যি-সত্যিই আজ মোটর-মিস্ত্রী, সে প্রবীর আর আমি নই।"

"কিন্তু কেন? কেন তুমি আমার সঙ্গে এ প্রতারণা করেছ?"

"আপনার সঙ্গে? কী বলছেন মিস্ সেন?"

"তুমি আমাকে চিঠি লেখ নি? 'রতি' বলে সম্বোধন করতে আস নি শেষ দেখার দিনে?"

"এসেছিলাম, কিন্তু আত্মসম্বরণ করে ফিরেই গিয়েছিলাম। এবং যে-যে কারণে পরস্পরের উপর দাবি জন্মায়, বলুন আপনি, আমাদের আলাপের মধ্যে তেমন কোন কারণ ঘটেছে?"

"ঘটনা শুধু বাইরেই ঘটে না, মনের মধ্যেও ঘটে।"

"সে-ঘটনাও দু-রমের মিস্ সেন। এক ধরনের দুর্লভ ঘটনা ঘটে, যার পর আর মন পাল্টায় না। নইলে ঘটনা তো নিত্যই অজস্র ঘটছে! আজ বন্ধুত্ব, কাল বিচ্ছেদ; আবার আপস; নয় কি? আপনার মনের ইতিহাস আমি ঠিক জানি না, তবে সে তো দাঁড়িয়ে নেই। ওই যে মাকে দেখলেন, উনি রতনের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, সে আজও সারে নি। আমাকে রতন ভেবে ফিরে পেয়ে তবে কিছু শান্ত হয়েছেন।"

হাসলে সে একটু।

আরতি বললে, "নাঃ। সেজন্যে মনে কোন ক্ষোভ নেই। লোভ জিনিসটা সাময়িক; সেটা প্রেম নয়, মানে তোমার ওই দুর্লভ ঘটনা নয়, তবে হতে পারত। তুমি দীর্ঘদিন এসেছ—গিয়েছ—"

"তা গিয়েছি। কিন্তু আপনি জানেন, কোনদিন—মাত্র শেষের একদিন ছাড়া, যেদিন

আপনি দেনাপাওনার কথা তুলেছিলেন, যেদিন আমরা তুমি তুমি হয়েছিলাম—সেই দিন ছাড়া—কোনদিন আপনাদের কাজে সাহায্য করা ভিন্ন অন্য কোনদিকে এক পা এগোই নি। তা ছাড়া, আপনি কেন আমার জন্য অধীর হচ্ছেন ? আমাকে ভুলে গিয়েছিলেন, ভুলেই যান। আমি সত্যিই মৃত।"

"তুমি প্রেত!"

"বলুন, রাগ করব না।"

"তুমি কেন ওদের প্রতারণা করলে ? ওই অপরূপ রূপসী বউটিকে পাবে বলে ?"

"হ্যাঁ তাই।"

"কিন্তু ওর স্বামী যেদিন ফিরবে, সেদিন ?"

"সে বেঁচে নেই। আমার সামনেই সে মারা গেছে। আমার কোলের উপর।"

"তুমি স্কাউণ্ড্রেল। তুমি অতি হীন।"

"আপনি বুঝতে পারছেন না…"

"আমি আজই গিয়ে প্রকাশ করে দেব।"

"আপনি মিথ্যে উৎপীড়িত করবেন না নিজেকে মিস সেন। ও জানে।"

"জানে!" বিস্ময়ের আর অবধি রইল না আরতির। জানে! জেনেশুনে, পুরুষ আর পুরুষোত্তম নিয়ে ওই তত্ত্বকথাগুলি শুনিয়েছে সে! আশ্চর্য তো! না, আশ্চর্যই বা কিসের ? যে-দেশে হরিনাম জপ করতে করতে অপরকে ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধির উপায় চিন্তা করে, এক নিশ্বাসে মিথ্যা কথা বলে, যে-দেশে ভগবানের মন্দিরের গায়ে অজস্র ব্যভিচারের চিত্রের অলঙ্করণ, যে-দেশে পরকীয়াসাধন ধর্মের অঙ্গ, সে-দেশের মেয়ে ওই ভটচাজ-কন্যাটির পক্ষে এই বা অসম্ভব কিসের ? কিন্তু, কিন্তু…

"কিন্তু, কিন্তু তুমি কেমন করে এই অনাচারে ডুবলে প্রবীর ? তোমার জীবনের সে-শিক্ষাদীক্ষা ?" কথা আর শেষ করতে পারলে না আরতি। নির্বাক প্রশ্নের নিষ্পলক দৃষ্টিকে প্রদীপ্ত করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তাতে কিন্তু বিব্রত হল না প্রবীর ; মৃদু কণ্ঠে আস্তে আস্তে জবাব দিলে সে। বললে, "নিজে এই করার আগে আমার কোন বন্ধু এই কাজ করলে আমিও এই প্রশ্ন করতাম। কিন্তু নিজে যখন করলাম, তখন বুঝলাম। বুঝেই করেছি। যুদ্ধে গিয়ে রত্নেশ্বরকে দেখি। মেকানিক মিস্ত্রী, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটেই কাজ করত। আমার চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল, তবে সে দাড়ি-গোঁফ রেখেছিল, ঠিক ধরা যেত না কতটা মিল। মিলত গলার স্বরে আর চোখে। রঙ তার আমার থেকে ময়লাই ছিল। তবু মিল ছিল। থাক সে-সব ছোট ছোট খুঁটিনাটির কথা। সে মারা গেল আমার কোলের উপর। মরবার সময় বললে তার মায়ের কথা, স্ত্রীর কথা। সে কী আকুতি! আমরা তখন জাপানীদের কাছে হেরে বনে বনে পালাচ্ছি। সেই অবস্থায় কোন রকমে এসে পৌঁছুলাম বাংলা দেশে। কলকাতার কাছেই এদের বাস ছিল। নাম বলব না। যে-সব গ্রাম এখন শহর হয়ে উঠেছে, যেখানের ব্রাহ্মণদের এককালে বাংলাজোড়া গৌরব ছিল ; এখন গৌরববিহীন ভিক্ষুকের মত অবস্থা,

যাদের বংশধরেরা সেই অগৌরবের জ্বালায় ইংরিজি শিখতে গিয়ে কেউ অর্ধশিক্ষিত, কেউ শিক্ষিত হয়ে আমার আপনার মত নাস্তিক ; সেখানে গিয়ে এদের পেলাম না। শুনলাম শাশুড়ী বউটিকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে, খেটে খায়। রাঁধুনী বা ঝিয়ের কাজ করে। ঠিকানা যোগাড় করে এলাম। বউ ও মা দুজনেই আমাকে ভুল করলে রত্নেশ্বর বলে। তখন আমার দাড়িগোঁফ হয়েছে ; আমার অজ্ঞাতসারে আমি রত্নেশ্বর সেজেছি। সে-ঘটনা—"

চুপ করলে সে। হাসলে। কৌতুকের হাসি নয়, সে-হাসি সুখস্মৃতি ধরণের হাসি, অথচ বিষণ্ণ।

আরতির ভালো লাগছিল না বিন্যাস করে কথা বলার এই ঢংটাকে। প্রবীর পাঁকে-গড়া মূর্তির উপর রং দিয়ে মনোরম করতে চাইছে। প্রবীর চুপ করতেই সে বলে উঠল, "তুমি বউটির রূপ দেখে আপনাকে হারালে। সুযোগ নিলে।"

"হ্যাঁ। কথা সংক্ষেপ করলে তাই দাঁড়ায়।"

"তারপর মেয়েটির যখন সর্বনাশ হয়ে গেল, আর অস্বীকারের পথ রইল না, তখন তুমি হয়তো তাকে বললে যে, সে তুমি নও। ছি! ছি! তোমাকে ছি প্রবীর।"

"মানুষের একটা অবস্থা আছে ; সে অবস্থায় সে যখন পৌঁছয়, তখন কোন ছি-ছিকারই তাকে স্পর্শ করে না মিস সেন।"

"তখন তার অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছয় সে। চামড়া হয় গণ্ডারের মত। পঙ্কপন্বলেই তখন তার বিলাস।"

"এরও প্রতিবাদ করব না আমি। কিন্তু শুধু একটি কথা বলব যে, মেয়েটি প্রথমে ভুল করলেও প্রথম রাত্রেই ভুল বুঝতে পেরেছিল। তাকে আমি ছুঁই নি, আমিও তাকে সব কথা খুলে বলেছিলাম। তখনও আমার চলে আসবার শক্তি ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পথ ছিল না। ওই আধপাগলা বুড়ী সারাটা রাত্রি বউবেটার ঘরের দরজা আগলে শুয়ে ছিল। আরও কিছু ছিল, কিন্তু সে থাক।"

"সে ওই বউটির অপরূপ রূপ।"

"না, তা ছাড়াও ছিল। সে থাক। কিন্তু বার বার রূপ-রূপ বলে যে-ভাবে কথা বলছেন, তাতে রূপকে যেন তুচ্ছ এবং ব্যঙ্গ করছেন আপনি। বলতে পারেন, যেখানে একজনের রূপকে একজনের চোখে ভাল লাগলে সে তার জন্যে পাগল হয়, সব বিসর্জন দেয়, সেখানে যে-রূপ বহুজনের চোখে অপরূপ মনে হয়, সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে যদি তার পূজা করেই থাকি, তবে কী দোষ করেছি আমি?" একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললে, "লোকে বলে, যেখানে বহুর মনোহরণ-করা রূপ, সেখানে ভগবানের-আভাস।"

হেসে উঠল আরতি ; বললে, "ভগবান! শেষ পর্যন্ত ভগবান প্রবীর? হায়! হায়! হায়!"

"ওঃ, আপনি ভগবান মানেন না!"

"না মানি। কিন্তু তুমি মানলেও ও নাম করবার অধিকারী তুমি নও।"

"মানতে পারলাম না। কারণ ভগবানই পাপপুণ্যের বিচার-কর্তা। তা থাক। কিন্তু বলুন

তো আমার অন্যায়টা কি ? পাপ কোথায় ?"

"এই প্রশ্ন তোমার জিভে আটকাচ্ছে না ?"

"না। ধরুন, মেয়েটি বিধবা হয়েছে। আমি যদি বিবাহ করতাম, তাতে আপত্তি থাকতে পারত ? অন্যায় হত আমার ?"

ভ্রূ কুঁচকে আরতি বললে, "তা তুমি কর নি।"

"না। কিন্তু তাকে নিয়ে আমি স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করি। আমাদের ঘরদোর দেখে এসেছেন। আমরা কীভাবে বাস করি, অন্তত সেখানে কোন ব্যভিচারের কোন নিদর্শন দেখেছেন কিনা বলুন!" একটু হেসে বলল, "এ যুগকে আমি জানি মিস সেন ; এ যুগের যেটা চরম মডার্নইজ্‌ম্‌ তাও জানি। ক্লাব-হোটেল দেখেছি। এ-যুগের অতি সৎ মডার্ন দম্পতিও দেখেছি। তাদেরও ডাইভোর্স দেখেছি। আমরা তাদের চেয়েও সৎ, শান্ত এবং সুখী। আমি দেবীর মত দেখি, সে আমাকে দেবতার মত দেখে। এবার বলুন, কোন্‌ অপরাধ আমাদের ?"

চুপ করে রইল আরতি। এই কথা যে বলতে পারে তার সঙ্গে তর্ক করে সে কী করবে ? মাথার ভিতরটা কেমন করছে তার। ক্ষোভ পাক খাচ্ছে—শিখা নিভে-যাওয়া ধোঁয়ানো অগ্নিকুণ্ডের মত। সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণতার মত একটা অবসাদ। তারই মধ্যে একটা কথা মনে হল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সে বললে, "কিন্তু এইভাবে মিস্ত্রীর কাজ করে জীবনকে নীচের স্তরে নামিয়ে দিয়েছ কেন ? তুমি যা বললে, যদি সত্যি হয়, তবে তুমি তোমার উপযুক্ত চাকরি করে ওকে উপরে তুলতে পারতে ! মানুষ অন্ধকারে মুখ লুকোয় কখন—"

"সে তুমি বুঝতে পারবে না গো ঠাকরুণ।"

চমকে উঠল আরতি। প্রবীরও মুখ নামিয়ে বসে ছিল। সে মুখ তুলে একটু হেসে বললে, "তুমি কেন এলে রতি ?"

রতি কখন এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। কাঁধে গামছা-কাপড়, হাতে একটি ঘটি। গঙ্গা-স্নানের অছিলা করে ওদের অনুসরণ করেছে।

রতি বললে, "থাকতে আর পারলাম না। সাপের মাথার মণিতে যখন কেউ হাত বাড়ায়—তখন সে জানতে পারে, আমিও জানতে পেরে ছুটে এসেছি। আমি তো চিনেছি এ কে। শোন, যা বললে তুমি, তার উত্তর শুনে বোঝা যায় না। তুমি তো বাবুঘরের মেয়ে গো। তোমাকে ভালবেসে কেউ তো ফকির হবে না। কোন কালেও তুমি বুঝবে না। তুমি নিজে যদি কোন ভিখিরীকে ভালবেসে তার পাশে দাঁড়িয়ে ভিখিরিনী হতে পার, তখন বুঝবে।" মেয়েটির চোখ দুটি জলজল করে যেন জলছে। গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে এই জলন্ত দৃষ্টি নিয়ে এই অপরূপ রূপসী মেয়েটি যেন বহ্নিশিখার মত জলছে।

আরতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু পারলে না। এই মুখরা মেয়ের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে পারবে না। সভাগৃহ হলে হত। এর মুখে তো কিছু আটকাবে না।

মেয়েটির মুখ আটকায় নি, সে আবার বললে, "ওকে তুমি এমন করে বোল না। ও আমার পুরুষোত্তমের দান, নারায়ণের আশীর্বাদ। যাও, তুমি বাড়ি যাও। আমার ঘরে

আগুন জ্বালাতে এসো না।"

"জ্বালাবার কিছু নেই।" এবার নিজেকে সম্বরণ করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘৃণাভরে বললে আরতি, "কী হবে জেলে? যা পুড়ে গেছে, তা কি আর পোড়ে? ও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রবীর, তুমি অঙ্গার। না, তুমি প্রেত! তুমি প্রেত!"

সে আর দাঁড়াল না, পা বাড়ালে। ওদের দিকে ফিরে তাকালে না। শুধু শুনতে পেলে মেয়েটির কথা, "দাঁড়াও, চান করে নি। তুমিও চান কর না। ওই অকথা-কুকথাগুলো শুনলে!" অতি তিক্ত হাসি আরতির মুখে ফুটে উঠল।

গঙ্গার জলের পুণ্যে অশরীরী প্রেত মুক্তি পায় কিনা, আরতি জানে না, কিন্তু জীবন্ত দেহধারী প্রেতের মুক্তি হয় না। তবে ডুবে মরলে স্বতন্ত্র কথা। প্রবীর ডুবুক বা না ডুবুক, তার স্মৃতি ডুবে যাক আজ, ভেসে যাক, সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যাক।

আট

সমস্ত জগৎ এবং জীবন এক মুহূর্তে তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। তার দৃষ্টিকে কিছু আকর্ষণ করলে না। কোন সুর কোন শব্দে সে মুখ ফেরাল না, চকিত হল না; কোন গন্ধ সে অনুভব করলে না; পথে বস্তিটার পাশের সরু গলির মুখে একটা মরা বেড়াল পচে গন্ধ উঠছিল, লোকজন নাকে কাপড় দিয়ে জায়গাটা পার হচ্ছিল, কিন্তু আরতির কোন খেয়ালই হল না; খেয়াল হল গলিটা পার হয়ে এসে রাস্তার উপর উঠে; কই গাড়ি কই? গাড়িটা অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে! তার মনে প্রশ্নও জাগল না—সে পথ ভুল করেছে অথবা গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! সে খেয়াল দূরের কথা, গাড়িটা থেকে মুখ বের করে তাকে ডাকছিল সুধা বউদির বোনপো সুব্রত,—গাড়িটাও তাদের এবং সেই তার সঙ্গে এসেছে, তাতেও তার হুঁশ হয় নি—সে হেঁটেই চলেছিল। সুব্রত গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে কাছে এসে তাকে ডাকলে, "মাসীমা মাসীমা বলে ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না? গেলে এক পথ দিয়ে এলে এক পথ ধরে!"

আরতি অর্থহীন উত্তর দিলে, "হাাঁ।"

"বেশ মানুষ!"

"এঁ্যা?"

আবার সুব্রত বললে, "কি হয়েছে মাসীমা?...মাসীমা!"

"চল শিগ্‌গির চল।"

"শরীরটা খারাপ করছে?"

বেঁচে গেল আরতি, এতক্ষণে বললে, "হ্যা।" বলে গাড়িতে চড়ে বসে এক কোণে হাতে মাথা রেখে বসে রইল। গাড়ির গতির প্রতি খেয়াল ছিল না, পথের জনতার উপর না, দু পাশের বাড়ির উপর না; মাইক্রোফোনে কি একটা পুলিস-ঘোষণা হচ্ছে, তাও সে শুনতে পেলে না।...

বাড়িতে এসে সে-ই যে সে ঘরে এসে শুল—চার পাঁচ দিন উঠল না। সুধা বউদি বার বার এলেন—কিন্তু সে বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। বউদি তার স্বভাব-মত জোর করে শুনতেও চাইলে না। কয়েকদিন পর সে উঠবার—বের হবার চেষ্টা করলে। বাইরের প্রচণ্ডবেগে আলোড়িত সংঘর্ষে সংঘাতে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের জীবনাবর্তের মধ্যে নিজেকে কুটোর মত ফেলে দেবার চেষ্টা করলে। খবরের কাগজ টেনে নিয়ে বসল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আশ্চর্য সংগ্রাম চলছে। প্রস্তাব—প্রত্যাখ্যান—প্রতিপ্রস্তাব। বিবৃতির পর বিবৃতি। রাজনীতির ঘাতে প্রতিঘাতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষের সীমা পরিসীমা নেই। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের জীবনক্ষেত্রে আগুন জ্বলে গেছে। ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে কলকাতার আকাশ। সে আগুন ছড়াচ্ছে দূরে-দূরান্তে গ্রামাঞ্চলে। এর মধ্যে নিজেকে ফেলে দিলেই হল। কিন্তু কার বা কাদের সঙ্গে জড়াবে নিজেকে? অরুণকে মনে পড়ল। সারারাত্রি ভেবে সে আবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। না। সে আর তা পারবে না। অরুণের সঙ্গে কোথায় একটা কি হয়ে গেছে, তার সঙ্গ ওর অসহ্য।

অরুণ নিজেও তার কাছে এসেছিল মাঝখানে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য নাটক লেখা হয়েছে, সেই নাটকে অভিনয় করতে হবে। আশ্চর্য স্বপ্ন বিভোর অরুণ। এমন ভাবে বললে যেন নাটকটা অভিনয় হয়ে গেলেই সব বিভেদ একেবারে বর্ষাশেষে শরতের আরম্ভে মেঘ কেটে যাওয়ার মত কেটে যাবে।' কিন্তু সে বলেছে—'না।' তার এসব কিছু ভাল লাগছে না। ওই প্রবীরের প্রেত যেন তাকে ভূতগ্রস্তের মত অভিভূত করে পেয়ে বসেছে। সে পারবে না। অরুণকে তার আরও খারাপ লাগছে। অরুণ তাকে কটু কথা বলেই চলে গেছে। যাক।

পাতুদা খুব সমারোহ করে সর্বজনীন পুজোর আয়োজনে মেতেছে। পাতুদাও বলেছিল—"আমাদের আপিসের কাজ করে দে না। বসেই তো রয়েছিস।"

মন্দ লাগল না প্রস্তাবটা। পাতুদা যাই হোক সর্বজনীন পুজোর কথা ভাল লাগল। কয়েকদিন কাজ করলে সে। কিন্তু কয়েকদিন পর তাও ভাল লাগল না।

কর্মীর দলের মধ্যে বিচিত্র সমাবেশ। রাস্তার রোয়াকের আড্ডাবাজ থেকে শিক্ষিত যুবক পর্যন্ত। মাঝে মাঝে আসে বর্তমান দুর্যোগে সমাজ ও সম্প্রদায়ের রক্ষী সেবার দল। বিচিত্র মনে হল আরও তার। কিছুদিন আগেও এরা সমাজে অপাংক্তেয় ছিল। আজ আশ্চর্যভাবে এরা কাজ করছে। মারবার এবং মরবার জন্য প্রস্তুত। সময় সময় প্রশংসা করতে ইচ্ছে হয় —আবার সময় সময় ভয় করে। এই এদের জন্যেই প্রথমটা মন বেঁকে বসল। তারপর সেই সুযোগেই বোধ হয় সেই বিষণ্ণ উদাসীনতা তাকে ব্যাধির পুনরাক্রমণের মতই অভিভূত করে ফেললে। সেই প্রবীরের প্রেত! তার উপর ক্ষোভকে সে সম্বরণ করতে পারছে না। অথচ না করলে সে বাঁচবে কি করে?

প্রথম দিন সে নিচে নামল না শরীর ভাল নেই বলে। দ্বিতীয় দিন বলে দিলে সে পারবে না। তার ভাল লাগছে না। কর্তব্য করবারও শক্তি বা প্রবৃত্তি নেই তার। পারবে না।

কয়েকদিন আগে সে পড়েছিল—'ক্ষণ মুহূর্তে চলমান পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে ধাবমান ও

পরিবর্তনশীল জীবনসত্তার গভীরে এক নিত্যকালের ও জীবনসত্তার অবস্থান আছে; তাই শাশ্বত। মনে মনে যদি কখনও অনুভব করে থাক—সকল জনের মধ্যেও তুমি একা, যাকে চেয়েছ তাকে পাও নি, সকল সম্পদের মধ্যে থেকেও তুমি রিক্ত অর্থাৎ ওর মধ্যে যা তুমি চাও তা তোমার নেই, তবে তখনই সেই নিত্যকাল ও সত্তাকে অনুভব করতে পারবে, আস্বাদন করতে পারবে। এই বিষণ্ণ বেদনার মধ্যে নীরবে নিঃশব্দে তুমি যদি ধ্যানমগ্ন হতে পার তবে সেই নিত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, তার মধ্যেই পাবে অমৃত, তার মধ্যেই পাবে পরম সত্য। কারণ কোন কালেই কেউ তো যা চেয়েছে তা পায় নি, তাই বেদনাই তো চিরন্তন, সেই বেদনাতেই সকল মানুষে শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গেছে।' বড় ভাল লাগল কথাগুলি।

ওই কথাকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরে সে পড়ে রইল। ওসব কাজ সে করতে পারবে না। কাজ সে করবে—এমন একটা কাজ যে কাজে বেদনার সমুদ্রে ডুব দিতে হবে, যে কাজে হাত দিয়েই মনে হবে—জীবন ধন্য হয়ে গেল। যাতে সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে পৃথ্বীরের অভাব আশ্চর্যভাবে কোন অগোচরে মিলিয়ে গেল।

এল, অকস্মাৎ সেই কাজের আহ্বান এল। খবরের কাগজটা খুলবামাত্র মনে হল—এই তো এই কাজেই সে খুঁজছিল।

১০ই অক্টোবর নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায় কলকাতার আগুন গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এবং যে বীভৎস নৃশংসকাণ্ড সেখানে ঘটল তাতে কলকাতার দাঙ্গার নৃশংসতা ক্ষুদ্র বলে মনে হল, ম্লান হয়ে গেল। নোয়াখালি আর গোলাম সারোয়ার—দুটো নাম মানুষের কাছে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে, বিছানায় শুয়ে ওই নাম দুটো মনে করলে আর ঘুম আসে না। এই মানুষ! এই ধর্ম, এই সভ্যতা, এই শিক্ষা!

হে ভগবান! কোথায় ভগবান! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন কানে শোনা যায় কোন্ দূর থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতা নারীর কান্না, ভেসে আসে মানুষের মৃত্যু-যন্ত্রণা, কাতর আর্তনাদ; চোখ বুজলে অন্ধকারের মধ্যে ভেসে ওঠে গ্রাম-জোড়া আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মানুষ বোবা হয়ে গেল মানুষের বর্বরতায়। রাজনৈতিক প্রগল্‌ভতা—আলাপ-আলোচনা স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ নাকি কলকাতার ব্যর্থতার পরিপূরণ।

অকস্মাৎ এই স্তম্ভিত স্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটি কণ্ঠস্বর—শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। দিল্লী থেকে ভেসে এল সে ধ্বনি—'আমি বাংলায় যাব; ওই নোয়াখালি ত্রিপুরায় আমি যাব—আর্ত পীড়িত মানুষকে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সাহস অবলম্বন করতে বলবার জন্য যাব; উগ্রতায় আক্রোশে আত্মসম্বিৎ-হারা আক্রমণকারীদের বলতে যাব—ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, ঈশ্বরকে স্মরণ কর, মনুষ্যত্বে ফিরে এস। আমি জানি না বাংলায় আমি গিয়ে কি করতে পারব—তবে এইটুকু বলতে পারি যে, বাংলায় না গেলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।'

আশ্চর্য কথা কয়েকটি। মন ভরে গেল আরতির। এই তো, এই তো কাজ। অগাধ বেদনায় মুহ্যমান স্পন্দনহীন মানুষের সেবা! ভয়-কাতর বাস্তুর ও ভয়ঙ্করতায় জর্জর রাত্রির

অন্ধকারের মধ্যে নিজের বুকের পাঁজরের টুকরো খসিয়ে আপনার মেদাবলেপন দিয়ে অভয়ের আলো জ্বালা। এই তো কাজ! হ্যাঁ। এই তো কাজ! প্রবীর সেই ভাস্বর আলোকবৃত্তের গণ্ডীর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাক—মিলিয়ে যাক।

সারাটা দিন এই কথাই সে ভাবছিল। নীচেকার ঘরে পাতুদাদের বৈঠক চলছে, রক্ষীবাহিনী দল এসে জুটেছে, মাতব্বরেরা এসেছে, উত্তেজনার অন্ত নেই। প্রতিহিংসায় অধীর হয়ে উঠেছে সকলে। প্রতিহিংসা চাই। টাকা উঠছে, অস্ত্র সংগ্রহ চলছে, সকলের মুখ থমথম করছে; আজ সন্ধ্যা থেকে কলকাতায় প্রতিশোধের আগুন জ্বলবে; সারা কলকাতার সংবাদ আসছে—এখান থেকে এখানকার সংবাদ যাচ্ছে। শান্তি কমিটিগুলো পঙ্গু হয়ে গেছে। গান্ধীর এই সংকল্প-বাণীর তীব্র প্রতিবাদ উঠছে। ওই গান্ধীই সব অনিষ্টের মূল। শান্তির জন্যে আসছেন! কে—না গান্ধী!

—গান্ধী? না—। নামটা বিকৃত এবং উপহাসাস্পদে রূপ দিয়ে উচ্চারণ করতেন পাতুদা! জাত তুলে গাল দিয়ে বলতেন—বেণে কোথাকার!

এসব তার কানে এলেও সে উত্তেজিত হয় নি। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অহিংসার প্রতি কোনদিনই তার আকর্ষণ ছিল না। বরং বিপরীত মনোভাবই সে পোষণ করে এসেছে। অরুণ কঠিন সমালোচনা করত, সেগুলি তার যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়েছে আগে। কিন্তু তার চরিত্র ও স্বভাবের মধ্যে মত-পার্থক্য সত্ত্বেও বিপরীত মতের শ্রদ্ধেয় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কখনও ঘটে নি। এ নিয়ে অরুণের সঙ্গে তার বাদপ্রতিবাদ অনেকদিন হয়েছে। শুধু গান্ধীজী নয়, সুভাষচন্দ্রকে নিয়েও হয়েছে। সে কঠিন প্রতিবাদ করেছে। আজ তার মন অতীতকালের সকল দিনের মন থেকে আলাদা। দাঙ্গা থেকে এই পর্যন্ত কঠিন আঘাত ও দহনের মধ্য দিয়ে এসে যে নতুন মন পেয়েছে—সে মন অনুত্তেজিত, শান্ত; নিঃশেষিত-শক্তি—অবসন্ন। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। সে যেন বহুদিনের বা অতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় পড়ে আছে; নানা কণ্ঠের নানা কথা, আহ্বান এসে কানে ঢুকছে কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রী অসাড়; হঠাৎ কে এক অমৃতময় পুরুষ-কণ্ঠের শান্ত সুরের ওই ক'টি কথা তার কানে এসে পৌঁছুল—'আমি যাব, ওই প্রজ্বলিত বহ্নিদাহের মধ্যে আমি প্রবেশ করব, বহ্নিকে বলব ক্ষান্ত হও শান্ত হও, অথবা আমাকে গ্রাস কর। দগ্ধ মানুষদের উদ্ধার করব, সেবা করব।'

তারই সঙ্গে অনুক্ত আহ্বান সে শুনতে পেলে, 'কেউ যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, এস।' এ আহ্বানে সে বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করলে। গল্পে যেমন শোনা যায়—মৃতকল্পের শিয়রে এসে মহাপুরুষ ডেকে বলেন, 'ফিরে এস জীবনে; সঞ্জীবিত হও, উঠে বস; সকল রোগ তোমার দূরে যাক।' আর অমনি রোগী চোখ মেলে প্রসন্ন হেসে ধীরে ধীরে উঠে বসে—ঠিক তেমনি। তেমনি ভাবেই সকল অবসাদ থেকে মুক্ত হয়ে সে উঠে বসল। যাবে—সে যাবে। সে ওই শান্তের সঙ্গে, ওই শুদ্ধের সঙ্গে, ওই করুণা-স্নিগ্ধ বেদনাকাতর মানুষটির সঙ্গে যাবে, ওই অগ্নিদাহের মধ্যে প্রবেশ করবে।

উঠে বসল বিছানার উপর। তারপর বিছানা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানালার

সামনে।

দূরে বিস্ফোরণের শব্দ উঠছে। ওই কোণের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। ওই ধ্বনি উঠেছে—'আল্লা হো আকবর; নারায়ে তকদীর।' ওই শোনা যাচ্ছে—'বন্দেমাতরম্। জয়হিন্দ।'

পরদিন সকাল হতে না হতে সে ছুটল সুব্রতদের বাড়ি। গাড়িটা একবার চাই। কিন্তু গাড়িটা পেলে না, খারাপ হয়ে আছে। সে বাসে চেপেই ছুটল। বাগবাজার। বাগবাজারে কাঁটাপুকুরে শচীন মিত্রের বাড়ি।

প্রিয়-দর্শন সৌম্য শচীন্দ্রনাথ কাগজ পড়তে পড়তে কাঁদছিলেন। চমকে উঠলেন আরতিকে দেখে।—"আপনি? আপনি তো আরতি সেন?"

"হ্যাঁ, আপনার কাছে প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।"

"প্রার্থনা? সে কি? বলুন।"

"মহাত্মাজী নোয়াখালি যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে যেতে চাই।"

'আপনি মহাত্মাজীর সঙ্গে যাবেন?" তার কণ্ঠস্বরে সে কী বিস্ময়। বিস্ময় অহেতুক নয় সে কথা জানে আরতি। নাটকের প্রসঙ্গ তার মনে আছে। কিন্তু সে সঙ্কুচিত হল না, সে অসঙ্কোচে বললে, "আমার জীবনে বিপর্যয় ঘটে গেছে শচীনবাবু, আমি এই মহাযজ্ঞের প্রসাদ পেলে বাঁচব, নইলে আমি ডুবে যাব, হারিয়ে যাব। হয়তো মরতে হবে আমাকে!"

তার মুখের দিকে চেয়ে শচীনবাবু বললেন, "বসুন বসুন। তার জন্যে কি! যাবেন।"

"যাব?"

"যাবেন; আমি অনুমতি করিয়ে দেব।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সে অকস্মাৎ বলে উঠল, "আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আপনাকে আমি প্রণাম করব—শচীনবাবু?"

ব্যস্ত হয়ে শচীন মিত্র মিষ্ট হেসে বললেন, "ভগবানকে করুন। আমাকে না।"

৬ই নভেম্বর সকালে স্পেশ্যাল ছাড়ল। বেহারে ওদিকে দাঙ্গা লেগেছে কলকাতা এবং নোয়াখালির প্রতিক্রিয়ায়। কলকাতার দাঙ্গায় হত আহত হিন্দুরা ফিরে গিয়ে বেহারে জ্বালিয়েছে আগুন। কলকাতা পর্যন্ত তার চিহ্ন এসেছে। বেহার হয়ে যেসব ট্রেন এসেছে সেসব ট্রেনের কামরায় রক্তের চিহ্ন। কিন্তু এই আশ্চর্য মানুষটির একটি নির্দেশে বেহার শান্ত হয়েছে। বেহার যদি শান্ত না হয় তবে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। বেহারে ছুটে এসেছেন জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বেহারে দাঙ্গার গতি রুদ্ধ হয়েছে। পরম শান্ত পরম শুদ্ধ চলেছেন নোয়াখালি।

স্পেশ্যাল ভর্তি লোক। পথে স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে কাতারে কাতারে লোক। তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করছে একটি গানের কলি—

"শান্ত হে, মুক্ত হে, হে, অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য!"

অকস্মাৎ তাতে ছেদ পড়ে গেল।

ভিড়ের মধ্যে ও কে ? ওই যে প্ল্যাটফর্মের বাইরে কোলাপ্সিবল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ? ও কে ?

ড্রাইভার রতন। প্রবীরের প্রেত। সঙ্গে তার প্রেতিনী। প্রেত আঙুল দিয়ে মহাত্মাজীকে দেখাচ্ছে। মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তার মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বললে, যা করেছ করেছ—তোমার বিচার ভগবান করবেন প্রবীর। আমি শুধু এইটুকু বলি—তুমি ওই রতনের প্রেতত্ব থেকে মুক্তিলাভ কর। ওই মেয়েটিকে পত্নীর মর্যাদা দিয়ে তুমি আবার প্রবীর হও। প্রেতত্ব থেকে মুক্তিলাভ কর।

নয়

না। জীবন্ত প্রেতের মুক্তি হয় না।

সংসারে যারা দেহনাশ করে আত্মহত্যা করে তাদের আত্মা প্রেতত্ব পায়—প্রেতলোকের অন্ধকারে বীভৎস রূপ নিয়ে অশান্ত অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা কালের অন্তে—অথবা উত্তরাধিকারীদের প্রেতশিলায় প্রায়শ্চিত্ত বিধানে এবং পিণ্ডদানে নাকি তাদের প্রেতত্বের মোচন হয় তারা মুক্তিলাভ করে, শান্তি পায়, দিব্য দেহ পায়। কিন্তু সংসারে যারা চরিত্রনাশ করে আত্মহত্যা করে—তারা জীবন্ত প্রেত। একমাত্র দৈহিক মৃত্যু ছাড়া তাদের জগতের প্রেতত্ব এবং প্রেতলোক থেকে তাদের মুক্তি হয় না। কিন্তু দেহের প্রতি তাদের আশ্চর্য মমতা। প্রেত রতন ড্রাইভারের মুক্তি হয় নি। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল আরতির সঙ্গে গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাটে।

আশ্চর্য বিপরীত সংস্থান—। একদিকে আত্মদান করে মহান আত্মা চলেছেন অগ্নিশিখার ভর করে—দিব্যলোকে। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ অশ্রুসজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে—অন্যদিকে এই প্রেত দাঁড়িয়ে আছে একটি চিতার পাশে। চোখে মুখে দীনতার ছাপ। আর ওই প্রেতিনীও দাঁড়িয়ে আছে পাশে। কিন্তু দেখেও সে ক্ষুব্ধ বিরক্ত হল না। নাঃ, অন্তরে তার জ্বালা নেই। সব যেন জুড়িয়ে গেছে।

প্রায় এক বৎসর পরের ঘটনা। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

এই এক বৎসরে তার জীবনের সকল গ্লানি সকল নালিশ মুছে গিয়ে শুভ্রতায় শুচিতায় আশ্চর্য আনন্দে ভরে গেছে। এক বৎসর সে কাটিয়েছে নোয়াখালিতে। নোয়াখালিতে ওই পরমাশ্চর্য মানুষটির সঙ্গে দুর্গতের দুঃখীর চোখের জল মোছাতে মোছাতে কখন যে তার নিজের জীবনের দুঃখ সকল শোক আনন্দ-আলোকে পরিণত হয়েছে তা সে হিসেব-নিকেশ করে দিন-তারিখ নির্ণয় করে দেখে নি কিন্তু ধীরে ধীরে তাই সে অনুভব করেছে প্রত্যক্ষ-ভাবে। প্রথম প্রথম সে অন্ধকারের সুযোগে একটা বেদনায় কাঁদত। তার মধ্যে এই সুখ-দুঃখ দুইই ছিল। তারপর দুঃখ ছিল না। একটি বেদনা-বিধুর বিষণ্ণ সুখ থাকত। তারপর

শুধু আনন্দ। সে আশ্চর্য অবস্থা। মৃত্যুতে ভয় নেই, মৃত্যুভয় যারা দেখায় তাদের প্রতি বিদ্বেষ নেই, কারুর প্রতি ঘৃণা নেই, পরিশ্রমে ক্লান্তি আছে কিন্তু দুঃখবোধ নেই; দেহে মনে সে এক অবস্থা! প্রথম দিকে মধ্যে মধ্যে প্রবীরের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু শেষের দিকে আর না।

সঙ্গে মেয়েরা আরও অনেকেই ছিলেন, নেতৃস্থানীয়া তাঁরা, তাঁদের মত ঠিক সে হতে পারে নি, কিন্তু তা নিয়েও তার কোন ক্ষোভ বা মনক্ষুণ্ণতা ছিল না। দু-একজন রহস্য করে বলেছেন, "আরতি তুমি ভাই নিজেকে যেন বৈরাগ্যের সিম্বল করে তুলছ। এ তো ভাল নয়।"

সে প্রসন্ন হেসে বলেছে, "দেখুন আমি যেবার প্রথম দার্জিলিং গিয়েছিলাম—সেবার এত গরম জামা চড়াতাম যে দার্জিলিংয়ের সকল মানুষের মধ্যে আমার দিকেই লোকের চোখ পড়ত। আমিও আশ্চর্য হয়ে দেখতাম কেমন কত অল্প গরম জামাকাপড় পরে লোক চলাফেরা করছে। তারপর ম্যালে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে বসেই থাকতাম তো বসেই থাকতাম। লোকে আসত বসত দেখত গল্প করত ফটো তুলত, হাসত, আমি বোবা হয়ে বসেই থাকতাম। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতেন—'আপনি বোধ হয় অসুস্থ?' আমি বলতাম—'না। আমি নতুন।' মহাত্মাজীর এই সাধন ক্ষেত্র আমার কাছে নতুন। এখানে আপনারা চলাফেরা করছেন অনেকদিন, আমি নতুন এসেছি—প্রতিটি পা ফেলতে আমার ভয় হয় কোথায় কোন্ ভুল করে ফেলি।"

প্রশ্নকর্ত্রী বলেছিলেন, "তুমি চতুর "

উত্তর দেয় নি আরতি।

কথাটা বাপুজীর কানেও উঠেছিল—বাপুজী ওকে একদিন ডেকে বলেছিলেন, "তোমার কি কোন দুঃখ আছে এখানে ?"

সে বলেছিল, "না বাপুজী! এখানে আমার কোন দুঃখ নেই; বরং জীবনে যে দুঃখ ছিল সে আমার জুড়িয়ে আসছে। হয়তো জু ড়িয়ে গেছে—তাই আমি এত ঠাণ্ডা!"

বাপুজী হেসে বলেছিলেন, "তবে নতুন দুঃখ কিছু সংগ্রহ করো। কিছু উত্তাপ প্রয়োজন জীবনে।"

সেদিন আবার মনে পড়েছিল প্রবীরের কথা। সব পুরানো কথাগুলি মনে পড়েছিল। প্রবীরের কথা। প্রেত রতনের কথা নয়

তারপর থেকে ধীরে ধীরে সে সহজ হ'তে চেষ্টা করেছে কিন্তু তা পারে নি। প্রেত এসে তার মনের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে তাকে সরাতে চেয়েও পারে নি।

কটা দিন সে তাকে যেন যখন তখন ভয় দেখিয়েছিল। আরতি কাজের মধ্যে বেশী করে মগ্ন করেছিল নিজেকে। কর্মই দিয়েছিল শক্তি; ওরই পুণ্যের প্রভাবে পাপ সরে গিয়েছিল।

ওঃ, সে কি কৃচ্ছ্রসাধন করেছিল সে! তার ফলেই ওই স্মৃতির উপরের কালো যবনিকা নিস্পন্দ স্থির হয়ে গিয়েছে। নোয়াখালির সে দিনগুলি কী দিন! প্রখর গ্রীষ্মে সে যেন মরুভূমিতে দিন যাপন। ক্রমে ক্রমে সে উত্তাপ কমল এই মানুষটির শান্তিবারি সিঞ্চনে। সমগ্র

ভারতবর্ষের তীর্থস্থান হয়ে উঠল নোয়াখালি। সর্বজনমান্য বরেণ্য মানুষেরা এল এখানে। ভারতবর্ষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের শেষ নির্দেশ যেতে লাগল নোয়াখালি থেকে। তারপর ২রা মার্চ গান্ধীজী গেলেন বিহার। সে থেকে গেল এখানে। থেকে গেল যাঁরা গান্ধীজীর কাজ শেষ করবার ভার নিলেন তাঁদের সঙ্গে। ফিরে এল আগস্ট মাসে। সুধা বউদির টেলিগ্রাম পেয়ে এল। বউদি আর্তভাবে টেলিগ্রাম করেছিলেন, 'তুমি অবিলম্বে এস, বড় বিপদ।' সুধা বউদির বিপদ? কি বিপদ?···অনুমান করতে পারে নি, তবু না এসেও পারলে না। অনুমান দু-তিনটে করেছিল বই কি, কিন্তু মিলল না। অনুমান করেছিল মামা বোধ হয় মারা গেছেন, কিন্তু না, তাঁর কিছু হয় নি। এক-আধবার মনে হয়েছিল পাতুদা হয়তো ছোরাছুরি খেয়েছেন। অসম্ভব তো নয়। অথবা কঠিন রোগে পড়েছেন হয়তো, শেষ মুহূর্তে পাশে দাঁড়াবার জন্য তাকে ডেকেছেন। কিন্তু না, তাও নয়। লাটুকে নিয়ে গোটা সংসারটা বিব্রত হয়েছে। লাটুকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। সে ওই রক্ষীবাহিনী নিয়ে একটা মুসলমান বস্তীতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

দেশকে কেটে হিন্দু মুসলমানকে পৃথক পৃথক অঞ্চলে ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে; ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্থানে বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হবে। বাংলা বেশ দু ভাগে বিভক্ত হবে, পূর্ববঙ্গ থেকে লাখে লাখে লোক চলে আসছে সব ফেলে দিয়ে, এখান থেকে মুসলমানরা যাচ্ছে পূর্ববঙ্গে, তবে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের মত নয়। সম্পত্তি বিকিকিনি চলছে জলের দামে। এই সুযোগে একটা মুসলমান বস্তী কিনেছে লাটু—এখানে শ্যাডো মিনিস্ট্রি গঠনের পরই। বস্তীটা থেকে অনেক মুসলমানই চলে গেছে পূর্ববঙ্গে, বাকী যে কজন ছিল তাড়াবার জন্য লাটু ওই রক্ষীবাহিনী নিয়ে গিয়ে বস্তীতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুলিস লাটুকে গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হয় নি, পাতুকেও এ্যারেস্ট করেছিল, সে জামিন পেয়েছে। সংসারে পাতুদারা বিচিত্র মানুষ। যত দুর্দান্ত তত ভীরু। যত কুটিল তত মূর্খ। যত দাম্ভিক তত নির্লজ্জ। পাতুদাই সুধা বউদিকে দিয়ে টেলিগ্রাম করিয়েছেন তাকে। আরতি আজ যখন গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসেছে, তাঁর স্নেহ পেয়েছে, তখন তাকে সঙ্গে করে কর্তাদের কাছে গেলে একটা উপায় কি হবে না? বৃদ্ধ বাপ—আরতির মামাও বলেছেন, "তাই কর বউমা, আরতিকেই টেলিগ্রাম করো!"

এ সবই প্রায় এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। পাতুদারা চিরকাল কল্লিৎকর্মা লোক। আইন আদালত, আইনের ফাঁকফাঁকি, মারপ্যাঁচ—এসব আইন-কর্তাদের চেয়েও অনেক বেশী জানেন এবং বোঝেন; শুধু তাই নয়, এমন শক্তি ধরেন যে সূচীপ্রবেশের ছিদ্রপথ পেলে সেই পথে অনায়াসে ঐরাবতে চড়ে পার হয়ে যেতে পারেন। পুরাণের মায়াবীদের মত যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আক্রমণ করতে পারেন আবার তাতে পরাজয় সম্ভাবনা দেখলে পর-মুহূর্তে ভয়ঙ্কর মূর্তি থেকে অদৃশ্য হয়ে এক মনোহর মূর্তিতে মাল্য হাতে আত্মপ্রকাশ করে স্মিতহাস্যে সম্ভাষণ করে বলতে পারেন শত্রুকে—'এস মাল্য গ্রহণ কর।' তাই করেছেন পাতুদা; কেসটা প্রায় মিটেই গেছে। মুসলমানদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে পীস কমিটি করেছেন, মিষ্টান্ন খাইয়েছেন, কাপড়চোপড় তৈজসপত্র কিনে দিয়েছেন; পোড়া-ঘর

তৈরী হতে আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর মুসলমানরা বলেছে—'না-না-না চিনতে আমাদের ভুল হয়েছে। সেই রাত্তিরের কাণ্ড, ভয়ে জান দুরদুর করছে; চোখে যেন দিশা দিশা লেগেছিল; লাটুর মতন বটে তবে লাটুবাবু না। উঁহু! উনি না।'

এতেই নিশ্চিন্ত হয় নি পাতুদা। সুধা বউদি বললেন, "শুধু এই নাকি! ওরা এই করেছে আর রক্ষীবাহিনীর সেই ন্যাড়া সে রাত্রে নাকি স্টেন গান নিয়ে সেখানে গিয়ে বলে এসেছে যে, আমাদের কি লাটুবাবুর নাম করলে শেষ করে দিয়ে যাব এই দিয়ে। তারপর তোর নাম নিয়েও কংগ্রেসীদের কাছে গিয়ে বলেছে, 'ভেবে দেখুন আরতি আমার আপন পিসতুতো বোন, সে ছেলেবেলা থেকে ছিল প্রগ্রেসিভ, দাঙ্গার পর আমাদের এখানে এসেই তার চেঞ্জ হয়েছে। কি হয়েছে সে জানেন আপনারা। সে নোয়াখালিতেই রয়ে গেছে; গান্ধীজীর মাহাত্ম্য সে আমাদের এখানেই বুঝেছে। আমরা এসব হিংসার কাজ করতে পারি না।' পাড়ার লোকেরা অবিশ্যি সায় দেয় নি অরুণ শুধু। সেই এক ছেলে আরতি। লোকেরা তো ওদের ওপর খড়্গ-হস্ত। পাড়ার ছেলেরা দেখলে টিটকিরি মারে; তবুও সব জায়গায় আছে, সবতাতেই আপনা থেকে এগিয়ে গিয়ে নাক গলিয়ে ঝগড়া করবে। মাঝখানে কারা গায়ে মাথায় গোবরের জল ঢেলে দিয়েছে, তাতে লজ্জা নেই—একভাবে চলেছে। মা-মা! সেদিন হন হন করে হেঁটে চলেছে, মাথায় তেল নেই, মুখে একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, জামাটা ছেঁড়া,—আমি গাড়ি থামিয়ে ডেকে বললাম, 'কোথায় যাবি—এ কি চেহারা?' উত্তর দিলে না, চলে গেল। অঃই অঃই স্বয়ং এসেছেন মহাপ্রভু তোর দাদা—এখন জিজ্ঞেস কর।"

পাতুদা ফিরলেন কোথা থেকে। খুব ব্যস্ত। যেন পৃথিবীর চিন্তা ভর করেছে। আরতিকে দেখে পরম সমাদর করে বললেন, "ও: বাপ্ রে আরতি বুড়ী! কখন? চা খেয়েছিস?"

হেসে আরতি বললে, "খাই নি আজ আট মাস। নোয়াখালি গিয়ে থেকেই।"

"তাই বটে। তা তুই ভাই দেখালি বটে। শঃ। মহাত্মার সঙ্গে নোয়াখালি। বাপরে বাপরে!...পথে কোন কষ্ট হয় নি!"

"না।"

"তারপর সব শুনেছিস? তা আমি সব চুকিয়ে ফেলেছি। দেখ আমি ভেবে দেখলাম, বুঝলাম—যে এ ছাড়া পথ নেই। ওই মহাত্মার পথ কংগ্রেসের পথই একমাত্র পথ। তুই যখন নোয়াখালি যাস তখন খুব চটেছিলা আমি। কিন্তু তুই ঠিক করেছিস। The only way. আমি কংগ্রেসের মেম্বার হব। তুই ভাই যখন এসেছিস তখন আর কুছ পরোয়া করি না আমি। তুই একটু বলে দিবি।"

অবাক হয়ে গেল আরতি।

পাতুদা বললে, "তোর একটা কাজ করে রেখেছি আমি। কপালিটোলার বাড়ি সব ক্লীয়ার করে তালা দিয়ে এসেছি। জানালা দু-চারটে খুলে নিয়েছে নিচের তলার, উপরটা ঠিক আছে। বলিস তো ভাড়া দিয়ে দিই। এখন ডিমাণ্ড খুব।"

আরতি বললে, "না। আমি নিজেই থাকব ওখানে। এখানেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দেখব

তারপর নোয়াখালি ফিরব—যদি সম্ভবপর হয়।"

সম্ভবপর হওয়া কঠিন সে বুঝে এসেছে আরতি। এখানেই সে বরং কাজ বেছে নেবে। বাপুজী আসছেন কলকাতা। স্বাধীনতা দিবসে তিনি দিল্লীতে থাকবেন না, কলকাতায় থাকবেন। তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সে গিয়ে শিয়ালদহে ওই বাস্তুহারাদের সেবায় লাগবে।

হঠাৎ এরই মধ্যে ঘটে গেল একটা বিপর্যয়। অকল্পিত আকস্মিক।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনে হিন্দু মুসলমানে সে কী মিলনের উৎসাহ আনন্দ। নাখোদা মসজিদে হিন্দুদের সে কী সমাদর। প্রাণখোলা আলিঙ্গন। স্বয়ং গান্ধীজী বেলেঘাটায় পীড়িত মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করছেন। মনে হল দুর্যোগের অবসান হল বুঝি। কিন্তু আশ্চর্য, কোথায় লুকিয়েছিল অবিশ্বাসের পাপ—তার সঙ্গেই থাকে হিংসার পাপ—হঠাৎ তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আবার দপ করে জ্বলে উঠল দাঙ্গার আগুন। মহাত্মাজী অনশনব্রত ধারণ করলেন। আত্মাহুতি দিয়ে এ আগুন নেভাবেন। কিন্তু তার আগেই তিনটি মহাপ্রাণ নিজেদের আহুতি দিয়ে বললেন—'শান্তিরস্তু'। শান্তি হোক। শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে আহত হলেন—শচীন মিত্র, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল দাসগুপ্ত।

আরতি বসেছিল মহাত্মাজীর পদপ্রান্তে ঘরের এক কোণে; তার মনে হল অন্ধকার হয়ে গেল সব। শচীনদা আহত হয়েছেন। বাঁচবার আশা নেই!—তাকে এই পথের সিংহদ্বার খুলে প্রবেশপত্র দিয়েছিলেন শচীনদা—সেই শচীনদা নেই!…

আর্তস্বরে অন্তরে অন্তরে সে ভগবানকে ডেকে বলেছিল—'হে ভগবান, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। বাংলার মহাপ্রাণ পুষ্পটিকে অকালে ঝরিয়ে দিও না।'

সে ছুটে এল বাগবাজার।

বাগবাজার থেকে শবযাত্রা শ্মশানে এল। পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন আচার্য কৃপালনী। সে দেখেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন। একটি লোকোত্তর বিষণ্ণ মহিমার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সে। হঠাৎ সে আচ্ছন্নতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এ কি বিস্ময়!

শ্মশানের ওদিকে দাঁড়িয়ে প্রবীর। ওপাশে সেই বধূটি। কার শব নামানো রয়েছে।

শচীনদার শবযাত্রার সঙ্গে শ্মশানে এসেছিল শেষ প্রণাম জানাতে, আর ইচ্ছে ছিল একটু ছাই সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে। শ্মশানে এসে ওপাশে তাকিয়ে সে চমকে উঠল।

ড্রাইভার রতন—প্রবীরের প্রেত, আর সেই প্রেতিনী। একটা চিতার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে! মুহূর্তের জন্য সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি দেখতে হল তাকে, এই পবিত্রক্ষণে ওই ওদের না দেখলেই যেন ভাল হত। মুখ ফিরিয়ে নিলে সে। তাকালে শচীন মিত্রের চিতার দিকে। কিন্তু কী বিচিত্র সন্নিবেশ! একদিকে মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ, অন্যদিকে জীবন্ত প্রেত। তার মুক্তি নেই, মুক্তি নেই! হতমান হতশ্রী—মূঢ় অপাংক্তেয় জীবন্ত প্রেত!

এদিকে চিতার আয়োজন হচ্ছে। শ্মশানঘাটে জীবনের ঢেউ এসে লেগেছে। লোকারণ্য। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। কুসুমাস্তীর্ণ করে দিচ্ছে ইহলোক থেকে লোকান্তরে যাবার পথ।

ওই পথে যাবে মহাযাত্রী।

মুখ ফিরিয়ে কিন্তু থাকতে পারলে না সে।

না। আজ তার আর ঘৃণা নেই। বিদ্বেষ নেই। করুণাই হচ্ছে। শ্মশানে এসেছে কেন? কি হল? বধূটিও এসেছে। তবে? মুখ ফিরিয়ে দেখলে আবার।

ও! প্রবীরের নকল-মা যাচ্ছেন। খাটের ওপাশে মুখখানা দেখা যাচ্ছে। হ্যা সেই বৃদ্ধাই বটে। হতভাগী। জানতে পারলে না তার সন্তান সেজে এক প্রেত তার জীবনের স্নেহের পরমান্ন আহার করে গেল।

কিন্তু প্রবীর এমন করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ক্লান্ত শ্রান্ত ভাবলেশহীন মুখ। সব যেন ফুরিয়ে গেছে!

বউটি দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। নিষ্পলক চোখ। মনে হচ্ছে যেন ভরা গঙ্গার স্রোতের উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে কোথায় যেন চলে গেছে—না যেতে চাচ্ছে। নদীর মোহনা—সেই সাগরসঙ্গম পর্যন্ত! সে দৃষ্টি না দেখলে কল্পনা করা যায় না। ওঃ, বড় আঘাত পেয়েছে ওরা দুজনে। ওই বুড়ীই বোধ করি এই দুজকে এক করে বেঁধে এই পাপ করিয়েছে। সে তো শুনেছে, সে জানে—মানুষ বুড়ো হওয়ার সঙ্গে কেমন করে চতুর হয়, ধর্মের ভাণ করে অধর্ম করতে শেখে, কেমন করে কন্যা বিক্রী করে, বধূকে পাপ করায় অর্থের জন্য।

না—আজ আর ও চিন্তা থাক। শচীন মিত্রের চিতার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করবার মত বল দাও। আজ এই মুহূর্তে যেন ওদের ঘৃণা না করি।'

পাড়ার লোকজনেই—রতন ড্রাইভারের সঙ্গীরা চিতা সাজাচ্ছে। প্রবীরের যেন চিন্তার অবধি নেই। কিসের এত চিন্তা?

শবটিকে চিতায় চাপানো হল।

একদিকে জয়ধ্বনি উঠছে। জীবনের জয়গান। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে ওই পরাজিত পতিত আত্মার প্রতি মমতা সহৃদয়তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। প্রবীর কি আজ অনুতপ্ত? অথবা বিব্রত? বউটি এগিয়ে আসছে। হাতে মুখাগ্নির আগুন তুলে নিচ্ছে। প্রবীর সেই চোখ বুজে দাঁড়িয়ে। অত্যন্ত চিন্তাকুল মনে হচ্ছে। বধূটিই বা এভাবে দাঁড়িয়ে কেন?

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আরতি এগিয়ে গেল। যেন এরপর আর থাকতে পারলে না। যে-অধঃপতনেই পতিত হয়ে থাক, একদিন উপকার সে অনেক করেছে। বলেছিল, 'আপনার ভেবে করেছি, আপনার ভেবে নিতে পারলে মনে ও-কথা উঠবে না মিস্ সেন!' কিন্তু আপনার তো হয় নি। আজ যদি কিছু উপকারেও লাগতে পারে, কিছু যদি শোধ হয়, হোক। তার ব্যাগে কুড়িটা টাকা আছে।

এগিয়ে গিয়ে সে কাছে দাঁড়াল। প্রবীর তাতেও চোখ খুললে না। সে ডাকল, "শো—"। সংশোধন করে ডাকলে, "শুনুন!"

প্রবীর চোখ মেলে চেয়ে একটু যেন চকিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, "আপনি। শচীন-বাবুর শেষ যাত্রায় এসেছেন? ওঃ মহাপ্রাণ চলে গেলেন!"

সে-কথার উত্তর দিলে না আরতি। বললে, "উনি, মানে বউটির শাশুড়ী মারা গেলেন?"

"হ্যাঁ।"

এ অবস্থায় কথা বলা বড় কঠিন। চুপ করে থেকে মনে গুছিয়ে নিয়ে আরতি বললে, "একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না?"

"না, বলুন। যা বললেন, আমি মাথা পেতে নেব।"

"না, সে-সব কোন কথা আমি তুলব না। তোমার স্মৃতি, তার জন্যে ক্ষোভ দুঃখ আমি মুছে ফেলেছি। তা ছাড়া আজ আমি মহৎ আশ্রয় পেয়েছি—"

"আমি জানি, মহাত্মার সঙ্গে আপনি নোয়াখালি গিয়েছিলেন। সেদিন বেলেঘাটা যাচ্ছিলেন, তাও দেখেছি।"

"ও কথা নয়। আমি আজকের কথা বলছি। আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, আপনি চোখ বুজে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে আছেন। এসে অবধিই দেখলাম।"

"হ্যাঁ। আজ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে। সে-সব শুনে আপনি কী করবেন মিস সেন?" একটু হাসলে সে।

আবারও মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে আরতি বললে, "শ্মশানে দাঁড়িয়ে চিন্তা—মানে উনি আপনার মা হলে কিছু বলতাম না।" আরও একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "কোন দরকার যদি থাকে, টাকাকড়ি—"

"না। ধন্যবাদ আপনাকে দেব না। সে সব কিছু দরকার নেই। এ অন্য কথা।" হেসে চুপ করলে সে। হঠাৎ তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একটু শঙ্কিত ভাবেই ডাকলে, "রতি! অত ঝুঁকো না।"

রতি—সেই বধূটি মুখাগ্নি সেরে গঙ্গার কিনারায় আল্‌সের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রতি বললে, "ভয় নেই। আর রতি কেন? সতী বলো।" তারপর হঠাৎ ঘুরে বললে, "তুমিও আগুন দাও না এইবার। যে অবান্ধবা বান্ধবা বা যে অন্য জন্মনি বান্ধবাঃ—আমি মন্তর বলে দিচ্ছি, বলো—।" সে আরতিকে দেখেও দেখলে না। আশ্চর্য মেয়ে! ও-মেয়েরা বোধ হয় এমনিই হয়। ওদিকে তখন জয়ধ্বনি উঠেছে। কে গান ধরেছে, 'জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম।'

প্রবীরের যাত্রার সময় যেন ওই দ্বিতীয় চরণটি কেউ গেয়ে দেয়।

দশ

'আরতি দেবী…'

একখানা চিঠি। প্রথমে মিস্ সেন লিখে কেটে লিখেছে আরতি দেবী! প্রবীরের চিঠি!

দুদিন পর সে চিঠিখানা পেলে। মোটা খামের চিঠি। গান্ধীজীর অনশনভঙ্গের পর

বেলেঘাটা থেকে বাড়ি ফিরে এসে চিঠিখানা পেলে। তার নিজের কপালিটোলার বাড়িতে। বাড়িতে এসে কেউ দিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে তখন সে প্রায় একা। থাকবার মধ্যে সুধা বউদিরা দিয়েছেন একজন গুর্খা দারোয়ান। আর সে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে তার পুরনো ভাড়াটে এক ঘর। তারা মা আর ছেলে। দাঙ্গায় কেমন করে বেঁচেছিল জানে না। মা বেঁচেছিল আরতি জানে; আরতির সঙ্গেই বাগবাজার গিয়েছিল একসঙ্গে—এক লরীতে। ছেলেটি ১৬ই আগস্ট কাজে বেরিয়ে আর ফিরতে পারে নি। পারে নি বলেই বোধ হয় বেঁচে গিয়েছিল। তারপর কেমন করে মাকে পেয়েছিল আরতি জানে না, তবে আরতি এ বাড়িতে আসতে তারা এসে বলেছিল—'আমরা ফিরে আসতে চাই।' আরতি না বলে নি। ছেলেটি ভদ্র। নোয়াখালিতে আরতি যখন ছিল তখন সে তাকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল—'আপনার এই আশ্চর্য পরিবর্তনের জন্য আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। আপনার বাড়িতে যখন গান্ধীজী নেতাজীর সম্পর্কে কটূক্তি করে আলোচনা হত তখন শুনে দুঃখ পেতাম।'

ভাল লেগেছিল আরতির। তাই তারা আসতে সে খুশী হয়েছিল।

চিঠিখানা পত্রবাহক ছেলেটির হাতেই দিয়ে গিয়েছিল। সে বলল, "আপনি বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ, বোধ হয় পাঁচ মিনিট পর। মোটর মিস্ত্রী একজন।" চিঠির এদিকে প্রবীরের নামও লেখা আছে। প্রবীর চ্যাটার্জি। বিস্মিত হল আরতি—আবার ভুরুও কোঁচকাল তার। কী? কেন? ফেলে দেবে? না! খুললে সে চিঠিখানা। উপরে লেখা, "চিঠিখানা পড়বেন। আমার জন্য দুঃখ অনুভব করেছেন, সেই সৌভাগ্যের দাবিতে অনুরোধ করছি।" নীচে কালির দাগ চিহ্নিত করে সর্বাগ্রে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রথমে 'মিস্ সেন' লিখে কেটে 'আরতি দেবী' সম্বোধন করেছে।

"আরতি দেবী!

"আজ আবার আমি প্রবীর।

"জীবনের বিচিত্র দুশ্ছেদ্য বন্ধন কাল ছিঁড়েছে। এ বন্ধন আপনি ছেঁড়ার আগে আমার নিজের ছেঁড়ার উপায় ছিল না। এবং এ বন্ধনের সম্পর্কে কোন কথা বলবারও অধিকার ছিল না। সংসারে এমন অবস্থাও হয় আরতি দেবী, যখন মিথ্যাই হয় সত্যের চেয়েও বড়। আমার তা-ই হয়েছিল। সেদিন যে কথাটা বলতে গিয়েও বলি নি, এবং এই বউটি এসে পড়েছিল—সেই কথাটাই বলি আগে। আপনি আমাকে এতো ধিক্কার দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ওকে বিধবা বিবাহ করলে না কেন?' উপায় ছিল না আরতি দেবী। নইলে, আপনি তো আমাকে জানতেন, বিধবা বিবাহে আমার কোন সংস্কারের বাধা কোন কালে ছিল না। এমন কি, বিবাহ না করেও ওকে নিয়ে যদি আমার শিক্ষাদীক্ষা মত চাকরি করতাম, তাতেই বা আমার কে কী করত? প্রবৃত্তিই যদি হয় এবং লজ্জা বা সামাজিক সংস্কার না থাকে, তবে কিসের বাধা? বর্তমানে সমাজে রাষ্ট্রে উচ্চপদস্থ যারা এবং অতি মডার্ন যারা, তাদের তো এ চাঁদের কলঙ্কের মত। জানি না স্বাধীন ভারতবর্ষে কী হবে। আমার চাকরি ছিল ইংরেজ রাজত্বে, যুদ্ধবিভাগের। আপনি মডার্ন লাইফের অনেক জানেন, অনেক দেখেছেন, কিন্তু

যুদ্ধবিভাগের এলাকায় ইংরেজ আমলে উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের প্রমোদ আপনি দেখেন নি। প্রমোদ কেন, তাদের সংসার-জীবনও জানেন না। থাক সে-কথা। আমি আমার বিচিত্র অবস্থার কথা বলছিলাম। যে অবস্থায় মিথ্যাই বড় হয়ে উঠল, সত্য মাথা তুলে প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারলে না। হার মানলে। আমার সত্য ইচ্ছে করে হার মেনেছিল বলেই আমি মিথ্যেকেই মাথায় তুলে নিয়েছিলাম—এবং তার জন্য কোনদিন কারুর কাছে লজ্জিত হই নি—আপনার কাছেও হই নি। সে নিশ্চয়ই আপনার মনে রয়েছে। আমার নিজের কাছেও হই নি। তাই পেরেছিলাম আপনার সে-দিনের কথাগুলি সহ্য করতে, আপনার কাছে মুখ তুলতে এবং এই মিস্ত্রী-জীবনের মধ্যেও সুখী হতে। ওই বস্তীতে বাস করেও দুঃখ পাই নি, মিস্ত্রী সেজে ওই খাটুনি খেটে অসুবিধে বোধ করি নি। না—ভূমিকা থাক এইখানেই, যা জানাতে চাই তা-ই বলি।

"সেদিন কিছুটা বলেছি। বিবরণটা তার আগে থেকেই শুরু করি। যেদিন আপনার সঙ্গে আমার 'তুমি' বলার দোর খুলেছিল, সেই দিন থেকে শুরু করি। সাইক্লোনের দিন। এ এক বিচিত্র কাহিনী আরতি দেবী।

"আমি যখন পুনা আমেদাবাদ এবং উত্তর ভারত ঘুরে এলাম, তখন আমার মনে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। জীবনে বাইরের জগতের আঘাতে যা ঘটে, নিজের মনের অবস্থানুযায়ী প্রতিক্রিয়ায় তার পরিবর্তন মানুষ ঘটিয়ে নেয়। ইংরেজের রাজকর্মচারীর ছেলে রাজকর্মচারীর ভাই, নিজে যুদ্ধবিভাগে চাকরি নিতে গেছি আমি, আমার মনে উত্তর ভারতের আগস্ট আন্দোলন একটা আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল। এরা যা করেছিল, এবং তার প্রতিকারে ইংরেজ তার লালমুখো গোরাদের ছেড়ে দিয়ে যা করিয়েছিল, তাতে মনের মধ্যে আমার যা হওয়া উচিত তা-ই হয়েছিল। তাই সেদিন লঘুভাবে কী একটা কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম, এ-দেশের লোক এমনভাবে লড়াই দিতে পারে এ কি কেউ জানত? সুভাষচন্দ্র বিদেশে গিয়ে সামরিক অধিনায়কের পোশাক পরে আমির স্যালুট নিতে পারেন, এ কি তিনি জানতেন? আপনি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে কটু কথা বলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। মনে পড়বে বোধ হয়। আমার মনটা খুঁত-খুঁত করেছিল। তখন আমিও আমার মনকে বুঝি নি। তার পরদিনই চলে গিয়েছিলাম চাকরির তলব পেয়ে। ট্রেনিংএর জন্য ঘুরতে হল কয়েকটা সামরিক কেন্দ্রে। ইংরেজ অফিসারের গাল শুনলাম। মনটা আরও বিষিয়ে গেল। মনে মনে শপথ নিলাম। মনে পড়ে গেল রথীনদার কথা। আপনার দাদা। আপনারা জানতেন না, রথীনদা ছিলেন গোপনে গোপনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী। রীতিমত তাঁর দলের সভ্য ছিলেন। আমাদের কলেজে তিনিই ছিলেন ওই দলের প্রতিভূ। তিনি যেদিন লণ্ডনে এয়ার-রেডে মারা গিয়েছিলেন, সেদিন বোধ হয় বাড়িটা হিট হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সৈনিকের মত বিপুল উত্তেজনায় উৎসাহে দাঁড়িয়েছিলেন, খাড়া হয়ে দেখেছিলেন লণ্ডন রেড। কোন শেল্টারে মাথা গুঁজে দিয়ে বসে বা শুয়ে থাকেন নি। কলেজে তিনি বলতেন, 'এ ছাড়া আমাদের পথ নেই। অন্তত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার পথে দাঁড়াতেই হবে। তাই আমার কল্পনায় রথীনদা সেদিন ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কলেজে

রথীনদার অনুগামী ছিলাম না। এসবে বিশ্বাসও করতাম না। কিন্তু চাকরি নিয়ে—আমি সেটা অনুভব করলাম। সেই অনুভূতি নিয়েই ফ্রন্টে যাওয়ার পথে কলকাতায় নেমে দেখা করতে গেলাম আপনার সঙ্গে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, আপনিও আপনার বেদনার তাড়নায় একটা পথে নেমে গিয়েছেন। একদল সঙ্গিনী এবং কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে আপনি সমিতি খুলে কাজে মেতেছেন। মত ভাল বা মন্দ, সে-কথা নয়। মত—সব মতই ভাল। ভাল ভিন্ন মত হয় না আরতি দেবী। ভালতে যাওয়ার পথ ভাল-মন্দ হয় এবং সেই পথ বাছা নিয়ে সংসারে তর্ক বাধে, শেষ পর্যন্ত বিরোধ হয়। সেই তর্ক সেই বিরোধ অনুভব করেছিলাম সেদিন, সেই মুহূর্তে। তাই সেদিন যা বলতে গিয়েছিলাম, তা বলতে পারি নি; চলে এসেছিলাম। যা বলতে গিয়েছিলাম, সে-কথার আর আজ পুনরুক্তি করব না, করার অধিকার নেই; তবে আপনার তা মনে আছে, আমি চিঠিতে লিখেছিলাম। সে-দিন গঙ্গার ধারে চিঠির কথা আপনি তুলেছিলেন। আমিও ইঙ্গিতে ওই জবাবই দিয়েছিলাম। বলতে গিয়েছিলাম—কিন্তু বলি নি। যাক।

"ফ্রন্টে চলে গেলাম স্পেশাল ট্রেনে। ঈস্টার্ণ ফ্রন্টে, আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে। সেখানেই পেলাম এই রতনকে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারস্ ইউনিটে। সে পদবীতে জমাদার, কাজে মিস্ত্রী। আমি তার গ্রুপের ক্যাপ্টেন। দাড়িগোঁফ চুলওয়ালা ভট্চাজ বংশের ছেলে। ধর্ম বংশ অনেক দোহাই পেড়ে সে দাড়িগোঁফ বজায় রেখেছিল। লোকটি অদ্ভুত নিপুণ মেকানিক। বিশেষ করে মোটর-যন্ত্র-বিদ্যায়। মোটর বিকল হলে একটু নেড়েচেড়েই ধরে দিত কোথায় কী হয়েছে। ঠিক যেন পুরনো কালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নাড়ী দেখে রোগ নির্ণয়ের মত। আর তেমনি ছিল জেদী। আর ছিল আমার মত ক্যাট্স্ আই। রঙেও সাদৃশ্য ছিল, তবে তার ছিল তামাটে; আর গলাও ছিল আমার মত ভারী। আমাদের ইউনিটের কর্তা একজন ইংরেজ, সে মধ্যে মধ্যে বলত, 'ও তোমার কেউ হয়?'

"বলেছিলাম, 'না'।

"সে বলেছিল, 'আশ্চর্য তো'।

"একদিন তাঁবুতে মদ খেতে খেতে বলেছিল, 'চ্যাটার্জি, তোমার বাবা তো হাই অফিসিয়েল ছিলেন? সত্যি না'?

"বলেছিলাম, 'হ্যাঁ'।

" 'তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় আয়া ছিল'।

" 'হ্যাঁ। তবে আয়া নয়, ঝি বলি আমরা মেড-সারভেন্টকে'।

"ওই জমাদার ভট্টাচারিয়ার মা নিশ্চয় তোমাদের বাড়িতে মেড-সারভেন্ট ছিল। বোধ হয় তোমার মনে নেই। নিশ্চয় তোমার জন্মের আগে। কারণ ও তোমার থেকে বয়েসে বড় হবে'।

"আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কী উত্তর দেব ভেবে পাই নি। কোমরের রিভলভারটা যেন নিজেই নড়ে উঠেছিল। কিন্তু মিলিটারি ডিসিপ্লিন, হাত দিতে পারি নি। শুধু উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখ বোধ হয় লাল হয়েছিল। লক্ষ্য করে বলেছিল, 'আই নো

চ্যাটার্জি, তোমাদের এ-দেশের সব জানি আমি। আমার গ্র্যাণ্ডপা এখানে প্ল্যাণ্টার ছিল, তার তিনটে আয়া ছিল—য়্যাণ্ড—আই নো'!

"আমি প্রতিবাদ জানিয়ে চলে এসেছিলাম। নাকী আওয়াজে একদল ইংরেজ কথা কয় শুনেছেন? লোকটা সেই নাকী আওয়াজে তবুও বলেছিল, 'আঁই নোঁ, আঁই নো ইঁয়োর ইঁণ্ডিয়া'।

"তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

"আসামের অরণ্যভূমে তখন সন্ধ্যা নামছে। সূর্য অস্ত গিয়েছে। অরণ্যের আশ্রয়ে অন্ধকার বিচিত্র গাম্ভীর্যে থমথম করে। সেদিনের থমথমানি আমার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে অজস্র ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মধ্যে কোন একটা রাত্রিচর পাখি সন্ধ্যায় প্রথম পাখসাট মেরে পাখা মেলেছিল এবং অত্যন্ত কর্কশস্বরে ডেকে উঠেছিল। আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, যে-কোন উপায়ে হোক এ রেজিমেণ্ট থেকে ট্রান্সফার আমাকে নিতেই হবে।

"নিজের তাঁবুর দিকে আসছিলাম। নিজের বুটের শব্দে বুঝতে পারছিলাম, আমি আত্ম হত্যা করতে পারি। পথের পাশে সাধারণ কর্মীদের ছাউনি। তারই একটা থেকে রতনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। সে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করছে। ভারী গলার আওয়াজ সন্ধ্যার অন্ধকারে কাঁসরের শব্দের মত মনে হচ্ছিল। চণ্ডী আবৃত্তি করছিল। খানিকটা আগে কয়েকটা ভারী যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। দিনেরবেলা ওগুলো দৈত্যের মত কাজ করত। মাটি পাথর কেটে চষে এগিয়ে চলত একশোটা কি হাজারটা বুনো শুয়োর বা মোষের মত। পথ তৈরী হচ্ছিল। আমরা পথ কেটে চলি আগে আগে। যান্ত্রিক বাহিনী যাবার জন্য পথ। ছাউনি থেকে দু-মাইল আগে কাজ হচ্ছিল। জনমানবহীন পাহাড় এবং বন চারিদিকে। শোনা যাচ্ছিল, শত্রুবাহিনী খুব দূরে নয়, দশ-বিশ মাইলের মধ্যেই। মনে হয়েছিল, আজই রাত্রে যদি তারা হানা দেয় তো বড় ভাল হয়। অন্তত বন্দী হয়ে মুক্তি পাই। তখন নেতাজী এসেছেন, পূর্ব দিগন্তের রণাঙ্গনে নতুন সাড়া জেগেছে। বনভূমে উদয় মুহূর্তের সূর্যরশ্মির একটা ছুটো বাঁকা রেখার মত সে সংবাদ আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু খুব অল্প লোকেরা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের ও-নাম মুখে আনার উপায় ছিল না। তবে ওরা নিজের মধ্যে মধ্যে নেতাজীকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করত। তা থেকেই বুঝতাম, সংবাদ সত্য। সেদিন মনে হয়েছিল, বন্দী হলে নেতাজীর সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেব। বলব, 'আমার রক্ত আমি দেব, প্রাণ দেব, আমায় স্বাধীনতা দাও তুমি, আমার মনুষ্যত্বের মর্যাদা আমাকে দাও।'

"এরই মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলাম রতনলালের ঘরে। রতনলালের সন্ধ্য স্তব পাঠ শেষ হয়েছে তখন। আমাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সৈনিকের অভিবাদন জানিয়ে বলেছিল, 'ইয়েস স্যার'!

"সেই দিন আলাপ করেছিলাম ভাল করে। কলকাতার কাছাকাছি একটি পণ্ডিতপ্রধান গ্রামের পণ্ডিত-বংশের ছেলে। একদিন মর্যাদা ছিল। আজ মর্যাদা গিয়েছে। তাই নতুন পথ ধরেছে। অন্ন চাই, মর্যাদা চাই, ঘর চাই। ইংরিজী পড়তে শুরু করেছিল, ম্যাট্রিক পাস করতে

পারে নি। শেষে মেকানিক হয়েছে ; বেশী উপার্জনের জন্য যুদ্ধে এসেছে। ঘরে মা আছে, স্ত্রী আছে। মায়ের একমাত্র সন্তান। মা কিছুতেই আসতে দেবে না, সে জোর করে এসেছে। বলেছিল, 'বলুন না, অবস্থা ফেরাবার এমন সুযোগ ছাড়তে আছে'? কথায়-কথায় বলেছিল, 'জীবনে ধিক্কার হত। আমার স্ত্রী পরমা সুন্দরী। রাজরাণী হবার উপযুক্ত। আমার হাতে পড়ে সে হয়েছে ঘুঁটে-কুড়ুনী। সত্যিই ঘুঁটে দিতে হয়। ফিরে গিয়ে বাড়ির অবস্থা ফেরাব। একটা মোটর মেরামতের কারখানা করব। খুব চলবে। মাকে বললাম, তুমি খুশী হয়ে ছেড়ে দাও, আর আশীর্বাদ কর, আমি অক্ষত দেহে ফিরে আসব। মা আমার সাক্ষাৎ সতী। তিনি আশীর্বাদ করেছেন, আমি যদি সতী হই তবে তোর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। আমি ব্রত করলাম। যতদিন না ফিরবি এই ডান হাতে জপ ছাড়া কিছু করব না। বিছানায় শোব না। তেল মাখব না। হবিষ্যি করব। আর তিন হাজার দুর্গামন্ত্র জপ করব। তা-ই করছেন তিনি'। সব শেষে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে অনেকদিন থেকে ইচ্ছে স্যার। আপনার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে। বামুনের ঘর তো, হয়তো খুঁজলে দু-তিন পুরুষের মধ্যে রক্তের মিল পাওয়া যাবে'।

"পত্র দীর্ঘ হচ্ছে আরতি দেবী। সংক্ষেপ করতে হবে। রাত্রে বসে পত্র লিখছি। কাগজও বেশী নেই। আপনারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। সকাল হলেই বের হতে হবে রতনের জীবনের পালা শেষ করতে। তাই একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনায় আসি। আমি রতন হলাম কী করে? কেন? ১৯৪৪ সন, মার্চ মাস। ওদিকে জাপানীদের পিছনে রেখে আই-এন-এ আজাদ-হিন্দ্ এগিয়ে আসছে। ইংরেজ হটছে। বাতাসে সুরের রেশ যেন শুনতাম, 'কদম-কদম বাঢ়ায়ে যা, খুশিকে গীত গাহে যা।' খুব কড়াকড়িতে গোপন রেখেছিল ইংরেজ আই-এন-এর খবর। তবু কানাকানিতে খবর পেতাম। মুখ খোলার উপায় ছিল না। মিলিটারি বিভাগের সব চেয়ে বড় শিক্ষা, চোখে দেখো, কানে শুনো, মুখ খুলো না। মুখ মৎ খুলো।'

"আমরা পিছিয়ে চলছি। হটছি। পালাচ্ছি। সম্মান বজায় রাখতে ইংরেজ অফিসারেরা বলছে, 'স্কিলফুল রিট্রিট'!

"মাথার উপর গুরুগুরু শব্দ উঠল। শত্রুবিমান। খান তিনেক। দেখতে দেখতে ছোঁ দিয়ে নেমে এল। তারপর সে এক ভয়াবহ পরিণাম। কলকাতার এয়ার-রেডের অভিজ্ঞতা থেকে এ কল্পনা করা যায় না। পায়রার ঝাঁকের উপর বাজপাখির ছোঁ যারা দেখেছেন? মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়! ঠিক তা-ই হল। কোন্ দিকে কে কোথায় গেল, পড়ল, লুকোল কেউ বলতে পারে না। প্লেন কখানা চলে যেতে না যেতে আশেপাশে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে। আমি বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ রতন ডাকলে 'স্যার'! একখানা জীপ পেয়েছে রতন। 'উঠে পড়ুন'।

"পিছনে দেখি অজ্ঞান হয়ে আছে আমাদের ইউনিটের কম্যাণ্ডিং অফিসার।

"রতনের হাতে জীপ। সে ছুটল এঁকেবেঁকে ; বনের ভিতর দিয়ে, খাল ডিঙিয়ে, চড়াই ভেঙে চলল। পিছনে রাইফেল মেশিনগানের অবিশ্রান্ত শব্দ উঠছে। বনভূমে তার প্রতিধ্বনি বাজছে পাহাড়ে পাহাড়ে। চিৎকার উঠেছে। আঃ, আমি যদি সেদিন অপেক্ষা কর-

তাম। কিন্তু ওই সময়টায় মানুষের স্নায়ু ঠিক থাকে না।

"হঠাৎ এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড়াল। রতন বললে, 'জলদি নামুন'। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে রতন টেনে ইংরেজ অফিসারটাকে নামালে। তার তখন জ্ঞান হয়েছে কিন্তু সম্বিৎ ফেরে নি। আমিও লাফ দিয়ে নামলাম।

"ব্রেক ফেঁসে গেছে। ভাগ্যক্রমে একটা পাথরে আটকে গেছে সামনের চাকা। তার সামনে ঢাল। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারে নি রতন। হেডলাইট জ্বালতে সাহস করে নি। আলোর সন্ধান খুঁজতে হয় না। আলো নিজেই সন্ধান দেয়। শত্রুর দৃষ্টি গাছের মাথায় জেগে থাকে।

"রতন বলেছিল, 'হাঁটুন! এগিয়ে চলুন!'

"অন্ধকার নামছিল অরণ্যে। আমরা তিনটি মানুষ। শত্রুর হাত থেকে পালাচ্ছি। আমার মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল, পালাব না, অপেক্ষা করব, ধরা পড়ব। আই-এন-এতে যোগ দেব। কিন্তু ইচ্ছাটাকে কার্যকরী করবার মত অবকাশ পাচ্ছিলাম না, পা দুটো ওদের সঙ্গেই চলেছিল।

"ইংরেজটি জীপ থেকে ছটকে পড়ে আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল; রতন জীপ চালিয়ে আসবার পথে দেখে তুলে নিয়েছিল; লোকটা চোট খেয়েছিল পিঠে। হাঁটতে পারছিল না। রতন এক জায়গায় বলেছিল, 'তাহলে এখানটাতেই রাত্রের মত বিশ্রাম করুন।' সামনে একটা ঝরণা। বন খানিকটা ফাঁকা সেখানটায়। ইংরেজটির সঙ্গে ছিল মদের ফ্লাস্ক, জলের বোতল, লোকটার সঙ্গে খাবারও ছিল পিঠের ব্যাগে। আমাদের রিট্রিটের পথেই আক্রমণ হয়েছিল; পালাবার জন্যে আয়োজনের ত্রুটি রাখে নি, কিন্তু জীপ উল্টে সে-সব গিয়েও সঙ্গের সরঞ্জাম কম ছিল না। লোকটা একাই খেতে শুরু করেছিল বসে বসে। আমিও বের করে খেতে গিয়ে সংকোচ বোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, 'রতন!'

"রতন হেসে বলেছিল, 'আমার একটু পুজো আছে।' তার ব্যাগ থেকে কী সব বের করতে আরম্ভ করেছিল। চলে গিয়েছিল ঝরণার ধারে। সামনেই কয়েক গজ মাত্র। সিগারেট লাইটার জেলে ঘোরাতেই বুঝলাম, আরতি করছে।

"ইংরেজটা চিৎকার করেছিল, 'বাতি নেভাও।'

" 'নেভাচ্ছি। এখানে কেউ দেখতে পাবে না।'

" 'নো-নো।' লোকটা উঠে এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল, 'ইউ ট্রেটার!' চমকে উঠে আমিও ছুটে গেলাম। দেখলাম কালীমূর্তির আরতি করছে রতন, পাশে ব্যাগ থেকে বের করা আরও ছবি রাখা হয়েছে। সে ছবি গান্ধীজীর।

"লোকটা ছুটে গিয়েছিল। রতনের গলা ধরে ফেলে অসুরের মত বুকে বসে ঘুষির পর ঘুষি মারতে আরম্ভ করেছিল এবং শেষে রিভলবার বের করে ধরেছিল, 'উইল শুট ইউ—ইউ ডগ!'

"আমার হাতে তখন রিভলবার উঠেছে। গুলি আমি করেছিলাম স্থির লক্ষ্যে। একটু

দেরি হয়ে গিয়েছিল। একটু। দুটো গুলি, এক মুহূর্তের আগে-পিছে বেরিয়ে গেল। আমারটা আগে, ওর হাতেরটা পরে। ওর ট্রিগারের হাতটা যে টান শুরু করেছিল, সেটা আহত হলেও প্রায় আপনাআপনি কাজ করেছিল। শুধু নড়ে গিয়েছিল। বুকে না লেগে লেগেছিল হাতের উপরে কাঁধে।

"মিলিটারি আইনে অপরাধী হয়ে গেলাম। রতন মরে নি। কিন্তু মরলেই ভাল হত। ওকে নিয়ে সেই অবস্থাতেই হাঁটতে শুরু করেছিলাম। ওঃ, সে কী অবস্থা! ভীষণ অরণ্যে পর্বতে একজন আহতকে নিয়ে আমি একা। তিন দিনের দিন রতনের হাত ফুলল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। এই দুদিন শুধু সে বলেছিল তার বউএর কথা, মায়ের কথা। মা আর বউ। বউ আর মা। তাদের ফটো বের করে শত-সহস্রবার দেখিয়েছিল। তিন দিনের দিন আর চলবার ক্ষমতা ছিল না তার, আমারও বইবার ক্ষমতা ছিল না। সেদিন চলায় ক্ষান্ত দিয়ে তাকে একটা গাছতলায় শুইয়ে আমি ছুটেছিলাম জলের জন্যে। সামনেই জল। জলের কাছে গিয়ে থাকতে পারি নি, শরীরের জ্বালায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ রতনের চিৎকারে ছুটে চমকে উঠলাম। কী হল? ছুটে গেলাম। গিয়ে শিউরে উঠলাম। রতনকে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েতে ছেঁকে ধরেছে। এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে এলাম। রতনের চোখ দুটো ভর্তি হয়ে গেছে পিঁপড়েতে, খেয়ে নিচ্ছে কুরে কুরে। রতন চিৎকার করছে, 'মা—মা—মা!'

"আমি আর থাকতে পারলাম না। আমার রিভলভারটা তুলে নিয়ে গুলি করে তাকে মুক্তি দিলাম। তারপর ছুটে পালালাম। কিছুদূর এসে ফিরলাম। ফিরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম আমার ব্যাগটা। সঙ্গে সঙ্গে ওরটাও নিলাম।

"কলকাতায় এলাম ভিক্ষুকের বেশে। ভিক্ষাবৃত্তি করেই। পায়ে হেঁটে, বিনা টিকিটে রেলে চড়ে। তখন দাড়িগোঁফ গজিয়েছে। মনে অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণা রতনের জন্য। বড় ভালমানুষ। আর কানে বাজছিল তার কথা, মা আর বউ! বউ আর মা! গুলি খেয়ে আহত হয়ে একদিন আমাকে বলেছিল, 'যদি মরে যাই, তবে যেন খবরটা তাদের দেবেন।' তারপরেই বলেছিল, 'আমি মরব না। আমার মা কালীমায়ের কাছে হাত বাঁধা দিয়ে হবিষ্যি করে মাটিতে শুয়ে ব্রত করে আছে। বলেছে, আমি যদি সতী হই, তবে তার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তা—' হেসে বলেছিল, 'যুদ্ধে একটা গুলি কাঁধে লাগা, এ কি একটা বেশী কিছু? মায়ের ব্রতের পুণ্য যদি মিথ্যে হবে, তবে লাগানো নলের গুলিটা কাঁধে এসে লাগবে কেন?'

"কলকাতায় ফিরতে লেগেছিল কয়েক মাস। সন্তর্পণে ফিরছিলাম। দ্বন্দ্বের মধ্যে ফিরছিলাম। ইংরেজটাকে মেরে কোর্ট মার্শালের ভয় ছিল, কিন্তু বেদনা ছিল না। রতনকে মেরেছি স্বীকার করে ফাঁসি যেতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু অন্তর্জ্বালার শেষ ছিল না। গৌহাটি কামাখ্যা পাহাড়ে সন্ন্যাসী সেজে ছিলাম কিছুদিন। শেষে কলকাতায় এলাম। আপনার কাছে যাই নি। ইচ্ছে হয় নি। আপনাকে যাদের সঙ্গে দেখে গিয়েছিলাম, আপনার মন এবং মত যা জেনে গিয়েছিলাম, তাতে মন বার বার বলেছিল, না, কাজ নেই। আপনারও ভাল লাগবে না, আমারও না। আর এই দীর্ঘ দেড় বছর আপনার মন আমার

জন্ম উন্মুখ হয়ে বসে আছে? আপনার পাশের সমারোহ তো দেখে গিয়েছিলাম। কী করব স্থির করি নি, তবে রতনের মা-বউএর খোঁজ করে তাদের কোন রকমে খবরটা দিয়ে যা হয় করব ভেবেই গিয়েছিলাম ওদের সন্ধানে। আপনাকে বলেছি, ওরা তখন গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছে। শুনেছিলাম বাগবাজার অঞ্চলে আছে। পাচিকাবৃত্তি করে। দু-একজন বলেছিল, রূপসী বউটাকে ভাঙিয়ে খায়।

"কলকাতায় ফিরে খুঁজে ফিরছিলাম। তখনও আশ্রয় নিই নি কোথাও। ঠিক করতেও পারি নি কিছু। তখনও ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজ অফিসার হত্যার অপরাধ মাথার উপর। ওই লোকটাকে মেরে বন্দুকের গুলিতে বা ফাঁসির দড়িতে মরবার ইচ্ছে আমার ছিল না। এর অনুকূলে যে ন্যায়শাস্ত্র যে কথাই বলুক, তার বিরুদ্ধে ছিল আমার সর্ব অন্তরের বিদ্রোহ।

"তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়। বাগবাজারের ঘাটে শনি-সত্যনারায়ণের পূজা হচ্ছিল। নিতান্তই ব্যর্থ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একটি বধূ এসে সামনে দাঁড়াল। বড় বড় চোখ, সে যেন জলজল করছে। মুখ, দেহ, এমন কি সারা অবয়বের মধ্যে আছে ওই আশ্চর্য দুটি চোখ, আর ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ক্লান্তি এবং মালিন্যের ছাপ-পড়া দেহবর্ণ। অন্যথায় শুধু কঙ্কাল। যেন যক্ষ্মার রোগী। আর বুঝতে পারা যাচ্ছিল, ঘোমটায় ঢাকা আছে একরাশি চুল। মুখের দিকে তাকাল অসঙ্কোচে; নির্ভয়ে। তারপর চলে গিয়ে ফিরে এল এক বৃদ্ধার হাত ধরে। আমায় বললে, 'নাও—তোমার মা নাও! আমার ছুটি!' এবার চকিতে চিনলাম, রতনের বউয়ের ফটো আমার কাছে তখন, চিনলাম, এই তো রতনের বউ!

"রতনের মা চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মুখে হাত বুলিয়ে কেঁদে উঠল, 'হে শনি-সত্যনারায়ণ, একবার আমার চোখ দুটি ফিরে দাও। একবার! হে শনি-সত্যনারায়ণ!'

"বউটি তিরস্কার করে বললে, 'একবার মা বলে ডাকো! চোখে চিনতে পারছেন না, ডাক শুনে চিনুন!'

"সমস্ত পূজার্থীরা সবিস্ময়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ডাক শুনবে বলে। রতনের মা তখন বলছেন, 'আমি বলেছিলাম, আমি যদি সতী হই—তবে—'

"আমি আর থাকতে পারলাম না, 'মা-মা, ও-সব কথা এখানে থাক্ মা!"

"বুকে জড়িয়ে ধরে রতনের মা বললে, 'চোখে না দেখলেও সেই তোর ডাক শুনে বুক জুড়িয়ে গেল। জুড়িয়ে গেল।'

"*মিথ্যের প্রথম বাঁধন পড়ে গেল আরতি দেবী।*

"*সঙ্গে সঙ্গে বউটি যা করলে, তা কেউ কল্পনা করতে পারে না।* ছুটে গিয়ে গঙ্গায় নেমে স্নান করে এলোচুলে দেবতাকে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমাকে কেউ একখানা ক্ষুর দাও গো, নয়তো ছুরি। আমার বুক চিরে রক্ত মানত আছে, পাঁচ টাকার মিষ্টান্ন মানত আছে, আজ আমার টাকা নেই, মিষ্টান্ন তো পারব না, কিন্তু বুকের রক্ত না দিলে যে আমার প্রত্যবায় হবে। একখানা ক্ষুর দাও গো।'

"এ দেশ বিচিত্র! এল ক্ষুর। অভাব হল না। আশ্চর্য, হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটি ক্ষুর দিয়ে বুকটা চিরে দিলে খানিকটা! রক্ত গড়িয়ে বেরিয়ে এল। ছোট একটা বাটি কেউ যেন নিয়ে এসে ধরল। কে যেন পাঁচ টাকার থেকে বেশী টাকার মিষ্টি এনে নামিয়ে দিলে। শাঁক বাজল। উলু পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

"বাসায় এলাম।

"একখানা অতি জীর্ণ খোলার চাল, ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ঘর, বাসা। সামনে তেমনি ছোট বারান্দা। আশেপাশে এক-একখানা ঘরে এক-একটি পরিবার। তার উপর বৃদ্ধার তপস্যায় যুদ্ধ থেকে বেঁচে হারানো ছেলে ফিরে এসেছে, এই পুণ্যকাহিনী শুনে লোকের ভিড়। সেদিন তাদের ব্যঙ্গ করতে পারি নি। মনে মনেও পারি নি। লোকগুলির প্রায় সকলেই কেঁদেছিল।

"বুড়ী আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। গুণগান করেছিল বংশপুণ্যের, গুণগান করেছিল দেবতার, অহঙ্কার করেছিল নিজের তপস্যার, নিজের সতীত্বের।

" 'কার সাধ্যি? যমের সাধ্যি দূরের কথা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ক্ষমতা ছিল না, সতীর বাছার প্রাণ নেয়। মহাশক্তি সতীর চরণ ধরে, আমি সতী বসে আছি যে!' প্রায় পাগলের মত হাসতে শুরু করেছিল।—হা-হা-হা-হা!

"আমি ডুবে যাচ্ছিলাম অথৈ জলে। এই সময় বাসিন্দাদের একজন আগন্তুকদের বলেছিল, 'এইবার একবার যাও বাপু। এতদিন পর হারানিধি এল; ওদের কথা কইতে দাও। যাও যাও সব।'

"কে যেন বলেছিল, 'ওলো, বউয়ের চুল-টুল বেঁধে দে। ভাল করে সাজিয়ে দে বাপু।'

" 'সাজাতে হয় না। যে রূপ!'

" 'রূপের কী রেখেছে? না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে নিজের রূপকে দেহকে পুড়িয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করে!'

" 'দিয়েই বেঁচেছ মা। নইলে কি আর পাপের ছোঁ থেকে রেহাই পেতে?'

"কে যে কোন্ ঘর থেকে বলছিল, জানি না। তবে কানে এসে ঢুকছিল।

"বুড়ী বলেছিল, 'হ্যাঁ বউ, আজ তুই রাত্রে ভাত খা!'

" 'খাবে বৈ কি। সোয়ামীর পাতে খাবে। মাছ আছে তো? না থাকে তো যাও না কেউ নিয়ে এস। আজকের খরচ সবারই।'

"খেয়েদেয়ে শুতে হয়েছিল। মনোরম করে পাতা শয্যা। আমার মনে হয়েছিল মৃত্যুশয্যা। হ্যাঁ, ওই শব্দটি ছাড়া আর কোন্ কথা মনে হতে পারে, বলুন?

"মিলিটারি অফিসার আমি, দিল্লীর কনট সার্কাস থেকে লালকেল্লা পর্যন্ত এলাকায় প্রমোদ-জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছি; ইতিহাসের ওই সব গল্প একসময় সংগ্রহ করে পড়েছি। আগ্রা কেল্লায় বাদশাদের জীবন্ত নারীকে ঘুঁটি সাজিয়ে সতরঞ্জ খেলার ছক দেখে আফসোস করেছি—কেন বাদশা হয়ে জন্মাই নি! এখানকার হোটেল-জীবনও

দেখেছি। নিজেকে অপাপবিদ্ধ বলব না। এখান থেকে শেষবার অর্থাৎ যেদিন আপনাকে কথা বলতে এসে ফিরে চলে গিয়েছিলাম, তারপর ফ্রন্টের পথে শিলংয়ে কয়েকদিন থাকার সময় একটা এ্যাংলো-বার্মিজ বা এ্যাংলো-খাসিয়া মেয়ে, ওয়াকী, নাম লনা, সে আমার উপর ঝুঁকেছিল। জীবনটা তখন মদের নেশার প্রভাবে চলেছে। ফ্রন্টে যাচ্ছি। জীবনের উপমা ফানুসের সঙ্গে, কখন ফেটে যাবে। সুতরাং তাকে রঙিন করে নাও। অফিসার্স মেস থেকে পালিয়ে তার সঙ্গে পাইন বনের তলায় চন্দ্রালোকিত রাত্রের প্রথম প্রহর যাপন করেছি। অসৎ আমি নই, কিন্তু কড়া নীতিবাদী সৎ-ও আমি ছিলাম না। সেদিন মন এইভাবেই তৈরী ছিল যে, মিসেস চ্যাটার্জি যিনি হবেন, তাঁকে অন্য অফিসারের সঙ্গে নাচতে হবে, শেরি খেতে হবে। যাক, তবু সেদিন ওই বস্তীর ঘরে পাতা ওই শয্যা থেকে মৃত্যু-শয্যার বিভীষিকা মনে জেগে উঠেছিল। মনে মনে ভগবানকে ডেকেছিলাম, 'রক্ষা কর, তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

"ওই বধূটি নিজে হাতে পাতলে বিছানা। এরই মধ্যে সে আবার সাবান মেখে গা ধুয়েছে। মুখে স্নো মেখেছে, চুলেও সাবান দিয়েছে। কেন জানেন? এতটুকু দুর্গন্ধ পাছে আমাকে পীড়িত না করে, তাই। অথচ আমি তখন নোংরা কাপড়ে-চোপড়ে, শুধু ভিক্ষুক। স্বল্প আলো সে-বাড়িতে; কেরোসিনের ডিবে আর হ্যারিকেন। ওই আলোতে মনে হয়েছিল, সেই মলিনা মেয়েটা যেন মেঘ কাটিয়ে সন্ধ্যা বা ভোরের ভেনাসের মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। আমি কেন জানি না, কাঁপছিলাম। মনে হয়েছিল, কোথাও গিয়ে একটু মদ খেয়ে আসব। কিন্তু তাও পারি নি। মন চায় নি। পরিবেশের প্রভাব যে মানুষের চরিত্র এমনভাবে পাল্টে দেয়, এ কথা এমনভাবে কখনও অনুভব করি নি। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের চেহারা দেখেছি। ভাল-মন্দ দুইই দেখেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। সে এমন শান্ত, এমন শুচি! ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইড-এর হাইডও বোধ করি এ পরিবেশে বিব্রত হত। বাঁশের পাতার মত ভিতরে ভিতরে কাঁপছিলাম। নিজের দুর্বলতার জন্য নয়; এ মেয়ের এমন রূপ সত্ত্বেও একে নিয়ে ব্যভিচারের কামনা আমার জাগে নি। সব মানুষের মধ্যেই পশু আছে, আমার পশুটা যেন ঘুমপাড়ানী কাঠির স্পর্শে হতচেতন হয়ে গভীর শান্ত নিদ্রায় পড়েছিল আমার মমতা এবং সততার পদপ্রান্তে। তবু আমি কাঁপছিলাম কেন জানেন? কাঁপছিলাম, একে আমি বলব কী করে, 'আমি সে নই, তোমার ভুল হয়েছে, তোমার দৃষ্টি ভুল, তোমার আনন্দ ভুল, তোমার বুক চিরে রক্ত দেওয়া ভুল, এই সজ্জা ভুল, এই শয্যারচনা ভুল, সব ভুল, সব ভুল!' কী করে বলব, 'রতনের মায়ের অহঙ্কৃত বাক্যগুলি মিথ্যা, তার এতদিনের এই তপস্যা মিথ্যা, তোমারও তাই। বিশ্বাস, তপস্যা, ধ্যান-ধারণা সব মিথ্যা!'

"ভগবানকে আজ আমি বিশ্বাস করি। আপনিও করেন। বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভগবান-বিশ্বাসী—যিনি ভগবানকে না দেখুন, প্রত্যক্ষভাবে জানেন—তাঁর সাহচর্যে আপনি ধন্য, তাঁর স্পর্শ আপনি লাভ করেন। রামধুন গানও করেন। আরতি দেবী, তাই অসংকোচে বলছি যে, ভগবানই সেদিন রক্ষা করেছিলেন; আমার কথাটা তিনিই তাই বলে দিয়েছিলেন।

"রাত্রে আমি মড়ার মতই চোখ বুজে পড়েছিলাম। অন্য পথ তো ছিল না। লিখতে

ভুলেছি, তার আগে ভিক্ষুকের বেশ ছাড়িয়ে আমাকে নতুন ধোলাই-পেটা কাপড়-জামায় রাজবেশ পরিয়েছে সে। যাক। আমি খেয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করলাম। আরতি দেবী, এই ভিক্ষা-দশাতেও আমার কাছে কয়েকটা ওষুধ থাকত। তার একটা হল যন্ত্রণা উপশমের অ্যাসপিরিন জাতীয় ট্যাবলেট; আর থাকত জোরালো ঘুমের ওষুধ। খেয়ে ফুট-পাথে বা যেখানে যেদিক হোক শুয়ে পড়তাম। সেদিন ঘুমের দুটো ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম আসে নি। স্নায়ু-শিরা বোধ করি এমন প্রবল উত্তেজনায় চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছিল যে, ওই দ্বিগুণ মাত্রায় ঘুমের ওষুধেও ঘুম আনতে পারে নি। ছিল একটা আচ্ছন্নতা মাত্র। তার মধ্যেই স্পষ্ট বুঝলাম—আলোর ছটা। চকিতের জন্য চোখ মেলে দেখলাম, সে সেই মনোহর সজ্জায় সেজে মাটির প্রদীপে ভর্তি তেল দিয়ে প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকছে। কাঠের পিলসুজটা টেনে কাছে এনে প্রদীপটা বসিয়ে সলতেটা আরও উস্কে দিল। তারপর কাছে বসল। আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে সে, আমি চোখ বন্ধ করলাম সভয়ে। তাতেও বুঝতে পারলাম, কারণ তার ওই প্রদীপের শিখার দীপ্তি আমি চোখের পাতার নিচ থেকেই অনুভব করছিলাম; এবং তার উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছিল আমার মুখের উপর। একসময় চোখের পাতার উপর আলোর দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল মনে হল; বুঝলাম আরও উস্কে দিয়েছে প্রদীপের শিখা। তারপর অনুভব করলাম আরও দীপ্তির সঙ্গে উত্তাপ। সে-দীপ্তি এত যে, বন্ধ চোখের অন্ধকার যবনিকা গাঢ় লাল রঙে রাঙা হয়ে উঠল। সব আচ্ছন্নতা তখন কেটে গিয়েছে আমার।

"বাইরে থেকে বিড়বিড় কথা ভেসে আসছে। বাইরে বোধ হয় রতনের মা দাওয়ার উপর বসে বকছে: 'ওই সীতা নাম! ও আমি কালই পাল্টাব। পাল্টাব। পাল্টাব। পাল্টাব। জনমদুঃখিনী সীতা। আমি তখনই বারণ করেছিলাম। রতন শুনলে না। উহু! সীতাহরণের পালাটা নয় এই রতনের যুদ্ধে হারানোতে শেষ হল! অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। এই বেরতো, বুক চিরে রক্ত দেওয়া, এর চেয়ে একালে অগ্নিপরীক্ষা কী হবে? কিন্তু তারপরেতে আবার বনবাস সীতার। উঁহু, উঁহু, ও-নাম আমি কাল পাল্টাব। পাল্টে তবে জলগ্রহণ করব।'

"তারপর একটু চুপ করলে। আবার শুরু করলে, 'বউ! অ-বউ! শুনছিস! কথা কইছিস না দুজনায়? রতন ঘুমুচ্ছে নাকি? ঠেলে তোল না আবাগী! লজ্জা লাগছে? মরণ তোর লজ্জার! অ-বউ?'

"পাশের ঘরের কেউ যেন বললে, 'ঠাকরুণ, তোমার কি আক্কেল-বুদ্ধি কিছু নেই গা?'

" 'কেন গা? অন্যায় কী বলছি?'

" 'বলছ না? বলি মা ঘরের দোরগোড়ায় জেগে বসে থাকলে বউবেটায় কথা কয় কী করে গা?'

" 'তাতে কী হয়েছে, আমি তো চোখের মাথা খেয়ে চোখে দেখতে পাই না—!'

" 'এইবার কড়া কথা বলব!'

" 'তা বল না। আজ আমার আনন্দ। আজ ঝাড় মারলেও সইব না তুলসী।. বল।'

" 'বলি কানের মাথা তো খাও নি? শুনতে তো পাও। না কী?'

" বুড়ী বললে, 'ওই দেখ! এটা তো মনে হয় নি তুলসী। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি

এই শুলাম। আমার চোখের পাতায় লক্ষ্মণের চৌদ্দ বছরের ঘুমের মত এই দু-বছর দশ মাসের ঘুম জেগে আছে। শুয়ে জেগে থাকতাম, আর মনে মনে বলতাম ভগবানকে, কখনও বউকে, শেষে আমার সিত-অহঙ্কার এমনি করে খানখান হয়ে গেল। ভগবান তো কথা কয় না তুলসী। বউ বলত, কখনও না। দেখবেন আপনি!'

"হাসলে বুড়ী। তারপর বললে, 'তুলসী, এই আমি শুলাম না। দেখ না, এখনিই ঘুমিয়ে যাব!'

"আরও কতক্ষণ পর। আর আমি থাকতে পারি নি। হাত জোড় করে উঠে বসেছিলাম। মেয়েটি নড়ে নি, নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে যেমন ঘুমন্ত আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, তেমনিই তাকিয়ে রইল। আমি কিছু বলবার আগেই সে মৃদু কঠিন কণ্ঠে বললে, 'তুমি কে? তুমি তো সে নও!' মুহূর্তে চোখ জলে উঠল। এমন চোখ জ্বলে ওঠা আমি দেখি নি। সে উঠে দাঁড়াল।

"কথার সূত্র পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম—হাতজোড় করেই বলেছিলাম, 'আমি ক্ষমা চাচ্ছি। অপরাধের আর শেষ নেই। কিন্তু আমি বলবার সময় পাই নি। কখন বলব?'

"মেয়েটি তখন ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো একখানা দায়ে হাত দিয়েছে। আমার কথা শুনে থমকে গেল। যাক, সে অনেক কথা, সংক্ষেপে বলি—!"

এরপর আট-দশ লাইন লিখে কেটে দিয়েছে। পাতাটা ওল্টালে আরতি।

এগারো

পরের পৃষ্ঠায় সে শুরু করেছে—"সংক্ষেপে লিখে তৃপ্তি হল না আরতি দেবী তাই কেটে বিশদভাবেই লিখছি। কাটা লেখাটা স্বচ্ছন্দে পড়া যাবে। মিলিয়ে দেখবেন গরমিল পাবেন না। আর কি জন্যেই বা মিথ্যে আপনার কাছে লিখব? এ চিঠিও আপনার কাছে লিখতাম না। আপনি জানেন—সংসারে বাবা-মার মৃত্যুর পর আমি নিজেকে একলা করে গড়েছি। দাদার সঙ্গে বনে নি, সম্পর্ক রাখি নি। চাকরি নিয়েছিলাম যুদ্ধের। আপনাদের —না—আপনার সঙ্গে পথের মধ্যে কদিন খেলাঘরে খেলুড়ের মত যোগাযোগ হয়েছিল, হয়তো বাঁধা পড়বার সুতোতেও পাক পড়েছিল—কিন্তু যেদিন তার আগেই চলে গেলাম—বেশ হাসতে হাসতেই গেলাম। এবং খেলার সময়টুকুর মধ্যেও এটুকু পরিচয় বোধ হয় দিয়েছিলাম—যে মিথ্যে আমি বলি নি। যাক, যে কথা বিশদভাবে না বলে তৃপ্তি পাচ্ছি না তাই বলি।

"দেওয়ালের দায়ে হাত দিয়েছিল বিউটি। চোখ তার জ্বলছিল। কিন্তু আমি হাতজোড় করে যখন বললাম, 'আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমার অপরাধের শেষ নেই। কিন্তু

ভেবে দেখুন—আমি কিছু বলবার সময় পাই নি। বলতে আপনারা দেন নি। বলুন কখন বলব? আর আমি তো আপনাকে চিনি নি। আপনিই আমাকে চিনলেন—রতন বলে!'

"'আপনি কে? ওই কমফাটার আপনি পেলেন কি করে?'

"আমি বললাম, 'সবই রতন আমাকে দিয়েছিল, আপনাদের দেবার জন্যে। তার খবর নিয়েই আমি আপনাদের খুঁজছিলাম। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে ওই খাটটার সামনে এসে দাঁড়ালাম আর—'

"অকস্মাৎ যেন বাঁধ ভেঙে গেল—ঝরঝর করে সে তার কি কান্না! কান্না আমি কমই দেখেছি আরতি দেবী। কারণ বাবার আগেই মা মারা গিছলেন। মা মারা গেলে আমি কেঁদেছিলাম—কিন্তু বাবা বলেছিলেন কাঁদতে নেই। কাঁদে দুর্বলেরা। সেই ধারণা নিয়ে উঠছিলাম—তাই পরবর্তী জীবনে কারুর কান্না দেখলে শুনলে বিরক্ত হয়েছি মনে মনে। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল ওর সঙ্গে আমিও কাঁদি। মনে হয়েছিল স্বর্গ নরক না মানি তবু মানছি এ কান্না স্বর্গীয়। স্বর্গ যদি থাকে—তবে রতন স্বর্গে বসেও তৃপ্ত হবে। তার সংসারের অতৃপ্ত মমতা প্রেমের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হবে। আমিও কেঁদেছিলাম। কয়েক ফোঁটা জলের ঝরে পড়ার পথ রোধ করতে পারি নি। চোখ মুছে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে দেখলাম তার কান্না। তারপর মৃদুস্বরে বললাম, 'কাঁদছেন আপনি, এ কান্নার হয়তো শেষ নেই আপনার। আমি এসেছিলাম তার খবরটা দিতে; বার বার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই অনুরোধই সে করেছিল আমাকে। আমিও ভেবে দেখছিলাম যে, এ খবর আমি না দিলে আপনারা কোনদিনই পাবেন না। তাই এসে আপনাদের গ্রাম খুঁজে সেখানে না পেয়ে কলকাতায় এসেছিলাম—আপনাদের সন্ধানে। ওরা বলেছিল—বাগবাজার অঞ্চলে কোথাও আছে। সেই খুঁজতে এসে—।'

"মেয়েটি এতক্ষণে মুখ তুলে বলেছিল, 'এমন আশ্চর্য মিল তার সঙ্গে! আর গলায় ওই কমফাটারটা আমারই হাতের বোনা!'

"আবার একটু চুপ করে বলেছিল, 'আমি ভেবেছিলাম—আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে সে। মানে—।' একটু হেসে বলেছিল, 'তার ভারি একটা সন্দেহ বাতিক ছিল। আমার এই রূপের জন্যে—।'

"আমি কি উত্তর দেব? ওই কমফর্টারের কথাটারই জের টেনেছিলাম—বলেছিলাম, 'কাপড়-চোপড় তো ভাল ছিল না; ওই একটা পেণ্টুলান আর ছেঁড়া শার্ট—তাই শীতের জন্যে কমফর্টার গলায় জড়িয়েছিলাম।'

"সে এবার বলেছিল, 'আপনি তা হ'লে—চাটুজ্জে সাহেব! সে শেষ চিঠিতে লিখেছিল—এখানে ভারি মজা হয়েছে, আমাদের একজন ক্যাপ্টেন সাহেব আছেন—চ্যাটার্জী সাহেব—ঠিক আমার মত দেখতে। যেন এক মায়ের পেটের ভাই। ভারি ভাল লোক, আমাকে খুব ভালবাসেন।'

"হ্যাঁ—আমিই চ্যাটার্জী সাহেব।'

"একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলেছিল—কথা বলতে বলতে সে চুপ করে যাচ্ছিল

মধ্যে মধ্যে—যেন তার সত্তাকে কেউ বাহির থেকে অন্তরের কোন এক অতল গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; আবার একটু পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কথা বলছিল; আমি বুঝতে পারছিলাম—সে ওই গভীরে নিমগ্ন হয়েই থাকতে চায়; কিন্তু কঠিনতম দুঃখের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেও তার নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই; কঠিনতম জীবনের সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে যেন সর্বস্ব-নীলামের পরওয়ানা নিয়ে; এ জাতের মেয়েদের জানি না প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু এদের কথা শুনেছি; বিশ্বাস করি নি কিন্তু যে মুহূর্তে ও দা হাতে নিতে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে আর অবিশ্বাস করতে পারি নি; একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মরবার সময় কিছু বলেছে সে?'

" 'না। শুধু বলেছে—কিছু করতে পারলাম না। কার হাতে দিয়ে গেলাম। মা-মা—সীতা-সীতা!'

" 'মায়ের কপাল! আর সীতার কপাল!' একটু চুপ করে থেকে বললে, 'সীতার কপাল সীতা জানত। কিন্তু ওই হতভাগীর?'

"হঠাৎ উন্মাদিনীর মত কপালে গোটা কয়েক চড় মেরে বলেছিল, 'এই—এই—এই!'

"আমি হাত ধরতে সাহস করি নি—শুধু বলেছিলাম, 'কি করছেন? না-না। শুনছেন!'

"ক্ষান্ত হয়েছিল ওতেই। তারপর কিছুক্ষণ বসেছিল পাথরের মত। তারপর বলেছিল, 'কি করে মরল? গুলিতে? জাপানীদের?'

'না। জাপানীদের নয়।'

"তবে!'

" 'সবটা তবে বলি শুনুন!'

"ধীরে ধীরে সবটা বলে গেলাম তাকে।

"বেশ মনে পড়ছে কলকাতার মত মহানগরীও তখন ঘুমে শান্ত স্তব্ধ। শুধু গঙ্গার ধারে পোর্ট কমিশনারের রেল লাইনে মধ্যে মধ্যে ইঞ্জিনের সিটি এবং শান্টিংয়ের শব্দ উঠছে। ক্বচিৎ কখনও এক-আধখানা রিকশার ঘণ্টা দু-চারবার বেজে চলে যাচ্ছিল।

"সব শুনে সে ধীরে ধীরে উঠে পাশের একটা দরজা খুলে ছোট্ট একটা কুঠুরীতে ঢুকে গেল। সেটা ওর ঠাকুরঘর। সেখানে গিয়ে ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

"আমি একবার ভাবলাম সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে চলে যাই। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু তা পারি নি। ওই ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতই বলেছিলাম, 'আমি তা হলে—'

"উপুড় হয়ে পড়ে ছিল সে, সেই অবস্থাতেই ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল, 'না।'

"তারপর উঠে বসে বলেছিল, 'না। কাল যাবেন। আমি কাল সকালে আপনার সঙ্গে খুব ঝগড়া করব। তারপর বেরিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। তখন আপনি চলে গেলে কথা উঠবে না। নইলে আজ যদি চলে যান—কাল সকালে আমাকে হাজার প্রশ্ন করবে, কি উত্তর দেব? আপনি আজ যেতে পাবেন না।'

"আর পারলাম না। আমার সকল শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি ফিরে গিয়ে বসলাম বিছানার উপর। সে সেই তেমনি করেই বসেছিল। হঠাৎ বলে উঠেছিল একসময়, 'কিন্তু ওই হতভাগী? ওই কানী, রাবণের মা নিকষা, ওর কি হবে? হে ভগবান!'

"রাত্রি-অবসান আসছিল। জীবনের অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে আসতে হয়, দিনের আলো যথানিয়মে রাত্রির অন্ধকার মুছে দিয়ে আপনি এগিয়ে আসে। পৃথিবীর ঘোরার নিয়মে ওর একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। সকালবেলা পর্যন্ত কেঁদে, চোখ মুছে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় বলে গেল, 'যা বলেছি। আমার মরার আগে আপনি যাবেন না।'

"আজ কানে বাজছে, বুড়ী জেগে বলছে, 'সুপ্রভাত সুসংবাদ। আমার সতীগৌরব রেখেছিস মা, তার জন্যে আর এক বছর বেরতো বাড়ালাম। তোর গৌরব বাড়ুক মা। তোর পুজোর প্রচার হোক। আমার কাল নেই, ক্ষমতা গিয়েছে, নইলে ধুপচী মাথায় করে গাঁয়ে নগরে বলে বেড়াতাম, দেখ গো দেখ, মায়ের মহিমা দেখ!'

"একজন কেউ বউটিকে বলেছিল, 'ও বাবা, মুখ-চোখ যে ফুলে উঠেছে গো বউ! সারারাত বুকে মুখ রেখে কেঁদেছ মনে হচ্ছে!'

"বউটি উত্তর দিয়েছিল, 'সুখের দিনে দুঃখের কান্না যে বড় মিষ্টি ভাই।'

"আমি মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম। রতনকে পিঁপড়েতে খেয়ে ফেলত, ফেলত, আমি তাকে মেরে নিমিত্তের ভাগী হয়েছি। আবার এই বউটির মৃত্যুর সকল দায় পড়বে আমার উপর।

"সকালে বসেই ছিলাম। চা খেয়েছিলাম। বউটি চা দিয়েই বলেছিল, 'স্নান করে পুজো করতে হবে। না জানেন, বই দেখে পড়তে পারবেন তো? গীতা আছে, চণ্ডী আছে, নইলে বুড়ী কুরুক্ষেত্র তো করবেই, হয়তো সন্দেহ করবে। পুজোর আগে জল খেতে পাবেন না। চাইবেন না যেন।'

"মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে শুধু একটু হেসেছিলাম। দিনের আলোতে দেখলাম তাকে। হ্যাঁ, রতন বউ-বউ করত,—একে রাজরাণীর সুখে সুখী করবার জন্যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল,—সে তার মিথ্যে অহঙ্কার নয়; না, সে তার মোহ নয়!

"কিছুক্ষণ পর ওই মা এসে বসেছিল কাছে।

"গায়ে হাত বুলিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে সে আবোল-তাবোল কত কথা। 'সেই কথাটা মনে আছে? সেই ঘটনাটা? সেইটে রে! সেই—' নিজেই বলে যাচ্ছিল অতীত ঘটনাগুলি। কখনও হাসি, কখনও বেদনার্ত দীর্ঘনিশ্বাস, সুখদুঃখের স্মৃতি-মাখানো ক্ষোভহীন গ্লানিহীন সে এক জীবনানন্দের আশ্চর্য প্রকাশ।

"হঠাৎ মুখে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'কাল তুলসী বলে, ওই বউয়ের দাড়িওলা বর মানায় না ঠাকরুণ। আর এমন ছেলে, কটা চোখ, কটা রঙ, কোট-পেণ্টুল পরলে সায়েব-সায়েব লাগবে। দাড়িফাড়ি কামাতে বল। তা আমি বলি, ওরে, এ আমার শ্বশুরকুলের সাতপুরুষের দাড়ি! ওই দাড়ি রেখেছে বলেই চণ্ডী-গীতা পড়ে, পুজো করে, নইলে সব ভেসে যেত। এ তান্ত্রিকবংশের দাড়ি। তোর সংস্কৃত পড়া হল না, ব্যাকরণের আগুতেই ঠেকলি, পণ্ডিত

বললে—মিছে চেষ্টা ঠাকরুণ, ওর দ্বারা এ হবে না। আমি বললাম, হবে না কি? এত বড় ঘরের ছেলে—পুজোর মন্তর মুখস্থ করুক, গঙ্গা-চান করুক, টিকি রাখুক—দাড়ি রাখুক—নিশ্চয় হবে। হ্যাঁ—আমার কথা মিথ্যে হয় না। বলেছিলাম—বুক ঠুকে বলেছি আমি সতী আমার ছেলেকে সতীমা বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনে আমার কোলে ফেলে দেবেন। দেখ্ ফলেছে কিনা।'

"এই সময়েই বউটি এসে বলেছিল, 'মা এখন কথা থাকুক, আমি তোমার ছেলেকে নিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসি। আর পথে কালীতলা মদনমোহনতলায় পেন্নাম করে আসব।'

" 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাই যা। দুজনেই জোড়ে যা। আমাকে নিয়ে হাঙ্গামা হবে। যা বাবা। যা।'

"আমার বুক কেঁপে উঠল থরথর করে। ভগবান মানিনে—তবু মনে মনে বললাম, 'হে ভগবান—তবে কি—। মেয়েটা কি সত্যই জলে ঝাঁপ দিয়ে মরবে আমার সামনে?'

"মেয়েটি বললে, 'এসো।' আমাকে অসহায়ের মত যেতেই হল। পথে বেরিয়ে মেয়েটি বললে, 'ভয় নেই, এখনি আমি ডুবে মরতে যাচ্ছি না। আপনার কাছে সব বিবরণ আর একবার শুনব। ঘরে তো হবে না। বুড়ী কান পেতে আছে। ঘরে কান খাড়া হয়ে রয়েছে। চলুন, গঙ্গার ধারে বসে শুনব।'

"যেখানটায় সেদিন আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, ঠিক সেইখানটিতেই বসে বলেছিলাম রতনের কথা। মেয়েটি নড়ে নি, চড়ে নি, গঙ্গার স্রোতের দিকে মুখ করে চোখ রেখে শুনে গিয়েছিল। রতনের প্রশংসা শুনে একবার—আর-একবার, তার মৃত্যুর কথা শুনে—দুবার নীরবে কেঁদেছিল শুধু।

আমিই বলেছিলাম, 'আমি আর উপায়ান্তর না দেখে; ওই পিঁপড়েরা তাকে লক্ষ দংশনে ছিঁড়ে খাবে, নৃশংস যন্ত্রণা সে ভোগ করবে, এ দেখে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। গুলি করেছিলাম। আমাকে ধরিয়ে দিতে চান দিন, ফাঁসি যেতে আমার কোন দুঃখ হবে না। বিশ্বাস করুন, কোন—'

"কথা কেড়ে নিয়ে মৃদু স্বরে ধীরভাবে বউটি বলেছিল, 'না। তা হলে আপনি আমাদের খবর দিতে আসতেন না। খুঁজতেন না। কাল আমাকে অবসর দিতেন না আপনাকে ভাল করে দেখতে, ভুল ভাঙাতে।'

"তারপর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

"বহুক্ষণ পর অসহনীয় হয়ে উঠেছিল আমারই; বলেছিলাম, 'উঠুন।'

" 'দাঁড়ান, ভাবছি।'

" 'কী?'

" 'কী করব আমি। আমি তো এখনই ঝাঁপ দিয়ে মরতে পারি। কিন্তু তারপর? ওই বুড়ী? ভার তো আমার। তাকে যে আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলেছিলাম—তুমি যাচ্ছ, মায়ের জন্য ভেবো না, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ভার আমার।'

"আমি বলেছিলাম, 'আমি কি করব বলুন। আমি বরং রাগ করার ভান করে পালিয়ে

যাই।'

"দিগ-দিগন্ত হারিয়ে ফেলা মানুষের মত সে এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে গঙ্গার পরপারের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। নীরবে সে ঘাড় নাড়লে। না। তারপর মৃদু স্বরে বললে, 'তাতে বুড়ী উন্মাদ হয়ে যাবে। ও সহ্য করতে পারবে না। ছেলে ফিরে আসবে, সে কত আশা ওর। কাল থেকে কত বড়াই। আপনি পালিয়ে গেলে ও পথে পথে বুক চাপড়ে চাপড়ে বেড়াবে। না—ওভাবে আপনার যাওয়া হবে না। বুড়ীকে নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়ব। তা ছাড়া আমার মনের জোর সব যেন ঝড়ে-পড়া চালাঘরের মত মাটিতে ভেঙে পড়েছে। আপনি রয়েছেন—তাই আপনাকে খুঁটির মত ধরে দাঁড়িয়ে আছি।'

"কি বলব—উত্তর খুঁজে পাই নি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ওই বলেছিল. 'উপায় ওই এক। ওবেলা আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে আমি ছুটে বেরিয়ে আসব; এসে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। কিম্বা এই রেলের ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ব। গলায় দড়ি দিলে কি বিষ খেলে আপনি হাঙ্গামায় পড়বেন।'

"ওই সিদ্ধান্তই যেন সে স্থির করে নিয়ে ওঠবার উদ্যোগ করলে। আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম—বললাম, 'না। দাঁড়ান।'

"সে হেসে বলেছিল, 'আর পথ নেই!'

"আমি বলেছিলাম, 'আছে। চলুন বাড়ি গিয়ে আমি সকল কথা খুলে বলি। আপনি ভগবান ছুঁয়ে বলুন—কাল রাত্রে আমি আপনাকে ছুঁই নি।'

"তার মুখে ঈষৎ একটু হাসি চকিতে দেখা দেওয়ার মত দেখা দিল, তাতে যত অবজ্ঞা তত দৃঢ়তা। সে বললে, 'আমার কলঙ্কের কথা ভাবছেন? না—তার জন্যে আপনি ভাববেন না। আমার অন্তর যতক্ষণ ঠিক আছে ততক্ষণ কোন কলঙ্ক আমার গায়ে ছোঁকা দেবে না। ওখানে আমি সত্যিই সীতা।' চোখ দুটো তার দপদপ করতে লাগল। তারপর আবার বললে, 'ওতে বুড়ী আপনাকে ছাড়বে না। হয় খুন করবে, নয় পুলিসের হাতে দেবে, তারপর নিজে খুন হবে।'

" 'তা হলে?'

" 'তা হলে ওই পথ। আমি মরি, আমার মৃত্যুতে আপনার মুক্তি।'

" 'সে—সে আমি কি করে হতে দেব বলুন। তার চেয়ে আমি এখান থেকেই পালাই। আপনি যা-হয় করবেন।'

" 'আপনি আপনার দিকটাই দেখছেন। আমার দিকটা ভাবছেন না। তার চেয়ে আপনি আজকের দিনটাও থাকুন। আমি ভাবি।'

"আমি এবার তাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম—একটা কথা। যেটা তার মত মেয়ের ভোলা উচিত হয় নি। বলেছিলাম, 'কিন্তু,—কিছু মনে করবেন না। আমি যতক্ষণ থাকব আপনাকে মাছ খেতে হবে, সধবা সেজে থাকতে হবে—'

"হেসে সে কথার মাঝখানেই কথা দিয়ে বলেছিল, 'সে আমার মনে আছে। কিন্তু তাতে আমার পাপ হবে না। একটা আমার গোপন কথা আপনাকে বলি শুনুন। যে কথা

আমার বাবা-মা ছাড়া কেউ জানতেন না ; স্বামী-শাশুড়ীও না। আমার বাবা ছিলেন বড় পণ্ডিত। খুব বড় পণ্ডিত। তিনিই আমার কুষ্ঠীবিচার করেছিলেন ; আমার ছিল বৈধব্যযোগ। আর দেখছেন তো আমার রূপ! বাবা বলতেন—এ রূপ যার হয় তার ভাগ্যে হয় বৈধব্য, নয় অগ্নিপরীক্ষা বনবাস। তাই বলতেন—আমাকেও বলেছিলেন—যার তার হাতে তোকে দেওয়া যায় না মা! কিন্তু আমি দরিদ্র, কোথায় পাব শ্রেষ্ঠ পুরুষকে! তাই লৌকিক বিয়ের আগে তোর অলৌকিক বিবাহ দেব। বিয়ের আগে তিনি আমাদের ঘরের শালগ্রাম-শিলার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন গোপন অনুষ্ঠান করে। বলেছিলেন—পুরুষোত্তমের বিগ্রহের সঙ্গে তোর বিয়ে হল। এবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে হবে ওই ওঁরই প্রতিনিধি। তোর লৌকিক স্বামী বাঁচে তো এতেই বাঁচবে ; না বাঁচলেও তাঁর ওঁর—উনি রক্ষা করবেন ; বিধবা তুই হবি নে, মঙ্গল বেটার অষ্টমে অত্যাচারের পথ আমি রোধ করে দিলাম।···বিধবা আমি নই—হব না ; স্বামী আমার তিনি। তাই তো কাল থেকে তাঁকেই বলছি—বল, কি করব? দেখাও পথ—দেখাও।'

"আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। এ যে রূপ-কথা, অবিশ্বাস্য। কিন্তু ওর মুখে অবিশ্বাস্য মনে হয় নি। অবিশ্বাস্য মনে করতে ইচ্ছে হয় নি, সাহস হয় নি। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে এই প্রশ্নই করেছিল, 'বিশ্বাস করতে পারছেন না? উদ্ভট মনে হচ্ছে?'

"আমি সসম্ভ্রমে বলেছিলাম, 'না।'

"সে বলেছিল, 'আপনার মধ্যে মহৎ মানুষ আছে। দেবতা আছে। অন্যে হলে—আজকালকার বাবুরা—মুচকে মুচকে হাসত। আপনি—' হঠাৎ সে থেমে গেল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আচ্ছা—।' আবার থেমে গেল। কী যেন হঠাৎ মনে এসেছে। বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে।

"আমিই বললাম, 'বলুন।'

" 'আপনি ঠিক এমনি করে আমাদের সঙ্গে থাকুন না।'

"স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি।

" 'রতন সেজে?'

" 'হ্যাঁ। অন্তত ওই বুড়ী যতদিন আছে। যেমন ভাবে কাল রাত্রি থেকে আমরা রয়েছি, তেমনি ভাবেই থাকব। আপনাকে মনে হচ্ছে বড্ড চেনা, বড্ড আপনার।'

"মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, 'মনে হচ্ছে সে ছিল আমার পুরুষোত্তমের অক্ষম প্রতিনিধি, আপনি আমার—তাঁর প্রতিবিম্ব। পুরুষোত্তম কল্পবৃক্ষ—আপনি তার ছায়া হোন।'

"আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম তার দিকে।

"সে বলেছিল, 'শুনেছি, মধ্যে মধ্যে কায়া ধরে ছদ্মবেশে ভগবান ভক্তের সেবা করেন, হাসেন, কথা বলেন, কৌতুক করেন। ধরা দেন না। আপনি ভগবানের ছায়া হয়ে আমাদের ধরা দিন না! আপনি আমাদের হোন, আমাদের বাঁচান, আমরা আপনার হব, শুধু আমাদের কায়ার কোন সম্পর্ক থাকবে না, সম্পর্ক থাকবে আর সবের। নতুন কালে

শুনেছি, ছেলেমেয়েতে এমন বন্ধুত্ব তো হয়। সেখানে অবিশ্যি দুজনেই দুজনের বন্ধু। আমি ভট্‌চাজ বাড়ির মেয়ে—বউ। বন্ধু আমাদের হয় না, হতে নেই। আপনি হবেন আমার পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব।' এর পর 'তুমি' বলে শুরু করলে, 'সংসারে এসেছ, ভগবান সাজ, পুত্রহীনার পুত্র হও, স্বামীহীনার স্বামী হও, মানুষ ছিলে দেবতা হও। পার না?' আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম তার মুখের দিকে। কথা শুনেও আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাকে দেখেও আত্মহারা হচ্ছিলাম। তার মুখের সে আশ্চর্য দীপ্তি—তার চোখে দীপ্তি, মুখে দীপ্তি, হাসিতে দীপ্তি, সে আশ্চর্য!

"তবুও আমি বলেছিলাম, 'কি বলছেন ভেবে দেখেছেন? এ যে আমার মৃত্যুযোগ!'

"সে বলেছিল, 'না এ তোমার অমৃতযোগ। মৃত্যুযোগে মরে মানুষ প্রেত হয়—এ অমৃতযোগ—এতে তুমি অমর হবে—মানুষ থেকে দেবতা হবে।'

"এবার আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এমন কথা তো শুনি নি কখনও। অনেক স্মার্ট কথা শুনেছি, শিখেছি বলেছি, থ্যাটায়ারে এক সময় ঝোঁক ছিল নেশা ছিল; কিন্তু এমন অন্তর-ভরা মন অভিভূত করা কথা তো শুনি নি। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"মেয়েটি হেসে বলেছিল, 'বল।' তারপর দৃষ্টি দেখে বলেছিল, 'কী দেখছ এমন করে? আমার রূপ? দু-চোখ ভরে দেখ, যত পার। এ রূপ তোমার জন্যে। তোমার আশ্রয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব, নির্ভয় হব, আমি আরও রূপসী হব। সাজব। তোমার আর আমার মধ্যে পিলসুজ রেখে জ্বেলে দেব ঘিয়ের প্রদীপ।'

"সেই দিন গঙ্গার জলে স্নান করবার সময় প্রবীরের নাম-পরিচয়, প্রবীরের শিক্ষা-দীক্ষা সব ডুবিয়ে দিয়ে সত্যিই রতন হয়ে ফিরে এসেছিলাম। বুড়ী খুব তিরস্কার করেছিল, বউটি মুখরার মত জবাব দিয়ে বলেছিল, 'তোমার ছেলেকে আমি খুঁটে বেঁধেছি, বেশ করেছি। চোখ গিয়েছে, দিলে তুমি রাখতে পারবে? ভাবনা, ভেবেই তো মলে! আমি থাকতে ভাবনা কিসের শুনি? সীতা বামনীকে জান না?'

"বুড়ী চীৎকার করে উঠেছিল, 'না-না। ও-নাম আর তুই মুখে নিবি না হতভাগী। ওই নামের জন্যে আবার হারাতে হবে। সীতার বনবাস! ও-নাম আর নয়। ওরে রতন, এখুনি নাম পাল্‌টা, এখুনি।'

"আমার কী জানি কেন আরতি দেবী, 'রতি' নামটা মনে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ-চমকের মত তার কাহিনী মনে পড়ল। আমি আজ ভস্ম হয়ে অতনু হয়ে গেছি। ও হোক 'রতি'। তাই বললাম, একটু ঘুরিয়ে বললাম, 'মা, মরে বেঁচেছি। মদন তাই বেঁচেছিল। ওর এই রূপ, থাক না মা ওর নাম রতি।'

"বুড়ী বলেছিল, 'খুব ভাল। খুব ভাল। রতি! রতি!'

"রতি হেসে বলেছিল, 'আজ ফুল কিনে এনো। মালা গেঁথে তোমাকে সাজাব, আমি সাজব।'

"সত্যিই সেজেছিল। মাঝখানে জলন্ত প্রদীপের আড় রেখে সে কী হাসি! সে কী

মাধুরী তার মুখে।

"রাত্রির পর রাত্রি।

"সত্য গোপন করব না আরতি দেবী। জীবনে আলো আছে ছায়া আছে। উপকার-প্রবৃত্তি আছে। স্বার্থপরতা আছে, দেবতা আছে পশু আছে; মধ্যে মধ্যে মনের অন্ধকারের মধ্যে সে পশুটার কি অধীর অস্থিরতা! আমাকে পাগল করতে চেয়েছে। বলেছে—ও তোমার কাছে যে মাশুল আদায় করেছে তুমি তার বিনিময় কেন নেবে না? আক্রমণ করে আদায় কর। পশুর মত ভোগ কর।

"কিন্তু তা পারি নি। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পশুটাকে পায়ের তলায় চেপে ধরেছি। বলেছি, 'ওরে তুই পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব, তুই পশু নোস।—'

"জিতেছি। সে জয়ে যে কি আনন্দ! যাক—তারপর বলি—

"আমি ধরলাম রতনের কাজ। ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, যন্ত্র যথেষ্ট বুঝতাম। যুদ্ধের সময় রতনের কাছে কাজ শিখেছিলাম। কাজ আবিষ্কার করলাম। কারও কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করব, সেটা ভাল লাগে নি। সকালে বের হতাম রাস্তায়। কাঁধে যন্ত্রের ঝুলি। সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু ধরে, পথে কারুর মোটর অচল দেখলেই গিয়ে দাঁড়াতাম।

" 'দেব মেরামত করে?' কাজ অনুযায়ী দাম বলতাম। মানুষ অনুযায়ীও বলতাম।

"মেরামত করে দিয়ে গাড়ি ঠিক চলেছে বা চলবে দেখিয়ে দেবার জন্য তাদের সঙ্গেই চলতাম। পথে অচল গাড়ি দেখলে সেখানা থেকে নেমে এখানার পাশে দাঁড়াতাম।

" 'দেখব গাড়িটা? চলছে না? দেব মেরামত করে?'

"চার টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত। দিনে অন্তত চার-পাঁচখানা গাড়ি। পঁচিশ টাকা রোজগার হত। বাগবাজারের ওই বস্তি থেকে শোভাবাজারে এলাম। একখানা গোটা বাসা। আপনি দেখে এসেছেন।

"রতি কাজ ছাড়ল; একটি বাড়িতে সে রান্নার কাজ করত, সে কাজ ছেড়ে দিল। দিনে দিনে সত্যই রূপসী হল। আমি এই শেষকালে, অস্বীকার করব না আপনার কাছে, আমি শুধু করুণা করে, এক সন্তানহারা হতভাগিনী অন্ধ বৃদ্ধা'কে পুত্রশোকের নিদারুণ আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই, মিথ্যা তার পুত্র-পরিচয়ের দুর্ভাগ্য মাথায় করে আত্মোৎসর্গ করি নি। আমি রতনকে যে-যন্ত্রণা থেকে রক্ষার জন্য গুলি করে থাকি, তারই শোধ দিতে ওখানে এমন করে থাকি নি। রতির ওই রূপ, ওই রূপে আমি জ্যোতির্লেখার চারিপাশে অদৃশ্য এক গণ্ডীকে ঘিরে এক বন্ধনে বাঁধা পতঙ্গের মত ঘুরেছি, কখনও এক জায়গায় বসে নিষ্পলক চোখে চেয়ে দেখেছি। রতি রতি নয়, ও জ্যোতি। ওর দাহিকা-শক্তি নেই। থাকলে পুড়ে যেতাম বোধ হয়। না। পুড়তাম না, এখানে বলি আরতি দেবী—আমার কামনাকে আমি স্বীকার করেও বলছি—আমার জীবনের শিক্ষা, আমার বংশধারা আমাকে বল দিয়েছে। আমার পশুকে আমি হার মানিয়েছি। যাক—। দিনের পর দিন, পুষ্টিতে, তুষ্টিতে, মার্জনায়, প্রসাধনে ও আরও রূপসী হয়েছে। রাত্রির পর রাত্রি আমরা পাশাপাশি মুখোমুখি বসে থেকেছি, ওকে দেখেছি। ও হেসেছে, ওর হাতখানি আমার হাতে থেকেছে। তারপর

হঠাৎ উঠে বলেছে, 'শুয়ে পড়—আমি যাই।' ও শুত পাশে একখানা ছোট ঘরে—ওর পুজোর ঘরে; ছোট একফালি ঘর; একটা দিকে ওর ঠাকুরের আসন। কত তার সাজসজ্জা। তারই সামনে একখানা কম্বল পেতে শুয়ে থাকত সে। এ ঘরে দেখেছিলেন ছোট একজনের তক্তাপোশে একটি বিছানাই ছিল। ও ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ত, আমি এ ঘরে থাকতাম। প্রথম প্রথম ছটফট করেছি, নিজের উপর ক্রোধ হয়েছে, মেয়েটার উপর হয়েছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর হয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার সব ক্ষোভ সব অনুশোচনা দূর হয়ে গেল। এক আনন্দ অনুভব করলাম।

"অবিশ্বাসী নাস্তিক যারা তারা অবিশ্বাস করতে পারে; অবিশ্বাসই তাদের ধর্ম। এমনই একটি অসহায় নারী বিশ্বাস করে তাদের আশ্রয় করলে তারা কি করে তা জানি না তবে প্রেমে পড়ার বা পরস্পরের মধ্যে দেহবাদের সম্পর্ক স্থাপনের কল্পনায় আনন্দ পায় এ আমি জানি। আজ সে স্তর পার হয়েছি আমি। আপনিও বিশ্বাস করবেন এও জানি। আপনি মহাত্মাজীর সঙ্গে মহা দুর্যোগে নোয়াখালির মহাশ্মশান পরিক্রমা করে এসেছেন। আপনি প্রশ্ন তুলবেন না, তবুও বলি—যদি কেউ প্রশ্ন তোলে তাদের বলবেন—বাক্যে এর ব্যাখ্যা নেই। শুধু একদিন কেউ যদি পরম বেদনায় আপনার মুখের সকল খাদ্যটুকু কোন অতি ক্ষুধাতুরকে দিয়ে নিজে উপবাসে থাকবার সুযোগ পায় তবে সে বুঝবে—এ বাস্তব, এ সত্য। একদিন আপনাকে বলেছিলাম, 'যে নেয় সে সব সময় দাতার চেয়ে ছোট নয়।' সব সময় কেন কোন সময়েই ছোট নয়—যদি সে পরম গ্রহীতার মত অসঙ্কোচে প্রাপ্য পূজা বলে তাকে নিতে পারে। ও সেই পরম গ্রহীতা।

"ও আশ্চর্য! একদিন বিধবা বিয়ের একখানা ছবি দেখতে গিয়ে মাঝখানেই উঠে চলে এল। বললে, 'রাম-রাম-রাম; এই দেখে?'

"আমি বললাম, 'কেন?' ও বললে, 'কেন? বিধবার বিয়ে!'

"আমি বললাম, 'বিধবার বিয়ে সব দেশেই আছে; আমাদের দেশেও আছে।'

"ও বললে, 'সে দেশে অন্য সমাজে আরও অনেক কিছু আছে, যা আমরা করি না। অন্য দেশে শূয়োর খায় অখাদ্য খায়—তাও দোষের নয়, তাই বলে তাই তুমি খেতে পার?'

"এ কথায় আমি হেসেছিলাম—বেচারী জানে না ওর স্বামী রতন বেঁচে ফিরে এলেও এ কথায় মুখ টিপে হাসত। কিন্তু এর পর ও যা বললে তার জবাব আমি পাই নি। সে বলেছিল, 'স্বামী মরলে স্ত্রী, স্ত্রী মরলে স্বামী যদি বিয়েই করবে—তবে প্রেম-প্রেম-প্রেম করে এত গান হা-হুতাশ—এত ছড়া পাঁচালী গদ্য পদ্য কেন রে বাপু? মরণ সব!' তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা যে দেশে যে সমাজে বিধবা বিয়ে আছে—সেখানে সব বিধবাই বিয়ে করে? ধর আমাদের দেশে পুরুষদের বিয়ে করতে আছে বউ মরলে; কিন্তু সবাই তো করে না। ওদের দেশে তেমনি দু-চারজন বিধবা বিয়ে না করে থাকে না? আমাদের মত?'

"বলতে হয়েছিল, 'হ্যাঁ থাকে।' ও প্রশ্ন করেছিল, 'তাদের বুঝি ওরা ঘেন্না-চক্ষে দেখে?'

"জবাব দিতে পারি নি।

"আর একদিন—এই সেদিন, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, সে আমাকে জিজ্ঞাসা

করেছিল, 'তোমার এই মিস্ত্রী সেজে থাকতে কষ্ট হয়, না?'

"আমি প্রসন্ন অন্তরেই ছিলাম, বলেছিলাম অকপটে, 'না।'

"খুব খুশী হয়ে বলেছিল, 'আমার চিনতে ভুল হয় নি; তুমি আমার পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব—আমার কল্পবৃক্ষের ছায়াই বটে।'

"সেদিন কথায় কথায় একটা কথা মনে উঠে গিয়েছিল। যুদ্ধ মিটে আসার সম্ভাবনায় কথাটা মনে হয়ে গেল। তাকে বললাম, 'এক কাজ করব রতি? খুব ভাল হবে হয়তো।'

" 'কি গো?'

" 'দেখ, যুদ্ধ মিটে গেছে; আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সবাই ছাড়া পেলে। এদিকে ওই অফিসারটাকে মারার কোন প্রমাণও আমার বিরুদ্ধে নেই। এখন আমি নিজের নামে নিজের পরিচয় দিই না কেন? ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই চাকরি নিশ্চয় পাব। মাকে একটা কিছু বললেই হবে। কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমাদের সুখে রাখতে পারব।'

"সে বলেছিল, 'না।' বার বার ঘাড় নেড়েছিল।

"প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেন রতি? মায়ের কাছে আমি রতনই থাকব। তোমার কাছে থাকব—সেই পুরুষোত্তমের ছায়া!'

"সে বলেছিল, 'না। তা হলে তুমি আমার কাছেই আর পুরুষোত্তমের ছায়া থাকবে না। আমি তখন লোভের পাপে সত্যি-সত্যিই তোমার রক্ষিতা হয়ে যাব। দেহের সম্বন্ধ না থাকলেও যাব।—'

"আমি খুব বিস্মিত হই নি। কারণ ওকে তো আমি জানতাম। তারপর ও আবার বলেছিল, 'জান, তোমাকে আমি ভালবাসি। সত্যিই বাসি। ওই ভগবানের ছায়া বলে মনে করে নিয়ে বাসি। কিন্তু তোমার ওপর আমার লোভ নেই।' আর কিছু কথা বলেছিল আপনার সম্পর্কে। কোন মন্দ বলে নি। বরং বহু কথা বলার জন্য দুঃখই প্রকাশ করেছিল।—সে সব থাক্।

"এই শেষ আরতি দেবী। এতটুকু কিছু গোপন করি নি। এত কথা, এত কথা কেন কোন কথাই আপনাকে লিখতাম না,—সেদিন শ্মশানে দেখা হলেও লিখতাম না। কিন্তু দেখলাম, সে-আপনিও আর নেই। আপনার চোখে-মুখে পরম প্রশান্তি দেখেছি। আপনি মহাত্মাজীর সঙ্গে নোয়াখালি গেছেন, তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন এটা জানতাম; কিন্তু সেদিন চোখে দেখলাম, তাঁর সাহচর্যের ছায়া পড়েছে আপনার উপর। মুখেচোখে বেদনা দেখেছিলাম, ক্রোধ দেখি নি। তাই লিখলাম। আজ এ পালা চুকে গেল, একজন পরম শ্রদ্ধের মমতাময় বন্ধুর কাছে সকল কথা না বলে সান্ত্বনা পাচ্ছি না বলে লিখেছি। আপনি এখন বুঝতে পারবেন বিচার করতে পারবেন। আর একটু ও-পৃষ্ঠায় দেখুন।"

উদাস দৃষ্টিতে জানালার মধ্য দিয়ে ভাদ্রের সেই দিনটির রৌদ্রালোকিত আকাশের দিকে আরতি চেয়ে বসে রইল। ক্রোধ নয়, ঘৃণা নয়, শুধু বেদনা। অন্তর ভরে গিয়েছে। শরতের আমেজ-লাগা ওই গাঢ় নীল আকাশের চারিদিকে ছড়ানো অজস্র কৃষ্ণ-শুভ্র মেঘপুঞ্জের মত পুঞ্জ

-পূর্ণ বেদনায় যেন ভরে গিয়েছে অন্তর। চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল টপ টপ করে। মনে মনে মনে বলতে গেল, প্রবীর তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু আগে পৃষ্ঠাটা ওলটাল।

"পরশু বৃদ্ধা মারা গেলেন। আপনি দেখেছেন, মুখাগ্নি করেছিল সে-ই। শেষকালে অবান্ধব-বান্ধব অন্য জন্মের বান্ধব বলে আমাকে দিয়েও দেওয়ালে আগুন। আমি তখন ভাবছিলাম, এর পর? রতিকে সে-প্রশ্ন করবার সময় হয় নি, পাই নি। কিন্তু ওর মুখ-চোখ দেখে বুঝেছিলাম, এ ভাবনা সেও ভাবছে। ভাবছে, এর পর? আপনি লক্ষ্য করেন নি, সে কী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গঙ্গার দিকে। সে যেন গঙ্গাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত উদাস দৃষ্টি! কী খুঁজছিল বুঝতে পারি নি। বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'রতি!'

" 'বল!'

" 'কী ভাবছিলে এমন করে?'

" 'কাল বলব।'

" 'আমি বলব?'

"আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। রতির এই প্রথম কান্না। প্রথম দিন রতনের মৃত্যু-সংবাদে কয়েক ফোঁটা চোখের জল সে ফেলেছিল, কিন্তু সে কান্না নয়। এ কান্না—সে কী কান্না! কাঁদতে কাঁদতেই উঠে চলে গিয়েছিল। তারই মধ্যেই কোন রকমে বলেছিল, 'কাল। কাল।'

"পুজোর ঘরে গিয়ে শুয়েছিল।

"আমিও শুয়েছিলাম। ঘুম আসে নি। শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সকালে উঠে দেখলাম রতি নেই। পেলাম একখানা চিঠি। লিখেছে, 'সারারাত কাঁদলাম। মা মরল। বন্ধন কাটল। আর তো কো‌ন ধর্মের কোন ন্যায়ে আমি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারব না। না, পারব না। তোমাকে এইভাবে বেঁধে রাখব কী বলে? আমার অধিকার নেই। বর্ষা গেল, এইবার যে মেঘ কাটিয়ে সূর্যচন্দ্রের মত উঠবার সময় হয়েছে। আমার তো সঙ্গে যাবার শক্তি নেই, উপায় নেই। তাই সুতোকাটা ঘুড়ির মত ভাসলাম। তুমি আমার পুরুষোত্তমের ছায়া। বহু ভাগ্যে ও-ছায়া মেলে, মিলেছিল আমার। এবার কাল হয়েছে, আমাকে ও-ছায়া ছেড়ে সরতে হবে। তুমি বুঝতে পার না, আমি পারি, তুমি আমার কাছে তো তোমার ইচ্ছায় নেই; তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি তাঁর ইচ্ছায় তাঁর ছায়ার মত আমার উপর নিজেকে মেলে রেখেছ। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তাই চললাম। শ্মশানে দেখেছিলে, কোন্ দিকে তাকিয়েছিলাম? গঙ্গাসাগরের দিকে। ভরা গঙ্গা এখন, কুটো পড়লেও সেখানে টানছে। সেখানে কামনা নিয়ে যাচ্ছি তো। কী কামনা সে বলব না। আমায় খুঁজো না ...। শেষে একটা কথা বলি। তুমি আমার পুরুষোত্তমের ছায়া। তোমার কোন গ্লানি নেই, অন্যায় নেই, আমি জানি। তবুও লোকে যখন তোমার কথা শুনবে—তখন আমার স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য অত্যাচারী সায়েবকে যে তুমি মেরেছ অস্ত্র নিয়ে কথা তুলবে। বিচার করতে চাইবে—তুমি পিঁপড়ের কামড়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে

তাকে যে গুলি করেছিলে, সেটা স্থায় কি অন্যায়। পরীক্ষা সংসারে ভগবানকেও দিতে হয়। তুমিও দিও। তুমি সব আগে গিয়ে বিচার চাও। বল, আমার বিচার কর। আজ দেশ স্বাধীন। এ দেশের যে-দণ্ড আসুক, তুমি পিছোবে কেন? মুক্তি তুমি পাবে। না পাও, তাতেই বা কী? স্থায়ের অবতার ওই তো বসে আছেন বেলেঘাটায়। তাঁর কাছে গিয়ে বল—বিচার কর। ইতি—রতি।'

"আবার পুনশ্চ লিখেছে, 'তুমি যেন রতি নামে আর কাউকে ডেকো না।'

"আমি মহাত্মাজীর কাছেই যাচ্ছি আরতি দেবী, আত্মসমর্পণ করতে। ওই বিচিত্র মেয়েটা এই সাহস আমায় দিয়ে গেছে। তাই বা শুধু বলি কেন; আমি দিল্লীর রাজকর্মচারীর ছেলে, ক্লাবের স্বাদ-পাওয়া অতি আধুনিক—সব কিছুতে অবিশ্বাসী; পুণ্যের নামে হেসেছি, সতীত্ব-সততাকে ব্যঙ্গ করেছি, প্রেমকে স্বীকার করি নি; আমাকে সে এক আশ্চর্য দিব্য পৃথিবীতে উত্তরায়ণ করিয়ে দিয়ে গেছে। মৃত্যুকে আমার আর ভয় নেই। ইতি—

প্রবীর।"

বিশ্ব-পৃথিবী ঝাপ্‌সা হয়ে যেন কুয়াশায় ঢেকে গেল। সে কুয়াশা ধীরে ধীরে কাটল। আরতির অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কোন গ্লানি নেই, দুঃখ নেই। মনে মনে বললে, 'তোমার যাত্রা শুভ হোক প্রবীর। নেবে বৈ কি—যা করেছ, তার বিচারে যা প্রাপ্য তা নেবে বৈ কি। কঠিনতমই যদি হয়, আমি কাঁদব। কারণ তুমি আমার। তোমার জন্য আরতিও তো কম তপস্যা করে নি। যে পৃথিবী বলছ, তার আভাস তো সেও পেয়েছে। পরম দুঃখেই তো তার সিংহদ্বার খোলে।'

আরতি প্রতীক্ষা করে রইল। হয় মুক্তিতে মালা দিয়ে স্বাগত জানাবে, নয় শবাধারের জন্য মালা নিয়ে যাবে, দিল্লীর লালকেল্লা পর্যন্ত।

আকাশ রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

'কীর্তিহাটের কড়চা' (৩য়-৪র্থ)

তারাশঙ্করের অমর সৃষ্টি তাঁর মহা উপন্যাস 'কীর্তিহাটের কড়চা'র শেষ ভাগ বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তারাশঙ্করের জীবিতকালে এ মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি— কিন্তু দীর্ঘদিন সাময়িক পত্র সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এর পাতায় এ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এ উপন্যাসটি রচনার ইতিহাস তাঁর আত্মজ শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশদ ভাবে অন্যত্র বলেছেনও। পূর্বোবর্তী খণ্ডে সে কথার উল্লেখও করা হয়েছে। Saga জাতীয় এত বড় দীর্ঘ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই মুহূর্তে কেবলমাত্র শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও পরবর্তী দুই খণ্ডের এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' ও পরবর্তী দুটি খণ্ডের নাম মনে পড়ছে।

প্রায় দুই শতাব্দীর উত্থান-পতনের ইতিহাসের সঙ্গে একটি জমিদার-বংশের কাহিনীর কথাও নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে তারাশঙ্কর বলেছেন। অর্থাৎ মোগল যুগের তখন অবসান হচ্ছে—দেশে বর্গীর হাঙ্গামা এবং ডাকাতি ও ফাঁসুড়ে ও ঠ্যাঙাড়ে প্রভৃতির নানাবিধ উৎপাত প্রবল। বিচার ও শাসন বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। 'জোর যার মুলুক তার'— এই নীতিই হোলো দেশের শক্তিশালী লোকদের মনোভাব। ইংরেজ শাসন ও শোষণ তখনও দেশে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় নি—তখন কাহিনীর আরম্ভ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও আরম্ভ—লর্ড কর্ণওয়ালিশের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজত্ব ও রাজস্ব আদায়ের সূত্রপাত ও বাঙালী ভূস্বামীদের অভ্যুদয়। তারপর ধাপে ধাপে নানা ভাঙাগড়ার কাহিনী বলেছেন তারাশঙ্কর— 'কীর্তিহাটের কড়চা' মহা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।

মনে হয় এই মহাগ্রন্থ রচনা করবার বাসনা দীর্ঘদিন ধরে অন্তরে লালন করেছেন তারাশঙ্কর। তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক অনেক রচনার টুকরো টুকরো অংশ পাওয়া যায় উপন্যাসটির মধ্যে। লাভপুর ও কলকাতার চোখে দেখা ও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শোনা অনেক কাহিনী তিনি চয়ন করেছেন এই মহা উপন্যাসে। অনেক কাছে থেকে দেখা মানুষের ভিড়ও অপ্রতুল নয় উপন্যাসটির মধ্যে।

বহু উল্লিখিত ও বহু কথিত আরো একটি কথা পুনরায় উল্লেখ করতে হচ্ছে। তারাশঙ্কর নিজে ছিলেন প্রাচীন জমিদার-বংশের সন্তান। তাছাড়া তাঁর স্বগ্রাম লাভপুরে ছিল ছোট ও বড় ভূস্বামীদের প্রাবল্য। তাদের দোষগুণ তিনি অতি কাছে থেকেই দেখেছেন। ক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর জমিদার-শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাঁর 'জলসাঘর', 'রায়বাড়ি', 'বন্দিনী কমলা' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্য দিয়ে। তাছাড়া 'সাড়ে সাত গণ্ডার

জমিদার' ও 'মুটু মোক্তারের সওয়াল' প্রভৃতি জমিদারপ্রধান বিখ্যাত গল্পও তাঁর আছে। তাঁর অতি বিখ্যাত 'অগ্রদানী' গল্পের মধ্যেও জমিদার-শ্রেণীর কথা আছে। তিনি জমিদার-শ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণ এবং তাদের বিবেকবর্জিত আদর্শহীন জীবনের কথা বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। আবার কোনো কোনো গল্পে বিগত বৈভবের কথার সঙ্গে মুচুকুন্দ চাঁপার মৃদু সুঘ্রাণের রেশ যেন পাই। এ গল্পগুলির মধ্য দিয়ে মানুষ তারাশঙ্করকে দেখতে পাই। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। ছোটই হোক—বড়ই হোক—মানুষকে villain ভাবতে তাঁর ভালো লাগত না।

'কীর্তিহাটের কড়চা'র কথক সুরেশ্বর শিল্পী। সে তাদের বংশের নানা ঘটনার ছবি এঁকেছে। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছবির পরে ছবির মালা গাঁথে নি। 'কড়চা' সঠিক অর্থে ইতিহাস নয়। উপন্যাসও নয়। অন্তত অভিধানে সে কথা বলে না। তারাশঙ্করও দুশো বৎসরের ঘটনাবলীর মধ্যে কিছু ফাঁক রেখেছেন। এই কাহিনী বর্গীর হাঙ্গামা—পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে কেনারাম ভট্টাচার্য রায়ের বৈষয়িক উন্নতি ও সেই সঙ্গে হারেম থেকে পলাতক যবনী-মুসলমানীর সঙ্গে তাঁর প্রেমভালবাসার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে।

এই সূচনা। তারপর সে কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি, নীলচাষ ও নীলকুঠির অত্যাচার, নীলকর রবিনসন সাহেব, শিকারকাহিনী এবং সোমেশ্বর রায় ও শ্যামাকান্তের তন্ত্রচর্চা, বীরেশ্বর রায়ের ঘটনাবহুল জীবন এবং ভবানী দেবী ও সফিয়া বাঈ এবং জমিদারী রত্নেশ্বর রায়ের কঠিন হাতে জমিদারী পরিচালনা ও প্রজাশাসন এবং তাঁর পরবর্তীকালে কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সচ্ছলতা থেকে উত্তরপুরুষের কয়লাখনির ব্যবসা ও সংবাদপত্র পরিচালনা এবং বিলিতিয়ানার অনুকরণ ও বিলেতযাত্রা দেখিয়েছেন। তারপর ক্রমে ক্রমবর্ধমান বংশধরদের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারীর আয়ের হ্রাস এবং বিলীয়মান জমিদারীর সঙ্গে বিলীয়মান মনুষ্যত্বের কথাও এই খ্যাতিমান স্রষ্টা অতি নিপুণভাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য-সমুজ্জ্বল লেখনীতে বর্ণনা করেছেন।

তারপর সুরেশ্বরের জীবনেও এসেছে পরিবর্তন। চির উচ্ছৃঙ্খল, ভাবুক, আদর্শবাদী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও সমাজতন্ত্রে-বিশ্বাসী সুরেশ্বর সেটেলমেণ্টের কাজে কীর্তিহাটে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। নানা রকম ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব দেখেছে ছোট ও বড়দের মধ্যে। গ্রামীণ দলাদলি দেখেছে। তাদের বংশের মানুষদের অধঃপতন দেখে বিস্মিত হয়েছে। শতাধিক বৎসর পূর্বে লেখা বীরেশ্বর রায় ও রত্নেশ্বর রায়ের ডায়েরি ও পত্রাবলী পড়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে ঘটনাবলীর নাটকীয়তায়। মেজদি অর্থাৎ মেজ ঠাকুমা ও অর্চনা এবং বংশের অন্যান্যদের স্নেহপাশে জড়িয়ে পড়েছে। মেজদি ও অর্চনা রাজনীতিতে উগ্র সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। মেজদি ও অতুলেশ্বর কাকার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগ থাকার সন্দেহে জেল হয়ে যায়। অর্চনাকে বাঁচানোর জন্য রায়বাড়ীর কুলবধূ মেজ ঠাকুমা স্বেচ্ছায় নিজের ওপর দোষ চাপিয়ে দেন—যাতে তাঁর নাতনী রক্ষা পায়।

সুরেশ্বর কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার নিয়ে গিয়েছিল। তাতে রাজদণ্ডের কিঞ্চিৎ লাঘব হয় মাত্র।

শেষ পর্যন্ত কংসাবতীবারি-বিধৌত বনছায়া-শীতল কীর্তিহাটে সুরেশ্বর বসবাস আরম্ভ করে। কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে আসে। তার পর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের বিষণ্ণ নভেম্বর সন্ধ্যায় সুরেশ্বর সুলতার কাছে কীর্তিহাটের জবানবন্দী দেয়। জমিদারী উচ্ছেদের পর সুরেশ্বর পুনরায় কীর্তিহাটে ফিরে যায় এবং তার পর সুলতা পেয়েছে সুরেশ্বরের মৃত্যুসংবাদ এবং কীর্তিহাটে অনুষ্ঠিত তার শ্রাদ্ধের আমন্ত্রণলিপি। তারপরই কাহিনীর ওপর যবনিকা নেমে এসেছে।

বিনয় করে এই দীর্ঘ উপন্যাসটির নামকরণ করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা 'কীর্তিহাটের কড়চা'। অর্থাৎ দুইশত বৎসরের সব কথা তিনি বলবেন না। মোটা তুলিতে টানটোন দিয়ে আঁচড় কাটবেন। উপন্যাস রচনা করবেন না। 'কীর্তিহাটের কড়চা' লিখবেন। কিন্তু এই প্রখ্যাত কথাশিল্পীর হাত দিয়ে বাংলাসাহিত্য লাভ করেছে একটি দীর্ঘদিনের প্রয়াস—রত্নের খনি। এত ব্যাপক পটভূমিতে এত বিপুলতর পৃথুল উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে খুব অল্পই আছে। এত বিপুল ঘটনার জাল ও বৈচিত্র্য উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে যে পাঠককে অনেক সময় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। প্রবীণ কথাশিল্পীর পরিণত বয়সের প্রজ্ঞার ফসল এই যুগান্তকারী মহৎ উপন্যাসের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে একালের একজন প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্য এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য :

"…তাঁর জীবনগত অভিজ্ঞতার যে বিস্তার, আপন দেশ-কালের যে পরিব্যাপ্ত চেতনার ও ঐতিহ্যের আলোয় তিনি স্বদেশের সমাজ রাজনীতি ও নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গণচেতনার অভ্যুত্থান ও ক্রমবিবর্তনকে উপলব্ধি করেন এবং সমকালের যুদ্ধোত্তর সংশয় ও অবক্ষয়ের পটভূমিতে জীবন সম্পর্কে তাঁর যে গভীর 'অস্তিবাদী' প্রত্যয়—জীবনের সেই বিশাল প্রেক্ষাপট, সেই ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি ও গভীর প্রত্যয়কে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত করতে যথার্থ মাধ্যম ছোট গল্প নয়, উপন্যাস—বৃহৎ 'ক্রনিকল'-ধর্মী উপন্যাস। 'রিজিওন্যাল' ও 'পিরিয়ড' নভেল-এর সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে যে 'ক্রনিকল'-এর আবেদন সামগ্রিক ও চিরায়ত, প্রকরণ-গত শিথিলতা সত্ত্বেও যে ধরনের বিপুলায়ত সৃষ্টির সংবেদন অনিবার্য—তারাশঙ্করের শিল্প-স্বভাবের মূল প্রবণতা সেই মহৎ উপন্যাস রচনার দিকেই। প্রবণতা ও প্রয়াসের এই সমুন্নত মহিমায় তারাশঙ্কর একালের বাংলা উপন্যাসের অদ্বিতীয় স্রষ্টা সন্দেহ নেই।" ('তারাশঙ্করের উপন্যাস', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯ কলকাতা)।

'সপ্তপদী'

'সপ্তপদী' বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ ও উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল—রচনার উৎকর্ষে অতুলনীয় উপন্যাস রচিত হয়েছে—এই ক্ষীণ কলেবর উপন্যাসটি তার মধ্যে একটি প্রধান স্থান পাবে বলে বিশ্বাস। বিশ্বসাহিত্যেই উজ্জ্বলতম রত্ন হিসেবে স্থান পাবে। প্রবীণ ও নিপুণ কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সপ্তপদী' উপন্যাসটির মধ্যে ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শ বুলিয়েছেন ঘটনার চমৎকারিত্বে ও ভাষার কারুকার্যে।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রচিত বিপুল কালের উপন্যাস দেখে দেখে স্বভাবতই সাহিত্য-পাঠকের মনে হয়—ক্ষুদ্র উপন্যাসের মধ্যে বুঝি বিস্তৃত পটভূমিকার বিস্তার করা যায় না। ছোট উপন্যাসের কাল বুঝি শেষ হয়ে এল। কিন্তু তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী' ও প্রসিদ্ধ মার্কিন ঔপন্যাসিক আরনেস্ট হেমিংওয়ে (Ernest Hemingway)-এর 'The old man and the Sea'-এর সাফল্য দেখে এই মোহভঙ্গ হয়। রবীন্দ্রনাথও শেষ বয়সে বিরাট বিপুল কলেবর মহাভারততুল্য মহাকাব্য সদৃশ উপন্যাসের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর শেষ বয়সে রচিত উপন্যাসগুলিও খুব বড় আকারের নয়। 'চতুরঙ্গ', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা চলে।

'সপ্তপদী' উপন্যাসটি পুস্তক-আকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩৫৬ সালের 'শারদীয়া আনন্দ-বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

'সপ্তপদী' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৬৪ পৃ, ১১৮। ষোল-পেজী ইম্পিরিয়াল সাইজ। ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট। প্রকাশক: শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড: ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। নবম সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়: ফাল্গুন ১৩৬৬। এই নবম সংস্করণে তারাশঙ্কর মুখবন্ধ স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সংযোগ করেন।

'সপ্তপদী'র ভূমিকাটি মূল্যবান। প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"তেরশো ছাপ্পান্ন সালে পূজার আনন্দবাজারে সপ্তপদী প্রকাশিত হয়েছিল। আমার সাহিত্য-কর্মের রীতি অনুযায়ী ফেলে রেখেছিলাম নূতন করে আবার লিখে বা আবশ্যকীয় মার্জনা ক'রে সংশোধন ক'রে বই হিসেবে বের করব। বিগত ১৫।১৬ বৎসর ধ'রে কবির সময় থেকে এই রীতি আমার নিয়ম ও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার জীবনে ও শিক্ষায় এ শক্তি আমার নেই। আমি জানি যে, একবার লিখেই কোন রচনাকে—নিখুঁত দূরের কথা—আমার সাধ্যমতও নিখুঁত করতে পারি না। কিন্তু সপ্তপদীর সময়ে ঘটনার জটিলতায় তা সম্ভবপর হয় নি। যেমনটি ছিল তেমনটিই ছেপে বইয়ের আকারে বের হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল দ্বিতীয়

সংস্করণের সময় সংশোধন ও মার্জনা করব, কিন্তু তাও সম্ভবপর হয় নি বইখানির চাহিদার জন্য। ছ'বৎসরে আটটি সংস্করণ হয়েছে। প্রকাশকেরা বিলম্ব করতে চান নি, আমাকেও সুযোগ দেন নি। এবার জোর করে সুযোগ নিয়ে মোটামুটি সংশোধন ও মার্জনা করলাম। তাও সম্পূর্ণ হ'ল না।

পরিশেষে সপ্তপদী রচনার ইতিহাস বা এই কাহিনীর আসল সত্য নিয়ে একটি নিবন্ধ যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেটিও পরিশিষ্টে যোগ করে দিলাম। মূল নিবন্ধে কৃষ্ণেন্দুর কথাই আছে। রিনার চরিত্র-ও ঠিক কাল্পনিক নয়। সামান্য দেখা কয়েকবারে কয়েকটা ঝলক মাত্র। সেটুকু সপ্তপদীর কথা বলবার সময় বলা উচিত বিবেচনায় যোগ করে দিলাম।"

'সপ্তপদী' উপন্যাসের শেষে পরিশিষ্ট অংশে তারাশঙ্কর কৃষ্ণেন্দু ও রিনার উৎস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। 'সপ্তপদী' উপন্যাসের মধ্য দিয়েও তারাশঙ্কর ধর্ম ও মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও বর্তমান কাল ও ভবিষ্যতের অনেক সমস্যা ও জীবন-জিজ্ঞাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। ভারতীয় ধর্মাদর্শ ও শাশ্বত জীবন-জিজ্ঞাসার বাণীরূপ এই উপন্যাসটির প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে আছে। 'বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মত' অতি অল্প কথার মধ্যে নিপুণ কথাকার অনেক কথা বলেছেন।

সেই সঙ্গে ভারতীয় খ্রীষ্টান জীবনের বিশেষ করে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নামক সম্প্রদায়ের দুঃখ ও দুর্দশা ও গ্লানিময় ক্লেদাক্ত জীবনের চিত্র অতি নিদারুণভাবে অতি দরদের সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। মনে হয় অতি কাছে থেকে দেখে এই দরদী কথাশিল্পী দেশী পুষ্পপাত্রে সাজানো বিদেশী ফুলের বর্ণনা করেছেন। যে ফুলগাছ দৃঢ়মূল হয়ে ভারতীয় কিম্বা পাশ্চাত্ত্য দেশের মাটিতে প্রোথিত হতে পারে নি।

তারাশঙ্কর নিজেও ছিলেন সেকালের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ-এর ছাত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরেজি ১৯১৫ খ্রীঃ কলেজ-এ ঢুকেছিলেন। থাকতেনও এণ্টালী এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। ফলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জীবনের হতাশা ও রিক্ততার চিত্র তাঁর মত মানুষের পক্ষে চোখে পড়া অসম্ভব ছিল না। তখনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় খ্রীষ্টান ও বাঙালী হিন্দু পরিবার তালতলা ও এণ্টালী অঞ্চলে পাশাপাশি বাস করতেন। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হয়—সে-সময় তিনি এণ্টালী থেকে চলে আসেন।

আরো অনেক পরে তারাশঙ্কর বউবাজারের একটি মেসে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তারাশঙ্কর তখন খ্যাতিমান কথা-সাহিত্যিক। বউবাজার মেসটি ছিল একটি বিচিত্র স্থান। প্রাসঙ্গিক অংশ তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবন' থেকে উদ্ধৃত করছি :

"বউবাজারের মেসটি ছিল একটি অতি বিচিত্র স্থান। এমন বিচিত্র সংস্থান কদাচিৎ ঘটে

জীবনে। বাড়িটি কলেজ স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মধ্যে বউবাজার স্ট্রীটের উত্তর ফুট-পাথের উপর। সামনেই একটি গির্জে আছে। এবং উত্তর দিকের ফুটপাথের বাড়িটার ঠিক একখানা বাড়ির পরেই আছে ফিরিঙ্গী কালী। চীনেম্যান, দেশী ক্রীশ্চান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মুসলমান নিয়ে পাড়াটা। শুধু তাই নয়, বড় বড় বাইজীদের বাসা এখানে। যে বাড়িটায় আমাদের মেস ছিল, সেই বাড়িতে এককালে ছিল বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'সারভেণ্ট' পত্রিকার আপিস। একদিন পবিত্র গাঙ্গুলী মেসে এসে সে কথা বলে গেলেন। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। নিচের তলায় চামড়ার গুদাম; সামনেটায় ফার্নিচারের দোকান। একটা গলিপথে ঢুকে পূর্বমুখী দরজার উপরতলার সিঁড়ি। এই সিঁড়িটাই বাড়িটাকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে। সামনের ভাগে অর্থাৎ দক্ষিণে বউবাজারের রাস্তার দিকটায় দোতলা এবং তিনতলায় চারখানা বড় বড় ঘরে পশ্চিমদেশীয়া বাইজীরা থাকে। উত্তরে চারখানা চারখানা আটখানা ঘরে চারটে মেস। দুখানা করে ঘর এক-একটি মেস। এক-এক ঘরে দশ-বারোজন থাকে, যাত্রার দলের আসামীই বলুন আর ধর্মশালার যাত্রীই বলুন—যা বলবেন উপমায় বেমানান হবে না। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম—লোক সব জায়গারই আছে। আমি যে মেসটায় গিয়েছিলাম, সে মেসটা ছিল লাভপুরের নির্মলশিববাবুদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস।…"

* * *

এই মেসেই রান্নার জন্যে কাঠের রান্নাঘর ছিল। সেই রকম একটা খালি কাঠের ঘরে বাস করতো দুটি ক্রীশ্চান মেয়ে।—একটি যুবতী একটি বুড়ী। তারাশঙ্কর এদের সম্পর্কে লিখেছেন:

"আরও একটা বিচিত্র সংস্থান ছিল। সরু মিহি গলায় চিৎকার উঠত ছাদে বা সিঁড়িতে—ঈ ওল্ড্ হ্যাগ—

উত্তরে আরও একটা গলা চেঁচাত—হোয়থ? ইউ বিচ্!

উপরের ছাদে এই ফ্লাটেই বলুন আর ঘরেই বলুন এগুলির জন্যে কাঠের রান্নাঘর ছিল। বোধ হয় খানতিনেক রান্নাঘর খালি ছিল, সেখানে থাকত দুটি ক্রীশ্চান মেয়ে।—একটি যুবতী একটি বুড়ী। ওদের দু'জনে ঝগড়া বাধত। বুড়ী ওই যুবতীটির রান্নাবান্না করত। তার সঙ্গেই খেত-দেত। যুবতীটি বিকেলে সাজসজ্জা করে বের হত, রাত্রে প্রায়ই মাতাল হয়ে ফিরত। তখনই বাধত ঝগড়া। মধ্যে মধ্যে সঙ্গে আসত ফিরিঙ্গী ছোকরা। খানিকটা দাপাদাপি করে শেষে গালাগাল করতে করতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছুটে পালাত। মাতাল যুবতীটা তাড়া করত ভাঙা বাজু বা মশারির ডাণ্ডা নিয়ে।

বুড়ীটা মধ্যে মধ্যে কাঁদত। হিন্দীতেই বলত, ছোকরী সেও এককালে ছিল।

বাবুরা অনেকে তাকে ডাকত 'ম্যাগী' বলে।

সে কিছু বলত না। কিন্তু একদিন আমাকে বলেছিল, দেখ, আমি ম্যাগীর মানে জানি··

"এই আসরের মধ্যে আমার আসর পাতলাম। সুবিধে ছিল দুপুরের সময়। খাঁ-খাঁ করত সব মেসগুলি। ওদিকে বাইজীরা নিদ্রামগ্ন। উপরে ফিরিঙ্গী মেয়ে দুটিও ঘুমোত। আমি লিখতাম।"

('আমার সাহিত্য-জীবন', প্রথম পর্ব, পৃ. ১৯৯, ২০২, ২০৩)।

সহজেই রিনা ব্রাউন ও তার মাতা ও ধাত্রী কুন্তী মায়ের কথা মনে আসে। অতি ক্ষীণ সূত্রের রেশ যেন দেখতে পাই। তারাশঙ্করের সৃষ্টির বৈচিত্র্যে দেশীয় ক্রীশ্চান শ্রেণীর কথা এসেছে বারে বারে। তাঁর 'অভিযান', 'কান্না' ও 'কীর্তিহাটের কড়চা' এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে। তিনি এই তথাকথিত অত্যন্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু সমাজ থেকে বিতাড়িত মানুষদের কথা অত্যন্ত দরদ দিয়ে লিখেছেন। এঁদের বিচিত্র ধর্মবিশ্বাসের কথাও লিখেছেন: "এই বিচিত্র বাসাটির স্মৃতি বিচিত্র। কত বিচিত্র মানুষ বিশেষ করে এই মহানগরীর বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সমাবেশ এখানে দেখেছি তার হিসাব দিতে গেলে—সে হবে অন্য গ্রন্থ। তবে একটি বৈচিত্র্যের কথা বলব। সে ফিরিঙ্গী কালী ও কালীতলার কথা। এই কালীস্থানটি বহু পুরাতন। কলকাতার তথা ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্তনে এই দেবতাটির ভূমিকা ঐতিহাসিক বললে অতিশয়োক্তি হবে না। সেকালে সমাজের অবহেলিত বর্ণের যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল—ওই আমাদের মেসের ছাদের বাসিন্দে ম্যাগী—লুসির পূর্বপুরুষদের আরাধ্যা দেবী। ক্রীশ্চান হয়েও বিপদেআপদে শোকে তারা মেরী ও ক্রাইস্টকে ডেকে সান্ত্বনা পেত না। তাই ওই দেবীটিকে স্থাপনা করেছিল। এখানে তারা পূজা দিত সেকালে। প্রণাম করে কাজে বের হত। এইকালেও দেখতাম, ক্রীশ্চানরা এসে দাঁড়াত—মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। যেই দেখত বিশেষ লোকজন নেই অমনি পয়সা দিয়ে টুপ করে একটি ছোট্ট প্রণাম নিবেদন করে চলে যেত। সন্ধ্যের পর থেকে এইটে ঘটত বেশী। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। মধ্যে মধ্যে দেখতাম—ম্যাগী বুড়ী হাত জোড় করে বিড় বিড় করে কিছু বলছে।" ('আমার সাহিত্য-জীবন'—প্রথম পর্ব, পৃ. ২০৩)।

রিনা ব্রাউন ও তার হিদেন অন্ত্যজশ্রেণীজাত মায়ের একটা ক্ষীণ ছায়া যেন তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবন'-এর পাতায় পাওয়া যায়। আরো একটি কথা। ১৯৪৫ খ্রীঃ মে মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মেনীর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম অংশ শেষ হয়েছে। তখনো পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ শেষ হয় নি। জাপানীদের হাত থেকে একের পর এক দেশগুলি হাতছাড়া হচ্ছে। নাগাসাকি ও হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা ফেলায় জাপান আত্মসমর্পণ করে—বিশ্বযুদ্ধের ওপর যবনিকা পড়ে। এসময়ে কলকাতার 'The Statesman' সংবাদপত্রে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণীর একটি হৃদয়বিদারক দীর্ঘ চিঠি 'চিঠিপত্রের কলমে' বের হয়। বিদেশী সৈন্যদের নর্ম-সহচরী রূপে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নারী সমাজের কলঙ্ক ও ব্যভিচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। তদানীন্তন The Statesman-এর ইংরেজ সম্পাদক অত্যন্ত দরদ দিয়ে পত্রটি ছাপিয়েছিলেন। তারপর কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে পত্রটি মুদ্রিত হয়। ভারতীয়

সমাজ ও সংবাদপত্রে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। হয়তো তারাশঙ্কর তাঁর এই কালজয়ী ও যুগান্তকারী উপন্যাসে সেই ফিরিঙ্গী মেয়েটির হতাশা ও রিক্ততার ছোঁয়া কিছুটা দিয়েছেন।

* * *

তারাশঙ্কর অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর অনেক কালজয়ী উপন্যাসে ও ছোট গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার মধ্যেও সে রকম একটি ঘটনা আছে। রিনা ও কৃষ্ণেন্দুর জীবনের নাটকীয় ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যে সেই ঘটনা আড়ালে পড়ে গিয়েছে।

• 'সপ্তপদী' স্রষ্টা তারাশঙ্করের কালজয়ী মহত্তম সৃষ্টি। য়ুরোপীয় জ্ঞান মর্যাদার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (ইংরেজী বা অন্য বিদেশী ভাষায় লেখা বা অনুবাদিত হয়ে) 'নোবেল প্রাইজ' প্রদত্ত হলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।।

উত্তরায়ণ

তারাশঙ্কর দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে নানা রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ লেখা লিখেছেন। কখনো পুরুলিয়া ও মালভূমের জঙ্গলের মধ্যে 'শিলাসন'-এ বসে শুনিয়েছেন রাঢ়' দেশের রুক্ষ—ব্রাত্য—দারিদ্র্য-পীড়িত অন্ত্যজ ও আদিম মানুষদের কাহিনী। আবার 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে শুনিয়েছেন রাঢ়-দেশের প্রান্তে হিজল-বনে শিরবেদেদের জীবনচর্যার সরস বর্ণনা। উন্মুক্ত আকাশতলে মুক্ত-বর্বর-যাযাবরদের কাহিনা শুনতে শুনতে বিস্ময় জাগে। তাঁর লেখায় কখনো বৈচিত্র্য ও ঘটনার বৈপরীত্যের অভাব ঘটে নি। একঘেয়ে কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে পুনরাবৃত্তি করতে বোধ হয় কুণ্ঠা হোত। তাই কখনো 'অভিযান'-এ ড্রাইভার নরসিং, 'সন্দীপন পাঠশালায়' সীতারাম পণ্ডিত এবং 'সপ্তপদী'তে রিনা ব্রাউন ও কৃষ্ণেন্দু বা কৃষ্ণস্বামীর বেদনামথিত কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। রচনার বৈচিত্র্যে ও ঘটনার চমৎকারিত্বে এবং প্রত্যেকটি কাহিনীই নাটকীয় রসে সংপৃক্ত এবং সর্বক্ষণ পাঠকদের আকৃষ্ট করে রাখে। তারাশঙ্করের 'উত্তরায়ণ'-এর মধ্যেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য ও নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় পাই।

'উত্তরায়ণ'-এর প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮; পৃ. ৪+১৬২। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। 'উত্তরায়ণ'-এর National Libraryতে call No. B891. 443 (V544U) 1958।

'উত্তরায়ণ'-এর কাহিনীর 'আরম্ভ কিন্তু গতানুগতিকতার স্পর্শমুক্ত নয়। দিল্লীর

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর ছেলে প্রবীরের সঙ্গে নায়িকা আরতির আলাপ হয় আকস্মিক ভাবে। দুর্জন ছাত্রদের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্রী আরতিকে উদ্ধার করে প্রবীর। তারপর দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে হৃদয় বিনিময় হয়। কিন্তু সে প্রেম সার্থক হয়ে ওঠার আগেই প্রবীর হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মরণ-আহ্বানে ব্রহ্মের রণাঙ্গনে চলে গেল। নায়ক প্রবীর মানুষ হয়েছিল দিল্লীতে—বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে একদল আত্মসর্বস্ব নীতিজ্ঞানহীন মানুষদের মধ্যে। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হোলো প্রবীরদের 'ইউনিট'-এর 'মোটর-মেকানিক' রতনের সঙ্গে। একজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীকে রতনের জন্যে হত্যা করে প্রবীর। আবার রতনকেও হত্যা করতে হয়। যুদ্ধের অবসানে সামরিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে রতনের মা ও স্ত্রীকে রতনের মৃত্যুর খবর দিতে এসে নতুন এক জালে জড়িয়ে পড়ে প্রবীর। প্রবীর ও মৃত রতনের চেহারার মধ্যে ছিল আশ্চর্য মিল। রতনের বৃদ্ধা মা ও অল্পবয়স্কা স্ত্রী প্রবীরকে প্রথমে রতন বলেই গ্রহণ করেছিল; কিন্তু রতনের রূপসী তরুণী স্ত্রী কিন্তু প্রথম রাতেই ধরতে পেরেছিল ছদ্মবেশী প্রবীর তার স্বামী রতন নয়। তবুও মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বৃদ্ধা শাশুড়ীকে প্রবোধ দিতে সে ও প্রবীর মিথ্যা করে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়ে লিপ্ত হোলো। যদিও তাদের প্রত্যেকেই তাদের প্রকৃত পরিচয় জেনেছিল। দিনের পর দিন লোক-দেখানো দাম্পত্য-জীবনের প্রেমহীন স্বামী ও স্ত্রীর অভিনয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময় আরম্ভ হয় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বিধ্বংসী দাঙ্গা বা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'। প্রবীরের কলেজ-জীবনের প্রণয়িনী আরতি দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় আটকা পড়েছিল। ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে গিয়েছিল রতনবেশী প্রবীর। সেখানে পূর্ব প্রণয়িনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। আরতি তখনো বিয়ে করে নি। কিন্তু প্রবীর প্রথমে আরতির কাছে তার পূর্ব পরিচয় গোপন করে। যদিও প্রথম যৌবনের উত্তপ্ত দিনগুলির কথা তার মনেও জাগরূক হয়েছিল। এই ঘটনায় প্রেমিকা আরতি তাকে ভুল বোঝে। প্রবীর যে রতনের অল্পবয়স্কা রূপসী স্ত্রীকে দেখে তাকে ভুলেছে—একথা মনে করে। কিন্তু রতনের বৃদ্ধা মায়ের কথা স্মরণ করে প্রবীর আরতির কাছ থেকে সরে আসে। তারপর রতনের মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবীর ও রতনের স্ত্রীর সকল সম্পর্কের অবসান হয়। প্রবীর সকল কথা পূর্ব প্রণয়িনীকে লিখে জানায়। তারপর চরম দণ্ডের জন্যে সে প্রস্তুত হয়।

তারাশঙ্করের 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসেও আধুনিক জীবনের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। আধুনিক জীবনের আলেখ্য 'জীবন যন্ত্রণা'র রূপ ধরা পড়েছে। তাঁর 'যতিভঙ্গ', 'সপ্তপদী', 'বিপাশা' ও 'যুগভ্রষ্ট' প্রভৃতি উপন্যাসের যুগলক্ষণের সঙ্গেও এই উপন্যাসটির যুগকে চিহ্নিত করা যায়। ক্রমবিলীয়মান যে যুগ কিছুদিন আগেও বিরাজমান ছিল—সে যুগের কথাই তিনি 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসে লিখেছেন। 'উত্তরায়ণ' উপন্যাস বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে চিরসমাদৃত হবে।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত